ইসলামের
ইতিহাস
প্রথম খণ্ড
মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী

ইসলামের ইতিহাস

প্রথম খণ্ড

মাওলানা আকবর শাহ্ খান নজিবাবাদী

অনুবাদকমণ্ডলী

মাওলানা আবদুল মতীন জালালাবাদী
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী
মাওলানা মুহাম্মদ হাসান রহমতী

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ইসলামের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)
মাওলানা আকবর শাহ্ খান নজীবাবাদী
ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন : ২০৫/১
ইফাবা প্রকাশনা : ২০৮৬/১
ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭.০৯
ISBN : 984-06-1229-8

প্রথম প্রকাশ
এপ্রিল ২০০৩

দ্বিতীয় সংস্করণ
জুন ২০০৮
আষাঢ় ১৪১৫
জমাদিউস সানি ১৪২৯

মহাপরিচালক
মোঃ ফজলুর রহমান

প্রকাশক
মুহাম্মাদ শামসুল হক
পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১৩৩৩৯৪

প্রচ্ছদ
জসিম উদ্দিন

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১১২২৭১

মূল্য : ২০০.০০ (দুইশত) টাকা মাত্র

ISLAMER ITIHASH (The History of Islam Part-1): Written by Maulana Akbar Shah Khan Najeebabadi in Urdu and translated by Maulana Abdul Matin Jalalabadi, Maulana Abdullah bin Sayeed Jalalabadi and Maulana Muhammad Hasan Rahmati into Bangla and published by Muhammad Shamsul Haque Director, Translation and Compilation Department, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 9133394.

June 2008

E-mail : islamicfoundationbd@yahoo.com
Website : www. islamicfoundation.org.bd

Price : Tk 200.00 ; US Dollar : 5.00

প্রকাশকের কথা

কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, আকায়িদ প্রভৃতি ধর্মীয় গ্রন্থের অনুবাদের সাথে সাথে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ইবনে ইসহাক, ইবনে হিশাম এবং আল্লামা ইবনে কাছীরের মত জগদ্বিখ্যাত ঐতিহাসিকদের বিরচিত ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে প্রামাণ্য এবং নির্ভরযোগ্য বহু গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করেছে। এরই ধারাক্রমে এবার প্রকাশ করা হলো বিখ্যাত ঐতিহাসিক এবং সাহিত্যিক মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী প্রণীত 'তারীখে ইসলাম' গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ 'ইসলামের ইতিহাস' প্রথম খণ্ড।

ইতিহাস হলো জাতির দর্পণস্বরূপ। এর মাধ্যমে মানুষ জানতে পারে বিগত দিনের সাফল্য ও ব্যর্থতার ইতিকথা। আর জানতে পারে এর কারণসমূহ। তাই মানুষ ইতিহাস পাঠে সাবধানী হয়, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় বিচক্ষণতার পরিচয় দেয়, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সচেষ্ট, উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হয়। ইতিহাসকে জাতির বিবেক বলা চলে। এটা একটা জাতির দিক-দর্শন যন্ত্রের মতও কাজ করে।

ঐতিহাসিক মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী তাঁর গ্রন্থের প্রথমদিকে ইতিহাসের সংজ্ঞা, ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা, ইসলামের ইতিহাস ও সাধারণ ইতিহাস সংক্রান্ত পর্যালোচনা করেছেন। এরপর আরবদেশ, আরবদেশের অবস্থান, প্রকৃতি ও এর অধিবাসী সম্পর্কিত আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জন্ম হতে ওফাত পর্যন্ত যাবতীয় ঘটনা সবিস্তারে বিধৃত হয়েছে। গ্রন্থখানির পরিসমাপ্তি ঘটেছে খুলাফায়ে রাশেদার আমলে ইসলাম প্রচার, দেশ বিজয় ও রাজ্য শাসন ইত্যাদি বিষয়ের নিখুঁত, নির্ভুল ও হৃদয়গ্রাহী উপস্থাপনার মাধ্যমে। যার ফলে গ্রন্থখানি প্রাণবন্ত, অনবদ্য ও অনিন্দ্যরূপ পরিগ্রহ করেছে। এ ধরনের একখানি মূল্যবান গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করতে পেরে আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করছি।

পুস্তকটির প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ার পর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশকালে বিজ্ঞ গ্রন্থকার ঐতিহাসিক মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, অনুবাদক জনাব মাওলানা আবদুল মতিন জালালাবাদী, মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী এবং মাওলানা হাসান রহমতীকে জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ। মুবারকবাদ জানাই দ্বিতীয় সংস্করণে সম্পাদনাকারী মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলীকে, যিনি প্রথম সংস্করণে মুদ্রিত অনেক ভুলভ্রান্তি সংশোধন করে দিয়েছেন। প্রুফ দেখার মত শ্রমসাধ্য কাজটি আনজাম দেয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাই জনাব মোহাম্মদ মোকসেদকে। গ্রন্থখানি প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য সকলকেও জানাই মুবারকবাদ।

গ্রন্থখানি নির্ভুলভাবে প্রকাশ করার প্রচেষ্টায় কিংবা আন্তরিকতায় কোন ইচ্ছাকৃত ত্রুটি করা হয়নি। তবু সুধীজনের নজরে কোন প্রমাদ পরিলক্ষিত হলে তা অনুগ্রহ করে আমাদের অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করার ব্যবস্থা করা হবে ইন্‌শাআল্লাহ।

মুহাম্মাদ শামসুল হক
পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

আরব দেশ

দ্বিতীয় অধ্যায়
হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম

তৃতীয় অধ্যায়

খিলাফতে রাশিদা

চতুর্থ অধ্যায়
(খিলাফতে রাশিদার শেষার্ধ)
হযরত উসমান গনী (রা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পূর্বকথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ . اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ . مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ . اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنَ . اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ . صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ . غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ . اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ . اَمَّا بَعْدُ . رَبِّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ وَيَسِّرْ لِىْ اَمْرِىْ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِىْ يَفْقَهُوْا قَوْلِىْ .

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্

বিশ্ব ইতিহাসের প্রতি নযর বুলালে প্রতীয়মান হয় যে, পৃথিবীর দেশে দেশে যুগে যুগে যত আম্বিয়ায়ে কিরাম, সংস্কারক ও ধর্ম প্রবর্তক এসেছেন তাঁদের সবাই এক মহান সত্তার (স্রষ্টার) অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন এবং সকলেই তাঁদের অনুসারীদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্বে বিশ্বাসী করে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন। হযরত আদম (আ), হযরত নূহ্ (আ), হযরত ইবরাহীম (আ), হযরত মূসা (আ) ও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সময়কালের মধ্যে শত শত হাজার হাজার বছরের ব্যবধান বা দূরত্ব থাকা সত্ত্বেও তাঁরা সবাই এক আল্লাহ্র একত্ব তথা তাওহীদের মূলনীতি শিক্ষা দিয়েছেন।

কৃষ্ণজী, রামচন্দ্রজী, গৌতম বুদ্ধ ও গুরু নানক ভারতবর্ষে, কায়কোবাদ ও জরথুস্ত্র ইরানে, কনফুসিয়াস চীনে, হযরত লুকমান গ্রীসে, হযরত ইউসুফ (আ) মিসরে, হযরত লূত (আ) সিরিয়া ও ফিলিস্তীনে ছিলেন, কিন্তু তাঁদের সকলের শিক্ষায়ই আল্লাহ্ তা'আলার একত্বের শিক্ষা অভিন্নভাবে বিদ্যমান।

নারী-পুরুষ, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নির্বিশেষে ইয়াহূদী-খ্রিস্টান প্রভৃতি পৃথিবীর প্রায় সকলেই আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বে বিশ্বাসী। স্বল্পসংখ্যক লোক এমন যারা কোন দিকেই গণ্য নয়। এমন কিছু লোকও থাকতে পারে, যারা বাহ্যত আল্লাহ্র অস্তিত্বকে অস্বীকার করলেও তাদের অন্তর আল্লাহ্র অস্তিত্বের স্বীকৃতি দিতে বাধ্য। শেষ পর্যন্ত তাদেরকেও স্বীকার করতে হয় যে,

এই কার্যকারণের পেছনেও একজন কুশলীর ইচ্ছা ও পরিকল্পনা সক্রিয় রয়েছে। সেই কুশলী ইচ্ছাময়ের নামই হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা।

কবির ভাষায় :

به لوح گر هزار اں نقش پید است
نیاید بے قلمزن یك الفت راست

পৃথিবীর এ বিপুল ঐকমত্যকে অস্বীকার করা এবং বিশ্বের তাবৎ জ্ঞানীগুণী দার্শনিকদের সর্ববাদীসম্মত আকীদা-বিশ্বাসকে ভুল প্রতিপন্ন করা পাগল ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভবপর নয়।

হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম

সুবিশাল বায়যান্টাইন সাম্রাজ্য শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। তার অর্ধপাশবিক আইন-কানুনও বিকৃত হয়ে তার নিপীড়ন ও ত্রুটিসমূহকে বর্ধিত এবং পূর্ব থেকেই যাতে গুণের পরিমাণ ছিল খুবই অল্প তা দিন দিন অবলুপ্ত করে ফেলেছিল। ইরানের শাহানশাহী জুলুম ও বিবাদের গুদামে পরিণত হয়েছিলো। চীন ও তুর্কিস্তান হয়ে উঠেছিল রক্তপাতের এক-একটি নিরাপদ ঘাঁটি। ভারতবর্ষে মহারাজা অশোক এবং রাজা কনিষ্কের যুগের সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা অবলুপ্ত হয়ে পড়েছিল। মহারাজা বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালের কথা তখন কেউ চিন্তাও করতে পারতো না। বৌদ্ধ রাজত্বের কোন নমুনাও তখন বিদ্যমান ছিল না। বৈদিক ধর্মের কোন উল্লেখযোগ্য নিদর্শনও তখন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। তথাগত বুদ্ধের নাম যারা ভক্তি গদগদ কণ্ঠে উচ্চারণ করতো, তাদের অবস্থাও এতই শোচনীয় ছিল যে, রাজত্বের মোহ, ভোগস্পৃহা ও বিশ্বাসগত দুর্বলতার দরুন যে কোন লজ্জাকর কাজ করতেও তারা দ্বিধাবোধ করতো না। শ্রীকৃষ্ণের নাম জপকারীদের অবস্থা ছিল এই যে, আশরাফুল মাখলুকাত মানুষকে বৃক্ষলতা ও জড় পদার্থের সম্মুখে অবনত মস্তকে প্রণিপাত করতে তারা একটুও দ্বিধাবোধ করতো না। ইউরোপ ছিল এক ব্যাঘ্র-সঙ্কুল বিভীষিকাময় প্রান্তর আর তার অধিবাসীরা ছিল রক্তলোলুপ ব্যাঘ্রের চাইতেও ভয়ঙ্কর জীব। আরব ছিল সমস্ত নৈতিকতা বিগর্হিত ও শান্তি বিনষ্টকারী কার্যকলাপের অভয়ারণ্য। সেখানকার অধিবাসীরা জীব-জন্তুরও অধম জীবন-যাপন করতো। মোটকথা, পৃথিবীর কোন দেশে কোন ভূখণ্ডে মানুষ মানবীয় মহত্ত্ব ও গুণাবলীসহ বিদ্যমান ছিল না। জল-স্থল অন্তরীক্ষে এক শোকার্ত করুণ পরিবেশ বিরাজ করছিল। গোটা বিশ্ব যখন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল তখন ভারতবাসীর কর্তব্য ছিল শ্রীকৃষ্ণ মহারাজের সেই বাণীটি স্মরণ করা, যাতে তিনি বলেছেন :

> হে অর্জুন! যখন ধর্মের হানি হয় এবং অধর্ম বেড়ে যায়, তখন আমি পুণ্যবানদেরকে রক্ষা করি এবং পাপের বিনাশ সাধন করে ধর্মকে কায়েম রাখি।

ইরানবাসীদের কর্তব্য ছিল জরথুস্ত্রের বাণী অনুসারে কেবল পথ প্রদর্শকের অনুসন্ধান করা। ইয়াহূদীদের কর্তব্য ছিল ফারানের পর্বতশীর্ষ থেকে আলো বিকীরণের প্রতীক্ষা করা এবং খ্রিস্টানদের কর্তব্য ছিল হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দু'আ এবং মসীহ-এর সুসমাচারকে আশা-ভরসার স্থল বানানো। কিন্তু বিশ্বজোড়া ফিতনা-ফাসাদ ও যুগের অন্ধকার সর্বত্র বিবেকসমূহকে

এমনি আচ্ছন্ন এবং চোখসমূহকে এমন অন্ধ করে রেখেছিল যে, কারো এতটুকু হুঁশও ছিল না। যে, নিজেদেরকে রুগ্ন জ্ঞান করবে এবং চিকিৎসার জন্য যত্নবান হবে।

এমনি যুগসন্ধিক্ষণে আরব দেশের মতো ভূখণ্ডে হাদীয়ে বরহক, রাসূলে রাব্বিল 'আলামীন, খায়রুল বাশার, শাফীউল মুযনিবীন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম শিরকের-ভ্রষ্টতা, মূর্তিপূজার অন্ধকার, মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি, পাপাচারিতা ও অশ্লীলতার ক্লেদ থেকে মানুষকে মুক্ত করার জন্য 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'-এর বুলন্দ আওয়াজ তুলে মানুষরূপী অমানুষগুলোকে প্রকৃত মানুষে ও চরিত্রবান মানুষে এবং চরিত্রবান মানুষকে আল্লাহওয়ালা মানুষে রূপান্তরিত করে দুনিয়ার যুগ-যুগান্তের জমাট অন্ধকাররাশিকে হিদায়াত, আলো, শান্তি ও পুণ্যে রূপান্তরিত করেন অর্থাৎ পথভ্রষ্ট মূর্তিপূজারী ও পাপাচারী লোকদেরকে মুসলমান বানাবার গুরুদায়িত্ব পালন করেন।

হযরত নূহ (আ) ইরাকের পথভ্রষ্ট মানুষকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার সাধনায় শত শত বছর তাবলীগ করার পর অবশেষে (رَبِّ لاَ تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ دَيَّارًا) "প্রভু। এ পৃথিবীতে কাফিরদের একটি ঘরও আর অবশিষ্ট রেখো না" (৭১ : ২৬) রূপী তরবারি প্রয়োগে সকলের কিস্সা খতম করতে বাধ্য হন। হযরত মূসা (আ) মিসরবাসী এবং তাদের মদমত্ত বাদশাহদেরকে সুপথে আনার সম্ভাব্য সকল প্রচেষ্টাই চালান। কিন্তু অবশেষে মূসা (আ)-ও বনী ইসরাঈল সেই দৃশ্যও অবলোকন করলেন যার সম্পর্কে কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে :

وَاَغْرَقْنَا اٰلَ فِرْعَوْنَ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ۔

আমি ফিরাউনের দলবলকে ডুবিয়ে মারলাম আর তোমরা তা প্রত্যক্ষ করছিলেন। (২:৫০)

ভারতবর্ষে মহারাজা রামচন্দ্রজীকে লঙ্কায় অভিযান চালাতে হয় এবং রাক্ষসদের সাথে যুদ্ধ করতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ মহারাজকে কুরুক্ষেত্রে সমরাঙ্গনে অর্জুনকে যুদ্ধে উৎসাহিত করে কুরুদের পাপাচারী দলকে পাণ্ডবদের হাতে ধ্বংস করতে হয়। ইরানে জরথুস্ত্রকে ইসফান্দিয়ারের বাহুবল ও রাজত্বকে ধর্ম প্রচারের মাধ্যমরূপে গ্রহণ করতে হয়।

কিন্তু প্রাচীন শিলালিপি ও প্রত্নতাত্ত্বিক যে সমস্ত বিবরণ পাওয়া যায় তাতে এ ব্যাপারে জ্ঞানীগুণীরা সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেন যে, মহামতি ধর্ম প্রবর্তকগণ এবং সত্য সাধকদের জীবনে এ নযীর খুঁজে পাওয়া যায় না যে, মাত্র পঁচিশ বছরের স্বল্প সময়ে আরবের অজ্ঞ বেদুঈনদের মত একটি জাতি সমস্ত সভ্য দুনিয়ার শিক্ষক, সর্বাধিক সভ্য ও চরিত্রবান জাতিতে পরিণত হয়েছে। এক শতাব্দীরও কম সময়ের মধ্যে কেবল আশিটি বছরের মধ্যে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আনীত ধর্মের অনুসারীরা আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত অর্থাৎ চীনের পূর্ব উপকূল পর্যন্ত অন্য কথায় সমস্ত সভ্যজগত জয় করে নেয়। এ বিস্ময়কর ও অলৌকিক সাফল্যের কোন নযীর পৃথিবীতে নেই।

ইসলামের নীতিমালার সৌন্দর্য যদি সমস্ত ধর্মের নীতিমালার সৌন্দর্যের সমাহার হয় এবং এর শিক্ষাবলী যদি সকল ধর্মের শিক্ষাবলীর চাইতে উত্তমই হয়, তাহলে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মানবশ্রেষ্ঠ, খাতিমুন নাবিয়্যীন এবং রাহমাতুল্লিল 'আলামীন তথা গোটা বিশ্বজগতের জন্য করুণা ও রহমত হওয়ার ব্যাপারে সংশয়ের কী থাকতে পারে ? পৃথিবীর কেইবা সাহস করতে পারে যে, তাঁরই আনীত কিতাব কুরআন মজীদের এ অনন্য বিশেষণ আরোপ এবং অনস্বীকার্য দাবী তথা আল্লাহ্র দাবীর প্রতিবাদ করবে, যাতে তিনি বলেছেন :

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ .

নিশ্চয়ই আমি কুরআন নাযিল করেছি এবং নিশ্চয় আমিই এর সংরক্ষণ করবো।(১৫ : ৯)।

বিভিন্ন জাতিকে উন্নতি ও প্রগতির পথে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিতে এবং তাদেরকে অধঃপতন ও অবনতি থেকে রক্ষা করতে ইতিহাস একটি অত্যন্ত কার্যকর ও মূল্যবান মাধ্যম। কোন জাতি যখন অধঃপতনের নিম্নতম স্তর থেকে উন্নতি ও অগ্রগতির পথে পা বাড়িয়েছে তখন ইতিহাসকেই সে তার প্রেরণার সবচেয়ে বড় উৎসরূপে পেয়েছে। কুরআনুল কারীম আমাদেরকে এও শিখিয়েছে যে, মানুষের সৌভাগ্য এবং দীন-দুনিয়ার সাফল্য অর্জন করতে হলে ইতিহাস পাঠ অপরিহার্য। তাই কালাম মজীদে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে উপদেশ গ্রহণের জন্যে স্থানে স্থানে বিগত জাতিসমূহের অবস্থাদি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এভাবে যে অমুক জাতি নিজেদের অনিষ্টকর কার্যকলাপের জন্যে ধ্বংস হয়েছে এবং অমুক জাতি তাদের সৎ কর্মসমূহের বদৌলতে কেমন করে সৌভাগ্য ও সাফল্য অর্জন করেছে।

হযরত আদম (আ), হযরত নূহ (আ), হযরত ইবরাহীম (আ), হযরত মূসা (আ) প্রমুখ নবী-রাসূলের ঘটনাবলী, ফিরাউন, নমরূদ, 'আদ, ছামূদ প্রভৃতির বর্ণনা কুরআনুল করীমে এ জন্যে উল্লিখিত হয়নি যে, আমরা এগুলো উপভোগ করবো বা আমাদের ঘুমপাড়ানীর কাজে এগুলো লাগবে, বরং এসব সত্য কাহিনী এজন্যে আমাদের সম্মুখে তুলে ধরা হয়েছে যেন আমাদের মধ্যে পুণ্য কাজের সাহস সঞ্চিত হয় এবং পাপাচার থেকে নিবৃত্ত থাকার প্রেরণা সৃষ্টি হয় এবং আমরা আমাদের নিজেদের অবস্থাকে উন্নত ভবিষ্যতের মাধ্যমরূপে গড়ে তুলতে পারি।

মানব জাতির সবচাইতে উপকারী, সর্বাধিক কল্যাণকামী এবং সৃষ্ট জীবসমূহের প্রতি সর্বাধিক সংবেদনশীল দরদী বন্ধু নবী-রাসূলগণ (আ) যখনই কোন জাতিকে ধ্বংস থেকে বাঁচানোর এবং তাদেরকে সম্মান ও সাফল্যের অধিকারী করার জন্যে যত্নবান হয়েছেন, তখনই তাঁরা তাঁদের জাতিসমূহকে অতীত ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির বড় বড় রাজনৈতিক নেতা ও সমাজ সংস্কারকদের মধ্যে এমন একজনও খুঁজে পাওয়া যাবে না যিনি অতীত ইতিহাস ও অতীত যুগের ঘটনাবলী দ্বারা অনুপ্রাণিত ও কর্মোদ্দীপ্ত হননি। এজন্যেই প্রত্যেক বাগ্মী বক্তাই তাঁদের বক্তৃতায় অবশ্য অবশ্যই অতীতের স্মৃতি মন্থন ও অতীত যুগের মহামানবদের ঘটনাবলী রূপী চাটনীর সংমিশ্রণ দিয়ে শ্রোতৃমণ্ডলীকে নিজেদের ইচ্ছেমত উদ্দীপ্ত করে থাকেন। অতীত যুগের খ্যাতনামা পুরুষদের মধ্যে যাঁদের সাথে আমাদের ধর্মীয়, জাতীয় বা দেশীয় মিল থাকার দরুন নিকট সম্পর্ক থাকে, তাদের ঘটনাবলী আমাদেরকে অধিকতর প্রভাবিত করে থাকে। রুস্তম, ইসফান্দিয়ার বা গশ্‌তাসিপও নওশেরওয়ার দ্বারা একজন পারস্যবাসীর অন্তরে যতটুকু ধর্মবোধ, বীরত্ব ও ন্যায়বোধ জাগিয়ে তোলে কোন চীনদেশীয় বা ভারতীয় ব্যক্তির মধ্যে তা ততটুকু করবে না। ভীম, অর্জুন, পৃথ্বীরাজ বা বিক্রমাদিত্যের ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত হিন্দুদেরকে যতটুকু অনুপ্রাণিত করবে, একজন খ্রিস্টানকে তা ততটুকু অনুপ্রাণিত করবে না। এজন্যেই আজ যখন বিভিন্ন জাতির ইতিহাস ও তার প্রভাব সম্পর্কে জনমনে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে এবং এ সত্য দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, কোন জাতিকে জীবন্ত করে তুলতে বা জীবন্ত রাখতে সেই জাতির অতীত ইতিহাসই হচ্ছে সবচাইতে মোক্ষম অস্ত্র, তখন আমরা দিব্যচোখে দেখতে পাচ্ছি যে, যে সমস্ত জাতির তেমন

কোন মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত ইতিহাস নেই, তারাও ইতিহাসের নামে কল্পকাহিনী রচনায় ব্যস্ত রয়েছে এবং সেসব স্বকপোলকল্পিত কাহিনীকে ইতিহাসের জামা পরিয়ে তাদের নতুন প্রজন্মকে উপহার দিচ্ছে যেন তারা এগুলোকে সত্য বলে বিশ্বাস করে। মিথ্যার এ বেসাতির আশ্রয় নিতে এ সব জাতি এজন্যে বাধ্য হচ্ছে যে, জাতিসমূহের প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ময়দানে এরূপ একটা প্রতীতি সৃষ্টি ব্যতিরেকে তাদের লোকজনকে সক্রিয় ও কর্মোদ্দীপ্ত করে তোলার বিকল্প কোন ব্যবস্থা নেই। আর এ জন্যে যে জাতি অপর কোন জাতিকে তাদের শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে তারা ঐ জাতির লোকজনকে তাদের গৌরবময় ইতিহাসকে বিস্মৃত বা বিকৃত করে তাদের গৌরবময় ইতিহাস সম্পর্কে তাদেরকে অজ্ঞ রাখার অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকে।

মুসলমানদের গৌরবোজ্জ্বল কীর্তি

পৃথিবীর জাতিসমূহের মধ্যে মুসলমানই একমাত্র জাতি যার রয়েছে সর্বাধিক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস-ঐতিহ্য। জাতি তাদের মহৎ ব্যক্তিদের কীর্তিসমূহ সম্পর্কে এমনি নিশ্চিতভাবে জানতে পারে যা সকল প্রকার সংশয় ও সন্দেহ থেকে মুক্ত। মুসলমানদের হোমারের এলিয়ড অথবা হিন্দুদের রামায়ণ, মহাভারতের কল্পকাহিনীর প্রয়োজন নেই। কেননা এসব কল্পকাহিনীর চাইতে অনেক বেশী বিস্ময়কর ও গৌরবোজ্জ্বল কাহিনীর বাস্তব উদাহরণ তাদের ইতিহাসের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে, অথচ ঐ সব কল্পকাহিনীর মিথ্যাচারিতা ও অবিশ্বস্ততার ছোঁয়াও তাতে লাগেনি। মুসলমানদের ফেরদৌসীর শাহ্নামা অথবা স্পার্টাবাসীদের কল্পকাহিনীরও কোনই প্রয়োজন নেই। কেননা, তাদের ইতিহাসের পাতায় পাতায় রয়েছে রুস্তম ও স্পার্টার ছড়াছড়ি। মুসলমানদের ন্যায়পরায়ণ নওশেরওয়া বাদশাহ্ বা হাতেম তাঈর গল্পেরও কোনই প্রয়োজন নেই। কেননা, তাদের সত্য ইতিহাসের পাতায় পাতায় অসংখ্য হাতেম ও নওশেরওয়া বিদ্যমান। মুসলমানদের এরিস্টটল, বেকন, টলেমী বা নিউটনেরও কোনই প্রয়োজন নেই। কেননা, তাদের পূর্বপুরুষদের মজলিসে এমন সব দার্শনিক ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী বিদ্যমান রয়েছেন–যাঁদের পাদুকাবহনকেও উল্লিখিত যশস্বী লোকেরা গৌরবান্বিত বোধ করবেন।

কতই আক্ষেপ ও বিস্ময়ের ব্যাপার, আজ যখন বিশ্বের তাবৎ জাতি নিজেদেরকে বিশ্বদরবারে সমুন্নত করার প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত, তখনও সর্বাধিক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস-ঐতিহ্যের অধিকারী মুসলমানগণ নিজেদের ইতিহাস সম্পর্কে উদাসীন ও নির্বিকার। মুসলমানদের যে শ্রেণীটাকে অনেকটা শিক্ষিত ও সচেতন মনে করা হয়, তারাও তাদের বক্তৃতা-বিবৃতি ও প্রবন্ধাদিতে কোন মহৎ ঘটনার উদারহণ দিতে চান তখন মনের অজান্তেই তাঁদের মুখ ও কলম দিয়েও কোন ইউরোপীয়ান বা খ্রিস্টান মনীষীর নামই নির্দ্বিধায় বেরিয়ে আসে। এক্ষেত্রে তার চাইতেও হাজার গুণ উল্লেখযোগ্য কোন মুসলিম মনীষীর নাম তাঁর জানা থাকে না। এ সত্যকে কে অস্বীকার করতে পারে যে, মুসলমানদের শিক্ষিত শ্রেণী বিশেষত নব্য শিক্ষিত শ্রেণীর মুসলমানদের বক্তৃতা-বিবৃতি বা রচনাদিতে নেপোলিয়ান, হ্যানিবল, শেক্সপিয়ার, বেকন, নিউটন প্রমুখ ইউরোপীয় মনীষীর নাম যত নিতে দেখি, খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ, সালাহউদ্দীন আইয়ূবী, হাসসান ইব্ন ছাবিত, ফেরদৌসী, তূসী, ইব্ন রুশদ, বূ-আলী, ইব্ন সীনা প্রমুখ মুসলিম মনীষীর নাম ততো নিতে দেখা যায় না। এর একটি মাত্র কারণ আর তা হচ্ছে বর্তমান যুগে মুসলমানরা তাদের নিজ ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ ও নির্বিকার। মুসলমানদের এই অজ্ঞতা ও উদাসীনতার কারণ হচ্ছে প্রথমত এমনিতেই অন্যান্য জাতির তুলনায় মুসলমানদের জ্ঞানস্পৃহা

কম। দ্বিতীয়ত, জ্ঞানান্বেষণের সুযোগ ও অবকাশও তাদের নেই। তৃতীয়ত, সরকারী কলেজ ও মাদরাসাগুলো ইসলামী শিক্ষায়তনগুলোকে ভারতবর্ষে প্রায় অস্তিত্বহীন করে দিয়েছে। চতুর্থত মুসলমানদের যে শ্রেণীটিকে সাধারণত শিক্ষিত বলা হয়ে থাকে এবং মুসলমানদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় বলে গণ্য করা হয় তাঁদের প্রায় সকলেই শিক্ষায়তনসমূহে লেখাপড়া করে এসেছেন—যেগুলোতে ইসলামের ইতিহাস পাঠ্যভুক্ত নয়, আর তা পাঠ্যভুক্ত থাকলেও ইসলামের ইতিহাস পদবাচ্য নয়-অন্য কিছু, অথচ তাকে ইসলামের ইতিহাস বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। কলেজ থেকে ডিপ্লোমা হাসিল করার পর না জ্ঞানার্জনের বয়স বাকী থাকে আর না তার তেমন কোন অবকাশ বা সুযোগ থাকে। মোটকথা আমাদের শিক্ষিত মুসলমানদেরকে সেই ইসলামের ইতিহাসের উপরই নির্ভর করতে হয় যা ইসলামের প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রুরা বিকৃত করে তাদের ইংরেজী পুস্তকাদিতে লিখেছে।

মুসলমানদের পূর্বে পৃথিবীর অন্য কোন জাতির এ সৌভাগ্য হয়নি যে, ইতিহাসকে একটা সঠিক ভিত্তির উপর রীতিমত একটা শাস্ত্ররূপে দাঁড় করাবে। তাঁদের কেউই তাদের পূর্বপুরুষদের সঠিক ইতিহাস রচনায় সমর্থ হননি। ইসলামের পূর্বে ইতিহাস রচনার মান যে কেমন ছিল বাইবেলের পৃষ্ঠাসমূহ বা রামায়ণ মহাভারতের কাহিনীগুলো পাঠই তা উপলব্ধি করার জন্যে যথেষ্ট। মুসলমানরা মহানবী (সা)-এর হাদীস সংরক্ষণ ও বর্ণনায় যে কঠোর সতর্কতা ও নিয়মানুবর্তিতার স্বাক্ষর রেখেছেন পৃথিবীর ইতিহাসে তার কোন নযীর নেই। 'উসূলে হাদীস' ও 'আসমাউর রিজালের' মত শাস্ত্রগুলো কেবল হাদীসে নববীর হিফাযত ও খিদমতের উদ্দেশ্যে তাঁরা উদ্ভাবন করেছেন। রিওয়ায়াত বা বর্ণনাসমূহের বাছ-বিচার ও যাচাই-বাছাইয়ের জন্য যে সুদৃঢ় নীতিমালা তাঁরা উদ্ভাবন করছেন পৃথিবী তার সুদীর্ঘ আয়ুষ্কালে কোন দিন তা প্রত্যক্ষ করেনি।

মুসলমানদের ইতিহাস সংক্রান্ত সর্বপ্রথম কীর্তি হচ্ছে ইল্‌ম হাদীসের বিন্যাস ও সংকলন। ঠিক সেই নীতিমালার ভিত্তিতেই তাঁরা তাঁদের খলীফাগণ, আমীর-উমরা ও সুলতানগণ, বিদ্বজ্জন ও মনীষিগণের জীবন-চরিত লিপিবদ্ধ করেছেন। এসবের সমাহার হচ্ছে ইসলামের ইতিহাস। মুসলমানদের ইতিহাস হয় না পৃথিবীর জন্যে এক অভাবিত, অভূতপূর্ব অথচ অপরিহার্য উপাদান। অন্যান্য জাতি যেখানে তাদের বাইবেল ও মহাভারত প্রভৃতিকেই তাদের গৌরবজনক 'ঐতিহাসিক' সম্পদ বলে বিবেচনা করতে অভ্যস্ত ছিল, তখন বিশ্বের মানুষ সবিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করল যে, মুসলমানরা খতীবের 'তারীখ' বা ইতিহাস গ্রন্থকে তাদের নির্ভরযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থের আলমারী থেকে বের করে সরিয়ে রাখছে। আজ ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদেরকে ইতিহাস শাস্ত্রের অনেক খুঁটিনাটি তত্ত্ব নিয়ে নাড়াচাড়া করতে দেখা যায়। মুসলমানরা তা দেখে অনেকটা হকচকিয়ে যান এবং পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে তাদের স্বীকৃতি দিয়ে থাকেন। কিন্তু তাদের একথাটিও জানা নেই যে, উত্তর আফ্রিকায় বসবাসকারী জনৈক স্পেনীয় আরব বংশোদ্ভূত মুসলমান ঐতিহাসিক ইব্‌ন খালদূনের ইতিহাসের ভূমিকা 'মুকাদ্দামায়ে তারীখ'-এর উচ্ছিষ্ট ভোগই গোটা ইউরোপ তথা গোটা বিশ্বকে ইতিহাস শাস্ত্র সম্পর্কে এমনি জ্ঞানদান করেছে যে, ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের সমস্ত ঐতিহাসিক গবেষণাকর্মকে ইব্‌ন খালদূনের মাজারের ঝাড়ুদারকে অর্ঘ-স্বরূপ বিনীতভাবে পেশ করা চলে। কিন্তু মুসলিম ঐতিহাসিকদের ইতিহাসকর্ম যে কত উঁচুমানের ছিল তা' এ থেকেই অনুমিত হয় যে, মুসলিম বিজ্ঞজনের মজলিসে ইব্‌ন

খালদূনের অনন্যসাধারণ 'মুকাদ্দামা' বাদ দিলে তাঁর আসল ইতিহাসের তেমন কোন মূল্য নির্বিবাদে স্বীকৃত হয়নি।

ইব্‌ন হিশাম, ইবনুল আছীর, তাবারী, মাসউদী প্রমুখ থেকে নিয়ে আহ্‌মদ ইব্‌ন খাওন্দশাহ এবং যিয়াউদ্দীন বারনী পর্যন্ত বরং মুহাম্মদ কাসিম ফিরিশ্‌তা এবং মোল্লা বদায়ূনী পর্যন্ত হাজার হাজার মুসলিম ঐতিহাসিকের বিপুল গবেষণা কর্ম যে বিশালায়তন ভলিউমসমূহে সংরক্ষিত রয়েছে, এদের প্রত্যেকটি মুসলমানদের বিস্ময়কর অতীত ইতিহাসের এক একটি খণ্ডচিত্র এবং এদের প্রত্যেকের লিখিত ইসলামের ইতিহাস এমনি উল্লেখযোগ্য যে, মুসলমানরা তা' অধ্যয়ন করে অনেক শিক্ষণীয় বিষয়ের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারে। কিন্তু অত্যন্ত আক্ষেপ ও পরিতাপের বিষয় যে, আজ শতকরা একজন মুসলমানও নিজেদের জাতীয় ইতিহাস জানার জন্যে ঐসব মনীষীর রচনাবলী পাঠের এবং তার মর্ম উপলব্ধি করার সামর্থ্য রাখে না। অথচ সেই তুলনায় মিল, কার্লাইল, ইলিয়ট, গিবন প্রমুখের লিখিত ইতিহাস পাঠ করার এবং তার মর্ম উপলব্ধি করার মত যোগ্য মুসলমানের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়।

ইসলামের ইতিহাসের গ্রন্থসমূহ যেহেতু আরবী ও ফার্সীতে রচিত আর ভারতবর্ষের শতকরা একজন মুসলমানও আরবী-ফার্সীতে ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন নয় বলে সেসব গ্রন্থ দ্বারা উপকৃত হতে পারে না। তাই মুসলমানদেরকে তাদের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে হলে জনসাধারণের ভাষায় ইসলামের ইতিহাস লিখতে হবে। ইতিপূর্বে এ অভাবটির কথা অনেক পূর্বেই অনুভূত হয়েছে এবং অনেকে উর্দু ভাষায় ইসলামের ইতিহাস লিখেছেনও, কিন্তু আজ পর্যন্ত উর্দু ভাষায় এমন একখানি ব্যাপক অথচ সংক্ষিপ্ত পুস্তক এ বিষয়ে লিখিত হয়নি যাতে স্বল্প অবসরের অপেক্ষাকৃত স্বল্প আগ্রহী লোকেরাও ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য ও তত্ত্বাদি জেনে নিতে পারে।

যদি এ জাতীয় আরো দু'চারটি বই লিখিতও হতো তবুও ইসলামের ইতিহাস এমনি একটি প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যে, আরো লেখকদের তাতে নিজ নিজ যোগ্যতা ও প্রতিভা অনুসারে লেখার অবকাশ রয়েই যেতো। এখন আমি আমার দীনহীন প্রচেষ্টা নিয়োগ করে এ পুস্তকখানি পাঠক সমীপে উপস্থাপিত করছি। অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন ও প্রশস্ত হৃদয় লোকদের জন্যে এ বিষয়ে যোগ্যতর রচনাকর্ম পেশের সুযোগ রইলো। আমার ধারণা, মাতৃভাষায় যত অধিক ইসলামের ইতিহাস রচিত হবে মুসলমানরা ততই এ দিকে আকৃষ্ট হবেন।

ইসলামের ইতিহাসের তাৎপর্য

ইসলামের ইতিহাস আসলে একটি স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বিদ্যা বা বিজ্ঞান। এ বিষয়ে হাজার হাজার যোগ্য ঐতিহাসিকের রচিত রচনাবলী মওজুদ রয়েছে। সাধারণত মুসলিম ঐতিহাসিকগণ নিজেদের সমসাময়িক সুলতানগণ অথবা কোন একটি রাষ্ট্র, জাতি, রাজবংশ বা একজন সুলতানের অথবা কোন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার ইতিহাস ভিন্ন ভিন্নভাবে রচনা করেছেন। কোন কোন ঐতিহাসিক কেবল উলামায়ে ইসলামের, কেউ মুসলিম দার্শনিকদের, আবার কেউ কেউ মুসলিম সূফী-দরবেশদের জীবনীগ্রন্থ রচনা করেছেন। মোদ্দাকথা, এ জাতীয় হাজার হাজার গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এ বিশাল ভাণ্ডার নিয়েই গড়ে উঠেছে ইসলামের ইতিহাস তথা ইসলামের ইতিহাস বিজ্ঞান। যুগ পরিক্রমার সাথে সাথে এ ভাণ্ডার স্ফীত থেকে স্ফীততর

হয়ে চলেছে। ইসলামী সালতানাত ও ইসলামী রাষ্ট্রের সংখ্যাও এতই অধিক যে, যদি এক-একটি ইসলামী সালতানাতের ইতিহাস স্বতন্ত্র সংক্ষিপ্ত সংকলনাকারে রচিত হয় তবে সে নির্বাচিত সংকলনগুলোর জন্যেও দু'চারটি আলমারী নয়। পাঠাগারের বেশ কয়েকটি কক্ষেরই প্রয়োজন হবে। একটি মধ্যম অবয়বের ইসলামের ইতিহাস রচনার অর্থ হচ্ছে ঐ সবের সারমর্ম অতি সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপন করা। কোন বড় দৃশ্যের ফটো একই কাঠে উঠিয়ে নেয়া অথবা একটা বিরাট প্রাসাদের চিত্র কোন তসবীহ দানার ছিদ্রে পুরে দেয়া একটি অপেক্ষাকৃত সহজ কাজ, কিন্তু একটি দু' হাজার পৃষ্ঠায় বইয়ে গোটা ইসলামের ইতিহাস পুরে দেয়া নিঃসন্দেহে একটি সুকঠিন কাজ। এজন্যে আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারছি না যে, এ কাজে আমি কতটুকু সফল হয়েছি। একমাত্র পাঠকগণ এ ব্যাপারে ফয়সালা করতে পারবেন যে আমার এ পুস্তকটির মান কি এবং মুসলমানদের জন্যে কতটুকু উপাদেয় হয়েছে।

ঘটনাবলীর ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে আমি সংশ্লিষ্ট ঘটনার এবং সমসাময়িক যুগের সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিকদের লিখিত গ্রন্থাদি পাঠ করে সে ঘটনা সম্পর্কে একটি ধারণায় উপনীত হতে চেষ্টা করেছি। আমার সেই বদ্ধমূল ধারণাকেই পরে নিজ ভাষায় যথাসম্ভব সংক্ষেপে উপস্থাপিত করেছি। যে ব্যাপারে ঐতিহাসিকগণের মতবিরোধ রয়েছে এবং কোন একজনের মতকে প্রাধান্য দেয়া সুকঠিন মনে হয়েছে সেখানে প্রত্যেক ঐতিহাসিকের বক্তব্য হুবহু অনুবাদ করে দিয়ে তার বরাত উদ্ধৃত করেছি এবং এ ব্যাপারে নিজের সিদ্ধান্তও নির্দ্বিধায় উল্লেখ করেছি এবং এ ঘটনার ফল কী দাঁড়িয়েছে তাও ব্যক্ত করেছি। যেহেতু বইটি উর্দু ভাষায় রচিত, তাই উর্দুভাষী হিন্দুস্থানী মুসলমানরাই এ দ্বারা সাময়িক উপকৃত হবেন। এজন্যে আমি ঐসব ইসলামী রাষ্ট্র এবং মুসলিম শাসকদের ব্যাপারে একটু আলোচনা করেছি—যাদের সাথে ভারত এবং ভারতীয় মুসলমানদের অধিকতর সম্বন্ধ রয়েছে অথবা যাদের সম্পর্কে ভারতবাসী অধিকতর জ্ঞাত। এতদসত্ত্বেও যেসব ইসলামী রাষ্ট্র অথবা মুসলিম রাজবংশ সম্পর্কে ভারতবাসী তেমন জ্ঞাত নন বা স্বল্প জ্ঞাত তাদের সম্পর্কে আলোকপাত করতে এবং ইসলামের ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ নকশা তুলে ধরার ব্যাপারে মোটেই কার্পণ্য বা অবহেলা করিনি। সাহাবায়ে কিরাম (রা) এবং পরবর্তী যুগে এমন সব মনীষী সম্পর্কে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে—যাঁরা কোন না কোন ইসলামী সম্প্রদায় কিংবা গোষ্ঠির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন।

মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট করে এমন ধরনের বিবরণ পরিহার করা হয়েছে। তাই বলে সঠিক ইতিহাস রচনায় বা ঐতিহাসিক হিসাবে আমার দায়িত্ব পালনেই ত্রুটি হয়ে যায় তেমন সতর্কতার আশ্রয় আমি নেই নি। আমি ইবাদত ও ইসলামী খিদমত মনে করেই এ ইতিহাসটি প্রণয়ন করেছি এবং এ জন্যে আল্লাহ্র কাছে এর পুরস্কারেরও আশা রাখি।

আমি আমার জ্ঞানগত দীনতার কথা স্বীকার করে নিয়েই বলছি, পদে পদে হোঁচট খাওয়াটাই স্বাভাবিক এবং ভুলত্রুটি থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত থাকা এটি অত্যাশ্চর্য ব্যাপার বলে গণ্য হতে পারে। যারা ভুলত্রুটি নিরসনের উদ্দেশ্যে এর সমালোচনা করবেন, আমি তাঁদেরকে উপকারী বন্ধু বলেই মনে করব। আর যারা বিদ্বেষবশত ছিদ্রান্বেষণে লিপ্ত হবেন তাদেরকে আল্লাহ্র হাতে সমর্পণ করছি।

আকবর শাহ্ খান নজীবাবাদী
১লা মুহাররম, ১৩৪৩ হিজরি

ভূমিকা

ইতিহাস

আরবী, উর্দু, ফার্সী ভাষায় 'তারীখ' বাংলাতে 'ইতিহাস'-এর পরিভাষাগত অর্থ হচ্ছে ঐ বিদ্যা যার মাধ্যমে রাজা-বাদশাহ, নবী-রাসূল, বিজেতা ও বিখ্যাত মনীষিগণের জীবনকাহিনী এবং অতীত যুগের বড় বড় ঘটনা ও রীতিনীতি সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায় এবং যা বিগত যুগসমূহের সামাজিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থাদি সম্পর্কে জ্ঞান লাভের মাধ্যম হয়ে থাকে। কেউ কেউ 'ইতিহাস'-এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে :

মানুষের একত্রে বসবাসকে 'তামাদ্দুন' (সংস্কৃতি) এবং সেই সমাজবদ্ধ জনপদকে 'মদীনা' (নগর) বলে। এদের উপর দিয়ে স্বভাবসিদ্ধভাবে অবস্থাদি অতিক্রান্ত হয় তাকে 'তারীখী ওয়াকিয়াত' (ঐতিহাসিক ঘটনাবলী) এবং পরবর্তীদের পূর্ববর্তীদের মুখ থেকে শুনে শুনে সে ঘটনাবলীকে সঙ্কলিত করা এবং শিক্ষণীয় উপদেশ স্বরূপ তা পরবর্তীদের জন্যে রেখে যাওয়াকে 'তারীখ' বা ইতিহাস বলে। কেউ কেউ বলেন, আসলে আরবী 'তাখীর' (تاخير) শব্দটিকে উল্টিয়ে 'তারীখ' (تاريخ) শব্দটি বানানো হয়েছে। তাখীর অর্থ পরবর্তীতে নিয়ে আসা, পূর্ববর্তী যুগকে পরবর্তী যুগের দিকে সম্পর্কিত করা। যেমন বলা হয়, অমুক ধর্ম বা অমুক সাম্রাজ্য বা অমুক যুদ্ধের উদ্ভব অমুক সময় হয়েছিল। যে বিশেষ ঘটনাবলী সে যুগটাতে ঘটেছিল, সে সবের শুরু বা সূচনাই হচ্ছে সে সময়টি। মোদ্দাকথা, তারীখ বা ইতিহাসের সংজ্ঞা সম্পর্কে এরূপ অনেক বিশেষণ রয়েছে। তার সবকটির সারমর্ম হচ্ছে প্রথমোক্ত সংজ্ঞাটি। আরো সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয়, যে সকল অবস্থা ও ঘটনাবলী কাল নির্দেশ করে লিখিত হয়, তাকেই ইতিহাস বলা হয়ে থাকে।

ইতিহাসের প্রয়োজন এবং এর উপকারিতা

ইতিহাস আমাদেরকে পূর্ববর্তী মহাপুরুষদের কাহিনীসমূহ সম্পর্কে অবহিত করে আমাদের মন-মস্তিষ্কে একটি শুভ উদ্দীপনার সঞ্চার করে। মানুষের প্রকৃতিতে একটা বিশেষ ধরনের পিপাসা এবং স্পৃহা থাকে যা অজানা দেশে ভ্রমণের, বাগবাগিচা ও পুষ্পোদ্যান বিচরণে এবং দুর্গম গিরি-পর্বত ও মরুপ্রান্তরে পরিভ্রমণে উদ্দীপ্ত করে। এই সহজাত প্রবৃত্তিই শিশুদেরকে রাতের বেলা পাখ-পাখালীর গল্প শোনায়, যুবকদেরকে তোতা-ময়নার উপাখ্যান শোনার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে :

فَسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ .

তোমরা যদি না জান তবে জ্ঞানীদিগকে জিজ্ঞাসা কর। (২১ : ৭)

আল্লাহ্র এই সুস্পষ্ট হুকুম তামীল করার মধ্যেই ঐতিহাসিক গ্রন্থাদি পাঠে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। মানুষের এই সহজাত প্রবৃত্তির দিকে লক্ষ্য রেখেই প্রবৃত্তিসমূহের স্রষ্টা আসমানী কিতাবসমূহে

মধুময় আস্বাদন রেখে দিয়েছেন। বনী ইসরাঈলের জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের কথা সর্বজনবিদিত। এমনকি তারা নিজেদেরকে نحن ابناء الله واحبائه (আমরা আল্লাহ্‌র পুত্র এবং তার প্রিয়জন, নাউযুবিল্লাহ্) বলে অভিহিত করতো। কিন্তু এমন একটি জাতিই যখন নিজেদের পূর্বপুরুষদের কথা বিস্মৃত হয়ে গেলো তখন তারাও দিন দিন অধঃপতনের দিকে তলিয়ে যেতে লাগলো। এজন্যেই আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বারবার এই বলে সম্বোধন করেছেন :

يَا بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ اذْكُرُوْا .

"হে বনী ইসরাঈল! স্মরণ কর" ... পূর্বপুরুষদের কথা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

ইতিহাস পাঠের উপকারিতা

ইতিহাস পাঠে পাঠকের সাহস ও আত্মপ্রত্যয় বৃদ্ধি পায়। সৎকর্মের উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায় এবং পাপাচারের প্রবণতা হ্রাস পায়। ইতিহাস পাঠে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা বৃদ্ধি পায়। বহুদর্শিতা, সৎসাহস ও সতর্কতার অভ্যাস সৃষ্টি হয়। অন্তর থেকে দুশ্চিন্তা ও চিন্তাক্লিষ্টতা দূরীভূত হয় এবং নব-উদ্যম ও উৎসাহের সঞ্চার হয়। ঐতিহাসিক গ্রন্থাদি পাঠে সত্যান্বেষণের এবং সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার মত অন্তর্দৃষ্টি ও মনোবল সৃষ্টি হয় এবং মানুষের সিদ্ধান্ত গ্রহণের শক্তি বৃদ্ধি পায়। ঐতিহাসিক গ্রন্থাদি পাঠে ধৈর্যস্থৈর্য বৃদ্ধি পায় এবং মনমগজ সর্বদা সতেজ ও প্রফুল্ল থাকে। মোদ্দাকথা, ইতিহাস শাস্ত্র হচ্ছে হাজার হাজার ধর্মোপদেশ বিতরণকারীর মধ্যে অন্যতম এবং শিক্ষা গ্রহণের সর্বোত্তম মাধ্যম। ঐতিহাসিক গ্রন্থাদি পাঠে পাঠক সর্বদা নিজেকে রাজা-বাদশাহ, দিগ্বিজয়ী নবী-রাসূল, ওলী-আউলিয়া, জ্ঞানীগুণী, দার্শনিক, পণ্ডিত ও কৃতী মনীষীদের দরবারে উপবিষ্ট দেখতে পায় এবং এসব মনীষীদের নিকট থেকে সে অহরহ জ্ঞানার্জন করতে থাকে। বড় বড় রাজা-বাদশাহ, উযীর-উজারা ও সেনাপতিদের দ্বারা সংঘটিত ভুলত্রুটিসমূহের কথা অবগত হয়ে সে নিজেকে এ সব ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে মুক্ত রাখতে সচেষ্ট হয়। অন্য কোন বিদ্যা পাঠ মানুষ এত সানন্দে ও অবসন্নতামুক্ত হৃদয়ে অব্যাহত রাখতে পারে না, যতটুকু পারে ইতিহাস পাঠে।

ইতিহাসের মাধ্যমে সামরিক বৈশিষ্ট্যাদি সংরক্ষণ

যে জাতি নিজের ইতিহাস ও ঐতিহ্য এবং অতীতের গৌরবজনক অধ্যায়গুলো সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখে, তাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যাদিও অক্ষুণ্ন থাকে। সে জাতির কোন ব্যক্তি অন্য জাতির মুকাবিলায় কোন ক্ষেত্রেই সাহসহারা বা হৃতবল হয়ে পিছপা হয় না বরং আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে জাতির হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হয় এবং তাতে তারা সাফল্যও অর্জন করে। যে ব্যক্তি তার বাপ-দাদার অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত নয়, সে সুযোগ হাতে পেলেই খিয়ানতের আশ্রয় নিতে পারে। কিন্তু যার তা জানা আছে যে, অনেক সুযোগ হাতের মুঠোয় পেয়েও আমার বাপ-দাদা লাখ লাখ টাকার লোভ সম্বরণ করে পূর্ণ বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়ে সম্মান অর্জন করে গেছেন, তার পক্ষে খিয়ানত বা বিশ্বাসভঙ্গ করা দুষ্কর। অনুরূপভাবে বাপ-দাদার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তি সমরক্ষেত্র থেকে পালিয়ে বাঁচাকে পসন্দ করবে। কিন্তু যার একথা জানা থাকবে যে, আমার বাপ-দাদারা অমুক অমুক যুদ্ধক্ষেত্রে অটলভাবে অবস্থান করে সম্মান অর্জন করেছিলেন, সে কখনো সমরক্ষেত্র থেকে পালিয়ে প্রাণ রক্ষার চিন্তা করতে পারবে না বরং বাপ-দাদার স্মৃতি তখন তার পায়ের জিঞ্জির হয়ে দাঁড়াবে। অনুরূপভাবে

বিশ্বস্ততা, সত্য ভাষণ, সচ্চরিত্রতা, লজ্জাশীলতা, দানশীলতা প্রভৃতির ব্যাপারেও পূর্বপুরুষের ইতিহাস সম্পর্কে অবগতিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এ অবগতি বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করে থাকে। সম্ভবত একথা চিন্তা করেই আমাদের প্রতিবেশী বিভিন্ন জাতি তাদের নিজস্ব কোন গৌরবজনক ইতিহাস না থাকলেও মনগড়া রূপকথা ও মিথ্যা কাহিনীসমূহকে ইতিহাসের রূপ দিয়ে কার্যোদ্ধারের প্রয়াস পেয়ে থাকেন। তাঁরা একটু পরোয়া করেন না বা ভেবেও দেখেন না যে, এ মিথ্যাচারের মাধ্যমে সত্য কথনে আদালতের কাঠগড়ায় বা ঐতিহাসিকদের দরবারে তারা কত খাটো ও হাস্যাস্পদ প্রতিপন্ন হবেন।

ইতিহাস ও বংশ কৌলীন্য

ইতিহাসে যেহেতু সৎলোকদের সততার কথা এবং অসৎলোকদের অনাচারের কথা লেখা হয়, তাই কোন নীচ বংশজাত লোকদের কাছে ইতিহাস খুব একটা প্রিয়বস্তু হতে পারে না। পক্ষান্তরে সম্ভ্রান্ত লোকেরা তাদের পিতৃপুরুষের গৌরবজনক কীর্তিগুলোকে স্মরণ করে থাকে এবং নিজেদের কৌলিন্য বজার রাখার জন্যে তারা এগুলো অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। ইতর জাতির কাল-পরিক্রমায় নিজেদের পূর্বপুরুষদের গৌরবজনক কীর্তিগুলোও বিস্মৃত হয়ে যায়। যে জাতি বা সম্প্রদায়ের লোকদের পিতৃপুরুষরা ধর্মপরায়ণতা, শৌর্যবীর্য, জ্ঞান-গরিমা এবং প্রভাব-প্রতিপত্তিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন তাদের অধঃস্তন পুরুষরা তা কখনো বিস্মৃত হতে পারে না। তাদের পূর্বপুরুষদের এসব গৌরবজনক কীর্তির কথা বারবার স্মরণ করিয়ে করিয়ে তাদের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তোলা যেতে পারে। কিন্তু ইতর সম্প্রদায়ের মধ্যে তা হবার জো নেই। এজন্যেই ইতিহাসের রসবোধ সাধারণত কুলীন সম্ভ্রান্ত বংশজাত লোকদের মধ্যেই পরিদৃষ্ট হয়। কোন নীচ বংশজাত লোক, নাস্তিক অথবা কাপুরুষতার জন্য কুখ্যাত ব্যক্তি এ যাবত প্রথম শ্রেণীর ঐতিহাসিক বা ঐতিহাসিকদের নেতা হতে পারেনি।

ইতিহাসবেত্তা

একজন যথার্থ ধার্মিক এবং সঠিক চিন্তাধারার লোকই একজন সত্যিকারের ইতিহাসবেত্তা হতে পারেন। তিনি শুধু তা-ই লিখবেন যা' সত্যি সত্যি ঘটেছে। তিনি কোন কিছু গোপনও করবেন না বা নিজের পক্ষ থেকে কিছু বাড়িয়েও লিখবেন না। যেসব ক্ষেত্রে স্বল্পবুদ্ধির লোকদের হোঁচট খাওয়ার আশংকা থাকে বা ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয় সেসব ক্ষেত্রে তিনি তার নিজের পক্ষ থেকে এর একটা ব্যাখ্যা অবশ্যই দেবেন বরং এটা ঐতিহাসিকের একটা দায়িত্বও বটে। ইতিহাসবেত্তা কারো অহেতুক তোষামোদও করবে না। আবার বিদ্বেষবশত কারো বিরুদ্ধেও তিনি কিছু লিখবেন না। ইতিহাসবেত্তার ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি হবে একান্তই সাদাসিধে, অনাড়ম্বর, সহজবোধ্য ও স্বতঃস্ফূর্ত। ছান্দসিক ভাষা প্রয়োগ ও ভাষার অলংকরণের প্রচেষ্টার মধ্যে অনেক সময় ইতিহাসের আসল বক্তব্যই হারিয়ে যায়। আর এজন্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে ছন্দোবদ্ধ ভাষায় বিরচিত ইতিহাসগুলো নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত বলে প্রতিপন্ন হয়নি। ইতিহাসবেত্তার জন্যে বিশ্বস্ততা হচ্ছে অপরিহার্য গুণ। সত্য ভাষণ ও সদাচারে তাকে অবশ্যই অন্য দশজনের তুলনায় অনন্য হতে হবে। মিথ্যাচার ও বাচালতা থেকে তাকে অবশ্যই মুক্ত থাকতে হবে। ইতিহাসের বিন্যাসে একজন ঐতিহাসিককে প্রাণান্তকর পরিশ্রম করতে হয়। তারপরও সঠিক তত্ত্ব হস্তগত হয়েছে তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।

জ্যোতির্বিদ্যা, ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্তর সংক্রান্ত বিদ্যা, সমাজবিদ্যা এবং পৃথিবীর নানা ধর্ম সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি অর্জন ছাড়াও ইতিহাসবেত্তাকে অত্যন্ত তীক্ষ্ণধী ও ন্যায়নিষ্ঠ এবং যুগপৎভাবে কথাশিল্পীও হতে হয় যাতে আপন বক্তব্য তিনি অনায়াসে গুছিয়ে যথাযথভাবে উপস্থাপন করতে পারেন। এতসব সত্ত্বেও এমন কিছু সমস্যা রয়েই যায় যেগুলোর সমাধান প্রায় অসম্ভব মনে হয়। উদাহরণস্বরূপ ধরুন, কোন ব্যক্তির থিয়েটারে যাওয়ার কথা একজন রাবী বা বর্ণনাকারী রিওয়ায়াত করলেন। এ রিওয়ায়াতটির দ্বারা বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, অথচ নিশ্চিতভাবে বলা মুশকিল যে এগুলোর কোন একটিও যথার্থ বা অযথার্থ। হতে পারে :

১. যে লোকটি থিয়েটারে গিয়েছিল, সে গানের বড় অনুরাগী।
২. গানের অনুরাগী ঠিক সে নয়, তবে সৌন্দর্য অনুরাগী।
৩. আসলে সে সৌন্দর্য অনুরাগীও নয়, ঘটনাচক্রে জনৈকা অভিনেত্রীর প্রেমে পড়ে গিয়েছে।
৪. আসলে কারো প্রেমিক সে হয়নি, কোন এক বন্ধুর সাথে সাক্ষাতের মানসেই সে থিয়েটারে গিয়েছিল।
৫. থিয়েটার সম্পর্কে একটা প্রবন্ধ রচনার প্রয়োজন ছিল বিধায় সে থিয়েটার দেখতে গিয়েছিল।
৬. থিয়েটারের বিরুদ্ধে কোথাও লোকটির একটি বক্তৃতা করার কথা ছিল, তাই স্বচক্ষে তার ত্রুটিপূর্ণ দিকগুলো অবলোকন করার জন্যেই গিয়েছিল।
৭. লোকটির চাকরি ছিল গোয়েন্দা পুলিশের। অফিসিয়াল দায়িত্ব পালনের জন্যেই সে সেখানে গিয়েছিল।
৮. আসলে সে নিজে থিয়েটার দেখা পছন্দ করে না, বন্ধু-বান্ধবের চাপে পড়েই গিয়েছিল।
৯. লোকটি আসলে একজন ধার্মিক আল্লাহ্ওয়ালা লোক ছিল। লোকজনের ভক্তি বিশ্বাসের দৃষ্টি থেকে নিজেকে রক্ষার জন্যেই সে এমনটি করেছে।
১০. কেবল পকেটমারার সুবিধার জন্যেই সে থিয়েটারে গিয়েছিল।

মোটকথা, এরূপ একটি রিওয়ায়াত থেকে শত শত সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসতে পারে। তারপর একটি সিদ্ধান্তের যথার্থতা প্রমাণের জন্যে অন্যান্য উপাদান থেকে সাহায্য ও সমর্থন নিতে হয়। সে সহায়ক উপাদানের মধ্যেও আবার নানারূপ সংশয় সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়। ইতিহাস লেখক যদি নিরপেক্ষমনা না হন এবং পূর্ব থেকেই কোন এক নির্দিষ্ট পক্ষের প্রতি তার দুর্বলতা থেকে থাকে তাহলে তার বিরোধী সব দলীল-প্রমাণকে সে অত্যন্ত বেপরোয়াভাবে উপেক্ষা করে যাবে এবং তার স্বপক্ষের দলীল-প্রমাণ খুঁজে খুঁজে বের করতে থাকবে। এভাবে নিজেও বিভ্রান্ত হয়ে এবং অন্যদেরকেও বিভ্রান্ত করবে।

ইতিহাস পাঠক

ইতিহাস লেখা বা তার বিন্যাস যেমন একটা সুকঠিন কাজ তেমনি তা পাঠ করা বা তা থেকে যথার্থভাবে উপকৃত হওয়াও কোন সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। ইতিহাস পাঠকের উচিত অতীত ইতিহাসকে শিক্ষণীয় ব্যাপাররূপে গণ্য করা, অতীতকালের লোকদের অনাচার ও ভুলভ্রান্তির পরিণতি সম্পর্কে অবহিত হয়ে সেসব অনাচার ও ভুলভ্রান্তি থেকে নিজেকে মুক্ত

রাখবার সংকল্প অন্তরে পোষণ করা। সদাচারের সফল সম্পর্কে অবহিত হয়ে সেগুলো আত্মস্থ করার জন্যে যত্নবান হবে। দুনিয়ার এ রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিয়েছে এমন কোন ব্যক্তির নিন্দাবাদ করা কোন পুরুষোচিত কাজ নয়। বিগত দিনের কোন ব্যক্তির প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করা, তার জন্যে দু'আ করা বা তার ভুলভ্রান্তির একটা সদার্থ করার চেষ্টা-চরিত্র চালানো কোন দূষণীয় ব্যাপার নয়। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ, শহর-বন্দর, নগর, পাহাড়-পর্বত, মরুপ্রান্তর বিয়াবানের সফর করার সাথে ঐতিহাসিক গ্রন্থাদি পাঠের মধ্যে একটা বড় রকমের সামঞ্জস্য রয়েছে। তবে একটা পার্থক্য হলো একজন পর্যটক সারা জীবনের ভূ-পর্যটনের দ্বারা যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেন একজন ইতিহাস পাঠক ততোধিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা একদিনের বা এক সপ্তাহের অধ্যয়নের মাধ্যমে অর্জন করতে সক্ষম। ইতিহাস পাঠক যতবেশী পক্ষপাতদুষ্ট মনমানসিকতার শিকার হবে ইতিহাস থেকে তার উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা ততই কম।

ইতিহাসের উৎস

ইতিহাসের উৎসসমূহকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে :

১. লিপিবদ্ধ নিদর্শনাদি : যথা পুস্তকাদি, স্মারকলিপি, অফিসিয়াল কাগজপত্র, পরোয়ানাসমূহ, ফায়সালা বা রায়সমূহ, দস্তাবেজ, ফরমান প্রভৃতি।

২. শ্রুতি নির্ভর নিদর্শনাদি : যথা লোকশ্রুতি, লোক কাহিনী, কবিতা ও প্রবাদবাক্য প্রভৃতি।

৩. প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদি : প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদি বলতে প্রাচীন যুগের নিদর্শনাদি বোঝায়। যথা বিভিন্ন শহরের ধ্বংসাবশেষ, দুর্গসমূহ, ঘরবাড়ি, বিভিন্ন ইমারতের শিলালিপি, পাথরের ছবি ও মূর্তিসমূহ, প্রাচীন যুগের অস্ত্রশস্ত্র, মুদ্রা, পাত্র প্রভৃতি।

কিন্তু এ উপাদানত্রয় থেকে উপকৃত হওয়া এবং ইতিহাস বিন্যস্ত করা কোন সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। তীক্ষ্ণ প্রতিভা, কঠোর পরিশ্রম, উদ্যম ও অন্তর্দৃষ্টি ব্যতিরেকে এসব উপাদান একান্তই তুচ্ছ প্রতিপন্ন হয়। এছাড়া সংশ্লিষ্ট জাতিসমূহের বৈশিষ্ট্যমূলক আচার-আচরণ, প্রথা-পদ্ধতি, রূপ-রেখা ও ভৌগোলিক অবস্থাদিও ইতিহাসবেত্তার জন্যে সহায়ক প্রতিপন্ন হয়ে থাকে।

ইতিহাসের প্রকরণ

বিভিন্ন দিক থেকে বিবেচনা করলে ইতিহাস বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। যেমন পরিমাণ পরিমিতির দিক থেকে ইতিহাস দ্বিবিধ হতে পারে ঃ

(১) সাধারণ ইতিহাস ও (২) বিশেষ ইতিহাস। সাধারণ ইতিহাস হচ্ছে সেই ইতিহাস যাতে সমগ্র বিশ্বের সমগ্র মানুষের ইতিহাস বিধৃত হয় আর বিশেষ ইতিহাস হচ্ছে সেসব ইতিহাস যা কোন বিশেষ জাতি, রাষ্ট্র বা রাজবংশের ইতিহাস।

আবার অবস্থার দিক থেকেও ইতিহাস দু'রকমের হতে পারে ঃ

(১) বর্ণনা ভিত্তিক (২) বুদ্ধি ও অনুমান ভিত্তিক।

১. বর্ণনা ভিত্তিক ইতিহাস হচ্ছে ঐগুলো যাতে প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা লিপিবদ্ধ হয় এবং সংশ্লিষ্ট ঘটনা সংঘটিত হওয়ার নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য রিওয়ায়াত বা বর্ণনা ঐতিহাসিকের হস্তগত হয়েছে। অথবা ইতিহাসবেত্তা নিজে প্রত্যক্ষদর্শীরূপে সে ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন। এ

জাতীয় ইতিহাসই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ও উপাদেয় বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। এ জাতীয় ইতিহাসে আন্দাজ অনুমানের ঘোড়া দৌড়াবার বা নিছক আন্দাজ-অনুমানমূলক বাস্তব ইতিহাসের রূপ দেবার প্রয়াস চালানোর প্রয়োজন হয় না বরং এ জাতীয় ইতিহাস অনুধাবনের ব্যাপারে ভুলত্রুটি হয়ে গেলে তার নিরসনও হয়ে যায়।

২. বুদ্ধিভিত্তিক ইতিহাস হচ্ছে সেগুলো যা শুধু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদির শ্রুতিনির্ভর নিদর্শনাদি এবং নিছক আন্দাজ-অনুমানের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়ে থাকে এবং ইতিহাসবেত্তার বর্ণনাকারীর সমসাময়িক কোন ব্যক্তির বর্ণনা আদৌ হস্তগত হয় না। যেমন প্রাচীন মিসর, প্রাচীন ইরাক এবং প্রাচীন পারস্যের ইতিহাস সম্প্রতিকালে লিখিত হয়েছে। এসব ইতিহাস থেকেও প্রভূত উপকার লাভ হয়ে থাকে, কিন্তু তাতে নিশ্চিত জ্ঞান কোনমতেই অর্জিত হতে পারে না।

ইতিহাসের যুগসমূহ

১. প্রাচীন যুগ
২. মধ্য যুগ
৩. শেষ যুগ

প্রাচীন যুগ হচ্ছে পৃথিবী সৃষ্টির সূচনাকাল থেকে বায়যান্টাইন সাম্রাজ্যের শেষ যুগ পর্যন্ত। মধ্য যুগ হচ্ছে বায়যান্টাইন সাম্রাজ্যের শেষ যুগ থেকে দ্বিতীয় সুলতান মুহাম্মদের যুগে কনস্টান্টিনোপল বিজয়কাল পর্যন্ত যুগ।

পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর দ্বারা পরবর্তী বা পূর্ববর্তীকালের অন্যান্য ঘটনার কাল নির্দেশ করার রেওয়াজ আছে। যথা আদম (আ) সৃষ্টির এত বছর পর, নূহ (আ)-এর প্লাবনের এত বছর পূর্বে বা পরে, ঈসা (আ) অথবা বিক্রমাদিত্যের জন্মের এত বছর পূর্বে বা পরে। অনুরূপভাবে মুহাম্মদ (সা)-এর মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের বা কোন রাজা বাদশাহ্‌র সিংহাসনে আরোহণের দ্বারাও বর্ষ নির্ণয় করা হয়ে থাকে। আজকাল পৃথিবীতে ঈসায়ী সন (খ্রিস্টাব্দ) ও হিজরী সনের প্রচলনই সর্বাধিক।

ইসলামের ইতিহাস

পৃথিবীর জাতিসমূহের মধ্যে একমাত্র মুসলিম জাতিই এমন একটি জাতি এবং ইসলাম ধর্মই এমন একটি ধর্ম যার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আনুপূর্বিক সুসংরক্ষিত রয়েছে। এর কোন একটি অংশ বা অধ্যায়ও এমন নয়—যাতে সংশয়-সন্দেহের অবকাশ আছে। মুসলমানরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত সংঘটিত যাবতীয় ঘটনার বিবরণ লিখিতভাবে সংরক্ষণের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র উদাসীনতা প্রদর্শন করেন নি। মুসলমানদের জন্যে এটা সঙ্গতভাবেই গর্বের কারণ যে, ইসলামের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস প্রত্যেকটি ঘটনার সমসাময়িক ঐতিহাসিক ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনার সাহায্যে তাঁরা বিন্যাস ও রচনা করতে পারেন এবং সেসব সমসাময়িক ঐতিহাসিক ও বিশ্বস্ত রাবীদের বর্ণনা অনস্বীকার্য ধারাবাহিকতাও তাঁরা সপ্রমাণিত করতে পারেন। মোদ্দাকথা, পৃথিবীতে কেবল মুসলমানই এমন একটা জাতি যারা তাঁদের পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভরযোগ্য ইতিহাস সংরক্ষণ করেছে। দুনিয়ায় অন্য কোন জাতি এ ব্যাপারে মুসলমানদের সমকক্ষ নয়। ইসলামের ইতিহাসবেত্তাগণ এ ব্যাপারে এতই সতর্কতা অবলম্বন

করেছেন যে, প্রতিটি ঘটনা হুবহু বর্ণনা করে নিজেরা মন্তব্য করা থেকে বিরত থেকেছেন। কেননা তাতে সন্দেহ হতে পারতো যে, ইতিহাস লেখকের নিজস্ব খেয়ালখুশী ও প্রবণতার ছাপ পড়ায় পাঠকের মনে তার প্রভাব পড়েছে এবং ঘটনা সম্পর্কে তার নিরপেক্ষ বিচারের স্বাধীনতা খর্ব হয়েছে। ফলে মনের অজান্তেই পাঠক ইতিহাস লেখকের বিশেষ প্রবণতার অন্ধ অনুসারী সেজে বসেছে। ইসলামের ইতিহাসের মাহাত্ম্য এখন অন্তরে আরো বেশি রেখাপাত করে যখন দেখা যায় যে, ইসলামের ইতিহাসের যে কোন অধ্যায়কে বুদ্ধির কষ্টিপাথরে ও যুক্তির বৈজ্ঞানিক মাপকাঠিতে পরীক্ষা এবং বিশ্লেষণ করলেও তাতে কোনরূপ ত্রুটি বৈকল্য বা কৃত্রিমতার লেশমাত্র পাওয়া যায় না।

ইতিহাসের ইতিহাস

বাবেল ও নিনোভার ধ্বংসাবশেষ, নজদের মরুভূমিতে 'আদ ইরামের স্তম্ভরাশি, মিসরের পিরামিড ও নারীমূর্তিসমূহ দর্শনে স্বভাবতই মানুষের মনে এগুলোর নির্মাতাদের সম্পর্কে জানবার কৌতূহল জন্মে। অনেকে বাবেলীয়দের ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। এবং নিজেদের অপরিপক্ক বুদ্ধিবিবেচনা খাটিয়ে অনেকে বর্ণনাও সংকলিত করেছেন। অত্যাশ্চর্য ধরনের লিপিমালা এবং মিসরীয় সংকেতসমূহ অবলম্বনে পিরামিড নির্মাতাদের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে।

যেন্দাবেস্তা, দসাতির, সফরঙ্গ, বর্তমানে বিদ্যমান আসমানী কিতাবাদি এবং বাইবেল, বাল্মিকীর রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি এমন সব গ্রন্থ যেগুলো সম্পর্কে ভুল শুদ্ধ কিছু না কিছু ইতিহাস জানা যায়। প্রত্যেক ভাষার বাকবিধি, প্রবাদবাক্য, প্রস্তরনির্মিত অস্ত্রশস্ত্র, লৌহনির্মিত যন্ত্রপাতি, স্বর্ণ-রৌপ্য ও তাম্রনির্মিত গহনাপত্র, প্রস্তরমূর্তি, মিসরের মমিকৃত সুসংরক্ষিত শবদেহসমূহ, অশোকের স্তম্ভসমূহ, রুস্তমের সিংহাসন, চীনের মহাপ্রাচীর প্রভৃতি নিঃসন্দেহে কৌতূহলোদ্দীপক ও আকর্ষণীয় এবং এগুলোর দ্বারা সামগ্রিকভাবে গোটা বিশ্বের ইতিহাস যদিও অবগত হওয়া নাও যায়, তবুও এগুলোর দ্বারা ইতিহাসের উপর বেশ কিছু আলোকপাত হয়, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ভারতীয়দের সত্য মিথ্যা কাহিনীসমূহ, মিসরীয়দের প্রাচীন শিলালিপিসমূহ, চীনাদের প্রাচীন লোক কাহিনীসমূহ, পারসিকদের প্রাচীন ইমারতসমূহের ধ্বংসাবশেষ, গ্রীকদের লিপিসমূহ বিশেষত হিরোডোটাসের রচনা, ইসরাঈলী রিওয়ায়াতসমূহ, প্রভৃতি মিলিয়ে ইতিহাসের অপরিহার্য এবং প্রাথমিক উপাদান।

ইতিহাসের সূচনা

রোমীয় এবং গ্রীকদের আমল বিশেষত আলোকজান্ডারের বিজয়সমূহের দ্বারা ইতিহাসের সেই অংশের সূচনা হয়েছে–যা পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের ইতিহাস এমনিভাবে আমাদের সম্মুখে তুলে ধরছে যে, ইতিহাসের ধারাবাহিকতা তারপর খুব কমই বিঘ্নিত হয়েছে। সাধারণত সেই থেকেই ঐতিহাসিক যুগের সূচনা বলে গণ্য হয়ে থাকে। গ্রীস, মিসর ও ইরানের ইতিহাস অধ্যয়ন করতে গিয়ে আগ্রহী ইতিহাস পাঠকরা যেমন আনন্দিত ও উৎসাহিত হন, তেমনি ভারতের ইতিহাস পাঠকালে তারা এই লক্ষ্য করে ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হন যে, এই ঐতিহাসিক যুগেও ভারতবর্ষকে ঘন তমসাচ্ছন্ন মনে হয়। এখানকার লোকদের এই উদাসীনতার জন্যে পৃথিবীর ইতিহাস লেখকগণ কঠিন সমস্যায় নিপতিত হন যখন তাঁরা লক্ষ্য করেন যে, এখানকার লোকেরা যতসব রূপকথা ও কল্পকাহিনীকে ইতিহাসের রূপ দিয়ে বসে আছে। এরা কোন দিন

যথার্থ ইতিহাস সরল ভাবে উপস্থাপিত করতে পারে নি। এই শস্য-শ্যামল ও জনাকীর্ণ দেশ ভারতবর্ষের ঠিক বিপরীত আরবের মরু রাজ্য তাদের বর্ণনার বিশুদ্ধতা, স্মরণশক্তির প্রখরতা, বংশপঞ্জি সংরক্ষণে নিষ্ঠা এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলী আনুপূর্বিক যথার্থভাবে উপস্থাপনের অপূর্ব ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে-যদ্দরুন সেই অসাধারণ জাতিগুলোও ইতিহাসের একটি মূল্যবান উপাদান বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।

ইতিহাসের সত্যিকারের সূচনা

এবার কুরআনুল কারীম নাযিল হতে লাগলো। আরবরা গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়লো। সমস্ত সভ্যতা-সংস্কৃতি আরব সংস্কৃতির মুখে খড়কুটো বা ধূলোবালি প্রতিপন্ন হলো। সত্যিকারের ইতিহাস এবার শুরু হলো। হাদীস রিওয়ায়াতের যাচাই-বাছাই এবং 'আসমাউর রিজাল' শাস্ত্রের উদ্ভাবনের অনন্য সাধারণ কীর্তিদ্বয়ের কথা বাদ দিলেও মুসলমানদের মধ্যে এমন শত শত হাজার হাজার ঐতিহাসিকের সন্ধান পাওয়া যাবে, যারা ইতিহাস প্রণয়নে এমন অবিস্মরণীয় কীর্তি রেখে গেছেন যে, পাঠক মাত্রকেই তা অভিভূত করে। সমাজ-সভ্যতা সংস্কৃতির এমন কোন দিক নেই, যে ব্যাপারে মুসলিম ইতিহাসবেত্তাগণ ইতিহাস প্রণয়ন করেন নি। ইতিহাসের প্রাণ হচ্ছে তার রিওয়ায়াত বা বর্ণনার বিশুদ্ধতা। এ ব্যাপারটি মুসলমানরা এতই নিষ্ঠার সাথে সংরক্ষণ করেছেন যে, মুসলমান ছাড়া অন্য কোন জাতি তার উদাহরণ দেখাতে ব্যর্থ। এমনকি অন্যান্য রাষ্ট্র ও জাতির ইতিহাস প্রণয়নেও মুসলমান ঐতিহাসিকগণ তাদের মেধা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ব্যয় করেছেন।। ইতিহাসকে একটা শাস্ত্রের মর্যাদায় উন্নীত করা মুসলমানদেরই কার্তি। ইতিহাসের মূলনীতির উদ্‌গাতা ইব্‌ন খালদূন চিরদিন ঐতিহাসিকদের ভক্তিশ্রদ্ধা লাভ করতে থাকবেন। যখন মুসলিম জাতির পতন শুরু হলো এবং মুসলিম ঐতিহাসিকের মধ্যে পূর্ববৎ উৎসাহ-উদ্দীপনা আর তেমন অবশিষ্ট রইল না 'তখন থেকে তাদেরই ছাত্র ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ তাদের সে আরব্ধ কাজ সমাপ্ত করার কাজে ব্রতী রয়েছেন।

সাম্রাজ্যের ইতিহাস

পশুর তুলনায় মানুষের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, পশুকে যেখানে সীমাবদ্ধ শক্তি-সামর্থ্য দেয়া হয়েছে যা সহজাতভাবে তার নিজের মধ্যেই বিদ্যমান, সেখানে মানুষকে এমন সম্ভাবনার অধিকারী করা হয়েছে যে, সে তার শক্তিকে যতই বৃদ্ধি করতে চায় ততই তার শক্তির ক্ষেত্র প্রশস্ত থেকে প্রশস্ততর হতে থাকে। এ কথাটি এভাবেও বলা যায়, মানুষ সর্বদা উর্ধ্বগামী। সে সর্বদা নীচ থেকে উপরের দিকে আরোহণ করার জন্যেই সৃষ্ট হয়েছে। মানুষের মধ্যে যে অনেক বেশী উর্ধ্বে সমাসীন হয়ে যায়, অন্যদেরকে সে যেহেতু অনেক নীচে দেখতে পায়, তাই নিজে পরিপূর্ণ না হলেও আপেক্ষিকভাবে নিজেকে অনেক পরিপূর্ণ দেখতে পায়। কিন্তু সাথে সাথে তার এ পূর্ণতা যেহেতু আপেক্ষিক এবং তার উন্নতির অবকাশ থেকেই যায় তাই তার চাইতে অপেক্ষাকৃত পূর্ণতর লোকদের তুলনায় নিজেকে সে অপূর্ণই দেখতে পায়। অপর কথায় বলা যায়, মানুষের মধ্যে সহজাতভাবেই উবুদিয়্যত বা দাস্যভাব বিরাজমান। সে তার শক্তি সামর্থ্যদাতা উপকারী সত্তার কাছে স্বভাবজাতভাবেই বিনীত।

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ ـ

আমি জিন ও মনবজাতিকে সৃষ্টিই করেছি ইবাদত করার জন্যে। (৫১ : ৫৬)

যে মানুষটিকে সকলের শীর্ষে ও উর্ধ্বদেশে সমাসীন দেখা যায় তাই স্বভাবত অন্যরা তার কাছে মাথা নত করে তার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে। এটাই হচ্ছে বাদশাহীর মৌল দর্শন আর এ থেকেই সেই বহুল প্রচলিত প্রবাদ বাক্যটির তাৎপর্য বোধগম্য হয়, যাতে বলা হয়ে থাকে যে, বাদশাহ্ বা শাসক হচ্ছে রূপকভাবে আল্লাহ্র ছায়াস্বরূপ। এখানে একথা বিস্মৃত হলে চলবে না যে, বাদশাহ্ বা শাসক প্রকৃতই কামেল বা পরিপূর্ণ সত্তা নয়, এ কেবল আপেক্ষিক পূর্ণ মাত্র-যাকে কেবল রূপক অর্থেই পূর্ণ বলা চলে। কেননা, প্রকৃত পূর্ণ সত্তা কেবল তিনিই হতে পারেন যিনি সকল সীমাবদ্ধতা, সমকক্ষতা, নশ্বরতা ও অপূর্ণতার উর্ধ্বে সমাসীন একক অবিনশ্বর স্বয়ম্ভূ ও অপরিহার্য সত্তা, সমস্ত গুণের আঁধার। তিনিই প্রকৃত বাদশাহ, শাসক, হাকিম, সার্বভৌমত্বের অধিকারী একক বিধানদাতা। মোটকথা মানুষ যেহেতু স্বভাবজাতভাবে সর্বদা তার আপন সত্তায় অনেক দীনতা ও অপূর্ণতা দেখতে পায়, তাই আনুগত্য ও মাথা নত করার সহজাত প্রবৃত্তিও তার মধ্যে নিহিত এবং এর স্বভাবজাত প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করতে তাকে বারণ করা হয়েছে :

أَطِيعُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ .

আল্লাহর আনুগত্য কর ও রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যকার শাসকেরও। (৪ : ৫৯)

রূপকভাবে আইন ও সার্বভৌমত্বের অধিকারী কেবল সেই বাদশাহ্ বা রাজন্যই হতে পারেন, যিনি আপেক্ষিকভাবে অন্যদের তুলনায় পূর্ণত্বের অধিকারী। তাই বলা যায়, প্রত্যেক পূর্ণ ও শক্তিমানই তার চাইতে অপেক্ষাকৃত অপূর্ণ এবং শক্তিহীনকে তার কর্তৃত্বাধীন বা প্রভুত্বাধীন দেখতে চাইবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যেহেতু মানব চরিত্রে তার স্বভাব-বিরোধী কাজ করার এবং আপন প্রতিভা ও শক্তির বিকাশের পরিবর্তে অধঃপতনের দিকে ধাবিত হওয়ার এবং শক্তির অপচয়ের প্রবণতা ও সুযোগও বিদ্যমান রয়েছে, এজন্যে এটাও অপরিহার্য ছিল যে, কখনও দেখা যাবে, কোন ব্যক্তি এক সময়ে অন্যদের তুলনায় অনেক অপরিপূর্ণ ও পশ্চাৎগামী হওয়া সত্ত্বেও আপন স্বভাবধর্মের বিপরীতে সে সেই ক্ষমতা ও যশই কামনা করবে যা কোনমতেই তার প্রাপ্য নয়, বরং তা কেবল পূর্ণ সত্তারই প্রাপ্য হতে পারে। বিভিন্ন সাম্রাজ্য ও সম্রাটের মধ্যে দ্বন্দ্বের মূল কারণ এখানেই নিহিত। কর্তৃত্ব ও শাসন ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার প্রধান হেতু দু'টিই হতে পারে; প্রথমটা রূহানী বা আধ্যাত্মিক, অপরটি দৈহিক বা বাহ্যিক। অন্য কথায় প্রথমটি হচ্ছে নবুওয়াত এবং দ্বিতীয়টি সালতানাত বা রাজত্ব।

সালতানাত বা জড়বাদী রাজত্বের সহিত সংশ্লিষ্ট পূর্ণতার বর্ণনা তালূত এবং হযরত দাউদ (আ)-এর রাজত্বের বর্ণনায় এভাবে রয়েছে :

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا .

তাদের নবী তাদেরকে বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্যে তালূতকে বাদশাহ্ মনোনীত করেছেন। (২ : ২৪৭)

বনী ইসরাঈল তালূতকে বাদশাহ মনোনীত হওয়ার সংবাদে প্রতিবাদ বা আপত্তি উত্থাপন করলে জবাবে বলা হলো :

اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهٗ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ .

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তালূতকে তোমাদের উপর রাজত্বের জন্যে মনোনীত করেছেন এবং তাকে বিদ্যাবুদ্ধি ও দেহাবয়বে তোমাদের মধ্যে সেরা ব্যক্তি করেছেন। (২ : ২৪৭)

তারপর দাউদ (আ) সম্পর্কে বললেন :

وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوْتَ وَاٰتٰهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاۤءُ .

এবং দাউদ জালূতকে হত্যা করলো এবং আল্লাহ্ তাকে রাজত্ব দান করলেন এবং তাঁর অভিপ্রায় অনুযায়ী তাকে জ্ঞান দান করলেন। (২ : ২৫১)

ইতিহাস পাঠে প্রতীয়মান হয় যে, যে ব্যক্তি কোন জাতির গোত্রপ্রীতি ও জাত্যাভিমানের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হতে পেরেছে এবং জ্ঞানবুদ্ধি, স্বাস্থ্য বা দেহসৌষ্ঠবে অন্যদের তুলনায় প্রাধান্য অর্জন করেছে সে-ই-তার জাতির নেতা ও রাজন্যপদে অনায়াসে বরিত হয়েছে। আজ থেকে তিন হাজার বছর পূর্বেও দৈহিক শক্তিমত্তা রাজত্ব লাভের জন্য প্রয়োজনীয় বিবেচিত হয়েছে-যার সাথে জ্ঞান ও বুদ্ধিগত প্রাধান্যও অপরিহার্য উপাদানরূপে বিবেচিত হয়েছে। তারপর শনৈ শনৈ মানব জাতির মধ্যে যতই নতুন নতুন গুণাবলী সৃষ্টি হয়েছে ততই রাজন্যের গুণাবলী ও পূর্ব শর্তের পরিধিও বিস্তৃত থেকে বিস্তৃততর হয়ে চলেছে। মোদ্দাকথা চিরকালই রাজা-বাদশাহ্ বা রাজন বলতে মূল্যবান ও গুণধর ব্যক্তিরাই বিবেচিত হয়ে এসেছেন। আর যখনই এর ব্যতিক্রমে অযোগ্য লোকেরা এ শীর্ষ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছে তখনই নানারূপ ফিতনা-ফাসাদ ও বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে। এ নিয়মের ব্যতিক্রম কোথাও পাওয়া যায় না। প্রতিটি মানুষ যেহেতু জন্মগত ও স্বভাবগতভাবে সমান অধিকার ও মর্যাদার অধিকারী, সুতরাং অধ্যবসায় সাপেক্ষে লভ্য যে মাহাত্ম্য ও গুণাবলী মানুষকে রাজা-বাদশাহর মর্যাদায় উন্নীত করে তাতে সকলেরই সমান অধিকার।

لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلاَّ مَا سَعٰى .

যে যতটুকু চেষ্টা করবে সে ততটুকুই কর্ম লাভ করবে।

প্রতিটি জাতির সবচেয়ে গুণধর ব্যক্তি তার স্বীয় গুণাবলী ও মাহাত্ম্যের দ্বারা আপন সমগোত্রীয় বা সমজাতীয়দের রাজার আসনে সমাসীন হয়েছে। প্রতিটি গ্রামের মোড়ল তার গ্রামের রাজাস্বরূপ। আর এটা হচ্ছে আদি মানবগোষ্ঠীর রাজত্বের নমুনা-যা আজো আমাদের চোখের সম্মুখে রয়েছে। আজো আমরা এ ব্যবস্থার কোন ত্রুটি নির্দেশ করতে পারবো না। হাঁ, তা তখনই পারবো যখন যোগ্যতর ব্যক্তির স্থলে অযোগ্য ব্যক্তি শাসক পদে বরিত হয় বা কোন গ্রাম বা মহল্লার মোড়ল-মাতব্বর (মেম্বার-চেয়ারম্যান) সেই গ্রাম বা জনপদের যোগ্যতর ব্যক্তিটি না হবে।

ব্যক্তিতন্ত্র ও গণতন্ত্র

মানুষ যেমন সৃষ্টির সেরা এবং গোটা বিশ্বের সবকিছুর সেবা সে লাভ করছে, তেমনি এটাও তার স্বভাবজাত যে, কোন উচ্চতর শক্তির কাছে সে মাথা নত করে তারই দ্বারা সে পরিচালিত হয়। মানুষের এই সহজাত প্রবৃত্তিই তাকে আল্লাহ্র একত্বে বিশ্বাসী হওয়ার প্রেরণা যোগায় এবং সমস্ত বাতিল উপাস্যকে বর্জন করে একক লা-শরীক আল্লাহ্র ইবাদতে নিয়োজিত হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। শয়তান যে ব্যাপারে মানুষকে সবচাইতে বেশি ধোঁকায়

ফেলেছে তা হলো শাসক হওয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় গুণাবলীর কথা বিস্মৃত মানুষ উত্তরাধিকার ও বংশগত সম্পর্ককে এর একটি অপরিহার্য পূর্বশর্তরূপে মেনে নিয়েছে। ফলশ্রুতিতে, অযোগ্য লোকেরা কেবল পূর্ববর্তী রাজা-বাদশাহর সন্তান বা উত্তরাধিকারী হওয়ার ভিত্তিতে রাজা-বাদশাহ বনে গিয়ে যোগ্যতর ব্যক্তিদেরকে বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত করার সুযোগ লাভ করেছে। মানব জাতির এ ভুলের দরুন পৃথিবীতে বহু অনর্থের সৃষ্টি হয়েছে এবং এজন্যে মানব জাতিকে চড়া মূল্য দিতে হয়েছে।

কুরআনুল কারীম নাযিল হয়ে এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নবীরূপে আবির্ভূত হয়ে পৃথিবীবাসীকে তাদের এ বিশ্বজোড়া বিভ্রান্তি ও পর্বততুল্য ভ্রান্তির অপনোদন করেছেন। এর সমস্ত মানবীয় গুণের অধিকারী নবী করীম (সা) স্বয়ং রাজ্য পরিচালনা করে নবুওয়াত ও রিসালতের গুরুদায়িত্ব পালনের সাথে সাথে পার্থিব রাজ্য পরিচালনার প্রকৃষ্ট নমুনাও বিশ্ববাসীর সম্মুখে উপস্থাপিত করেছেন এবং বিশ্ববাসীকে বাস্তবে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, রাজ্যের শাসক কেমন হতে হয় এবং তার দায়িত্ব ও ইখতিয়ারের গণ্ডি কি ? তাঁর অব্যবহিত পরে তাঁর সাহচর্য ধন্য এবং তাঁরই হাতে শিক্ষা-দীক্ষা প্রাপ্ত, তাঁর হাতে গড়া সর্বোত্তম মানব শ্রেণী অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরাম তাঁর শিক্ষা অনুসারে সর্বোত্তম ব্যক্তিটি অর্থাৎ শাসক হওয়ার যোগ্যতম ব্যক্তিটিকে তাঁদের শাসকরূপে নির্বাচিত করেন। বাস্তব ক্ষেত্রে এই সর্বপ্রথম পৃথিবীর ইতিহাসে শয়তানের সেই ভোজবাজিটির অবসান ঘটলো যে, শাসক হওয়ার জন্যে অবশ্যই পূর্ববর্তী শাসকের উত্তরাধিকারী বা সন্তান হতে হবে। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর পর হযরত উমর ফারূক (রা)-এর নির্বাচনও যোগ্যতার ভিত্তিতেই হয় এবং তাঁর পরে হযরত উছমান গনী (রা)-এর নির্বাচন যদিও বংশগত বা উত্তরাধিকারসূত্রে হয়নি, তবুও মুসলমানদের কোন কোন ব্যক্তি ও শ্রেণীর মনে এ ব্যাপারে কিছুটা অনীহার ভাব বিদ্যমান ছিল এবং উসমান (রা) তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও স্বগোত্রীয় লোকদেরকে বিভিন্ন ব্যাপারে প্রাধান্য দিয়ে রেখেছিলেন।[১] তাই তাঁর শাসনামল বিক্ষোভমুক্ত ছিল না। তাই বলা যায়, হুযূর (সা) রাসূল হিসাবে যেভাবে দীর্ঘ তেইশ বছরকাল তাঁর আপন জীবনকে মানব জাতির পথ প্রদর্শনের জন্য নিয়োজিত রেখেছিলেন, ঠিক তেমনি ১ম হিজরী থেকে ২৩ হিজরী পর্যন্ত তাঁর রাজ্য শাসনের আদর্শও সুদীর্ঘ ২৩ বছরকাল বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করেছে। যেভাবে হুযূর (সা)-এর জীবনের নবুওয়াতী জীবনের তেইশটি বছর মানবজাতির অনুকরণীয় আদর্শ, ঠিক তেমনি তাঁর মাদানী জীবন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এবং হযরত উমর ফারূক (রা)-এর খিলাফত কালব্যাপী তেইটি বছর বিশ্বের রাজন্যবর্গের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ স্বরূপ।

খিলাফতে রাশিদার পর মানবীয় দুর্বলতা এবং শয়তানী ভোজবাজি আবার উত্তরাধিকার সম্পর্কে শাসক হওয়ার জন্যে অপরিহার্য পূর্বশর্তের মর্যাদা দিয়ে দিল এবং আবার শাসক হওয়ার জন্যে যোগ্যতর লোকের স্থলে অযোগ্য পাত্ররাই পূর্ববর্তী শাসকের উত্তরাধিকারী হওয়ার ভিত্তিতে শাসক হওয়ার যোগ্যপাত্র বলে বিবেচিত হতে লাগলো। ফলে যোগ্য শাসকদের

---

১. সত্যিকারের ইতিহাস বিচারে এ বক্তব্য আংশিক সত্য মাত্র। যেমন, হযরত উসমান (রা) তাঁর যেসব আত্মীয় ও স্বগোত্রীয়কে প্রাধান্য দিয়েছিলেন বলে বলা হয়ে থাকে, তাঁদের অধিকাংশই তাঁর খিলাফত আমলের পূর্ব থেকেই গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে অধিষ্ঠিত ছিলেন। গোত্রীয় জিহালত মাথাচাড়া দিয়ে উঠতেই এসব প্রশ্নের উদ্ভব হয়েছিল—অনুবাদক।

অযোগ্য উত্তরাধিকারীরাই শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে লাগলো। এ অযোগ্য লোকদেরকে পদচ্যুত করতে প্রচুর মেধাক্ষয় এবং কষ্ট ও নির্যাতন স্বীকার করতে হতো। অবশেষে এসব নির্যাতনে উত্যক্ত হয়ে লোকজন সেই গণতন্ত্রের দ্বারস্থ হলো—যা আজকাল ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে দৃষ্ট হয়ে থাকে। অথচ প্রকৃতপক্ষে বংশগত উত্তরাধিকার ভিত্তিক রাজতন্ত্র যেমন মানবজাতির জন্যে অনিষ্টকর ছিল, তেমনি এসব গণতন্ত্রও মানব জাতির জন্যে উপাদেয় ও আশীর্বাদস্বরূপ হতে পারে না। মানব জাতির স্বভাবধর্মের সাথে পূর্ণ সঙ্গতিশীল এবং সর্বপ্রকারে উপাদেয় কেবল সেই রাজ্যশাসন পদ্ধতিই যা হিজরী শতকের প্রথম চতুর্থাংশ বিশ্ববাসীর সম্মুখে উপস্থাপিত করেছিল—যা গণতন্ত্র ও রাজতন্ত্রের মাঝামাঝি একটা ব্যবস্থা।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণ সাধারণ ভোটে তিন অথবা পাঁচ বছরের জন্যে কোন এক ব্যক্তিকে তাদের শাসক নির্বাচিত করে—যাকে প্রেসিডেন্ট বা রাষ্ট্রপতি নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। একজন মানব দরদী রাষ্ট্রপতির যতটা শক্তি থাকা প্রয়োজন সাধারণত এ ব্যবস্থায় নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির সে ক্ষমতা থাকে না। সামান্য সামান্য ব্যাপারেও এ ব্যবস্থার রাষ্ট্রপতিকে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিতে হয়, যেন রাষ্ট্রের সত্যিকারের কোন কেন্দ্রীয় পরিচালকের শক্তি নেই এবং মূল শক্তি বহুধা বিভক্ত হয়ে সমগ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। বাহ্যত এ রাষ্ট্র ব্যবস্থাটি খুবই চমকপ্রদ ও জনপ্রিয়। কেননা, এতে জনগণ আত্মনিয়ন্ত্রণের সুযোগ হাতে পায় এবং স্বৈরতন্ত্রের শক্তিকে দুর্বল দেখতে পেয়ে আনন্দবোধ করে। কিন্তু এতে তারা নিজেদের অনেক ক্ষতিও সাধন করে থাকে। বল্গাহারা স্বাধীনতা এবং সর্বতোভাবে স্বাধীন আস্থা মানবীয় মর্যাদা রক্ষার অনুকূল প্রতিপন্ন হয় না। এ কারণেই ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি গণতান্ত্রিক দেশে আধ্যাত্মিকতা উৎসন্নে গেছে। আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মের শিক্ষাশ্রিত উঁচুদরের নৈতিকতা এমন কোন রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত থাকতেই পারে না, যেখানে গণতন্ত্রের তরঙ্গমালা উপচে পড়ছে। গণতন্ত্রের রাষ্ট্রব্যবস্থা মানুষকে এমনি বল্গাহীন করে তোলে যে, তা মানুষের বেশীক্ষণ আল্লাহ্‌মুখী ও আল্লাহ প্রেমিক হিসাবে কায়েম থাকতে দেয় না। নির্ভেজাল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা হচ্ছে নাস্তিকতা ও ধর্মহীনতার চারণভূমি। মরুভূমিতে যখন শস্য উৎপন্ন হতে পারে না, পানি থেকে বের করে নিলে মাছ যেমন জীবন ধারণ করতে পারে না, অন্ধকার স্যাতসেঁতে স্থানে মানুষ যেভাবে সুস্থ থাকতে পারে না, তেমনি নির্ভেজাল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা চিন্তা-চেতনা, বিধি-নিষেধ ও ইবাদত-বন্দেগীর বিকাশ ঘটতে পারে না এবং আল্লাহ প্রদত্ত কোন ধর্মীয় ব্যবস্থা সেখানে বেশীক্ষণ জীবন্ত থাকতে পারে না। ধর্মের প্রাণ হচ্ছে আনুগত্য এবং সত্য ধর্মের আনুগত্য মানব চরিত্রের সেই মৌলিক স্পিরিটকে অক্ষুণ্ন রাখে যে, প্রত্যেক সম্মানার্হ ঊর্ধ্বতম সত্তাকে যথাযথ সম্মান দেখাতে হবে এবং আল্লাহ্ তা'আলা যেহেতু সর্বোচ্চ সত্তা এবং নিরংকুশ কামালিয়ত বা পূর্ণতা কেবল তাঁরই, তাই তাঁর দরবারে সিজদারত হয়ে 'সুবহানা রাব্বিয়াল আলা'এর স্বীকারোক্তি করা উচিত। দুনিয়ার প্রত্যেক নবী-রাসূল পথ-প্রদর্শকই এ সঙ্গত দাবীই করেছেন যে, হে মানব জাতি। আমার বিধি-নিষেধ মেনে নাও, আমার আনুগত্য কর। আর এটা অনস্বীকার্য যে, এ নবী-রাসূল, পথ-প্রদর্শকদের নিঃশর্ত অনুসরণ ও আনুগত্যের মাধ্যমেই মানব জাতি চিরদিন মঙ্গল ও সাফল্য লাভ করেছে এবং সর্বনিম্ন স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হয়েছে। তাই যে রাষ্ট্রব্যবস্থা এ উন্নত ব্যবস্থার জন্যে বিষতুল্য এবং মানুষকে বল্গাহারা করে

দিতে প্রেরণা যোগায়, তার ফলাফল মানবজাতির জন্যে কখনো মঙ্গলজনক হতে পারে না। পৃথিবীর প্রতিটি পিতা তার সন্তানের আনুগত্য আশা করে এবং সন্তানের জন্যেও তার পিতার আনুগত্যে মঙ্গল নিহিত রয়েছে। প্রতিটি শিক্ষক তার শাগরিদের আনুগত্য চায়। প্রত্যেক পীর তার মুরীদের আনুগত্য চায় এবং শাগরিদ ও মুরীদের জন্যে তাদের শিক্ষক ও পীরের আনুগত্যেই মঙ্গল নিহিত। প্রতিটি নেতা তার দলীয় কর্মীর আনুগত্যের প্রত্যাশী এবং কর্মীর মঙ্গল নেতার আনুগত্যেই নিহিত। প্রতিটি সিপাহসালার যুদ্ধক্ষেত্রে তার সৈনিকের আনুগত্যের প্রত্যাশী এবং সৈনিকের মঙ্গলও তার সেনাপতির নিঃশর্ত আনুগত্যের মধ্যে নিহিত। গণতন্ত্রের সামগ্রিক প্রভাবে পুত্র তার পিতার, শাগরিদ তার উস্তাদের, মুরীদ তার পীরের, জনতা তার নেতার, সৈনিক তার সিপাহসালারের আনুগত্যকে একটি বোঝাস্বরূপ মনে করে এবং ধীরে ধীরে সে আনুগত্যের প্রবণতা বিনষ্ট হয়ে যায়। ফলে মানুষ নাস্তিকতা ও ধর্মহীনতার দিকে ঝুঁকে পড়ে যা তাকে মানবতার গণ্ডি থেকে বের করে পশুত্বের স্তরে নামিয়ে দিতে চায়। গণতন্ত্রের ব্যবস্থা যেহেতু ধর্ম বিরোধী প্রতিপন্ন হয়েছে তাই এ ব্যবস্থা দ্বারা ধর্মের যে পরিমাণ ক্ষতি সাধিত হবে, সুখ-শান্তি সেই পরিমাণই রাষ্ট্র ও জাতি থেকে বিদায় নেবে। কেননা, সত্যিকারের রাজনীতি ও সুখ–শান্তি কেবল ধর্মের মাধ্যমেই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। রাষ্ট্র এ ব্যাপারে কোনদিনই সাফল্যমণ্ডিত হতে পারেনি। আপন বাড়ীর গণ্ডিতে, নির্জন স্থানে বিজন বন বা মরুভূমিতে, পথে-ঘাটে প্রান্তরে মানুষ রাষ্ট্রের ক্ষমতা বা পুলিশের আওতা থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকে। এ সব ক্ষেত্রে মানুষকে চুরি-ডাকাতি, রাহাজানি, ব্যভিচার প্রভৃতি পাপাচার থেকে একমাত্র ধর্মই নিবৃত্ত রাখতে পারে। রাষ্ট্র এ ব্যাপারে কিছুই করতে পারে না। সমগ্র বিশ্বের মানুষ যদি ধর্মহীন হয়ে যায়, তা হলে পৃথিবী চুরি, ডাকাতি, হত্যা, রাহাজানি, ব্যভিচার, মিথ্যাচার প্রভৃতি পাপাচারে পূর্ণ একটি জাহান্নামের রূপ পরিগ্রহ করবে।

ইউরোপ আমেরিকার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে এমন কোন সৌন্দর্য আমরা দেখতে পাই না যদ্দরুন সঙ্গতভাবে আমরা ঈর্ষা করতে পারি। এসব দেশে ধর্মহীনতার জয়জয়কার। এদের সমাজ অশ্লীলতায় পূর্ণ। প্রতিশ্রুতিভঙ্গ, বিশ্বাসঘাতকতা, স্বার্থপরতা, মিথ্যাচার, প্রতারণা প্রভৃতি তাদের সমাজ জীবনের অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কোন নেপোলিয়ন, কায়সার, উইলিয়াম, জুলিয়াস সীজার, তৈমুর, হ্যানিবল, সালাহউদ্দীন, সুলায়মান কানুনী, শেরশাহ, আলমগীর কস্মিনকালেও সৃষ্টি হতে পারে না বা সৃষ্টি হলেও বেঁচে থাকতে পারে না। এমন ব্যবস্থায় কোন খালিদ ইবন ওয়ালীদের জন্মগ্রহণ অসম্ভব ব্যাপার। মানুষের প্রতারিত হওয়ার এবং হীনম্মন্যতার শিকার হওয়ার সম্ভবত এটাই সর্বনিকৃষ্ট নমুনা যে, আজ আমরা অনেক মুসলিম সন্তানকেও পাশ্চাত্যের ঐ গণতন্ত্রের প্রত্যাশী লক্ষ্য করছি। অথচ এ ব্যবস্থাটি হচ্ছে ইসলামের সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং মানব জাতির জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। মুসলমানদের এ প্রবণতার মূলে রয়েছে তাদের কাপুরুষতা ও হীনম্মন্যতা। ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং কুরআন হাদীস সম্পর্কে চিন্তাভাবনা না করার ফলেই এ হীনম্মন্যতার সৃষ্টি হয়েছে।

ব্যক্তিশাসন ও রাজতন্ত্র

যখন কোন ব্যক্তি রাজ্যের বা সিংহাসনের মালিক বনে বসে তখন রক্ত ও বংশের সম্পর্ক এবং সহজাত প্রবৃত্তি তাকে এ জন্যে উদ্বুদ্ধ করে যেন সে তার সন্তানকে তার ব্যক্তিগত সম্পদরাশির উত্তরাধিকারী করার সাথে সাথে তার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও সিংহাসনের উত্তরাধিকারী

করে যায়। কিন্তু আসলে এটা তার ভুল বৈ কিছু নয়। কেননা, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তার ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ছিল না বরং এটা ছিল একটা আমানত—যা দেশ ও জাতি তার উপর অর্পণ করে রেখেছিল। এ আমানতে খিয়ানত করে অপর কাউকে স্বেচ্ছায় তা হস্তান্তরিত করার অধিকার তাকে কে দিয়েছে ? আমানত তার প্রকৃত মালিকের হাতেই প্রত্যর্পণ করতে হয়। তাই ঐ শাসকের পর শাসন ক্ষমতায় অন্য কাউকে আসীন করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জাতির দায়িত্ব তা ঐ শাসকের দায়িত্ব নয়। কিন্তু বাদশাহ, খলীফা বা শাসক যেহেতু শক্তির সমস্ত উৎস ও কেন্দ্রের উপর ক্ষমতাবান থাকে তাই তাকে তার খিয়ানত থেকে বিরত রাখার জন্যে বিপুল সৎ সাহস ও মনোবলের প্রয়োজন। ইসলাম তার প্রতিটি অনুসারীর মধ্যে সেই সৎ সাহস ও মনোবল সৃষ্টি করতে চায় এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও কুরআনুল কারীম সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে তা সৃষ্টি করেও ছিলেন। মুসলমানরা ইসলামের শিক্ষা থেকে যতই দূরে সরে যেতে লাগলো ততই তাদের মধ্যে সেই সৎ সাহসের অভাব দেখা দিতে লাগলো এবং শেষ পর্যন্ত তারা তা হারিয়ে ফেললো-যা দ্বারা তারা শক্তিমান শাসকদেরকে খিয়ানত থেকে বিরত রাখতে পারতো। ফলে তারা শাসকদের খিয়ানতের কাছেই আত্মমর্পণ করে বসলো। অবশেষে খিলাফতে রাশিদার সোনালী যুগে মিটে যাওয়া ব্যক্তিতন্ত্র বা রাজতন্ত্রের পুনরাবির্ভাব ঘটলো মুসলিম সমাজে। এ বদ রুসূমের কাছে আত্মসমর্পণের কুফলও অনেকবারই মুসলমানদেরকে হাড়ে হাড়ে ভুগতে হয়েছে। উত্তরাধিকারীদেরকে শাসনভার হস্তান্তরের এ কুপ্রথার ফলে অনেক সময় এমন সব অযোগ্য অকর্মণ্য লোক মুসলমানদের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে যাদের মামুলী ভদ্রলোকদের দরবারে বসার মত যোগ্যতাও ছিল না। অবশ্যই মুসলমানদের এমন একজন সুলতান বা খলীফা হওয়া উচিত-যিনি হবেন সমস্ত মুসলিম সমাজের যোগ্যতম ব্যক্তি বা অধিকাংশ মুসলমানের বা সকলের সমর্থনপুষ্ট ও সকলের দ্বারা নির্বাচিত। কোন ব্যক্তির সুলতান বা উত্তরাধিকারী হয়ে যাওয়াটা নিশ্চয়ই তার খলীফা হওয়ার যোগ্যতার নিশ্চিত প্রমাণ হতে পারে না।

মুসলমানদের মধ্যে যদি উত্তরাধিকারীদেরকে রাজ্যক্ষমতা হস্তান্তর তথা রাজতন্ত্রের এ কুপ্রথা জারি না হতো এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগের মতো পবিত্র আমানতের মর্যাদা নিয়ে অবশিষ্ট থাকতো তাহলে আজ ইসলামী হুকুমত ও মুসলমানদের বর্তমান দুরবস্থা আমাদের দেখতে হতো না। কিন্তু আল্লাহ্‌র মর্যী বুঝি এরূপই ছিল এবং অদৃষ্টের সে লিখনই বাস্তবায়িত হলো। মুসলিম সমাজ যদি গোড়াতেই এর বিরোধিতা করতো এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ব্যাপারটিকে সুসংরক্ষিত রাখতে ত্রুটি না করতো তা হলে প্রথম প্রথম হয়তো তাদেরকে এজন্যে বড় বড় ত্যাগ স্বীকার করতে হতো, তারপর কোন শাসকের এরূপ দুর্গতি হতো না যে নিজের পরে সে তার পুত্রকে শাসক মনোনীত করতে বা যুবরাজ বলে ঘোষণা করতে পারে।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর একাধিক পুত্র রাজ্য পরিচালনার যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিতে যেহেতু উমর ফারূক (রা)-ই মুসলমানদের মধ্যে যোগ্যতম ব্যক্তি বিবেচিত হয়েছেন, তাই তিনি তাঁকে শাসক নিযুক্তির পক্ষেই মুসলমানদেরকে সুপারিশ করেন। হযরত উমর (রা)-এর পুত্র হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর নিঃসন্দেহে মুসলমানদের খলীফা হওয়ার যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু হযরত উমর (রা) যেহেতু রাজতন্ত্রের কুপ্রথাকে

নির্মূল করতে আগ্রহী ছিলেন, তাই তিনি ওসীয়ত করে যান যেন অবশ্য তাঁর পুত্রকে খলীফা নির্বাচিত করা না হয়।

লোকে মূর্খতা ও অনভিজ্ঞতার দরুন ব্যক্তিতন্ত্র বা রাজতন্ত্রের কুফলাদি দর্শনে তার মৌল কারণ সম্পর্কে না জেনে সাধারণভাবেই এর বিরুদ্ধাচরণ করে গণতন্ত্রের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠে। ব্যক্তিতন্ত্র বা রাজতন্ত্রের যত কুফল আমাদের চোখে পড়ে তার মূল কারণ হচ্ছে রাজতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যক্তিগত উত্তরাধিকারে পর্যবসিত হয়ে পড়ে এবং শাসক নির্বাচিত করার জনগণের অধিকারকে ছিনিয়ে নেয়া হয়। তাই যুক্তির কথা হলো, আমরা অকল্যাণের আসল হেতু বা উৎস উত্তরাধিকারকে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপের সুযোগ দেবো না এবং পিতার পর পুত্র যদি প্রকৃতপক্ষে সমাজের যোগ্যতম ব্যক্তি না হয়ে থাকে তবে অবশ্যই তাকে আমাদের শাসক হতে দেবো না। আর যদি প্রকৃতপক্ষে সে ব্যক্তিটিই রাজ্যের বা জাতির যোগ্যতম ব্যক্তি হয়ে থাকে, তবে জনসাধারণের সম্মতি বা রায় পাওয়ার পরই কেবল শাসকরূপে বরণ করা হবে। এটা কোথাকার বুদ্ধিমানের কথা যে, একটি ভুলের কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে আরেকটি ভুলের শিকার হতে হবে! ব্যক্তিতন্ত্র বা রাজতন্ত্রে জনসাধারণের সৎ সাহসের অভাবের দরুনই বাদশাহদের জনগণকে শোষণ ও অত্যাচার করার সাহস বেড়ে যায়। কাউকে যোগ্যতম ব্যক্তি জেনে তার আনুগত্য করা এবং তার জুলুমের ভয়ে তার আনুগত্য করার মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে। একথাটি হয়তো এভাবে বোধগম্য হতে পারে যে, হযরত উমর (রা)-এর কোন কোন প্রাদেশিক গভর্নর বলেন, আমাদের কাছে এরূপ মনে হতো, হযরত উমর (রা)-এর এক হাত আমাদের উপরের চোয়ালের উপর, এর অপর হাত আমাদের নীচের চোয়ালের উপর রয়েছে। মনে হতো, আমরা যদি একটুও ব্যতিক্রম করি, তবে তিনি তৎক্ষণাৎ আমাদের উভয় চোয়াল টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিবেন। হযরত উমর ফারূক (রা)-এর আদেশ খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদের কাছে পৌঁছলো। তৎক্ষণাৎ তিনি প্রধান সেনাপতির পদ থেকে মামুলী সৈন্যের পর্যায়ে নেয়ে গেলেন। আর খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদের মতো বিজয়ী বীর বিনা বাক্য ব্যয়ে তা তাৎক্ষণিকভাবেই মেনে নিচ্ছেন! আবার অন্য দিকে দেখুন, প্রকাশ্য মিম্বরে উমর ফারূক (রা)-এর মত জাঁদরেল শাসককে চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে, আর মামুলী প্রজা তাঁর আমানতদারী ও বিশ্বস্ততার পরীক্ষা নিচ্ছে। জনৈক অবলা মহিলা মোহরানার ব্যাপারে হযরত উমর ফারূক (রা)-এর খুতবা শুনে নিঃসংকোচে আপত্তি উত্থাপন করছে আর খলীফাও মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে প্রকাশ্যে অঙ্গীকার ব্যক্ত করলেন যে, মদীনার রমণীরা যদি এভাবে তাঁকে ভুল ধরিয়ে দেয়, তবে তিনি অবশ্যই তাদের সঙ্গত আপত্তির মর্যাদা রক্ষা করবেন। এবার চিন্তা করুন, এ কেমন ধরনের আনুগত্য-যা হযরত উমর ফারূক (রা)-এর জনগণ তাঁর সাথে দেখিয়েছে! অপরদিকে পরবর্তী যুগের মোগল বাদশাহদের প্রতি প্রজা-সাধারণের আনুগত্যের নমুনাও লক্ষ্য করুন। কেবল পাঞ্জাব, সিন্ধু, দাক্ষিণাত্য ও বাংলার মত দূরবর্তী অঞ্চলের স্বাধীনচেতা জনগণই তাদের ফরমানের বিরুদ্ধাচরণ করেনি, বরং আগ্রা, এলাহাবাদ ও দিল্লীতেও শাহী ফরমানের যথার্থ তামিল হতো না।

ব্যক্তি গণতান্ত্রিক সরকার

ইসলাম যে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চেয়েছে এবং যে ব্যবস্থার নমুনা ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে পেশ করেছে তাকে ব্যক্তি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা বলা যেতে পারে। একে রাজতন্ত্র

ও গণতন্ত্রের মাঝামাঝি রূপ বলা যেতে পারে। খলীফা নির্বাচনে সর্বস্তরের মুসলমানদের রায় প্রদানের সুযোগ থাকে। যোগ্যতম ব্যক্তিকে নির্বাচিত করার সম্ভাব্য সকল পন্থাই গ্রহণ করা যেতে পারে–যাতে যোগ্যতম ব্যক্তিটির নির্বাচন সুনিশ্চিত হতে পারে। কোন নতুন শাসনতন্ত্র বা রাষ্ট্রীয় আইন রচনার প্রয়োজনই মুসলমানদের নেই। কেননা কুরআন মজীদ ও সুন্নাতে নববী তাদের কাছে রয়েছে। তাই যোগ্যতম ব্যক্তিকে নির্বাচিত করাও তাদের জন্যে তেমন কোন কঠিন কাজ নয়। যে ব্যক্তি কুরআন হাদীস সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন এবং তাঁর জীবন কুরআন-হাদীসের রঙে অনুরঞ্জিত তিনিই মুসলমানদের নেতা হওয়ার যোগ্যতম ব্যক্তি। কুরআন হাদীসের শিক্ষার আলোকে জাতি ও রাষ্ট্রকে পরিচালিত করা এবং সমাজ জীবনে আল্লাহ ও রাসূলের বিধি-নিষেধ কার্যকরী করাই হচ্ছে শাসকের দায়িত্ব। মুসলমান যদি তার নেতাকে বা শাসককে কুরআন-হাদীসের বিরুদ্ধাচরণ করতে দেখে তখনই সে তার ত্রুটি নির্দেশ করতে এবং তাকে রীতিমত বাধা দিতে পারে। কিন্তু তাঁর কুরআন-হাদীসের পরিপন্থী নয় এমন সব বিষয় মেনে চলা প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরয। তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের চিন্তা-ভাবনাও মনে আনা উচিত নয়। মুসলমানদের শাসক যদি কুরআন হাদীসের অনুশাসনের বিরুদ্ধাচরণ করে তবে তৎক্ষণাৎ পদচ্যুত করা যেতে পারে। কিন্তু তিনি যদি তাঁর দায়িত্ব পালনে এবং দেশ ও জাতির সেবায় আল্লাহকে ভয় করে চলেন এবং সদিচ্ছার পরিচয় দেন, তবে তাঁর মত একজন অভিজ্ঞ ও বহুদর্শী, দেশ ও জাতি-হিতৈষী সৎ লোককে কেবল এজন্যে অপসারণ বা পদচ্যুত করা যে, ইতিপূর্বে তার শাসনামলের তিন বা পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে—চরম বোকামী বৈ কিছুই নয়। মুসলমানদের খলীফা প্রকৃতপক্ষে তাদের খাদিম, প্রহরী ও আমানতদার। তিনি যদি তাঁর দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে যেতে পারেন তাহলে কেন অযথা তাঁকে অপসারিত করতে যাবো এবং নবাগত অপর একজনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ঝামেলায় পড়তে যাবো? মুসলমানরা তাদের খলীফার দ্বারা আইন প্রণয়ন করায় না। মুসলমানরা আপন অর্থে খলীফাকে আয়াসে লিপ্ত হবার সুযোগও দিতে চায় না। মুসলমানদের খলীফা একটি অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ এবং ন্যায়সঙ্গত পদ্ধতিতে আমীর-উমরা তথা ধনাঢ্য ব্যক্তিদের নিকট থেকে প্রয়োজন অনুসারে ধনসম্পদ উশুল করে গরীর-মিসকীন, ইয়াতীম-অনাথদের ভরণ-পোষণে তা ব্যয় করবেন। মুসলমানদের রাজকোষের সমস্ত অর্থ মুসলিম জনগণের যৌথ মালিকানাধীন আর তা তাদের কল্যাণেই ব্যয়িত হবে। খলীফা বা সুলতানের এটা ব্যক্তিগত মালিকানা নয় যে, তিনি যথেচ্ছভাবে তা ব্যয় করতে পারবেন। মুসলিম শাসন ব্যবস্থায় যেহেতু ধনাঢ্য ব্যক্তিদের নিকট থেকে একটি সঙ্গত হারে কর উশুল করা হয় এবং তা অভাবীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়, তাই এখানে পুঁজিপতি ও শ্রমিকের দ্বন্দ্ব সৃষ্টিই হতে পারে না—যা গোটা প্রাশ্চাত্যকে আজ গ্রাস করে রেখেছে।

মুসলমানদের খলীফা একাধারে তাদের প্রহরী ও অভিভাবক। তিনি মুসলিম জনতার পিতাও, আবার পীর বা উস্তাদও। মুসলমানদের খলীফা একাধারে তাদের গৃহশিক্ষক এবং সিপাহ্সালারও। তিনি তাদের সেবক, আবার শাহানশাহ্ও। যদি কোন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা দেখা দেয়, যেমন কোন দেশ আক্রমণের বা কোন জাতির সাথে যুদ্ধের প্রয়োজন দেখা দেয়, কোন জাতির সাথে সন্ধি করতে হয়, কারো সাহায্যার্থে সৈন্যবাহিনী প্রেরণের প্রয়োজন দেখা দেয়, মুসলমানদের প্রতিরক্ষা এবং দেশের নিরাপত্তার জন্যে কি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে এমন প্রশ্ন দেখা দেয় তবে মুসলমানদের খলীফা অবশ্যই তাদের সাথে পরামর্শ করবেন। কেননা কুরআনুল

কারীমে এরই নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু এ পরামর্শের উদ্দেশ্য এই নয় যে, সাধারণ মানুষ তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে খলীফার বা রাষ্ট্রপ্রধানের সিদ্ধান্তকে অচল করে দেবে এবং তাঁকে তাঁর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য করবে, বরং এ পরামর্শের উদ্দেশ্য হবে, খলীফা যেন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে তাদের সাহায্য লাভ করতে পারেন। অর্থাৎ খলীফা সকলের মতামত শুনবেন এবং পক্ষ-বিপক্ষের দলীল-প্রমাণ সম্পর্কে অবহিত হবেন এবং অবশেষে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে সে অনুযায়ী কার্যক্রম শুরু করে দেবেন।

وشاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوكل على الله .

এবং তাদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারসমূহে পরামর্শ করবে এবং যখন কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হবে, তখন আল্লাহর উপর নির্ভর করে কার্যক্রম শুরু করে দেবে।

ইসলাম উপরিউক্ত রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করার পক্ষপাতী। খিলাফতে রাশিদায় তাঁরই নমুনা প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে। খিলাফতে রাশিদার পর মুসলমানদের শাসন-ব্যবস্থা রাজতন্ত্রে পর্যবসিত হয়, কিন্তু এতদসত্ত্বেও ইসলামের শিক্ষার সৌন্দর্য এবং ইসলামী চরিত্রের প্রতিফলন অধিকাংশ রাষ্ট্রে এবং রাজবংশে সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়েছে এবং সামগ্রিকভাবে মুসলমানরা যে সুন্দর রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম করেছে অন্যত্র তা পরিদৃষ্ট হয় না। ইউরোপ আমেরিকার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা কস্মিনকালেও ইসলামের এ রাষ্ট্র ব্যবস্থার মুকাবিলা করতে পারবে না।

যেখান থেকে শুরু

সাধারণত মুসলমান ঐতিহাসিকগণ ইসলামের ইতিহাস প্রণয়নে আদম আলায়হিস্ সালাম থেকে বরং কেউ কেউ পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে লিখতে শুরু করেছেন। আমি আমার ইতিহাস হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম থেকে শুরু করছি। কেননা, হুযূর (সা)-এর পূর্বেকার ইতিহাস সর্বতোভাবে সন্দেহমুক্ত নয়। তাঁর যুগের পূর্বে পৃথিবীতে ইতিহাস রচনার তেমন কোন ব্যবস্থা ছিলো না। সাধারণত নবী করীম (সা) থেকেই ইসলামের ইতিহাসের সূচনা বলে ধরা হয়। কেননা, সাধারণ্যে হুযূর (সা)-কেই ইসলামের প্রবর্তক বলে মনে করা হয়ে থাকে এবং তাঁরই অনুসারীদেরকে মুসলমান বলা হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর আদি মানব হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের সময় থেকেই-ইসলাম দুনিয়াতে মওজুদ রয়েছে এবং এভাবেই চলেও আসছে।

ইতিহাস ও ভূগোলের পারস্পরিক সম্পর্ক

ইতিহাসের সাথে নিঃসন্দেহে ভূগোলের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। তাই সাম্প্রতিক কালে ইউরোপীয়ান ঐতিহাসিকদের অনুসরণে যেসব ইতিহাসগ্রন্থ লিখিত হয়েছে সেগুলোতে ইতিহাসের সাথে ভূগোলও জুড়ে দেয়া হয়েছে। হুযূর (সা)-এর সীরাত রচয়িতাগণও আরবদেশের ভূগোলের ব্যাখ্যা প্রদান প্রতিপাদ্য বিষয়ের বুঝবার সুবিধার্থে সন্নিবেশিত করাকে জরুরী জ্ঞান করে থাকেন। কিন্তু আমি যেহেতু ইসলামের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখতে মনস্থ করেছি তাই ভাবলাম আমি যদি এর সাথে ভূগোলও জুড়ে দেই তাহলে গোটা বিশ্বের ভূগোলই তাতে সন্নিবেশিত করতে হবে। কেননা, মুসলমান এবং তাদের রাজত্ব প্রায় গোটা বিশ্বের সাথে সম্পর্কিত। সংক্ষেপে তা গ্রন্থবদ্ধ করা সুকঠিন ব্যাপার। তাই আমাকে এ সুধারণারই আশ্রয় নিতে হয়েছে যে, এ গ্রন্থের পাঠক নিশ্চয়ই ভূগোল সম্পর্কে সম্যক ওয়াবিফহাল এবং পৃথিবীর

বিভিন্ন দেশের মানচিত্র নিশ্চয়ই তাঁদের হাতের কাছে মওজুদ আছে বা তাঁরা তা জোগাড় করে নিতে পারবেন। তবুও ইচ্ছা আছে স্থানে স্থানে কোন কোন দেশ ও প্রদেশের মানচিত্র সন্নিবেশিত করে দেব। জাহিলিয়াতের যুগ, আরবের বিভিন্ন জাতি, যেমন কুরায়শ, জাহিলিয়া যুগের প্রথা-পদ্ধতি প্রভৃতি ব্যাপারও এ গ্রন্থে ততো বিস্তারিত আলোচিত হবে না।

হুযূর (সা)-এর জীবনী প্রণয়নে আমি সর্বাধিক নির্ভর করেছি হাদীসের প্রখ্যাত ছয়খানি গ্রন্থ সিহাহ্ সিত্তাহ্র উপর। হাদীসের কিতাবসমূহকে এ ব্যাপারে ইতিহাস গ্রন্থসমূহের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। ইতিহাস গ্রন্থসমূহের মধ্যে তারীখে তাবারী, তারীখুল কামিল, ইব্‌ন আসীর, তারীখে মাসউদী, তারীখে ইব্‌ন খালদূন, তারীখুল খুলাফা, সুয়ূতী প্রভৃতি গ্রন্থের মধ্যে সাধারণভাবে যা বিবৃত হয়েছে তা-ই লিপিবদ্ধ করেছি এবং এভাবে ইতিহাসের সর্বোত্তম সারবস্তু লিখে দিয়েছি। আব্বাসী খিলাফতের দুর্বলতা ও পতনের সূচনাতে যেসব দেশে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হয়েছে, সেসবের পৃথক পৃথকভাবে সমসাময়িক যুগের ঐতিহাসিকদের গ্রন্থাদি থেকে লিখে দিয়েছি। কোন কোন স্থানে খ্রিস্টান ঐতিহাসিকদের বরাতও দিয়েছি এবং তাদের হুবহু পাঠও উদ্ধৃত করে দিয়েছি। কিন্তু তা' কেবল প্রতিপাদ্য বিষয়ের সত্যতা প্রতিপন্ন করার জন্যে সাক্ষ্য স্বরূপই উদ্ধৃত করেছি। সাধারণভাবে আমার বিশ্বাস, খ্রিস্টান ঐতিহাসিকদের লিখিত ইতিহাস গ্রন্থাদি মুসলমান ঐতিহাসিকদের গ্রন্থাদির তুলনায় নেহাতই মামুলী ও ভাসাভাসা ধরনের। আমাদেরকে প্রকৃত সত্য উদ্ধারের এবং মনের সান্ত্বনা খোঁজার জন্যে তাদের দিকে তাকানো আদৌ উচিত হবে না। কেননা, খ্রিস্টান ঐতিহাসিক মাত্রই রিওয়ায়াত বা বর্ণনার বিশুদ্ধতার ব্যাপারে অত্যন্ত বেপরোয়া এবং সীমাহীন অসতর্ক প্রতিপন্ন হয়েছেন। অপরদিকে তাঁরা সমস্ত মেধা ও যোগ্যতাকে সিদ্ধান্ত প্রদানে ব্যয়িত করে ইতিহাসকে উপন্যাস ও কল্পকাহিনীতে পর্যবসিত করতেই ব্যস্ত থাকেন। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ আল্লাহ্র ফযলে এ প্রবণতা থেকে অনেকাংশেই মুক্ত। আর এজন্যেই তাঁরা বিশ্বস্ত সাক্ষ্যের মত আমাদেরকে অনেকটা সহায়তা প্রদান করতে পারেন।

এ ইতিহাস গ্রন্থখানি দ্বারা মুসলিম পাঠকগণ কিভাবে উপকৃত হবেন এবং এতে কোন্ কোন্ অংশ একটু মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করতে হবে এবম্বিধ অনেক জরুরী ব্যাপারে পাঠক ধারণা অর্জন করতে পারবেন, যা পুস্তকটির উপসংহারে লিপিবদ্ধ করার ইচ্ছা রইলো। আল্লাহ্ই তাওফীক দাতা।

প্রথম অধ্যায়
আরব দেশ

আরবের একটা মোটামুটি আলোচনা সর্বপ্রথমে এ জন্যই আবশ্যক যে, আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) এই আরবেরই প্রসিদ্ধ মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং অপর বিখ্যাত নগরী মদীনাতে হিজরত করেন এবং তা-ই হয় শেষ পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্রের আদি রাজধানী। আরবই সেই দেশ যার প্রায় সকল অধিবাসীই প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জীবদ্দশায়ই ইসলাম গ্রহণ করেন। এই সে আরব-যেখানে সর্বপ্রথম ইসলামের বিজয় কেতন উড়েছিল। এই আরবের ভাষাতেই পূর্ণাঙ্গ ওয়াহী এবং সর্বশেষ আসমানী কিতাব অবতীর্ণ হয়—যা' দেশ, জাতি ও ভাষা নির্বিশেষে সকলের কিয়ামত পর্যন্ত কালের জন্য পূর্ণাঙ্গ দিক-দিশারী। এই আরবের মাটি থেকে পৃথিবীর দশ দিগন্ত ইসলামের আলো বিচ্ছুরিত হয়েছে। এ দেশেই রয়েছে পবিত্র কা'বা ঘর—পৃথিবীর প্রতিটি দেশ থেকে প্রতিবছর মুসলমানরা যেখানে ছুটে আসে দলে দলে, আরাফাতের ময়দানে সকলে মিলে আল্লাহ্ তা'আলার স্তুতি ও মুনাজাতে নিমগ্ন হয়। সেখানে রাজা-প্রজা ও আমীর-ফকীর সকলেরই একই বেশ, একই অবস্থা। আসমান যমীনের স্রষ্টার মহিমা ও আধিপত্যই সকলের মনমগজকে আচ্ছন্ন করে রাখে। এই সে আরব—যা গোটা বিশ্বের উপর আধিপত্য বিস্তার করে এর গোটা বিশ্বের জন্যে দিক-দিশারী ও হিদায়াতের দীপ্ত শিখা প্রতিপন্ন হয়।

অবস্থান ও ভূপ্রকৃতি

এশিয়ার মানচিত্রে দক্ষিণ দিকে ভারতবর্ষের পশ্চিম দিকে একটি বিশাল আয়তক্ষেত্রের মত উপদ্বীপ চোখে পড়ে। এরই নাম জাযীরাতুল আরব—আরব উপদ্বীপ বা আরব দেশ।

দেশটির পূর্বে পারস্য উপসাগর ও ওমান উপসাগর, দক্ষিণে আরব সাগর ও ভারত মহাসগর, পশ্চিমে লোহিত সাগর ও সুয়েজখাল, উত্তরে সিরিয়া।

আরব দেশের আয়তন বার-তের লক্ষ বর্গমাইল যার মধ্যে পাঁচ লাখ বর্গমাইল কেবল ঊষর মরু অঞ্চল যেখানে কোনো বসতি নেই। সর্বাধিক খ্যাত মরুভূমিটি আল রাবউল খালী বা আল-দাহ্না' নামে পরিচিত। এর আয়তন আড়াই লাখ বর্গমাইল। এ বিশাল মরুভূমির উত্তরে বাহ্রায়নের আল-হাসায়া প্রদেশ। রাবউল খালীর দক্ষিণ-পূর্বে ওমান প্রদেশ। এর রাজধানী ও সর্বাধিক বিখ্যাত শহর হচ্ছে মাস্কট। এ প্রদেশটি ওমান উপসাগরের তীরে অবস্থিত। রাবউল খালীর দক্ষিণ-পূর্বে হাদরামাউত ও মাহ্রা প্রদেশ অবস্থিত। এগুলো আরব সাগর ও ভারত মহাসাগরের উপকূলবর্তী এলাকা। রাবউল খালীর দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রসিদ্ধ ইয়ামান প্রদেশ অবস্থিত। এ প্রদেশটির সর্বাধিক বিখ্যাত শহর হচ্ছে সাফার। এ প্রদেশটি ভারত মহাসাগর ও লোহিত সাগরের কূল ঘেঁষে অবস্থিত। এডেন ও হাদীদা বন্দর এ প্রদেশেই অবস্থিত। রাবউল খালীর

পশ্চিমে এবং ইয়ামার উত্তরে নাজরান প্রদেশ অবস্থিত। লোহিত সাগরের কূল ঘেঁষে এ প্রদেশটির অবস্থান। ইসলামের অভ্যুদয় কালে এ প্রদেশটি ছিলো গোটা আরব দেশে খ্রিস্টানদের পাদপীঠ। রাবউল খালীর পশ্চিমে এবং নাজরানের উত্তরে আসীর প্রদেশ—যা লোহিত সাগরের উপকূলে অবস্থিত। নাজরান এবং আসীর প্রদেশদ্বয় ইয়ামানের অংশ হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে। আসীরের উত্তরে লোহিত সাগরের কূলে একটি ছোট এলাকা হচ্ছে তিহামা—যা হিজাযের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ তা হিজাযের দক্ষিণাংশ বলে গণ্য হয়ে থাকে। রাবউল খালীর উত্তরে বর্গাকৃতির বিশাল নজ্‌দ প্রদেশ অবস্থিত। এর পূর্বে বাহরায়ন প্রদেশ, পশ্চিমে হিজায প্রদেশ এবং উত্তরে সিরিয়া মরুভূমি অবস্থিত। নজদের দক্ষিণ-পূর্ব অংশের নাম হচ্ছে ইয়ামামা। নজদের পূর্বে এবং লোহিত সাগরের পশ্চিমে হিজায প্রদেশ অবস্থিত। মক্কা, মদীনা এবং জিদ্দা ও ইয়াম্বু বন্দরদ্বয় এই প্রদেশে অবস্থিত। হিজাযের পশ্চিমে এবং নজদের দক্ষিণ-পূর্বে একটি ছোট এলাকা হচ্ছে খায়বার। সিরিয়া, হিজায ও নজদের মধ্যবর্তী একটা এলাকা হচ্ছে হজ্‌র। রাবউল খালীর মধ্যে হাদরামাউত ও ইয়ামামার মধ্যে আল-আহকাফ হচ্ছে একটি প্রসিদ্ধ অনাবাদী ভূমি—যা' একদা আরব জাতির বাসস্থান ছিল। মানচিত্রে উপরিউক্ত স্থানসমূহের দিকে নযর বুলালে আরব দেশের প্রদেশসমূহ ও মশহুর এলাকাসমূহ সম্পর্কে সঠিক ধারণা জন্মে।

আবহাওয়া ও অধিবাসী

আরব দেশে কোন প্রসিদ্ধ বা উল্লেখযোগ্য নদ-নদী নেই। প্রায় গোটা দেশটাই ঊষর মরু ও অনুর্বর ভূমি নিয়ে গঠিত। সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকাসমূহে কিছু কিছু তরুলতা ও মানুষের বসবাস পরিলক্ষিত হয়। পানিশূন্যতা দেশটির মধ্যবর্তী এলাকাসমূহকে মানুষ বসবাসের অনুপযোগী এবং জীবন যাপন দুর্বিষহ রেখেছে। সমস্ত জনপদ সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকাসমূহে অবস্থিত। কেবল নজদের বিশাল প্রদেশটিই এর ব্যতিক্রম—যা রাবউল খালীর উত্তরে দেশের অভ্যন্তরভাগে অবস্থিত। নজ্‌দ হচ্ছে একটি মালভূমি -যাতে বিশালায়তন মরুভূমিসমূহও রয়েছে। নজদের এ মরুভূমিসমূহ একেবারে সিরিয়ার বিশাল মরুভূমিসমূহে গিয়ে মিশেছে। আরব দেশে স্থানে স্থানে পর্বতমালাও রয়েছে। কিন্তু তার একটিতেও তরুলতা নেই। লোহিত সাগরের উপকূলবর্তী ইয়ামান ও হিজায প্রদেশদ্বয় অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অধিকতর শস্য-শ্যামল। সমগ্র আরব দেশের মোট জনসংখ্যা সোয়াকোটি বলা হয়ে থাকে। অন্য কথায় দেশটির প্রতি বর্গমাইলে মাত্র দশজন লোকের বসবাস। রৌদ্রের প্রখরতা খুব বেশি। এত প্রচণ্ড লু-হাওয়া দেশটির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় যে, এ হাওয়াকে সাইমুম বা বিষাক্ত বায়ু বলা হয়ে থাকে। মানুষ তো মানুষ, মরু হাওয়া যে প্রাণীটির একান্তই গা সওয়া সেই উটও এ হাওয়ার সম্মুখে তিষ্ঠাতে পারে না। লু-হাওয়ার এক ঝটকাতেই উট প্রাণ হারায়। উট সেখানে অত্যন্ত উপকারী পশু। শত শত মাইলের মধ্যে পথিকরা পানির নাম নিশানা পর্যন্ত পায় না। উট হচ্ছে মরুভূমির জাহাজ। এর পিঠে চড়েই বড় বড় সফর করতে হয়। খেজুর ছাড়া অন্য কোন উল্লেখযোগ্য ফসলও হয় না। সে দেশের অধিবাসীরা উটের দুধ ও খেজুর খেয়েই জীবন ধারণ করে। অধিবাসীদের এক বিরাট অংশ যাযাবর জীবন যাপন করে। এজন্যে দেশটিতে বড় বড় শহরের সংখ্যা নগণ্য। কবি হালী দেশটির চিত্র অংকন করেছেন এভাবে :

এক উপদ্বীপ ছাড়া আরব কিছুই ছিলো না তো
কোনো দেশের সঙ্গে তার সংযোগ ছিলো না তো

কারো উপর ছিলো না যে তার শাসন-অধিকার-
সাধ্যও ছিলো না কারো তাকে শাসন করবার
তমুদ্দুনের কোনো ছায়া তখনো তাতে পড়েনি
প্রগতির পদচিহ্ন একটুও তাতে পড়েনি।
ছিলো না তার আবহাওয়াতে প্রাণের কোনো রেশ
হয়নি তাই সেখানটাতে সবুজের উন্মেষ
ছিলো না সেখানে এমন কোনো পাত্র গুণাধার
পারতো ঘটাতে হৃদয় মাঝে বিকাশ প্রতিভার
উষর মরু প্রান্তরে নেই শ্যামল পেলবতা
নেই বৃষ্টি অঝর ধারায় নেই নদী বহতা
দেশ ভরা কঙ্কর মাটি-বহে আগুন হাওয়া
লু-ঝড়ে অতিষ্ঠ জীবন যায় না কিছু পাওয়া
পাহাড় টিলায় দেশটি ভরা বিজন বিয়াবান
খেজুর বনের সমারোহ আছে নেই তাতে প্রাণ
খেত-খামারের চিহ্ন নেই, নেই শস্যের লেশ
সব মিলিয়ে এই তো ছিলো সেদিন আরব দেশ।

পুস্তকের কলেবর আরবের ভৌগোলিক বিবরণ সম্পর্কে আর অধিক লেখার অনুকূলে নয় বিধায় এখানেই এ প্রসঙ্গের ইতি টানছি।

আরবের প্রাচীন অধিবাসী

আরবদেশে প্রাচীনকাল থেকেই হযরত নূহ আলায়হিস সালামের পুত্র সামের বংশধরদের বাস ছিল। কাল হিসাবে ঐতিহাসিকগণ আরবের অধিবাসীদেরকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। ১. আরবে বায়িদা, ২. আরবে আরিবা ও ৩. আরবে মুস্‌তারিবা।

আরবে বায়িদা বলতে সেসব জাতির লোকজনকে বোঝায় যারা প্রাচীনকালে আরবের আদি অধিবাসী ছিল। তাদের সকলেই ধ্বংস হয়ে গেছে। তাদের কোন বংশধর পৃথিবীতে আর অবশিষ্ট নেই। অনেকে আরবে আরিবা ও আরবে মুস্তারিবা এ উভয় গোষ্ঠীকে একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলে অভিহিত করে এদের সম্মিলিত নাম দিয়েছেন আরবে বাকিয়া। তাঁদের মতে আরবের অধিবাসীরা দুই শ্রেণীভুক্ত : ১. আরবে বায়িদা ও ২. আরবে বাকিয়া।

আরবে বাকিয়া হচ্ছে তারা যারা এখনো আরব দেশে বাস করছে। তাদেরও দু'টি শ্রেণী, তারা 'আরিবা ও মুস্‌তারিবা নামে অভিহিত। কেউ কেউ আরববাসীদেরকে চার শ্রেণীতে ভাগ করেছেন : ১. আরবে বায়দা বা আরবে আরিবা, ২. আরবে মুস্‌তারিবা, ৩. আরবে তাবিয়া ও ৪. আরবে মুস্‌তা'জিমা।

আরবে বায়িদা

আরবে বায়িদা হচ্ছে ঐসব প্রাচীন অধিবাসী যাদের গোত্রগুলোর নাম হচ্ছে 'আদ, ছামূদ্ আবীল, আমালিকা, তাসাম, জাদীস, উমায়ম, জুরহাম, হাদরামাউত, হাযুর, আবদে যাখাম প্রভৃতি। এরা সকলেই হযরত নূহের পৌত্র লায ইব্‌ন সামের বংশধর ছিল। গোটা আরব

উপদ্বীপে তাদের রাজত্ব ছিল। এদের কোন কোন নৃপতি মিসর পর্যন্ত জয় করেছিলেন। এদের বিশদ বিবরণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। তবে নজদ, আহ্‌কাফ, হাদরামাউত ও ইয়ামানে এমন প্রাচীন তাদের ইমারতসমূহ, প্রত্নতত্ত্ব, পাথর স্তম্ভ, অলংকারাদি ও কাটা প্রস্তরাদি পাওয়া যায় যদ্দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তাদের যুগে তারা অত্যন্ত শৌর্যবীর্যের অধিকারী ছিল। এদের মধ্যে 'আদ গোত্রটি ছিল অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। এরা আহ্‌কাফ সমতলে বসবাস করতো। সামের প্রপৌত্র 'আদ ইব্‌ন আউস ইব্‌ন ইরাম ছিলেন এদের প্রথম নৃপতি—যার নামে গোটা গোত্রটি খ্যতিলাভ করে। তার ছিল তিন পুত্র : ১. শাদ্দাদ, ২. শাদীদ ও ৩. ইরাম। এরা একের পর এক রাজ্যর অধিকারী হন। আল্লামা যামাখশারী এই শাদ্দাস ইব্‌ন 'আদ সম্পর্কে লিখেন যে, সেই আদন মরুভূমিতে ইরাম নগরীর পত্তন করেছিল। কিন্তু তার কোন নিদর্শনই এখন আর অবশিষ্ট নেই। কুরআন শরীফেও ইরামের উল্লেখ আছে, কিন্তু তা' আরাম নগরী বা ইরাম বাগিচা নয়, তা হচ্ছে ইরাম গোত্র।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন—

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ . اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِىْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِى الْبِلَادِ .

তুমি কী দেখনি তোমার রব 'আদ-ইরামের লোকদের সাথে কি আচরণ করেছেন-যাদের শারীরিক গঠন অবয়ব ও শক্তি-সামর্থ্য এমনি অদ্বিতীয় ছিলো যে, পৃথিবীর অন্য কোন জনপদে এমনটি সৃষ্টি করা হয়নি। (৮৯ : ৬-৮)

ঐতিহাসিক মাসউদী লিখেন : 'আদের পূর্বে তার পিতা 'আসও বাদশাহ ছিল। এ বংশেরই জনৈক নৃপতি জীরূন ইব্‌ন সাআদ ইব্‌ন 'আদ ইব্‌ন আওস দামেশ্‌ক বিজয় করে মর্মর পাথর এবং অন্যান্য বহু মূল্যবান পাথর দিয়ে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেছিল যার নামকরণ সে করেছিল ইরাম। ইব্‌ন আসাকিরও তাঁর তারীখে দামিশ্‌ক বা দামেশ্‌কের ইতিহাস গ্রন্থে জীরূনের উল্লেখ করেছেন। হযরত হূদ আলায়হিস সালাম যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ঐ 'আদ জাতির প্রতি নবীরূপে আবির্ভূত হন তখন তারা তাঁর অবাধ্যতা করে আল্লাহ্‌র আযাবে ধ্বংস হয়। এর বিস্তারিত বর্ণনা কুরআন শরীফে রয়েছে। 'আদের পর আবীল আমালিকা, ছামুদ, আবদে যাখাম প্রভৃতি কবীলা রাজত্ব করে। অবশেষে ইয়ারিব ইব্‌ন কাহ্‌তান এদেরকে উৎখাত করে নতুন এক যুগের সূচনা করেন। ছামূদ গোত্র বা ছামূদ জাতির প্রতি নবী হয়ে আসেন হযরত সালিহ্ আলায়হিস্ সালাম। ছামূদ জাতির বাস ছিল হাজ্‌র এলাকায়। তাসাম এবং জাদীস কবীলাদ্বয়ের বাস ছিল ইয়ামামায়, আমালিকারা বাস করতো তিহামায়। জুরহাম গোত্র থাকতো ইয়ামানে। ইতিহাসে বলা হয়েছে যে, আরবের সকল গোত্রই হযরত নূহ্ (আ)-এর পুত্র সামের বংশধর। তাই এ গোত্রগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক সুস্পষ্টভাবে অনুধাবনের জন্যে ৫৪ নং পৃষ্ঠায় এদের বংশপঞ্জির রেখা সন্নিবেশিত হলো :

আরবে 'আরিবা

এরা কাহ্‌তানের বংশধর বলে গণ্য হন। কাহ্‌তানের পূর্ববর্তী নূহ (আ) পর্যন্ত এ বংশের কেউই আরবী ভাষী ছিলেন না। কাহ্‌তানের অধঃস্তন বংশধররাই সর্বপ্রথম আরবী ভাষায় কথা

বলতে শুরু করেন। আর এ ভাষা তারা শিখেছিলেন আরবে বায়িদা থেকে। কাহ্তানের বংশধররা দু'ভাগে বিভক্ত : ১. ইয়ামিনিয়া ও ২. সাবাইয়া।

কাহ্তানের বংশপঞ্জি নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে অনেক মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন ইনি আবির ইব্ন শালিখ ইব্ন আরাফাখশাদ ইব্ন সাম ইব্ন নূহ-এর পুত্র এবং ফালিগ ও ইয়াকতানের ভাই ছিলেন। কিন্তু তাওরাতে তার কোন উল্লেখ নেই। অবশ্য ফালিগ ও ইয়াকতানের উল্লেখ তাওরাতে রয়েছে। কারো কারো ধারণা কাহ্তান ইয়াকতানেরই আরবী রূপ। অন্য কথায় যাকে ইয়াকতান বলা হযেছে তিনিই কাহ্তান। কারো কারো ধারণা, ইয়ামান ইব্ন কীদার ইব্ন ইসমাঈল (আ)-এর পুত্র ছিলেন কাহ্তান। ইব্ন হিশাম বলেন, ইয়ারিব ইব্ন কাহ্তানকে ইয়ামানও বলা হতো এবং তাঁরই নামানুসার ইয়ামান দেশের নামকরণ করা হয়েছে। কাহ্তান যদি ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর সাব্যস্ত হন, তাহলে গোটা আরবের অধিবাসীরা ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর প্রতিপন্ন হন। কেননা, আদনান এবং কাহ্তান এ দু'জনই আরব জাতির আদি বংশধর। কিন্তু গবেষণা দ্বারা প্রতীয়মান হয় এবং এটা অধিকতর গ্রহণযোগ্য অভিমত যে, কাহ্তান এবং ইয়াকতান অভিন্ন ব্যক্তি। আর কাহ্তান ইসমাঈল বংশীয় নয়। আরব দেশে আরিবা বা কাহ্তানী বংশের বেশ কয়েকজন বড় বড় বাদশাহ্ হয়েছেন-গোটা আরব উপদ্বীপ জুড়ে যাদের রাজত্ব ছিল। কাহ্তানের পুত্র ইয়ারিব আরবে বায়িদার শেষ চিহ্নটুকু পর্যন্ত বিলুপ্ত করে দেন এবং তাদের গোটা বংশকে নিশ্চিহ্ন করে দেন। বনী কাহ্তানের সংক্ষিপ্ত কুলপঞ্জি ৫১ নং পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত করা হলো।

সামের বংশ তালিকা

হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম
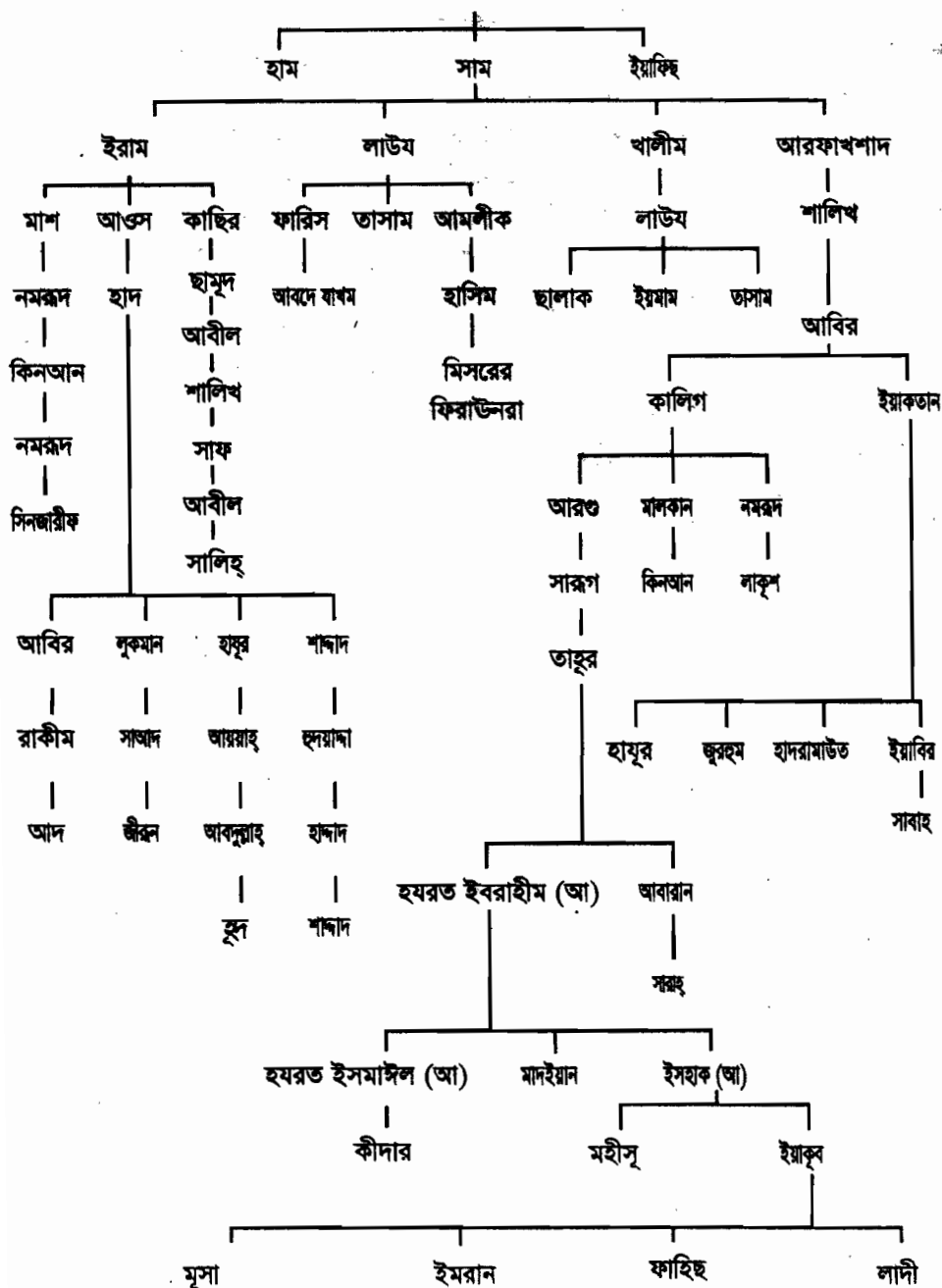
বনী কাহ্তানের সংক্ষিপ্ত কুলপঞ্জী নিম্নরূপ
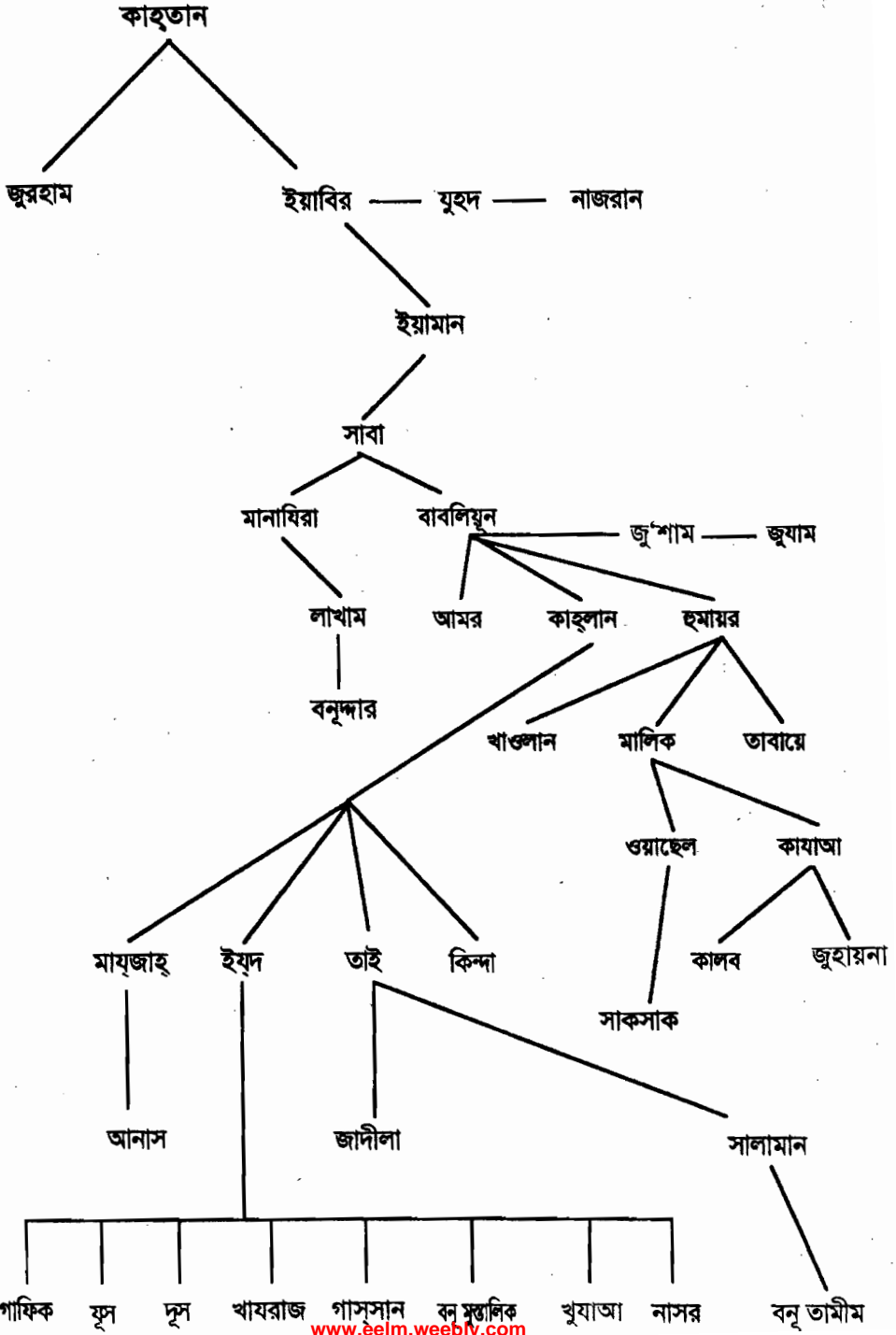
কাহ্তানী গোত্রসমূহের কেন্দ্রভূমি বা আদি নিবাস ইয়ামান ছিল বলে ধারণা করা হয়ে থাকে। এদের মধ্যে হিময়ারী ও ইযদী গোত্র অত্যন্ত বিখ্যাত বলে গণ্য হতো। সাবা শহর এবং দক্ষিণ আরবে ইযদীদের রাজত্ব ছিল। ইয়ামান দেশের সমৃদ্ধি সাধনে এরা অত্যন্ত তৎপর ছিলেন। সুলায়মান আলায়হিস্ সালামের সমসাময়িক বিলকীস রানী এদেরই বংশের লোক ছিলেন। ইয়ামান ও হাদরামাউতের শাসক মালকূক তাবাইয়াও এদেরই লোক ছিলেন। ইযদের একটি গোত্র মদীনায় এসে বসবাস শুরু করে এবং সেখানে তাদের রাজত্ব গড়ে তোলে। খোযাআ গোত্রীয়রা মক্কার দিকে মনোনিবেশ করে এবং সেখানে পূর্ব থেকে রাজত্বকারী জুরহাম গোত্রকে পরাভূত করে। ইযদের পুত্র নাসর তিহামা অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। খোযাআর এক পুত্র ইমরান ওমানে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। তার বংশধর ইযদে ওমান নামে খ্যাতি লাভ করে। তার অপর পুত্র গাস্সান সিরিয়া সীমান্তে গিয়ে বসতি স্থাপন করে এবং সীমান্তবর্তী কবীলাসমূহকে পরাস্ত করে সেখানে স্বীয় রাজত্ব গড়ে তোলে। ইয়ামান কাহ্তানী বাদশাহদের রাজত্ব ঈসায়ী সপ্তম শতক পর্যন্ত কায়েম ছিল। গাস্সানের কাহ্তানী রাজত্বের সীমা রোমান সাম্রাজ্যের সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অপর দিকে হীরার কাহ্তানী রাজ্য পারস্য সাম্রাজ্যের প্রতিবেশী ছিল। ইসলামের আবির্ভাবকালে কাহ্তানী গোত্রগুলো অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল এবং গোটা আরব তারাই দাপটের সাথে শাসন করতো।

আরবে মুস্তাআরিবা

বনু আদনান ও হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর এ নামে পরিচিত। এরা বাহির থেকে এসে আরবে বসতি স্থাপন করেন। এজন্যেই এদেরকে আরবে মুস্তাআরিবা বা মিশ্র আরব নামে অভিহিত করা হয়। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর মাতৃভাষা ছিল আজমী তথা ফার্সী। তিনি যখন তাঁর পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ)-কে তার মা হাজেরাসহ মক্কা মুয়ায্যমায় (হিজাযে) রেখে যায়, তখন তিনি কাহ্তানী গোত্রের শাখা গোত্র জুরহামের নিকট থেকে আরবী ভাষা শিক্ষা করেন। এরা তখন মক্কায় বসত করতো। পরবর্তীকালে এই আরবীই হয় ইসমাঈল বংশীয়দের ভাষা। হযরত ইসমাঈল (আ)-এর পনের বছর বয়ঃক্রমকালে তাঁর মা হাজেরার ইন্তিকাল হয়। মায়ের মৃত্যুর পর হযরত ইসমাঈল (আ) মক্কা থেকে সিরিয়ার দিকে চলে যেতে মনস্থ করেন। কিন্তু জুরহাম গোত্রের লোকজন পরামর্শক্রমে তাঁকে মক্কাত্যাগ থেকে বিরত রাখেন এবং আমালিকা গোত্রের আমারা বিন্ত সাঈদ ইব্ন উসামা ইব্ন আকীলের সাথে তাঁর বিবাহ করিয়ে দেন। কিছু দিন পরেই সেখানে হযরত ইবরাহীম (আ) আগমন করলেন এবং তাঁরই ইঙ্গিতে পুত্র ইসমাঈল তাঁর উক্ত স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেন। তারপর তিনি জুরহাম গোত্রের সাইয়িদা বিন্ত মাদাদ ইব্ন আমরের পাণি গ্রহণ করেন। এ ঘটনার পর আল্লাহ্র নির্দেশক্রমে হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত ইসমাঈল (আ) হযরত আদম (আ)-এর যুগের ভিতের উপর খানা কা'বা নির্মাণের কাজ শুরু করেন, এভাবে যে হযরত ইবরাহীম (আ) গাঁথুনী দিচ্ছিলেন আর হযরত ইসমাঈল (আ) পাথর ও মসলাদি তাঁকে উঠিয়ে দিচ্ছিলেন। উভয়ে তখন এভাবে দু'আ করছিলেন :

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ .

হে আমাদের রব। আমাদের পক্ষ থেকে কবূল করুন! নিঃসন্দেহে আপনি সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন। (২ : ১২৭)

ফলে দেওয়াল কিছুটা উঁচু হলো এবং পুনঃ নির্মাণ কাজ কিছুটা কষ্টকর হয়ে উঠলো। তখন হযরত ইবরাহীম (আ) একটি পাথরের উপর দাঁড়িয়ে কাজ করতে লাগলেন। যে স্থানটিতে দাঁড়িয়ে ইবরাহীম (আ) কাজ করছিলেন, তা-ই মাকামে ইবরাহীম নামে খ্যাত। খানা কা'বা নির্মাণ যখন সমাপ্ত প্রায়, তখন হযরত ইবরাহীম (আ) হযরত ইসমাঈল (আ)-কে বললেন, আচ্ছা একখণ্ড পাথর নিয়ে এসো, যাতে তা মাকামে রুকনের উপর রেখে দিয়ে লোকজনের জন্যে তা চিহ্নিত করে দিতে পারি। তখন হযরত ইসমাঈল (আ) হযরত জিবরাঈল (আ)-এর নির্দেশনা অনুসারে বূ-কুবায়স পাহাড় থেকে হাজরে আসওয়াদ উঠিয়ে নিয়ে আসেন। হযরত ইবরাহীম (আ) তা মাকামে রুকন-এর উপর স্থাপন করে দিলেন। এটাই সেই বিখ্যাত হাজরে আস্ওয়াদ বা কাল পাথর—তাওয়াফের সময় যার চুমু খাওয়া হয়। খানা কা'বা পুনঃ নির্মাণের পর হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত ইসমাঈল (আ)-এর প্রতি যে সমস্ত লোক ঈমান এনেছিল তাদেরকে নিয়ে মিনা ও আরাফাতের মাকামসমূহের দিকে যাত্রা করলেন। তাঁরা কুরবানী করলেন এবং খানা কা'বার তাওয়াফ করলেন। হযরত ইবরাহীম (আ) শাম দেশের দিকে চলে যান এবং যতকাল জীবিত ছিলেন প্রতিবছর খানা কা'বার যিয়ারত ও হজ্জের জন্যে আসতেন। খানা কা'বা পুনঃ নির্মাণের পর হযরত ইবরাহীম (আ) পুত্রকে কুরবানী করার জন্যে আদিষ্ট হয়েছিলেন।

হযরত ইসমাঈল (আ) শেষ জীবন পর্যন্ত মক্কা মুয়ায্যমায়ই বসবাস করেন। বনী জুরহাম কবীলা (এরা জুরহাম সাথী নামে অভিহিত) মক্কা মুয়ায্যমায় এবং আমালিকা কবীলা মক্কার আশেপাশে বসবাস করতো (এরা আরবে বায়িদাভুক্ত আমালিকা নয়)। এ কবীলাদ্বয়ের কিছু লোক হযরত ইসমাঈল (আ)-এর প্রতি ঈমান এনেছিলেন। অনেকে তাদের পূর্বতন কুফরী ও নাস্তিকতায় লিপ্ত ছিল। তাওরাতের বিবরণ অনুযায়ী হযরত ইসমাঈল (আ) একশ' সাঁইত্রিশ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বারজন পুত্র ছিলেন। এঁদের বংশধরদের সংখ্যা এতই বৃদ্ধি পেলো যে মক্কায় তাদের আর স্থান সঙ্কুলান হলো না। তাঁরা গোটা হিজাযে ছড়িয়ে পড়লেন। কাবার রক্ষণাবেক্ষণ ও মক্কার কর্তৃত্ব সর্বদা এঁদেরই হাতে ন্যস্ত ছিল। হযরত ইসমাঈল (আ)-এর পুত্র কীদারের বংশধরদের মধ্যে আদনান নামক এক ব্যক্তির জন্ম হয়। বনী ইসমাঈলের প্রায় প্রত্যেকটি মাশহুর কবীলা এদেরকে নিয়ে গঠিত হয়েছে। এজন্যে আরবে-মুস্তাআরিবা বনী ইসমাঈলকে আলে-আদনান বা আদনানের বংশ বলা হয়ে থাকে। আদনানের পুত্রের নাম মাআদ এবং পৌত্রের নাম নাযার ছিল। নাযারের চার পুত্র থেকেই আদনানী বংশের বিস্তার ঘটে। এ জন্যে আদনানী কবীলাকে মাআদী এবং নাযারীও বলা হয়ে থাকে। ৫৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত বংশপঞ্জি থেকে আদনানী বংশের বিভিন্ন শাখার পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝা যায়।

আদনানী গোত্রসমূহ

আদনানী গোত্রসমূহের মধ্যে আয়াদ, রবীআ ও মুদার গোত্রসমূহ সমধিক বিখ্যাত। এদের মধ্যেও শেষোক্ত দু'টি গোত্রের খ্যাতি বেশী। মানে মর্যাদায় এরা ছিল পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী। মুদারী গোত্রসমূহের অন্যতম গোত্র বনূ কিনানা গোত্রের ফিহ্র ইব্ন মালিকের অপর নাম ছিল কুরায়শ। উক্ত কুরায়শের বংশধরগণের মধ্যে অনেক কবীলার উদ্ভব হয়। এদের মধ্যে বনী সাহম, বনী মাখযুম, বনী হুমাহ্, বনী তায়েফ, বনী আদী, বনী আবদেদার, বনী যুহরা, বনী আবদে মানাফ সমধিক বিখ্যাত। আবদে মানাফের ছিল চার পুত্র, আবদে শামস্, নাওফিল,

মুত্তালিব এবং হাশিম। হাশিমের বংশধরদের মধ্যে আমাদের নবী করীম হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল মুত্তালিব ইব্ন হাশিমের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্বের যাবৎ মুসলমান তাঁরই উম্মত এবং তিনি আখেরী যামানার নবী। এ গ্রন্থে তাঁরই উম্মতের বিবরণ দেয়ার প্রয়াস পেয়েছি। আবদে শামসের পুত্রের নাম ছিল উমাইয়া। বনী উমাইয়ারা তাঁরই বংশধর। আদনানী গোত্রের লোকজন যখন বনী খোযায়ার হাতে পরাস্ত হয়ে মক্কা ছেড়ে যেতে বাধ্য হলো, তখন তারা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়লো। বনী বকর বাহরায়নে, বনী হানীফা ইয়ামামায়, বনী তাগলিব ফোরাত নদীর অববাহিকায়, বনী তামীম আলজাযীরায়, বনী সুলায়ম মদীনার আশেপাশে, বনী ছাকীফ তায়িফে, বনী উর কূফার পশ্চিম পাশে এবং বনী কিনানা তিহামায় গিয়ে বসতি স্থাপন করে। বনী আদনানের কবীলাসমূহের মধ্যে কেবল কুরায়শ গোত্রসমূহই মক্কা ও তার আশেপাশে রয়ে যায়, কিন্তু তাদের মধ্যেও তেমন ঐক্য-সম্প্রীতি ছিল না। এরা ছিল শতধা বিচ্ছিন্ন। কুসাঈ ইব্ন কিলাব এদেরকে ঐক্যবদ্ধ ও সংঘবদ্ধ করে (খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে) এমনি শক্তিশালী করে তোলেন যে, তারা কেবল মক্কায়ই নয়, গোটা হিজাযের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। খানা কা'বার ব্যবস্থাপনা আবার বনী আদনানের করতলগত হয়। কুসাঈ খানা কা'বা মেরামত করে এবং নিজের জন্য একটি মহল নির্মাণ করেন। ঐ মহলের একটি বিশালায়তন কক্ষ সামাজিক পরামর্শ কেন্দ্ররূপে ব্যবহৃত হতো। এ কক্ষটির নাম রাখা হয়েছিল দারুন নাদওয়া। দারুন নাদ্ওয়ায় বসেই কুসাঈ রাজকার্য পরিচালনা করতেন এবং কুরায়শ-সর্দাররা এখানেই পরামর্শের জন্যে জমায়েত হতেন।

কুসাঈ হজ্জের সময় মক্কার তীর্থযাত্রী হাজীদেরকে তিন দিন পর্যন্ত পানাহারে আপ্যায়নেরও ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন এবং এর ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য কুরায়শদের নিকট থেকে চাঁদা সংগ্রহের ব্যবস্থা করেন। মোদ্দাকথা, কুসাঈ মক্কা তথা গোটা হিজাযের দীনী ও দুনিয়াবী কর্তৃত্বের অধিকারী হয়ে বসেন। ৪৮০ খ্রিস্টাব্দে কুসাঈ পরলোকগমন করেন এবং তাঁর পুত্র আবদুদ্দার তাঁর স্থলাভিষিক্তরূপে মক্কার শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। আবদুদ্দারের মৃত্যুর পর তার পৌত্রদের এবং তাঁর ভাই আবদে মানাফের পুত্রদের মধ্যে মক্কার শাসনক্ষমতা নিয়ে গোলযোগের সূত্রপাত হয়। কিন্তু প্রভাবশালী লোকেরা মধ্যস্থতা করে এভাবে এর ফায়সালা করে দেন যে, আবদে মানাফের পুত্র আবদে শাম্স পানি বিতরণ, চাঁদা ও কর উশুল এবং হাজীদের আপ্যায়নের দায়িত্ব পালন করবেন আর আবদে দারের পৌত্রগণ সামরিক ব্যবস্থাপনা, কা'বা ঘরের হিফাযত এবং দারুন্ নাদওয়ার দেখাশোনা করবেন। কিছুদিন পর আবদে মানাফের পুত্র আবদে শাম্স তার অনুজ হাশিমকে তাঁর রাজত্ব ও সমস্ত অধিকার ফিরিয়ে দেন। হাশিম তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্য, ধন-সম্পদ ও বদান্যতার জন্যে মক্কাবাসীদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি কুরায়শদেরকে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য অনুপ্রাণিত করে এবং তার সুযোগ করে দিয়ে তাদের প্রভূত উপকার সাধন করেন।

আদনান
মা'আদ
নাযার
রবীআ'
আনমার
আয়াদ
মুযার
আসাদ
লাজীম
নিসার
দবীআ
সদূস
উজ্‌ল
ইয়াস
কায়েস গায়লান
জাদিলা
আবদে কায়েস
লাহানেজা
মুদরিকা
ওয়ায়েল
বকর
বনূতামীম
আবাব
জুনা
বনূমুযায়না
খাযিয়া
হুযায়ল
আজ্‌ল
আসাদ
হাওন
কিনানা
ছা'লাব
আয়াহ্
বকর
তাগলিবী
সওর
ইয়াতীম
বনূহানীফা
বনূশায়বান
আবদে মানাফ
আমের
নসর
মালিক
বনূ বকর
বনূ তিগার
মালিক
বনূ ফারাস
ফিহ্‌র বা কুরায়শ
হাওয়াযিন
মাযিন
আকীল
আদওয়ান
বনূ কিলাব
সুলায়ম
বাহিলা
গানতান
সাআসা জু'শাম
বনূ সাআদ
বনূ বকর
বনূ ছাকীফ
যুবয়ান
আবস
বনূ আমের
মাযারহ
হিলাল
রাবিআহ্
বনূ নুমায়র
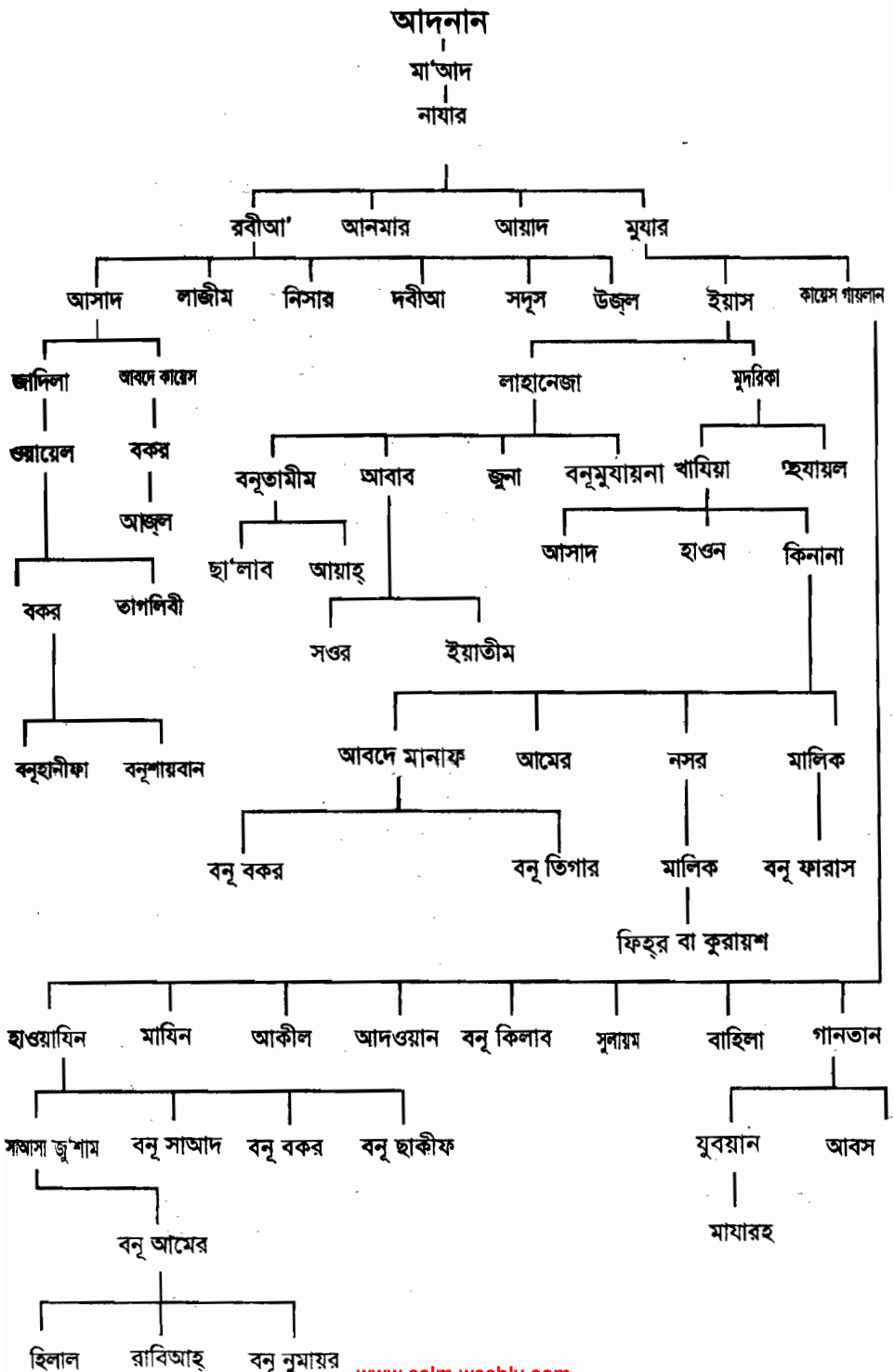
আবদুল মুত্তালিব নামকরণের কারণ

হাশিম মদীনার জনৈক সর্দারের কন্যাকে বিবাহ করেন। তার গর্ভে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। নবজাতকের নাম রাখা হয় শায়বা। শায়বার শৈশবেই তার পিতা হাশিমের মৃত্যু হলে হাশিমের সহোদর মুত্তালিব মক্কার শাসক হন। হাশিমের শিশুপুত্র শায়বা মদীনায় প্রতিপালিত হন। শায়বার যৌবনে পদার্পণের সংবাদ পেয়ে মুত্তালিব তাঁর ভাতিজাকে নিয়ে আসার জন্যে মদীনায় যান। তিনি যখন তাঁর ভাতিজাটিকে নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করলেন, তখন মক্কার লোকে ভাবলো এ যুবকটি বনী মুত্তালিবের গোলাম হবে। মুত্তালিব তাদের এ ভ্রমের কথা অবগত হয়ে লোকজনকে উদ্দেশ্য করে বলেন যে, যুবকটি আমার ভাই হাশিমের পুত্র, আমার ভাতিজা। কিন্তু লোকজন তাকে আবদুল মুত্তালিব বা মুত্তালিবের গোলাম নামেই অভিহিত করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত শায়বা ইব্‌ন হাশিম আবদুল মুত্তালিব নামেই মশহুর হয়ে যান। উন্নত চালচলনে, মানে-মর্যাদায়, দানে বদান্যতায় আবদুল মুত্তালিব নিজেকে তাঁর পিতা হাশিমের সুযোগ্য পুত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু উমাইয়া পুত্র হারবের তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি সহ্য হলো না। তিনিও তাঁর পিতার মত আবদুল মুত্তালিবকে যুদ্ধের জন্য চ্যালেঞ্জ দিয়ে বসলেন। এবারও যথারীতি সালিশ বসলো। সালিশের রায় আবদুল মুত্তালিবের পক্ষেই হলো। এ রায় বনী হাশিম ও বনী উমাইয়ার মধ্যে শত্রুতা বৃদ্ধি করলো। আবদুল মুত্তালিবের সময় হাবশার সৈন্যরা আবরাহা নামক সেনাপতির নেতৃত্বাধীন মক্কা আক্রমণ করে। এ বাহিনীই ইতিহাসে আসহাবুল ফীল বা হস্তীবাহিনী নামে অভিহিত হয়। আল্লাহ্‌র গযব তথা আসমানী আযাবে এ বাহিনী ধ্বংস হয়। কুরায়শদের পারস্পরিক সম্পর্ক ৫৭ নং পৃষ্ঠায় প্রদত্ত বংশপঞ্জি থেকে সুস্পষ্ট বোঝা যাবে।

আবদে মানাফের খান্দান

আবদে মানাফ গোটা আরব দেশে সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত বলে গণ্য হতেন। তার পরে তাঁর পুত্রগণও গোটা আরবে শ্রদ্ধার পাত্র বলে গণ্য হতেন। আবদে মানাফের আসল নাম ছিল মুগীরা। তাকে কমর ও সাইয়্যিদ নামেও অভিহিত করা হতো। যেহেতু তাঁর অপর দুই সহোদরের নামে ছিল আবদে দার ও আবদে উজ্জা, তাই লোকে তাকে আবদে মানাত বলে ডাকতে থাকে।[১] তারপর আবদে মানাত থেকে কালক্রমে তা আবদে মানাফে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

আরবের নৈতিক অবস্থা

পূর্বেই বলা হয়েছে, আরবদেশ প্রাচীনকাল থেকেই সামী খান্দান তথা সেমিটিক জাতির প্রতিপত্তি ছিল। প্রাথমিক যুগে আরবদের তথা আরবে বায়িদার বিবরণ খুব কমই জানা যায়। তাতে এ ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে কিছুই জানা যায় না যে, সমসাময়িকদের বিশ্বের অন্যান্য জাতির তুলনায় আরবে বায়িদার নৈতিক অবস্থা কী ছিলো। তবুও অনুমিত হয় যে, সেকালে গোটা বিশ্বের লোকসংখ্যা যখন মনুষ্য বসতির সংখ্যা ছিলো একান্তই অল্প তখন সকল জাতির অবস্থা প্রায় অভিন্নই ছিলো। বনী ইসমাঈল-এর উন্নতির পূর্বে আরবে বায়িদার পর কাহ্‌তানী

---

১. দার, উজ্জা ও মানাত আরবদের প্রাচীন আমলের মশহুর দেবদেবী। পাশাপাশি এদের নাম উচ্চারিত হতো বলে উক্ত দুই দেবতার পাশাপাশি মানাতের নাম যোগ করে তাকে আবদে মানাত বলা হতো। —অনুবাদক

ফিহ্‌র ইব্‌ন মালিক (কুরায়শ)
গালিব
হারিছ
লুওয়াই
আলখুলজ
(হযরত আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা) এরই বংশধর)
কাআব
হাসীস
(হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) -এর পূব পুরুষ)
'আদী
(হযরত উমর ফারুক (রা) -এর বংশধর)
মুর্‌রা
বনূ মাখযুম
(হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদের বংশ)
ইয়াকতিনা
বনূ তামীম
(এ বংশেই বিবি আমিনা, আবদুর রহমান ইব্‌ন সাআদ এবং সাওদা ইব্‌ন ওয়াক্কাসের জন্ম হয়)।
কিলাব
বনূ যুহ্‌রা
কুসাঈ
আবদে দার
আবদে মানাফ
আবদুল উজ্জা
(বিবি খাদীজা (রা) ও যুবায়র ইব্‌ন আওয়ামের পূর্ব পুরুষ বনূ আসাদ
আবদে শাম্‌স
হাশিম
মুত্তালিব
উমাইয়া
(হযরত আমীরে মু'আবিয়া (রা)-এর পূর্ব পুরুষ)
আবদুল মুত্তালিব
আবূ তালিব
হামযা
আব্বাস
আবদুল্লাহ্
আবূ লাহাব
হারিছ
যুবায়র
আলী
আকীল
জা'ফর
আব্দুল্লাহ
ফযল
হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)

আরবদের যুগে আরবদেশে অনেক রাজ্য ও রাজবংশের অস্তিত্ব ছিল বলে জানা যায়। কিন্তু কোন যুগেই গোটা আরব একই শাসনকর্তার অধীনে ছিল না। এক এক প্রদেশে এক একটি রাজবংশের বা রাজার রাজত্ব ছিল। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ বেশ যশস্বীও হয়েছেন। এতদসত্ত্বেও দেশের অভ্যন্তরে স্বাধীনচেতা বেদুঈন পরিবারসমূহের উটের পিঠে তাঁবু ও গৃহসামগ্রী নিয়ে দূর-দূরান্তে পাড়ি জমাবার দৃশ্যও সাধারণভাবে পরিদৃষ্ট হতো পানি ও শস্য-সামগ্রীর অপর্যাপ্ততা আরবদেরকে আবহমানকাল থেকেই মরুচারী, কষ্ট-সহিষ্ণু যাযাবর জীবনে অভ্যস্ত করে রেখেছে। জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভারের অপর্যাপ্ততা তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতিকে অগ্রসর হতে দেয়নি। ফলে তাদের সমাজ জীবনে তেমন কোন পরিবর্তন বা সংস্কারের ছোঁয়া লাগেনি। বৈচিত্র্যহীন জীবনধারা ও নৈসর্গিক দৃশ্য তাদের জীবনকে একান্তই একঘেয়ে ও দুর্বিষহ করে রেখেছিল। দিগন্ত বিস্তৃত মরুভূমি, উৎপন্নজাত দ্রব্যাদির স্বল্পতা, মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রীর অভাব, জনসংখ্যা ও জনপদের স্বল্পতার দরুন বহির্বিশ্বের কোন দিগ্বিজয়ী শাসক বা বিজেতা জাতি কোন দিন আরব জয়ে প্রলুব্ধ হয়নি। পর্যটক বা বণিকদেরকে আকর্ষণ করার মত কোন সামগ্রীও এ উপদ্বীপে বর্তমান ছিল না। ফলে বহির্বিশ্বের জাতিসমূহের উন্নতি-প্রগতি সম্পর্কে আরবরা সাধারণভাবে অনবহিত ছিল। এজন্যে তারা অন্য কোন জাতির সভ্যতা-সংস্কৃতি ও সমাজব্যবস্থা দ্বারা প্রভাবান্বিতও হয়নি।

কবি হালী যথার্থই তাদের সম্পর্কে লিখেছেন :

نہ وہ غیر قوموں پہ چڑھ کر گیا تھا
نہ اس پر کوئی غیر فرماں روا تھا

অপর জাতির তারা করেনি শাসন
অপরও পায়নি তার শাসক-আসন।

বংশগরিমা

এমতাবস্থায় আরবদের মধ্যে স্বভাবতই দু'টি বস্তুর প্রসার ঘটে। দীর্ঘ অবসর ও রাতের উন্মুক্ত আকাশের নীচে কর্মহীন দীর্ঘ আকাশ তাদের মধ্যে কাব্যচর্চার উন্মেষ ঘটায়। দ্বিতীয়ত, স্বাধিকার রক্ষার অব্যাহত অনুশীলন ও সহিষ্ণুতার অভ্যাস তাদেরকে যুদ্ধবাজ ও কথায় কথায় শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার অভ্যাসে অভ্যস্ত করে তুলেছিল। পারস্পরিক যুদ্ধবিগ্রহকে জিইয়ে রাখার জন্যে তারা আত্মপ্রশংসা ও বংশগৌরব প্রকাশের দিকেও অতিমাত্রায় ঝুঁকে পড়ে। অহমিকা প্রকাশ ও নিজের মাহাত্ম্য প্রকাশের জন্যে বীরত্ব ও বদান্যতা ছিল দু'টি আকর্ষণীয় ব্যাপার। নিষ্ক্রিয়তা ও কাব্যিকতা তাদেরকে প্রেম নিবেদনে এবং তাদের সচ্ছল লোকদেরকে মদ্যপানে উদ্বুদ্ধ করে। বীরত্ব ও বদান্যতা তাদেরকে প্রথম শ্রেণীর অতিথিপরায়ণ এবং প্রতিশ্রুতি রক্ষায় অভ্যস্ত করে সকলের শ্রদ্ধাভাজন করে তোলে। জুয়া, তীরন্দাজী, মুশায়েরা (কবিসভা), বংশমর্যাদার অহমিকা প্রকাশ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রভৃতি ছিলো তাদের চিত্তবিনোদনের মাধ্যম। মোদ্দাকথা, আরবের নিঃসর্গ ও আবহাওয়া মনের অজান্তেই তাদের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত চরিত্র গড়ে তুলেছিলো। আরবে বায়িদার প্রতি হযরত হূদ আলায়হিস সালাম, হযরত সালিহ আলায়হিস সালাম প্রমুখ আম্বিয়ায়ে কিরাম প্রেরিত হন। এসব আম্বিয়ায়ে কিরামের প্রতি আনুগত্য না করায় সেই পর্যায়ের জনগোষ্ঠী উজাড় ও ধ্বংস হয়ে যায়। দ্বিতীয়

পর্যায়ের অর্থাৎ কাহ্তানী আরবদের প্রতিও কতিপয় হিদায়াতকারী প্রেরিত হন। কিন্তু আরববাসীরা খুব কমই তাঁদের কথায় কর্ণপাত করেছে। ফলে পাপাচার, অবাধ্যতার জন্যে বারবার তাদের উপর ধ্বংস নেমে এসেছে। সেদেশের অধিবাসীদের পাপাচার ও বশ্যতাহীন প্রকৃতি তাদেরকে আম্বিয়ায়ে কিরামের শিক্ষা থেকে অনুগৃহীত হতে দেয়নি। হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত ইসমাঈল (আ)-এর প্রতিও দেশের খুব কম সংখ্যক লোকই ঈমান এনেছিলো। তাদের বংশ নিয়ে অহমিকা এবং আত্ম-গৌরবের অভ্যাস ধর্মের ব্যাপারও তাদেরকে তাদের পূর্বপুরুষদের প্রশস্তির দিকে ঠেলে দিয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁদের নামের প্রতিমাপূজায় অভ্যস্ত করে তুলেছিল। যখন কাহ্তানী কবীলাসমূহের প্রতিপত্তি লোপ পাচ্ছিল এবং বনী ইসমাঈল বা আদনানীদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেতে শুরু করে তখন খুযায়া গোত্রের মক্কা আক্রমণ এবং জুরহাম গোত্রের বিপর্যয় আদনানী গোত্রসমূহকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আশ্রয়ের সন্ধানে ছড়িয়ে দিয়ে হিজাযে বনী ইসরাঈলদের ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে সাংঘাতিকভাবে ব্যাহত করে। ফলশ্রুতিতে দেশের প্রতিটি অঞ্চলে ও প্রদেশে আদনানী ও কাহতানী কবীলাসমূহকে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ করে। এভাবে গোটা আরব উপদ্বীপে ছোট ছোট গোত্রীয় রাজ্য ছাড়া কোন উল্লেখযোগ্য রাজ্য আর অবশিষ্ট থাকলো না। যদিও আরবের বড় বড় রাজ্যও অরাজকতামুক্ত ছিল না এবং কোন আরব শাসকেরই প্রজাদের উপর তেমন শক্ত নিয়ন্ত্রণ ছিল না যা পারস্যের কোন সাধারণ সামন্তরাজের বা রাজকর্মচারীর পারসিক প্রজাদের উপর নিয়ন্ত্রণের সাথে তুল্য ছিল। তখন ঐ অরাজকতা এবং কবীলাদের বল্গাহীন আযাদীর ঐ যুগে আরবদেশে সামাজিক অনাচার ও চারিত্রিক ব্যাধির দ্রুত প্রসার ঘটে। আরব দেশে ইসলামের অভ্যুদয় না ঘটা পর্যন্ত চারিত্রিক ব্যাধি ও অসামাজিক কার্যকলাপের প্রসার লাভ অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে।

আরববাসীদের বেশীর ভাগ লোকই যাযাবর জীবন-যাপন করতো এবং তাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক লোকই শহরে জনপদে স্থায়ীভাবে বসবাস করতো। আরববাসীরা তাদের বংশপঞ্জি অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে মুখস্থ ও সংরক্ষণ করতো। পিতৃপুরুষের নামধাম ও কীর্তি তারা গর্বসহকারে প্রকাশ করতো এবং একেই তারা যুদ্ধ-বিগ্রহে বীরত্ব প্রদর্শন ও উদ্দীপনা সৃষ্টির মাধ্যমরূপে ব্যবহার করতো। দেশের আবহাওয়ার প্রভাবেই হোক বা বংশপঞ্জি মুখস্থ রাখার আগ্রহেই হোক আরবদের স্মৃতিশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। কয়েক শ' পংক্তির কবিতা তারা দু' একবার শুনেই অনায়াসে মুখস্থ বলে দিতে পারতো। কাব্যচর্চা তাদের ভাষাকে এমনি উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যায় যে, অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই তারা অনারবদেরকে আজমী বা বোবা বলে অভিহিত করতো। কোন গোত্রের কেউ যদি অপর গোত্রের হাতে নিহত হত তার স্বগোত্রীয়ের কারো রক্তের বদলা নিতে না পারতো, তাহলে তার অস্থিরতার অবধি থাকতো না। হত্যার প্রতিশোধ না নিয়ে নির্বিকারভাবে বসে থাকা তাদের নিকট ছিল রীতিমত অপমানজনক ব্যাপার। খানা কা'বার সাহায্য করা এবং অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সোচ্চার ও সক্রিয় থাকা তাদের সমাজে একটি বড় গুণ বলে গণ্য হতো। কাপুরুষতা ও কৃপণতাকে তারা সর্বাধিক ঘৃণা করতো।

শান্তির মাসসমূহ

বছরে এক বা একাধিক মাস তারা শান্তিকাল বলে নির্ধারিত করে রাখতো যখন যুদ্ধবিগ্রহ করাকে তারা অবৈধ জ্ঞান করতো। এ সময় সমস্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ মুলতবি থাকতো। এ অবকাশে

বসতো বড় বড় মেলা। অনুষ্ঠিত হতো মুশায়েরা বা কবিসভা। এ সুযোগে ব্যবসা-বাণিজ্যও তারা করে নিতো। এ-ই ছিল সেকালের আরব সমাজের গুণের দিক। এবার মুদ্রার অপর পিঠটাও দেখা যাক।

ধর্মীয় অবস্থা

ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্বে আরবদের ধর্মীয় অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই যে, কোন কোন গোত্র স্রষ্টার অস্তিত্ব ও পরকালে বিশ্বাসী ছিলো না। তাদের কেউ কেউ স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করলেও পরকালে এবং হিসাব-নিকাশে তারা বিশ্বাস করতো না। মূর্তিপূজক ও নক্ষত্র পূজারীদের সংখ্যা ছিলো প্রচুর। কোন কোন গোত্রের মধ্যে অগ্নি উপাসনারও প্রচলন ছিলো। খানা কা'বাকে তারা মূর্তিপূজার কেন্দ্র বানিয়ে রেখেছিলো এবং সেখানে তারা তিন শ' ষাটটি মূর্তি স্থাপন করে রেখেছিলো। সিরিয়ার দিক থেকে কিছু সংখ্যক ইয়াহূদী এসে আরবে বসবাস করতে থাকে। হযরত মূসা (আ)-এর ইন্তিকালের অব্যবহিত পরেই এরা আরবে এসে বসবাস করতে শুরু করে। বনী কুরায়যা, বনী নযীর, বনী কায়নূকা প্রভৃতি ইয়াহূদী গোত্র ছিল সমধিক প্রসিদ্ধ। কিছু সংখ্যক খ্রিস্টানও আরব দেশে বসবাস করতো। এদের নিবাস ছিল গাস্সান ও নাজরানে। বনী খুযায়ার কিছু সংখ্যক লোকও খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়ে গিয়েছিলো।

মূর্তিপূজা

আরবের সর্বত্র ব্যাপকভাবে মূর্তিপূজার প্রকাশ্য প্রচলন ছিলো। নবী করীম (সা)-এর চার শ' বছর পূর্বে পারস্য সম্রাট শাপূরের শাসনামলে হিজাযের বাদশাহ্ আমর ইব্ন লুহায়্যি, সর্বপ্রথম খানা কা'বার ছাদে হুবল নামের মূর্তি এবং যমযম কূপের ধারে আসাফ ও নায়িলা নামের দু'টি মূর্তি রেখে সেগুলোর পূজার জন্য লোকজনকে উৎসাহিত করে। ঐ ব্যক্তি কিয়ামত বা পরকালে বিশ্বাসী ছিলো না। এ ছাড়াও ইয়াগূছ, ইয়াউক, নসর, উদ্দ, সুওয়া প্রভৃতির দেবমূর্তির পূজা করতো বিভিন্ন কবীলার লোকজন। প্রত্যেক কবীলার নিজস্ব স্বতন্ত্র দেবমূর্তি ছিলো। উদ্দের আকার ছিল পুরুষের। নায়িলার অবয়ব ছিল নারীর। সুওয়াও ছিল নারীমূর্তি। ইয়াগূছের অবয়ব ছিলো সিংহের। ইয়াউকের অবয়ব ছিল ঘোড়ার এবং নসর ছিল শকুনাকৃতির। তাসাম এবং জাদীসের দেবমূর্তি ছিল অভিন্ন। কালব গোত্র উদ্দের পূজারী ছিল। এটা দূমাতুল জান্দালে অবস্থিত ছিলো। বনূ তামীম পূজা করতো তায়মের। হুযায়ল গোত্রের পূজা ছিল সুওয়া'। মুযজাহ এবং ইয়ামানের গোত্রসমূহ পূজা করতো ইয়াগূছের। হিমইয়ারের যুলকিলা' গোত্র পূজা করতো শকুনাকৃতির নসর দেবমূর্তির। হামদানরা ইয়াউক দেবমূর্তির আর বনী ছাকীফ গোত্র তায়িফে লাতের পূজা করতো।

বনী ছাকীফের একটি শাখাগোত্র বনী মুগীছ লাত দেবতার দ্বাররক্ষী নিযুক্ত ছিলো। কুরায়শ ও বনী কিনানা উয্যার পূজারী ছিলো। বনূ শায়বা ছিলো উয্যার দ্বাররক্ষী। আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয় পূজা করতো মানাফের। বনী হাওয়াযিন জিহার, বকর ও তাগলিব আউয়ালের, বনী বকর ইব্ন ওয়ায়িল মুহ্রিকের, বনী মালকান ইব্ন কিনানা সাআদ-এর, বনী আনতারা সাঈদ-এর, বনী খাওলান উমিয়ানূসের, বনী তাঈ রিযা-এর এবং দূওস গোত্র যুল-কাফ্ফায়নের পূজো করতো। উপরোক্ত দেবমূর্তি ছাড়াও জারীশ, শারিক, আয়িম, মাদান, আওফ, মান্নাফ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ দেবমূর্তি কোন-না-কোন গোত্রের দ্বারা পূজিত হতো। খানা কা'বায় যখন

মূর্তিপূজারীদের সমাবেশ হতো। তখন কোন গোত্রের লোক নির্ধারিত দিনে কা'বায় পৌঁছতে না পারলে তারা দাওলার নামে একটি প্রস্তর স্থাপন করে তার চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করতো। আরব দেশে খানা কা'বার মত আরো কয়েকটি মূর্তিপূজার কেন্দ্র ছিল। গাতফান গোত্র একেবারে কা'বার আকৃতির একটি তীর্থকেন্দ্র বানিয়ে নিয়েছিল। তারা এর নাম রেখেছিল লাইস। সেখানেও তারা হজ্জ পালনও করতো। বনী খাশআম যুলখালিসা নামে অপর একটি তীর্থকেন্দ্র নির্মাণ করেছিল। সেখানেও অনুরূপ হজ্জ পালিত হতো। উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে সাঈদা নামক একটি উপাসনালয় ছিল। আরবের মূর্তিপূজারীরা তারও হজ্জ পালন করতো। রবীআ গোত্রের উপাসনালয়ের নাম ছিল যু'ল-কা'বাত। তারও তাওয়াফ করা হতো। নাজরানেও একটি গোত্রীয় উপাসনা মন্দির বিদ্যমান ছিল–যা তিন শ' চর্ম দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। ওটাকে বলা হতো নাজরানের কা'বা। আরবের মূর্তিপূজারীরা কা'বার মতো ওটারও যিয়ারত করতে ছুটে যেতো। অধিকন্তু তারা ওটাকে হারামও বানিয়ে রেখেছিল, অর্থাৎ কোন হত্যাকারী ব্যক্তি ওখানে আশ্রয় গ্রহণ করলে ওখানে সে নিরাপদে থাকতে পারতো। খানা কা'বার ছাদে হুবল ব্যতীত শামস নামক অপর একটি মূর্তিও ছিল। হযরত ইবরাহীম (আ), হযরত ইসমাঈল (আ), হযরত ঈসা (আ) এবং হযরত মারয়াম (আ)-এর মূর্তিও খানা কা'বায় পূজিত হতো।

কুরবানী

পৌত্তলিকরা যখন হজ্জে আসতো, তখন তারা কুরবানীর জন্যে উটও নিয়ে আসতো। সেসব উটের গলায় পরিচিতিস্বরূপ তারা জুতা লটকিয়ে দিতো এবং সেগুলোর কুঁজ যখম করে দিতো। তা দেখলেই লোকে বুঝতে পারতো যে এগুলো কুরবানীর উট। তখন কেউ আর এগুলোর কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করতো না। উটের বাচ্চা, ভেড়া প্রভৃতি চতুষ্পদ জন্তু তারা মূর্তির নামে উৎসর্গ করতো। কোন কোন গোত্রের লোকজন এসব মূর্তির জন্যে নরবলি পর্যন্ত দিতো।

কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে আরবের মূর্তিপূজারীরা তাওহীদেও বিশ্বাসী ছিলো এবং এক আল্লাহ্‌কে জানতো। তারা উক্ত মূর্তিগুলোকে আল্লাহ্‌র দরবারে সুপারিশকারী জ্ঞানে পূজো করতো। এদের মধ্যে কোন কোন কবীলার লোকজনের এরূপ বিশ্বাস ছিলো যে কোন মৃত ব্যক্তির কবরে উটনী যবাই করে দিলে সেই উটনীর পিঠে সওয়ার হয়ে ঐ ব্যক্তি কিয়ামতের দিনে উত্থিত হবে। তাদের এ বিশ্বাস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তারা পুনরুত্থানে এবং শেষ বিচারে হিসাব-নিকাশে বিশ্বাসী ছিল।

নক্ষত্র পূজা

জাহিলিয়াতের যুগে আরব দেশে নক্ষত্র পূজার ব্যাপক প্রচলন ছিলো। কিন্তু ঐতিহাসিকদের মতে এ ব্যাপারে কোন প্রমাণ নেই যে, আরব, মিসর, গ্রীস ও ইরান এ চারটি দেশের নক্ষত্রপূজারীদের মধ্যে কোন্ দেশের নক্ষত্রপূজারীরা উস্তাদ ছিল আর বাকী কোন্ তিনটি দেশের নক্ষত্রপূজারীরা তাদের শাগরিদ ছিল। মোটকথা, একথা বলা মুশকিল যে, নক্ষত্রপূজার প্রথাটি আরব দেশে বাহির থেকেই এসেছিল, নাকি তারাই এর মূল উদগাতা। হামীর গোত্র সূর্যের, কিনানা গোত্র চাঁদের, তামীম গোত্র ওহরানের, লুখাম ও জুযাম গোত্র বৃহস্পতি গ্রহের, তাঈ গোত্র সুহায়ল নামক নক্ষত্রের, কায়স গোত্র লুব্ধক নক্ষত্রের এবং আসাদ গোত্র বুধ গ্রহের পূজা করতো। অধিকাংশ গোত্রের দেবমূর্তির গ্রহ-নক্ষত্রের নামে নামকরণ করা হতো। প্রস্তর

নির্মিত মূর্তিগুলো এবং বিখ্যাত গ্রহ-নক্ষত্রগুলোর পূজা বিভিন্ন গোত্র যৌথভাবেই করতো। গ্রহ-নক্ষত্রের উদয়াস্তের উপরই তাদের উল্লেখযোগ্য গোছের কাজগুলো করা নির্ভর করতো। মরুভূমির খোলা আকাশের নীচে বসতকারীদের জন্যে গ্রহ-নক্ষত্রের প্রতি এরূপ ঘনিষ্ঠতাবোধ করা, এগুলোর কোন কোনটার পূজায় লিপ্ত হওয়াটা বিচিত্র কিছু ছিলো না। কুরআন শরীফের সূরা নূহ পাঠে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত নূহ (আ)-এর যুগে ইরাক-আরবে ইয়াগূছ, ইয়াউক, উদ্দ, নসর, সুওয়া প্রভৃতির পূজা হতো। গ্রহ-নক্ষত্রের নামানুসারেই এসব দেবমূর্তির নামকরণ করা হয়েছিলো। এতে প্রতীয়মান হয় যে, নক্ষত্রপূজা প্রাচীনকাল থেকেই আরবে প্রচলিত ছিল। নক্ষত্রপূজারীদের মধ্যে চাঁদের পূজারী সংখ্যাই ছিলো সর্বাধিক এবং চাঁদই ছিল সর্বাধিক জনপ্রিয় উপাস্য।

কিহানত (ভবিষ্যত বলা)

আরবে কাহিন বা গণৎকারের সংখ্যা ছিলো প্রচুর। কাহিন বলা হতো ঐ সব লোককে যারা গুপ্ত রহস্য ও অদৃশ্য জগতের সংবাদাদি জানার দাবী করতো। যারা অতীতে সংঘটিত ব্যাপারসমূহের সংবাদ দিতো তাদেরকে কাহিন এবং যারা ভবিষ্যতের সংবাদ দিতো তাদেরকে আর্রাফ বলা হতো। অদৃশ্য জগতের সংবাদ যারা দিতো তাদের মধ্যে নারীপুরুষ উভয় শ্রেণীর লোকই ছিলো। আফআ, জাযীমা, আবরাশ, শিক, সাতীহ্ প্রমুখ ছিলো সেকালের আরবের নামকরা গণৎকার। গণৎকারদের একটি শ্রেণী ছিলো যাদেরকে নাযির বা দ্রষ্টা বলা হতো। এরা দর্পণে বা পানিভর্তি পাত্রে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে অদৃশ্য জগতের সংবাদ বলে দিতো অথবা পশুপক্ষীর অস্থি, যকৃত প্রভৃতি নিরীক্ষণ করে ভবিষ্যদ্বাণী করতো। এদের মধ্যে কঙ্কর নিক্ষেপকারী এবং বীজ নিক্ষেপকারী গণৎকারও ছিল। কিন্তু এদের মর্যাদা আর্রাফ এবং কাহিনদের চাইতে কম বলে গণ্য হতো। তাবীয বা ঝাঁড়ফুঁককারীদের মর্যাদা তাদের চাইতেও নীচে ছিলো।

ফাল–ভাগ্যপরীক্ষা

অন্ধকার যুগে আরবদেশে সুলক্ষণ এবং কুলক্ষণ পরীক্ষা করার বহুল প্রচলন ছিলো। কাককে তারা খুবই কুলক্ষুণে জ্ঞান করতো এবং একে বিচ্ছেদের হেতু বলে মনে করতো। আরবী ভাষায় কাককে যেহেতু গুরাব বলা হয়ে থাকে তাই মুসাফিরীকে তারা গুরবত এবং মুসাফিরকে গরীব বলে অভিহিত করে। অর্থাৎ তাদের ধারণা ছিলো যে, কাকের প্রভাবেই মানুষ বিরহ-বিচ্ছেদের কবলে পড়ে দুর্ভোগের শিকার হয়ে থাকে। তারা পেচাকেও অত্যন্ত অলক্ষুণে জ্ঞান করতো। তাদের ধারণা ছিলো যে, পেচা শব্দ করলে মানুষের মৃত্যু ও ধ্বংস অনিবার্য। তারা হাঁচি দেওয়াকেও কুলক্ষুণে জ্ঞান করতো। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক যাদুকরও ছিল। তারা একে পেশা হিসাবে গ্রহণ করতো। অসাধ্য সাধনের উদ্দেশ্যে শয়তানকে বশীভূত করার জন্যে তারা অনেক কঠোর সাধনায় লিপ্ত হতো।

যুদ্ধপ্রীতি

অতি তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে কথায় কথায় তাদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ শুরু হতো। আর একবার যুদ্ধের সূত্রপাত হলে তখন কয়েক পুরুষ এবং কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত তা অব্যাহত গতিতে চলতো। তাদের যুদ্ধসমূহের মধ্যে এমন কোন যুদ্ধের সন্ধান পাওয়া যায় না, যা কোন সঙ্গত কারণে বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে শুরু হয়েছিল। জাহিলিয়াত যুগের আরবদের যুদ্ধ-বিগ্রহের

মধ্যে শ' সোয়াশ' যুদ্ধ অত্যন্ত বিখ্যাত। এগুলোর মধ্যে রয়েছে বুআসের যুদ্ধ, কিলাবের যুদ্ধ, ফাতরাতের যুদ্ধ, নাখলার যুদ্ধ, কার্নের যুদ্ধ, সুবানের যুদ্ধ, হাতিবের যুদ্ধ প্রভৃতি। এ সব যুদ্ধে কোন পক্ষেরই কোন লাভ হয়নি, বরং উভয় পক্ষই জানে-মালে উৎসন্ন হয়েছে।

আরব জাহিলিয়াতের এটাও একটা রেওয়াজ ছিল যে, যখন তারা প্রতিপক্ষের উপর জয়ী হতো এবং তাদের স্ত্রীপুত্র-পরিজনকে বন্দী করতো তখন তারা নির্দ্বিধায় ঐসব অসহায় বন্দীকে হত্যা করতো। কিন্তু বন্দীদের কেউ যদি তাদের আহার্য থেকে কিছু খেয়ে নিত, তাহলে সে রক্ষা পেতো, তাকে আর হত্যা করা হতো না। তারা যাকে মুক্তি দিতে চাইতো প্রথমে তার মাথার চুল মুণ্ডন করে দিত। তাদের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধের বহুল প্রচলন ছিল। সারিবদ্ধভাবে লড়াইয়ের রেওয়াজ তাদের মধ্যে ছিল না। যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র ও ঘোড়ার দেখাশোনায় তারা খুবই মনোযোগী ছিল। অসি চালনা, তীরন্দাজী ও বল্লম নিক্ষেপে কৃতিত্বের অধিকারীদের সমাজে খুবই সম্মান ছিল। এ ধরনের লোকদের ডাকনাম দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়তো। যুদ্ধ কৌশল ও যুদ্ধাস্ত্র পরিচালনার জন্যে কোন কোন গোত্রের খুবই খ্যাতি ছিল। বিশেষ বিশেষ তলোয়ার, বল্লম, ধনুক, ঘোড়া প্রভৃতির বিশেষ বিশেষ নাম রাখা হতো এবং ঐ নামে এগুলো গোটা দেশে পরিচিত ছিল। উদাহরণস্বরূপ হারছ ইব্‌ন আবূ শামর গাস্‌সানীর তলোয়ারের নাম ছিল খাযূম। আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন হাশিমের তলোয়ারের নাম আতশান এবং মালিক ইব্‌ন যুবায়েরের তলোয়ারের নাম ছিল যুন-নূন।

এসব দেখে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আরবরা যুদ্ধ-বিগ্রহে অত্যন্ত উৎসাহী ছিল। এজন্যে ঘোড়া ও তরবারির আরবী প্রতিশব্দ হাজারটি পর্যন্ত বলা হয়ে থাকে।

প্রেম-প্রীতি

আরব জাহিলিয়াতে পর্দার কোন বালাই ছিলো না। তাদের মহিলারা যথাযথভাবে পুরুষদের সম্মুখে আনাগোনা করতো। জীবন যাত্রার উপায়-উপকরণ ও ব্যস্ততার অভাব, বল্গাহীন চরিত্র ও মেজায, প্রচুর অবসর, কাব্যিকতা ও বংশগৌরব, উপরন্তু উত্তপ্ত আবহাওয়া ও নিঃসর্গ তাদের মধ্যে এ ব্যাধিরও জন্ম দেয়। জাহিলিয়াত আরব সমাজে ঐ ব্যক্তি চরম নীচ ও অভদ্র বলে বিবেচিত হতো যার কোন রমণীর সাথে কোন দিন প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেনি। আরবের কোন কোন কবীলা প্রেমলীলার জন্যে বিখ্যাত ছিলো। উদাহরণস্বরূপ আয্‌রা গোত্রের কথা বলা যেতে পারে। তাদের প্রেমলীলা এতই মশহুর ছিলো যে, আরবের একটি প্রবাদবাক্য অত্যন্ত মশহুর তা হলো : عشق من بنی عذرة। অর্থাৎ অমুক প্রেমলীলায় বনী উযরাকেও মাত করে দিয়েছে। জনৈক বেদুঈনকে তার পরিচয় জিজ্ঞেস করলে সে জবাবে বলেছিলো, আমি এমনি এক গোত্রের লোক যারা প্রেম করলে অনিবার্যভাবে সে প্রেমের জন্যে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে। জনৈক কিশোরী তা শুনে তাৎক্ষণিকভাবে মন্তব্য করলো : عذری ورب الكعبة অর্থাৎ কা'বার প্রভুর কসম, তুমি অবশ্যই আযরা গোত্রের লোক হবে।

কাব্যচর্চা

আরব জাহিলিয়াতে এমন কোন লোক ছিলো না, যার মধ্যে কাব্যিকতা ছিল না। নারী-পুরুষ, আবাল-বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই কিছু না কিছু কাব্যিকতার অধিকার ছিল যেন তারা মাতৃগর্ভ থেকেই কবি হয়ে আসতো। জন্মগতভাবেই তারা ছিল অলংকারসমৃদ্ধ ভাষার অধিকারী।

সাধারণত তাদের কবিতা হতো তাৎক্ষণিক ও স্বতঃস্ফূর্ত। কবিতা রচনার জন্যে চিন্তা-ভাবনা করা বা কষ্ট-কল্পনার আশ্রয় নেয়ার তাদের আদৌ প্রয়োজন হতো না। তাদের ভাষাসৌকর্য ও কাব্যিকতার এমনি গর্ব ছিল যে, গোটা বিশ্বের তাবৎ অনারব লোককে তারা বোবা জ্ঞান করতো। কিন্তু কুরআন শরীফ অবতীর্ণ হয়ে আরবদের সে দর্পকে চিরতরে চূর্ণ করে দেয়। শেষ পর্যন্ত সেই কাব্যিকতা ও ভাষা সৌকর্যের জন্যে দর্পকারী আরবরা আল্লাহ্‌র বাণীর অভূতপূর্ব ভাষাসৌকর্য ও লালিত্যের কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হয়।

বার্ষিক মেলা উৎসব এবং হজ্জের সময় অনুষ্ঠিত মজলিসে মুশায়েরা বা কবিসভায় যার কবিতা সর্বোত্তম বলে সাব্যস্ত হতো রাতারাতি সে বিপুল মান-সম্মান ও যশের অধিকারী হয়ে পড়তো। একজন কবির সম্মান সে সমাজে একজন বীরপুরুষ বা রাজা-বাদশাহ্‌র সমান বা তার চাইতেও অধিক ছিল। আসলেও গোত্রে গোত্রে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেয়া, কোন গোত্রকে অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শনে উদ্বুদ্ধ করা, যুদ্ধ অব্যাহত রাখা বা তার অবসান ঘটানো ছিল কবিদের বাম হাতের খেলা স্বরূপ। সর্বোত্তম কাসীদাগুলো খানা কা'বায় লটকিয়ে দেয়া হতো। এমনি সাতটি কাসীদা 'সাবয়ে' মুআল্লাকা' বা ঝুলন্ত কবিতা সপ্তক নামে বিখ্যাত। ইমরাউল কায়েস ইব্‌ন হাজার কিন্দী, যুবায়র ইব্‌ন আবূ সালমা মুযানী, লবীদ ইব্‌ন রবীআ, উমর ইব্‌ন কুলছুম, আন্‌তারা আবসী প্রমুখ কবির দ্বারা এগুলো রচিত হয়।

শিকার

জাহিলিয়াত যুগের আরবরা ছিলো অত্যন্ত শিকার প্রিয়। এজন্যে আরবী ভাষায় শিকারের অনেক প্রতিশব্দ পাওয়া যায়। যে শিকার ডান দিক থেকে এসে বাম দিকে চলে যেতো তাকে বলা হতো সালিখ; আবার যে শিকার বাম দিক থেকে এসে ডান দিকে চলে যেতো তাকে বারিহ বলা হতো। যে শিকার সম্মুখ দিক থেকে আসে তাকে নাতিহ্ আবার যে শিকার পিছন দিক থেকে আসে তাকে 'কাঈদ' বলা হত। শিকারের জন্য শিকারী যেখানে ওঁৎ পেতে থাকে তাকে কুরাহ বলা হতো। আবার বাঘ শিকারের জন্যে যে গর্ত খনন করা হতো তাকে বলা হতো যাবিয়া। শিকার জন্তু লক্ষ্য করে পেটের উপর ভর দিয়ে মাটি কামড়ে এগিয়ে যাওয়াকে তালবুদ এবং শিকারীর ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে আসাকে আখদাক বলা হতো। তারা যা-ই শিকার করতো তা-ই নির্বিচারে খেয়ে নিত। হালাল হারামের কোন বাছ-বিচার করতো না। ইসলাম হারাম-হালালের শর্ত আরোপ করে এবং শিকারের মধ্যে নিয়ম-কানুন প্রবর্তন করে।

পোশাক-পরিচ্ছদ ও খাবার-দাবার

আরব দেশে রেশম বা তুলা কিছুই উৎপন্ন হয় না। যদিও বা কোন প্রদেশে উৎপন্ন হয়, তাও পরিমাণে এতই অল্প যে দেশবাসীর প্রয়োজন তা মেটাতে পারে না। ইয়ামানে প্রাচীনকাল থেকেই বস্ত্র বয়ন হয়ে আসছে। সাধারণভাবে আরববাসীদের লেবাস-পোশাক অত্যন্ত সাদাসিধে ও অনাড়ম্বর ছিল। মোটা কাপড়ের জামায় চর্মের তালি লাগিয়ে পরা ছিল সাধারণ ব্যাপার। কেউ কেউ চামড়ার ছোট ছোট টুকরাকে সূচের দ্বারা ঢেকে নিয়ে চাদর বানিয়ে নিত। এ চাদর নির্দ্ধিধায় তারা চাদর ও বিছানারূপে ব্যবহার করতো। উট ও ভেড়ার লোম দিয়েও কাপড় হতো। ঢিলেঢালা লম্বা কোর্তা ও লুঙ্গি এবং মাথায় রুমাল ও পাগড়ী ব্যবহারের প্রচলন ছিল। সুবাসিত কাঠ, আম্বর, লোবান ও কর্পূর প্রভৃতি সুগন্ধি ব্যবহার সম্পর্কেও তারা জ্ঞাত ছিল।

আরবদের আহার্যও ছিল অত্যন্ত সাদাসিধে ও আড়ম্বরবিহীন। নিরস বিস্বাদ খাদ্যেই তারা তৃপ্ত থাকতো। গোশ্‌ত ছিল তাদের সবচাইতে প্রিয়, মূল্যবান ও সুস্বাদু খাদ্য। দুধ, গোশ্‌ত, চীনা প্রভৃতি ছিল দেশের সাধারণ খাদ্য। পনীর, যবের ছাতু, খেজুর, যয়তূন তৈল, হারীর প্রভৃতির ব্যবহারও চালু ছিল। টিড্ডি, ফড়িংও তারা খেতো–যা ঐ দেশে প্রচুর পাওয়া যেতো। আটা চালুনীতে ছেঁকে খাওয়ার রেওয়াজ ছিল। বিনা ছাঁকা আটার রুটিও তারা রান্না করে খেতো। মরুভূমির শুশুকও তারা রান্না করে অত্যন্ত সুস্বাদু খাদ্যরূপে খেতো। পানাহারের রীতিনীতিও ছিল একান্তই সাদাসিধে। পানাহার সংক্রান্ত নবী করীম (সা)-এর হাদীসসমূহে বর্ণিত বিধি-নিষেধসমূহ পাঠে সে সম্পর্কে একটি ধারণায় উপনীত হওয়া যায় যাতে অনেক প্রকার অশিষ্ট আচরণ করা হয়েছে। তাতে অধিক ভোজন, নির্লজ্জতা, নোংরামী এবং বাজে বকা থেকে বারণ করা হয়েছে।

লুণ্ঠন ও রাহাজানি

উপরেই বলা হয়েছে আরবদেশে শহুরে জীবনে অভ্যস্ত ও যাযাবর এ দু'শ্রেণীর লোক বাস করতো। আর এদের মধ্যে যাযাবরদের সংখ্যাই ছিল অধিক। শহুরে লোকদের মধ্যে যদিও প্রতিবেশীর অধিকার সচেতনতা, বিশ্বস্ততা প্রভৃতি গুণ ছিল, তথাপি ব্যবসায় প্রতারণা প্রভৃতি অপরাধ প্রবণতা তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলো। বেদুঈন শ্রেণীর লোকেরা ডাকাতি, রাহাজানি ও তস্করবৃত্তিতে ছিলো অত্যন্ত পাকা। পথচারীদেরকে লুটপাট করে তাদের যথাসর্বস্ব অপহরণ করা ছিলো সকলের সাধারণ অভ্যাস। কোন পথচারীকে নিঃসঙ্গ অবস্থায় পেলে তার যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করে তারা তাকে দাসরূপে বিক্রি করে দিত। পথিপার্শ্বের কূয়ো তৃণ গুল্মাদি দিয়ে এ উদ্দেশ্যে ঢেকে রাখা হতো যাতে পথিক পানির অভাবে মৃত্যুবরণ করে আর তার মালপত্র নির্বিবাদে হস্তগত করা যায়। তস্করবৃত্তিতে তারা ছিল পাকা উস্তাদ। কেউ কেউ তো চুরি বিদ্যায় এমনি পাকা ছিল যে, তাদের নাম প্রবাদ বাক্যের মত মশহুর ছিল। এদেরকে আরবের নেকড়ে বলা হতো।

দাম্ভিকতা

দম্ভ ও অহংকারের নীচ প্রবৃত্তি জাহিলিয়াতের আরব সমাজে চরমে পৌঁছে ছিল। জাযীমা আবরাশের অহংকারের অবস্থাটি এই যে, সে কাউকে তার মন্ত্রী, উপদেষ্টা বা পারিষদ পর্যন্ত গ্রহণ করেনি। সে বলতো, আকাশের তারকারা হচ্ছে আমার সভাসদ, অন্য কোন সভাসদের আমার প্রয়োজন নেই। বনী মাখযুম গোত্রের লোকেরাও অহংকারের জন্য বিখ্যাত ছিল। অনুরূপভাবে আরও অনেক গোত্রের এ কুখ্যাতি ছিল। তৎকালীন আরবের কোন একটি গোত্রও এ ব্যাধি থেকে মুক্ত ছিল না। তাদের অহংকার ও দাম্ভিকতাই তাদের নবী-রাসূল হিদায়াতকারীদের ওয়ায-নসীহত শ্রবণের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারা কোন হিদায়াতকারীর আনুগত্যকে দোষাবহ জ্ঞান করতো।

বিদ্বেষ ও প্রতিশোধ স্পৃহা

যদি কোন হত্যাকারী বা প্রতিপক্ষের জীবদ্দশায় তাকে বাগে না পাওয়া যেতো, তাহলে তার পুত্র, পৌত্র বা নিকটাত্মীয়কে হত্যা করে তার প্রতিশোধ নেয়া হতো এবং প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত অস্থিরতার অন্ত থাকতো না। শত্রুতার হেতু স্মরণ না থাকলেও শত্রুতা যে আছে

তা কিন্তু বিলক্ষণ স্মরণ থাকতো। অনেকে শুধু এজন্যেই নিহত হতো যে, হত্যাকারী গোত্রের সাথে তাদের গোত্রীয় শত্রুতা আছে, কিন্তু সে শত্রুতার হেতু কি তা তারা বলতে পারতো না।

শোক বিলাপ

যখন কোন ব্যক্তির মৃত্যু হতো তখন তার নিকটাত্মীয়রা ললাট ঘর্ষণ করে এবং মাথার চুল ছিঁড়ে হায় হায় করে বিলাপ করতো। মহিলার চুলের বেণী খুলে মাথায় মাটি মেখে শবদেহের পিছু পিছু চলতো-যেমনটি ভারতের হিন্দুরা তাদের মৃতজনকের শোকে চুল ও গোঁফ দাড়ি মুণ্ডন করে শোক পালন করে থাকে। জাহিলিয়াতের যুগে আরবে মাতমকারিণী মহিলাদেরকে ভাড়া করে বিলাপের জন্যে নিয়ে আসা হতো। তারা অত্যন্ত জোরেশোরে ইনিয়ে বিনিয়ে বিলাপ করতো। দাফন কাফন শেষ করে বিলাপকারিণীদেরকে উত্তমরূপে আপ্যায়িত করা হতো। ইসলাম এসে সেসব জাহিলিয়াতের প্রথা-পদ্ধতির অবসান ঘটায়। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, ভারতবর্ষের মুসলমানদের মধ্যে মৃত্যুর তৃতীয় দিনে দশমী, চল্লিশতম দিনে চেহলাম, ষান্মাসিক এবং বার্ষিক শোক উৎসব করার কুসংস্কার এখনো চালু রয়েছে। আরব জাহিলিয়াতের প্রতিচ্ছবি আজো আমরা আমাদের চোখের সম্মুখে দেখতে পাচ্ছি। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

কুসংস্কার

জিন-পরী, দৈত্য-দানবেও জাহিলিয়াতের আরবরা বিশ্বাস করতো। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, পরীরা পুরুষ লোকের প্রেমে পড়ে এবং জিন্‌রা নারীদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে। জিনদেরকে তারা অদৃশ্য জীবন বলে বিশ্বাস করতো। আবার সাথে সাথে এটাও বিশ্বাস করতো যে, অশরীরী আত্মার সাথে মানুষের জড়দেহের মিলনেও সন্তান ভূমিষ্ঠ হতে পারে। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, জুরহাম মানুষ ও ফেরেশতার মিলনের ফসল ছিল। অনুরূপ ধারণা তারা সাবার রানী বিলকীস সম্পর্কেও পোষণ করতো। আমর ইব্‌ন ইয়ারবূ' সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল যে, মানুষ ও প্রান্তরের ভূতের মিলনে তার জন্ম হয়েছিল। যে উষ্ট্রীর পাঁচটি শাবক হতো এবং তার পঞ্চমটি নর হতো তারা তার কান ছিদ্র করে দিয়ে তাকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিতো। সে উষ্ট্রী যদৃচ্ছা ঘুরে বেড়াতে এবং যা ইচ্ছা খেতে পারতো, কেউ তাকে বাধা দিতো না। এমন উষ্ট্রীকে তারা 'বহীরা' বলে অভিহিত করতো। ভেড়ার নর শাবক হলে তারা তা' দেবতার নামে বলি দিত। পক্ষান্তরে মাদী হলে তারা তা নিজেদের জন্যে রেখে দিতো। যদি ভেড়ার দুটো শাবক নর ও মাদী এক সাথে জন্মগ্রহণ করতো তবে এগুলো তারা কুরবানী দিতো না। তারা একে وصليه নামে অভিহিত করতো। যে উষ্ট্রের সহবাসে দশটি উষ্টছানার জন্ম হতো, তারা সেটাকে খুবই সম্ভ্রমের চোখে দেখতো। তারা তাতে মাল বোঝাই করতো না বা নিজেরা তাতে আরোহণ করতো না এবং ষাঁড়ের মতো স্বাধীন ছেড়ে দিতো। তারা এর নামকরণ করতো 'হাম' (حام) বলে। তারা মূর্তির সম্মুখে বা মূর্তিশালার দেউড়ীতে তিনটি তীর রেখে দিতো। তার একটাতে 'না' ও একটাতে 'হাঁ' লেখা থাকতো। এ তীরগুলো একটা তূণে থাকতো। যখন কোন বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দিত, তখন তারা তূণ থেকে একটা তীর উঠিয়ে দেখতো তাতে কি লেখা আছে। যদি তাতে 'না' লিখিত তীর উঠতো তবে তারা সে কাজ থেকে বিরত রইতো। আর 'হাঁ' লিখিত তীর উঠলে তাকে দেবতার সম্মতি আছে

বলে তারা ধরে নিত। যদি তৃতীয় তীরটি উঠতো–যাতে কিছু লিখিত থাকতো না, তাহলে তারা পুনরায় তীর উঠাতো এবং যতক্ষণ 'হাঁ' লিখিত তীরের দ্বারা এভাবে দেবতার ইচ্ছা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে না পারতো ততক্ষণ পর্যন্ত এর পুনরাবৃত্তি করে যেতো।

কখনো কার্যব্যাপদেশে বাইরে যেতে হলে তারা 'রতম' নামক একটি বৃক্ষের ছোট্ট শাখায় একটা গাঁট দিয়ে যেতো এবং ফিরে এসে দেখতো যে, সে গাঁটটা ঠিক আছে, নাকি খুলে গেছে। ঘটনাক্রমে সে গাঁটটি কোন ভাবে খুলে গেলেই তারা ধরে নিত যে, নিশ্চয়ই ঐ ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার স্ত্রী কারো সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে। গাঁটটি পূর্ববৎ থাকলেই কেবল স্ত্রীর সতীত্ব বহাল আছে বলে তারা বিশ্বাস করতো।

কোন ব্যক্তির মৃত্যু হলে তারা তার কবরে তার উষ্ট্রীকে চোখ বন্ধ করে বেঁধে রাখতো এবং উষ্ট্রীটির মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত এভাবেই তাকে বেঁধে রাখতো। অথবা ঐ উষ্ট্রীর মাথা পিছনের দিকে টেনে তার বুকের সাথে বেঁধে দিত এবং এভাবেই উষ্ট্রীর মৃত্যু হতো। তাদের ধারণা ছিল যে, তাতে পরকালে যখন ঐ মৃত ব্যক্তি কবর থেকে উত্থিত হবে তখন সে এ উষ্ট্রীটিতে আরোহণ করেই উঠতে পারবে। তাদের বিশ্বাস ছিল, যদি কোন ব্যক্তি কোন জনপদে গিয়ে সেখানকার মহামারী সম্পর্কে ভীত হয় আর সে ব্যক্তি সেই জনপদের দ্বারপথে দাঁড়িয়ে গাধার সুরে চিৎকার করে, তাহলে সে মহামারীর কবল থেকে রক্ষা পাবে। যখন কোন ব্যক্তির উটের সংখ্যা এক হাজার অতিক্রম করতো তাহলে পালের মোটা ষাড়টার দু'টি চোখ উপড়ে ফেলা হতো। তাদের ধারণা ছিল যে, এতে উটের পাল বদনযর থেকে রক্ষা পাবে। যখন কোন উটের খোস-পাঁচড়া হতো তখন সেই অসুস্থ উটের পরিবর্তে তারা সুস্থ উটের গায়ে দাগ দিতো এবং তাদের ধারণা ছিল যে, এভাবে অসুস্থ উটটির রোগ সেরে উঠবে। এ ব্যাপারে কবি নাবেগার উক্তিটি স্মরণ করা যেতে পারে :

حَمَلْتَ عَلَيَّ ذَنْبَهُ وَتَرَكْتَهُ
كَذَا الْعَزَّ يَكْوِيْ غَيْرَهُ وَهُوَ رَائِعٌ

তার দোষের বোঝা আমার উপর চাপিয়ে দিয়ে তুমি তাকে ছেড়ে দিলে—যেমনটি পাঁচড়া রোগাক্রান্ত উটকে ছেড়ে দিয়ে চারণক্ষেত্রে বিচরণরত সুস্থ উটকে দাগ দেয়া হয়ে থাকে।

অনুরূপভাবে যখন কোন গাভী পানি পান না করতো তখন তারা ষাঁড়কে ধরে বেদম পিটাতো। তাদের ধারণা ছিল, ষাঁড়ের উপর জিন সওয়ার হয়ে গাভীকে পানি পানে বাধা দিয়ে থাকে। তাদের ধারণা ছিল যে, কোন নিহত ব্যক্তির রক্তের বদলা না নিলে তার মাথার খুপড়ী থেকে একটি পাখি বের হয়ে অস্থিরভাবে চীৎকার করতে থাকে এবং বলতে থাকে আমাকে পানি পান করাও, আমাকে পানি পান করাও এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তার রক্তের শোধ নেয়া না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে ক্ষান্ত হয় না। তারা উক্ত কল্পিত পাখির নাম ঠাউরিয়েছিল 'হামা'। তাদের ধারণা ছিল, প্রতিটি মানুষের পেটে একটি করে সাপ থাকে। যখন সে সাপটি ক্ষুধার্ত হয় তখন পাঁজরের হাড় থেকে সে গোশ্‌ত খুলে খুলে খায়। তাদের ধারণা ছিল যে, যদি কোন মহিলার গর্ভজাত সন্তান মারা যায়, তাহলে সে মহিলা যদি কোন সম্ভ্রান্তধর্মী ব্যক্তির লাশকে উত্তমরূপে পদদলিত করে, তবে তার সন্তান বাঁচতে শুরু করবে। তাদের ধারণা ছিল যে,

জিন-ভূতেরা খরগোশকে ভীষণ ভয় করে। তাই জিন-ভূতের কুপ্রভাব থেকে শিশুদেরকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে তারা খরগোশের হাড্ডি শিশুদের গলায় তাবীযস্বরূপ ঝুলিয়ে দিত।

কন্যা হত্যা

বনী তামীম এবং কুরায়শদের মধ্যে কন্যা হত্যার সমধিক প্রচলন ছিল। তারা এজন্যে রীতিমত গর্ববোধ করতো এবং একে তাদের জন্যে সম্মানের প্রতীক বলে বিশ্বাস করতো। কোন কোন পরিবারে এ পাষণ্ডতা এতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছিল যে, মেয়েরা যখন বেশ বড় হয়ে যেতো এবং মিষ্টি কথা বলতে শুরু করতো, তখন পাঁচ ছ'বছর বয়সে তাকে সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত করে পিতা তাকে লোকালয়ের বাইরে নিয়ে যেতো। পাষণ্ড পিতারা পূর্বেই সেখানে গিয়ে গর্ত খুঁড়ে আসতো এবং পরে মেয়েকে সেখানে নিয়ে গিয়ে ধাক্কা দিয়ে গর্তে ফেলে দিত। অবোধ মেয়ে তখন অসহায় অবস্থায় চীৎকার করে করে বাপের সাহায্য চাইতো, কিন্তু পাষণ্ড পিতা তার দিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে ঢিল ছুড়ে ছুড়ে তাকে হত্যা করতো বা জীবন্ত মাটি চাপা দিয়ে নিজ হাতে কবর সমান করে দিয়ে নির্বিকারে ঘরে ফিরে আসতো এবং এভাবে আপন কলিজার টুকরো সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করার জন্যে সে রীতিমত গর্ববোধ করতো। বনী তামীমের জনৈক কায়স ইব্‌ন আসিম এভাবে একে একে তার দশটি কন্যাসন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করে। কন্যা হত্যার এ অমানুষিক বর্বরতা থেকে আরবের কোন কবীলাই মুক্ত ছিল না। তবে কোন কোন কবীলায় এটি অনেক বেশী হতো, আবার কোন কোন কবীলায় তা কম হতো।

জুয়াখেলা

জাহিলিয়াতের যুগে আরবের অধিবাসীরা জুয়াখেলায় অত্যন্ত আগ্রহী ও অভ্যস্ত ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আযলামের সাহায্যে জুয়াখেলা হতো। আযলাম ছিল জুয়াখেলার তীর বিশেষ। তাতে পালক সংযোজিত থাকতো না। সে তীরের সংখ্যা হতো দশটি। প্রত্যেকটি তীরের স্বতন্ত্র নাম থাকতো। নামগুলি ছিল এরূপ : (১) গুয, (২) তাওয়াম, (৩) রকীব, (৪) নাফিস, (৫) হাল্‌স, (৬) মুবাল, (৭) মুআল্লা, (৮) ফসীহ (৯) ফাইহী (১০) ওগাদ। প্রত্যেকটি তীরের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক ভাগ নির্ধারিত থাকতো। যেমন গুযের এক ভাগ, তাওয়ামের দু'ভাগ। এভাবে সপ্তম তীর পর্যন্ত এক এক ভাগ করে বৃদ্ধি পেয়ে সপ্তম তীরের ভাগ সংখ্যা থাকতো সাতটি। অবশিষ্ট তিনটি তীরের কোন ভাগ ছিল না। দশজন ধনী ব্যক্তি হৃষ্টপুষ্ট দেখে দশটি ছাগল কিনে এনে এগুলোকে যবাই করে আটাশ ভাগে বিভক্ত করতো। সমস্ত তীর একটি তূণে রেখে এক ব্যক্তির হাতে অর্পণ করা হতো এবং সে প্রত্যেককে একটি করে তীর দিতো। তারপর যার তীরে যত ভাগের চিহ্ন থাকতো সে তত ভাগ করে গোশত পেতো এবং শেষোক্ত তিনটি তীর যাদের হাতে পড়তো, তারা কিছুই পেতো না। তারা বঞ্চিত রইতো। খানা কা'বার মধ্যে হুবল দেবতার সম্মুখে এ জুয়া খেলা হতো। জুয়ার আরেকটি পদ্ধতি ছিল এই যে, কিছু বালি এনে কোন বস্তু তার মধ্যে গোপন করা হতো। তারপর উক্ত বালির স্তূপকে দু'ভাগে ভাগ করে প্রশ্ন করা হতো, এবার বল দেখি বস্তুটি কোন্ স্তূপের মধ্যে রয়েছে। জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি তা সঠিকভাবে বলে দিতে পারলে সে জুয়ায় জিতে যেতো, নতুবা সে হেরে যেতো।

জাহিলিয়াতের যুগে আরব ও সমসাময়িক বিশ্ব

উপরে ইসলামের অভ্যুদয় ও নবী করীম (সা)-এর নবুওয়াত লাভের প্রায় এক শ' বছর পূর্বে আরবের অধিবাসীদের নৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থার বিবরণ দেয়া হয়েছে। নবী করীম (সা)-এর আগমন পর্যন্ত প্রায় একই অবস্থা বিরাজমান ছিলো। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! একটু চিন্তা করে দেখুন, যাদের মধ্যে নবী করীম (সা) প্রেরিত হলেন আর যারা ছিলো ইসলামের প্রথম সম্বোধিত মানবশ্রেণী, তাদের অবস্থা কত শোচনীয় ছিলো। পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহে রাসূলে আরাবীর শিক্ষাবলী এবং ইসলামের প্রভাবে আরবদের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের বিবরণ পাঠ করে তারা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন যে, নবী করীম (সা)-এর আধ্যাত্মিকতা ও ইসলামের প্রভাব কী বিপুল শক্তির নাম। তাদের এ উপলব্ধি আরো যথার্থ হবে যখন তারা নবী করীম (সা)-এর আবির্ভাবের সমসাময়িক যুগের বিশ্বের প্রতি একটি সামগ্রিক দৃষ্টি বুলিয়ে দেখবেন যে, ইসলাম গোটা বিশ্বের বুকে বিস্তার লাভ করে পৃথিবীর বুকে কী পরিবর্তন সাধন করেছে। তাই আরবদের উল্লিখিত বিবরণ প্রদানের পর জাহিলিয়াতের যুগে আরবদের সমসাময়িক বিশ্বের একটি মোটামুটি চিত্র সংক্ষেপে তুলে ধরা সমীচীন মনে করছি।

ইরান

ইরান বিশ্বের অত্যন্ত প্রাচীন একটি সম্ভ্রান্ত দেশ বলে গণ্য হয়ে থাকে। প্রাচীনকালে এদেশে মাহ্ আবাদী ধর্ম প্রচলিত ছিল। ঐ প্রাচীন ধর্মটির অনেক সংস্কারকও সেদেশে জন্মগ্রহণ করে তাদের ধর্মের সংস্কারকার্যে ব্রতী হন। এর প্রথম পর্যায় শেষ না হতেই যরথুস্ত্র নতুনভাবে অগ্নি উপাসনার ধর্ম চালু করেন। এ ধর্মটিকে 'মাহ্ আবাদী' ধর্মেরই নতুন সংস্কারকৃত রূপ বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। যরথুস্ত্র সত্য ধর্মের প্রচারক বলে নিজের পরিচয় ব্যক্ত করেন। স্বল্পকালের মধ্যেই এ ধর্মটি ইরানী জনসাধারণ ও রাজ-রাজড়ার ধর্মে পরিণত হয়। সম্ভবত ইরানীরাই পৃথিবীতে সর্বাধিক উন্নতি লাভ করে। তাদের চরম উন্নতির যুগে তাদের রাজ্য ভূমধ্যসাগর এবং মিসর থেকে শুরু করে চীন ও মঙ্গোলিয়া পর্যন্ত এবং হিমালয় পর্বত ও পারস্য উপসাগর থেকে খাযর হ্রদ ও আলতাই পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। সমগ্র এশিয়া মহাদেশে তাদের সংস্কৃতির জয়-জয়কার ছিলো। তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও নৈতিকতা এশিয়ার প্রতিটি রাষ্ট্র ও জাতির কাছে অনুকরণ ও অনুসরণযোগ্য বলে বিবেচিত হতো। কিন্তু ইসলামের অভ্যুদয়কাল পর্যন্ত তাদের অবস্থা এতই শোচনীয় হয়ে পড়েছিলো যে, শিরকে লিপ্ত হওয়ার দরুন তারা একে একে তাদের সৌন্দর্য ও সকল সৌকর্য হারিয়ে বসেছিলো। যরথুস্ত্র খোদায়ী গুণসমূহে গুণান্বিত ধরে নিয়ে তারা তাকেও তাদের বাতিল উপাস্যদের তালিকায় শামিল করে নিয়েছিলো। মঙ্গল ও অমঙ্গলের দেবতারূপে তারা ইযদান ও আহরিমন নামে দুইজন দেবতার পূজা করতো। প্রকাশ্যে এবং অত্যন্ত জোরেশোরে আগুনের পূজা হতো। চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্রের পূজা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিলো। দেশব্যাপী চুরি-রাহাজানিরও বেশ প্রকোপ ছিলো। ব্যভিচার এতই চরমে উঠেছিলো যে, মুযদাক নাহিনজার প্রকাশ্য রাজদরবারে ইরান সম্রাটকে তার রাজমহিষীর সাথে সঙ্গম করার পরামর্শ দেয়, অথচ ইরান অধিপতি তার অসঙ্গত ও নির্লজ্জ প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। পারস্পরিক অনৈক্য ও

হিংস্রতা, হানাহানি, হিংসা-বিদ্বেষ, প্রতারণা, সবলদের দুর্বলদেরকে পশুর চাইতে অধম জ্ঞান করার মত সামাজিক অনাচারগুলো তাদেরকে দুর্ভাগ্য ও পতনের দিকে এমনিভাবে ধাবিত করছিল যেমনটি বন্যার পানি নিচের দিকে ধাবিত হয়ে থাকে। ইরান যেনো তখন সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান, নৈতিকতা ও সভ্যতা-সংস্কৃতি শূন্য হয়ে পড়েছিলো। ফলে যে দেশটি একদা সভ্যতা-সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল, তাই যেন তমসাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলো। সে সময় দেশে কেবল যে নক্ষত্রপূজা ও অগ্নিপূজাই হতো তাই নয় বরং বাদশাহ, মন্ত্রীবর্গ, সিপাহসালার এবং আমীর-উমারারা পর্যন্ত নিরীহ প্রজাসাধারণ থেকে পূজা আদায় করে নিত। এ লাঞ্ছনা, বিড়ম্বনা ও তমস্যারাশি থেকে ইরানী রাষ্ট্র ও জাতি নিষ্কৃতি পেল তখনই যখন মুসলমানরা বিজয়ীর বেশে ইরান সীমায় প্রবেশ করলো।

রোম ও গ্রীস

ইরানী সাম্রাজ্যের মুকাবিলায় পৃথিবীর অপর সর্বাধিক শক্তিধর শক্তি ছিল রোমান সাম্রাজ্য। রোম ও গ্রীসের সভ্যতা-সংস্কৃতিও অনেক-প্রাচীন ও গৌরবোজ্জ্বল এবং তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল বিশ্বজোড়া। চিকিৎসা বিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান, তর্কশাস্ত্র, দর্শন ও বিজ্ঞানের উৎকর্ষতায় পৃথিবীর অন্য কোন দেশ গ্রীসের মুকাবিলা করতে পারেনি। এদেশেই সুকরাত[১], বুকরাত লুকমান, আফলাতূন এবং আরাস্তূর মত বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসাবিজ্ঞানী এবং সিকান্দরের মত দিগ্বিজয়ীর জন্ম হয়েছিল। গ্রীসের কায়জার, যাঁর রাজধানী ছিল কনস্টান্টিনোপল, শুধু দেশের বাদশাহই ছিলেন না-একাধারে তিনি বাদশাহ ও ধর্মীয় নেতা বলে গণ্য হতেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও জড়বাদী দিক থেকে এত উন্নতি অগ্রগতি সত্ত্বেও ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকের রোম ও গ্রীস অধঃপতনের এমনি অতল তলে চলে গিয়েছিল যে, ইরানের অধঃপতনকে তার তুলনায় বেশী বলা চলে না। ইরানের খাতকরা যেমন আত্মবিক্রি করে মহাজনদের ঋণ শোধ করতো, তেমনি গ্রীসেও ক্রীতদাস কয়েক ধরনের ছিল। তন্মধ্যে এক ধরনের ক্রীতদাস ছিল তারা যাদেরকে দেশের বাইরে নিয়ে বিক্রি করা চলতো না। কিন্তু সাধারণত ক্রীতদাসদেরকে বহির্দেশে নিয়ে ঠিক তেমনি বিক্রি করা হতো যেমনটি বিক্রি করা হতো গরু, বকরী, উট, ঘোড়া প্রভৃতি চতুষ্পদ জন্তু। মনিব ঠিক তেমনি ক্রীতদাসকে হত্যা করতে পারতো যেমনটি পারে কোন ব্যক্তি তার নিজের পশুপালের যে কোন পশুকে যখন ইচ্ছে যবেহ করতে। পিতা-মাতা তাদের সন্তানকে যথেচ্ছ বিক্রি করে দিয়ে অপরের গোলাম বানিয়ে দিতে পারতো। রোম ও গ্রীসে দাসদের বিয়ে করার অধিকার ছিলো না। তাদের এবং তাদের সন্তানদের মধ্যে আইনগত কোন সম্পর্ক সমাজে স্বীকৃত হতো না।

খ্রিস্টানদের অধঃপতন

হযরত ঈসা (আ)-এর দু'শ বছর পর পর্যন্ত খ্রিস্টানদের মধ্যে রাহিব বা সন্ন্যাসীদের কোন নাম-গন্ধ ছিলো না। কিন্তু ষষ্ঠ শতাব্দীতে সিরিয়া, গ্রীস ও রোমে এদের এতই আধিক্য দেখা

---

১. টীকা : উর্দু-ফার্সী আরবী ভাষায় নামগুলো এভাবেই পরিচিত। আমাদের বাংলাভাষীরা ইংরেজি ভাষা ও সভ্যতার প্রভাবে এগুলোর ইংরেজি জানার সাথেই পরিচিতি বিধায় আমাদের কাছে এ নামগুলো হচ্ছে : ১. সক্রেটিস, ২. হিপোক্র্যাটস, ৩. প্লেটো ৪. (এরিস্টটল) ও ৫. আলেকজান্ডার—অনুবাদক।

দিলো যে, যে কেউ মান-সম্মান ও প্রতিপত্তির জন্যে লালায়িত হতো, সে-ই রাহ্‌বানিয়াত বা সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করতো। এরপর ধীরে ধীরে এ প্রবণতা নারীদের মধ্যেও সংক্রামিত হতে লাগলো। ফলে রাহিব পুরুষ ও রাহিব রমণীদের বাসস্থান গির্জাগুলো লজ্জাজনক কার্যকলাপের কেন্দ্রে পরিণত হলো। রাহিবদের কেউ কেউ প্রান্তরেও বাস করতো। নারীদের প্রাপ্য সম্ভ্রম ও অধিকার এবং পিতামাতার প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা একেবারেই উঠে গিয়েছিলো। চুরি, ব্যভিচার, প্রতারণা সমাজে এমনিভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল যে, কেউ এগুলোকে দূষণীয় বলেও মনে করতো না। এটা ছিলো রাহবানিয়াত বা সন্ন্যাসব্রতের বিস্তৃতিরই ফল। তওহীদ ও খোদাপরস্তির নাম-নিশানাও ছিলো না। সংসার ত্যাগী ধর্মীয় নেতা ও সন্ন্যাসীদের সন্তুষ্টি বিধানেই মুক্তির গ্যারান্টি বা সার্টিফিকেট হাসিল করা হতো। আমীর শ্রেণীর লোকেরা দরিদ্র জনসাধারণকে তাদের সেবক এবং গোলামরূপে ব্যবহারের বৈধ অধিকারী বলে মনে করতো। বাদশাহ ও সিপাহ্‌সালাররা জনসাধারণকে পশুর চাইতে অধিক মর্যাদা দিতো না। তারা নিঃসংকোচ চাষীদেরকে কেবল প্রাণরক্ষা উপযোগী আহার্য দিয়ে তাদের মেহনতের ফসল নিজেরা পুরোপুরিই গ্রাস করতো।

মিসর

মিসরীয় সভ্যতা যে কত প্রাচীন এবং তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি যে কত মাহাত্ম্যপূর্ণ ও শানদার তা উপলব্ধি করার জন্যে মিসরের পিরামিডসমূহ আব্দুল হাওল বা স্ফিংক্স-মূর্তি এবং সম্প্রতিকালে ভূগর্ভস্থিত কক্ষগুলো থেকে উদ্ধারকৃত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাবলী বেশ সহায়ক। মিসর যেহেতু একটি কৃষিপ্রধান দেশ, তাই প্রাচীন মিসরের শক্তিতে যখন একটু ভাটা পড়লো, তখন দেশটি বহিরাক্রমণের শিকারে পরিণত হতে লাগলো। ইরানী, গ্রীক ও রোমানরা বারবার দেশটির উপর হামলা করতে থাকে এবং দীর্ঘকাল পর্যন্ত দেশটি দখল করে রাখে। এসব হামলাকারীদের তাহযীব-তমুদ্দুনও মিসরীয় সংস্কৃতিতে তাদের প্রভাব ফেলে মিসরীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে সমৃদ্ধতর করে তুলবে, এটা মনে করাটাই স্বাভাবিক। রোমানদের শাসনামলে খ্রিস্ট ধর্ম মিসরে প্রবেশ করে। দেশটির অধিবাসীদের এক বিরাট অংশ খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করে ফেলেছিলো। কিন্তু মিসরীয়দের ইসলামে প্রবেশের পূর্বে দেশটির অবস্থা সবদিক দিয়েই অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়েছিলো। খ্রিস্টীয় ধর্মের অবস্থাও মিসরে মূর্তিপূজার চাইতে উন্নততর ছিলো না। মিসরীয় মূর্তি পূজারীদের অবস্থা অন্য যে কোন দেশের প্রতিমা পূজারীদের চাইতেও নিকৃষ্টতর ছিলো। রোমান ও গ্রীক বিজেতা জাতিসমূহের মধ্যে যেসব ব্যাধি বিদ্যমান ছিল মিসরীয়দের মধ্যে সেগুলো নিকৃষ্টতর রূপ নিয়ে অনুপ্রবেশ করে। দাসপ্রথা তার নিকৃষ্টতম ও সর্বাধিক অমানুষিকরূপে সেখানে চালু ছিল। ব্যভিচার ও রাহাজানির প্রতি উৎসাহব্যঞ্জক আইন-কানুন বানিয়ে নেয়া হয়েছিল। নরহত্যা ছিল তাদের জন্যে নেহায়েত মামুলী উপভোগের ব্যাপার। নারীদের আত্মহত্যার জন্যে উৎসাহিত করা হতো। মোদ্দাকথা, মিসরের অবস্থা অন্য কোন জাতির চাইতে কম শোচনীয় ও তমসাচ্ছন্ন ছিলো না। উন্নত সভ্যতা ও রুচিবোধের নিদর্শন মিসরীয়দের আচার-আচরণ ও চরিত্র থেকে সম্পূর্ণরূপে মুছে গিয়েছিল এবং সর্বদিক থেকে দেশটি তিমিরে ছেয়ে গিয়েছিল।

ভারতবর্ষ

অশোক, চন্দ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্যের মতো বড় বড় রাজা-মহারাজা ভারতবর্ষে অতিবাহিত হয়েছেন। জ্যোতির্বিজ্ঞান, অংক, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রে ভারতীয়দের কৃতিত্ব ছিল গৌরবজনক। কৃষ্ণ, রামচন্দ্র ও গৌতম বুদ্ধের মত ধর্ম প্রবর্তকদের কথা এবং রামলীলা ও মহাভারতের শৌর্যবীর্য কাহিনীও তাদের স্মরণ ছিল। কিন্তু যে যুগের বিশ্বকে আমরা পর্যবেক্ষণ করছি ঐ যুগে বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ থেকে বিদায় নিচ্ছিলো। ধীরে ধীরে তার স্থান দখল করে নিচ্ছিলো ব্রাহ্মণ্য ধর্ম। ভারতবর্ষের কোন বড় প্রদেশেই তেমন কোন উল্লেখযোগ্য হুকুমত প্রতিষ্ঠিত ছিলো না। সর্বত্র প্রতিমা পূজার জয়-জয়কার ছিলো। বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয় ধর্মেই প্রতিমাপূজা সমানভাবে মুক্তির উপায় বলে স্বীকৃত ছিলো। ব্রাহ্মণ এবং বৌদ্ধদের দেবমূর্তি অধিকাংশ মন্দিরেই পাশাপাশি স্থান পেতো এবং অত্যন্ত ভক্তি সহকারে ভক্তদের দ্বারা পূজিত হতো। চীনা পরিব্রাজক লিখেন যে, ভারতবর্ষের কোন একটা ঘরও কসম খাওয়া দেবমূর্তি থেকে মুক্ত ছিলো না। বৈষ্ণবদের ঘৃণ্য ও নির্লজ্জ মতবাদ দেশের সর্বত্র জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলো। ব্যভিচারের জন্য মিসরীয়দের মতো আইন-কানুন প্রণীত হয়ে তা রীতিমত আইনসিদ্ধ ও ধর্মভুক্ত হয়ে গিয়েছিলো। সিন্ধুর রাজাদের মধ্য সহোদরা বিবাহের দৃষ্টান্তও স্থাপিত হয়ে গিয়েছিল। যখন স্বয়ং রাজ-রাজড়াদের অবস্থাই যখন এই, তখন প্রজা-সাধারণের অবস্থা যে কত শোচনীয় হতে পারে, তা বলাই বাহুল্য। পুরাণ ও ধর্মীয় গ্রন্থাকারে সে যুগের যে সমস্ত রচনা আজো পাওয়া যাচ্ছে সেগুলোর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ভারতীয়দের চরিত্র ও নৈতিকতা অত্যন্ত নীচ পর্যায়ে নেমে গিয়েছিলো। ঐগুলো সে যুগের সমাজব্যবস্থার অত্যন্তনগ্ন লজ্জাজনক চিত্রই তুলে ধরে। গ্রহ-নক্ষত্র, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু, সর্প, প্রস্তর ও লিঙ্গের পূজা ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিলো। এর দ্বারাই সেকালের ভারতবর্ষের অধঃপতন ও তমসার কথা সহজেই অনুমান করা যায়।

চীন

উপরে আরবের চতুষ্পার্শ্বে অবস্থিত যে দেশগুলোর অবস্থা বিবৃত হয়েছে সে যুগে এগুলোই বিখ্যাত, উন্নত ও সভ্য জাতি বলে গণ্য হতো। এগুলো ছাড়া অপর যে সভ্য জনাকীর্ণ ও শস্য-শ্যামল দেশের নাম নেয়া যায় তা হলো চীন। চীনের অবস্থা উপরিউক্ত দেশগুলোর চাইতেও শোচনীয় ছিল। কনফুসিয়াস, তাও ও বৌদ্ধ ধর্মত্রয়ের রাসায়নিক সংমিশ্রণে সে দেশের তাহ্‌যীব-তমুদ্দুন ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে ঠিক ঐ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যেমনটি হয়ে থাকে সোডা ও টারটারিক এসিডের সংমিশ্রণে। এ অবস্থার পরিবর্তন কেবল তখনই হয়েছিল যখন মুসলমানদের একটি জামাআত চীনে প্রবেশ করে বসবাস করতে শুরু করে এবং নিজেদের চারিত্রিক নমুনা দ্বারা প্রতিবেশীদেরকে প্রভাবান্বিত করে। তুর্কিস্তান, রুশ, ব্রহ্মদেশ, ইউরোপ প্রভৃতি স্থানেও মনুষ্য বসতি বিদ্যমান। কিন্তু সেকালে হয় এসব দেশের অধিবাসীদের সম্পর্কে বিশ্ববাসীরা অনবহিত ছিল নতুবা তারা মানবেতর জীবন যাপন করতো। মোদ্দাকথা তাদের তেমন কোন মানবীয় গুণের কথা জানা যায়নি, যা নিয়ে ঈর্ষা করা চলে।

মোদ্দাকাথা, উপরিউক্ত বিবরণ পাঠে একথা দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে এবং তাঁর আবির্ভাবের যুগে গোটা পৃথিবী তমসাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলো। অজ্ঞতার অন্ধকার তখন বিশ্বব্যাপী এমনিভাবে ছেয়ে গিয়েছিল যে, পৃথিবীর কোন অঞ্চলে তখন একটি নিভুনিভু আলোও পরিদৃষ্ট হচ্ছিলো না।

ইতিপূর্বে পৃথিবীব্যাপী কখনো এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়নি যে, সভ্যতা-সংস্কৃতি, নৈতিকতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মারিফাতে ইলাহী একই সাথে বিলুপ্ত হয়ে গোটা বিশ্ব অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। পৃথিবীর প্রতিটি দেশে আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবী-রাসূল হিদায়াতকারীরা উপর্যুপরি এসে সেসব দেশে বিরাজিত তমসারাজিকে বিদীর্ণ করে রাতের পর দিনের আগমনের মতো সেসব দেশকে আলোয় উদ্ভাসিত করেছেন। কিন্তু এবার যেহেতু গোটা বিশ্বের জন্যে একই হাদীকে প্রেরণ করার পালা ছিল, তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা ইতিপূর্বে সমস্ত হিদায়াতকারী এবং সকল দেশের পথপ্রদর্শকদের দ্বারা প্রচারিত শিক্ষার যুগকে একই সাথে খতম করে দুনিয়ায় সর্বত্র এক নতুন হাদীর প্রয়োজন সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। গোটা বিশ্ব সমকণ্ঠে আর্তনাদ করে এক নতুন হাদীর জন্যে আকুল আকুতি প্রকাশ করছিলো। আল্লাহ্‌ তা'আলা সেই কামিল হাদী ও সর্বশেষ রাসূলকে প্রেরণের জন্যে আরবভূমিকে বেছে নিলেন এবং গোটা ভূ-ভাগের নিশ্চিদ্র অন্ধকার রজনীর অবসান ঘটিয়ে মক্কা মুআযযমায় নবুওয়াত-সূর্যের উদয় ঘটালেন। সে সূর্য উদিত হয়ে গোটা বিশ্বকে আলোকে উদ্ভাসিত করে তুললো। আমাদের এ গ্রন্থের সূচনা সেই সূর্যোদয় থেকেই হওয়ার কথা। কিন্তু তার পূর্বে একটি প্রশ্নের জবাব বাকী রয়ে গেছে আর তা' হলো আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে নবীরূপে প্রেরণের জন্যে আরবের মাটিকেই কেন বেছে নেয়া হলো, অন্য কোন দেশে কেন তাঁকে প্রেরণ করা হলো না।

নবী প্রেরণের জন্যে আরবকে কেন নির্বাচন করা হলো

এ প্রশ্নেরই সবচাইতে সঙ্গত, বুদ্ধিগ্রাহ্য ও মোক্ষম জবাব হচ্ছে, আখিরী যামানার নবী যে দেশেই জন্মগ্রহণ করতেন, সে দেশ সম্পর্কেই এরূপ প্রশ্ন উঠতে পারতো যে, সে দেশকে কেন এজন্যে নির্বাচিত করা হলো ? কেননা, নবী তো শেষ পর্যন্ত কোন একটি দেশেই জন্মগ্রহণ করতেন এবং অন্যান্য দেশ এ গৌরব থেকে বঞ্চিত থাকতোই। সুতরাং এরূপ প্রশ্ন অবান্তর।

দ্বিতীয় জবাব হলো, দুনিয়ার অন্যান্য দেশ প্রাচীন আমলের কোন-না-কোন পর্যায়ে একবার না একবার উন্নতির শিখরে আরোহণ করেছে। তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি, নৈতিকতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান এমন একটি পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে যে তারা তখন গোটা বিশ্বকে তাদের বিজয়ডংকা শুনিয়েছে। সকল জাতিই ইতিহাসের কোন না কোন পর্যায়ে অন্যান্য জাতির উপর প্রাধান্য বিস্তারের সুযোগ পেয়েছে বা অপরের বশ্যতা স্বীকার করেছে। উপরন্তু পৃথিবীর অন্য কোন জাতির ভাষা ততটা উৎকর্ষ ও পূর্ণতা লাভ করতে পারেনি। আরবী ভাষা, সে দেশের ভৌগোলিক ও নৈসর্গিক অবস্থা এবং তার অধিবাসীদের প্রচুর অবকাশের জন্য উৎকর্ষ ও পূর্ণতা লাভে সমর্থ হয়েছিলো। আরব ছাড়াও অন্য কোন দেশে যদি এ কামিল নবীর জন্ম হতো তাহলে তার প্রথম সম্বোধিত জাতি যেহেতু ইতোপূর্বে অন্যান্য জাতিকে দুর্দান্ত প্রতাপে শাসন করেছে তাই এ নবীর হিদায়াত ও তাঁর হিদায়াতনামা পূর্ণ প্রভায় উদ্ভাসিত হতো না বরং সংশ্লিষ্ট জাতির এক বিরাট অংশ তাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের পরিচয়েই পরিচিত রয়ে গিয়েছিলো। এ কামিল নবীর শিক্ষার দ্বারা সভ্যতা-সংস্কৃতি ও চরিত্র শুদ্ধির ক্ষেত্রে যে বিরাট কীর্তি সাধিত হতো তাও ঐ দেশ ও জাতির প্রাচীন ঐতিহ্যের অবদান বলে গণ্য হয়ে আখেরী যামানার নবী ও শেষ আসমানী কিতাবের বাহকের পূর্ণ প্রভা বিকাশের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করতো। কামিল হিদায়াতনামা নাযিলের জন্যে প্রয়োজন ছিল ঐ ভাষার যা' পৃথিবীর যাবৎ ভাষার মধ্যে পূর্ণাঙ্গতার শীর্ষে

আরোহণ করেছে। আরবী ছাড়া এ চিরন্তন ও বিশ্বজনীন হিদায়াতনামার উপযোগী অন্য কোন ভাষা ছিল না এ পৃথিবীতে—যা' কিয়ামতকাল পর্যন্ত সকল দেশের সকল জাতিকে পথ প্রদর্শন করবে। এজন্যেই মহানবী (সা)-এর আরবদেশে জন্মগ্রহণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিলো। আরববাসীরা না কোন দিন অন্য কোন জাতির দ্বারা শোষিত হয়েছে, আর না তারা কোন দিন অন্য কোন জাতিকে শাসন-শোষণ করেছে। তাই আরবদের জন্যে গোটা বিশ্বের সকল দেশ সকল জাতি ছিল একই সমান। তারা যখন ইসলামের আলোকবর্তিকা নিয়ে বেরিয়েছে তখন হিস্পানিয়া অর্থাৎ আটলান্টিক মহাসাগরের পূর্ব উপকূল থেকে চীন তথা চীন সাগরের পশ্চিম উপকূল পর্যন্ত গোটা সভ্য দুনিয়া সকল দেশ সকল জাতি তাদের দৃষ্টিতে সমান ছিলো। তারা সকলের কাছেই পর ছিলেন আর সকলেই তাদের নিকট পর ছিল। তাই আল্লাহ্ তা'আলা যখন গোটা বিশ্বের জন্য এক অভিন্ন ধর্ম সাব্যস্ত করলেন তখন ঐ ধর্ম তিনি এমনি একটি জাতির মাধ্যমে গোটা বিশ্বে প্রচার করলেন, যারা সবার জন্যে সমান এবং একান্তই নিরপেক্ষ। আরবের নৈতিকতা তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির যেহেতু ইতোপূর্বে মোটেই উন্নতি হয়নি তাই ঐ বিশ্বজনীন ধর্ম রাতারাতি তাদেরকে সর্বাধিক শুদ্ধিশুদ্ধ, সর্বাধিক সভ্য ও নৈতিকতামণ্ডিত ও সকল জাতির শিক্ষক ও পথ প্রদর্শকে রূপান্তরিত করে এ সত্যকে সপ্রমাণিত করলো যে, আরবের এ বিস্ময়কর উন্নতির হেতু ইসলামের শিক্ষা ছাড়া আর কিছুই নয়। সাথে সাথে এটাও প্রমাণিত হলো যে, মহানবী (সা) এমনি বিপুল আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী যে, পৃথিবীর প্রতিটি দেশ প্রতিটি জাতি সব যুগে তা থেকে উপকৃত হতে পারে। উপরন্তু পৃথিবীর সকল হাদী সকল পথপ্রদর্শক সকল নবী-রাসূল বিভিন্ন জাতির জন্যে যেসব শিক্ষা ও হিদায়াতনামা নিয়ে এসেছিলেন সেসবের মূলনীতিই কুরআন শরীফের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে :

فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ .

আর উম্মী লকবধারী আরবী নবী (সা)-এর মহান সত্তা সমস্ত পূর্ণতার আঁধার।

ফার্সী কবির ভাষায় :

انچه خوبان همه دارند توتنها داری

তাদের সকলে যত সৌন্দর্য-সৌকর্যের অধিকারী ছিলেন হে মহানবী! আপনি একাই সে সবের অধিকারী।

এই শেষোক্ত বাক্যগুলোকে হয়ত ঐতিহাসিকের গণ্ডির বাইরের বক্তব্য বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু যেহেতু আমি এ ইতিহাস গ্রন্থটি মুসলমান পাঠকদের অধ্যয়নের জন্যই প্রণয়ন করেছি আর আমি আশা করি যে, মুসলমান পাঠকরাই এ গ্রন্থটি বেশী অধ্যয়ন করবেন, আর আমি নিজেও আল্লাহ্র শোকর মুসলমানই। তাই হুযূর (সা)-এর জীবনকথা বিবৃত করতে গিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে বাক্যগুলো বেরিয়ে এসেছে, তা আমি প্রত্যাহার করতে পারতাম না। এটা যদি ঐতিহাসিকদের মজলিসে একটা দোষাবহ কাজ হয়েই থাকে, তা হলে আমি এজন্যে অবশ্যই খুশী যে, ঐতিহাসিকদের দল থেকে আমাকে বহিষ্কার করে দিলেও মুসলমানদের দলে তো আমি অবশ্যই শামিল বলে গণ্য হবো।

দ্বিতীয় অধ্যায়

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম

ভোর হলো

সূর্যোদয়ের প্রাক্কালে পূর্ব গগনে হালকা আলোর আভা দেখা দিতে শুরু করে। উপরেই বর্ণিত হয়েছে, গোটা বিশ্ব তখন অজ্ঞতা ও কুফরের ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন ছিল। সেই বিশ্বজোড়া ঘন আঁধার রাতের অবসানে সূর্যোদয়ের শুভবার্তা ঘোষণার জন্যে ভোরের প্রথম আভা দেখা দিল। যে আরব ভূমি অন্ধকারের কেন্দ্র হয়ে গিয়েছিলো আর মরুপ্রান্তরে শির্‌ক ও পাপের জোর তুফান বয়ে চলছিলো। সেই আরব ভূমিতেই এমন কিছু আলামত জাহির হতে লাগলো যার দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছিল যে, অচিরেই নবুওয়াত-সূর্য উদিত হতে যাচ্ছে।

আরবের জাতিসমূহ হাজার হাজার বছর ধরে লাঞ্ছনা, বিড়ম্বনা, অজ্ঞতা ও গোমরাহীর মধ্যে জীবন-যাপন করে আসছিল। কিন্তু মহানবী (সা)-এর নবুওয়াত লাভ নয় বরং তাঁর জন্মগ্রহণের সময় থেকেই আরব গোত্রসমূহের মধ্যে অভিজাতসুলভ প্রবণতা এবং পাপাচার ও নীচতার প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হতে শুরু করে। ওয়ারাকা ইব্‌ন নাওফিল ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা, উসমান ইবনুল হুওয়ায়রিছ ইব্‌ন আসাদ, যায়দ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নুফায়ল (উমর ইবনুল খাত্তাবের চাচা), উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহাশ প্রমুখ কতিপয় ব্যক্তি একত্রে সম্মিলিত হয়ে নিজেদের ধর্মবিশ্বাস ও আচার-আচরণ সম্পর্কে পর্যালোচনা ও চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন। অবশেষে সকলেই এ ব্যাপারে একমত হন যে, পাথর ও গাছপালার পূজা বর্জনীয়। তাঁরা তখন সঠিক ইবরাহীমী দীনের খোঁজে বিভিন্ন স্থানের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে পড়েন।

ওয়ারাকা ইব্‌ন নাওফিল খ্রিস্টীয় ধর্মে দীক্ষিত হন এবং অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে তাওরাত, ইনজীল প্রভৃতি আসমানী কিতাব অধ্যয়ন করেন। উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহাশ সমতে অটল থাকেন। অর্থাৎ দীনে হানীফ তথা সত্য ধর্মের সন্ধানে ব্যাপৃত থাকেন। ইসলামের অভ্যুদয় পর্যন্ত তাঁর এ অনুসন্ধিৎসা অব্যাহত থাকে। অবশেষে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। সেখানে গিয়ে তিনি খ্রিস্ট ধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়েন। উসমান ইব্‌ন হুওয়ায়রিছ রোম সম্রাটের দরবারে গিয়ে খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত হয়ে পড়েন। যায়দ ইব্‌ন আমর ইয়াহূদ-নাসারাও হলেন না। আবার মূর্তিপূজায় যোগ দিলেন না। তিনি রক্ত এবং মৃত জন্তু ভক্ষণ নিজের জন্যে হারাম করে নেন। তিনি আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং নরহত্যা থেকেও বিরত থাকেন। যখন কেউ তাঁকে ধর্মের ব্যাপারে প্রশ্ন করতো তখন তিনি জবাব দিতেন আমি ইবরাহীম (আ)-এর প্রভুর উপাসনা করি। তিনি মূর্তিপূজার নিন্দাবাদ করতেন এবং নিজ সম্প্রদায়ের লোকজনকে ভর্ৎসনা করতেন এবং তাদেরকে সদুপদেশ দিতেন। তার মুখে প্রায়ই শোনা যেতো :

اَللّٰهُمَّ اَوْ اِنِّى اَعْلَمُ اَىَّ الْوَجْهِ لاَ اَحَبَّ اَلَيْكَ لِعِبَادَتِكَ وَلٰكِنَّ لاَ اَعْلَمُ .

হে আল্লাহ্! যদি আমি নিশ্চিতভাবে জানতে পারতাম যে, কিভাবে তোমার ইবাদত করতে হবে তবে আমি অবশ্যই তোমার ইবাদত করে তোমার সন্তুষ্টি হাসিল করতাম। কিন্তু আমি তো সে সম্পর্কে অজ্ঞ।

এ কথাগুলো বলেই তিনি সিজদায় চলে যেতেন। গণৎকার ও জ্যোতিষীরাও বলাবলি করতে লাগলো যে, আরব দেশে এক মহান নবীর আবির্ভাব হতে যাচ্ছে। অচিরেই তাঁর রাজত্বের সূচনা হবে।

উপরেই বর্ণিত হয়েছে যে, আরব দেশে ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানরাও বসবাস করতো। তাদের ধর্ম-যাজকরাও তাওরাত, ইনজীলের সু-সমাচার জনসমক্ষে বর্ণনা করতে লাগলেন যে, অচিরেই আরব ভূমিতে আখিরী যমানার নবীর অভ্যুদয় হতে যাচ্ছে।

স্বল্পকালের জন্যে ইয়ামান দেশ আবিসিনিয়া সম্রাটের করতলগত থাকে। আবদুল মুত্তালিবের আমলেও ইয়ামান এলাকাটি উক্ত সম্রাটের অধীনে ছিলো। সে সময় আবরাহা ছিলো আবিসিনিয়া রাজ্যের পক্ষ থেকে ইয়ামানের শাসনকর্তা। সে ইয়ামানে একটি উপাসনালয় নির্মাণ করে আরববাসীদেরকে কা'বার পরিবর্তে তার সে উপাসনালয়ে হজ্জ করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু তার সে উদ্দেশ্য সফল হলো না বরং সুযোগ বুঝে কেউ একজন তার সে উপাসনা-মন্দিরকে অবমাননার উদ্দেশ্যে সেখানে মলত্যাগ করে। তার প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে আবরাহা মক্কা আক্রমণ করে এবং খানা কা'বা ধ্বংসের জন্য অগ্রসর হয়। তার সেনাদলে হাতিও ছিল বিধায় আরববাসীরা সে বাহিনীর নামকরণ করে আসহাবুল-ফীল এবং সে বছরের নাম দেয় আম-আলফীল বা হস্তীবর্ষ। মক্কার উপকণ্ঠে পৌছে আবরাহা যখন তাঁবু স্থাপন করলো তখন মক্কাবাসীরা ভীত-সন্ত্রস্ত হলো। কেননা, সে বাহিনীর মুকাবিলা করার সাধ্য তাদের ছিল না। তারা সকলে একত্র হয়ে আবদুল মুত্তালিবকে আবরাহার দরবারে গিয়ে তার একটা বিহিত করার জন্যে গিয়ে ধরলো। আবদুল মুত্তালিব আবরাহার কাছে গিয়ে পৌঁছলেন। তাঁর আভিজাত্যের ছাপমাখা গাম্ভীর্যপূর্ণ চেহারা দর্শনে এবং তাঁর সর্দারীর পরিচয় পেয়ে আবরাহা অভিভূত হলো এবং তাঁকে মর্যাদার আসনে উপবিষ্ট করে তাঁর প্রতি সম্ভ্রম প্রদর্শন করলো। সে তাঁর আগমনের কারণ জিজ্ঞেস করলো। জবাবে তিনি বললেন : আপনার সৈন্যরা আমার (চল্লিশটি, মতান্তরে দু'শ'টি) উট নিয়ে এসেছে। দয়া করে তা ফিরিয়ে দিন। আবরাহা বিস্ময়ের সাথে বললো : আমি তো আপনাকে একজন বিজ্ঞ লোক বলে মনে করতাম। কিন্তু এখন দেখছি আমার সে ধারণা ভুল। আপনি জ্ঞাত আছেন যে, আমি খানা কা'বা ধ্বংস করার জন্যে এসেছি। আপনি নিজের উট উদ্ধারের জন্যে বেশ সচেষ্ট, কিন্তু কা'বা রক্ষার কোন তদবিরই আপনি করছেন না। আবদুল মুত্তালিব মুখের উপর জবাব দিলেন।

انا رب الا بل وللبيت رب يمنعه .

আমি তো কেবল আমার উটের প্রভু। ঐ ঘরেরও একজন প্রভু আছেন। তাঁর ঘর রক্ষার ব্যবস্থা তিনি নিজেই করবেন।

জবাব শুনে আবরাহা ক্ষেপে গেলো। সে বললো, "আচ্ছা, দেখা যাবে মালিক (রাব্বুল বায়ত) কি করে আমাকে বিরত রাখে আর কিভাবে সে তাঁর ঘর রক্ষা করে।"

তারপর তাঁর বাহিনীর উপর ধ্বংস নেমে এলো এবং তারা ভক্ষিত তৃণের মতো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো। আবরাহার প্রতি উচ্চারিত আবদুল মুত্তালিবের এ জবাব এবং তারপর তার এ শিক্ষাপ্রদ ধ্বংস ছিলো আরববাসীদের জন্যে এক বিরাট উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এ ঘটনা আরববাসীদের মনে আল্লাহ্‌র ভয় সৃষ্টি করে। লোকজন এবার অত্যাচার অবিচার খুন-খারাবি করতে রীতিমত ভয় পেতে লাগলো।

আসহাবুল ফীল বা হস্তী বাহিনীর এ ঘটনার অব্যবহিত পরেই ইয়ামান আবিসিনিয়া অধিপতির শাসন-শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়। এবার সাইফ ইব্‌ন যী-ইয়াযন ইয়ামানের শাসন ক্ষমতা দখল করলেন। আবদুল মুত্তালিব কতিপয় কুরায়শ নেতাকে সঙ্গে নিয়ে অভিনন্দন জ্ঞাপন করতে ইয়ামানে গিয়েছিলেন।

সাইফ ইব্‌ন যী-ইয়ামন তার জ্ঞানানুসারে আবদুল মুত্তালিবকে এ সুসংবাদ দেন যে, আখিরী যামানার যে নবীর আগমনের জন্যে পৃথিবীর প্রতিটি দেশ প্রতিটি জাতি উন্মুখ হয়ে অধীর প্রতীক্ষায় দিন কাটাচ্ছে তিনি হবেন তোমারই বংশধর। একথাটি ব্যাপকভাবে প্রচার হয়ে যায়। প্রতিনিধিদলের প্রতিটি সদস্য ভাবতে থাকেন যে, সেই প্রতীক্ষিত নবী তারই বংশে জন্মগ্রহণ করবেন। তারা আহ্‌লে কিতাব সম্প্রদায়ের ধর্মযাজক ও সন্ন্যাসীদের কাছে গিয়ে আখিরী যামানার নবীর নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে খুঁটিনাটি ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জিজ্ঞেস করতে থাকে। উমাইয়া ইব্‌ন আবী খালফের ধারণা হয় যে, এই আখিরী নবী বুঝি তিনি নিজেই হবেন। তিনি আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হার্‌বকে সঙ্গে নিয়ে শাম দেশের দিকে যাত্রা করেন এবং কোন একজন ধর্মযাজকের নিজের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। কিন্তু সেখান থেকে নৈরাশ্যব্যঞ্জক জবাব আসে।

দুনিয়ায় যখনই কোন বড় নবী-রাসূলের নবুওয়াত লাভ বা জন্ম গ্রহণের ঘটনা ঘটেছে তখনই আকাশে ঘন ঘন এবং অস্বাভাবিক হারে নক্ষত্র পতনের দৃশ্য পরিদৃষ্ট হয়েছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্মের প্রাক্কালে অনুরূপ ঘন ঘন ও অস্বাভাবিক হারে নক্ষত্র পতনের ঘটনা ঘটতে থাকে। আহ্‌লে কিতাব সম্প্রদায়ের ধর্মযাজকগণ তখন একে আখিরী যামানার নবীর আবির্ভাবের পূর্বলক্ষণ বলে অভিহিত করেন। সত্যি সত্যি হস্তীবর্ষের ৯ই রবিউল আউয়াল মুতাবিক পারস্য সম্রাট কিসরার চল্লিশতম অভিষেক বর্ষে মুতাবিক ৫৭১ খ্রিস্টাব্দের ২২ শে এপ্রিল সোমবার সুবহে সাদিকের পর ও সূর্যোদয়ের পূর্বে আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ভূমিষ্ঠ হন।

দ্বিতীয় যবীহ্ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব

যমযম কূপের উৎপত্তি হয়েছে হযরত ইসমাঈল (আ) থেকে যখন তিনি আর তাঁর জননী হযরত হাজেরা মক্কার মরুপ্রান্তরে পিপাসায় কাতর হয়ে পড়েছিলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমে সেখানে পানির প্রস্রবণ নির্গত হয়। হযরত হাজেরা তার চারপাশে বাঁধ দিয়ে সে পানিটুকু ধরে রাখেন। এভাবে তা একটি কূপের রূপ পরিগ্রহ করে। কিছু কাল পর তা মাটি ভরাট হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। লোকমুখে যমযম কূপের কথা শোনা যেত, কিন্তু তা কোথায় কেউ বলতে পারত না। যখন আবদুল মুত্তালিবের উপর হাজীদেরকে পানি পান করানোর দায়িত্ব অর্পিত হলো, তখন তিনি যমযম কূপের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হলেন। দীর্ঘকাল পর্যন্ত তিনি আর তাঁর পুত্র হারিছ যমযমের সন্ধানে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও ব্যর্থ হন। কুরায়শ

বংশের একটি লোকও এ ব্যাপারে তাদের কোনরূপ সহযোগিতা করলো না বরং উল্টো এজন্য তারা পিতাপুত্রকে নিয়ে উপহাস করতো।

প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সম্মানিত পিতা

একদিন আবদুল মুত্তালিব স্বপ্নে যমযম কূপের সন্ধান পেয়ে গেলেন এবং সে অনুসারে খননকার্য শুরু করলেন। ঐ স্থানটিতেই আসাফ ও নায়লার মূর্তিদ্বয়ের অধিষ্ঠান ছিল। তাই কুরায়শরা এ খননকার্যে তাঁদেরকে বাধা দিল। এমনকি তারা তাঁদের সাথে লড়তে উদ্যত হলো। পিতা পুত্র দু'জন ছাড়া অপর কেউ তাঁদের সমর্থক ছিল না। কিন্তু সকলে মিলেও তাঁদের সাথে এঁটে উঠলো না। তাঁরা খননকার্য চালিয়ে গেলেন। এ সময় আবদুল মুত্তালিব হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করলেন যে, তিনি একান্তই নিঃসঙ্গ। তখন তিনি মানত করলেন, আল্লাহ্ যদি তাঁকে দশটি পুত্র সন্তান দান করেন আর যমযম কূপের সন্ধানও তিনি পেয়ে যান তাহলে তাঁর একটি পুত্রকে তিনি আল্লাহ্‌র নামে কুরবানী করবেন। কিছুদিনের মধ্যেই যমযম কূপ বেরিয়ে আসলো আর আবদুল মুত্তালিবও আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় একে একে দশটি পুত্র সন্তানের পিতা হলেন। যমযম কূপ উদ্ধারের দরুন আবদুল মুত্তালিবের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং সকলেই তাঁর সর্দারী ও আধিপত্য মেনে নেয়। আবদুল মুত্তালিবের সন্তানরা যখন যৌবনে পদার্পণ করলো তখন তিনি তাঁর মানত পূরণ করতে মনস্থ করলেন। তিনি তাঁর দশ পুত্রকে নিয়ে কা'বা ঘরে উপস্থিত হলেন। হুবল দেবতার সম্মুখে তীর নিক্ষেপ করে দশ ছেলের নামে লটারী করলেন। ঘটনাচক্রে লটারীতে প্রিয়তম কনিষ্ঠ পুত্র আবদুল্লাহ্‌র নাম উঠলো। আবদুল মুত্তালিব মানত পুরা করার জন্যে দৃঢ়সংকল্প ছিলেন। অগত্যা তিনি আবদুল্লাহকে নিয়ে বধ্যভূমির দিকে অগ্রসর হলেন। আবদুল্লাহ্‌র সমস্ত ভাই-বোন এবং কুরায়শ বংশের সর্দাররা হায়! হায়! করে উঠলো। তারা তাঁকে আবদুল্লাহকে কুরবানী করতে বারণ করলেন। কিন্তু আবদুল মুত্তালিব নাছোড়বান্দা। অবশেষে অনেক তর্ক-বিতর্কের পর ব্যাপারটি সাজা নাম্নী এক জ্যোতিষী মহিলার কাছে উত্থাপিত হলো। তিনি বললেন, তোমাদের সমাজে একজন লোকের রক্তপণ হচ্ছে দশটি উট। তোমরা একদিকে দশটি উট আর অপরদিকে আবদুল্লাহ্‌কে রেখে লটারী করে দেখ লটারীর ফলাফল কী দাঁড়ায়। যদি লটারীতে উটের নাম আসে তাহলে দশটি উট যবাহ্ করে দাও। আর যদি আবদুল্লাহ্‌র নামই উঠে, তাহলে আরো দশটি উট যোগ করে বিশটি উটের নামে পুনরায় লটারী করো। এভাবে প্রতিবারে দশটি করে উটের সংখ্যা বৃদ্ধি করে লটারী চলতে লাগলো। কিন্তু প্রতিবারই লটারীতে আবদুল্লাহর নাম উঠতে লাগলো। অবশেষে যখন একদিকে একশ' উট আর অপরদিকে আবদুল্লাহ্‌র নাম দিয়ে লটারী করা হলো, তখন একশ' উটের নামই উঠলো। সন্দেহমুক্ত হওয়ার জন্যে আবদুল মুত্তালিব আরো দু'বার করে লটারী করলেন। কিন্তু না প্রতিবারেই উটের নাম আসতে লাগলো। তখন একশ'টি উট যবাহ্ করা হলো। আর সেদিন থেকেই রক্তপণ একশ'টি উট বলে সাব্যস্ত হলো। আবদুল মুত্তালিবের ঔরসে মোট তেরজন পুত্র এবং ছ'জন কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। তাঁদের বংশপঞ্জি ৭৯ নং পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত হল :

আবদুল্লাহ্

আবদুল মুত্তালিব

গীদাক
কুশম
আবূ তালিব
মুকাওওয়াম
হুজল
হারিস
যুবায়র
হামযা
আব্বাস
যেরার
আবূ লাহাব

আবূ তালিব: তালিব, আকীল, জা'ফর, আলী, উম্মেহানী, হেজানা, তাবূন

আলী: হুসায়ন, হাসান

আকীল: মুসলিম

হুজল: হিন্দ

হারিস: মুর্রা, নওফেল, উমাইয়া, আবূ সুফিয়ান, আবদুল্লাহ্

যুবায়র: উম্মুল হাকীম, সাইয়াআ', তাহির, আবদুল্লাহ্

হামযা: ফাতিমা, ইমাবাত

আব্বাস: তামাম, সুফিয়া, উম্মে হাকীম, কাছীর, ফযল, উবায়দুল্লাহ্, আবদুল্লাহ্, সাবীহ্, মীনা, মাসহার, আবদুর রহমান, মাবা'দ, হারিস

আবূ লাহাব: উতায়বা, উৎবা, খালিদ, রবীয়া'

হস্তীবর্ষের কয়েকদিন পূর্বে আবদুল মুত্তালিব তাঁর পুত্র আবদুল্লাহকে কুরায়শের একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা আমিনা বিন্‌ত ওয়াহাবের সাথে বিয়ে দেন। সে সময়ে আবদুল্লাহ্‌র বয়স ছিল চব্বিশ বছর। ঐ সময়েই আবদুল মুত্তালিব নিজেও আমিনার নিকটাত্মীয় হালা বিন্‌ত উহায়েবের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এই হালার গর্ভেই হযরত হামযা (রা) ভূমিষ্ঠ হন। বিবাহের অল্প কিছুদিন পরেই আবদুল মুত্তালিব তাঁর পুত্র আবদুল্লাহকে ব্যবসা ব্যাপদেশে বাণিজ্য কাফেলার সাথে শাম দেশে প্রেরণ করেন। সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনকালে অসুস্থ হয়ে তিনি মদীনায় আত্মীয়-স্বজনের ওখানে উঠেন এবং পিতা আবদুল মুত্তালিবের কাছে লোক মারফত আপন অসুস্থতার সংবাদ প্রেরণ করেন। প্রিয়তম পুত্রের অসুস্থতার সংবাদে বিচলিত আবদুল মুত্তালিব তাঁর সংবাদ নেয়ার এবং তাঁকে মক্কায় সযত্নে ফিরিয়ে নেয়ার জন্যে অপর পুত্র হারিছকে মদীনায় প্রেরণ করলেন। কিন্তু হারিছ মদীনায় পৌছাবার পূর্বেই আবদুল্লাহ ইন্তিকাল করেন এবং মদীনায় তাঁর আত্মীয় বনী নাজ্জার বংশের গোরস্তানে সমাহিত হন। হারিছ মক্কায় ফিরে এ হৃদয়বিদারক সংবাদ আবদুল মুত্তালিবকে অবহিত করলেন। মৃত্যুকালে আবদুল্লাহ্ পরিত্যক্ত সম্পদরূপে রেখে যান কয়েকটি উট, কয়েকটি ছাগল এবং একটি দাসী উম্মে আয়মনকে।

আমিনা তখন সন্তানসম্ভবা। আল্লাহ্‌র নবী (সা) মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায়ই পিতৃহারা হয়ে গেলেন। মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে আবদুল্লাহ্‌র ইন্তিকাল হয়। আসহাবুল ফিল বা হস্তীর ঘটনার বায়ান্ন বা পঞ্চান্ন দিন পর আল্লাহ্‌র নবী ভূমিষ্ঠ হন। তাঁর মাতৃগর্ভে থাকাকালেই আমিনা স্বপ্নে দেখেন যে, একজন ফেরেশতা এসে তাঁকে বলছেন গর্ভস্থিত সন্তানের নাম যেন আহ্‌মদ রাখা হয়। এজন্যে মা নবজাতকের নাম রাখলেন আহ্‌মদ। আবদুল মুত্তালিব তাঁর আদরের এ পৌত্রটির নাম রাখলেন মুহাম্মদ। ঐতিহাসিক আবুল ফিদার বর্ণনা অনুসারে, লোকজন বিস্ময়ভাবে আবদুল মুত্তালিবকে জিজ্ঞেস করেন যে, বংশের প্রচলিত নামসমূহ বাদ দিয়ে তিনি পৌত্রের এরূপ নামকরণ করলেন কেন ? জবাবে আবদুল মুত্তালিব বলেন যে, তাঁর এ নাতিটি যেন বিশ্বজোড়া সকলের প্রশংসার উপযুক্ত হন এজন্যই তিনি তাঁর এরূপ নামকরণ করেছেন। ইব্‌ন সাআদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় সাধারণত নবজাতকের দেহের সাথে যেসব ময়লা আবর্জনা মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়ে থাকে সেরূপ কিছু মহানবী (সা)-এর প্রসবকালে পরিদৃষ্ট হয়নি। তিনি খাৎনা করা অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হন।

ঐতিহাসিকরা এও বর্ণনা করেছেন যে, তিনি যখন ভূমিষ্ঠ হন ঠিক সেই মুহূর্তে পারস্য সম্রাট নওশেরওয়ার রাজপ্রাসাদে ভূমিকম্প উপস্থিত হয় এবং তার চৌদ্দটি চূড়া ভেঙ্গে পড়ে। অস্তাখরের (পারস্যের) বিখ্যাত অগ্নিকুণ্ড অকস্মাৎ নিভে যায়। তাঁর জন্মের আনন্দে সপ্তম দিনে আবদুল মুত্তালিব পশু কুরবানী করে সমস্ত কুরায়শকে দাওয়াত করে আপ্যায়িত করেন।

বাল্যকাল

জন্মের পর প্রথম সাতদিন আবূ লাহাবের আযাদকৃত দাসী ছুওয়াইবিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে স্তন্যপান করান। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পিতৃব্য হামযাকেও এই ছুওয়াইবিয়া স্তন্যদান করেছিলেন। এ সূত্রে ছুওয়াইবিয়ার পুত্র মাসরূক এবং হযরত হামযা তার দুধ ভাই ছিলেন। জন্মের অষ্টম দিনে আরবের অভিজাত খানদানসমূহের প্রথা অনুযায়ী তাঁকে হাওয়াযিন গোত্রের বনী সাআদ বংশের ধাত্রী হালীমার হাতে অর্পণ করা হয়, যাতে তিনি তাকে স্তন্যদান এবং লালন-পালন

করেন। অভিজাত আরবরা এজন্যেও আপন সন্তানদের বেদুঈন ধাত্রীদের হাতে তুলে দিতেন যেন মরুভূমির মুক্ত হাওয়ায় অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করে শিশুরা পুষ্ট বলিষ্ঠ হয়ে গড়ে উঠে এবং তাদের মুখে সুললিত ভাষাও ফুটে ওঠে। কেননা শহরের ভাষার তুলনায় মরুপল্লীর ভাষা অনেক সুললিত ও মার্জিত হতো। হালীমা সা'দিয়া বছরে দু'বার করে অর্থাৎ প্রতি ছ'মাস অন্তর অন্তর মা আমিনা ও দাদা আবদুল মুত্তালিবকে তাঁদের আদরের শিশু মুহাম্মদকে দেখিয়ে আনতেন। শিশু নবী দু'বছর পর্যন্ত হালীমার দুধপান করেন এবং অতিরিক্ত আরো দু'বছর অর্থাৎ চার বছর পর্যন্ত হালীমার ঘরে বনী সাআদ কবীলায় লালিত-পালিত হন। যখন তাঁর বয়স চার বছর হলো তখন মা আমিনা তাঁকে মক্কায় রেখে দিলেন। তাঁর বয়স যখন ছয় বছর তখন তাঁর আম্মাজান তাঁকে নিয়ে মদীনায় তাঁর আত্মীয়-স্বজনের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতে যান। একমাস সেখানে কাটিয়ে মক্কায় প্রত্যাবর্তনের পথে আবওয়া নামক স্থানে পৌঁছে তিনি ইন্তিকাল করেন। এবার দাদা আবদুল মুত্তালিব তাঁর লালন-পালনের ভার আপন হস্তে তুলে নেন। কোন কোন রিওয়ায়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, শিশু নবী হালীমার কাছে চার বছর নয়, পাঁচ বছরকাল পর্যন্ত লালিত-পালিত হয়েছিলেন এবং আপন মায়ের কাছে কেবল এক বছর কয়েকমাস সময়ই কাটাবার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। তাঁর বয়স যখন পাঁচ বছর তখন একদিন যখন তিনি তাঁর দুধ-ভাই দুধ-বোনদের সাথে মরুভূমিতে ছাগল চরাচ্ছিলেন, তখন তাঁর বক্ষ বিদারণের ঘটনাটি ঘটে। ইব্ন হিশাম রচিত 'সীরাতে রাসূলুল্লাহ্' গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, হালীমা বিন্ত আবূ যুওয়ায়েব বর্ণনা করেন যে, একদা আমার পুত্র দু'টি দৌড়ে আমার কাছে এসে বললো, দু'জন শ্বেত পোশাকধারী আমাদের কুরায়শ ভাইটিকে ধরে নিয়ে গেছে এবং তারা তার বুক চিরে ফেলেছে। আমি এবং আমার স্বামী (হারিছ ইব্ন আবদুল উযযা) দু'জন তখন দৌড়ে সেখানে গিয়ে দেখি তাঁর চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। আমি দৌড়ে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরলাম এবং কি হয়েছে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি বললেন : দু'জন শ্বেত বসনধারী আমার নিকটে এসে আমাকে চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে আমার বুক চিরে দিলেন। তাঁরা আমার হৃৎপিণ্ড বের করলেন এবং তাথেকে কি যেন বের করলেন। হালীমা তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করেও কোন ক্ষত বা রক্তের চিহ্ন খুঁজে পেলেন না। তিনি ভাবলেন বোধ হয় জ্বিন ভূতের আছর হয়েছে। তাই এভাবে আর বেশীদিন তাঁকে তাঁর নিজের কাছে রাখা তিনি সমীচীন মনে করলেন না। তিনি তাঁকে মক্কায় নিয়ে গিয়ে তাঁর আম্মার কাছে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করলেন এবং সাথে সাথে এও বললেন, আমার ধারণা, ছেলের উপর জ্বিন-ভূতের আছর হয়েছে। সব শুনে হযরত আমিনা বললেন, ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই। আমার এ ছেলে ধরাপৃষ্ঠে মহাসম্মানের অধিকারী হবে। সে হবে অসাধারণ। সমস্ত বিপদাপদ থেকে আল্লাহ্ তাঁকে হিফাযত করবেন। কেননা, সে যখন আমার গর্ভে ছিলো, তখন স্বপ্নে ফেরেশতারা তাঁর সম্পর্কে অনেক সুসংবাদ দিয়েছেন এবং তাঁর অনেক অলৌকিক ব্যাপার আমি প্রত্যক্ষ করেছি।

সহীহ্ মুসলিম হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর রিওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, একদিন তিনি মক্কায় ছেলেদের সাথে খেলছিলেন। তখন হযরত জিবরাঈল (আ) তাঁর সকাশে উপস্থিত হলো এবং তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ করে হৃৎপিণ্ড থেকে একটি রক্তবিন্দু বের করে দিয়ে বললেন যে, এটা ছিলো শয়তানের অংশ। তারপর সোনার তশতরীতে যমযমের পানিতে ধুয়ে যথারীতি তা দেহে পুনঃ সংযোজিত করেন।

আবদুল মুত্তালিবের ওফাত

দু'বছর পর্যন্ত আবদুল মুত্তালিবের আদর যত্নে প্রতিপালিত হয়ে তিনি যখন আট বছর বয়সে পদার্পণ করলেন তখন দাদা আবদুল মুত্তালিবও পরলোক গমন করলেন। আবদুল মুত্তালিবের শবাধার যখন গোরস্তানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো তখন তিনিও অশ্রুসজল চোখে তার অনুগমন করছিলেন। আবদুল মুত্তালিব তাঁর মৃত্যুর পূর্বে আপন পুত্র আবূ তালিবকে ডেকে বিশেষভাবে ওসীয়ত করে যান যে, এ ছেলেটির অর্থাৎ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের যত্ন-আত্তিতে তিনি যেন কোনরূপ ত্রুটি না করেন। আবূ তালিব ছাড়াও তাঁর আরো চাচা অর্থাৎ আবদুল মুত্তালিবের আরো অনেক পুত্র ছিলেন। কিন্তু বিচক্ষণ আবদুল মুত্তালিব এজন্যেই তাঁকে আবূ তালিবের হস্তে অর্পণ করেন যে, আবূ তালিব ও আবদুল্লাহ্ ছিলেন একই মায়ের গর্ভজাত সন্তান। তাই আবদুল্লাহ্‌র সন্তানের জন্যে তাঁর দরদই সবচাইতে বেশী থাকার কথা। আবদুল মুত্তালিবের এ ধারণা কালে যথার্থ প্রতিফলিত হয়েছিলো। আবূ তালিব অক্ষরে অক্ষরে পিতার অন্তিম উপদেশ বাস্তবায়িত করে যোগ্য সন্তানের পরিচয়ই দিয়েছিলেন।

আবূ তালিবের ক্রোড়ে

আবূ তালিব নিজের সন্তানদের চাইতেও শিশু নবীকে বেশী আদর-যত্ন করতেন এবং তাঁকে সব সময় চোখে চোখে রাখতেন। তিনি কখনো তাঁকে চোখের আড়াল হতে দিতেন না। এমন কি রাতের বেলায়ও তিনি তাঁকে নিজের কাছেই শোয়াতেন। তাঁর শিশুকাল আরবের অন্যান্য শিশুদের চাইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিলো। ছেলেদের সাথে খেলাধুলা বা পথে পথে ঘুরে বেড়ানোর অভ্যাস তাঁর আদৌ ছিলো না বরং তিনি তাদের সাহচর্য এড়িয়ে চলতেন এবং নির্জনতাই অধিকতর পসন্দ করতেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে যাবতীয় কু-অভ্যাস থেকে হিফাযত করেন। তাঁর শৈশব কালের একটি ঘটনা। কয়েকজন কুরায়শ কিশোর একদিন তাঁকে জোর করে ধরে নিয়ে যায় এক বিয়ের মজলিসে। সেখানে নৃত্যগীতের বেজায় ধুমধাম চলছিল। তিনি মজলিসে উপস্থিত হতেই নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। সারা রাত এভাবে তাঁর নিদ্রায় অতিবাহিত হয়। রাত্রি শেষে যখন নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান শেষে লোকে যার যার ঘরে চলে গেলো তখন তাঁর ঘুম ভাঙ্গলো। এভাবে তিনি একটা ঘৃণিত মজলিসের অপকার থেকে বেঁচে গেলেন।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সাত বছর বয়ঃক্রমকালে কুরায়শরা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কা'বা ঘরের পুনর্নির্মাণ কার্যে হাত দেয়। এ সময় তিনিও অন্যদের সাথে মিলে পাথর কুড়িয়ে এনে দিচ্ছিলেন। চলতে ফিরতে ও পাথর উঠাতে এ সময় লুঙ্গি অনেকটা বাধার সৃষ্টি করছিলো। সাত বছরের একটা বালকের উলঙ্গ হওয়াটা সে সমাজে কোন দূষণীয় ব্যাপার ছিলো না, তাই তাঁর চাচা আব্বাস তাঁকে কিছু না বলেই এক ঝটকা টানে অতর্কিত তাঁর পরনের লুঙ্গি খুলে ফেললেন। শিশু নবী (সা) এতই লাজুক ছিলেন যে, এ অতর্কিত তুচ্ছ ঘটনায়ই তিনি মূর্ছা গেলেন। তাঁর এ অভাবিত লজ্জাশীলতা দর্শনে উপস্থিত সকলেই হতবাক হয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে লুঙ্গি পরিয়ে দেয়া হলো।

প্রথম সিরিয়া সফর

প্রিয়নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বয়স তখন বারো বছর। আবূ তালিব এক বাণিজ্য কাফেলার সাথে ব্যবসা উপলক্ষে সিরিয়া যেতে মনস্থ করলেন। কিশোর নবীকে

তিনি মক্কায়ই রেখে যেতে চাইলেন। কিন্তু আবূ তালিবের হাতে প্রতিপালিত হওয়ার গোটা সময়টায় যেহেতু তিনি চাচার সাথে সাথে রয়েছেন, তাই এবার চাচাকে ছেড়ে একা মক্কায় থাকতে কোন মতেই তাঁর মন মানছিল না। আবূ তালিব তাঁর ইয়াতীম ভাতিজার মনের কথা টের পেলেন এবং যাতে তাঁর মনের কষ্ট না হয় সেজন্যে তাঁকেও সাথে নিয়েই যাত্রা করলেন। সিরিয়ার দক্ষিণাংশে বসরা নামক স্থানে যখন তাঁরা উপনীত হলেন, তখন সেখানে বসবাসকারী খ্রিস্টান রাহিব বা ধর্মযাজক বাহীরা তাঁকে দেখেই আখিরী যামানার নবী বলে তাঁকে শনাক্ত করেন। তিনি আবূ তালিবের নিকট এসে বলেন যে, আপনার এ ভাতিজাটি নবী হবেন। তাওরাত ও ইনজীলে আখিরী যামানার নবীর যেসব নিদর্শন বর্ণিত হয়েছে, সেসবই এর মধ্যে বিদ্যমান। আপনি একে নিয়ে ইয়াহূদীদের দেশে যাবেন না। তারা তাঁর ক্ষতি করবার চেষ্টা করবে। বাহীরা রাহিবের কথা শুনে আবূ তালিব সতর্ক হলেন এবং মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে তার মালপত্র ওখানেই বিক্রি করে দিয়ে ভাতিজাকে নিয়ে মক্কায় ফিরে এলেন। আবূ তালিব এ যাত্রায় সিরিয়ার শহরসমূহে না গিয়েও প্রভূত মুনাফা অর্জন করলেন। একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, আবূ তালিব বাহীরা রাহিবের কথা শুনে কিশোর নবীকে সেখান থেকেই মক্কায় ফেরত পাঠিয়ে দেন আর নিজে কাফেলার সাথে সিরিয়ায় যান।

ফিজারের যুদ্ধ : প্রথমবারের মত যুদ্ধে অংশগ্রহণ

ওকাযে জমজমাট মেলা বসতো প্রতিবছরেই। সেখানে মুশায়েরা বা কবিসভা হতো। ঘোড়-দৌড় হতো, হতো কুস্তি ও সমরকৌশলের প্রতিযোগিতা। আরবের প্রতিটি কবীলাই ছিলো চরম যুদ্ধবাজ। কথায় কথায় তলোয়ার বের হয়ে আসতো খাপ থেকে। ওকাযের মেলায় কী একটা তুচ্ছ কথা নিয়ে হাওয়াযিন ও কুরায়শ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে গেল। প্রথমে তো উভয় কবীলার বিচক্ষণ লোকেরা মধ্যে পড়ে কথা বাড়তে দেননি। ঝগড়া সেখানেই রফা হয়ে যায়। কিন্তু প্রতিটি জাতির মধ্যে দুষ্ট প্রকৃতির লোকই সংখ্যায় বেশী থাকে। এক্ষেত্রেও তাই হলো। ফলে একটা মীমাংসিত ব্যাপারও মীমাংসিত রইলো না। পুনরায় উভয় পক্ষে যুদ্ধ শুরু হলো। মারামারি কাটাকাটি হানাহানিতে পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠলো। এ যুদ্ধটি মুহাররম মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তাই এটা হরবুল ফিজার বা অন্যায় যুদ্ধ নামে অভিহিত হয়। কেননা আরবদের প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী মুহাররম মাসে যুদ্ধবিগ্রহ অত্যন্ত পাপের কাজ ছিল। তাই পূর্ব থেকে চলে আসা যুদ্ধও এ মাসে মুলতবি হয়ে যেতো। এ যুদ্ধটি ছিল চারটি বড় বড় যুদ্ধের এক অবিশ্রান্ত ধারা। এক যুদ্ধের পর আরেক যুদ্ধের তীব্রতা ও ভয়াবহতা হতো অনেক বেশী। কেননা হাওয়াযিন কবীলার পক্ষে কায়স আইলানের সমস্ত শাখা গোত্র এবং কুরায়শের পক্ষে কিনানা কবীলার সমস্ত শাখা গোত্র এসে যুদ্ধে যোগদান করে। ফলে যুদ্ধটি বিস্তৃত হয়ে তা মারাত্মক আকার ধারণ করে। চতুর্থ বা সর্বশেষ যুদ্ধটি ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। এ যুদ্ধে অনেক সর্দার নিজ নিজ পায়ে এজন্য জিঞ্জির বেঁধে নেন যাতে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাবার সুযোগ অবশিষ্ট না থাকে। এই শেষ বা চতুর্থ যুদ্ধে আমাদের মুহাম্মদ (সা) প্রথমবারের মতো অস্ত্র সজ্জিত হয়ে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। বনূ কিনানার প্রতিটি কবীলার ভিন্ন ভিন্ন সিপাহসালার ছিল। সে হিসাবে বনূ হাশিমের সিপাহসালার ছিলেন তাঁর চাচা যুবায়র ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব এবং বৃহত্তর বনূ কিনানা বংশের প্রধান সেনাপতি ছিলেন হারব ইব্‌ন উমাইয়া। হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর বয়স ছিলো তখন পনের বছর। তাঁর উপর দায়িত্ব ছিল চাচাদেরকে তীর কুড়িয়ে

এনে দেয়া। সরাসরি কারো সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সুযোগ তাঁর হয়নি। যুদ্ধের প্রথম দিকে বনী হাওয়াযিনের পাল্লা ভারী ছিলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বনী কিনানাই জয়ী হয় এবং কায়েস বংশীয় কবীলাসমূহ পরাস্ত হয়। ইব্‌ন খালদূনের রিওয়ায়ত অনুসারে ফিজার যুদ্ধের সময় নবী করীম (সা)-এর বয়স ছিল দশ বছর মাত্র। কিন্তু বিশুদ্ধতম মত হলো ফিজার যুদ্ধ ৫৮১ খ্রিস্টাব্দে[১] সংঘটিত হয় আর তখন তাঁর বয়স ছিলো এগার বছর।[২]

বাণিজ্যে গমন

হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যৌবনে পদার্পণ করলে তিনি ব্যবসা করতে মনস্থ করলেন। চাচা আবূ তালিবও তাঁর জন্যে এ পেশা পসন্দ করলেন। তিনি কয়েক বারই ব্যবসাপণ্য নিয়ে যাত্রা করেন এবং প্রতিবারেই ব্যবসায়ে বেশ মুনাফা হয়। এ সব সফরে লোকজন তাঁর বিশ্বস্ততা, আমানতদারী ও চমৎকার লেনদেন প্রত্যক্ষ করে। মক্কা শহরেও যাদের সাথেই তাঁর লেনদেন বা ব্যবসায়িক আদান-প্রদান হয়েছে সকলের কাছেই তিনি অত্যন্ত বিশ্বস্ত, সত্যবাদী ও চমৎকার চরিত্রের লোক বলে প্রতিপন্ন হন। সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবুল হামসা (রা) বলেন, নবুওয়াত পূর্বের ঐ সময়টাতে একবার হযরত নবী (সা)-এর সাথে আমার একটি ব্যবসা সংক্রান্ত লেনদেনের কথা হচ্ছিলো। এমন সময় কোন একটি কাজে একটু বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হয়। তাই কথা শেষ না করেই "আমি একটু আসছি, আপনি অপেক্ষা করুন" বলেই চলে যাই। তারপর তাঁর সাথে আমার এ ওয়াদার কথা আমি ভুলে যাই। তৃতীয় দিনে যখন সেখান দিয়ে আমি যাচ্ছিলাম আমি লক্ষ্য করি যে, তিনি তখনো সেখানে এক ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি আমাকে দেখেই কেবল এটুকুই বললেন, তুমি আমাকে ভীষণ বিপদে ফেলে দিয়েছ। আমি এ পর্যন্ত ঠায় দাঁড়িয়ে তোমার অপেক্ষাই করছি। অনুরূপভাবে সাহাবী হযরত সায়েব (রা) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন কেউ কেউ হুযূর (সা)-এর নিকট তাঁর প্রশংসা করছিলেন। তখন হুযূর (সা) বললেন : আমি সায়েবকে তোমাদের চাইতে বেশী চিনি। তখন হযরত সায়েব (রা) বলে উঠলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার পিতামাতা আপনার জন্যে কুরবান হোক ! একবার ব্যবসায়ে আমি আপনার অংশীদার ছিলাম। আপনার লেনদেন ছিল অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন।

হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা)-এর প্রস্তাব

বনূ আসাদ কবীলার সম্ভ্রান্ত মহিলা খাদীজা বিন্‌ত খুয়ায়লিদ কুরায়শ বংশের একজন ধনাঢ্য মহিলা বলে গণ্য হতেন। তিনি ছিলেন বিধবা এবং ইতিপূর্বে দু'জন স্বামীর ঘর করেছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় স্বামী অনেক ধনসম্পদ রেখে যান। খাদীজা (রা) কর্মচারীদের মাধ্যমে সর্বদা শাম, ইরাক ও ইয়ামানে ব্যবসা পণ্য পাঠাতেন। হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আমানতদারী ও বিশ্বস্ততার খ্যাতির কথা শুনে তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র কাতীহা মারফত প্রস্তাব দিয়ে পাঠান যে, তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে ব্যবসা পণ্য দিয়ে শাম দেশে তাঁর ব্যবস্থাপকরূপে পাঠাতে চান। তিনি চাচা

---

১. এ পুস্তকে প্রদত্ত জন্মসাল (৫৭১ খৃ.)-কে বিশুদ্ধ মেনে নিলে ৫৮১ খৃ. কোনক্রমেই নবী (সা)-এর বয়স এগার বছরের বেশী ছিলো না। তবে এ যুদ্ধটি দীর্ঘ চার বছর পর্যন্ত চলেছিলো বিধায় যুদ্ধের শেষ দিকে চতুর্থ যুদ্ধের সময় তাঁর বয়স পনের বছর হতে পারে।—অনুবাদক

২ কারো কারো মতে ৫৮৪ খৃ.-৫৮৯ খৃ. হরবে ফিজার সংঘটিত হয়।—সম্পাদক

আবূ তালিবের সাথে পরামর্শক্রমে এ প্রস্তাবে সম্মতি দেন। খাদীজা তাঁর জন্য সঙ্গত পারিশ্রমিক ধার্য করেন। যথাসময়ে হযরত মুহাম্মদ (সা) খাদীজার ব্যবসার ব্যবস্থাপকরূপে তাঁর ব্যবসা পণ্য নিয়ে শাম দেশের দিকে যাত্রা করেন। এ সময়ে খাদীজার ক্রীতদাস মায়সারা এবং জনৈক প্রিয়জন হাকীম ইব্‌ন হিযামও প্রিয়নবী মুহাম্মদ (সা)-এর সফরসঙ্গী ছিলেন।

সিরিয়ায় দ্বিতীয় সফর

হযরত খাদীজা (রা)-এর ব্যবসাপণ্যসহ বাণিজ্যিক কাফেলার সাথে হযরত মুহাম্মদ (সা) শাম দেশে প্রবেশ করে একটি উপাসনালয়ের নিকট তাঁবু স্থাপন করেন। এ উপাসনালয়ে নাস্তুরা নামক একজন ধর্মযাজক বাস করতেন। নাস্তুরা তাঁকে দেখতে পেয়েই তাঁর উপাসনালয় থেকে কয়েকটি আসমানী কিতাব নিয়ে এলেন এবং হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর দেহাবয়ব ও চেহারা তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। তিনি একবার কিতাবের দিকে আর একবার হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর দিকে দেখতে লাগলেন। তিনি হযরত নবী (সা)-এর চেহারার সাথে কিতাবের বিবরণ মিলিয়ে দেখছিলেন। তাঁর এ অদ্ভুত হাবভাব লক্ষ্য করে, খুযায়মার মনে সন্দেহ দেখা দিলো। তিনি চিৎকার করে উঠলেন ইয়া আলে গালিব ! অর্থাৎ হে গালিব বংশীয়রা ! বাঁচাও ! বাঁচাও !! তার এ চীৎকার শুনে কুরায়শরা চতুর্দিক থেকে এসে সমবেত হলো। কুরায়শদেরকে এভাবে তেড়ে আসতে দেখে নাস্তুরা রীতিমত ঘাবড়ে গেলেন। তিনি দৌড়ে গিয়ে তার উপাসনালয়ের ছাদে উঠলেন। সেখান থেকেই তিনি কাফেলার লোকদেরকে লক্ষ্য করে বললেন : তোমাদের ভয়ের কোন কারণ নেই। আমি আসমানী কিতাবসমূহের সাথে তোমাদের সঙ্গীটির অবস্থা মিলিয়ে দেখলাম। আখিরী যামানার নবীর যেসব নিদর্শনের কথা কিতাবে বর্ণিত হয়েছে তার সবক'টি নিদর্শনই এর মধ্যে বিদ্যমান। শুনে সকলে আশ্বস্ত হলেন। এ যাত্রায়ও কাফেলার পণ্য বিক্রি করে প্রচুর মুনাফা হলো। এভাবে কয়েকবারই খাদীজার ব্যবসা পণ্য নিয়ে তিনি বাহ্‌রায়ন, ইয়ামান ও সিরিয়ায় যাত্রা করেন এবং প্রতিবারই ব্যবসায় প্রচুর মুনাফা হয়।

শাদী মুবারক

হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আমানতদারী ও বিশ্বস্ততা, উন্নত চালচলন ও নিষ্কলুষ চরিত্রের কথা হযরত খাদীজা (রা)-এর কাছে গোপন ছিলো না। মক্কার প্রতিটি ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁকে শাদী করার জন্যে অত্যন্ত লালায়িত থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজে নুফায়সা নাম্নী মহিলার মাধ্যমে এবং অন্য রিওয়ায়াত অনুসারে আতিকা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিবের মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর কাছে শাদীর প্রস্তাব পাঠালেন। চাচা আবূ তালিবও এ প্রস্তাব অনুমোদন করলেন। তিনিই শাদীর খুতবা পড়ালেন। এ শাদীর মজলিসে আমর ইব্‌ন আসাদ, ওয়ারাকা ইব্‌ন সাওফিল প্রমুখ, হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা)-র সমস্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন এবং অনুরূপ হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আত্মীয়-স্বজনরাও উপস্থিত ছিলেন। বিবাহের সময় হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর বয়স পঁচিশ বছর এবং হযরত খাদীজা (রা)-এর বয়স চল্লিশ বছর ছিল। হযরত খাদীজা (রা)-এর গর্ভে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর তিন পুত্র এবং চার কন্যার জন্ম হয়।

সাদিক ও আল-আমীন খিতাব

হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সততা, সদাচরণ, আমানতদারী, বিশ্বস্ততা ও উন্নত চরিত্রের খ্যাতি মক্কার সীমানা ছাড়িয়ে গোটা আরবে এতই ছড়িয়ে পড়ে যে, কেউ কেউ আর তাঁকে নাম

ধরে ডাকতো না। সকলেই তাঁকে আস-সাদিক অথবা আল-আমীন বলে ডাকতো। গোটা আরবে এ নামটি বলতেই সকলে তাঁর কথাই বুঝতো এবং এ নামেই লোকে তাঁকে এক ডাকে চিনতো বা স্মরণ করতো। নিখিল ভারত থিওসফিক্যাল সোসাইটির নেত্রী বিখ্যাত ইংরেজ মহিলা মিসেস এনি বেসান্ত লিখেন :

শ্রেষ্ঠ নবীর [হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর] যে গুণটি আমার অন্তরে তাঁর প্রতি ভক্তির সঞ্চার করেছে, তা হলো তাঁর সেই অনন্য বিশেষণ যা তাঁর স্বদেশবাসীকে তাঁকে আল-আমীন (পরম বিশ্বস্ত) নামে অভিহিত করতে বাধ্য করেছিল। মুসলিম অ-মুসলিম নির্বিশেষে সকলের কাছে এর চাইতে বেশী অনুসরণযোগ্য ব্যাপার আর কিছুই হতে পারে না। যাঁর গোটা সত্তা সততা ও সত্যবাদিতার প্রতিমূর্তি, তিনি যে সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত তাতে সন্দেহের অবকাশ কোথায়? সত্যের পয়গাম-বাহক কেবল এমন ব্যক্তিই হতে পারেন।

হিলফুল ফুযুল

প্রাচীনকালে আরবের কতিপয় মহৎ ব্যক্তি মিলে এ মর্মে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন :

আমরা সর্বদা মজলুমদের সাহায্য করবো এবং জালিমদেরকে প্রতিরোধ করবো।

ঘটনাচক্রে যারা এ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয়েছিলেন এদের প্রত্যেকের নামই ছিল ফযল শব্দযুক্ত। এজন্যে তাঁদের এ প্রতিজ্ঞা বা চুক্তি 'হিলফুল ফুযূল' নামে খ্যাতিলাভ করে। এ সংগঠনটির অস্তিত্ব লোপ পেয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু আলোচনা তখনও লোকমুখে প্রচলিত ছিলো। ফিজারের যুদ্ধের পর হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর চাচা যুবায়র ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিবের মনে এ চুক্তি তথা সংগঠনটিকে পুনর্জীবিত করার প্রেরণা দেখা দেয়। কতিপয় মহৎ ব্যক্তি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাদআনের বাড়ীতে একত্রিত হয়ে এ মর্মে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন :

"আমরা সর্বদা জালিমদেরকে প্রতিরোধ করবো এবং মজলুমদেরকে সাহায্য করবো।"

হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর বয়স তখন অল্প হলেও তিনিও এ চুক্তিতে শামিল ছিলেন। তারপর তিনি যখন যৌবনে পদার্পণ করলেন তখন তিনি অধিকাংশ কবীলার সরদার এবং বিজ্ঞ লোকদেরকে দেশের প্রচলিত অরাজকতা, পথচারীদের লুণ্ঠিত হওয়া, দরিদ্রদের প্রতি ধনী ও আমীর ব্যক্তিদের অত্যাচার–অনাচারের কথা বলে তাদেরকে এ অবস্থায় নিরসনের জন্যে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। অবশেষে বনূ হাশিম, বনূ আবদুল মুত্তালিব, বনূ যুহরা ও বনূ তামীমের লোকদের সমন্বয়ে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রতিটি সদস্যকে অঙ্গীকার করতে হয় :

(ক) আমরা দেশের অরাজকতা ও অশান্তি দূর করবো।

(খ) আমরা পথিকদের জানমালের হিফাযত করবো।

(৩) আমরা নিঃস্ব দরিদ্রদেরকে সাহায্য করবো।

(ঘ) সবলদেরকে দুর্বলদের প্রতি অত্যাচার অবিচার করা থেকে বিরত রাখবো।

এ সংগঠনের দ্বারা জনগণের প্রভূত উপকার সাধিত হয়। নবুওয়াত লাভের পরও হুযূর (সা) বলতেন : যদি আজো কেউ আমাকে সেই অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সাহায্যার্থে আহবান করে তবে আমি তার ডাকে সাড়া দেবো।

কুরায়শ কবীলাসমূহের মধ্যে বিবাদ মীমাংসাকারী হিসেবে

একদা কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে কা'বা ঘরে আগুন ধরে যায় এবং এর ফলে কা'বা ঘরের দেওয়ালের স্থানে স্থানে ফাটল দেখা দেয়। কুরায়শরা ইমারতটি ভেঙ্গে ফেলে নতুনভাবে তা নির্মাণ করতে মনস্থ করে। সকলে তো এ মর্মে সম্মতি দিলো কিন্তু কেউই এ ইমারতটি ভাঙ্গতে সাহসী হলো না। অবশেষে কুরায়শ সরদারদের মধ্যে ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরা এ কাজটি শুরু করেন। তাঁর দেখাদেখি এ অপসারণ কার্যে অন্যান্য কবীলার লোকেরাও অংশগ্রহণ করলো। এ সময় জেদ্দা বন্দরের নিকটে একটি জাহাজ বিধ্বস্ত হয়। সংবাদ পেয়ে কুরায়শরা লোক পাঠিয়ে তা খরিদ করে এবং উটে বোঝাই করে তার কাঠ মক্কায় নিয়ে আসে। এ কাঠ কা'বা ঘরের ছাদের জন্যে কেনা হয়েছিল।

কা'বা ঘরের প্রাচীর ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে যখন ইব্রাহীমী ভিত্তির গোড়া পর্যন্ত তারা পৌঁছে গেল, তখন পুনর্নির্মাণের কাজ তারা শুরু করলো। ছাদের কাঠ যেহেতু পরিমাণে কম ছিল তাই সেবার তারা কা'বা ঘর ইবরাহীমী ভিতের উপর পুরোপুরি সম্পন্ন করতে পারলো না বরং একদিকের কিছু অংশ তারা বাদ দিয়ে দিল। প্রাচীরের কাজ যখন হাজরে আসওয়াদের স্থান পর্যন্ত পৌঁছলো তখন কুরায়শ কবীলাসমূহের মধ্যে এক বিরাট সংঘাত দেখা দিল। প্রত্যেক কবীলার সর্দার নিজ হাতে এ পবিত্র কাল পাথরটি কা'বা প্রাচীরে স্থাপন করার জন্যে লালায়িত ছিলো। এ নিয়ে তুমুল যুদ্ধ বাঁধবার উপক্রম হলো। প্রত্যেক গোত্রের লোক তুলোয়ার কোষমুক্ত করে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেল। বনূ আবদে-দার এজন্যে প্রয়োজন হলে মরতে বা মারতে প্রস্তুত বলে কসম খেয়ে বসলো। এ কলহে পাঁচ দিন পর্যন্ত নির্মাণ কার্য মুলতবি রইলো। অবশেষে কুরায়শ কবীলাসমূহ এর একটা সুরাহা করার উদ্দেশ্যে কা'বা ঘরে সমবেত হলো। আবূ উমাইয়া ইব্ন মুগীরা প্রস্তাব করলেন : সর্বপ্রথম যে ব্যক্তিটি কা'বা ঘরে প্রবেশ করবেন তাঁকেই এর ফায়সালার ভার অর্পণ করা হোক। এমনি সময় লোকজন দেখতে পেলো হুযূর (সা) কা'বা ঘরে প্রবেশ করলেন। সকলেই 'আল-আমীন' 'আল-আমীন' বলে সমস্বরে চীৎকার করে উঠলো। তারা জানালো যে, তিনি এ ব্যাপারে যে ফায়সালা করবেন, 'তাতেই সকলে রাযী থাকবে।

এখানে প্রণিধানযোগ্য, যে মর্যাদাটি লাভের জন্য প্রতিটি কবীলা লালায়িত ছিল এবং রক্তভর্তি পেয়ালায় অঙ্গুলি ডুবিয়ে ডুবিয়ে সে যুগের প্রথামত যে সম্মানটি অর্জনের জন্যে সকলেই মরতে এবং মারতে কসম খেয়ে বসেছিল সে মহাসম্মানের ফায়সালার ভার হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর সমর্পণ করতে কারো কোন দ্বিধা ছিল না। এ থেকে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, হযরতের বিশ্বস্ততা ও ন্যায়নিষ্ঠার প্রতি সকলেরই অগাধ আস্থা ছিল। ব্যাপারটি অনুধাবন করতে পেরে তিনি তৎক্ষণাৎ সে কলহ দূর করে দিলেন। কুরায়শ বংশের প্রবীণ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা পর্যন্ত তখন তাঁর এ অপূর্ব ন্যায়নিষ্ঠা ও বিচক্ষণতা দেখে অভিভূত হয়ে যান এবং সকলেই মারহাবা বলে তাঁকে অভিনন্দিত করেন। তিনি এর ফায়সালা করেন এভাবে, একটি চাদর বিছিয়ে স্বহস্তে তাতে হাজরে আসওয়াদ স্থাপন করেন এবং সকল কবীলার সরদার সে চাদরের চতুর্দিকে ধরে পাথরটি বহন করে নিতে বলেন। কুরায়শ সরদাররা তাঁর কথামত চাদরের চতুর্দিকে ধরে পাথরটি যথাস্থানে বয়ে নিয়ে যায়। হযরত মুহাম্মদ (সা) তখন আপন হস্তে তা উঠিয়ে প্রাচীরে স্থাপন করে দেন। এতে সকলেই খুশী হলো এবং কারো বলার কিছু রইলো না। এ ঘটনায় উতবা ইব্ন রবী'আ ইব্ন আবদে শামস,

আসওয়াদ ইব্‌ন মুত্তালিব ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন আবদুল উজ্জা, আবূ হুযায়ফা ইব্‌ন মুগীরা ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মাখদূম এবং কায়স ইব্‌ন আদী আস্‌-সাহামী অগ্রণী ছিলেন। এরা যেমন করেই হোক এ ব্যাপারটির একটি সুরাহা কামনা করছিলেন। হযরত নবী (সা)-এর এ ফায়সালায় তাঁরা অত্যন্ত মুগ্ধ হন। ঘটনাচক্রে এ নিয়ে যদি যুদ্ধ বাঁধতো তাহলে এ হতো জাহিলিয়াত যুগে সংঘটিত এ যাবৎ কালের সবচাইতে প্রচণ্ড ও ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। হাজরে আসওয়াদের সমস্যা সমাধানকালীন এ ঘটনার সময় হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর বয়স ছিলো পঁয়ত্রিশ বছর।

গরীবদের লালন-পালন

মান-মর্যাদা ও জনপ্রিয়তায় সম্ভবত তিনিই ছিলেন মক্কার শীর্ষস্থানীয় পুরুষ। কেউ তাঁর শত্রু ছিল না। সকলেই তাঁকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার চোখে দেখতো এবং ভালবাসতো। তাঁর বিচক্ষণতা, সুন্দর চালচলন, বিশ্বস্ততা ও আমানতদারীর দেশজোড়া খ্যাতি ছিল। ব্যবসা তাঁর পেশা ছিলো। খাদীজা (রা)-এর সঙ্গে শাদী হবার পর বেশ সচ্ছলতার সাথেই তাঁর জীবন অতিবাহিত হচ্ছিলো। একবার দেশে খুব দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তাঁর চাচা আবূ তালিবের পরিবারের লোকসংখ্যা ছিল বেশী। খান্দানের প্রবীণতম ব্যক্তি এবং বনী হাশিম গোত্রের সরদার রূপে তাঁর প্রভূত সম্মান ছিল। কিন্তু সাংসারিক সচ্ছলতার অভাবে খুব কষ্টেই তাঁর জীবিকা নির্বাহ হতো। চাচার এ অর্থকষ্ট লক্ষ্য করে একদিন তিনি তাঁর অপর চাচা আব্বাসকে লক্ষ্য করে বললেন, আজকাল দেশে দারুণ দুর্ভিক্ষ চলছে। আবূ তালিবের সংসার বড়। তাঁর পুত্রকে আপনি আপনার সংসারে নিয়ে যান আর একজনকে আমি আমার সংসারে নিয়ে আসি। এভাবে তাঁর সাংসারিক বোঝা বেশ হালকা হয়ে যাবে। তাঁর এ পরামর্শ আব্বাসের খুবই মনঃপূত হলো। তাঁরা দু'জনে তখন আবূ তালিবের খিদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁদের প্রস্তাব তাঁর কাছে পাড়লেন। জবাবে আবূ তালিব বললেন : আকীলকে তো আমার কাছে থাকতে দাও আর অন্যদেরকে ইচ্ছে হলে তোমরা নিয়ে যেতে পার। সে মতো হযরত জা'ফরকে হযরত আব্বাস নিয়ে গেলেন আর হযরত আলীকে হযরত মুহাম্মদ (সা) তাঁর নিজ ঘরে নিয়ে আসলেন। এটা ঐ বছরেরই ঘটনা, যে বছর কা'বা ঘর পুনর্নির্মাণ করা হয়েছিল। কিন্তু এটা কা'বা নির্মাণের সময়কার উপরোক্ত ঘটনার পূর্ববর্তী ঘটনা। তখন হযরত নবী (সা)-এর বয়স ছিল পঁয়ত্রিশ বছর আর হযরত আলী (রা)-এর বয়স ছিলো পাঁচ বছর।

যায়দ ইব্‌ন হারিছ-এর প্রতি স্নেহ

হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা)-এর ভাতিজা হাকীম ইব্‌ন হিযাম কোথা থেকে যেন একটা ক্রীতদাস কিনে এনে তাঁর ফুফু হযরত খাদীজা (রা)-কে দান করেন। হযরত খাদীজা (রা) তাকে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর খিদমতে সমর্পণ করেন। এরই নাম ছিল যায়দ ইব্‌ন হারিছা। আসলে ইনি একজন স্বাধীন খ্রিস্টান বংশের সন্তান ছিলেন। কোন এক লুটপাটের সময় তিনি ধৃত হয়ে ক্রীতদাসরূপে বিক্রিত হয়ে যান। কিছুদিন পর তাঁর পিতা হারিছা এবং চাচা কাআব যখন জানতে পারলেন যে, তাদের ছেলে যায়দ মক্কার কোন একটি পরিবারে দাসরূপে বসবাস করছেন, তখন তাঁরা উভয়ে মক্কায় এসে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হয় এবং বিনীতভাবে প্রার্থনা জানান যে, তাদের ছেলেটিকে যেন তিনি মুক্ত করে দেন। হযরত মুহাম্মদ

(সা) তৎক্ষণাৎ তাঁদের আবেদন মঞ্জুর করেন এবং বলেন যে, যায়দ যদি তোমাদের সাথে চলে যেতে চায়, তবে আমার পক্ষ থেকে তার অনুমতি রইলো। সাথে সাথে যায়দকে ডাকানো হলো। হযরত মুহাম্মদ (সা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এদেরকে চিনতে পারছো? জবাবে যায়দ বললেন, জ্বী হাঁ। এরা হচ্ছেন আমার পিতা ও চাচা। হযরত মুহাম্মদ (সা) বললেন, এরা তোমাকে নিতে এসেছেন। আমার পক্ষ থেকে তোমার যাবার অনুমতি আছে। জবাবে যায়দ বললেন : আমি আপনাকে ছেড়ে কোথাও যাবো না। তখন তাঁর পিতা হারিছ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, তুই কি স্বাধীনতার উপর গোলামীকেই প্রাধান্য দিচ্ছিস? যায়দ মুখের উপর বললেন, জ্বী হাঁ। আমি মুহাম্মদ (সা)-এর মধ্যে এমন কিছু প্রত্যক্ষ করেছি যে, তাঁর মুকাবিলায় আমি পিতাকে কেন, সারা পৃথিবীরও প্রাধান্য দিতে পারি না। হযরত মুহাম্মদ (সা) যায়দের মুখে এ জবাব শুনে তৎক্ষণাৎ তাঁর হাত ধরে কা'বা ঘরে উপস্থিত হলেন এবং চীৎকার করে ঘোষণা করলেন, "লোক সকল ! তোমরা সাক্ষী থেকো, আজ থেকে আমি যায়দকে মুক্ত করছি এবং তাকে আমার ছেলে রূপে গ্রহণ করছি।" সে হবে আমার উত্তরাধিকারী এবং আমি হবো তার উত্তরাধিকারী। যায়দের পিতা ও পিতৃব্য তা দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলো এবং যায়দকে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর কাছে খুশীমনেই রেখে গেলেন। সেদিন থেকে যায়দ ইব্‌ন হারিছ হলেন যায়দ ইব্‌ন মুহাম্মদ (সা)। কিন্তু হিজরতের পর যখন মহানবীর প্রতি ওয়াহী নাযিল হলো যে পালক পুত্রকে পুত্র বলা যাবে না, তখন থেকে আবার সকলে তাঁকে যায়দ ইব্‌ন হারিছা নামেই ডাকতে থাকেন। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সা) তাঁকে পূর্ববৎ ভালবাসতে থাকেন বরং তাঁর এ অনুরাগ আরো বৃদ্ধি পায়। এ ঘটনা দ্বারাই বোঝা যায় যে, নবুওয়াতের পূর্বেও মুহাম্মদ (সা)-এর চরিত্র কত উন্নত ছিল।

আল্লাহ্‌র দিকে মনোনিবেশ

বত্রিশ অথবা পঁয়ত্রিশ বছর বয়ঃক্রমকালে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আল্লাহ্‌তে অনুরাগ বৃদ্ধি পায় এবং তিনি অত্যধিক নির্জনতাপ্রিয় হয়ে উঠেন। তিনি প্রায়ই একটি জ্যোতি (নূর) দেখতে পেতেন এবং এতে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হতেন। এ জ্যোতির মধ্যে কোন আকার দেখা যেতো না বা কোন আওয়াজও শোনা যেতো না। আরবের মুশরিকী প্রথা-পদ্ধতির প্রতি তিনি সর্বদাই বিমুখ ছিলেন। একদা মক্কায় প্রতিমা পূজারীরা কোন উৎসব উপলক্ষে তাঁর সম্মুখে দেবমূর্তির প্রতি উৎসর্গীকৃত খাবার রেখে দেয়। তিনি সে খাবার যায়দ ইব্‌ন আমরের দিকে ঠেলে দিলেন। কিন্তু তিনিও তা খেলেন না, বরং প্রতিমা পূজারীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, আমরা দেবমূর্তির নামে উৎসর্গিত খাবার খাই না। ইনি হচ্ছেন সেই যায়দ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নুফায়ল, যার কথা উপরে বর্ণিত হয়েছে এবং যিনি হযরত উমর (রা)-এর চাচা ছিলেন। তিনি নির্জনতার মুহূর্তগুলোতে আল্লাহ্‌র সৃষ্টিলীলা সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতেন এবং অধিকাংশ সময়ই আল্লাহ্‌র গুণগানে রত থাকতেন। মুশরিকী কার্যকলাপ ও প্রথা-পদ্ধতি থেকে পুরোপুরি দূরে থাকতেন। বয়স চল্লিশ বছরের যতই নিকটবর্তী হতে লাগলো তাঁর নির্জনবাস ততই বৃদ্ধি পেতে লাগলো। প্রায় সময়ই তিনি ছাতু ও পানি নিয়ে হেরা পর্বতের গুহায় চলে যেতেন এবং সেখানে গিয়ে বেশ কয়েকদিন পর্যন্ত যিকির-আযকার ও ইবাদতে নিমগ্ন থাকতেন। যখন ছাতু ও পানি শেষ হয়ে যেতো তখন ঘরে এসে পুনরায় ছাতু ও পানি নিয়ে যেতেন এবং পুনরায় আল্লাহ্‌র ইবাদতে নিমগ্ন হতেন। হেরা গুহা হলো হেরা পর্বতের একটি গুহা। হেরা পর্বতকে

আজকাল 'জাবালে নূর' বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। মক্কা থেকে তিন মাইল দূরে মিনায় যেতে এ পাহাড়টি বাঁয়ে পড়ে। এ গুহাটি দৈর্ঘ্যে চার গজ এবং প্রস্থে দুই গজ। এ অবস্থায় তিনি সত্য স্বপ্ন দেখতেন। পরদিন প্রত্যূষে অনুষ্ঠিতব্য ঘটনাবলী তিনি রাত্রে স্বপ্নে প্রত্যক্ষ করতেন। এভাবে দীর্ঘ সাতটি বছর তাঁর আল্লাহর ইবাদতের সাধনায় অতিবাহিত হয়। শেষে দু'টি মাস এভাবে কাটে যে তিনি যেন ইবাদতের প্রতিমূর্তি হয়ে দাঁড়ান। হেরা পর্বতের গভীর নির্জনতায় তিনি এ সময়টা পুরোপুরিই নিমগ্ন থাকেন এবং এ সময় উপর্যুপরি তিনি সত্য স্বপ্ন দেখতে থাকেন।

সূর্যোদয়

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বয়স চল্লিশ বছর পূর্ণ হলো। হিদায়াতের রবি এবার উদয়াচলে। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাঁকে প্রদত্ত আধ্যাত্মিক শক্তি যখন চরমভাবে বিকশিত হলো, ইবাদত, সিয়াযত ও নির্জন সাধনায় পূর্ণতা লাভ করে যখন তিনি ওয়াহী বহনের পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করলেন তখন একদা হেরা গিরি গুহায় ফেরেশতার আবির্ভাব ঘটলো।

ফেরেশতা তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন : اِقْرَأْ-অর্থাৎ "আপনি পড়ুন!"

তিনি জবাব দিলেন : مَا اَنَا بِقَارِئٍ –"আমি তো পড়তে জানি না।"

তারপর তিনি তাঁকে আলিঙ্গন করে জোরে চাপ দিলেন এবং বললেন : اِقْرَأْ।

তিনি আবার জবাব দিলেন : مَا اَنَا بِقَارِئٍ

তিনি আবার তাঁকে আলিঙ্গন করে জোরে চাপ দিলেন। তারপর ছেড়ে দিয়ে পুনরায় বললেন : اِقْرَأْ। পুনরায় তিনি জবাব দিলেন : مَا اَنَا بِقَارِئٍ

এবার তৃতীয়বার ফেরেশতা তাঁকে আলিঙ্গন করে জোরে চাপ দিয়ে বললেন :

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ . خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ . اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ .

পড় সেই রব-এর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে যিনি জমাট রক্তপিণ্ড থেকে সৃষ্টি করেছেন। পড় এবং তোমার রব-ই সবচাইতে সম্মানিত ও মহান। যিনি কলমের দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না। (৯৬ : ১-৫)

প্রিয়নবী (সা) পাঠ করলেন। ফেরেশতা অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তিনি সেখান থেকে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় ঘরে ফিরলেন এবং খাদীজা (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন : زَمِّلُوْنِىْ زَمِّلُوْنِىْ "আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও। আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও।" হযরত খাদীজা (রা) তাঁকে কম্বল দিয়ে আবৃত করে দিলেন। তিনিও রীতিমত ঘাবড়ে গেলেন যে, ব্যাপার কী! কিছুক্ষণ পরে যখন তিনি কিছুটা শান্ত হলেন, তখন তিনি সমস্ত বিবরণ আনুপূর্বিক খাদীজাকে শোনালেন এবং বললেন : لقد خشيت على نفسى "আমার তো ভয় হচ্ছে আমি বুঝি আর বাঁচবো না।"

হযরত খাদীজা (রা)-এর ঐতিহাসিক সান্ত্বনা বাণী

জবাবে হযরত খাদীজা (রা) বললেন :

كلا البشر فوالله لا يحزيك الله ابدا انك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق .

"কখনো তা হতে পারে না। আপনি শান্ত হোন! আল্লাহ্ আপনাকে কখনো লাঞ্ছিত অপদস্থ করতে পারেন না। কেননা–

(ক) আপনি সর্বদা আত্মীয়-স্বজনের সাথে ঘনিষ্ঠ আচরণ করেন (তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন না বা অনাত্মীয়সুলভ আচরণ করেন না।)

(খ) সর্বদা সত্য কথা বলেন।

(গ) অপরের বোঝা বহন করেন (কর্জ প্রভৃতি শোধ করেন।)

(ঘ) নিঃস্বদের দেখাশোনা করেন।

(ঙ) অতিথিদের সেবা-যত্ন করেন।

(চ) বিপদগ্রস্তদের সাহায্য করেন এবং সত্যের সহায়তা করেন।

এভাবে সান্ত্বনা দেওয়ার পর তিনি তাঁকে নিয়ে তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইব্ন নাওফিলের কাছে যান। তিনি তখন অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ওয়ারাকা ইব্ন নাওফিলের কাছে সবকিছু আনুপূর্বিক বর্ণনা করেন। সব শুনে ওয়ারাকা বললেন : ইনি হচ্ছেন সেই মহান ফেরেশতা যিনি মূসা (আ)-এর কাছে এসেছিলেন। হায়, যদি আমি যুবক হতাম এবং ঐ সময় পর্যন্ত জীবিত থাকতাম যখন আপনার স্বজাতি আপনাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করবে। হুযূর (সা) তখন বললেন :

او مخرجوهم

"কি, তারা আমাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করবে?"

ওয়ারাকা ইব্ন নাওফিল বললেন, "জ্বী হাঁ। এ পৃথিবীর যিনিই রাসূল এসেছেন, তিনিই একত্ববাদের দাওয়াত দিয়েছেন, লোকে প্রথমে তাঁদের সাথে শত্রুতাই করেছে।" তারপর যথারীতি তিনি হেরা গুহায় যাতায়াত করতেন। কিছুদিন পর্যন্ত আর তাঁর কাছে কোন ওয়াহী আসে নি। এ সময়টাকে ফাতরা বা বিরতিকাল বলা হয়ে থাকে।

অবশেষে একদিন তিনি হেরাগুহা থেকে বাড়ীতে ফিরছেন এমন সময় তিনি সেই ফেরেশতাকে দেখতে পেলেন। তিনি তাঁকে দেখে রীতিমত ঘাবড়ে গেলেন এবং ঘরে এসে বস্ত্রাবৃত হয়ে শুয়ে পড়লেন। এ সময় তাঁর কানে এ গুরুগম্ভীর আওয়াজ এলো ঃ

يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرْ . قُمْ فَاَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ . وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ . وَالرُّجْزَ فَاجْرُ

হে বস্ত্রাচ্ছাদিত ! উঠো এবং লোকদেরকে (আল্লাহ্র শাস্তি থেকে) সতর্ক কর। এবং তোমার রব-এর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। এবং তোমার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখ এবং অপবিত্রতা শির্ক ও খারাবি থেকে দূরে থাক। (৭৪ : ১-৫)

তারপর একের পর এক ওয়াহী আসা অব্যাহত থাকে। একদা হযরত জিবরাঈল আমীন হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে পাহাড়ের পাদদেশে নিয়ে যান। তাঁর সম্মুখে নিজে ওযূ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-ও তাঁর দেখাদেখি অনুরূপ ওযূ করেন। তারপর জিবরাঈল (আ) তাঁকে নামায পড়ালেন।

ইসলাম প্রচারের সূচনা

তাওহীদ প্রচারের হুকুম পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাওহীদের তথা ইসলামের প্রচারকার্য শুরু করেন। লোকজনকে শির্ক থেকে বিরত রাখার এবং তাওহীদ বা আল্লাহ্র একত্বের দাওয়াতের কাজ তিনি নিজ ঘর থেকেই শুরু করেন। সর্বপ্রথম হযরত খাদীজা (রা) তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করেন। হযরত আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) এবং যায়দ ইব্ন হারিছা (রা) প্রথম দিনই তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করেন। এরা সবাই ছিলেন তাঁর ঘরের মানুষ। তাঁর বন্ধু হযরত আবূ বকর (রা)-ও ঈমান আনয়ন করেন। সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারীদের একজন ছিলেন তাঁর সহধর্মিণী, একজন চাচাতো ভাই, একজন আযাদকৃত ক্রীতদাস আর একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বলা বাহুল্য, এদের প্রত্যেকেই তাঁর আচার-আচরণ সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন এবং তাঁর জীবনের কোন দিক এদের কাছে গোপন ছিলো না। এদের সর্বপ্রথম ঈমান আনয়ন তাঁর উন্নত চরিত্রের একটি বলিষ্ঠ প্রমাণ। প্রথমে তিনি তাঁর এ প্রচারকার্য গোপনে গোপনে নিকটাত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন। প্রথম পর্যায়ে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) সবচাইতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। তাঁর বন্ধুমহল কুরায়শদের মধ্যে অনেক বিস্তৃত ছিলো। তাঁরই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে হযরত উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা), হযরত তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ (আ), হযরত সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা), হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা), হযরত যুবায়র ইব্ন আওয়াম (রা) প্রমুখ ঈমান আনয়ন করেন। এরপর হযরত আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা), হযরত আবূ সালামা (রা), হযরত আবদুল আসাদ ইব্ন হিলাল (রা), হযরত উছমান ইব্ন মাজউন (রা), হযরত কুদামা ইব্ন মাজউন (রা), হযরত সাঈদ ইব্ন যায়দ (রা), হযরত উমর (রা)-এর ভগ্নি হযরত ফাতিমা (রা) প্রমুখও ইসলামে দাখিল হন। এঁদের পরে হযরত সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাসের সহোদর হযরত উমায়র (রা), হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা), হযরত জা'ফর ইব্ন আবূ তালিব (রা) প্রমুখ ঈমান আনয়ন করেন এবং এ ভাবে মুসলমানদের একটি ছোটখাট জামাআত তৈরী হয়ে যায়। এঁদের মধ্যে নারী-পুরুষ, যুবা, বৃদ্ধা সর্বশ্রেণীর লোক ছিলেন। মুশরিকদের ভয়ে মুসলমানরা মক্কার বাইরে পাহাড়ের ঘাঁটিতে গিয়ে সালাত আদায় করতেন। তিন বছর পর্যন্ত ইসলামের প্রচারকার্য এভাবে গোপনে গোপনেই হতে থাকে এবং শনৈঃ শনৈঃ লোকজন শির্ক ও মূর্তিপূজা থেকে বিমুখ হয়ে ইসলামে দাখিল হতে থাকে। এ তিন বছর পর্যন্ত কুরায়শদের প্রতিটি মজলিশে এ নতুন ধর্মের কথা আলোচিত হতে থাকে। মুসলমানরা যেহেতু নিজেদের নবধর্মে দীক্ষিত হওয়ার কথা প্রচার করতেন না, তাই তাদের নিজেদের মধ্যেও একে অপরকে মুসলমান বলে সম্বোধন করতে পারতেন না। কুরায়শরা প্রথম দিকে এ নতুন ধর্মকে তেমন গুরুত্বপূর্ণ বা মারাত্মক কিছু বলে মনে করেনি। তাই তারা এ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো এবং মুসলমানদেরকে মৌলিকভাবে কষ্ট দিতো। সামগ্রিকভাবে এ নতুন ধর্মকে উৎখাত করার জন্যে সমস্ত সম্প্রদায়ের লোকজন সক্রিয় হয়ে উঠেনি। কুরায়শের কোন কোন দুষ্ট লোক ফাঁক পেলেই দুর্বলতার সুযোগে মুসলমানদেরকে

দৈহিক নির্যাতন করতেও ছাড়তো না। একবার হযরত সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রা) মুসলমানদের একটি ঘাঁটিতে সালাত আদায় করছিলেন। অতর্কিতে সেখানে কয়েকজন মুশরিক মক্কাবাসীর আগমন ঘটলো। তারা অত্যন্ত কঠোরভাবে মুসলমানদেরকে সালাত আদায়ে বাধা দিলো। হযরত সাআদ (রা)-ও অত্যন্ত শক্তভাবে তার মুকাবিলা করেন। একজন বিধর্মী হযরত সাআদ (রা)-এর তরবারির আঘাতে আহতও হয়। আল্লাহ্‌র রাস্তায় এটাই ছিলো মুসলমানদের সর্বপ্রথম তরবারি চালনা।

একদিন প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও হযরত আলী (রা) একটি ঘাঁটিতে সালাত আদায়ে রত ছিলেন। এমন সময় কোথা থেকে আবূ ত্বালিব এসে সেখানে উপস্থিত। তিনি নীরবে দাঁড়িয়ে তা লক্ষ্য করলেন। তারপর যখন তাঁদের সালাত শেষ হলো, তখন তিনি বললেন : এ কোন্ ধর্ম তোমরা গ্রহণ করলে ? হযরত মুহাম্মদ (সা) নির্বিকারে জবাব দিলেন : এটাই হচ্ছে ইবরাহীম (আ)-এর ধর্ম। সাথে সাথে তিনি চাচাকেও এ ধর্ম গ্রহণের দাওয়াত দিলেন। জবাবে আবূ তালিব বললেন : আমি তো আমার বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করবো না। কিন্তু হযরত আলী (রা)-কে উদ্দেশ করে বললেন : বেটা, তুমি কিন্তু মুহাম্মদ (সা)-এর সঙ্গ পরিত্যাগ করবে না। আমার গভীর আস্থা রয়েছে যে, মুহাম্মদ তোমাকে পুণ্য ছাড়া কোনদিন পাপের উৎসাহ দিবেন না। মোদ্দাকথা, ওয়াহী অবতীর্ণ হওয়ার দিন থেকে শুরু করে তিন বছরকাল পর্যন্ত ইসলামের প্রচারকার্য নীরবে নিভৃতে চলতে থাকে এবং সৌভাগ্যবানরা ধীরে ধীরে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হতে থাকেন।

সাফা পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে প্রথম সত্য-ঘোষণা

এবার আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্দেশ এলো ওয়াহীর মাধ্যমে :

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ

(হে রাসূল!) আপনি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছেন তা প্রকাশ্যে প্রচার করুন।

এ নির্দেশ আসার পর প্রিয়নবী (সা) সাফা পাহাড়ে আরোহণ করলেন এবং এক একটি করে কবীলার নাম ধরে সবাইকে উচ্চৈঃস্বরে আহবান জানাতে লাগলেন। আরবের তৎকালীন প্রথা অনুসারে লোকজন এসে তাঁর চতুষ্পার্শ্বে জমায়েত হলো। তখন তিনি বললেন :

اخبرتكم ان العدو مصبحكم او ممسكم اما كنتم

হে কুরায়শ, আমি যদি তোমাদেরকে সংবাদ দেই যে, সকালে অথবা সন্ধ্যায় তোমাদের উপর শত্রুর আক্রমণ হবে। তাহলে কি তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস করবে ?

সকলে সমস্বরে বলে উঠলো : "আলবৎ, আমরা সব সময় আপনাকে সত্যকথা বলতে শুনেছি।" এবার হযরত মুহাম্মদ (সা) বলে উঠলেন :

"আমি তোমাদেরকে সংবাদ দিচ্ছি, আল্লাহ্‌র শাস্তি অতি নিকটবর্তী। তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করো, যাতে করে তাঁর শাস্তি থেকে রেহাই পেতে পারো।"

তাঁর কথা শুনে কুরায়শরা হেসে উঠলো। আবূ লাহাব বলে উঠলো, "তোমার জন্য ধ্বংস আসুক : এজন্যেই কি তুমি আমাদেরকে ডেকে এনেছো ?"

এরপর সমাবেশ ভঙ্গ হয়ে গেলো। লোকজন যার যার ঘরে নানা কথা বলাবলি করতে করতে চলে গেলো। আবূ লাহাব উঠে যেতেই নাযিল হলো : تَبَّتْ يَدَا اَبِىْ لَهَبٍ সূরা। আরো কয়েকদিন পর নাযিল হলো :

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ

অর্থাৎ নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক করুন (হে রাসূল!)।

হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আলী (রা)-কে একটি যিয়াফতের আয়োজন করতে বললেন। হযরত আলী (রা) নির্দেশ মাফিক যিয়াফতের আয়োজন করলেন। হযরত মুহাম্মদ (সা) নিকটাত্মীয়দেরকে দাওয়াত করলেন। প্রায় চল্লিশজন আত্মীয়-স্বজন এলেন। যখন সকলের খাওয়া-দাওয়া শেষ হলো তখন তিনি কিছু বক্তৃতা করতে চাইলেন। কিন্তু আবূ লাহাব এমনি আজে-বাজে কথাবার্তা শুরু করে দিলো যে, লোকজন একে একে চলে গেলো। হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর কথা বলার কোন সুযোগই আর হয়ে উঠলো না। পরদিন আবার সবাইকে দাওয়াত দেওয়া হলো। সকলের খাওয়া দাওয়া শেষ হলে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদেরকে সম্বোধন করে বললেন :

> দেখো, আমি তোমাদের নিকট এমন উত্তম কথা নিয়ে এসেছি যার চাইতে উত্তম কথা কেউ কোনদিন তার স্ব-সম্প্রদায়ের জন্যে নিয়ে আসেনি। বলো, তোমাদের মধ্যে কে কে এ কাজে আমাকে সাহায্য করবে?

একথা শুনে সকলেই নিশ্চুপ হয়ে রইলো। কারো মুখেই কোনো জবাব শোনা গেলো না। এমনি সময় হযরত আলী (রা) দাঁড়িয়ে বললেন :

> যদিও আমি বয়সে সবার চাইতে ছোট এবং সবচাইতে দুর্বল,
> আমি আপনাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে প্রস্তুত রয়েছি।

তাঁর এ কথা শুনে সবাই হেঁসে উঠলো এবং ঠাট্টা-মশকরা করতে করতে প্রস্থান করলো।

প্রকাশ্য প্রচার

এবার রাসূলুল্লাহ (সা) প্রকাশ্যে লোকজনকে তাওহীদ ও ইসলামের দাওয়াত দিতে লাগলেন। এ সময়েই তাঁর উপর এবং তাঁর ছোট দলটির উপর দুর্ভোগ নেমে এলো। মেলায়, মজলিসে, বাজারে, বৈঠকখানায় তথা ঘরে ঘরে গিয়ে তিনি লোকজনকে তাওহীদের সৌন্দর্য বোঝাতে লাগলেন এবং মূর্তিপূজা করতে নিষেধ করতে লাগলেন। তিনি ব্যভিচার, জুয়া, মিথ্যা কথন, বিশ্বাসভঙ্গ, চুরি-ডাকাতি, রাহাজানি প্রভৃতি অনাচারের পথ থেকে লোকজনকে ফিরিয়ে আনার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। কুরায়শরা ছিলো ভীষণ দাম্ভিক প্রকৃতির। তাদের বাপদাদার ধর্ম ও আচার-আচরণের নিন্দাবাদ শুনে যাওয়া তাদের পক্ষে মোটেই সহজ ব্যাপার ছিলো না। তাদের মধ্যে মনিব ও গোলামের পার্থক্য বা ভেদাভেদ ছিলো একটা স্বীকৃত ব্যাপার। ইসলাম মনিব ও গোলামের এ পার্থক্যকে মিটিয়ে দিয়ে একই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে সবাইকে আবদ্ধ করে ছিলো। এ সাম্যও তাদের মনঃপূত ছিলো না। কুরায়শ ও মক্কাবাসীদের মর্যাদা গোটা আরবে স্বীকৃত ছিলো। তাঁদের এ মর্যাদা ছিলো সেই মূর্তিগুলোর জন্যে যেগুলোর পূজার জন্যে গোটা আরব থেকে বিভিন্ন কবীলার লোক মক্কায় ছুটে আসতো এবং মূর্তি পূজার আনুষ্ঠানিক উৎসব

পালন করতো। ইসলাম ছিল মূর্তিপূজার ঘোর বিরোধী। যার ফলশ্রুতিতে তাদের মান-মর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি খর্ব হওয়া ছিল অনিবার্য। বড় বড় সরদাররা কোনমতেই একথা মেনে নিতে রাযী ছিলো না যে, মহানবীর আনুগত্য মেনে নিয়ে তারা তাদের নিজ নিজ সরদারী থেকে হাত গুটিয়ে নেবে। কুরায়শদের অধিকাংশ কবীলার লোকজন এমনিতেই বনূ হাশিম গোত্রের প্রতি অন্তরে বিদ্বেষ পোষণ করতো। এজন্যে তারা একথা কোনমতেই মেনে নিতে পারছিল না যে, একটা প্রতিদ্বন্দ্বী গোত্রের একজন লোককে নবীরূপে স্বীকার করে নিয়ে তারা তাঁর আনুগত্য করবে। এ প্রকাশ্য প্রচারের ফলে সমস্ত কুরায়শ বংশ তাঁদের শত্রুতায় অবতীর্ণ হলো এবং তারা ইসলাম ও তার নবী (সা)-এর মূলোৎপাটন করার জন্যে সক্রিয় হয়ে উঠলো। কুফ্র ও ইসলামের এ প্রকাশ্য সংঘাত নবুওয়াতের চতুর্থ বছরে অত্যন্ত জোরে-শোরে শুরু হয়ে যায়।

ইসলামের প্রথম মাদরাসা-দরস্গাহ

এ সময়েই হযরত নবী (সা) সাফা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত আরকাম ইব্ন আরকাম (রা)-এর বাড়ীকে ইসলামের দরস্গাহ বা শিক্ষাগাররূপে ব্যবহার করতে শুরু করেন। নবদীক্ষিতরা এ বাড়ীতে এসে ইসলামের শিক্ষা দিতেন, তা'লীম দিতেন। এ বাড়ীতে সর্বদা মুসলমানদের ভিড় লেগেই থাকতো। হযরত মুহাম্মদ (সা) এখানে বসেই সকলকে ইসলামের শিক্ষা দিতেন এবং এখানেই সকলে মিলে একত্রে সালাত আদায় করতেন। নবুওয়াতের ষষ্ঠ বছর পর্যন্ত পুরো তিন বছর এই দারুল-আরকামই ছিলো প্রিয় নবী (সা)-এর অবস্থানস্থল এবং ইসলামের প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ। এ তিন বছরে যারাই ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাদেরকে আদি পর্যায়ের মুসলমানদের মর্যাদা দেয়া হয়ে থাকে। দারুল আরকামে ইসলাম গ্রহণকারীদের তালিকায় হযরত উমর ফারূক (রা)-এর নামই হচ্ছে সর্বশেষ নাম। তাঁর ইসলাম গ্রহণের ফলে মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং তাঁরা দারুল আরকাম থেকে মুক্তাঙ্গনে বেরিয়ে এলেন। কুরায়শরা যখন হযরত রসূল (সা) ও তাঁর দলের মূলোৎপাটনকে একান্তই অপরিহার্য বলে বিবেচনা করলো, তখন তারা নির্যাতনের নতুন নতুন পন্থা অবলম্বন করলো।

কুরায়শদের বিরোধিতা

ঈমান আনয়ন করে যাঁরা মুসলমান হলেন, তাঁদের মধ্যে এমন লোকও ছিলেন যাঁরা ক্রীতদাস। আর কিছু লোক এমনও ছিলেন যাঁরা কবীলা বা গোত্রের বল বা আত্মীয়-স্বজনের সংখ্যা প্রচুর না থাকায় সমাজে অত্যন্ত দুর্বল বলে বিবেচিত হতেন। এমন লোকদেরকে ইসলামচ্যুত করার জন্যে বিরুদ্ধবাদীরা তাঁদেরকে দৈহিকভাবে নির্যাতন করতে শুরু করলো। যাঁরা কোন কবীলাভুক্ত ছিলেন তাদেরকে নির্যাতন করলে তাঁদের আত্মীয়-স্বজন তাঁদের সমর্থনে দাঁড়িয়ে যেতে পারে এরূপ আশঙ্কায় তারা তাঁদের আত্মীয়-স্বজনকেই ইসলাম গ্রহণকারী নিকটাত্মীয়দেরকে শাস্তি দিয়ে ও নির্যাতন চালিয়ে ধর্মচ্যুত করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করতে লাগলো। যাতে কেউ ইসলাম গ্রহণে সাহসী না হয় তজ্জন্য মুসলমানদেরকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার এবং তাদেরকে প্রকাশ্যে নিন্দাবাদ করার জন্যে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হলো। এদিকে হযরত রাসূল (সা)-ও ইসলামের প্রকাশ্য প্রচারকার্যের মাত্রা বাড়িয়ে দিলেন। ওদিকে কুরায়শরাও পূর্ণ উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে বিরোধিতার জন্যে কোমর বাঁধলো। হযরত বিলাল (রা) ছিলেন উমাইয়া ইব্ন খালফের ক্রীতদাস। তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা জানতে পেরে উমাইয়া তাঁকে

নানারূপ পীড়া দিতে থাকে। মরুভূমির উত্তপ্ত বালিতে তাঁকে শুইয়ে দিয়ে বুকের উপর ভারী পাথর চাপা দিয়ে রাখা হতো। বেত্রাঘাতে গোটা দেহ জর্জরিত করা হতো। ভুখা রাখা হতো। গলায় রশি বেঁধে দুষ্ট ছেলেদের হাতে তাঁকে তুলে দেয়া হতো। তারা তাঁকে মক্কার অলিতে-গলিতে, শহরে-বাইরে, পাহাড়-পর্বতে ও মরুপ্রান্তরে টেনে নিয়ে ফিরতো এবং বেদম মারপিট করতো। হযরত বিলাল (রা) এ সব নির্যাতনই সহ্য করে যেতেন আর মুখে 'আহাদ' 'আহাদ' উচ্চারণ করতেন।

হযরত আম্মার (রা) তার পিতা ইয়াসির এবং মাতা সুমাইয়ার সাথে একত্রে মুসলমান হন। আবূ জাহেল তাঁদেরকে নানারূপে ক্লেশ দিতো। জালিম আবূ জাহেল হযরত সুমাইয়া (রা)-কে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে বর্শার আঘাতে শহীদ করে। হযরত যুবায়র (রা)-কে আবূ জাহেল এতই প্রহার করে যে, প্রহারের ফলে তিনি অন্ধ হয়ে যান। এমন গোলাম-বাঁদীর সংখ্যা প্রচুর যাঁদেরকে এত কঠোর ও অমানবিক নির্যাতন করা হয় যে, এগুলো কল্পনা করতেও শরীর শিউরে উঠে। কিন্তু ইসলাম এমনি এক শক্তি যে, ঐ নিষ্ঠুর নরপিশাচের এতরূপ নির্যাতন করেও কোন একটি মুসলমানকেও ইসলামচ্যুত করে মুরতাদ বানাতে সমর্থ হয়নি।

হযরত উসমান (রা) ছিলেন বনী উমাইয়া গোত্রের একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি। ইসলাম গ্রহণের অপরাধে তাঁর চাচা রশি দিয়ে তাকে বেঁধে বেদম প্রহার করে এবং নানাভাবে দৈহিক নির্যাতন চালায়। হযরত যুবায়র ইব্ন আওআম (রা)-কে তাঁর চাচা চাটাইর উপর শুইয়ে দিয়ে তাঁর নাকে ধোঁয়া দিতো। হযরত আবূ যর গিফারী (রা)-কে কুরআন পড়তে শুনে কুরায়শরা এরূপ প্রহার করে যে, তাঁর সংজ্ঞা লোপ পায় এবং তিনি ভূমিতে লুটিয়ে পড়েন। তারা তাঁকে প্রাণে বধ করতেই উদ্যত হয়েছিল। এমন সময় হযরত আব্বাস (রা) এই বলে তাদেরকে বাধা দেন যে, এ হচ্ছে বনী গিফার গোত্রের লোক। তোমাদের বাণিজ্য কাফেলা চলার পথেই এদের বাস। এরা তোমাদের নাকে দম এনে তবে ছাড়বে। অর্থাৎ বাণিজ্য কাফেলার পথ রুদ্ধ করে অর্থনৈতিকভাবে তোমাদেরকে অবরোধ করবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা)-কেও অনুরূপভাবে কা'বা প্রাঙ্গণে প্রহার করতে করতে তারা বেহুঁশ করে ফেলে। অনুরূপভাবে হযরত খাব্বাব ইব্ন আরাতকে তারা নানাভাবে নির্যাতন করে। একবার জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর তাঁকে চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে এক ব্যক্তি তাঁর বুকের উপর চেপে বসে যাতে তিনি পার্শ্ব পরিবর্তন করতে না পারেন। তাঁর কোমরের চামড়া ও গোশত পুড়ে গিয়ে কাবাব হয়ে যায়। কোন কোন সাহাবাকে গরু বা উটের কাঁচা চামড়ার মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলে দিত। কাউকে কাউকে লোহার বর্ম পরিয়ে জ্বলন্ত আগুনে এবং জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর ফেলে দিতো।

নবী করীম (সা)-এর সাথে ধৃষ্টতামূলক আচরণ

হযরত মুহাম্মদ (সা) একদিন খানায়ে কা'বায় সালাতরত ছিলেন। এমন সময় উক্বা ইব্ন আবী মু'আইত তাঁর গলায় চাদর ফেলে এভাবে পেচাতে লাগলো যে, তাঁর শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছিল। সংবাদ পেয়ে হযরত আবূ বকর (রা) দৌড়ে আসলেন এবং তাঁকে দুষ্টের কবল থেকে উদ্ধার করলেন। সাথে সাথে তিনি কুরায়শদেরকে লক্ষ্য করে বললেন :

اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلاً اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّىَ اللّٰهُ .

তোমরা কি এক ব্যক্তিকে কেবল এ অপরাধেই হত্যা করবে যে, সে বলে আমার রব আল্লাহ্ ?

তখন কাফিররা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে তো ছেড়ে দিলো কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা)-কে ঘিরে ফেললো এবং তাঁকে বেদম প্রহার করলো।

একবার কা'বা প্রাঙ্গণে কাফিররা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে লাঞ্ছিত করতে উদ্যত হয়। হযরত হারিছ ইব্ন আবী হালা (রা) সংবাদ পেয়ে দৌড়ে এসে সেখানে উপস্থিত হন এবং তাঁকে দুষ্টদের কবল থেকে রক্ষার প্রয়াস পান। কাফির নরপিশাচরা তাঁকে সেখানেই শহীদ করে ফেলে ! কিন্তু আর তাঁর গায়ে হাত তোলার সাহস কারো হয় নি। রাতের বেলা হযরত রাসূল (সা) যে পথ দিয়ে চলাফেরা করতেন, তাঁকে কষ্ট দেওয়ার মানসে সে পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখা হতো।

একবার প্রিয় নবী (সা) কা'বা প্রাঙ্গণে সালাত আদায়ে রত ছিলেন। কুরায়শরা তখন সেখানে উপবিষ্ট ছিল। এমন সময় আবূ জাহেল বলে উঠলো, অমুক স্থানে উট যবাহ হয়েছে। তার ভুঁড়ি সেখানে পড়ে আছে। কেউ একজন তা উঠিয়ে নিয়ে এসে মুহাম্মদের উপর ফেলে দাও। উকবা ইব্ন আবী মুআইত উঠে গিয়ে তৎক্ষণাৎ তা নিয়ে এলো এবং যখনই তিনি সিজদায় গেলেন তখন সে তা তাঁর পিঠের উপর ফেলে দিল। হযরত মুহাম্মদ (সা) তো তখন আল্লাহ্র ধ্যানে মগ্ন ছিলেন বিধায় তা টেরও পেয়ে উঠেন নি, কিন্তু কাফিররা পৈশাচিক উল্লাসে ও অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু কাফিরদের ভিড় দেখে তিনি কিছু করতে সাহস পেলেন না। ঘটনাচক্রে হযরত ফাতিমাতুয্ যুহরা (রা) সেখানে এসে উপস্থিত হন। তিনি তখন বালিকা মাত্র। তিনিই অগ্রসর হয়ে পিতার পিঠ থেকে বহুকষ্টে উটের ভুঁড়ি সরালেন এবং এ সময় তিনি নরপিশাচ কাফিরদেরকে আচ্ছা করে ভর্ৎসনা করেন।

হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর ঘরে প্রায়ই ঢিল পাথর ছোঁড়া হতো। নানারূপ আবর্জনাও নিক্ষিপ্ত হতো তাঁর বাসগৃহে। একবার তিনি ভর্ৎসনার সুরে বললেন : হে বনূ আবদে মানাফ। প্রতিবেশীর উত্তম হকই তোমরা আদায় করছো! কখনো তাঁকে শায়ের বা কবি, আবার কখনো সাহের বা যাদুকর বলে আখ্যায়িত করা হতো। কখনো তাঁকে জ্যোতিষীর খেতাব দেয়া হতো, আবার কখনো জিনগ্রস্ত বা উন্মাদ বলে অভিহিত করা হতো। মোদ্দাকথা, মক্কার কাফিররা [illegible]রত মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর অনুসারীদেরকে নির্যাতন করতে এবং তাঁদের কাজে বাধা সৃষ্টি করতে কোনরূপ শৈথিল্য প্রদর্শন করেনি। এ জন্যে হেন কোন পন্থা নেই-যা তারা অবলম্বন করেনি। হযরত মুহাম্মদ (সা)-ও পূর্ণোদ্যমে সাহস ও প্রত্যয়ের সাথে তাঁর প্রচারকার্যে নিয়োজিত ছিলেন। কাফিররা যখন নিশ্চিত হলো যে, তাদের সকল চেষ্টাই পণ্ড হতে চলেছে এবং এতসব [illegible]রও বিন্দুমাত্র সাফল্য অর্জন তাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি, তখন তারা বাধ্য হয়ে অন্য পথ [illegible]লম্বন করলো।

[illegible]ীন জবাব

[illegible]বার কুরায়শরা সমবেত হয়ে পরামর্শ করলো এবং উত্বা ইব্ন রবীআকে তাদের প্রতি[illegible]ধিস্বরূপ হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে পয়গাম দিয়ে পাঠালো। উতবা হযরত মুহা[illegible] সা)-এর সকাশে উপস্থিত [illegible] বললো :

মুহাম্মদ! তুমি অত্যন্ত ভদ্র ও মর্যাদাসম্পন্ন। তোমার বংশও অত্যন্ত অভিজাত ও মর্যাদাসম্পন্ন। কিন্তু সম্প্রদায়কে এক মহাপরীক্ষার মধ্যে ফেলে দিয়েছো। শেষ পর্যন্ত তোমার অভীষ্ট কি বল দেখি! যদি তুমি ধন-সম্পদেরই প্রত্যাশী হও, তা' হলে আমরা তোমার জন্যে এত বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদের সংস্থান করবো যে, তুমিই হবে আরবের সবচাইতে বনাঢ্য ব্যক্তি। আর যদি সরদারী ও রাজত্বই তোমার কাম্য হয়ে থাকে, তবে আমরা তোমাকে সরদার বানাতে এবং তোমার প্রাধান্য মেনে নিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। যদি কোন সুন্দরী রমণীই তোমার কাম্য হয়, তবে আমরা সবচাইতে অভিজাত খানদানের সব চাইতে সুন্দরী তন্বীকেই বধুরূপে তোমার হাতে তুলে দেবো। যদি এসবই তোমার কাম্য হয়ে থাকে, তবে এসবের সংস্থান করে দিয়ে আমরা তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত! তুমি আমাদেরকে তোমার অভীষ্ট সম্পর্কে স্পষ্টভাবে অবহিত করো।

উতবা যখন তার বক্তৃতা শেষ করলো তখন হযরত মুহাম্মদ (সা) সূরা হা-মীম সিজদা তিলাওয়াত করতে শুরু করলেন। যখন তিনি এ আয়াতে পৌঁছলেন :

فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صٰعِقَةً مِّثْلَ صٰعِقَةِ عَادٍ وَّثَمُوْدَ .

—তবু এরা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বলুন, আমি তো তোমাদেরকে সতর্ক করছি এক ধ্বংসকর শাস্তির, 'আদ ও ছামূদের শাস্তির অনুরূপ (৪১ : ১৩)।

তখন উতবার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। সে তখন হুযূর (সা)-এর মুখে হাত দিয়ে বললো : "এমনটি বলো না।" হুযূর (সা) সিজদা করলেন এবং সিজদা থেকে উঠে বললেন : "তোমরা আমার জবাব শুনলে তো?"

উতবা তখন সেখান থেকে প্রস্থান করে কুরায়শদের কাছে এসে বললো : আমার অভিমত হচ্ছে একে তার অবস্থার উপর ছেড়ে দাও এবং তোমরা এর ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা অবলম্বন কর। যদি সে গোটা আরবের উপর বিজয়ী হয় তাহলে সে তো তোমাদেরই ভাই, তার সাফল্য হবে তোমাদেরই সাফল্য। আর যদি সে ধ্বংস হয়ে যায়, তবে তোমরা নির্বিঘ্নে বেঁচে গেলে।

তার এরূপ বক্তব্য শুনে কুরায়শরা উতবাকে বলে উঠলো : মুহাম্মদ (সা) তোমাকে যাদু করে ফেলেছে। জবাবে উতবা বললো : তোমরা যা' ইচ্ছে বলতে পারো। আমি আমার মত তোমাদেরকে জানিয়ে দিলাম।

আবূ তালিব সকাশে কুরায়শ প্রতিনিধি দল

উতবার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেলে উতবা, শায়বা, আবুল বুখতারী, আসওয়াদ, ওয়ালীদ, আবূ জাহেল প্রমুখের একটি প্রতিনিধি দল আবূ তালিব সকাশে উপস্থিত হয়ে অনুযোগ করলো, আপনার ভাতিজা আমাদের দেব-দেবীকে মন্দ বলা থেকে বিরত হতে অনিচ্ছুক। আপনি তাকে একটু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলুন এবং এ কাজ থেকে তাকে বিরত করুন।

আবূ তালিব এ প্রতিনিধি দলকে সঙ্গত জবাব দেন। তিনি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন যে, তোমরাও তো নির্যাতনের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করে চলেছো। সেদিনের মতো তারা আবূ তালিবের কাছ থেকে উঠে চলে গেলো। পরদিন শলা-পরামর্শ করে তারা আবার এসে হাযির হলো। আবূ তালিব তাদের আসার পর হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে তাদের সম্মুখেই ডেকে

আনলেন। তাঁর উপস্থিতিতেই কথোপকথন শুরু হলো। কুরায়শ সরদাররা উতবার মাধ্যমে প্রেরিত তাদের প্রস্তাব পুনরায় পেশ করলো। পূর্বে এ প্রস্তাব উতবা একা এসে পেশ করেছিলো।

তারা বললো : মুহাম্মদ (সা)! আপনাকে কয়েকটি জরুরী কথা বলার জন্য ডাকা হয়েছে। আল্লাহ্‌র কসম, কোন ব্যক্তি তার নিজের কওমকে এতটুকু বিপদে ফেলেনি, যতটুকু বিপদে আপনি আপনার কওমকেই ফেলেছেন। যদি আপনি এ নতুন ধর্ম দিয়ে ধন-সম্পদ উপার্জনে আগ্রহী হন, তবে আমরা এত ধন-সম্পদ আপনার জন্য সংগ্রহ করে দেবো যে, আর কারো কাছে এতো সম্পদ থাকবে না। যদি মান-মর্যাদার খায়েশ হয়ে থাকে, তবে আমরা আপনাকে এখনই আমাদের সরদার স্বীকার করে নিচ্ছি। যদি রাজত্বই এর দ্বারা আপনার কাম্য হয়, তবে আমরা আপনাকে সমগ্র আরবের বাদশাহ মেনে নিতে প্রস্তুত। যদি কোন জিনভূতের আছরের জন্যে আপনি এরূপ করে থাকেন, তবে আমরা ওঝা-বদ্যি ডেকে চিকিৎসা করাবো।

তিনি তাদের এসব বক্তব্যের জবাবে কুরআন শরীফের কয়েকটি আয়াত তিলাওয়াত করলেন। তারপর বললেন : আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তোমাদের নিকট রাসূলরূপে প্রেরণ করেছেন। আমি আল্লাহ্ তা'আলার পয়গাম তোমাদের নিকট পৌঁছিয়ে দিয়েছি। যদি তোমরা আমার শিক্ষাগুলো গ্রহণ করে নাও, তবে তোমাদের দীন-দুনিয়ার কল্যাণ হবে, আর যদি তোমরা তা প্রত্যাখ্যানই করো, তবে আমি তোমাদের ব্যাপারে তাঁর ফায়সালা কি হয় তা দেখার জন্যে অপেক্ষা করবো।

তাঁর এ কথা শুনে কাফিররা বলে উঠলো, আচ্ছা, যদি আপনি আল্লাহ্‌র রাসূলই হয়ে থাকেন তাহলে আপনি এ পাহাড়গুলোকে তাদের স্থান থেকে সরিয়ে দিন এবং মরুভূমিকে শস্য-শ্যামল করে তুলুন তো দেখি! আমাদের বাপ-দাদাদেরকে পুনর্জীবিত করে দেন। তাঁদের মধ্য থেকে কুসাই ইব্‌ন কিলাবকে অবশ্যই উঠাতে হবে। তিনি যদি পুনর্জীবিত হয়ে আপনাকে রাসূলরূপে সনাক্ত করেন, তাহলে আমরা আপনাকে রাসূলরূপ স্বীকার করে নেবো।

জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদেরকে বললেন : এসব কাজের জন্যে আমাকে রাসূলরূপে প্রেরণ করা হয়নি। আমার কাজ হলো, আমার প্রতি নাযিলকৃত আল্লাহ্ তা'আলার বিধান আমি তোমাদেরকে শুনিয়ে দেবো এবং উত্তমরূপে তা বুঝিয়ে দেবো। নিজ এখতিয়ারে আমি কিছুই করতে সক্ষম নই।"

এরূপ কথোপকথনের পর কুরায়শ সরদার অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হয়ে উঠে চলে গেলো। যাবার সময় তারা আবূ তালিবকেও মুকাবিলা ও বিরোধিতার জন্য চ্যালেঞ্জ দিয়ে গেলো।

কুরায়শ সরদারের প্রস্থানের পর আবূ তালিব হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে লক্ষ্য করে বললেন : "ভাতিজা, আমি এখন বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছি। কুরায়শদের মুকাবিলা করবার মতো শক্তি এখন আর নিজের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছি না। এমন শক্ত বোঝা তুমি কাঁধে চাপিয়ে দিও না, যা বহন করার শক্তি-সামর্থ্য তোমার এ দুর্বল চাচার নেই। তোমার দীনের প্রচার এবং দেবমূর্তিসমূহের প্রকাশ্য সমালোচনা তোমার ছেড়ে দেয়াটাই সমীচীন বলে আমি মনে করি।" সব শুনে তিনি বললেন : "চাচাজান! এরা যদি আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চন্দ্রও তুলে দেয় তবুও আমি আমার কাজ থেকে বিরত হবো না।" আবূ তালিবের কথায় তাঁর সন্দেহ হলো, এবার চাচাও বুঝি আমাকে সাহায্য করা থেকে হাত গুটিয়ে নেবেন। আবূ তালিব মক্কার কুরায়শ সরদারদের

মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। বনূ হাশিম কবীলার সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতা বলে তিনি গণ্য হতেন। তাঁর কারণে আক্রমণকারীরা তাঁর উপর আক্রমণ করতে অনেকটা দ্বিধাবোধ করতো। তাদের আশঙ্কা ছিলো, বনূ হাশিম কবীলার সকলে মিলে যদি হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পক্ষে দাঁড়িয়ে যায়, তাহলে ব্যাপারটা বেশ সঙ্গীন ও নাযুক হয়ে দাঁড়াবে। তাই আবূ তালিবের সমর্থন তাঁর জন্যে বেশ সহায়কই ছিলো। এবার তাঁর এ নৈরাশ্যব্যঞ্জক বক্তব্য শুনে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। অশ্রুসজল কণ্ঠে তিনি বললেন : চাচাজান! আমি আমার কাজ ত্যাগ করবো না যতক্ষণ না আল্লাহ্‌র কাজ পূর্ণ হয়, কিংবা এই কাজ করতে করতে আমি নিজেই কুরবান হয়ে যাই।—একথা বলেই তিনি আবূ তালিবের নিকট থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

দৃঢ়চেতা ইয়াতীম ভাতিজাটির কথায় আবূ তালিব অভিভূত হয়ে পড়লেন। তিনি তাঁকে ফিরিয়ে এনে বললেন : তুমি অবশ্যই তোমার কাজ চালিয়ে যাবে। আমি যতদিন বেঁচে থাকি ততদিন আমি তোমাকে সাহায্য করেই যাবো এবং কোনদিনই তোমাকে শত্রুদের হাতে তুলে দেবো না।

আবিসিনিয়ায় হিজরত

কুরায়শদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হলো। তারা তাওহীদের প্রচারকার্য অব্যাহত গতিতে চলতে দেখে রীতিমত প্রমাদ গুণলো। তারা লক্ষ্য করলো যে, যে আন্দোলনকে তারা শিশু বলে তুচ্ছ জ্ঞান করছিলো, তা এখন বিকশিত হয়ে এমনি শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে, তার মূলোৎপাটন আর এখন মোটেই সহজ নয়। তারা সর্বাত্মক চেষ্টায় মেতে উঠলো। তারা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর খানায়ে কা'বায় প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করলো। শহরের বখাটে ছেলেদেরকে হযরত রাসূল (সা) ও মুসলমানদেরকে দেখামাত্র সমবেতভাবে হাত তালি দেয়া ও গালিগালাজ করবার জন্য নিযুক্ত করলো। এখন থেকে এদের কাজ হলো রাস্তাঘাটে, অলিতে-গলিতে মুসলমানদের চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করা, বাইরের কোন আগন্তুককে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে না দেয়া এবং যখন যেখানে যেভাবে পারা যায় দুর্বল মুসলমানদেরকে উত্যক্ত করা। ফলে মক্কায় মুসলমানদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠলো। এমনতরো পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে হযরত মুহাম্মদ (সা) মুসলমানদেরকে খ্রিস্টান শাসিত আবিসিনিয়ায় হিজরতের অনুমতি দান করেন। সে অনুসারে নবুওয়াতের পঞ্চম বর্ষের রজব মাসে এগারোজন পুরুষ এবং চারজন নারী আবিসিনিয়ার উদ্দেশ্যে মক্কা ত্যাগ করেন। পনেরো সদস্যের এ কাফেলাটি রাতের আঁধারে গোপনে মক্কা ত্যাগ করে। ঘটনাক্রমে জিদ্দা বন্দরে এসে তারা নোঙর খুলে ছাড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে এমন অবস্থায় জাহাজ পেয়ে গেলেন। তাঁরা সেই জাহাজে করে আবিসিনিয়ায় গিয়ে উপনীত হন। সেই প্রথম হিজরতকারী দলের সদস্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন :

১. হযরত উসমান ইব্‌ন আফফান (রা)।
২. হযরত উসমান (রা)-এর সহধর্মিণী রুকাইয়া বিন্‌ত রাসূলুল্লাহ্ (সা)।
৩. হযরত হুযায়ফা ইব্‌ন উত্‌বা (রা)।
৪. হযরত উসমান ইব্‌ন মাযঊন (রা)।
৫. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা)।

৬. হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা)।
৭. হযরত যুবায়র ইবনুল আওয়াম (রা)।
৮. হযরত মুসআব ইব্‌ন উমায়র (রা)।
৯. হযরত আমির ইব্‌ন রবীআ (রা)
১০. হযরত সুহায়ল ইব্‌ন বায়দা (রা)।
১১. হযরত আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুল আসাদ (রা)।[৩]
১২. হযরত আবূ সাবুরা ইব্‌ন রেহেম আমিরী (রা)।
১৩. হযরত হাতিম ইব্‌ন আমির (রা)।
১৪. হযরত উম্মে সালামা বিন্‌ত আবূ উমাইয়া (আবূ সালামার স্ত্রী যিনি আবূ সালামার মৃত্যুর পর নবী-সহধর্মিণী হয়েছিলেন)।
১৫. হযরত সাহ্‌লা বিন্‌ত সুহায়ল আবূ হুযাফা (রা)-এর সহধর্মিণী—সীরাতে মুস্তফা জিলদে আউয়াল পৃঃ ২৪১-৪২ এর বরাতে (অনুবাদক)।

এঁরা কুরায়শদের মশহুর ও শক্তিশালী কবীলার লোক ছিলেন, যদ্দারা প্রতীয়মান হয় যে, এ পর্যায়ে অত্যাচার কেবল গোলাম-বাঁদী বা দুর্বল শ্রেণীর মুসলমানদের উপরই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তা সকল দুর্বল নির্বিশেষে সকল কবীলার ও সকল শ্রেণীর মুসলমানদের প্রতিই নির্বিচারে ও নির্দ্বিধায় চালিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো। উপরন্তু এটাও প্রতীয়মান হচ্ছে যে, দুর্বল শ্রেণীর মুসলমানদের এত দূরদেশে হিজরত করে যাওয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় সফর-সামানও ছিল না যে, তাঁরা এত দূরবর্তী দেশে সফরে যাবেন।

কাফিররা যখন মুসলমানদের হিজরত ও আবিসিনিয়ার দিকে যাত্রার সংবাদ পেলো, তখন তারাও তাঁদের পশ্চাদ্ধাবন করলো। কিন্তু কাফিরদের জিদ্দায় পৌঁছাবার পূর্বেই জাহাজ জিদ্দা থেকে ছেড়ে দিয়েছিল। আবিসিনিয়ায় পৌঁছে মুসলমানরা স্বস্তির সাথে জীবন যাপন করছিলো। তারপর একে একে আরো অনেক মুসলমানই আবিসিনিয়ায় হিজরত করতে থাকেন। হযরত জা'ফর ইব্‌ন আবূ তালিবও আবিসিনিয়ায় মুসলমান ভাইদের সাথে গিয়ে মিলিত হন। ফলে এ পর্যন্ত আবিসিনিয়া মুসলমানদের সংখ্যা তিরাশিতে উন্নীত হলো।

মুসলমানদের আবিসিনিয়ার উপস্থিতির কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁরা গুজব শুনতে পেলেন যে, মক্কাবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেছে বা তাদের সাথে মুসলমানদের সন্ধি হয়ে গেছে। এখন আর মক্কায় মুসলমানদের ভয়ের কোন কারণ নেই। এ গুজব শুনে মুসলমানদের কেউ কেউ আবিসিনিয়া থেকে মক্কায় ফিরেও যান। কিন্তু মক্কার নিকটবর্তী হতেই তাঁরা জানতে পারল যে, ঐ সংবাদ আসলে ছিল গুজবমাত্র। তাই কেউ কেউ রাস্তা থেকেই আবিসিনিয়ায় ফিরে যান, আবার কেউ কেউ কোন প্রভাবশালী কুরায়শী ব্যক্তির জামানত নিয়ে মক্কায় আসেন। এঁরা মক্কায় এসে আরও মুসলমানদেরকে সঙ্গে নিয়ে পুনরায় আবিসিনিয়ায় যাত্রা করল। এটাকে আবিসিনিয়া মুসলমানদের দ্বিতীয় হিজরত নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এ পর্যায়ে আবিসিনিয়ায় মুসলমানদের সংখ্যা একশ'তে উন্নীত হয়।

৩. প্রথমবার আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী অপর পাঁচজন হচ্ছেন ক্রমিক নম্বর ১১ থেকে ১৫ পর্যন্ত।

আবিসিনিয়ার সম্রাটের নিকট কুরায়শদের আবদার

মক্কার লোককে মুসলমান হয়েই আবিসিনিয়ায় হিজরত করে চলে যেতে দেখে এবং সেখানে আরামে জীবন-যাপন করতে দেখে মক্কার কাফিররা প্রমাদ গুণলো। এভাবে ক্রমে ক্রমে তাদের বিরাট শক্তি মুসলিম শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে বাইরে একটি শক্তিশালী কেন্দ্র গড়ে তুলবে এবং শেষ পর্যন্ত বাইরে থেকে তাদের উপর কোন বিপদ আপতিত হতে পারে। এসব ভেবে তারা ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেলো।

তাই তারা মক্কায় হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর অনুচরবর্গের উপর অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দিলো এবং মক্কার দু'জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আমর ইবনুল 'আস ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন রবীআকে দূত রূপে আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজাশীর দরবারে প্রেরণ করলো। পূর্ব থেকেই মক্কার কুরায়শবর্গ এবং আবিসিনিয়া সম্রাটের মধ্যে একটা বাণিজ্যচুক্তি বর্তমান ছিলো আর সে অনুসারেই আবিসিনিয়া ও মক্কার মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য চলছিলো। এ দু'জন দূতের নিকট তারা আবিসিনিয়ার সম্রাটের জন্যে বহু মূল্যবান উপঢৌকনাদিও দিয়েছিলো। শুধু আবিসিনিয়ার সম্রাটের জন্যেই নয়, তার পারিষদবর্গের জন্যেও তারা মূল্যবান উপঢৌকন প্রেরণ করলো। কুরায়শ দূতদ্বয় আবিসিনিয়ায় পৌঁছে আবিসিনিয়ার রাজদরবারে এসব উপঢৌকন পেশ করলো। তারা আবিসিনিয়ার সম্রাটের পারিষদদেরকেও নিজেদের সমর্থক বানিয়ে নিয়ে এভাবে তাদের দাবী উত্থাপন করলো :

> রাজন! আমাদের কিছু ক্রীতদাস বিদ্রোহী হয়ে আপনার দেশে এসে পৌঁছেছে এবং নিজেদের পৈতৃক ধর্ম ছেড়ে দিয়ে তারা এক অভূতপূর্ব নতুন ধর্ম গ্রহণ করেছে। তাই এ ক্রীতদাসদেরকে আমাদের হাতে তুলে দেয়া হোক।

সম্রাট তাদের আবেদন শুনে বললেন : আগে আমি এ সম্পর্কে তদন্ত করে দেখি। তারপর তোমাদের দাবী বিবেচনা করা হবে। পারিষদরাও কুরায়শ দূতদেরকে সমর্থন জানালো। কিন্তু সম্রাট নাজাশী সেদিকে কর্ণপাত না করে মুহাজির মুসলমানদেরকে দরবারে ডেকে পাঠালেন। তিনি তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা যে ধর্ম গ্রহণ করেছো সেটা কোন্ ধর্ম ? মুসলমানদের পক্ষ থেকে হযরত জা'ফর ইব্ন আবূ তালিব (রা) অগ্রসর হয়ে নাজাশীর দরবারে নিম্নধারার ভাষণ দেন।

জা'ফর ইব্ন আবূ তালিবের মর্মস্পর্শী ভাষণ

> বাদশাহ্ নামদার! আমরা ছিলাম অজ্ঞ ও মূর্তিপূজারী। মৃত জন্তু ভক্ষণকারী, অসামাজিক কার্যকলাপ ও প্রতিবেশীদেরকে নির্যাতনে আমরা অভ্যস্ত ছিলাম। আমাদের সবল ব্যক্তিরা দুর্বলদের অধিকার গ্রাস করতো। এমন সময় আল্লাহ্ আমাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করলেন। তাঁর উচ্চ বংশমর্যাদা, সততা ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে পূর্বেই আমরা অবগত ছিলাম। তিনি আমাদের এক আল্লাহ্তে বিশ্বাসীতে পরিণত করে মূর্তিপূজা থেকে ফিরিয়ে এনেছেন, সত্য বলতে, আমানত রক্ষা করতে ও নেক আমল করতে হুকুম করেছেন এবং পাপাচার, মিথ্যা কথন এবং পিতৃহীনদের সম্পদ গ্রাস করতে তিনি আমাদেরকে বারণ করেছেন। সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ও প্রতিবেশীর প্রতি সৌহার্দমূলক আচরণের নির্দেশ দান করেছেন। তিনি আমাদের হত্যা ও রাহাজানি থেকে ফিরিয়ে এনেছেন এবং আল্লাহ্র

ইবাদত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা সেই রাসূলের উপর ঈমান এনেছি এবং তাঁর আনুগত্য অবলম্বন করি। এজন্যে আমাদের স্বজাতি আমাদের প্রতি রুষ্ট হয়ে গেছে। তারা আমাদেরকে নানারূপে নির্যাতন করে। অগত্যা আমরা দেশত্যাগ করে আপনার দেশে এসে আশ্রয় নেই। আমাদের এ প্রতীতি রয়েছে যে, আপনার দেশে আমাদের প্রতি কোনরূপ অবিচার করা হবে না।

এ ভাষণ শুনে নাজাশী বললেন : তোমাদের নবীর প্রতি আল্লাহ্‌র যে কালাম নাযিল হয়েছে তার কিছুটা শোনাও দেখি। হযরত জা'ফর (রা) সূরা মারয়াম তিলাওয়াত শুরু করলেন। কুরআনুল কারীমের আয়াত শুনে নাজাশী এবং পারিষদবর্গের চোখে পানি এসে গেলো। হযরত জা'ফর (রা) সূরা মারয়ামের প্রথম দিকের আয়াতগুলো পড়ে শোনাতেই নাজাশী বলে উঠলেন: হযরত মূসা (আ)-এর তাওরাতের আর এ কালামের ধরন তো একই। উভয়টি অভিন্ন মনে হচ্ছে।

কুরায়শ দূতেরা বলে উঠলেন : এরা কিন্তু হযরত ঈসা (আ)-এরও বিরোধী। একথাটির দ্বারা তারা খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী আবিসিনীয় রাজাকে মুসলমানদের প্রতি ক্ষেপাতে চেয়েছিলো। হযরত জা'ফর ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন : মিথ্যে কথা বরং

هُوَ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهٗ وَكَلِمَةٌ اَلْقٰهَا اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ .

তিনি আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল এবং আল্লাহ্‌র বাণী যা তিনি মারয়ামের নিকট প্রেরণ করেছিলেন এবং তাঁর আদেশ।

নাজাশী বলে উঠলেন : তোমাদের এ বিশ্বাস যথার্থ। ইনজীল কিতাবের মর্মও ঠিক তাই। তিনি কুরায়শ দূতদ্বয়কে ব্যর্থ মনোরথ ফিরিয়ে দিলেন এবং স্পষ্ট বলে দিলেন, আমি এঁদেরকে তোমাদের হাতে তুলে দিতে পারি না। সাথে সাথে কুরায়শদের দেয়া উপহার সামগ্রীও তিনি ফেরত দিয়ে দিলেন। ফলে তাদের অপমানের অন্ত রইলো না। এটা নবুওয়াতের ষষ্ঠ সালের ঘটনা। নাজাশীর দরবারে কুরায়শদের এ ব্যর্থতা মুসলমানদের প্রতি তাদের বিদ্বেষ আরো বাড়িয়ে তুললো।

হযরত আমীর হামযা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

মক্কার কুরায়শরা নবী করীম (রা)-এর প্রতি বিদ্বেষে পাগল হয়ে উঠেছিলো। একদিন হযরত মুহাম্মদ (সা) সাফা পাহাড়ের চূড়ায় কিংবা এর পাদদেশে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় সেখানে আবূ জাহেল এসে উপস্থিত। হযরত মুহাম্মদ (রা)-কে দেখতে পেয়েই সে প্রথমে তো ভীষণ কর্কশ ও অশ্রাব্য ভাষায় গালি-গালাজ করলো। তিনি এ সবের জবাব মাত্র না দিয়ে নির্বিকার রইলেন। তখন সে হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে লক্ষ্য করে একটি প্রস্তর নিক্ষেপ করলো। হযরত মুহাম্মদ (সা) তাতে আহত হলেন এবং তাঁর পবিত্র দেহ থেকে লহু মুবারক নির্গত হতে লাগলো। তিনি চুপচাপ বাড়িতে চলে আসলেন। আবূ জাহেল কা'বা প্রাঙ্গণে আলাপরত লোকদের সাথে এসে বসে তাদের সাথে আলাপে মেতে উঠলো।

হযরত আমীর হামযা (রা) ছিলেন আবদুল মুত্তালিবের ছেলে। হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আপন চাচা। হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে তিনি অত্যন্ত ভালবাসতেন। কিন্তু তিনি তখনও মুশরিকদের

দলভুক্ত। তিনি প্রতিদিন ভোরে তীর-ধনুক নিয়ে শিকারে বের হতেন এবং সারাদিন শিকারের সন্ধানে ঘোরাফিরা করে শিকার করে সন্ধ্যায় ফিরতেন। ফিরেই সর্বপ্রথম তিনি কা'বায় গিয়ে তাওয়াফ করতেন। তারপর ঘরে ফিরতেন। ঐ দিনও শিকার করে আপন অভ্যাস মতো তিনি ফিরছিলেন। পথেই আবূ জাহেলের বাঁদীর সাথে তাঁর দেখা হয়ে গেলো। বাঁদী তাঁকে বলল, আবূ জাহেল হযরম মুহাম্মদ (সা)-কে গালাগালি দেয় এবং পাথর মেরে জখম করে কিন্তু মুহাম্মদ (সা) ধৈর্য ধারণ করে চুপ থাকে।

হযরত হামযা (রা) শুধু হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর চাচাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন তাঁর দুধ-ভাইও। রক্ত ও দুধের সম্পর্ক তাঁকে অধীর করে তুললো। তিনি প্রথমে খানায়ে কা'বায় গেলেন। তাওয়াফ শেষ করেই তিনি সোজা ঐ মজলিসের দিকে রওনা হলেন যেখানে বসে আবূ জাহেল আলাপ-আলোচনায় মত্ত ছিলো। হযরত হামযা (রা) ছিলেন বীর পাহ্‌লোয়ান। তিনি একজন যোদ্ধা ও বীর পুরুষ বলে গণ্য হতেন। তিনি সেখানে পৌঁছেই ধনুক দিয়ে আবূ জাহেলের মাথায় এমনি জোরে আঘাত করলেন যে, তার মাথা ফেটে দর দর করে রক্ত প্রবাহিত হলো। তারপর মুখে বললেন : আজ থেকে আমিও মুহাম্মদ (সা)-এর ধর্মের অনুসারী এবং তিনি যা বলে থাকেন আমিও তাই বলি। বলো দেখি হতভাগা তোর কি বলার আছে ? আবূ জাহেলের লোকজন তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে তার স্বপক্ষে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু আবূ জাহেল হামযাকে তাঁর বীরত্বের জন্য ভয় করতো। তাই সে নিজেই তাদেরকে সংযত করলো এবং বললো, "আসলেও আমার পক্ষ থেকে একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছিলো। হামযা যদি তাঁর ভাজিতার অপমানের প্রতিশোধ না নিতেন তাহলে এটা তাঁর আত্মমর্যাদার পরিপন্থী হতো।" সম্ভবত হযরত হামযার কথা শুনেই আবূ জাহেলের মনে আশংকা সৃষ্টি হয়েছিলো যে, পাছে এর রাগ ও জেদের বশে তিনি মুসলমানই না হয়ে যান। আর এজন্যেই সে হযরত হামযা (রা)-কে শুনিয়েই কথাগুলো বলছিলো যেন ব্যাপারটির এখানেই ইতি ঘটে আর তিনি ইসলামের দিকে ঝুঁকে না পড়েন।

আবূ জাহেলের সাথে বোঝাপড়া করে হযরত হামযা (রা) হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর কাছে এলেন এবং তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন : ভাতিজা, তুমি শুনে আনন্দিত হবে যে, আবূ জাহেলের নিকট থেকে আমি তোমার প্রতিশোধ এরই মধ্যে নিয়ে নিয়েছি।

জবাবে হযরত নবী (সা) বললেন : "চাচা! এ জাতীয় ব্যাপার আমাকে আনন্দ দেয় না। হ্যাঁ, যদি আপনি ইসলাম গ্রহণ করেন তবে তা আমাকে অপার আনন্দ দেবে।" এ কথা শুনে হযরত হামযা (রা) তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করলেন। হযরত হামযা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণে বিপর্যস্ত মুসলমানদের শক্তি ও মনোবল অনেকটা চাঙ্গা হয়ে উঠলো। এটা ছিলো নবুওয়াতের ষষ্ঠ পর্যায়ের কথা। সে সময় হযরত মুহাম্মদ (সা) হযরত আরকাম (রা)-এর বাড়ীতে অবস্থান করতেন। মক্কার কুরায়শরা তাঁর সাথে অত্যন্ত ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ শুরু করে দিয়েছিলো। হযরত হামযা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণে তারা অনেকটা সংযত হলো এবং হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর শানে গোস্তাখী করার ক্ষেত্রে দ্বিধায় পড়ে গেলো।

হযরত উমর ফারূক (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

হযরত হামযা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের সংবাদে কুরায়শদের দুশ্চিন্তা ও বিদ্বেষের মাত্রা আরো বেড়ে গেল। তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ ও নানারূপ ফন্দি-ফিকির করতে লাগলো।

হযরত উমর ফারূক (রা) ছিলেন হযরত হামযা (রা)-এর মতো আরবের বিখ্যাত বীরপুরুষ। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে মুসলমানদেরকে নির্যাতন এবং হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর বিরুদ্ধে তৎপরতায় তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিলো। তিনি মুসলমানদেরকে ধরে এনে বেদম প্রহার করতেন এবং প্রহার করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেলে থামতেন এবং বিশ্রাম নেওয়ার পর পুনরায় উঠে মারধর শুরু করতেন। মোটকথা, মুসলমানদেরকে ইসলাম থেকে মুরতাদ বানানোর জোর কোশেশ করেন কিন্তু ব্যর্থ হন। অবশেষে একদিন তিনি শেষ সিদ্ধান্ত নেন এবং কাফিরদের মজলিসে অঙ্গীকার করেন যে, এবার তিনি একাই কুরায়শদের উপর আপতিত এ ফিতনার মূলোচ্ছেদ করবেন অর্থাৎ এ ফিতনার প্রবর্তক মুহাম্মদ (সা)-এর কণ্ঠ স্তব্ধ করে দেবেন।

আবূ জাহেল তাঁর এ ঘোষণা শুনে সোৎসাহে ঘোষণা করলেন : সত্যি সত্যি তুমি যদি এ কাজটি করে আসতে পার, তাহলে তোমাকে একশ'টি উট এবং এক হাজার উকিয়া পরিমাণ রৌপ্য বখশিশ স্বরূপ প্রদান করা হবে।

আর যায় কোথায়! কোষমুক্ত তলোয়ার হাতে উমর তক্ষণি হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। পথে সাআদ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাসের সাথে সাক্ষাৎ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : কি হে উমর ! এ অবস্থায় কোথায় যাচ্ছ ? জবাবে উমর বললেন : মুহাম্মদ (সা)-কে কতল করতে যাচ্ছি, কেননা, আজ আমি সংকল্প করেছি যে, কুরায়শ কওমকে আপদমুক্ত করবো এবং তাদের রকমারি তদবিরকে সহজ করে দেবো। হযরত সাআদ (রা) জিজ্ঞেস করলেন : বনী হাশিম-এর প্রতিশোধের ভয় কর না ? জান না যে, মুহাম্মদ (সা)-কে কতল করা চাট্টিখানি কথা নয়? জবাবে উমর বললেন : আমার হাতে এ কোষমুক্ত তলোয়ারখানা থাকতে আমি কাউকে পরোয়া করি না। তারপর হযরত সাআদ (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন : তুমিও বুঝি তার সমর্থক বনে গেছো? তাহলে প্রথমে তোমাকেই শেষ করছি ! সাআদ (রা) বললেন : আমাকে এবং মুহাম্মদ (সা)-কে পরেই বধ করো হে ! আগে নিজের খবর নাও। তোমার বোন যে মুসলমান হয়ে গেছে আর ইসলাম তোমার নিজ ঘরেই ঢুকে পড়েছে, সে খবর রাখ?

হযরত সাআদ (রা)-এর এ জবাব হযরত উমর (রা)-এর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার মতো বিধলো। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর বোনের বাড়ীর দিকে ছুটলেন। তিনি বেরিয়েছিলেন হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে কতল করার সংকল্প নিয়ে। রাস্তায় গিয়ে পথ ধরলেন বোনের বাড়ীর। সেখানে যখন তিনি পৌঁছলেন তখন হযরত খাব্বাব ইবনুল আরাত (রা) উমরের বোন ফাতিমা (রা) এবং তাঁর স্বামী হযরত সাঈদ ইব্‌ন যায়দ (রা)-কে কুরআন শরীফ শিক্ষা দিচ্ছিলেন। উমরের উপস্থিতি টের পেয়ে তিনি ঘরের এক কোণে আত্মগোপন করলেন এবং যে পৃষ্ঠাসমূহে কুরআন শরীফের আয়াত লিখিত ছিলো তাড়াতাড়ি তাও লুকালেন। তিনি ঘরে ঢুকেই জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা কি পড়ছিলে ? তারপর ভগ্নিপতি সাঈদ ইব্‌ন যায়দ (রা)-কে ধরেই ফেলে দিলেন এবং বেদম প্রহার করতে লাগলেন এবং বললেন : তোমরা কেন মুসলমান হতে গেলে? স্বামীকে ভাইয়ের কবল থেকে মুক্ত করার জন্যে বোন আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ভাইকে জাপটে ধরলেন। জাপটাজাপটিতে ফাতিমা (রা)-এর মাথায় এমনি আঘাত লাগলো যে দরদর করে তাঁর মাথা থেকে রক্ত ঝরতে লাগল। উমর (রা) বোন এবং ভগ্নিপতির দু'জনকেই বেদম প্রহার করলেন। অবশেষে বোনটি বেপরোয়া হয়ে উঠলেন এবং বললেন :

قَدْ اَسْلَمْنَا وَتَابَعْنَا مُحَمَّدًا افْعَلْ مَا بَدَا لَكَ .

হাঁ, আমরা মুসলমান হয়ে গেছি এবং মুহাম্মদ (সা)-এর আনুগত্য অবলম্বন করেছি। এ জন্যে তুমি যা' করতে পার কর !

বোনের এ বেপরোয়া জবাব শুনে হযরত উমর (রা) যখন বোনের দিকে নজর তুলে তাকালেন তখন তাঁর রক্তাক্ত দেহের উপর চোখ পড়তেই তাঁর রাগ অনেকটা পানি হয়ে গেলো। বোনের রক্তমাখা দৃশ্য ভাইয়ের মনে পরিবর্তনের সূচনা করলো।

এবার অনেকটা শান্তস্বরে তিনি বোনকে বললেন : আচ্ছা, এই মাত্র তোমরা যা পড়ছিলে তা আমাকে দেখাও এবং পড়ে শোনাও যার আওয়াজ আমি ঘরে ঢুকবার সময় শুনতে পাচ্ছিলাম। উমর (রা)-এর কণ্ঠ অনেকটা শান্ত দেখে বোন আরো সাহসী হয়ে উঠলেন। তিনি বললেন : এ পবিত্র কিতাব পড়তে হলে প্রথমে তোমাকে গোসল করতে হবে। উমর (রা) তৎক্ষণাৎ গোসল করলেন। গোসল সেরেই কুরআন শরীফের আয়াতগুলো যে পৃষ্ঠাগুলোতে লিখিত ছিলো তা' পড়তে লাগলেন। মাত্র কয়েকটি আয়াত পড়তে না পড়তেই মনের অজান্তে বলে উঠলেন : কী মধুর বাণী ! এ বাণী আমার অন্তরে রেখাপাত করছে।

হযরত খাব্বাব (রা) ভেতরে লুকিয়েছিলেন। একথা শোনা মাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ বের হয়ে এসে বলে উঠলেন : হে উমর (রা) ! মুবারক হো। হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দু'আ তোমার পক্ষেই কবূল হলো দেখছি। আমি কালই হযরত মুহাম্মাদ (সা)-কে দু'আ করতে শুনেছি, "হে আল্লাহ ! উমর ইবনুল খাত্তাব ও আবূ জাহেল এ দু'জনের একজনকে তুমি মুসলমান বানিয়ে দাও ! তারপর হযরত খাব্বাব (রা) সূরা ত্বা-হার প্রথম রুকূ তিলাওয়াত করে শোনালেন। হযরত উমর (রা) সূরা ত্বা-হার এ তিলাওয়াত শুনতে শুনতে অঝোরধারায় কাঁদছিলেন। তিনি হযরত খাব্বাব (রা)-কে বললেন : আমাকে এক্ষুণি হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর কাছে নিয়ে চলো ! সত্যি সত্যিই তিনি তাঁকে নিয়ে দারে আরকামের দিকে রওয়ানা হলেন। তখনো কোষমুক্ত তলোয়ারখানা তাঁর হাতে ছিলো। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে তিনি সে তলোয়ারখানা নিয়ে বোনের বাড়ীর দিকে যাচ্ছিলেন সে উদ্দেশ্য আর এখন ছিলো না।

আরকামের বাড়ীতে পৌঁছে হযরত উমর (রা) দরজায় করাঘাত করলেন। উমরের হাতে কোষমুক্ত তলোয়ার দেখে সাহাবায়ে কিরাম প্রথমে দরজা খুলতে দ্বিধাবোধ করেন এবং হুযূর (সা)-কে জানান যে, উমর (রা) খোলা তলোয়ার হাতে দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। হুযূর (সা) বললেন : দরজা খুলে দাও ! হযরত হামযা (রা)-ও তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, আসতে দাও। সদিচ্ছা নিয়ে এসে থাকলে তো ভাল, নতুবা তারই তলোয়ারে তার শির উড়িয়ে দেবো।

দরজা খুলে দেয়া হলো। হযরত উমর (রা) ভিতরে প্রবেশ করলেন। তিনি ভিতরে প্রবেশ করতেই হযরত মুহাম্মদ (সা) অগ্রসর হয়ে তাঁর জামার এক প্রান্ত ধরে হেঁচকা টান দিয়ে বললেন : কী হে উমর ! আর কতদিন বিরোধিতা করে চলবে? তুমি কি এখনো বিরত হবে না? জবাবে হযরত উমর (রা) আরয করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) ! ঈমান আনার জন্যেই আপনার খিদমতে হাযির হয়েছি ! একথা শুনতেই আনন্দ উচ্ছ্বাসে হযরত (সা) উচ্চকণ্ঠে

"আল্লাহু আকবার" বললেন। অমনি দারে আরকামে উপস্থিত সাহাবায়ে কিরামগণও গগনবিদারী কণ্ঠে সমবেতভাবে আল্লাহু আকবর উচ্চারণে মক্কার পাহাড়-পর্বত প্রকম্পিত করে তুললেন।

হযরত হামযা (রা) ও হযরত উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণে মুসলমানদের শক্তি অনেক গুণে বৃদ্ধি পেলো। হযরত উমর (রা) মুসলমান হয়েই সোজা আবূ জাহেলের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং দরজায় করাঘাত করলেন। সে বের হয়েই আহলান ওয়া সাহ্‌লান এবং মারহাবা বলে তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালো এবং তাঁর আগমনের কারণ জিজ্ঞেস করলো। হযরত উমর (রা) বললেন : আল্লাহ্ তা'আলার শোকর যে, আমি মুসলমান হয়ে গিয়েছি। হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে রাসূল বলে মেনে নিয়েছি। কথাটি শুনেই আবূ জাহেল রাগান্বিত হয়ে অন্দরে চলে গেলো। হযরত উমর (রা)-ও ফিরে আসলেন। তাঁর ইচ্ছেই ছিলো ইসলামের সবচাইতে বড় শত্রুকে তাঁর ইসলাম গ্রহণের সংবাদ জানিয়ে আসবেন।

হযরত উমর (রা) মুসলমান হয়েই হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর কাছে নিবেদন করলেন : আমাদের এখন আর গোপনে ঘরে সালাত আদায়ের প্রয়োজন নেই। প্রকাশ্যে খানায়ে কা'বাতেই আমাদের সালাত আদায় করা উচিত। সত্যি সত্যি তাই করা হলো। প্রথম প্রথম কুরায়শদের পক্ষ হয়ে যারাই প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতো হযরত উমর (রা) তাদের মুকাবিলা করতেন। শেষ পর্যন্ত সকল বাধাই অপসারিত হলো এবং মুসলমানগণ বিনা বাধায় সেখানে সালাত আদায় করতে লাগলেন। ইসলাম এখন মক্কায় প্রকাশ্যে পালিত হতে লাগলো। এটা হচ্ছে নবুওয়াতের ষষ্ঠ বর্ষের শেষ মাসের কথা। হযরত উমর (রা)-এর বয়স তখন ছিল ৩৪ বছর। হযরত উমরের ইসলাম গ্রহণের সময় মক্কায় মুসলমানদের সংখ্যা দাঁড়ালো চল্লিশে। আবিসিনিয়ায় অবস্থানরত মুসলমান এর বাইরে ছিলেন।

বয়কট

হযরত উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণে কুরায়শরা দারুণ আঘাত পেলো। এদিকে মুসলমানরা প্রকাশ্যে খানায়ে কা'বায় সালাত আদায় করতে লাগলেন। অনেক মুসলমান নাজাশীর দেশে চলে গিয়েছিলেন যাদের উপর কুরায়শের কোন জারিজুরিই চলতো না। হযরত হামযা (রা) ও হযরত উমর (রা)-এর বর্তমানে মক্কার মুসলমানদের গায়েও নির্বিবাদে হাত দেয়ার সাধ্য ছিলো না। এ অবস্থা দেখে নবুওয়াতের সপ্তম বছরের প্রথম মাসে অর্থাৎ মুহাররম মাসে কুরায়শরা একটি পরামর্শ সভায় মিলিত হলো। মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান শক্তি যে একটা সংকটরূপে দেখা দিয়েছে তাও মজলিসকে অবহিত করা হলো এবং সে সংকট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে কী কী ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় সে সম্পর্কে যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা ও সলা-পরামর্শ করা হলো। অবশেষে সকলে একমত হলো যে বনী হাশিম ও বনী আবদুল মুত্তালিবের সকলেই যদিও মুসলমান হয়নি, তবু হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পক্ষ সমর্থন ও পাশে দাঁড়ানো থেকে বিরত থাকবে না। তাই প্রথমে আবূ তালিবকে বলা হোক যে, আপনি আপনার ভাতিজা মুহাম্মদ (সা)-এর পাশ থেকে সরে দাঁড়ান এবং তাকে আমাদের হাতে তুলে দিন! যদি তিনি তাতে সম্মত না হন, তাহলে বনী হাশিম ও বনী আবদুল মুত্তালিবের সাথে বিয়ে-শাদী, মেলামেশা, সালাম-কালাম সব বন্ধ করে দিতে হবে। তাদের কাছে কোন বস্তু বেচাকেনা করা বা তাদের কাছে কোনরূপ খাদ্যদ্রব্য পৌঁছতে দেয়া চলবে না। যতদিন পর্যন্ত তারা মুহাম্মদকে আমাদের হাতে তুলে না দেবে ততদিন পর্যন্ত এ প্রাণান্তকর বয়কট চলতেই থাকবে।

এ বয়কট সম্পর্কে একটা চুক্তিনামাও লেখা হলো। কুরায়শ সরদারদের সবাই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে তাতে সই করলো। সইকৃত চুক্তিপত্র খানায়ে কা'বায় ঝুলিয়ে রাখা হলো। আবূ তালিব বনূ হাশিম ও বনূ আবদুল মুত্তালিবের সবাইকে নিয়ে মক্কার অদূরবর্তী এ গিরিসংকটে স্বেচ্ছাবন্দী হলেন। ইতিমধ্যে যারা মুসলমান হয়েছিলেন, তারাও তাঁদের সাথে যোগ দিলেন। বনূ হাশিমের একটি মাত্র লোক এর ব্যতিক্রম ছিল, সে হচ্ছে আবূ লাহাব। সে কুরায়শদের পক্ষে ছিল। বনূ হাশিম যে খাদ্যদ্রব্যাদি সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন তা অল্প কয়েক দিনেই নিঃশেষিত হলো। দারুণ খাদ্যাভাবে তাঁদের ভীষণ কষ্ট হতে লাগলো। গিরি-সংকট থেকে বেরোনোর একটি মাত্র সংকীর্ণ গিরিপথ ছিল। কারো বাইরে যাওয়ার সাধ্য ছিলো না।

বনী হাশিমের লোকজন ও মক্কার মুসলমানগণ দীর্ঘ তিন বছর ভীষণ কষ্টে অতিবাহিত করেন। শি'বে আবী তালিব নামক উক্ত গিরিসংকটে তাঁরা সে সময় যে অবর্ণনীয় কষ্ট স্বীকার করেন তা কল্পনা করতেও গা' শিউরে ওঠে। কেবল হজ্জের মওসুমে এ অবরুদ্ধ লোকগুলো বাইরে আসতে পারতেন। আরবের চিরাচরিত প্রথা অনুসারে ঐ সময়টিতে পূর্ণ শান্তি বিরাজ করতো। কেউ কারো সাথে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হতো না। ঐ সুযোগে তাঁরা নিজেদের আহার্য ও পানীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করে সঞ্চয় করে নিতেন। ঐ সুযোগে হুযূর (সা) বাইরে বের হতেন এবং বহিরাগত লোকদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতেন। কিন্তু কুরায়শরাও তাঁর সাথে সাথে লেগে থাকতো এবং যেখানেই তিনি যেতেন সেখানেই লোকদেরকে তাঁর কথা শোনা থেকে বারণ করতো। তারা তাঁকে পাগল ও যাদুকর বলে আখ্যায়িত করে তাঁর দিকে কাউকে মনোযোগী হতে দিতো না। শি'বে আবূ তালিবের তিন বছর ব্যাপী নির্যাতনের কথাটি চিন্তা করলে এ কথাটি বোধগম্য হয় যে, গোত্রীয় টান ও বংশের নৈকট্যানুভূতিও এমনি একটি শক্তি যে বনূ হাশিমের লোকেরা মুসলমান না হওয়া সত্ত্বেও শুধু এ টানের জন্যে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সমর্থন ও সাহায্য করতে এতদূর কষ্ট বরণ করতে বাধ্য করেছিল। অপর দিকে গিরিসংকটে ঐ বন্দিত্বের সময়টাতে তারা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে অতি নিকট থেকে অবলোকনের এবং তাঁর চারিত্রিক সৌন্দর্য দর্শনে প্রভাবান্বিত ও ইসলামকে জানার সুযোগ পায়। এ বংশগত আভিজাত্যবোধ এভাবে তাঁদেরকে (বনূ হাশিমকে) সঙ্গতভাবেই সম্মানের যোগ্য করে তোলে। তিন বছরের এ নিবর্তনমূলক বন্দিত্ব এবং বনূ হাশিমের দুঃখকষ্ট অবশেষে কুরায়শদের কোন কোন ব্যক্তির উপরও প্রভাব বিস্তার করে।

বনী হাশিমের ছোট ছোট বাচ্চাদের ক্ষুধার্ত অবস্থায় ছটফট করা এবং ক্ষুধার্ত পিতামাতার সম্মুখে তাদের কচি সন্তানদের আর্ত চীৎকার সেই অসহনীয় অবস্থা মক্কার কুরায়শরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতো। যুবায়র ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন মুগীরা বনী হাশিমের এ যাতনা এজন্যে সর্বপ্রথম উপলব্ধি করল যে, আবূ তালিব ছিলেন তাঁর মামুজান। যুবায়র প্রথমে মুত'ঈম ইব্‌ন আদী ইব্‌ন নাওফিল ইব্‌ন আবদে মানাফকে আত্মীয়তা বন্ধনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এ চুক্তি ভঙ্গের জন্যে তাকে উদ্বুদ্ধ করেন। তারপর আবুল বুখতরী ইব্‌ন হিশাম এবং যুমআ ইব্‌ন আসওয়াতকে তিনি তাঁর সমর্থক বানান। মোটকথা, বনী হাশিমের সাথে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা বন্ধনে আবদ্ধ কয়েক ব্যক্তি বনী হাশিমের ভোগান্তির কথা উপলব্ধি করে এ ব্যাপারে বলাবলি শুরু করেন। এমনি একদিন হযরত মুহাম্মদ (সা) আবূ তালিবকে বললেন, আমাকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবহিত করা হয়েছে যে, ঐ চুক্তিপত্রে লেখাগুলো পোকায় খেয়ে ফেলেছে। কেবল যেখানে

যেখানে আল্লাহ্র নাম আছে, সে স্থানগুলো অক্ষত অবস্থায় আছে। আল্লাহ্ নাম ছাড়া বাকী সমস্ত অক্ষর নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। একথা শুনে আবূ তালিব ঘাঁটি থেকে বেরোলেন এবং কুরায়শদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, আমাকে তো মুহাম্মদ (সা) এরূপ অবহিত করেছেন তোমরা চুক্তিপত্র পরীক্ষা করে দেখো। যদি তাঁর দেয়া সংবাদ যথার্থ হয়ে থাকে, এবং সত্যি সত্যি চুক্তিপত্র নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়ে থাকে তবে এ বয়কটের অবসান হওয়া উচিত। তাঁর কথা শুনে কুরায়শরা তৎক্ষণাৎ খানায়ে কা'বায় গিয়ে উপস্থিত হলো এবং লক্ষ্য করলো যে, সত্যি সত্যি পোকায় চুক্তিপত্রটি খেয়ে নষ্ট করে দিয়েছে, কেবল আল্লাহ্ শব্দটি যেখানে যেখানে লিখিত ছিল তা'ই অক্ষত রয়েছে। তাদের বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা রইলো না এবং তৎক্ষণাৎ তারা বয়কট অবসানের কথা ঘোষণা করে দিল। বনী হাশিম এবং মুসলমানরা দীর্ঘ তিন বছর বেরিয়ে এসে মক্কায় নিজ নিজ ঘরে পুনরায় বসবাস শুরু করেন। শি'বে আবূ তালিবে অধিকাংশ সময়ই মুসলমানদেরকে ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হয়ে গাছের পাতা খেতে হতো। কারো কারো অবস্থা এমন সংগীন হয়ে উঠে যে, কোথাও একটু শুকনো চামড়া পাওয়া গেলে তাই ধুয়ে একটু নরম করে আগুনে সিদ্ধ করে চিবুতেন। হাকীম ইব্ন হিযাম মাঝে মাঝে নিজ গোলামকে দিয়ে আপন ফুফু হযরত খাদীজা (রা)-এর জন্যে গোপনে খাদ্য পাঠাতেন। একবার আবূ জাহেল তা জানতে পেরে গোলামের হাত থেকে খাবার ছিনিয়ে নেয় এবং কঠোর প্রহরা বসিয়ে দেয়।

শোকবর্ষ : নবুওয়াতের দশম সাল

হযরত মুহাম্মদ (সা) যখন শি'বে আবূ তালিব থেকে বের হলেন, তখন নবুওয়াতের দশম বর্ষ শুরু হয়ে গেছে। এবার মুসলমানদের সাথে কুরায়শদের ব্যবহার অনেকটা মার্জিত ও নম্র হওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু না, মুসলমানদের দুঃখকষ্ট এবং হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর বিপদ পূর্বের তুলনায় আরো বেড়ে গেলো। শীঘ্রই এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হলো যে, এ বছরটি মুসলমানদের কাছে শোকবর্ষ নামে খ্যাতিলাভ করে। রজব মাসে আবূ তালিব অসুস্থ হয়ে অশীতিপর বয়সে পরলোকগমন করেন। আবূ তালিবের মৃত্যুর সাথে সাথে কাফিরদের সাহস বৃদ্ধি পায়। আবূ তালিবই ছিলেন এমন এক ব্যক্তিত্ব এবং বনী হাশিমের এমন একজন প্রভাবশালী সরদার যাকে সকলে ভয় করতো এবং সমীহ করে চলতো। তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে বনী হাশিমের সেই পূর্বের প্রভাব আর মক্কায় বাকী রইলো না। মাঠ খালি পেয়ে কুরায়শরা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর যদৃচ্ছা অত্যাচার-উৎপীড়ন চালাতে শুরু করলো।

এ বছরই হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-ও মক্কায় কুরায়শদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে হিজরত করার ইরাদা করলেন। তিনি মক্কা থেকে বেরিয়েও পড়লেন। মক্কা থেকে চার মঞ্জিল পথ অতিক্রম করে তিনি বিরকুল গিমাদ নামক স্থানে উপনীত হলেন। কারা কবীলার সরদার ইবনুদ দাগিনার সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হলো। ইবনুদ দাগিনা জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যাচ্ছেন! হযরত আবূ বকর (রা) জবাবে বললেন : আমার কওম আমাকে অত্যাচারে এমনি অতিষ্ঠ করে তুলেছে যে, এখন আমি ইরাদা করেছি মক্কার বাইরে কোথাও গিয়ে থাকবো এবং আমার রব-এর ইবাদত করবো। ইবনুদ দাগিনা বললেন : আপনি তো এমনি এক ব্যক্তি যার নিজেরও মক্কা ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাওয়া সমীচীন হবে না আর আপনার স্বজাতিরও আপনাকে যেতে দেয়া ঠিক হবে না। আমি আপনাকে আমার আশ্রয়ে নিচ্ছি। আপনি ফিরে চলুন এবং মক্কাতে

থেকেই নিজের রব-এর ইবাদত করুন! তাঁর কথায় হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) মক্কায় ফিরে এলেন। ইবনুদ দাগিনা কুরায়শ সরদারদের ডেকে একত্র করে তাদের ভর্ৎসনা করলেন এবং বললেন : তোমরা এমন এক সৎগুণের অধিকারী ব্যক্তিকে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করছো যার উপস্থিতি যে কোনো কওমের জন্য গর্বের হেতু হতে পারে। হযরত আবূ বকর (রা) তার বাড়ীর আঙিনায় একটি ছোট চবুতরা মসজিদরূপে বানিয়ে সেখানে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন এবং ইবাদতে মশগুল থাকতেন। তাঁর কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজে মহল্লার মহিলা ও শিশুরা অভিভূত হয়ে যেতো। কুরায়শদের কাছে তাও ছিলো অসহনীয়। ইবনুদ দাগিন্না তাঁকে এরূপ করতে বারণ করলে তিনি স্পষ্ট বলে দিলেন : আমি তোমার আশ্রয় থেকে বেরিয়ে আমার আল্লাহ্‌র আশ্রয়ই অবলম্বন করছি। তাঁর আশ্রয়ই আমার জন্যে যথেষ্ট। তবুও কুরআন তিলাওয়াত থেকে বিরত থাকতে পারবো না।

আবূ তালিবের ওফাতের প্রায় দুই মাস পরে নবুওয়াতের দশম বছরে হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা)-ও ইন্তিকাল করেন। হযরত খাদীজা (রা)-কে হুযূর (সা) অত্যন্ত ভালবাসতেন। সমস্ত দুঃখ-কষ্টে তিনি ছিলেন হযরত নবী (সা)-এর সহধর্মিণী। সর্বপ্রথম তিনিই তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করেছিলেন। সব সময়েই তিনি তাঁকে সাহস যুগিয়েছেন। বিপদে আপদে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছেন। আবূ তালিব ও হযরত খাদীজা (রা) হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর এমন দু'জন সঙ্গী ও সহমর্মী ছিলেন যে, তাঁদের মৃত্যু হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে ভীষণ শোকার্ত করে তোলে। সাথে সাথে কুরায়শদের অত্যাচার-উৎপীড়নও বৃদ্ধি পায়। একদিন হযরত মুহাম্মদ (সা) পথ অতিক্রম করছিলেন—এমন সময় কোন এক দুরাচার তাঁর উপর কাঁদা নিক্ষেপ করে। তাঁর মাথার চুল, দেহ মুবারক, কাপড়-চোপড় কর্দমাক্ত হয়ে গেলো। এই অবস্থায় ঘরে ফিরলে হযরত ফাতিমা যুহ্‌রা (রা) তা দেখে দৌড়ে পানি নিয়ে আসলেন। তিনি পিতার এই হাল দেখে কেঁদে ফেললেন এবং পানি এনে মাথা ধুয়ে দিলেন। হযরত মুহাম্মদ (সা) বললেন : কেঁদো না মা! আল্লাহ্‌ই তোমার পিতাকে রক্ষা করবেন।

একদিন হযরত মুহাম্মদ (সা) খানায়ে কা'বায় গেলেন। সেখানে মুশরিকদের অনেকেই উপবিষ্ট ছিলো। হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে দেখে আবূ জাহেল উপহাসের স্বরে বলে উঠলো : হে আবদে মানাফের বংশধররা! দেখো দেখো, তোমাদের নবী এসে গেছেন! উত্‌বা ইব্‌ন রবীআ বলে উঠলো, কেউ নবী হোক, কেউ ফেরেশতা বনে যাক, তাতে আমাদের কি! হযরত মুহাম্মদ (সা) উতবাকে সম্বোধন করে বললেন : তুমি কোনো দিনই আল্লাহ্ ও রাসূলের পক্ষ সমর্থন করোনি। নিজের জেদ নিয়েই অটল রয়েছো। এরপর আবূ জাহেলকে লক্ষ্য করে বললেন : তোমার জন্যে সেদিন বেশী দূরে নয়, যখন তুমি হাসবে অল্পই, কাঁদবে অনেক বেশী। তারপর উপস্থিত মুশরিকদেরকে লক্ষ্য করে বললেন : সেদিন বেশী দূরে নয় যখন তোমরা এ দীনের ছায়াতলে আশ্রয় নেবে, যে দীনকে আজ তোমরা অস্বীকার করছ।

তায়িফ সফর

কুরায়শদের জেদ ক্রমেই বেড়ে চললো। শি'বে আবূ তালিবের বন্দিত্বের জীবনেই হযরত মুহাম্মদ (সা) যখন হজ্জের মওসুমে বেরিয়ে আসতেন, তখন মক্কায় আগত বাইরের তীর্থ যাত্রীদের কাছে ইসলামের তাবলীগ শুরু করে দিয়েছিলেন। সে সময় তাঁর সে প্রচারকার্যে

তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ফল পাওয়া যায়নি। এখন মক্কাবাসীদের ইসলামের প্রতি সীমাহীন বিরাগভাব লক্ষ্য করে তিনি তায়িফবাসীদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে মনস্থ করেন।

তায়িফ ছিলো মক্কা থেকে তিন মন্যিল অর্থাৎ ষাট মাইল দূরবর্তী মক্কার মতোই বড় শহর। ছাকীফ গোত্র সেখানে বাস করতো। ওরা ছিলো লাতের পূজারী। সেখানে লাতের মন্দির ছিলো। গোটা শহরের লোক ছিলো সে মন্দিরের ভক্ত পূজারী। নবুওয়াতের দশম বছর শওয়াল মাসে অর্থাৎ হযরত খাদীজা (সা)-এর ইন্তিকালের এক মাস পরে হযরত মুহাম্মদ (সা) যায়দ ইব্ন হারিছা (রা)-কে সঙ্গে নিয়ে পায়ে হেঁটে তায়িফ গিয়ে উপনীত হন। সেখানে পৌঁছবার পূর্বে রাস্তায় তিনি ইব্ন বকর কবীলায় গিয়ে উঠেন। যখন তিনি লক্ষ্য করলেন যে, এরাও মক্কাবাসীদের সমধর্মী ও সহমর্মী তখন তিনি কাহ্তান বংশীয়দের কাছে গিয়ে উপনীত হলেন। কিন্তু যখন দেখতে পেলেন যে, এরাও নিষ্ঠুরতার কোন অংশে মক্কাবাসীদের চাইতে কম না তখন তিনি তায়িফে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তায়িফে পৌঁছে সর্বপ্রথম তিনি সেখানকার নেতৃস্থানীয় লোকদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তায়িফের সরদারদের মধ্যে আবদে ইয়ালীল ইব্ন উমর এবং তার দুই ভাই মাসউদ ও হাবীব বনী ছাকীফের নেতৃস্থানীয় সরদার ও সর্বাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তি বলে গণ্য হতেন। হযরত মুহাম্মদ (সা) সর্বপ্রথম এদের সাথে দেখা করে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। এরা ছিল অত্যন্ত দাম্ভিক ও অহংকারী। তাদের একজন বললো : আল্লাহ্ যদি তোমাকে নবীই বানাতেন, তবে কি আর এমন করে জুতা চটর চটর করে পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়াতে ? দ্বিতীয় জন বলল : আল্লাহ্ বুঝি তোমাকে ছাড়া নবী বানাবার জন্যে আর কোন লোক খুঁজে পেলেন না ? শেষ পর্যন্ত তিনি তোমাকেই নবী বানালেন।

لَوْ لَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ . (٤٣ : ٣١)

তৃতীয় জন বললো : আমি তোমার সাথে বাক্য ব্যয় করতে চাই না। কেননা, তোমার দাবী অনুসারে সত্যিই যদি তুমি আল্লাহ্র রাসূল হয়ে থাক তাহলে তোমার কথা প্রত্যাখ্যান করা বিপজ্জনক হবে। আর যদি তুমি আল্লাহ্র উপর মিথ্যা আরোপ করে থাক, তবে এমন ব্যক্তির সাথে বাক্যালাপ না করাই শ্রেয়।

তায়িফবাসীদের ঔদ্ধত্যমূলক আচরণ

হযরত মুহাম্মদ (সা) যখন আবদে ইয়ালীল ও তার ভাইয়ের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেলেন, তখন তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন : আচ্ছা, আপনারা আপনাদের এ চিন্তাধারা নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখুন, অন্যদেরকে আর এসব কথা বলবেন না। সেখান থেকে বিদায় গ্রহণ করে তিনি তায়িফের অন্যান্য লোকের মধ্যে ইসলাম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। কিন্তু আবদে ইয়ালীল ও তার ভাইয়েরা নিজেদের গোলামদেরকে এবং শহরের ছেলে-পিলে ও গুণ্ডা বদমায়েশদেরকে তাঁর পিছনে লেলিয়ে দিল। তিনি যেখানেই যেতেন, তারাও পিছু পিছু গালি দিতে দিতে এবং ঢিল ছুঁড়তে ছুঁড়তে চলতে লাগলো। তাঁর বিশ্বস্ত খাদিম যায়দ ইব্ন হারিছ (রা) তাঁর সাথে সাথে চলছিলেন এবং তাঁকে দুরাচারদের ঢিল ও আক্রমণ থেকে হিফাযত করার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। পাথর ও ঢিলের আঘাতে হযরত মুহাম্মদ (সা) ও যায়দ উভয়েই রক্তাক্ত হয়ে গেলেন। তাঁদের তায়িফে অবস্থান অসম্ভব হয়ে উঠলো। অগত্যা তাঁরা সেখান থেকে বের হয়ে গেলেন।

তায়িফের গুণ্ডা-বাদমায়েশেরা দল বেঁধে পাথর আর ঢিল নিক্ষেপ করতে করতে তাঁদের পিছু পিছু ছুটে চলেছিলো। তাঁরা যখন তায়িফের সীমা পেরিয়ে বের হয়ে গেলেন তখনো তারা তাঁদের পিছন ছাড়ছিল না। দীর্ঘ তিন মাইল পর্যন্ত তারা তাঁদের পিছু পিছু ছুটতে থাকে। তাঁর পদযুগল তাঁদের পাথরের আঘাতে আঘাতে রক্তাক্ত হয়ে গেল। আহত পদযুগল থেকে প্রবাহিত রক্তে জুতা পর্যন্ত ভরে উঠলো। এরূপভাবে সারা দেহই আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে উঠেছিলো। তিনি নিজে বলেন : আমি তায়িফ থেকে তিন মাইল দূর চলে আসি। তখনো আমার হুঁশ ছিল না যে, কোথা থেকে আসছি আর কোথায় যাচ্ছি! তায়িফ থেকে তিন মাইল দূরে মক্কার জনৈক সরদার উতবা ইব্‌ন রবীআর একটি বাগান ছিল। হযরত মুহাম্মদ (সা) সেখানে এসে আশ্রয় নিলেন। তায়িফের গুণ্ডা-বদমায়েশেরা তখন তায়িফে ফিরে চললো। তিনি তখন উক্ত বাগানের দেয়ালের ছায়ায় বসলেন এবং নিজের অসহায় অবস্থার জন্যে আল্লাহ্‌র দরবারে এভাবে ফরিয়াদ জানালেন :

"ইলাহী, অসহায় ও দুর্বলদের তুমিই হিফাযতকারী
আমি তোমারই দরবারে মদদ কামনা করছি।"

উতবা ইব্‌ন রবীআ তখন বাগানে উপস্থিত ছিলো। সে তাঁকে এ অবস্থায় দূর থেকে দেখতে পেলো। আরবের আভিজাত্যবোধ ও অতিথিপরায়ণতা তার মধ্যে মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। একটি রেকাবীতে আঙুরের কয়েকটি থোকা রেখে সে তার গোলাম আদ্দাসের মাধ্যমে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলো। গোলামটি ছিলো নিনোভার অধিবাসী একজন খ্রিস্টান। হযরত মুহাম্মদ (সা) আঙুর খেতে খেতে গোলামটিকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। গোলাম আদ্দাসের অন্তরে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর কথা দাগ কাটলো। সে মাথা নিচু করে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর দাস্ত মুবারকে চুমু খেলো। উতবা দূর থেকে গোলামের এ চুমু খাওয়ার দৃশ্যটি লক্ষ্য করলো। আদ্দাস ফিরে গেলে উত্‌বা তাকে বললো, সাবধান! ঐ লোকটির কথায় কান দিও না; তার চেয়ে তো তোমার ধর্মই উত্তম। হযরত মুহাম্মদ (সা) কিছুক্ষণ উতবার বাগানে বিশ্রাম নিলেন। তারপর সেখান থেকে চলে গেলেন। সেখান থেকে বেরিয়ে নাখলা নামক স্থানে এক খেজুর বাগানে এসে উপনীত হলেন। সেখানে জিন সরদাররা তাঁকে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতে শুনে তাঁর উপর ঈমান আনয়ন করে।

মক্কায় প্রত্যাবর্তন

নাখলা থেকে রওনা হয়ে হযরত মুহাম্মদ (সা) হেরা পর্বতে আসেন এবং সেখানে অবস্থান করে কুরায়শ সরদারদের কারো কারো কাছে এ মর্মে পয়গাম পাঠালেন যে, তারা যেনো তাঁকে তাদের জামানতে বা আশ্রয়ে গ্রহণ করেন। কিন্তু কেউই তাতে সম্মত হলো না। মুত'ঈম ইব্‌ন আদীর কাছে যখন তাঁর পয়গাম পৌঁছলো তখন তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং তিনি মুশরিক ও কাফির হওয়া সত্ত্বেও তার আরবী আভিজাত্য এবং গোত্রীয় টান তাঁর মধ্যে এমনিভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো যে, তিনি তৎক্ষণাৎ সোজা হেরা পর্বতে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং হযরত নবী (সা)-কে সঙ্গে নিয়ে মক্কায় এসে উপস্থিত হলেন। মুত'ঈমের পুত্র তখন উন্মুক্ত তরবারি হাতে খানায়ে কা'বার সম্মুখে দাঁড়িয়ে গেলেন। হযরত মুহাম্মদ (সা) কা'বা শরীফ তাওয়াফ করলেন। তারপর মুত'ঈম এবং তাঁর পুত্রগণ উন্মুক্ত তরবারির প্রহরায় তাঁকে নিরাপদে

বাড়ি পৌঁছিয়ে দিলেন। কুরায়শরা মুত'ঈমকে জিজ্ঞেস করলো : মুহাম্মদের সাথে তোমার কী সম্পর্ক? মুত'ঈম জবাব দিলেন : সম্পর্ক কিছুই নেই, তবে আমি তাঁর একজন সমর্থক। যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি আমার আশ্রয়ে আছেন ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ তাঁর দিকে চোখ তুলেও তাকাতে পারবে না। মুত'ঈমের এ দৃঢ় সমর্থন ও নির্ভীক আচরণে কুরায়শরা অনেকটা স্তব্ধ হয়ে গেলো।

একটি রিওয়ায়াতে আছে, হযরত মুহাম্মদ (সা) যখন তায়িফে কাফির-মুশরিকদের কংকর আঘাতে জর্জরিত তখন জনৈক ফেরেশতা তাঁর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করেন যে, যদি আপনি নির্দেশ দেন তবে আমি পাহাড় উত্তোলন করে তায়িফবাসীদের উপর নিক্ষেপ করবো। তাতে তারা পিষে মরবে। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সা) জবাবে বলেন : না, তা কখনো হতে পারে না। আমি আশা করি, এরা যদি ইসলাম গ্রহণ নাও করে, তবে এদের সন্তানরা অবশ্যই ইসলামের খিদমতে আত্মনিয়োগ করবে। তাদের পরবর্তী গোটা প্রজন্ম ইসলাম গ্রহণ করবে। আমি তাদের ধ্বংস কামনা করি না।

হযরত আয়িশা (রা)-এর সাথে শাদী মুবারক : মি'রাজ

এ বছরই অর্থাৎ নবুওয়াতের দশম বর্ষে হযরত মুহাম্মদ (সা) হযরত আয়িশা বিন্ত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এবং হযরত সাওদা বিন্ত যামআ (রা)-এর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। ঐ বছরই তিনি মি'রাজে গমন করেন। মি'রাজ সম্পর্কে তাবারীর অভিমত হচ্ছে তা' ওয়াহী অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে অর্থাৎ নবুওয়াতের প্রথম বর্ষের ঘটনা, যখন নামায ফরয হয়েছিল। ইব্ন হাযমের মতে, তা দশম হিজরীর ঘটনা।

কোনো কোনো রিওয়ায়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মি'রাজ মদীনায় হিজরতের পরে ঘটেছিল। যেভাবে বক্ষ বিদারণ সম্পর্কে কোন কোন আলেমের ধারণা যে তা' একাধিকবার সংঘটিত হয়েছে তেমনিভাবে মি'রাজ সম্পর্কেও কোনো কোনো পণ্ডিতের ধারণা যে, তাও একাধিকবার হয়েছে। মোটকথা, এ বিতর্কের স্থান এটা নয়। এজন্যে স্বতন্ত্র পুস্তক এবং তাফসীর ও হাদীসের কিতাবাদি দেখা যেতে পারে।

বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন গোত্রে ইসলাম প্রচার

মক্কাবাসীদের প্রতি নিরাশ হয়ে হযরত মুহাম্মদ (সা) তায়িফ গমন করেছিলেন। সেখানকার লোক মক্কাবাসীদের চাইতেও জঘন্যতর আচরণ করলো। মক্কাবাসীদের ঘৃণ্য ও জিদ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগলো। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সা) সাহস হারালেন না। তায়িফ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি মক্কার আশেপাশে বসবাসরত গোত্রসমূহের কাছে যেতে এবং তাদের মধ্যে ইসলামের বাণী প্রচার করতে লাগলেন। সে অনুসারে বনূ কিন্দা ও বনূ আবদুল্লাহ গোত্রদ্বয়ের আবাসস্থলেও তিনি গমন করেন। বনূ আবদুল্লাহ্ গোত্রকে লক্ষ্য করে তিনি বলেন : হে বনূ আবদুল্লাহ গোত্রের লোকজন! তোমাদের আদি পুরুষ ছিলেন আবদুল্লাহ, আল্লাহ্র দাস। সুতরাং তোমরাও সত্যিকারের আল্লাহ্র দাস হয়ে যাও! বনী হানাফিয়ার আবাসভূমিতেও তিনি গমন করেন। কিন্তু সে জালিমরা গোটা আরবের মধ্যে তাঁর সাথে সবচাইতে জঘন্য ও নিষ্ঠুর পন্থায় তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে।

বাইরে থেকে যেসব পথচারী মক্কায় আসতো বা হজ্জের সময় দূর-দূরান্ত থেকে যেসব কাফেলা আসতো হযরত মুহাম্মদ (সা) তাদের কাছেও ইসলামের দাওয়াত পৌঁছিয়ে দিতেন।

কিন্তু আবূ লাহাব তাঁর বিরোধিতার জন্যে এক পায়ে খাড়া থাকতো। এসে সর্বত্র তাঁর পিছু পিছু লেগে থাকতো এবং বহিরাগতদেরকে তাঁর কথায় কর্ণপাত করতে বারণ করতো। হযরত নবী করীম (সা) একে একে বনূ আমির, বনূ শায়বান, বনূ কাল্ব, বনূ মাহারিব, ফাযারাহ, গাস্সান, সুলায়ম, আবাস, হারিছ, আযারা, ফাহল, মুর্রা প্রভৃতি গোত্রকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেন।

যখন তিনি বনূ আমিরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে গেলেন তখন তাদের মধ্যকার ফার্রাস নামক এক ব্যক্তি বললো : আচ্ছা, আমরা যদি মুসলমান হয়ে যাই আর আপনি দুশমনদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হন, তাহলে আপনি কি আমাকে আপনার খলীফা মনোনীত করে যাবেন ? জবাবে হযরত মুহাম্মদ (সা) বললেন : এটা তো আল্লাহ্র ইখতিয়ারে। তিনি যাকে ইচ্ছে আমার খলীফা বানাবেন। এ কথা শুনে ঐ ব্যক্তি বলে উঠলো : বাঃ! এখন তো আমরা আপনার অনুসারী ও সমর্থক হয়ে নিজেদের গলা কাটাবো, আর যখন আপনি কৃতকার্য হয়ে যাবেন, তখন অন্যরা শাসন ক্ষমতার মজা লুটবে! যান, আমাদের আপনার দরকার নেই।

সুয়াইদ ইব্ন সামিত

নবুওয়াতের একাদশ বর্ষ তখন শুরু হয়ে গেছে। মদীনাবাসী আওস গোত্রের জনৈক সুয়াইদ ইব্ন সামিত মক্কায় এলো। লোকটি তার স্বগোত্রে কামিল খিতাবে মশহুর ছিলো। ঘটনাচক্রে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে তাঁর মূলাকাত হলো। তিনি লোকটাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। সে বললো, সম্ভবত আমার কাছে যা' আছে আপনার কাছেও তা-ই আছে। হযরত মুহাম্মদ (সা) তখন জিজ্ঞেস করলেন : তোমার কাছে কী আছে হে! সে বললে : লুকমানের হিকমত বা জ্ঞানরাশি। তিনি বললেন : আচ্ছা, তা থেকে একটু শোনাও তো দেখি! সে তা পড়ে শোনালে হযরত মুহাম্মদ (সা) বললেন : এটা ভালো বাণী! কিন্তু আমার কাছে রয়েছে কুরআন মজীদ, এর থেকে উত্তম ও শ্রেয় এবং এটা হচ্ছে হিদায়াত ও নূর। তারপর তিনি তাকে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করে শোনালেন। সে তা' শুনে স্বীকার করলো যে, সত্যিই এ হিদায়াত ও নূর। কোনো কোনো রিওয়ায়াতে আছে যে, সে মুসলমান হয়ে যায়। আবার কোনো কোনো রিওয়ায়াতে আছে যে, সে মুসলমান হয়নি বটে, কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর বিরোধিতা মোটেই করেনি। মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পর আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে সংঘটিত এক যুদ্ধে সে নিহত হয়।

আয়াস ইব্ন মু'আয (রা)

ঐ দিনগুলোতে আনাস ইবন রাফি' তার স্বগোত্রে ইব্ন আবদুল আশহালের কতিপয় লেখকসহ মদীনা থেকে মক্কায় আসে। উদ্দেশ্য ইব্ন খাযরাজের বিরুদ্ধে মক্কাবাসীদের সহযোগিতা লাভের জন্যে চুক্তিবদ্ধ হওয়া। এ প্রতিনিধি দল আসার সংবাদ পেয়ে হযরত মুহাম্মদ (সা) সর্বপ্রথম তাদের কাছে গেলেন। কুরায়শ নেতাদের সাথে তখনো তারা তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছুই বলে সারেননি। তিনি গিয়েই তাদেরকে বললেন : আমার কাছে এমন বস্তু আছে যাতে (তাদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে) তোমরা রাযী থাকলে আমি তা তোমাদের কাছে তুলে ধরতে পারি। তারা বললো : বেশ তো, আপনি তা উপস্থাপন করুন! তিনি বললেন : মানবজাতির হিদায়াত ও পথ প্রদর্শনের জন্যে আল্লাহ তা'আলা আমাকে নবীরূপে প্রেরণ করেছেন। আমি

শির্‌ক করতে নিষেধ করি এবং কেবল এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করার নির্দেশ দিয়ে থাকি। আমার উপর আল্লাহ তা'আলা কিতাব নাযিল করেছেন। তারপর তিনি একে একে ইসলামের মূলনীতি তাদের সম্মুখে তুলে ধরেন এবং কুরআন শরীফ পড়ে তাদেরকে শোনান। মদীনায় এ প্রতিনিধি দলে আনাস ইব্‌ন রাফির সাথে আয়াস ইব্‌ন মুআয নামক এক যুবকও ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কথা এবং কুরআনের বাণী শুনে তিনি তাঁর স্বগোত্রীয়দেরকে লক্ষ্য করে বললেন : 'হে আমার স্বগোত্রীয় ভাইয়েরা! তোমরা মদীনা থেকে যে উদ্দেশ্যে এসেছ আল্লাহ্‌র কসম, তার চাইতে এটাই আমার কাছে শ্রেয় মনে হয়।" প্রতিনিধি দলের নেতা আনাস ইব্‌ন রাফি' তাঁকে ধমক দিয়ে বলল : ওহে! এ কালাম শোনার জন্যে আমরা এত দূর থেকে এখানে আসিনি। আয়াস তখন চুপ হয়ে গেলেন। হযরত মুহাম্মদ (সা)-ও চুপ করে সেখান থেকে উঠে চলে আসলেন। ফলশ্রুতিতে মদীনার এ প্রতিনিধি দল ব্যর্থ মনোরথ হয়ে মক্কা থেকে ফিরে আসে। কুরায়শ এবং তাদের মধ্যে আর কোন চুক্তিই হলো না। মদীনায় প্রত্যাবর্তনের অল্প কিছু দিন পরই হযরত আয়াস ইব্‌ন মুআয (রা)-এর ইন্তিকাল হয়ে যায়। মৃত্যুর পূর্বেই তিনি তাঁর ঈমান আনয়ন ও ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করে দেন।

যিমাদ ইযদী (রা)

যিমাদ ইযদী ছিলেন আরবের মশহুর যাদুকর। তিনি ছিলেন ইয়ামানের অধিবাসী। তিনি একবার মক্কায় আসলেন। তিনি কুরায়শদের কাছে শুনতে পান যে, মুহাম্মদ (সা)-এর উপর জিন ভূতের আছর আছে। তিনি বলে উঠলেন : আমি আমার মন্ত্র প্রয়োগে এক্ষুণি তাঁর চিকিৎসা করে দিচ্ছি। সত্যি সত্যি ঐ ব্যক্তি হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর কাছে এসে বললেন, আমি আপনাকে আমার মন্ত্র শোনাচ্ছি। হযরত নবী করীম (সা) বললেন : প্রথমে আমারটা শুনে নাও, তারপর তোমার মন্ত্র শুনিয়ো। তারপর তিনি তাঁর খুতবার ভূমিকা অংশ এভাবে শুরু করলেন :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ وَاشْهَدُوْا اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ .

এতটুকু উচ্চারণ করতেই যিমাদ চীৎকার করে বলে উঠলো : আচ্ছা, এ কথাগুলো আবার বলুন তো! পুনঃ পুনঃ কয়েকবার তিনি এ বাক্যগুলো তাঁর মুখে উচ্চারণ করিয়ে শুনলেন। তারপর বললেন : আমি অনেক ভবিষ্যদ্বক্তা, যাদুকর ও কবিকে দেখেছি এবং তাদের কথাবার্তা শুনেছি, কিন্তু এমন ব্যাপক অর্থবোধক অলংকারসমৃদ্ধ কথা আমি কারো মুখে কোনো দিন শুনিনি। তারপর তিনি বললেন : আপনি হাত বাড়ান, আমি আপনার হাতে মুসলমান হচ্ছি এবং ইসলামের জন্যে বায়'আত হচ্ছি।

তুফায়ল ইব্‌ন আমর দুওসী (রা)

ইয়ামানে দুওস কবীলার বাস ছিলো। সেই কবীলার সরদার তুফায়ল ইব্‌ন আমর ইয়ামানের বিখ্যাত রঈসদের অন্যতমরূপে গণ্য হতেন। তুফায়ল তাঁর জ্ঞানবত্তা ছাড়াও একজন বড় কবি ছিলেন। ঐ বছর অর্থাৎ একাদশ নববী বর্ষে তিনি ঘটনাক্রমে মক্কায় আগমন করেন। তুফায়ল

ইব্‌ন আমরের আগমন সংবাদে মক্কার সরদারগণ তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে মক্কার বাইরে এগিয়ে যায়—এবং অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ অভ্যর্থনা দ্বারা তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। তারা তাঁকে মক্কায় নিয়ে আসে। কুরায়শদের ভয় ছিল পাছে মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে তুফায়লের সাক্ষাৎ না হয়ে যায় আর তিনি তাঁর উপর তার যাদুকরী প্রভাব বিস্তার করে না বসেন। তাই তুফায়লের মক্কা প্রবেশের সাথে সাথে তুফায়লকে বলে যে, আমাদের এ মক্কায় আজকাল এমন এক যাদুকরের আবির্ভাব ঘটেছে—যে গোটা শহরকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছে। তার কুপ্রভাবে পিতা তার পুত্র থেকে, পুত্র তার পিতা থেকে, ভাই তার ভাই থেকে, স্বামী তার স্ত্রী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আপনি যেহেতু আমাদের সম্মানিত অতিথি, তাই এর ব্যাপারে আপনি সতর্ক থাকবেন এবং এ যাদুকরের অর্থাৎ মুহাম্মদের মুখ থেকে কোন কথা শুনবেন না। কুরায়শদের বার বার সতর্কীকরণ ও ভীতি প্রদর্শনে তুফায়ল এতই ভীত হলো যে, তিনি তাঁর দুই কানে তুলা ঠেসে দিলেন—যাতে কোনক্রমেই ঐ যাদুকরের কথা তার কর্ণমূলে প্রবেশ করতে না পারে।

একদিন ভোরবেলা তুফায়ল স্বীয় কানে তুলো দিয়ে খানায়ে কা'বায় প্রবেশ করলেন। হযরত নবী করীম (সা) তখন সেখানে ফজরের নামায পড়ছিলেন। হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নামাযের নিয়ম পদ্ধতি চোখে দেখে তুফায়লের কাছে ভালই ঠেকলো। তিনি তাঁর আরো নিকটবর্তী হলেন। সেখানে তাঁর কিরাতের ধ্বনি অল্প অল্প তাঁর কানে ঢুকছিলো। তারপর তুফায়ল ভাবলেন, আচ্ছা, আমি নিজেও তো একজন কবি মানুষ। নিজের জ্ঞানবুদ্ধি ও বিবেক আছে। ঐ ব্যক্তির কথা ভাল হলে মেনে নেবো, মন্দ হলে প্রত্যাখ্যান করবো। একথা মনে আসতেই তিনি কান থেকে তুলো খুলে ফেলে দিলেন। হযরত মুহাম্মদ (সা) নামায শেষে যখন ঘরের দিকে পা বাড়ালেন তখন তুফায়লও পিছে পিছে তাঁর সাথে যেতে লাগলেন। তিনি তাঁকে তাঁর বাণী শোনাবার আবেদন জানালেন। হযরত মুহাম্মদ (সা) কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করে শোনালেন। সাথে সাথে তুফায়ল ইসলাম গ্রহণ করলেন। তিনি আরয করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি দু'আ করুন, আমার মাধ্যমে যেন আমার গোটা গোত্রকে ইসলাম গ্রহণের তাওফীক আল্লাহ্ তা'আলা দান করেন। তুফায়ল মক্কা থেকে বাড়ি প্রত্যাবর্তন করে তাঁর গোত্রের লোকজনকে ইসলামের দাওয়াত দিতে লাগলেন। তুফায়ল হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে বলেন যে, মক্কাবাসীরা আপনাকে জ্বালাতন করে। আপনি হিজরত করে আমাদের ওখানে চলুন। জবাবে হযরত মুহাম্মদ (সা) বলেন : যখন আল্লাহ তা'আলা আমাকে হিজরত করার আদেশ দিবেন, তখনই আমি হিজরত করবো। তিনি যেখানে হিজরত করার নির্দেশ দেবেন, সেখানেই আমি হিজরত করবো।

হযরত আবূ যর গিফারী (রা)

হযরত আবূ যর (রা) ছিলেন গিফার গোত্রের লোক। তিনি মদীনার (ইয়াছরিবের) উপকণ্ঠে বসবাস করতেন। মদীনায় হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর খবর সুয়িদ ইব্‌ন সামিত ও আয়াস ইব্‌ন মুআযের মাধ্যমে পৌঁছে এবং এরকম একটা উড়ো খবর হযরত আবূ যরের কান পর্যন্ত পৌঁছে। সাথে সাথে তিনি বিষয়টি তদন্ত করে দেখার জন্যে তাঁর কবি ভাই আনিসকে মক্কায় পাঠালেন। আনিস মক্কায় গিয়ে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। মদীনায় ফিরে তিনি ভাইয়ের কাছে বর্ণনা করেন যে, হযরত মুহাম্মদ (সা) এমন এক ব্যক্তি যিনি

সৎকাজের আদেশ দেন এবং অসৎকাজের বারণ করেন। এ সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় আবূ যরের মন ভরলো না। তিনি নিজে পায়ে হেঁটে মদীনা থেকে মক্কায় গেলেন। শেষ পর্যন্ত হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হওয়া মাত্র ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি তৎক্ষণাৎ খানায় কা'বায় উপস্থিত হয়ে কুরায়শের সম্মুখে প্রকাশ্যে উচ্চৈঃস্বরে কালেমা পাঠ করেন এবং ততক্ষণে যতটুকু কুরআন তিলাওয়াত রপ্ত করেছিলেন তা তিলাওয়াত করে সবাইকে শোনালেন। কুরায়শরা মার মার রবে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। কুরায়শদের বেদম প্রহারে তিনি চৈতন্য হারালেন। হযরত আব্বাস তখনো কুরায়শদের দলে ছিলেন। তিনি তখনো মুসলমান হননি। তিনি এসে সেখানে উপস্থিত হলেন। কাণ্ড দেখে তিনি চীৎকার করে বললেন : সর্বনাশ, এ কী কাণ্ড ! এ যে গিফারী গোত্রের লোক, যেখান থেকে তোমরা খেজুর ক্রয় করে এনে থাক ! একথা শোনা মাত্র লোকজন কেটে পড়লো। চৈতন্য ফিরতেই তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর কাছে ছুটে এলেন। পরদিন আবার তিনি পূর্বদিনের মতো প্রকাশ্যে এবং উচ্চৈঃস্বরে কালেমা পাঠ করলেন। আবার কুরায়শরা তাঁকে প্রহার করলো। এভাবে মক্কায় ইসলামের ঘোষণা দিয়ে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

ইয়াছরিবের সৌভাগ্যবান ছয়জন

নবুওয়াতের একাদশ বর্ষের শেষ মাসের কথা। মদীনার আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যকার সেই বিখ্যাত লড়াই যার প্রস্তুতি গ্রহণের নিমিত্ত বনী আশহাল গোত্রের প্রতিনিধিদল মক্কায় এসেছিলো- যা ইতিহাসে বুআছ যুদ্ধ নামে খ্যাত এবং যাতে গোত্রদ্বয়ের বড় বড় সর্দাররা নিহত হয়েছিল- তখন তা' শেষ হয়েছে। কা'বা ঘরে হজ্জের জন্যে আরবের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোক আসা তখন শুরু হয়ে গেছে। হযরত মুহাম্মদ (সা) ঐ সব কাফেলার কাছে গিয়ে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। আবূ জাহেল, আবূ লাহাবরা-তাঁর পিছু পিছু গিয়ে বহিরাগতদেরকে তাঁর কথায় কর্ণপাত করতে মানা করতো। দুষ্টদের এ দুষ্টামী থেকে বাঁচবার জন্যে হযরত মুহাম্মদ (সা) অধিকাংশ সময় রাতের অন্ধকারে দুই তিন মাইল পায়ে হেঁটে বহিরাগতদের তাঁবুতে গিয়ে পৌঁছতেন। তিনি তাদের কাছে বসতেন। মূর্তিপূজার অসারতা বর্ণনা করে তাদেরকে বোঝাতেন এবং তাওহীদ বা আল্লাহ্‌র একত্বের পানে তাদেরকে আহবান জানাতেন। এভাবে এক রাতে মক্কায় কয়েক মাইল দূরবর্তী আকাবা স্থানে তিনি কয়েকজন তীর্থযাত্রীকে আলাপ করতে শুনতে পেলেন। তিনি তাদের নিকটবর্তী হলেন। লক্ষ্য করলেন তারা ছয়জন। তিনি তাদের কাছে গিয়ে বসলেন। জিজ্ঞেস করে জানতে পেলেন যে, এরা ইয়াছরিব থেকে হজ্জ করতে এসেছেন। এরা খাযরাজ বংশের লোক। তিনি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। কুরআন শরীফের আয়াত তিলাওয়াত করে শোনালেন। তারা পরস্পরে মুখ চাওয়া-চাওয়ি শুরু করলেন এবং তৎক্ষণাৎ ঈমান আনয়ন করলেন। ইয়াছরিববাসীরা তখন প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। এক ভাগ ছিল ইয়াহূদী, অন্যভাগে মূর্তিপূজারী মুশরিকরা। এ মুশরিকদের মধ্যে আওস ও খাযরাজ কবীলা দু'টি ছিলো অত্যন্ত শক্তিশালী ও মশহুর কবীলা।

এরা ইয়াহূদীদের মুখে শুনে আসছিলেন যে, একজন মহান নবীর আবির্ভাব হতে যাচ্ছে। তিনি সকলের উপর বিজয়ী হবেন। কথাগুলো যেহেতু আগে থেকেই তারা শুনে আসছিলেন তাই তাঁকে নবীরূপে বরণ করতে তাঁরা আর দেরী করলেন না। সকলের আগে ভাগেই তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করলেন। এ ছ'জনের নাম হলো :

১. আবূ উমামা আসআদ ইব্ন যুরারা–(ইনি ছিলেন বনী নাজ্জারের লোক এবং ইনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আত্মীয়ও ছিলেন। এদের মধ্যে ইনিই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন।)
২. আওফ ইব্ন হারিছ
৩. রাফি ইব্ন মালিক
৪. কুতবা ইব্ন 'আমির
৫. জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্
৬. উকবা ইব্ন 'আমির ইব্ন নাবী

হযরত মুহাম্মদ (সা) উক্ত ছ'জনের মধ্যে রাফি ইব্ন মালিককে ঐ পর্যন্ত নাযিলকৃত আয়াতসমূহের একটি লিখিত কপি প্রদান করলেন। ঐ ছোট্ট কাফেলাটি মুসলমান হয়ে ওখান থেকেই মদীনায় ফিরে গেলো। যাবার সময় তারা ওয়াদা করে যায় যে, নিজেদের গোত্রে গিয়ে তাঁরা ইসলাম প্রচার করবেন। সত্যি সত্যি মদীনায় ফিরেই তাঁরা ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু করে দিলেন। মদীনার অলি-গলি ইসলামের আলোচনায় মুখর হয়ে উঠলো।

আকাবার প্রথম বায়'আত

মক্কার নবুওয়াতের একাদশ বর্ষ অতিবাহিত হলো। দ্বাদশতম বর্ষটিও দেখতে দেখতে এমনিভাবে কেটে গেলো। কুরায়শদের বিরোধিতা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে লাগলো। আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর বছরটি কেটে গেলো। কেননা, মদীনায় ঐ ছ'জন ভক্ত মুসলমানের কথা বার বার তাঁর মানসপটে উঁকি দিচ্ছিল যাঁরা তাঁর কাছে স্বদেশে ইসলামের তাবলীগের প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছিলেন। সুদূর মদীনায় দীর্ঘ এক বছর কালের মধ্যে সে প্রচার কাজের কি প্রতিক্রিয়া হলো তা' তিনি জানতেই পারলেন না। অবশেষে দ্বাদশতম নববী বর্ষের শেষ মাসে অর্থাৎ যিলহাজ্জ মাসে তিনি মিনার নিকটবর্তী উক্ত আকাবা নামক স্থানে গিয়ে ইয়াছরিব কাফেলার খোঁজ করতে লাগলেন। ঘটনাক্রমে একদিন সত্যি সত্যি তিনি তাঁর সেই ভক্তদের দেখা পেলেন যারা গত বছর তাঁর হাতে বায়'আত হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরাও হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে দেখতে পেলেন এবং সাগ্রহে তাঁর দিকে অগ্রসর হলেন। এবার তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন বারজন। গতবছরের সেই ছয়জনের অতিরিক্তরা এবার নতুন এসেছেন। এরা আওস ও খাযরাজ উভয় গোত্রের লোক। ঐ বারজনের নাম হলো :

১. আবূ উমামা
২. আওস ইব্ন হারিছ ইব্ন রিফাআ
৩. রাফি ইব্ন মালিক ইবনুল আজলান
৪. কুতবা ইব্ন আমির ইব্ন হাদবা
৫. উকবা ইব্ন আমির
৬. মুআয ইবনুল হারিছ
৭. যাক্ওয়ান ইব্ন কায়স ইব্ন খালিদ
৮. খালিদ ইব্ন মুখাল্লাদ ইব্ন আমির ইব্ন যুরায়ক
৯. ইবাদা ইব্ন সামিত ইব্ন কায়স

১০. আব্বাস ইব্ন উবাদা ইব্ন ফাযালা (উক্ত দশজন ছিলেন খাযরাজ গোত্রের)
১১. আবুল হায়ছাম ইবনুত তায়্যিহান (ইনি ছিলেন বনূ আবদে আশহাল গোত্রের)
১২. উয়িম ইব্ন সায়িদা (শেষোক্ত দু'জন আওস গোত্রভুক্ত ছিলেন)।

উক্ত বারোজন হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর হাতে বায়'আত হন। এটা যেন ছিলো আকাবার প্রথম বায়'আতের ছয়জনের দাওয়াতের ফসল। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকালে এরা তাদের সাথে একজন কারী বা মুবাল্লিগ দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে আবেদন জানালেন। তিনি হযরত মুসআব ইব্ন উমায়র (রা)-কে তাঁদের সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি মদীনায় গিয়ে আস'আদ ইব্ন যুরারার ঘরে অবস্থান করেন এবং ঐ বাড়ীটিতেই ইসলাম প্রচারের কেন্দ্ররূপে গড়ে তোলেন।

আকাবার প্রথম বায়'আতের সময় মুহাম্মদ (সা) যে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, তা নিম্নরূপ :

১. আমরা এক অদ্বিতীয় আল্লাহ্র ইবাদত করবো এবং কাউকে তাঁর সাথে শরীক করবো না।
২. আমরা চুরি-ব্যভিচারের কাছেও যাবো না।
৩. নিজেদের কন্যা সন্তানদের হত্যা করবো না।
৪. কারো উপর মিথ্যা অপবাদ দেবো না।
৫. চোগলখুরি করবো না।
৬. সৎ কাজে নবী করীম (সা)-এর আনুগত্য করবো।

মদীনায় মুসআব ইব্ন উমায়রের সাফল্য

মুসআব ইব্ন উমায়র (রা) মদীনায় পৌছে অত্যন্ত উদ্যম ও নিষ্ঠার সঙ্গে ইসলামের প্রচারকার্যে মনোনিবেশ করলেন। আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ ও দয়ায় মদীনাবাসীদের সৌভাগ্য সূর্য উদিত হলো। তাই তারা দলে দলে গোত্রে গোত্রে ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করেন। মদীনায় আওস গোত্রের শাখা গোত্রসমূহের মধ্যে বনূ যুফার অত্যন্ত মশহুর ও শক্তিশালী গোত্র ছিল। সা'দ ইব্ন মুআয বনূ আবদে আশহাল কবীলার সরদার হওয়ার সাথে সাথে সকল গোত্রের মধ্যে প্রধান সর্দার বলে গণ্য হতেন। বুআছ যুদ্ধে নিহত হওয়ার পর আওস গোত্রসমূহের মধ্যে যিনি সর্বাধিক গণ্যমান্য বলে বিবেচিত হতেন তিনি হলেন আসআদ ইব্ন যুরারা—যার বাড়ীতে মুসআব ইব্ন উমায়র (রা) অবস্থান করছিলেন। তিনি ছিলেন সাআদ ইব্ন মুআযের খালাতো ভাই।

একদিন মুসআব ইব্ন উমায়র (রা) ও আসআদ ইব্ন যুরারা (রা) বনী আবদে আশহালের মহল্লায় কূপের পাশে বসে আলাপ-আলোচনা করছিলেন। সাআদ ইব্ন মুআয তার মহল্লায় তাঁদের আগমন ও ইসলাম প্রচার পসন্দ করতেন না। সা'দ উসায়দ ইব্ন হুযায়রকে ডেকে বললো, আমার খালাতো ভাই বলে আমি একটু সতর্কতা অবলম্বন করছি, তুমি গিয়ে কঠোর ভাবে বলে দাও ওরা যেন আর কখনো আমাদের মহল্লায় না আসে। ওরা আমাদের লোককে পথভ্রষ্ট করে বিধর্মী বানাতে আসে। তার কথামত উসায়দ তৎক্ষণাৎ তলোয়ার হাতে আসআদ ও মুসআবের কাছে গিয়ে উপনীত হলেন এবং তাঁহাদের বেশ কষে গালিমন্দ দিলেন। তিনি

তাদেরকে অত্যন্ত কঠোরভাবে ধমকালেন। তাঁরা বললেন : আপনি যদি দয়া করে একটু বসে আমাদের দু'টি কথা শোনেন, তাতে আপনার তো কোন ক্ষতি হবে না।

তারপর আপনি যা ইচ্ছে আদেশ দেবেন, আমাদের বলার কিছু থাকবে না। উসায়দ বললেন বেশ তো, তারপর তিনি তাঁদের কাছে বসে পড়লেন। মুসআব তাঁকে ইসলামের তাৎপর্য বুঝিয়ে বললেন এবং কুরআন মজীদ পড়ে শোনালের। উসায়দ চুপচাপ তা শুনে যাচ্ছিলেন। মুসআবের কথা শেষ হতেই উসায়দ বলে উঠলেন : আমি ইসলাম গ্রহণ করছি। একথা বলেই তিনি তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করলেন। উসায়দ (রা) বললেন : আরও এক ব্যক্তি আছে তাঁকে যদি আপনারা মুসলমান বানাতে পারেন তাহলে আপনাদের বিরোধিতা করার মতো কেউ থাকবে না। আমি এক্ষুণি গিয়ে তাকে আপনাদের কাছে পাঠাচ্ছি। উসায়দ সেখান থেকে উঠে সাআদ ইব্‌ন মুআযেব কাছে গেলেন। সা'দও এতক্ষণ তারই প্রতীক্ষায় ছিলেন। বললেন : বলো হে ! তুমি তাদেরকে কী বলে আসলে ? উসায়দ (রা) বললেন : তাঁরা অঙ্গীকার করেছেন যে, তোমাদের মতের বিরুদ্ধে তাঁরা কিছুই করবেন না। কিন্তু সেখানে আরেকটি কাণ্ড ঘটে গেছে। বনূ হারিছের কতিপয় যুবক কোথা থেকে সেখানে এসে পৌঁছেছে। তারা আসআদ ইব্‌ন যুরারাকে হত্যা করতে চাচ্ছিলো। এ কথাটি শোনামাত্র সা'দ ইব্‌ন মুআয উঠে দাঁড়ালেন এবং তলোয়ার হাতে ওখানে গিয়ে উপনীত হলেন। তিনি গিয়ে দেখলেন আসআদ ও মুসআব অত্যন্ত শান্ত শিষ্টভাবে নির্বিকারে সেখানে বসে আছেন। তা দেখে তাঁর সন্দেহ হলো উসায়দ বুঝি আমাকে মিথ্যা কথা বলে ধোঁকা দিয়ে এদের কাছে পাঠিয়েছেন যাতে আমিও তাদের কথা শুনি। সাথে সাথে তিনি দু'জনকে গাল দিতে দিতে আসআদকে লক্ষ্য করে বললেন : আমি কেবল আত্মীয়তার খাতিরে চুপ করে আছি, নতুবা তোমার কি সাধ্য ছিল যে, আমার মহল্লায় এসে লোকদেরকে পথভ্রষ্ট করবে। মুসআব বললেন : আপনি একটু শান্ত হয়ে বসুন ! আমাদের দু'টি কথা শুনুন। যদি শোনার মত হয় শুনবেন, নতুবা শুনবেন না, প্রত্যাখ্যান করবেন। এ ব্যাপারে কেউ কি আপনাকে জোর করতে পারবে ?

সা'দ তলোয়ারখানা রেখে দিয়ে বসে পড়লেন। মুসআব সা'দকেও ঠিক তা-ই শোনালেন যা একটু আগে উসায়দকে শুনিয়েছিলেন। আল্লাহ্‌র কী মর্যি, সা'দও তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করলেন। কবীলায় ফিরে এসে তিনি সকলকে একত্রিত করে বললেন, তোমাদের আমার সম্পর্কে কী ধারণা ? তারা সমস্বরে বললো, আপনি আমাদের সর্বজনমান্য সর্দার। আপনার নির্দেশ আমরা সর্বদা মেনে আসছি। এবার সা'দ বললেন : যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা মুসলমান না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের সাথে আমার কোনই সম্পর্ক নেই। একথা শোনা মাত্র আবদে আশহাল গোত্রের সবাই একযোগে ইসলাম গ্রহণ করলো। অনুরূপভাবে মদীনায় অন্যান্য গোত্রেও ইসলামের প্রচার-প্রসার ঘটতে লাগলো। এটা ছিল নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছর। এদিকে মুসআব ইব্‌ন উমায়র একের পর এক সাফল্য অর্জন করে চলেছিলেন; ওদিকে মক্কায় মুসলমানদের প্রতি কুরায়শদের অত্যাচার সকল সীমা ছাড়িয়ে অসহনীয় হয়ে উঠছিলো।১৩তম নববী সালের যিলহাজ্জ মাসে হযরত মুসআব ইব্‌ন উমায়র (রা) মদীনার ৭২ জন মুসলিম নর-নারীর একটি কাফেলা নিয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। মদীনার নবদীক্ষিত মুসলিমগণ এই কাফেলাকে এজন্য প্রেরণ করে যে, তাঁরা প্রিয়নবী (সা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে মদীনায় তশরীফ আনার জন্য মদীনাবাসীদের পক্ষ থেকে দরখাস্ত করবে।

আকাবার দ্বিতীয় বায়'আত

হযরত মুহাম্মদ (সা) এ কাফেলার আগমন সংবাদ আগেই পেয়ে গিয়েছিলেন। রাতের বেলায় তিনি ঘর থেকে বেরিয়েছেন এমন সময় চাচা আব্বাসের সাথে দেখা। আব্বাস (রা) তখনো মুসলমান না হলেও হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে তিনি অত্যন্ত ভালবাসতেন এবং তিনি তাঁর প্রতি হামেশা সমমর্মী ছিলেন। কুরায়শদের ব্যাপক বিরোধিতার মধ্যেও পর্দার অন্তরালে তিনি যে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি সহানুভূতিশীল, তা হযরত মুহাম্মদ (সা) জানতেন। হুযূর (সা) তাঁকে সঙ্গে নিয়ে নিলেন। তিনি তাঁকে তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত করলেন। দু'জন রাতের আঁধারে আকাবা উপত্যকায় গিয়ে উপস্থিত হলেন।। মদীনা থেকে আগত কাফেলাটি সেখানে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এখানে শুধু মদীনা থেকে কেবল মুসলমানরাই হজ্জ করতে আসেননি, প্রাচীন প্রথা অনুসারে সেখানকার মুশরিকরাও হজ্জ করতে এসেছে। তারাও এসে মক্কার বাইরে তাঁবু গেড়েছিলো। কিন্তু আকাবার ঘাঁটিটি হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্যে নির্ধারিত ছিলো। সেখানে কেবল মদীনা থেকে আগত মুসলমান এবং তাঁদের প্রতি সহানুভূতশীল এবং ইসলামকে পসন্দ করতো এমন কিছু অমুসলিম ছিলেন। তাঁরা সকলেই হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জন্য উন্মুখ হয়ে প্রতীক্ষা করছিলেন। মদীনার অন্যান্য মুশরিক আকাবার এ সাক্ষাৎ সম্পর্কে ঘুণাক্ষরেও কিছু জানতো না। তারা তাদের মূল অবস্থান স্থলে ঘুমোচ্ছিল। তিনি আকাবায় পৌঁছে প্রতীক্ষারত মুসলমানদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তাঁদের সাথে আলাপকালে তাঁর মদীনায় চলে যাওয়ার আগ্রহের কথা শুনতে পেয়ে হযরত আব্বাস (রা) সময়োপযোগী ও জরুরী একটি ভাষণ দিলেন। তাতে তিনি বললেন :

> হে মদীনাবাসীরা ! মুহাম্মদ (সা) এখানে তাঁর স্বগোত্রের সাথে আছেন। গোত্রের লোকজন তাঁর দেখাশোনা ও হিফাযত করে থাকে। তোমরা তাঁকে নিয়ে যেতে চাও ভাল কথা কিন্তু মনে রেখো, তোমাদেরকে তাঁর দেখাশোনা ও হিফাযত করতে হবে। এ কিন্তু সহজসাধ্য কথা নয়, বলে রাখছি। তোমরা যদি বিরাট যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে পার, তাহলেই কেবল তা সম্ভবপর। তোমরা যদি এরূপ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাক, তাহলে কেবল তাঁকে তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে পার, নতুবা তাঁকে সঙ্গে নেওয়ার কথাটিও উচ্চারণ করো না।

হযরত বারা ইব্‌ন মা'রূর (রা) দাঁড়িয়ে বললেন : আব্বাস ! আমরা আপনার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনেছি। এখন আমরা চাই যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-ও এ ব্যাপারে কিছু বলুন ! তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-ও ভাষণ দিলেন। তিনি কুরআন মজীদের আয়াত পড়ে শোনালেন।

তাঁর ভাষণে হক্‌কুল্লাহ এবং হক্‌কুল ইবাদের বর্ণনা করলেন এবং তাঁকে সঙ্গে নিয়ে গেলে মদীনাবাসীদের উপর কি কি দায়িত্ব বর্তাবে তাও বর্ণনা করলেন। বারা ইব্‌ন মা'রূর (রা) সব শুনে বললেন : আমরা এ সবের জন্যে প্রস্তুত। আবুল হায়ছামা ইবন তায়্যিহান (রা) বললেন : আপনি এটা অঙ্গীকার করুন যে, আপনি আমাদেরকে ত্যাগ করে স্বদেশে আবার চলে আসবেন না। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : না, আমার বেঁচে থাকা এবং আমার মরে যাওয়া তোমাদের সাথে হবে। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা বললেন : এর বিনিময়ে আমরা কী পাবো ইয়া রাসূলাল্লাহ?

জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : জান্নাত এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি। আবদুল্লাহ বলে উঠলেন : ব্যস, সওদা হয়ে গেছে। এখন আপনিও কথা থেকে সরতে পারবেন না। আমরাও আমাদের কথা থেকে সরবো না। তারপর সকলে মিলে বায়'আত হলেন। এ বায়'আতে বারা ইব্ন মা'রূর (রা) ছিলেন সকলের অগ্রগামী। এটাই আকাবার দ্বিতীয় বায়'আত নামে বিখ্যাত। বায়'আত সম্পন্ন হওয়ার পর আসআদ ইব্ন যুরারা সকলকে লক্ষ্য করে বললেন : লোক সকল! মনে রেখো, এ প্রতিজ্ঞার অর্থ হচ্ছে আমরা গোটা পৃথিবীর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে প্রস্তুত! সকলে সমস্বরে বলে উঠলো : প্রস্তুত। আমরা খুব ভাল করেই জানি যে, আমাদেরকে গোটা পৃথিবীর বিরুদ্ধে লড়তে হবে। তারপর হুযূর (সা) তাঁদের মধ্যকার বারো জনকে নির্বাচিত করলেন এবং তাঁদেরকে ইসলাম প্রচারের বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে নিজের নকীব নিযুক্ত করলেন। তাঁদের নাম হলো।

১. হযরত আসআদ ইব্ন যুরারা (রা)
২. হযরত উসায়দ ইব্ন হুযায়র (রা)
৩. হযরত আবূল হায়ছাম ইবনুত তায়্যিহান (রা)
৪. হযরত বারা ইব্ন মা'রূর (রা)
৫. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা)
৬. হযরত উবাদা ইব্ন সামিত (রা)
৭. হযরত সা'দ ইবনুর রবী' (রা)
৮. হযরত সা'দ ইব্ন উবাদা (রা)
৯. হযরত রাফি' ইব্ন মালিক (রা)
১০. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আমর (রা)
১১. হযরত সা'দ ইব্ন হায়ছামা (রা)
১২. হযরত মুনযির ইব্ন আমর (রা)

এ বারোজন সরদারের মধ্যে নয়জন ছিলেন খাযরাজ গোত্রের, আর বাকী তিনজন ছিলেন আওস গোত্রের। এ বারোজনকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন :

"যেভাবে হযরত ঈসা (আ)-এর হাওয়ারিগণ যিম্মাদার ছিলেন, ঠিক তেমনি আমিও তোমাদেরকে তোমাদের স্বজাতিকে শিক্ষা দানের যিম্মাদারী অর্পণ করছি। আর আমি নিজে তোমাদের সকলের যিম্মাদাররূপে রইলাম।"

যে সময় আকাবার ঘাঁটিতে এ বায়'আত কার্য সম্পন্ন হচ্ছিলো তখন পর্বতশীর্ষ থেকে একটি শয়তান মক্কাবাসীদেরকে লক্ষ্য করে চীৎকার করে বললো : দেখ, দেখ, মুহাম্মদ ও তার দলবল তোমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। হযরত মুহাম্মাদ (সা) ও মুসলমানগণ সেদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র করলেন না। যখন সবকিছু চূড়ান্তভাবে ঠিকঠাক হয়ে গেলো, তখন হযরত মুহাম্মাদ (সা) মদীনায় হিজরতের দিনকাল নির্ধারণের ব্যাপারটি আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশের উপর ছেড়ে দিলেন। তারপর একজন করে তাঁরা নীরবে সে স্থান ত্যাগ করতে লাগলেন- যাতে কেউ তাঁদের এ সমাবেশ ও পরামর্শের কথা টের না পায়। হযরত মুহাম্মদ (সা) এবং হযরত আব্বাস (রা)-ও মক্কায় ফিরে আসলেন। কিন্তু ভোর না হতেই দেখা গেলো যে, রাতের এ পরামর্শের

কথা কুরায়শদের কাছে জানাজানি হয়ে গেছে। তারা তৎক্ষণাৎ মদীনাবাসীদের তাঁবুতে গিয়ে উপনীত হলো এবং জিজ্ঞেস করলো যে, রাতের বেলা মুহাম্মদ (সা) কি তোমাদের কাছে এসেছিলেন? মুশরিকরা নিজেরাই রাতের এ সমাবেশের ব্যাপারটি অবগত ছিলো না। এদের মধ্যে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়্য ইব্ন সুলূলও ছিলো—যে পরবর্তীকালে মুনাফিকদের সর্দার হয়েছিল। সে সবিনয়ে বললো : মদীনাবাসীরা এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে আর আমি তা ঘুণাক্ষরেও টের পাবো না-এমনটি তো হতে পারে না। কুরায়শরা তাতে সন্দেহমুক্ত হলো এবং সেখান থেকে ফিরে এলো।

মদীনাবাসীরা তখনই রওয়ানা হয়ে গোলো। কুরায়শরা মক্কায় ফিরে এসে বিশ্বস্ত সূত্রে পুনরায় রাতের সলা-পরামর্শের কথা জানতে পারলো। তারা পুনরায় সশস্ত্র হয়ে আকাবায় এসে পৌঁছলো। কিন্তু তখন মদীনার কাফেলা সেখান থেকে চলে গিয়েছে। কেবল হযরত সা'দ ইব্ন উবাদা (রা) এবং হযরত মুনযির ইব্ন আমর (রা) কোনো প্রয়োজনে সেখানে থেকে গিয়েছিলেন। হযরত মুনযির (রা) কুরায়শদেরকে দেখেই স্থান ত্যাগ করলেন। ফলে তারা তাঁর নাগাল পেলো না। কিন্তু হযরত সা'দ ইব্ন উবাদা (রা) তাদের হাতে বন্দী হয়ে গেলেন। কুরায়শরা তাঁকে প্রহার করতে করতে মক্কায় নিয়ে এলো। হযরত সা'দ ইব্ন উবাদা (রা) এ সম্পর্কে বলেন যে, মক্কাবাসীরা যখন আমাকে প্রহার করছিলো তখন লাল ও সাদা পোশাকধারী এক ব্যক্তিকে আমি আমার দিকে এগিয়ে আসতে দেখতে পেলাম। আমি মনে মনে ভাবলাম এ লোকটির কাছে হয়তো সদয় ব্যবহার পাবো।....... কিন্তু সে কাছে আসতেই আমাকে সজোরে একটা চপেটাঘাত করলো। তখনই আমার স্থির বিশ্বাস জন্মালো যে, এদের মধ্যে কোন ভাল লোক নেই- যার কাছে মানবতা বা বিবেকপূর্ণ ব্যবহার আশা করা যেতে পারে। এমন সময় আর এক ব্যক্তি এসে বললো, কি হে ! কুরায়শদের মধ্যে তোমার কোন পরিচিত লোকজন নেই ? আমি বললাম, হাঁ। যুবায়র ইব্ন মুত'ঈম এবং হারিছ ইব্ন উমাইয়া- দু'জনেই আবদে মানাফের পৌত্র-আমার পরিচিত। তখন ঐ ব্যক্তি বললেন : তাহলে ঐ দুজনের নাম ধরে তুমি সাহায্য প্রার্থনা করছ না কেন ? আমাকে এ বুদ্ধি বাতলে দিয়ে তিনি ঐ দুই ব্যক্তির কাছে গিয়ে বললেন, খাযরাজ গোত্রের জনৈক ব্যক্তিকে বেদম প্রহার করা হচ্ছে আর লোকটি তোমাদের নাম নিয়ে নিয়ে সাহায্যের জন্যে ফরিয়াদ করছে। তারা জিজ্ঞেস করলেন লোকটির নাম কি? ঐ ব্যক্তি বললেন : ওর নাম সা'দ ইব্ন উবাদা। ... তখন তাঁরা দু'জনে বললেন, হাঁ। ঐ ব্যক্তির যথেষ্ট ঋণ আমাদের উপর রয়েছে। আমরা ব্যবসা উপলক্ষে মদীনা গেলে ওর ওখানেই উঠি এবং সে আমাদের দেখাশোনা করে। তারপর ঐ দুজন এসে আমাকে মারমুখী কুরায়শদের হাত থেকে উদ্ধার করে। আমি তক্ষণি ইয়াছরিবের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। এখানে উল্লেখ্য যে, আকাবার দ্বিতীয় বায়'আতের বহু পূর্বেই আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে প্রিয় নবী (সা)-কে হিজরত করতে হতে পারে তা জানিয়ে দেয়া হয়েছিলো। এমন কি স্বপ্নে তিনি খেজুর গাছের সারি ঘেরা এক জায়গায় হিজরত করছেন দেখতে পান। পরে তিনি নিশ্চিত হন যে জনপদ হচ্ছে ইয়াছরিব (মদীনা)।

মদীনায় হিজরতের সাধারণ অনুমতি

আকাবার দ্বিতীয় বায়'আতের পর মক্কার মুসলমানদের উপর কুরায়শদের অত্যাচারের মাত্রা এতোই বৃদ্ধি পেলো যে, মক্কায় তিষ্টানো তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠলো। হযরত

মুহাম্মদ (সা) তাদের সীমাহীন-অত্যাচার উৎপীড়ন লক্ষ্য করে মক্কার মুসলমানদেরকে তাঁদের মদীনায় হিজরতের অনুমতি দিয়ে দিলেন। এ অনুমতি পেয়েই মুসলমানরা নিজেদের বাড়িঘর ফেলে দিয়ে আত্মীয়-পরিজনের মায়া কাটিয়ে মদীনায় হিজরত করতে শুরু করলেন। কুরায়শরা যখন দেখলো যে, এরা বাড়িঘর ত্যাগে প্রস্তুত এবং মদীনায় গিয়ে শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ জীবন-যাপন করবে তখন এটাও তাদের সহ্য হলো না। তারা হিজরতকারীদের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে লাগলো।

হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন, আমার স্বামী আবূ সালামা (রা) হিজরত করতে মনস্থ করলেন। আমাকে তিনি উটের পিঠে চড়ালেন। যখন আমরা রওয়ানা হয়ে পড়লাম, তখন গোত্রের লোকেরা এসে আবূ সালামাকে ঘিরে ফেললো। তারা বললো, তুই যেতে চাস, যেতে পারিস, কিন্তু আমাদের গোত্রের এ মেয়েকে আমরা তোর সাথে নিয়ে যেতে দেবো না। এমন সময় আবূ সালামার গোত্রের লোকজনও এসে উপস্থিত হলো। তারা এসে বললো, তুই যেতে চাস্ যা, কিন্তু এ শিশু আমাদের গোত্রেরই একজন। তাকে নিয়ে যেতে আমরা তোকে দেবো না। ফলে বনূ আবদুল আসাদ শিশুকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলো। বনূ মুগীরা উম্মে সালামাকে কেড়ে নিলো। অগত্যা আবূ সালামা একাকীই মদীনায় হিজরত করলেন। উম্মে সালামা তাঁর স্বামী ও শিশু সন্তান উভয়কেই হারালেন। আবূ সালামা স্ত্রী ও পুত্র উভয়ের মায়া কাটিয়ে একাকী হিজরত করে সওয়াবের ভাগী হলেন।

হযরত সুহায়ব রূমী (রা) যখন মক্কা থেকে বেরোলেন, তখন তাঁর যাবতীয় ধন-সম্পদ মক্কাবাসীরা লুটে নিলো। হাজার হাজার টাকার সম্পদ তাঁর নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়ে নিতান্তই রিক্তহস্তে তাঁকে তারা মদীনায় হিজরত করতে দিলো। হযরত হিশাম ইব্‌ন 'আস (রা) যখন হিজরত করতে মনস্থ করলেন তখন সংবাদ পেয়ে মক্কার কুরায়শরা এসে তাঁকে বন্দী করলো এবং তাঁকে নানারূপ নির্যাতন করতে লাগলো। হযরত আয়িশা (রা) হিজরত করে মদীনায় গিয়ে উপনীত হয়েছিলেন। আবূ জাহেল তাঁর পিছু পিছু মদীনায় গিয়ে পৌঁছলো এবং সেখানে থেকে তাঁকে ধোঁকা দিয়ে মক্কায় ফিরিয়ে নিয়ে এসে বন্দী করলো।

এ জাতীয় বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও এক এক, দুই দুই জন করে বহু মুসলিম হিজরত করে মদীনায় গিয়ে উপনীত হন। সেখানে এই মুহাজিরগণ মদীনায় মুসলমানদের মেহ্‌মান হন। মক্কা থেকে আগত এ মুসলমানরা মুহাজির এবং মদীনায় তাঁদের মেজবান মুসলমানরা আনসার নামে খ্যাত হন। এরপর থেকে আমরা তাঁদেরকে এ নামেই উল্লেখ করবো।

নবুওয়াতের চতুর্দশ বছর তখন শুরু হয়ে গেছে। মক্কায় তখন কেবল হযরত মুহাম্মদ (সা), হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা), এবং হযরত আলী (রা) এবং তাদের পরিবার-পরিজনদের হিজরত করা বাকী। আর রয়েছেন এমন কতিপয় দুর্বল মুসলমান যাদের হিজরত করার মতো সামর্থ্য ছিলো না। অন্যান্য মুসলমান সকলেই মক্কা থেকে হিজরত করে চলে গিয়েছেন। মক্কায় মুসলমানদের আবাস স্থলগুলো একদম জনশূন্য হয়ে পড়েছিলো। হযরত মুহাম্মদ (সা) তখনও হিজরত করার সিদ্ধান্ত নেননি। কেননা তিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ওয়াহীর নির্দেশের প্রতীক্ষা করছিলেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে তিনি পথসঙ্গীরূপে পাবার জন্যে রেখে দিয়েছিলেন। অনুরূপভাবে হযরত আলী (রা)-ও হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নির্দেশক্রমে তখনো মক্কাতেই আছেন।

দারুন নাদওয়ায় কুরায়শদের পরামর্শ সভা

কুরায়শরা যখন রক্ষ্য করলো যে, মুসলমানরা একে একে প্রায় সকলেই চলে গিয়েছে এবং এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক মদীনায় গিয়ে উপনীত হয়ে এখন এক শক্তির রূপ পরিগ্রহ করেছে যা মোটেই উপেক্ষণীয় নয়, তখন তাদের ভবিষ্যত সংকটের আশংকা মনে মনে দেখা দিলো। তারা স্পষ্টই দেখতে পেলো যে, তাদের সম্ভ্রম ও জীবনের নিরাপত্তা মুসলমানদের পূর্ণ মূলোৎপাটনের উপরই নির্ভরশীল। যেহেতু মক্কা থেকে মুহাম্মদ (সা)-এর সমর্থকদের প্রায় সকলেই তখন চলে গেছেন, বলতে গেলে তিনি এখন একান্তই একাকী। তাই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া তাদের জন্যে খুবই সহজ ছিল যে, সেখান থেকে ধর্মের প্রবর্তককে খতম করে দেয়াই একান্ত জরুরী হয়ে পড়েছে এবং এ ব্যাপারে উদাসীনতা প্রদর্শন করা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। কেননা মুহাম্মদ (সা) যদি মক্কা থেকে বেরিয়ে যান এবং মদীনায় গিয়ে তাঁর সমর্থকদের সাথে মিলিত হয়ে যান তাহলে এ নতুন ধর্মের সংকট মুকাবিলা করা সহজসাধ্য থাকবে না, দুঃসাধ্য হয়ে উঠবে। একথাটি কুরায়শের প্রত্যেকটি ব্যক্তির মুখে মুখে এবং এ চিন্তা তাদের প্রতিটি লোকের মগজে ঘুরপাক খাচ্ছিলো। দেখতে দেখতে মক্কার সমস্ত গোত্রের মধ্যে এ সর্বনাশা নিষ্ঠুর চিন্তাধারা ছড়িয়ে পড়লো। অবশেষে নবুওয়াতের চতুর্দশ বর্ষের সফর মাসে বনূ হাশিম ছাড়া কুরায়শের অন্যান্য গোত্রের সকল উল্লেখযোগ্য সরদাররা এ ব্যাপারে সলা-পরামর্শ করার জন্যে দারুন নাদওয়ায় একত্রিত হলো। এ পরামর্শ সভায় কুরায়শদের মশহুর ও উল্লেখযোগ্য যেসব সরদার সমবেত হয়েছিলো তারা হলো :

১. আবূ জাহেল ইব্ন হিশাম (বনী মাখযূম-এর পক্ষ থেকে)
২. নাবিলা (তারা দু'জনেই হাজ্জাজের পুত্র, এরা বনূ সাহমের লোক)
৩. মুনাব্বাহ (বনূ জুমাহ-এর প্রতিনিধি)
৪. উমাইয়া ইব্ন খাল্ফ
৫. আবুল বুখতরী ইব্ন হিশাম
৬. যুমআ ইব্ন আসওয়াদ (বনূ সাহমের প্রতিনিধি)
৭. হাকীম ইব্ন হিযাম
৮. উমাইয়া নযর ইব্ন হারিছ (বনূ আবদে দার-এর প্রতিনিধি)
৯. উত্বা (এরা দু'জনই রবীআর পুত্র)
১০. শায়বা
১১. আবূ সুফিয়ান ইব্ন হার্ব (এরা বনূ উমাইয়া গোত্রের লোক)
১২. তায়মা ইব্ন আদী
১৩. জুবায়র ইব্ন মুতঈম
১৪. হারিছ ইব্ন আমির (এরা বনী নাওফিল-এর লোক)

উল্লেখযোগ্য, উক্ত লোকদের ছাড়াও আরো অনেক সরদার এ পরামর্শ সভায় উপস্থিত ছিলো। জনৈক অভিজ্ঞ বৃদ্ধ নজ্দবাসী শয়তানও এ মজলিসে উপস্থিত ছিলো। ঐ বৃদ্ধটিই ছিলো ঐ মজলিসের সভাপতি। এ ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হলো যে, ভাবী সঙ্কটের কেন্দ্রবিন্দু ও উৎস হচ্ছেন হযরত মুহাম্মদ (সা)। এখন বিবেচ্য বিষয় ছিলো তাঁর সাথে কী

আচরণ করা হবে ? একজন বললো, মুহাম্মদকে জিঞ্জিরাবদ্ধ করে একটি কুঠরিতে বন্দী করে রেখে দিলেই হয়। দৈহিক কষ্ট এবং ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হয়ে সেখানে তাঁর মৃত্যু ঘটবে। নজদের সেই বৃদ্ধটি বললো : এ অভিমতটি ঠিক নয়। কেননা, তার আত্মীয়-পরিজন এবং অনুসারীরা তাকে মুক্ত করতে সচেষ্ট হবে এবং তাতে ফ্যাসাদ বাড়বে বৈ কমবে না। অপর একজন বললো, মুহাম্মদকে মক্কা থেকে বের করে দিয়ে পুনরায় ঢুকতে না দিলেই হয়। নজদী বৃদ্ধ এ অভিমতকেও যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে নাকচ করে দিল। মোটকথা, নানা জনে নানা প্রস্তাবই উত্থাপন করলো আর নজদী বৃদ্ধ প্রত্যেকটি প্রস্তাবই নাকচ করে দিল। অবশেষে আবূ জাহেল তার প্রস্তাব উত্থাপন করলো। সে বললো, আমার মতে আমাদের প্রত্যেক গোত্র থেকে এক একজন অসি চালক বেছে নেয়া দরকার। এরা একযোগে চতুর্দিক থেকে মুহাম্মদ (সা)-এর উপর চড়াও হয়ে তাকে হত্যা করবে। ফলে মুহাম্মদের রক্তপণ আদায়ের দায়িত্ব যৌথভাবে সকল গোত্রের উপর বর্তাবে। বনূ হাশিম একা এতগুলো গোত্রের মুকাবিলাও করতে পারবে না। ফলে তারা রক্তের বদলা নেওয়ার পরিবর্তে রক্তপণ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হবে। আর এ রক্তপণ আদায় করায় তেমন কোন বেগও পেতে হবে না। সবাই মিলে সব গোত্র থেকে চাঁদা উঠিয়ে সহজেই তা পরিশোধ করা যাবে। আবূ জাহেলের এ প্রস্তাবই নজদী বুড়োর খুবই মনঃপূত হলো এবং সভার সকলেই তা একবাক্যে মেনে নিলো। এদিকে দারুন নাদওয়ায় এ সলা-পরামর্শ চলছিল। ওদিকে আল্লাহ্ তা'আলা ওয়াহীর মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে কাফিরদের সব সলা-পরামর্শের কথা জানিয়ে দিলেন এবং হিজরতের হুকুম নাযিল করলেন।

সফরের আয়োজন

আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে হিজরতের নির্দেশ পাওয়া মাত্র হযরত মুহাম্মদ (সা) ভরা-দুপুরে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন। গ্রীষ্মের মওসুমে দুপুর বেলা লোক রৌদ্রের উত্তাপ ও লু-হাওয়া থেকে আত্মরক্ষার জন্যে ঘরের কোণে আশ্রয় নেয়। রাস্তা-ঘাট থাকে জনশূন্য ও নিরিবিলি। হযরত মুহাম্মদ (সা) হযরত আবূ বকর (রা)-এর ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। এই অসময়ে হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে আসতে দেখেই হযরত আবূ বকর (রা)-এর বুঝতে বাকী রইলো না যে, হিজরতের আদেশ নাযিল হয়ে গেছে। হযরত মুহাম্মদ (সা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন : ঘরে বাইরের কেউ নেই তো ? যখন জানতে পারলেন যে, আবূ বকর (রা) এবং তাঁর কন্যাদ্বয় আসমা ও আয়িশা ছাড়া অপর কেউই এখন ঘরে নেই তখন তাঁকে তিনি বললেন যে, ইয়াছরিবে (মদীনায়) হিজরতের হুকুম এসে গেছে।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তখন জিজ্ঞেস করলেন : সফরসঙ্গী কে হবে ? হযরত নবী করীম (সা) বললেন : তুমিই হবে আমার সফরসঙ্গী। শুনে আবূ বকর (রা) এতই আনন্দিত হলেন যে, খুশিতে তাঁর চোখ দু'টি থেকে টপটপ করে আনন্দাশ্রু ঝরতে লাগলো। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি পূর্ব থেকেই দু'টি উটনী খরিদ করে খুব ভাল করে খানা-দানা দিয়ে মোটা তাজা করে রেখেছি। তার একটি আমি আপনার হাতে তুলে দিচ্ছি। হযরত মুহাম্মদ (সা) বললেন, আমি তার মূল্য শোধ করবো। অগত্যা হযরত আবূ বকর (রা) মূল্য নিতে বাধ্য হলেন। ঠিক তক্ষুণি হিজরত করার আয়োজন শুরু হয়ে গেলো। হযরত আসমা বিনৃত আবূ বকর (রা) ছাতুর থলে এবং খাবার-দাবার ঠিক করতে লেগে গেলেন। হযরত আয়িশা (রা)-র বয়স তখন খুবই কম। হযরত মুহাম্মদ (সা) হযরত আবূ বকর (রা)-কে

সংবাদ দিয়েই নিজ ঘরে ফিরে আসলেন। সামনের রাতটিই ছিলো মুশরিকদের আগের রাতের প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত রাত। আজই তারা তাঁকে হত্যা করবে। সন্ধ্যার সময়ই তারা তাঁর বাড়ি অবরোধ করলো। তারা অপেক্ষায় রইলো যে, যখন তিনি রাতের বেলা নামাযের উদ্দেশ্যে বের হবেন তখন একযোগে হামলা করে তাঁকে হত্যা করবে। তিনি ওয়াহীর নির্দেশ অনুসারে হযরত আলী (রা)-কে তাঁর বিছানায় শুইয়ে দিয়ে চাদর দিয়ে তাঁকে ঢেকে দিলেন। মক্কাবাসীদের যেসব গচ্ছিত দ্রব্য তাঁর কাছে রাখা ছিলো তাও তিনি হযরত আলী (রা)-কে বুঝিয়ে দিলেন এবং বললেন যে, সকালে উঠেই এ গচ্ছিত দ্রব্যগুলো মালিকদের বুঝিয়ে দিও। তারপর তুমিও মদীনায় চলে এসো। এসব সম্পন্ন করে রাতের আঁধারে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। সর্বপ্রথম তিনি সূরা ইয়াসীনের শুরুর দিকের আয়াতসমূহ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ পর্যন্ত পড়ে এক মুষ্টি মাটিতে ফুঁক দিয়ে কাফিরদের দিকে নিক্ষেপ করলেন। তারপর তাদের সম্মুখ দিয়েই অকপটে বেরিয়ে গেলেন, কিন্তু কাফিরদের কেউই তাঁকে দেখতে পেলো না।

وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ ۔

স্মরণ কর, কাফিরগণ তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তোমাকে বন্দী করিবার জন্য, হত্যা করিবার অথবা নির্বাসিত করিবার জন্য এবং তাহারা ষড়যন্ত্র করে এবং আল্লাহ্ও কৌশল করেন; আর আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশলী। (৮ : ৩০).

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বাহন উটনী দুটো আবদুল্লাহ্ ইব্ন উরায়কিতের হাতে ন্যস্ত করেন। উক্ত আবদুল্লাহ্ যদিও মুসলমান ছিলো না কিন্তু নির্ভরযোগ্য ছিলো বিধায় মদীনা পর্যন্ত পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সঙ্গত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে যখন আবূ বকর (রা) তাকে পথ প্রদর্শক নিয়োগ করেছিলেন। হযরত মুহাম্মদ (সা) নিজ বাড়ি থেকে বেরিয়ে হযরত আবূ বকর (রা)-এর বাড়িতে গেলেন। তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতীক্ষায়ই ছিলেন। কাল-বিলম্ব না করে উভয়ে তক্ষুনি বেরিয়ে পড়লেন এবং মক্কার নিম্নাঞ্চল দিয়ে চার মাইল দূরে অবস্থিত ছওর পর্বতের গুহায়-যা ছওর গুহা নামে বিখ্যাত-গিয়ে উপনীত হলেন। তাঁরা সেখানে আত্মগোপন করে রইলেন।

এ দিকে মক্কায় হযরত আলী (রা) সারারাত ধরে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর বিছানায় নিদ্রা গেলেন। মক্কার কাফিররাও সারা রাত ধরে বাড়ি অবরোধ করে দাঁড়িয়ে রইলো। তারা হযরত আলী (রা)-কে শায়িত দেখে নিশ্চিত রইলো যে, হযরত মুহাম্মদ তো বিছানায়ই শুয়ে আছেন। তারা তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে আসার জন্য অধীরভাবে অপেক্ষা করছিলো। ফজরের সময় যখন হযরত আলী (রা) নামায পড়ার জন্যে ঘুম থেকে জেগে উঠলো তখন তারা জিজ্ঞেস করলো : মুহাম্মদ কোথায়? হযরত আলী (রা) বললেন : আমি তার কি জানি?

জানার কথা তো তোমাদের! কেননা তোমরা পাহারায় ছিলে। আমি তো সারা রাত শুয়ে কাটিয়েছি। কাফিররা হযরত আলী (রা)-কে পাকড়াও করলো। তারা তাঁকে প্রহার করলো এবং কিছুক্ষণ পর্যন্ত তাঁকে বন্দী করে রাখলো। তার পর ছেড়ে দিলো। হযরত আলী (রা) ধীরে সুস্থে সমস্ত গচ্ছিত দ্রব্য মালিকদের হাতে প্রত্যর্পণ করলেন।

এখানে লক্ষণীয়, কাফিররা হযরত নবী (সা)-এর প্রাণের বৈরী ছিল, কিন্তু তাঁর বিশ্বস্ততার প্রতি এতই আস্থাশীল যে, তাদের মূল্যবান সোনা-দানা অলংকারাদি তাঁরই কাছে গচ্ছিত রাখতো। তিনিও মক্কা ত্যাগের সময়ও তাঁর এ বিশ্বস্ততা রক্ষার জন্যে সেই প্রিয় চাচাতো ভাই, যাকে তিনি আপন পুত্রসম প্রতিপালন করছিলেন, শুধু এজন্যে একাকী মক্কায় রেখে যাচ্ছেন যেন তিনি সেই গচ্ছিত দ্রব্যাদি যথারীতি মালিকের হাতে প্রত্যর্পণ করে আসেন।

কাফিররা তখন আলী (রা)-কে ছেড়ে সোজা হযরত আবূ বকর (রা)-এর বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলো। দরজায় করাঘাত করতেই হযরত আসমা (রা) বেরিয়ে এলেন। আবূ জাহেল জিজ্ঞেস করলো, হে বালিকা! তোর পিতা কোথায় ? তিনি বললেন : আমি তা জানিনে। বলতেই দুরাচার এমনি জোরে তাঁকে চপেটাঘাত করলো যে তাঁর কানের বালি (দুল) নীচে পড়ে গেল। তারপর তারা মক্কার আনাচে-কানাচে তন্ন-তন্ন করে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সন্ধান করতে লাগলো, কিন্তু কোথাও তাঁর খোঁজ পেলো না। অবশেষে তারা ঘোষণা করলো : যে কেউ মুহাম্মদ (সা)-কে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় ধরে দেবে তাকে একশ' উট পুরস্কার স্বরূপ দান করা হবে। এ পুরস্কারের ঘোষণা শুনে অনেকেই মক্কার চতুর্দিক দূর-দূরান্ত পর্যন্ত তাঁর খোঁজে বেরিয়ে পড়লো।

ছওর গিরি গুহায় আফতাব (সূর্য) ও মাহতাব (চাঁদ)

রাতের অন্ধকারে প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ যখন ছওর গুহার নিকটে গিয়ে পৌছলেন, তখন হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে প্রথমে আবূ বকর (রা) গুহার অভ্যন্তরে ঢুকলেন। তিনি তার অভ্যন্তর ভাগ পরিষ্কার করলেন এবং গুহার ছিদ্রসমূহ খুঁজে বের করে পরনের কাপড় ছিঁড়ে ছিঁড়ে সেগুলো বন্ধ করতে লাগলেন। এভাবে সমস্ত ছিদ্র বন্ধ করার পর তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে গুহার ভিতরে নিয়ে গেলেন। এ চন্দ্র ও সূর্য পূর্ণ তিন দিন তিন রাত এ গুহায় আত্মগোপন করে থাকেন। কুরায়শদের বড় বড় সর্দাররা পুরস্কারের ঘোষণা দিয়ে নিজেরাও সন্ধানী লোকদের সাহায্যে পায়ের চিহ্ন ধরে এগুতে এগুতে ছওর গুহার মুখ পর্যন্ত গিয়ে উপস্থিত হলো। সন্ধানীরা জানালো, এরপর তো আর পায়ের কোনো চিহ্নই পাওয়া যাচ্ছে না, হয় মুহাম্মদ এখানেই কোথাও লুকিয়ে আছেন, নতুবা এখান থেকে সোজা আসমানে উঠে গেছেন। একজন বললো, তাহলে এ গুহার অভ্যন্তরে গিয়েই দেখা যাক না। দ্বিতীয়জন বললো, এত অন্ধকার বিভীষিকাময় গুহায়ও মানুষ ঢুকতে পারে নাকি ? আমরা তো বহুকাল ধরে এগুলোকে এভাবেই দেখে আসছি। তৃতীয়জন বললো, দেখ, দেখ, এ গুহার মুখে মাকড়সা জাল বুনে রেখেছেন। কেউ যদি একান্তই এখানে ঢুকতোই তবে এ জাল অবশ্যই ছিন্ন হয়ে যেতো। চতুর্থজন বললো, ঐ দেখ, ওখান থেকে কবুতর উড়ে যাচ্ছে। তার ডিমও দেখা যাচ্ছে-যাতে বসে তা দিচ্ছিল। সকলেই তখন এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেল যে, গুহায় আর কোন লোক নেই। নিশ্চিন্ত হয়ে সবাই অন্য দিকে পথ ধরলো। কাফিররা গুহার এতই নিকটে পৌছে গিয়েছিল যে, হযরত মুহাম্মদ (সা) ও আবূ বকর (রা) তাদের পা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন। তাদের কথাবার্তার আওয়াজও স্পষ্টই শোনা যাচ্ছিলো। এমন বিপজ্জনক অবস্থায় হযরত আবূ বকর (রা) বলে উঠলেন : হুযূর! কাফিররা তো এসেই গেল! এখন উপায় ? হযরত মুহাম্মদ (সা) বললেন :

لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا

ভীত-বিহ্বল হয়ো না, আল্লাহ্ নিশ্চয়ই আমাদের সাথে রয়েছেন।

তারপর তিনি বললেন :

وما ظنك باثنين الله ثالثهما

সে দুই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার কী ধারণা যাদের তৃতীয় জন হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা?

কাফিররা তাদের খোঁজাখুজিতে ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে গেল। একে একে তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর কাফিররা একেবারে ক্লান্ত-শ্রান্ত ও নিরাশ হয়ে পড়লো। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তদীয় পুত্র আবদুল্লাহ ইতিপূর্বেই বলে রেখেছিলেন যে, কাফিরদের অবস্থা ও তাদের সারাদিনের কর্মতৎপরতা সম্পর্কে তিনি যেন রাত্রে এসে অবহিত করে যান। অনুরূপভাবে তদীয় গোলাম আমির ইব্ন ফুহায়রাকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন যে, ছাগলপালকে সারা দিন এদিক-সেদিক চরিয়ে রাতের বেলা তিনি যেন মেষটাকে চরাতে চরাতে ছওর গুহার কাছে নিয়ে আসেন। আসমা বিন্ত আবূ বকর (রা)-এর উপর এ দায়িত্ব অর্পণ করে রেখেছিলেন যে, আহার্য দ্রব্যাদি সযত্নে প্রস্তুত করে রাতের বেলা যেন তা গুহাবাসীদের কাছে পৌঁছিয়ে দেন। আবদুল্লাহ ও আসমা ভাইবোন দু'জন নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে যখন ঘরে ফিরতেন তখন আমির ইব্ন ফুহায়রা ছাগল দোহন করে এবং গুহাবাসীদেরকে তা পান করিয়ে ছাগলপাল নিয়ে অধিক রাতে মক্কায় প্রবেশ করতেন। এভাবে আবদুল্লাহ্ ও আসমার পদচিহ্ন ছাগলপালের চলাচলের দ্বারা মুছে যেতো। যখন মক্কাবাসীদের উৎসাহ-উদ্দীপনায় ভাটা পড়ার সংবাদ জানা গেলো তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উরায়কিতের কাছে সংবাদ পাঠানো হলো যেন প্রতিশ্রুতি অনুসারে উটনী দু'টি নিয়ে ছওর পাহাড়ের পাদদেশে এসে উপস্থিত হন। এখানে আবদুল্লাহ্, আসমা ও আমির ইব্ন ফুহায়রার গোপনীয়তা রক্ষায় প্রশংসা না করলে নাও করতে পারেন, কেননা তাঁরা ছিলেন হযরত আবূ বকর (রা)-এর ঘনিষ্ঠজন। কিন্তু আবদুল্লাহ্ ইব্ন উরায়কিতের গোপনীয়তা রক্ষা, প্রতিশ্রুতির মর্যাদা রক্ষা ও ধৈর্য-স্থৈর্যের প্রশংসা না করে পারা যায় না—যে নিছক একজন শ্রমিকই ছিল আর সে ব্যক্তি মুসলমানও ছিল না। তার এসব গুণের প্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ করলে আরবদের জিদ, আত্মমর্যাদাবোধ ও জাতীয় আভিজাত্যবোধের প্রশংসা না করে পারা যায় না। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উরায়কিত উক্ত দু'টি উটনী এবং তার নিজস্ব একটি উট নিয়ে ছওর পাহাড়ের পাদদেশে ছওর গুহার নিকট রাতের বেলা এসে উপনীত হলেন। রাতটি ছিল রবিউল আউয়াল চাঁদের প্রথম রাত। হযরত আসমা বিন্ত আবূ বকর (রা)-ও সফরের জন্যে ছাতু প্রভৃতি আহার্য দ্রব্য নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন। হযরত মুহাম্মদ (সা) ও আবূ বকর সিদ্দীক ছওর গুহা থেকে বেরিয়ে পড়লেন। একটি উটনীতে হযরত মুহাম্মদ (সা) আরোহণ করলেন। সে উটনীটির নাম ছিলো কাসওয়া। অপর উটনীতে হযরত আবূ বকর (রা) ও তাঁর গোলাম আমির ইব্ন ফুহায়রা আরোহণ করেন। পথ প্রদর্শক আবদুল্লাহ্ ইব্ন উরায়কিত তাঁর নিজস্ব উটে আরোহণ করলেন। চার ব্যক্তির এ সংক্ষিপ্ত কাফেলাটি সাধারণ পথ এগিয়ে মদীনার অন্য পথে এগিয়ে চললো। যেহেতু তখনো পশ্চাদ্ধাবনের আশংকা ছিল, তাই যাত্রা শুরুর পূর্বে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটলো এই যে, হযরত আবূ বকর-তনয়া আসমা ছাতুর যে থলে ঘর থেকে নিয়ে এসেছিলেন, ভুলক্রমে তিনি তা লটকানোর জন্যে কোন

ফিতে বা রশি নিয়ে আসননি। হযরত আসমা তখন কালবিলম্ব না করে আপন কোমরের ফিতা খুলে অর্ধেক কোমরে বেঁধে বাকী অর্ধেক দিয়ে তা উটের হাওদার সাথে বেঁধে দিলেন। হযরত মুহাম্মদ (সা) তার এ তাৎক্ষণিক ও সময়োপযোগী কাজটি দেখে অত্যন্ত প্রীত হন এবং তাঁকে 'যাতু'ন-নিতাকায়ন বা দুই ফিতাধারিণী' বলে অভিহিত করেন। পরবর্তীকালে হযরত আসমা এ খেতাবেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এ আসমা বিন্‌ত আবূ বকর (রা) ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের জননী। এটাও একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, হযরত আবূ বকর (রা) যাত্রা শুরুর সময় তাঁর ঘরের সমুদয় নগদ অর্থ সম্পদ, যার পরিমাণ ছিল পাঁচ ছয় হাজার দিরহাম, সাথে নিয়ে রওয়ানা হয়েছিলেন। তাঁর পিতা আবূ কুহাফা তখনো কুফরের উপর অবিচল ছিলেন এবং অন্ধ ছিলেন। তিনি ঘরে তাঁর নাতনীদ্বয়কে লক্ষ্য করে বললেন, আবূ বকর নিজেও গেল এবং সমুদয় অর্থ-সম্পদও নিয়ে গেল। হযরত আসমা বললেন : দাদাজান, আব্বা আমাদের জন্যে অনেক অর্থ রেখে গেছেন। বলেই তিনি একটি বস্ত্র খণ্ডে অনেক কাঁকর মুড়িয়ে ঠিক সেই স্থানে নিয়ে রেখে দিলেন, যেখানে সাধারণত টাকার থলে রাখা হতো। তিনি দাদার হাত ধরে সেখানে নিয়ে গেলেন। তিনি হাতড়ে দেখে নিয়ে ধারণা করলেন যে, আসলেও অর্থ সেখানে আছে। তখন তিনি নাতনীদেরকে বললেন, তাহলে আবূ বকর গেছে, তজ্জন্য চিন্তা নেই।

হিজরতের সফর

হযরত মুহাম্মদ (সা) কাসওয়ার পিঠে চড়ে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে মক্কার দিকে অত্যন্ত বিষাদ মাখা কণ্ঠে বললেন :

"হে মক্কা! তাবত শহরের মধ্যে তুমিই আমার প্রিয়তম শহর। কিন্তু তোমার অধিবাসীরা আমাকে এখানে থাকতে দিলো না।"

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বলে উঠলেন : "এরা আপন নবীকে দেশছাড়া করলো। এরা ধ্বংস হয়ে যাবে।"

ঐ সময়েই নাযিল হলো আল-কুরআন-এর এই আয়াত :

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقْتَلُوْنَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَإِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ

যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হইল তাহাদিগকে যাহারা আক্রান্ত হইয়াছে; কারণ তাহাদের প্রতি অত্যাচার করা হইয়াছে। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাহাদিগকে সাহায্য করিতে সম্যক সক্ষম। (২২ : ৩৯)

এখানে প্রণিধানযোগ্য, এ অবধি যারা মুসলমান হয়েছিলেন তাঁরা কোন্ পরিস্থিতিতে এবং কীভাবে ইসলামের সত্যতার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে কতো হৃদয়বিদারক যাতনা ও পর্বত-প্রমাণ বিপদাপদের মুকাবিলা করে এসেছেন। এ মুসলমানদের সম্পর্কে এ ধারণা করা যেতে পারে যে তাঁরা প্রলোভন বা ভীতির দ্বারা ইসলাম গ্রহণে বাধ্য হয়েছিলেন ? তা কখনো হতে পারে না। উক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পর এবার নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো যখন দুরাচারদের এবং সত্য ধর্মের প্রচারে বিঘ্ন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে হত্যা ও লুণ্ঠন থেকে যারা বিরত না থাকে তাদেরকে শাস্তি প্রদান এবং সত্যের প্রচারের পথ থেকে বাধা-বিপত্তি দূর করার অনুমতি পাওয়া গেলো। এবার ভবিষ্যতের ঘটনাবলীর দিকেও দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখুন আর প্রত্যক্ষ করুন, কিভাবে মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে।

এ ছোট্ট কাফেলাটি রাত্রের প্রথম ভাগেই সফর শুরু করে। পরবর্তী দিন অর্থাৎ নবুওয়াতের চতুর্দশ বর্ষের প্রথম রবিউল আউয়াল তারিখের তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত একটানা পথ চলতে থাকে। তৃতীয় প্রহরে তাঁরা উম্মে মা'বাদের খিমায় গিয়ে পৌছেন। উম্মে মা'বাদ ছিল খুযাআ গোত্রের এক অতিথিপরায়ণা বৃদ্ধা। এখানে হযরত মুহাম্মদ (সা) বকরীর দুধ পান করেন এবং কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার পথ চলতে নির্দেশ দেন। অল্প একটু পথ চলতেই লক্ষ্য করলেন সুরাকা ইব্‌ন মালিক তাঁদের পিছু পিছু ধেয়ে আসছে। সুরাকা ছিল মক্কার কুরায়শদের একজন বীর যোদ্ধা। সুরাকার ঘটনাটি এরূপ :

"সুরাকা কয়েক ব্যক্তির সাথে বসে মক্কায় গল্পগুজবে রত ছিল। কাকডাকা ভোরে এক ব্যক্তি এ মজলিসে এসে বললো, আমি তিনজন উষ্ট্রারোহীকে পথ অতিক্রম করতে দেখেছি। তারা ঐ দিকে যাচ্ছিলো। আমার ধারণা, এরা মুহাম্মদ আর তাঁর সঙ্গীরাই হবেন। সুরাকা ইঙ্গিতে ঐ লোকটিকে চুপ করতে বলে বললো, তিনি ছিলেন অমুক ব্যক্তি। তিনি আজ রাতেই যাত্রা করেছেন। তার উদ্দেশ্য ছিল, আমিই তাঁকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসবো। অন্য কেউ যেন একথা শুনে লাফিয়ে না উঠে। নতুবা একশ' উটের বিরাট উপহারটি আমার হাতছাড়া হয়ে যাবে। একটু পরেই সুরাকা সেখান থেকে উঠে নিজ ঘরে চলে আসে। সে চুপিসারে তার ঘোড়া ও অস্ত্র-শস্ত্র শহরের বাইরে পাঠিয়ে দেয় এবং নিজেও লোকের চোখ ফাঁকি দিয়ে শহর থেকে বেরিয়ে আসে। অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সে ঘোড়ায় আরোহণ করে এবং উটসমূহের পায়ের দাগ ধরে দ্রুতবেগে এগিয়ে যায়। অল্প কিছুদূর এগুতেই তার ঘোড়াটি হোঁচট খায় এবং সুরাকা ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে। তারপর আবার সে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসে এবং পুনরায় যাত্রা শুরু করে। তার মনে মনে আশা ছিল, আমি মুহাম্মদকে গ্রেফতার বা হত্যা করে একশ' উট উপহার স্বরূপ লাভ করবো। যখন হযরত মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর সঙ্গীদের উট দেখা যাচ্ছিলো, তখন তার ঘোড়াটি পুনরায় হোঁচট খেয়ে ভূমিতে পড়ে গেলো এবং তার ঘোড়ার সামনের দু'টি পা হাঁটু পর্যন্ত মাটিতে গেড়ে গেলো। সুরাকা ঘোড়ার জীন থেকে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। তারপর উঠে পুনরায় ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসলো এবং পথ চলতে শুরু করলো। হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উটনীর একেবারে নিকটে পৌছে তার ঘোড়াটি পেট পর্যন্ত মাটির নীচে প্রোথিত হয়ে গেল। সুরাকা আবার ভূমিতে ছিটকে পড়লো। এ অবস্থা দেখে সে ভীষণ ভয় পেয়ে গেল এবং স্পষ্ট বুঝতে পারলো, আমি এ মহাত্মার গায়ে হাত দিতে পারবো না। তাই সে তার বাহন ঘোড়াটিকে থামিয়ে দিল। সে বললো, আমি তো আপনাকে গ্রেফতার করতেই এসেছিলাম, কিন্তু এখন আমি ফিরে চলছি এবং আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমাকে একটি নিরাপত্তাপত্র লিখে দিন এবং ক্ষমা করে দিন। ফিরে যাবার কালে আরো যারা আপনার পশ্চাতে একই উদ্দেশ্যে ছুটে আসছে তাদেরকেও ফিরিয়ে নিয়ে যাবো। সত্যি সত্যি হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নির্দেশে আবূ বকর সিদ্দীক (রা) অথবা তাঁর খাদিম আমির ইব্‌ন ফুহায়রা উটের উপর বসে বসে একটি নিরাপত্তাপত্র লিখে তার দিকে ছুঁড়ে দিলেন। সে ঐ পত্রখানা নিয়ে মক্কার দিকে ফিরে চললো। পথে যাদেরকেই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সন্ধানে আসতে পাওয়া গেল সবাইকে সে এই বলে ফিরিয়ে নিয়ে গেল যে, এদিকে তাঁর তো কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। মক্কা বিজয়ের সময় সুরাকা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হযরত মুহাম্মদ (সা) প্রদত্ত উপরোক্ত নিরাপত্তাপত্রকেই তিনি তাঁর দলীল বা প্রমাণপত্ররূপে গ্রহণ করেন।

ছওর গিরিগুহা তথা নিম্ন মক্কা থেকে রওয়ানা হয়ে আবদুল্লাহ ইবন উরায়কিত হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে সমুদ্রোপকূলের পথ ধরে এগিয়ে নিয়ে চলেন। 'আসফান নামক স্থান থেকে সামান্য দূর এগিয়ে সাধারণ চলাচলের পথ ডিঙ্গিয়ে উমাজ নামক স্থানের নিম্নভাগে কাদীদ পর্যন্ত তাঁরা এগিয়ে যান। তারপর আবার রাজপথ ডিঙ্গিয়ে খার্রার প্রান্তর তাঁরা অতিক্রম করেন। সানাতুল মুররা, লাফত, মুদলিজা, মাখাজ প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করে যুল-আযওয়াইন অঞ্চল পেরিয়ে যী-মুসলিম মরুভূমির মধ্য দিয়ে আল-আবাবীদ, আল-আ'রাজ প্রভৃতি স্থান তাঁরা অতিক্রম করেন। আল-আ'রাজের নিম্নভূমি অতিক্রমকালে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উটনী ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লো। সেখানে আসলাম গোত্রের জনৈক আওস ইব্‌ন হাজারের নিকট থেকে একটি উট নেন। আওস ইব্‌ন হাজার তাঁর একটি গোলামকেও হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে দিয়ে দেন। সেখান থেকে এ কাফেলাটি মুছান্নাতুল-গায়ের-এর রাস্তায় রীম প্রান্তরে এসে পৌঁছেন। রীম প্রান্তর অতিক্রম করে দুপুর বেলা তাঁরা কুবার নিকটে এসে পৌঁছেন।

সুরাকা ইব্‌ন মালিকের প্রত্যাবর্তনের পর সামান্য পথ অতিক্রম করতেই হযরত যুবায়র ইব্‌ন আওআম (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ। তিনি তখন সিরিয়া থেকে বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে মক্কায় ফিরছিলেন। যুবায়র ইব্‌ন আওআম হযরতের খিদমতে পরিধেয় বস্ত্র পেশ করলেন এবং জানালেন যে, তিনিও মক্কায় ফিরেই কালবিলম্ব না করে মদীনায় চলে আসবেন। এ সফরে যেখানেই লোকের সাথে সাক্ষাৎ হতো, তারা হযরত আবূ বকর (রা)-কে চিনে ফেলতো। কেননা, ব্যবসা ব্যাপদেশে প্রায়ই তাঁর এ পথে আসা-যাওয়া ছিল। পক্ষান্তরে হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে লোকে চিনতো না। তাই তাকে প্রায়ই জিজ্ঞেস করতো, আপনার আগে আগে পথ অতিক্রমকারী এ ব্যক্তিটি কে? তিনি জবাব দিতেন : هذا يهديني السبيل "ইনি আমার পথ প্রদর্শক।"

সফরের সমাপ্তি

আট দিন পথ চলে হযরত নবী (সা) ৮ই রবিউল আউয়াল ১৪ নববী সালে দুপুর বেলা কুবার নিকটে এসে পৌঁছেন। কুবা মদীনা থেকে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত এবং এটি মদীনারই একটি পল্লী বলে বিবেচিত হতো। সেখানে বনী আমর ইব্‌ন আওফ গোত্রের প্রচুর লোক বাস করতো এবং তাঁরা ইসলামের আলোকে ইতিপূর্বেই আলোকিত হয়েছিলেন। মক্কা থেকে নবী (সা)-এর রওয়ানা হওয়ার সংবাদ মদীনায় কয়েক দিন পূর্বেই পৌঁছে গিয়েছিল। এজন্যে মদীনার আনসারগণ প্রতিদিন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত তাঁর আগমন প্রতীক্ষায় জনপদের বাইরে এসে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতেন। তাঁদের আশা ছিলো এভাবে নবী করীম (সা)-এর শুভাগমনের দৃশ্য বহু দূর থেকেই তাঁরা দেখতে পাবেন। যখন সূর্যের উত্তাপ বৃদ্ধি পেয়ে সহ্যসীমার বাইরে চলে যেতো, কেবল তখনই তারা নিজ নিজ বাড়ীতে ফিরে যেতেন।

জনৈক ইয়াহূদী মুসলমানদেরকে এ ভাবে বিপুল সংখ্যায় ভিড় করে থাকতে প্রতিদিনই দেখতে পেতো। সে জানতো যে, হযরত মুহাম্মদ (সা) মক্কা থেকে আসছেন এবং এরা প্রতিদিন তাঁরই প্রতীক্ষায় ভিড় করে। ঘটনাক্রমে ঐ ইয়াহূদীটি সেদিন তার ঘরের ছাদের উপর উপবিষ্ট ছিল। সে দূর থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাশরীফ আনছেন দেখতে পেলো। তাই সে চীৎকার করে বললো :

يا معشر العرب يا بنى قيله هذا جدكم قد جاء

ওহে আরবরা! ওহে দুপুরে বিশ্রামকারীরা!! ঐ যে তোমাদের অভীষ্ট আগন্তুক, তোমাদের সৌভাগ্যের হেতু এসে পড়েছেন!

আওয়াজটি শুনতেই লোকজন যার যার ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। গোটা কুবা পল্লীতে মহা ধুমধাম পড়ে গেল। আনসাররা লক্ষ্য করলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা) একটি খেজুর বাগানের দিক থেকে আসছেন। আল্লাহ্র রাসূল কোনজন তা' চিনতে যেন কারো বেগ পেতে না হয় তাই হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) চট করে উঠে তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে আপন চাদর দিয়ে তাঁকে ছায়া দান করতে লাগলেন। ফলে কে মনিব্ আর কে তাঁর ভক্ত তা চিনতে কাউকে আর বেগ পেতে হলো না।

মহানবী (সা) কুবা পল্লীতে প্রবেশ করছিলেন আর আনসার বালিকারা মনের আনন্দে আবৃত্তি করছিলো :

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا * مِنْ ثَنِيَاتِ الْوَادَاعِ

وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا * مَا دَعَا لِلّٰهِ دَاعٍ

اَيُّهَا الْمَبْعُوْثُ فِيْنَا * جِئْتَ بِالْاَمْرِ الْمُطَاعِ

পূর্ণ শশীর উদয় আজি মোদের আঙিনায়
ছানিয়াতুল বিদা-য় তোরা দেখবি যদি আয়
ওয়াজিব হলো মোদের তরে শোকর আদায়
যাবৎ কেউ ডাকিবে লোকে ডাকিতে খোদায়
হে মহান সত্তা তুমি প্রেরিত হেথায়
শিরোধার্য তব আদেশ যদিও প্রাণ যায়।

—(অনুবাদক)

[এখানে 'ছানিয়াতুল বিদা' বলতে ঐ স্থানটিকেই বোঝানো হয়েছে যেখান পর্যন্ত মদীনাবাসীরা মক্কায় হজ্জযাত্রীদেরকে বিদায় দেয়ার সময় বিদায় অভিনন্দন জানাতে অগ্রসর হতো। আজ সেই বিদায়-অভিনন্দনের স্থান দিয়েই নবুওয়াত-সূর্য মদীনায় প্রবেশ করছিলেন মক্কা থেকে এসে। তাই এ অভিনন্দন কাব্যে শব্দের কবিত্বের সাথে সাথে ভাবের একটা চমৎকার কাব্যিকতাও বিদ্যমান।—অনুবাদক]

হযরত নবী (সা) সোমবার দিন কুবায় প্রবেশ করেন এবং শুক্রবার পর্যন্ত এখানেই অবস্থান করেন। হযরত নবী (সা) কুলছুম ইব্ন হাদামের ঘরে এবং হযরত আবূ বকর (রা) হাবীব ইবন আসাফের ঘরে অবস্থান করেন। মজলিস হতো সাআদ ইব্ন খায়ছামা (রা)-এর বাড়িতে। অর্থাৎ সেখানে লোকজন এসে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং সেখানেই তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চতুষ্পার্শ্বে ভিড় জমিয়ে থাকতেন। এ কয়দিনের মধ্যেই তিনি কুবায় একটি মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন। এটাই ছিল ইসলামের সর্বপ্রথম মসজিদ। তারপর ১২ই রবিউল আউয়াল শুক্রবার তিনি কুবা থেকে রওয়ানা হয়ে মদীনায় প্রবেশ করেন। তিনি কুবায়

থাকতেই হযরত আলী কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু মক্কা থেকে এসে তাঁর খিদমতে উপনীত হন। মক্কা থেকে মদীনার এ দীর্ঘ পথ তিনি পদব্রজে অতিক্রম করেন। হযরত মুহাম্মদ (সা) যখন সওর গিরিগুহায় অবস্থান করছিলেন, তখন তিনি মক্কায় অবস্থান করে লোকজনের গচ্ছিত দ্রব্যাদি প্রত্যর্পণ করছিলেন। ঘটনাচক্রে যেদিন হযরত মুহাম্মদ (সা) সওর গিরিগুহা থেকে মদীনার দিকে রওয়ানা হন ঐ দিনই হযরত আলী (রা)-ও মক্কা থেকে মদীনার পানে রওয়ানা হন। কিন্তু হযরত আলী (রা) যেহেতু একাকী ছিলেন তাই রাতের বেলায় তিনি সারারাত ধরে পথ চলতেন এবং দিনের বেলায় কোথাও আত্মগোপন করে পড়ে রইতেন। হযরত মুহাম্মদ (সা) সর্বজনপরিচিত রাস্তা এড়িয়ে অন্য পথে দূরত্বটুকু অতিক্রম করেন এবং তাতে কুবা পৌঁছতে তাঁর আটদিন সময় অতিবাহিত হয়। হযরত আলী (রা) পরিচিত রাস্তা দিয়েই আসেন। কিন্তু যেহেতু তিনি পায়ে হেঁটে এসেছিলেন, তাই কুবায় পৌঁছতে তাঁর তিন চার দিন বেশী সময় লাগে।

মদীনায় প্রবেশ

শুক্রবার দিন হযরত মুহাম্মদ (সা) কুবা এবং কুবার অধিবাসী বনী আমর ইব্‌ন আওয়াফ গোত্রের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। মদীনার প্রতিটি মহল্লার প্রতিটি পরিবার সর্বান্তঃকরণে কামনা করতো যে, হযরত মুহাম্মদ (সা) যেন তাদেরই ঘরে গিয়ে বসবাস করেন। তিনি বনী সালিম ইব্‌ন আওফের মহল্লায় পৌঁছতেই জুমুআর সালাতের ওয়াক্ত হয়ে যায়। হযরত মুহাম্মদ (সা) একটি খোলা মাঠে একশত জন ভক্তদের নিয়ে জুমুআর সালাত আদায় করেন। এটা ছিল মদীনায় তাঁর প্রথম জুমুআ এবং প্রথম খুতবা। এখানেও একটি মসজিদ নির্মিত হলো।

জুমুআর সালাত অন্তে হযরত মুহাম্মদ (সা) তাঁর উটনীতে চড়ে বসলেন। বনী সালিম ইব্‌ন আওফ-এর লোকেরা এসে তাঁর উটের বল্গা ধরে বসলো এবং তাঁকে তাদের ওখানেই থাকার জন্য আবদার জানালো। অন্যান্য কবীলার এবং অন্যান্য মহল্লার লোকেরাও তাঁকে তাদের ওখানে নিয়ে যেতে তাদের আগ্রহ প্রকাশ করলো। এভাবে তাদের মধ্যে বাদানুবাদের সৃষ্টি হলো। হযরত মুহাম্মদ (সা) বললেন : আমার উটনীকে তোমরা থামিও না ! তার লাগাম ছেড়ে দাও ! আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সে নির্দেশ ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছে। যেখানে আমার উটনীটি বসে পড়বে সেখানেই আমি অবস্থান করবো। উটনীর লাগাম তাই ছেড়ে দেয়া হলো এবং সে এগিয়ে চললো। সমস্ত আনসার ও মুহাজির তার অগ্র-পশ্চাতে ও ডানে-বামে সাথে সাথে এগিয়ে চললেন। হযরত নবী (সা) লাগাম ঢিলা দিয়ে দিলেন এবং সে তার নিজ খুশিতে ধীরে ধীরে চলতে লাগলো। সকলেই অধীর আগ্রহে অপলক নেত্রে উটনীর দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। সকলেই পরম কৌতূহল—শেষ পর্যন্ত সে কোথায় গিয়ে থামে এবং কার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় তা-ই দেখবেন। উটটি যখন হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে নিয়ে বনূ বায়াদিয়া গোত্রের মহল্লায় গিয়ে উপনীত হলো তখন সেই গোত্রের সর্দার যিয়াদ ইব্‌ন লবীদ এবং উরওয়া ইব্‌ন আমর অগ্রসর হয়ে উটনীর লাগাম ধরতে উদ্যত হন। তখন হযরত মুহাম্মদ (সা) বলে উঠলেন :

دَعُوهَا فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ

একে ছেড়ে দাও। কেননা সে ইতিমধ্যেই সুনির্দিষ্ট আদেশ পেয়ে গেছে।

তারপর উটনীটি বনূ সাঈদা গোত্রের মহল্লায় গিয়ে উপনীত হয়। বনু সাঈদা গোত্রের সরদার সা'দ ইব্ন উবাদা এবং মুনযির ইব্ন আমর উটনীকে বাধা দিতে চাইলেন। তখন হযরত মুহাম্মদ (সা) আবারও বললেন :

دَعُوْهَا فَاِنَّهَا مَامُوْرَةٌ

একে ছেড়ে দাও, কেননা ইতিমধ্যেই সে সুনির্দিষ্ট আদেশ পেয়ে গেছে।

তারপর উটনীটি বনূ হারিছ ইব্ন খাযরাজ গোত্রের মহল্লায় গিয়ে উপনীত হলো। এখানে সা'দ ইবনুর রবীঈ, খারিজা ইব্ন যায়দ ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা থামাতে চাইলেন। তাঁদেরকেও পূর্বোক্ত নিষেধাজ্ঞাটি শোনানো হলো। সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে উটনীটি বনূ আদী ইবনুল নাজ্জারের মহল্লায় গিয়ে উপনীত হলো। এটি যেহেতু আবদুল মুত্তালিবের নানার গোত্র ছিল এজন্য তাদের দাবী ছিল এই যে, আবদুল মুত্তালিবের মা সালমা বিন্ত আমর যেহেতু আমাদেরই গোত্রের মেয়ে ছিলেন, তাই হযরত মুহাম্মদ (সা) আমাদেরই সাথে থাকবেন। সাথে সাথে বনূ আদী গোত্রের সর্দার সলীত ইব্ন কায়েস ও আসীরা ইব্ন খারিজা অগ্রসর হয়ে উটনীর লাগাম ধরেও বসলেন, কিন্তু তাঁদেরকেও হযরত মুহাম্মদ (সা) বললেন : উটনীকে যেতে দাও ! কেননা, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সে ইতিমধ্যেই সুনির্দিষ্ট নির্দেশ পেয়ে গেছে। তারপর উটনী বনূ মালিক ইব্ন নাজ্জার গোত্রের মহল্লায় গিয়ে একটি অনাবাদী জমির উপর বসে পড়লো। একটু পরে উঠেই আবার কিছু দূর পর্যন্ত অগ্রসর হলো। তারপর আবার ফিরে এসে পূর্ববর্তী স্থানে এসে বসে পড়লো। এবার উটনীটি বসে গা ঝাড়া দিল, ঘাড় নীচু করে ফেললো এবং লেজ দোলাতে লাগলো।

সেই অনাবাদী জমির পাশেই ছিল হযরত আবূ আইয়ূব খালিদ ইব্ন যায়দ আনসারী (রা)-এর বাড়ী। তিনি অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে হযরত নবী করীম (সা)-এর সামান-পত্র বহন করে নিজের ঘরে নিয়ে উঠালেন। হযরত মুহাম্মদ (সা) সেখানেই অবস্থান করলেন।

ঐ পতিত জমিটি ছিলো সাহ্ল ও সুহায়ল নামক দুটি ইয়াতীম বালকের। সেখানে কয়েকটি খেজুর গাছ দাঁড়িয়েছিল। মূর্তিপূজারীদের কয়েকটি কবরও ছিল সেখানে। পশুপাল এসে এখানে বসতো। হযরত মুহাম্মদ (সা) জিজ্ঞেস করলেন : এ জমিটি কার ? মুআয ইব্ন আফরা আরয করলেন : জমিটা আমার দু'টি ইয়াতীম আত্মীয়ের ছেলের। এরা আমারই ঘরে প্রতিপালিত হচ্ছে। আমি তাদেরকে রাযী করে ফেলবো-। আপনি আপনার খুশিমত এখানে মসজিদ বানাতে পারেন। হযরত মুহাম্মদ (সা) বললেন : আমি তা মূল্য দিয়ে কিনতে চাই। বিনা মূল্যে তা' আমি কোন মতেই গ্রহণ করবো না। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তখনই তার মূল্য পরিশোধ করলেন। হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নির্দেশক্রমে খেজুর গাছগুলো কেটে ফেলা হলো। মূর্তিপূজারীদের কবরগুলোকে ভূমির সাথে সমান করে দেয়া হলো এবং মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ (সা) স্বয়ং মসজিদ নির্মাণের কাজে অংশ গ্রহণ করতেন। মুহাজিরীন ও আনসার স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে এ কাজে লেগে থাকতেন। মসজিদের দেয়ালের গাঁথুনী পাথর ও কাঁদামাটির দ্বারা দেয়া হলো। খেজুর গাছের কাণ্ড ও পাতা দিয়ে তার ছাদের কড়িকাঠ ও চাল ছাওয়ার কাজ সম্পন্ন করা হলো। মসজিদ এবং তার পাশে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর বাসস্থান নির্মিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি হযরত আবূ আইয়ূব

আনসারী (রা)-এর ঘরে তাঁর মেহমানরূপে অবস্থান করেন। ইনি সেই ইতিহাস বিখ্যাত আবূ আইয়ুব আনসারী (রা) যাঁর মাযার কনস্টান্টিনোপলে রয়েছে। তিনি ৪৮ হিজরীতে হযরত আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর আমলে কনস্টান্টিনোপল অবরোধকালে ইন্তিকাল করেন।

হযরত মুহাম্মদ (সা) এগারো মাস কয়েকদিন হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা)-এর ঘরে অবস্থান করেন। হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আমলে নির্মিত এ মসজিদটি হযরত উমর (রা)-এর আমল পর্যন্ত ঐরূপই ছিলো। হযরত উমর (রা) তাঁর খিলাফত আমলে মসজিদটি আরো প্রশস্ত করেন। হযরত উছমান (রা) তাঁর খিলাফত আমলে মসজিদের দেয়ালগুলো পাকা করান। তারপর ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল মালিকের আমলে তা আরো প্রশস্ত করা হয় এবং নবী সহধর্মিণিগণের হুজরাসমূহও এর অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়। আব্বাসী খলীফা মামুনুর রশীদ মসজিদের শোভা বর্ধন করেন। হযরত আবূ আইয়ূব আনসারীর বাড়ীতে অবস্থানকালেই হযরত মুহাম্মদ (সা) যায়দ ইব্ন ছাবিত ও আবূ রাফি'ঈ (রা)-কে মক্কা পাঠিয়ে হযরত ফাতিমা (রা) হযরত উম্মে কুলসূম (রা), হযরত সাওদা বিন্ত যাম্‌আ (রা), হযরত উসামা ইব্ন যায়দ (রা) এবং তার মা হযরত উম্মে আয়মন (রা)-কে মদীনায় আনিয়ে নেন এবং তাঁদের সকলের আসার পর হুযূর (সা) তাঁর নব নির্মিত হুজরায় গিয়ে উঠেন।

হিজরী সন

এ যাবত আমরা সন তারিখ উল্লেখ করতে নববী সন তারিখ ব্যবহার করে এসেছি। এর অর্থ ছিলো উক্ত ঘটনার সময়টি হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির এত বছর পরের ঘটনা। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, চান্দ্রমাসের প্রচলিত ক্রম ও নাম প্রাচীনকাল থেকে আরবে যেভাবে চলে আসছিল সেভাবেই আছে। তাই নববী সনের প্রথম বর্ষটি কয়েক মাস পরেই শেষ হয়ে যায়। এ জন্যেই হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর মদীনা প্রবেশকে ১৪তম নববী বর্ষের রবিউল আউয়াল মাসের ঘটনা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আসলে কিন্তু তখন নবুওয়াতের বা রিসালাত প্রাপ্তির মাত্র সাড়ে বার বছর কাল অতিক্রান্ত হয়েছিল। আর এভাবেই হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর মদীনা গমন থেকে হিজরী সন গণনা আরম্ভ করা হয়। যেহেতু হযরত মুহাম্মদ (সা) বারই রবিউল আউয়াল তারিখে মদীনায় আগমন করেছিলেন, তাই প্রথম হিজরী বর্ষটি সাড়ে নয় মাস পরেই সমাপ্ত হয়ে যায়। ১লা মুহাররম থেকে হিজরী দ্বিতীয় বর্ষের সূচনা হয়। সুতরাং হযরত মুহাম্মদ (সা) দ্বিতীয় হিজরীর সফর মাস পর্যন্ত হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা)-এর বাড়ীতে অবস্থান করেছিলেন বলে বুঝে নিতে হবে।

হিজরী প্রথম বর্ষ

হিজরী প্রথম বর্ষের ঘটনাবলীর মধ্যে মসজিদে নববী নির্মাণ, নবী করীম (সা)-এর বাসস্থান নির্মাণ, মক্কার অবশিষ্ট মুসলমানদেরকে মদীনায় নিয়ে আসার কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হযরত আবূ উমামা আসআদ ইব্ন যুরারা (রা)-এর মৃত্যুর ঘটনাটিও উল্লেখের দাবী রাখে। আবূ উমামার কোন রোগ-শোক ছিলো না। অকস্মাৎ রোগাক্রান্ত হয়ে তিনি ইন্তিকাল করেন। এ খবরটি পাওয়া মাত্র হযরত মুহাম্মদ (সা) বলেছিলেন, বিধর্মীদের এ কথা বলার সুযোগ এসে গেলো যে, এ কেমনতর রাসূল যে, তার বন্ধুদের একজন আকস্মিকভাবে মারা গেলো। তাঁর ইন্তিকালের পর বনূ নাজ্জার-এর লোকজন এসে হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে

বললো : "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আবূ উমামা আমাদের সরদার ছিলেন। তাঁর ইন্তিকালে আমরা সরদার শূন্য হয়ে গেলাম। আপনি আমাদের মধ্য থেকে কাউকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে দিন।"

জবাবে হযরত মুহাম্মদ (সা) বললেন : বনূ নাজ্জারের তোমরা তো আমার মামু। এজন্যে আমি নিজেও তোমাদেরই একজন। আমি নিজেই তোমাদের নকীব বা সরদাররূপে রইলাম। এ কথা শুনে বনূ নাজ্জারের লোকদের খুশির সীমা-পরিসীমা রইলো না। তারা আনন্দে বাগ বাগ হয়ে গেলো। তাদের মধ্য থেকে কাউকে নেতা নিযুক্ত করলে নেতৃত্ব প্রয়াসী অন্যরা হয়তো তাকে সহজে মেনে নিতে পারতো না। ফলে সাময়িকভাবে হলেও গোত্রটির মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হতো। হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর এ বিচক্ষণ সিদ্ধান্তে সে আশংকা দূর হয়ে গেল। এভাবে গোত্রটির সাহস ও ঐক্য পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধিই পেলো।

হযরত নবী করীম (সা) মদীনায় এসে সর্বপ্রথম যে ব্যাপারটির প্রতি মনোযোগী হলেন তা হলো শহরের নিরাপত্তা বিধান এবং নাগরিকদের পারস্পরিক সম্প্রীতি-সৌহার্দ বৃদ্ধি। তিনি মদীনায় পৌঁছেই উপলব্ধি করেন যে, মক্কা থেকে মুহাজিরগণ যেন মদীনাবাসীদের কষ্টের কারণ ও সমস্যা হয়ে না দাঁড়ান। সাথে সাথে দীনের খাতিরে সীমাহীন কষ্ট অকাতরে গ্রহণকারী এবং নিজেদের প্রিয় ঘরবাড়ি, আত্মীয়-পরিজন, অর্থ-সম্পদ, জমি-জমার মায়াত্যাগী মুহাজিরগণও যাতে কোনরূপ মর্মযাতনার শিকার না হন, সেদিকেও তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিলো। তাই তিনি সমস্ত আনসার ও মুহাজিরকে একটি সমাবেশে একত্রিত করে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে তাঁদেরকে উপদেশ দিলেন এবং মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন করে মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে সুসম্পর্ক ও সম্প্রীতি স্থাপন করেন। প্রায় সকল মুহাজিরই কোন-না-কোন আনসারের ভাইয়ে পরিণত হলেন। হযরত আবূ বকর (রা)-এর দীনী ভাই হলেন খারিজা ইব্‌ন যুবায়র আনসারী (রা)। হযরত আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)-এর ভ্রাতৃত্ব স্থাপিত হলো হযরত সা'দ ইব্‌ন মুআয আনসারী (রা)-এর সাথে। হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা)-এর ভাই হলেন সা'দ ইব্‌ন রবী' আনসারী। হযরত যুবায়র ইব্‌ন আওআম (রা)-এর ভ্রাতৃত্ব হলো সালামা ইব্‌ন সালামা (রা)-এর সাথে। হযরত উছমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা) ছাবিত ইব্‌ন মুনযির আনসারী (রা)-এর ভাই হলেন। অনুরূপভাবে হযরত তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ (রা) ও হযরত কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা), হযরত মুসআব ইব্‌ন উমায়র (রা) ও হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা), আম্মার ইবৃন ইয়াসির (রা) ও হযরত হুযায়ফা ইব্‌ন ইয়ামান (রা) পরস্পরে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। মোটকথা এক এক জন মুহাজির এক একজন আনসারীর সাথে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। মদীনার আনসারগণ এ ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কের যে মর্যাদা প্রদর্শন করেন পৃথিবীর ইতিহাসে তার কোন নজীর নেই। মুহাজিরগণকে আনসারগণ তাঁদের সত্যিকারের ভাই বলেই গ্রহণ করেন এবং নিঃসংকোচে নিজেদের সমস্ত ধন-সম্পদ তাঁদের হাতে তুলে দেন। কোন কোন আনসার ভাই তো তাঁর মুহাজির ভাইয়ের মনতুষ্টির জন্য নিজের দু'টি স্ত্রীর একজনকে তালাক দিয়ে মুহাজির ভাইয়ের হাতে তুলে দিতে অগ্রসর হন। মুহাজিরগণও এমনি সতর্ক ছিলেন যে, তাঁরা তাঁদের ব্যয়ভার আনসার ভাইদের উপর চাপানো থেকে বিরত থাকেন। তাঁরা অত্যন্ত পরিশ্রম করতেন। কেউ কেউ ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করে দেন এবং এভাবে তাঁরা নিজেদের জীবিকা কায়িক শ্রম দ্বারা নির্বাহ করতে শুরু করেন। এভাবে তাঁরা তাদের আনসার ভাইদের শক্তি বৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়ালেন।

প্রথম শাসনতান্ত্রিক সনদ

হিজরী প্রথম বর্ষের একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো এই যে, হযরত মুহাম্মদ (সা) মদীনাবাসী ইয়াহূদী ও মূর্তিপূজারী নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মদীনাবাসীদেরকে নিয়ে একটি চুক্তিনামা প্রণয়ন করেন। সকল পক্ষই সন্তুষ্টচিত্তে এ চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করেন। এ চুক্তিপত্রে অনেকগুলো শর্তের মধ্যে ছিলো :

(ক) যখন মদীনায় কোন বহিঃশত্রুর আক্রমণ হবে, তখন সকলে মিলে তা প্রতিরোধ করবে।

(খ) মদীনার ইয়াহূদীরা মক্কার কুরায়শ কিংবা তাদের সাথে মিত্রচুক্তিতে আবদ্ধ মুসলমানদের কোন শত্রুকে আশ্রয় দিবে না।

(গ) মদীনাবাসীরা কেউ কারো ধর্ম বা জানমালে হস্তক্ষেপ করবে না।

(ঘ) মদীনাবাসীদের কোন দুই পক্ষের মধ্যে যদি কলহ উপস্থিত হয় এবং তারা নিজেরা এর সমাধান করতে সমর্থ না হয়, তা হলে হযরত মুহাম্মদ (সা)-ই তার ফায়সালা করবেন। এতে কোন পক্ষের আপত্তি থাকবে না।

(ঙ) যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি বা লাভের মধ্যে সমস্ত মদীনাবাসীরা সমানভাবে অংশীদার থাকবেন।

(চ) যে সমস্ত গোত্রের সাথে মদীনার ইয়াহূদীদের চুক্তি বা বন্ধুত্বের সম্পর্ক রয়েছে, ঐ গোত্রসমূহ মদীনার মুসলমানদেরও মিত্র বলে গণ্য হবেন এবং বন্ধুত্বমূলক আচরণ তাদের প্রাপ্য হবে। অনুরূপভাবে যে সমস্ত গোত্রের সাথে মুসলমানদের মিত্রতা রয়েছে, মদীনায় ইয়াহূদীরা তাদেরকে মিত্ররূপে গণ্য করবে এবং তারা তাদের সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ করবে।

(ছ) মদীনার সীমানার মধ্যে খুনাখুনি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত হবে।

(জ) অত্যাচারিতের সাহায্য করা সকলের সাধারণ কর্তব্য বলে গণ্য হবে, ইত্যাদি।

এ চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর হযরত মুহাম্মদ (সা) মদীনার আশেপাশের গোত্রসমূহকেও এ চুক্তিতে শামিল করতে প্রয়াসী হন- যাতে করে হত্যা, হানাহানি ও অশান্তির মূলোৎপাটন হয়ে যায়। এ উদ্দেশ্যে তিনি মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী 'উসফান' নামক স্থান সফর করেন এবং বনী হামযা ইব্‌ন বকর ইব্‌ন আবদে মানাফ গোত্রকে এ চুক্তির মধ্যে শামিল করে তাদের সরদার আমর ইব্‌ন মাখশীর স্বাক্ষর আদায় করেন। বাওয়াত পার্বত্য অঞ্চলের বাসিন্দাদেরকেও তিনি এ চুক্তিতে শামিল করেন। ইয়াম্বুঈর দিকে অবস্থিত যিল-আশারা নামক স্থানেও তিনি গমন করেন এবং বনূ মুদলিজ গোত্রকেও এতে স্বাক্ষর করান। হযরত মুহাম্মদ (সা) মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছেই শান্তি-শৃংখলা বিধান ও জনসেবামূলক কার্য তৎপরতার দ্বারা এমন শান্তিপূর্ণ পরিবেশ প্রতিষ্ঠার দিকে মনোনিবেশ করেন যাতে মানুষ দীন-ইসলামকে বুঝে শুনে তা গ্রহণ করতে পারে। হযরত নবী (সা)-এর এ প্রচেষ্টা যখন অব্যাহত গতিতে চলছিল, তখন মদীনার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে বসবাসকারী সকল গোত্র পুরোপুরি এতে শামিল হওয়ার পূর্বেই মদীনার ভিতরে ভিতরে এবং মদীনার বাইরে থেকে প্রকাশ্যেই শত্রুরা হামলা চালাতে শুরু করলো।

মুনাফিকীর উদ্ভব

মদীনায় আবদুল্লাহ ইব্ন উবায়্য ইব্ন সলূল নামক একজন অত্যন্ত বুদ্ধিমান, অভিজ্ঞ ও ধুরন্ধর লোক বাস করতো। আওস ও খাযরাজ গোত্রে তার অপ্রতিহত প্রভাব ছিল। সকলেই তাকে নেতা বলে গণ্য করতো। আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয় এর কিছু দিন আগেও বুআছের যুদ্ধে একে অপরের মুকাবিলা করছিল। এ যুদ্ধে উভয় গোত্রেরই বাছা বাছা সরদাররা নিহত হন এবং গোত্রদ্বয় অত্যন্ত হীনবল হয়ে পড়ে। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়্য এ পরিস্থিতির সুযোগ নেয় এবং উক্ত দু'টি গোত্রে নিজের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির কোন সুযোগই হাতছাড়া হতে দেয়নি। মদীনাবাসীরা তাকে তাদের সর্বসম্মত নেতারূপে ঘোষণার উপক্রম করছিল। এমন কি তার অভিষেকের উদ্দেশ্যে তারা একটা মুকুটও তৈরী করে ফেলেছিল। এমনি সময় মদীনায় ইসলাম ও তাঁর নবীর আবির্ভাব ঘটে।

হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর মদীনায় আগমনের সাথে সাথে মুসলমানরাই মদীনার সবচাইতে বড় শক্তি বলে বিবেচিত হতে লাগলো। অবশেষে উপরোক্ত চুক্তিপত্রে সকলে সই করে দিয়ে তাদের সে শক্তি ও আধিপত্যকে সকলেই আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিয়ে দিল। এর অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়্যর বাড়াভাতে ছাই পড়লো। তার বাদশাহী ও সরদারীর স্বপ্ন ধুলোয় মিশে গেল। কিন্তু লোকটি যেহেতু অত্যন্ত ধুরন্ধর ছিল, তাই হযরত নবী (সা)-কে তার পরম শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করলেও সে মনোভাবের প্রকাশকে নিরর্থক মনে করে সে তা মনে মনেই চেপে রইলো। আওস ও খাযরাজের যেসব লোক তখনো মূর্তিপূজারী ছিলো তাদের উপর তার আধিপত্য তখনো পূর্ববৎ অটুট ছিল। মক্কার কুরায়শরা যখন জানতে পারলো হযরত মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর অনুচরগণ মদীনায় গিয়ে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করছেন এবং দিন দিন ইসলামের প্রসার ঘটছে, তখন সর্বপ্রথম তারা যে দুষ্টামিটি করলো তা হলো আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়্য এবং মদীনার মুশরিকদেরকে তারা এ মর্মে একটি সতর্কবাণী পাঠালো যে, আমাদের লোকদেরকে তোমরা আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাদের ওখানে থাকতে দিচ্ছ। তোমাদের এখন উচিত তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা এবং তাদেরকে মদীনা থেকে বের করে দেয়া। যদি তোমরা তা না কর তবে আমরা সুসজ্জিত হয়ে মদীনা আক্রমণ করবো। তোমাদের যুবকদেরকে হত্যা করা হবে এবং তোমাদের রমণীদেরকে আমরা হস্তগত করবো।

এ খবর পাওয়া মাত্র আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়্য মদীনার মুশরিকদেরকে একত্রিত করলো এবং তাদেরকে মক্কাবাসীদের এ বার্তাটি সম্পর্কে অবহিত করে সকলকে যুদ্ধের জন্য প্ররোচিত করলো। ঘটনাচক্রে হযরত মুহাম্মদ (সা) তার এ ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত হয়ে গেলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই সমাবেশে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি সেই সমাবেশকে লক্ষ্য করে বললেন : "মক্কার কুরায়শরা তোমাদেরকে প্রতারিত করতে চাচ্ছে। যদি তোমরা তাদের প্রতারণার জালে ধরা দাও এবং তাদের হুমকিকে আমল দাও, তাহলে তোমরা দারূণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তোমাদের জন্যে সমীচীন হবে এই যে, তোমরা তাদেরকে সাফ জবাব দিয়ে দেবে এবং আমাদের সাথে কৃত তোমাদের চুক্তির উপর অটল থাকবে। যদি একান্তই কুরায়শরা মদীনা আক্রমণ করেও তবে তাদেরকে প্রতিরোধ করা এবং তাদের সাথে লড়াই করা আমাদের জন্যে খুব সহজই হবে। কেননা, আমরা সংঘবদ্ধভাবে তাদের মুকাবিলা করবো। পক্ষান্তরে যদি তোমরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তাহলে নিজ হাতে তোমরা নিজেদের পুত্র, ভাই ও নিকটাত্মীয়দেরকে

হত্যা করবে এবং এভাবে নিজেরাই নিজেদেরকে ধ্বংস করবে।" হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর কথাগুলো উপস্থিত সকলেই সমর্থন করলো এবং তৎক্ষণাৎ সভা বঙ্গ হয়ে গেলো। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়্য তা নীরবে প্রত্যক্ষ করলো।

এ বছরই মুসলমানদেরকে মসজিদে আহবান করার জন্যে আযানের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলো। এ বছরই ইয়াহূদীদের একজন প্রাজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা) ইসলাম গ্রহণ করলেন। ঐ বছরই হযরত সালমান ফারসী (রা) যিনি প্রথমে মজুসী বা অগ্নি উপাসক ছিলেন তারপর খ্রিস্টান হন এবং ইয়াহূদী-নাসারাদের কিতাবাদি অধ্যয়ন করে আখিরী যামানার নবীর প্রতীক্ষায় ছিলেন— তিনি হযরত নবী (সা)-এর খিদমতে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হন। এ বছরই যাকাতও ফরয হয়।

হিজরী দ্বিতীয় বর্ষ

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মক্কা থেকে সহি-সালামতে তাশরীফ নিয়ে চলে যাওয়াটাকেই কাফির মুশরিকরা মস্ত পরাজয় বলে মনে করছিলো। এবার থেকে তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা মুসলমানদের উপর থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের চিন্তায় নিয়োজিত হলো। হযরত মুহাম্মদ (সা) ও মুসলমানদেরকে ধ্বংস করাটাই ছিলো তাদের সর্বাগ্রগণ্য ও সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ কাজের তুলনায় অন্যান্য কাজ ছিলো তাদের কাছে গুরুত্বহীন। এজন্যে তারা তাদের নিজেদের মধ্যকার খুঁটিনাটি মতপার্থক্য ভুলে গিয়ে গোটা জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের সমস্ত শক্তি ও যোগ্যতা এ কাজে নিয়োগের জন্য প্রস্তুত ছিলো। মক্কা ও মদীনার দূরত্ব ছিলো প্রায় তিন শত মাইলের। মদীনার উপর আক্রমণ চালাতে হলে তাদের বিশেষ প্রস্তুতি গ্রহণের প্রয়োজন ছিলো। মদীনায় যেতে যেসব গোত্র পথে পড়ে সেসব গোত্র এবং আরবের অন্যান্য সম্প্রদায়কে নিজেদের পক্ষে টানা বা কমপক্ষে তাদের সহানুভূতি লাভও জরুরী বলে বিবেচিত হচ্ছিলো। একজন বিচক্ষণ নেতা এবং দূরদর্শী সিপাহ্সালাররূপে হযরত মুহাম্মদ (সা)-ও এ অবশ্যম্ভাবী সংকটের কথা উপলব্ধি করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের অনুমতিও তিনি ইতিমধ্যেই লাভ করে ফেলেছিলেন। দীন ইসলামের প্রচার-প্রসার এবং ইসলামে প্রবেশকারীদের পথের অহেতুক অন্তরায় দূর করাও ছিল একটি জরুরী কাজ। এদিকে মদীনায় মুসলমান পুরুষদের সংখ্যা তিন চার শ'র বেশী ছিলো না। যদিও সংখ্যা ও যুদ্ধ সরঞ্জামের দিক থেকে তারা দুর্বল ছিলেন, কিন্তু কাফিরদের দুষ্টামি ও সীমাহীন ঔদ্ধত্য দেখে তাদের আরবী জিদ এবং বীরত্ব মাথাচাড়া দিয়ে উঠতো। তাঁরা বারবার কাফিরদের মুকাবিলা করার এবং তীর তলোয়ার দিয়ে তাদের সমুচিত জবাব দানের অনুমতি হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর দরবারে পেশ করছিলেন। এখন যেখানে ইসলামের সভ্যতা এবং ঈমানের শক্তি দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গেছে, মুসলমানরা হৃদয়বিদারক অত্যাচার-অবিচারকে হাসিমুখে বরণ করে নিয়ে দুনিয়ার সম্মুখে ইসলামের প্রতি আসক্তি যে সর্বপ্রকার ভীতি ও প্রলোভনের ঊর্ধ্বে তা সুপ্রমাণিত করে ফেলেছেন। আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে দুরাচারদেরকে শাস্তি দানের এবং আত্মরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণের অনুমতি লাভের পর অনুমতিও এসে গেছে, তরপরও ঘটনাবলীর ধারাবাহিকতার প্রতি গভীর ভাবে মনোনিবেশ করলে দেখা যাবে যে, হযরত নবী করীম (সা) সব সময়েই যুদ্ধের উপর শান্তিকে এবং প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধের উপর ক্ষমাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। মক্কার জনৈক কাফির নেতা কুরয ইব্ন জাবির একটি দলকে সাথে নিয়ে মক্কা থেকে এসে মদীনার

সন্নিহিত চারণ ভূমিতে হানা দিয়ে মুসলমানদের বিপুল সংখ্যক উট নিয়ে পালিয়ে যায়। মুসলমানরা এ সংবাদ জানতে পেয়ে সাফওয়ান নামক স্থান পর্যন্ত তার পশ্চাদ্ধাবন করেন। কিন্তু শিকার তখন হাতছাড়া হয়ে গেছে। তারা আর শত্রুর দেখা পেলেন না। অগত্যা তারা ফিরে আসেন। এটা ছিল মক্কাবাসীদের পক্ষ থেকে খোলা চ্যালেঞ্জ ও যুদ্ধ ঘোষণার শামিল। তারা মদীনাবাসীদেরকে বুঝিয়ে দিল যে, আড়াইশ' মাইল দূর থেকে এসে আমরা মদীনায় তোমাদের ঘরে হানা দিয়ে তোমাদের ধন-সম্পদ লুট করে নিতে পারি। আনুসঙ্গিক অন্যান্য প্রচেষ্টা থেকেও তারা হাত গুটিয়ে ছিল না। তারা একদিকে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায়্যর সাথে এবং অপর দিকে মদীনার ইয়াহূদীদের সাথে রীতিমত চিঠিপত্র আদান-প্রদানের মাধ্যমে সংযাগ রক্ষা করে চলছিলো এবং ভিতরে ভিতরে এদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্ররোচনা দিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে তুলেছিল।

এ বছরেরই শা'বান মাসে কিবলা পরিবর্তনের আদেশ নাযিল হয়। এর কয়েকদিন পরেই শা'বান মাস শেষ হওয়ার আগেই রমযানের সওম ফরয হয়। রমযানের শুরুতেই মদীনায় এ খবরটি পৌছলো যে, মক্কাবাসীদের একটা কাফেলা শামদেশ থেকে আসছে এবং মদীনার পাশ দিয়ে তা অতিক্রম করবে। হযরত মুহাম্মদ (সা) মক্কাবাসীদের মনে এক প্রকার ভীতি সৃষ্টি এবং কুরয ইব্‌ন জাবিরের হামলার জবাব স্বরূপ মুহাজির ও আনসারদের একটি জামাআতকে মক্কাবাসীদের এ কাফেলাকে বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলেন, যাতে করে তারা উপলব্ধি করতে পারে যে, মদীনাবাসীদের সাথে সম্পর্কের অবনতি তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যে অত্যন্ত ক্ষতিকর হবে, এমন কি এতে সিরিয়ার সাথে তাদের বাণিজ্যপথ বন্ধও হয়ে যেতে পারে। এ কাফেলাটি আদৌ যুদ্ধের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়নি–নিছক খবরদারী ও হুশিয়ারী প্রদানই এর উদ্দেশ্য ছিল বিধায় সামরিক গোপনীয়তাও তাঁদেরকে প্রেরণের সময় রক্ষিত হয় নি। ফলে, তাদের রওয়ানা হওয়ার সংবাদ সাথে সাথেই মক্কাবাসীদের কাছে পৌছে যায় এবং তারা সতর্ক হয়ে যায়। কাফেলার সর্দার আবূ সুফিয়ান অত্যন্ত সন্তর্পণে কাফেলাকে পাশ কাটিয়ে নিয়ে যেতে সমর্থ হয়। সে যামযাম ইব্‌ন আমর গিফারীকে পারিশ্রমিক দিয়ে রাস্তা থেকেই মক্কায় সংবাদ দিয়ে পাঠালো যে, মুসলমানদের পক্ষ থেকে হামলার আশংকা রয়েছে, সুতরাং নিজেদের বাণিজ্যসম্ভার রক্ষার্থে সাহায্যের জন্য দ্রুত অগ্রসর হও। সংবাদ পাওয়া মাত্র আবূ জাহেল সাতশ' উট ও তিনশ' ঘোড়াসহ এক হাজার দুর্ধর্ষ সৈন্যের একটি বাহিনীসহ অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে মক্কা থেকে বের হলো। এ বাহিনীর প্রতিটি সৈন্যই ছিল অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত এবং বর্ম পরিহিত। গায়ক-সংবাদ পাঠকরাও তাদের সাথে ছিল। আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব, উত্‌বা ইব্‌ন রবীআ, উমাইয়া ইব্‌ন খাল্‌ফ, নযর ইব্‌ন হারিছ, আবূ জাহেল ইব্‌ন হিশাম প্রমুখ তেরজন খাদ্য পরিবেশনকারী ছিল। আবূ সুফিয়ানের কাফেলা নিরাপদে মক্কায় উপনীত হলো। মুসলমানদের যে দলটি কেবল কাফেলাওয়ালাদেরকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে গিয়েছিল তাঁরা মদীনায় ফিরে চললেন।

বদর যুদ্ধ

আবূ সুফিয়ান আবূ জাহেলের কাছে সংবাদ পাঠালো যে, আমরা নিরাপদে মক্কায় পৌছে গিয়েছি। সুতরাং তোমরা ফিরে এসো। কিন্তু আবূ জাহেল তার দুর্ধর্ষ বাহিনীর জন্যে গর্বিত

ছিলো। এমনি ফিরে যাওয়াটা তার মনঃপূত হলো না। আসলে আবূ জাহেল কেবল কাফেলার হিফাযতের উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে সদলবলে বেরোয়নি, বরং কুরায়শদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে বতনে নাখলার দিকে হযরত নবী (সা)-এর প্রেরিত কয়েকজন মুসলমানের হাতে নিহত কুরায়শদের জনৈক মিত্র আমর ইব্ন হাযরামীর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের ছলে যুদ্ধের পূর্ণ প্রস্তুতি সম্পন্ন করে রেখেছিলো। যামযাম ইব্ন আমর কাফেলাওয়ালাদের পক্ষ থেকে সাহায্যের অনুরোধ পৌঁছানো মাত্র সে সদলবলে বেরিয়ে পড়ে এবং মারমার রবে মদীনার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। কুরায়শ বাহিনীর যাত্রার সংবাদ হযরত নবী (সা) যথাসময়েই পেয়ে যান। তিনি এও জানতে পারলেন যে আবূ জাহেল, উত্বা, শায়বা, ওয়ালীদ, খাকলা, উবায়দা, 'আসী, হুরছ, তুআয়মা, যামআ, আকীল, আবুল বুখতারী, মাসঊদ, বানিয়্যা, মুনাব্বা, নাওফিল, সাইব, রিফাআ প্রমুখ বড় বড় কুরায়শ সরদাররা এ বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এ সংবাদ পাওয়া মাত্র হযরত মুহাম্মদ (সা) একটি পরামর্শ সভা আহবান করে সাহাবায়ে কিরামকে বললেন যে, মক্কা তার শ্রেষ্ঠ সন্তানদেরকে তোমাদের দিকে রওয়ানা করে দিয়েছে। এদের সাথে মুকাবিলা করার ব্যাপারে তোমাদের অভিমত কি ? হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা), হযরত উমর (রা) ও হযরত মিকদাদ (রা) একে একে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত তেজোব্যঞ্জক ও বীরত্বপূর্ণ ভাষায় বললেন : আমরা ঐ বনী ইসরাঈলদের মতো নই যারা হযরত মূসা (আ)-কে বলে দিয়েছিল :

فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاَ اِنَّا هٰهُنَا قَاعِدُوْنَ

আপনি আর আপনার প্রভু দু'জনে গিয়ে ফিরাউনের সাথে যুদ্ধ করুন! আমরা এখানে বসে বসে তা উপভোগ করবো।

তারপর হযরত মুহাম্মদ (সা) আবার বললেন : কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যাপারে তোমাদের কী অভিমত ? দ্বিতীয় বার জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য ছিলো আনসারদের অভিমত সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া। কেননা, উপরিউক্ত তিনজনই ছিলেন মুহাজির। আনসারগণ হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর অভিলাষ উপলব্ধি করলেন। তাই তাঁদের পক্ষ থেকে হযরত সা'দ ইব্ন মুআয (রা) উঠে দাঁড়ালেন এবং আরয করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার এ প্রশ্নের উদ্দিষ্ট বোধ হয় আমরা আনসাররাই ? জবাবে হযরত মুহাম্মদ (সা) বললেন : হাঁ, তাই। হযরত সা'দ (রা) তখন বললেন :

আমরা আপনার প্রতি ঈমান এনেছি। আপনাকে আল্লাহ্র রাসূল বলে আমরা দৃঢ় বিশ্বাস করি। এটা কেমন করে সম্ভবপর হতে পারে যে, আল্লাহ্র রাসূল কাফিরদের মুকাবিলা করার জন্যে নির্গত হবেন আর আমরা ঘরে বসে থাকবো ? এই কাফিররা তো আমাদের মতো মানুষই! আপনি যদি নির্দেশ দেন যে, ঐ সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়, তা'হলে আমরা নিঃসংকোচে আপনার সে নির্দেশও পালন করবো এবং অকাতরে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়বো।

যখন হযরত মুহাম্মদ (সা) এ মর্মে আশ্বস্ত হলেন যে, সাহাবায়ে কিরাম যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রয়েছেন, তখন তিনি মদীনা থেকে রওয়ানা করতে মনস্থ করলেন। যুদ্ধে যাবার মতো উপযুক্ত লোকের সংখ্যা ছিলো মোট তিন শ' দশ, অথবা তিন শ' বার অথবা তিন শ' তের জন, শহর থেকে বেরিয়ে যখন তিনি তাঁর বাহিনীর পর্যালোচনা করলেন তখন লক্ষ্য

করলেন তিন শ' তেরজন লোক। এর মধ্যেও কেউ কেউ বয়সে এতোই কম ছিলো যে, যারা যুদ্ধ করার মতো উপযুক্ত হয়নি। তিনি তাদেরকে ফিরে যেতে নির্দেশ দিলেন, কিন্তু তাঁরা ফিরে যেতে রাযী হলেন না, অনেক কাকুতি-মিনতি করে যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি হাসিল করলেন।

এ যুদ্ধে মুসলমানদের সরঞ্জাম ছিল নিম্নরূপ

দুটো মাত্র ঘোড়া—যেগুলোতে হযরত যুবায়র (রা) ও হযরত মিকদাদ (রা) সওয়ার ছিলেন। উট ছিলো সত্তরটি—এর প্রত্যেকটিতে তিন তিন জন চার চার জন করে আরোহী ছিলেন। হযরত মুহাম্মদ (সা) যে উটটিতে সওয়ার ছিলেন, তার পিঠেও আরো দু'তিনজন আরোহী ছিলেন। তারপরও অনেকে সওয়ারী হীন ছিলেন। এ ইসলামী বাহিনীটি যখন বদর প্রান্তরে উপস্থিত হলো, তখন দেখা গেলো যে, কাফিররা ইতিপূর্বেই সেখানকার উঁচু ভূমিতে এসে তাঁবু গেড়ে ফেলেছে। অগত্যা মুসলমানদেরকে নীচু ও বালুময় অংশেই অবস্থান নিতে হলো। কিন্তু বদরের পানির ঝরনাগুলো মুসলমানদের অংশেই পড়লো। হযরত মুহাম্মদ (সা) তাঁর বাহিনীর লোকদেরকে বলে দিলেন, কাফিরদের কেউ পানি নিতে আসলে তাদেরকে বাধা দিও না। সাহাবায়ে কিরাম হুযূর (সা)-এর জন্যে একটি ছোট ঝুপড়ি তৈরী করে দিলেন। তিনি সেখানে ইবাদত ও দু'আ করতেন। সংখ্যায় সাহাবায়ে কিরাম তো কুরায়শদের এক-তৃতীয়াংশ ছিলেন, কিন্তু সাজ-সারঞ্জামের দিক থেকে তাঁরা তাদের এক–শতাংশও ছিলেন না। কাফিরদের সবাই ছিলো বর্ম পরিহিত এবং প্রত্যেকে বয়সে ছিলো যুবক। পক্ষান্তরে মুসলমানদের সাধারণ অবস্থা ছিলো তাঁরা ক্ষুধা কাতর, দুর্বল, অসুস্থ ও ক্ষীণকায়। সকলের কাছে মামুলী হাতিয়ারও পুরোপুরি ছিলো না। কারো কাছে হযতো তলোয়ার আছে, কিন্তু বল্লম বা ধনুক নেই, কারো কাছে হয়তো বল্লম আছে, কিন্তু তলোয়ার নেই। মুসলমানগণ সেনা ছাউনী স্থাপন করলেন। ওদিকে কুরায়শরা উমায়র ইব্‌ন ওয়াহাব জামূহীকে গোয়েন্দাগিরির জন্য পাঠালো। মুসলমান বাহিনীর সংখ্যা জানার জন্য তারা তাকে পাঠিয়েছিলো। উমায়র ফিরে গিয়ে জানালো যে, মুসলমানদের সংখ্যা তিন শ' দশের বেশী নয় এবং এদের মধ্যে কোন দু'জন অশ্বারোহী আছে। কাফিরদের দর্প যে কী পরিমাণ ছিলো তা এর দ্বারাই অনুমেয় যে, উত্‌বা ইব্‌ন রবীআ মুসলমানদের এ সংখ্যাস্বল্পতার কথা শুনেই বলে উঠলো, এ অল্প কয়টি লোকের সাথে যুদ্ধ করে কাজ নেই, চল আমরা যুদ্ধ না করেই ফিরে যাই। কেননা, আমাদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে এত বেশী যে, এ হবে এক অসম যুদ্ধ। এতে বাহাদুরীর কিছুই নেই। কিন্তু আবূ জাহেল তাতে সম্মত হলো না। সে বললো : হোকগে, এদের মূলোৎপাটন করাই হবে আমাদের কাজ।

যুদ্ধ শুরু

অবশেষে পরদিন অর্থাৎ দ্বিতীয় হিজরীর ১৭ই রমযান রণক্ষেত্র জেগে উঠলো। হযরত মুহাম্মদ (সা) প্রথমে তাঁর ইবাদতের সেই ছোট্ট ঝুঁপড়ীতে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করতে লাগলেন :

اَللّٰهُمَّ اِنْ تُهْلِكْ هٰذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ اَهْلِ الْاِيْمَانِ فَلاَ تُعْبَدُ فِى الْاَرْضِ اَبَدًا

হে আল্লাহ, যদি ঈমানদারদের এই দলটিকে তুমি ধ্বংস করে দাও, তবে যমীনে তোমার ইবাদতকারী কেউ থাকবে না।

তারপর তিনি দু'রাকাআত নামায পড়লেন। তারপর কিছুক্ষণের জন্য তিনি তন্দ্রাগ্রস্ত হলেন। তারপরই মুচকি হাসতে হাসতে বেরিয়ে এসে বললেন :

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ .

কাফির বাহিনী পরাজিত হবে এবং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করবে।

হযরত মুহাম্মদ (সা) নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন যে, যুদ্ধের সূচনা তোমরা করবে না। মুসলমানদের মধ্যে আশিজন অথবা তার চাইতে আরো দু'তিনজন বেশী সংখ্যক মুহাজিরীন এবং অবশিষ্টরা আনসার ছিলেন। আনসারদের মধ্যে আওস গোত্রসমূহের একষট্টিজন ও ১৭০ জন খাযরাজ গোত্রের লোক ছিলেন। উভয় পক্ষের সৈন্যরা সারিবদ্ধ হলেন। হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর হাতে একটি তীর ছিল। তিনি সেই তীরের ইংগিতে সারিগুলোকে বিন্যস্ত করছিলেন। তারপর আরবের প্রথা অনুসারে কাফিরদের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম রবীআর পুত্রদ্বয় উত্বা ও শায়বা এবং ওয়ালীদ ইব্ন উত্বা যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলো এবং মুসলিম সৈন্যদের তিনজনকে দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য আহবান জানালো। এদের মুকাবিলা করার জন্যে আনসারদের মধ্য থেকে আফরার পুত্রদ্বয় আওফ ও মুআব্বিয এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা) বেরিয়ে এলেন। উত্বা জিজ্ঞেস করলো من انتم-তোমরা কারা হে? তাঁরা জবাব দিলেন : رهط من الانصار আমরা আনসার অর্থাৎ মদীনাবাসী মুসলমান। উতবা অত্যন্ত দর্পের সাথে শ্লেষাত্মক সুরে বলে উঠলো :

ما لنا بكم من حاجة

তোমাদের সাথে আমাদের লড়বার প্রয়োজন নেই।

তার পর চীৎকার করে বললো :

محمد اخرج الينا احفاءنا من قومنا

হে মুহাম্মদ! আমাদের স্বজাতীয় এবং সমকক্ষদেরকে আমাদের সাথে মুকাবিলার জন্যে প্রেরণ করো!

হযরত মুহাম্মদ (সা) উতবার মুকাবিলায় হযরত হামযা ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা)-কে, শায়বার মুকাবিলায় হযরত উবায়দা ইবনুল হারিছ (রা)-কে এবং উতবার পুত্র ওয়ালীদের মুকাবিলায় হযরত আলী ইবন আবূ তালিব (রা)-কে অবতীর্ণ হতে আদেশ দিলেন। উতবা এ তিন জনের নাম কি কি জিজ্ঞেস করলো। অথচ এঁদেরকে সে খুব ভাল করেই চিনতো। এঁদের নাম শুনে বললো : হাঁ, তোমাদের সাথে আমাদের লড়াই হতে পারে। দ্বন্দ্বযুদ্ধ শুরু হলো। হযরত হামযা (রা) এবং হযরত আলী (রা) প্রথম আঘাতেই উত্বা এবং ওয়ালীদ পিতাপুত্র উভয়কে পরাভূত ও কতল করলেন। শায়বার মুকাবিলায় হযরত উবায়দা (রা) আহত হলেন। যখম ছিল মারাত্মক, তাই সে আঘাত তিনি সহ্য করতে পারলেন না। মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। হযরত আলী (রা) তখন অগ্রসর হয়ে শায়বাকে হত্যা করলেন এবং উবায়দা (রা)-কে উঠিয়ে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর কাছে নিয়ে আসলেন। তারপর কাফিররা সারিবদ্ধ হলো। এদিকে মুসলমানরাও সক্রিয় হলেন। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ শুরু হলো। উভয় পক্ষ বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করলো। ফলাফল দাঁড়ালো এই যে, কাফির পক্ষ তাদের সত্তর জন

বীরের শবদেহ এবং নব্বই জনকে বন্দী অবস্থায় রেখে রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করলো। ব্যাপক যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর হুযূর (সা) একটি ছায়াযুক্ত স্থানে দাঁড়িয়ে যুদ্ধের গতিবিধি প্রত্যক্ষ করছিলেন এবং নিজ বাহিনীকে প্রয়োজনীয় নির্দেশাদি দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন যে, কুরায়শদের সাথে আগত বনী হাশিম-এর লোকজন যেহেতু স্বেচ্ছায় ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে নয়, কুরায়শদের চাপের মুখে এসেছেন তাই তাদের প্রতি যেন কঠোরতা প্রদর্শন না করা হয় এবং আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিবকে যেন হত্যা করা না হয়। অনুরূপভাবে আবদুল বুখতরী সম্পর্কেও তিনি বলে রেখেছিলেন যে, তার ব্যাপারেও যেনো তেমন কঠোরতা অবলম্বন না করা হয়। এ নির্দেশ শুনে আবূ হুযায়ফা বলে উঠলেন : এটা কেমন করে হতে পারে যে, আমি আমার সহোদরকে হত্যা করবো এবং আব্বাসকে ছেড়ে দেবো। আব্বাস যদি আমার মুকাবিলায় আসেন, তাহলে তো নির্ঘাত তাঁকে আমি হত্যা করবো, একটুও দ্বিধাবোধ করবো না। পরবর্তীকালে হুযায়ফা এজন্যে অত্যন্ত লজ্জিত হয়েছিলেন এবং এজন্যে দুঃখ প্রকাশও করেছিলেন। মাহ্‌যার ইব্‌ন যিয়াদের মুকাবিলা হয় আবুল বুখতরীর সাথে। মাহযার ইব্‌ন যিয়াদ বলেন যে, আমাদের প্রতি তোমার সাথে লড়তে নিষেধ আছে, তাই তুমি আমার সম্মুখ থেকে চলে যাও! আবুল বুখতরী তার এমন একজন সাথীকে বাঁচাতে প্রয়াস পায়–যাকে মাহযার ইব্‌ন যিয়াদ হত্যা করতে যাচ্ছিলেন। এ প্রয়াস চালাতে গিয়ে আবুল বুখতরী নিহত হয়। উমাইয়া ইব্‌ন খাল্‌ফ এবং তার পুত্র আলী ইব্‌ন উমাইয়া নিজেদের প্রাণ রক্ষার জন্যে অস্থির হয়ে ছুটাছুটি করছিলো। উমাইয়া ও আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফের মধ্যে জাহিলিয়াতের যুগে বন্ধুত্ব ছিলো। হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) তাকে এ অবস্থায় দেখে নিজের হিফাযতে নিয়ে নেন এবং উমাইয়ার হাত ধরে অগ্রসর হতে থাকেন। এমন সময় হযরত বিলাল (রা) তাকে দেখতে পেয়ে চীৎকার করে আনসার যুবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং সবাই মিলে পিতাপুত্র দু'জনকে হত্যা করেই তবে ছাড়েন। হযরত উমায়র ইব্‌ন হুমাম আনসারী (রা) নামক এক সাহাবী খেজুর খেতে খেতে হুযূর (সা)-এর কাছে এসে আরয করেন : যদি আমি কাফিরদের সাথে লড়তে লড়তে মারা যাই তা হলে কি সাথে সাথে জান্নাতে চলে যাবো ? প্রিয়নবী (সা) বললেন : হাঁ। তখন ঐ সাহাবী হাতের খেজুর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তলোয়ার হাতে দুশমনদের মধ্যে ঢুকে পড়েন এবং লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে যান।

লড়াই যখন খুব জোরসোরে চলছিল তখন হুযূর (সা) এক মুষ্টি ধূলো মাটি নিয়ে তাতে দম করে তা কাফিরদের দিকে নিক্ষেপ করেন। সাথে সাথে কাফির সৈন্যরা পালাতে শুরু করে। ঘটনাক্রমে এক আনসারী তরুণ হযরত মুআয ইব্‌ন আমর (রা)-এর সাথে আবূ জাহেলের মুকাবিলা হয়। আবূ জাহেলের দেহ লৌহ বর্মাদির দ্বারা পূর্ণ আচ্ছাদিত ছিলো। হযরত মুআয ইব্‌ন আমর (রা) এক ফাঁকে আবূ জাহেলের পা খোলা দেখে সেই বরাবর এমন জোরে কোপ দিলেন যে, পা দূরে গিয়ে ছিটকে পড়লো। আবূ জাহেলের পুত্র ইকরামা পিতার এ শোচনীয় অবস্থা লক্ষ্য করে মুআয ইব্‌ন আমর (রা)-এর উপর এমনি এক আঘাত হানলো যে, তাঁর বাম হাত স্কন্ধের নিকট থেকে কেটে গিয়ে ঝুলে পড়লো। হাতটি তখন কেবল চামড়ার উপরই লটকে ছিলো। হযরত মুআয (রা) সারা দিন এ অবস্থাতেই লড়াই করে যেতে লাগলেন। ঝুলন্ত হাতটি যখন একটা বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো তখন তিনি নিজেই হাতটি পায়ের নীচে রেখে টান দিয়ে বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন। তারপর আনসারের অপর এক তরুণ মুআব্বিয ইব্‌ন

আফরা আবূ জাহেলের নিকটবর্তী হয়ে এমনি এক আঘাত হানলেন যে, সে অর্ধমৃত হয়ে গেলো। কাফিররা রণক্ষেত্র ছেড়ে পালালো আর মুসলমানেরা বিজয় পতাকা উড্ডীন করলো। হযরত মুহাম্মদ (সা) আবূ জাহেলের শবদেহ যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে আছে কিনা তদন্ত করে দেখতে নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ পাওয়া মাত্র হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) যুদ্ধক্ষেত্রে শবদেহগুলো পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেলো। আবূ জাহেলকে অর্ধমৃত অবস্থায় পাওয়া গেলো। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) তার বুকের উপর চেপে বসে বললেন : আল্লাহর দুশমন, দেখ, আল্লাহ্ তোকে কিভাবে অপদস্থ করলেন! আবূ জাহেল জিজ্ঞেস করলো, যুদ্ধের ফলাফল কী হলো ? হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বললেন : মুসলমানদের জয় এবং কাফিরদের পরাজয় হয়েছে। একথা বলেই তিনি তার শির কাটতে উদ্যত হলেন। আবূ জাহেল বললো : আমার গলাটি কাঁধের একেবারে নিকটে এমনভাবে কাটবে যেনো অন্যান্য কাটা শিরের তুলনায় তা একটু দীর্ঘ বলে মনে হয় এবং স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এটা সরদারের শির। হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) তার শির কেটে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে এসে উপস্থিত হলেন এবং তাঁর কদম মুবারকের নিকট তা ফেলে দিলেন। হযরত মুহাম্মদ (সা) আবূ জাহেলের কর্তিত শির দেখে আল্লাহ্র শোকর আদায় করলেন। এ যুদ্ধে মোট চৌদ্দজন সাহাবী শহীদ হন। এঁদের মধ্যে ছয়জন ছিলেন মুহাজির এবং আটজন আনসার। যুদ্ধান্তে হযরত মুহাম্মদ (সা) শহীদদের লাশ দাফন করলেন। মুশরিকদের লাশ একটি বড় গহবরে বা কূপে ফেলে দিয়ে মাটি চাপা দেয়া হলো। কেবল উমাইয়া ইব্ন খালফের লাশ শতধাবিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে উঠিয়ে নিয়ে কূপে নিক্ষেপ করা সম্ভবপর হয়নি। তার লাশ যেখানে ছিলো, সেখানেই মাটি চাপা দেয়া হয়।

কাফিররা এমনি দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্যভাবে মাঠ পরিত্যাগ করেছিল যে, তাদের অর্ধমৃত নেতা আবূ জাহেলকে পর্যন্ত তারা রণক্ষেত্রেই আহত অবস্থায় ফেলে যায়। হারিছ ইব্ন যামআ, আবুল কায়স ইবনুল ফাকিহ, আলী ইব্ন উমাইয়া ও 'আস ইব্ন খাবআ ছিল বয়সে তরুণ। হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর মক্কায় অবস্থানের সময় এঁরা তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন অথবা সম্ভবত মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। নবী করীম (সা)-এর মদীনায় হিজরতের পর তাঁদের আত্মীয়-স্বজনরা তাঁদেরকে অত্যন্ত কঠোরভাবে শাসন করে এবং মুরতাদ হওয়ার প্ররোচনা দেয়। প্রাণ রক্ষার্থে বাহ্যিকভাবে তাঁরা নবী করীম (সা)-এর সাথে সম্পর্ক ত্যাগের কথা ঘোষণা করতে বাধ্য হন এবং কাফির বাহিনীর সাথে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে যুদ্ধক্ষেত্রেই নিহত হন। মক্কার যেসব বড় বড় সরদার এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল তাদের প্রায় সবাই নিহত হয়। পরাজিত এ কাফির বাহিনী মক্কায় প্রত্যাবর্তন করলে ঘরে ঘরে কান্নার রোল উঠে। হযরত নবী করীম (সা) যুদ্ধলব্ধ সমস্ত গনীমতের মাল একত্রিত করে বনূ নাজ্জার বংশীয় আবদুল্লাহ্ ইব্ন কা'বের হাতে অর্পণ করেন। হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা) এবং হযরত যায়দ ইব্ন হারিছা (রা)-কে মদীনার উঁচু ও নীচু এলাকায় যুদ্ধজয়ের সুসংবাদ দানের জন্যে প্রেরণ করলেন। হযরত উসামা ইব্ন যায়দ–যাঁকে হযরত নবী করীম (সা) মদীনায় তাঁর নায়েবরূপে রেখে এসেছিলেন, তিনি বলেন যে, যুদ্ধজয়ের এ সুসংবাদ ঠিক ঐ সময় আমাদের কাছে পৌঁছলো যখন আমরা নবীনন্দিনী ও হযরত উসমান (রা)-এর সহধর্মিণী হযরত রুকাইয়া (রা)-কে দাফন করছিলাম। মদীনায় ১৮ই রমযান তারিখে এ সুসংবাদটি পৌঁছে।

যুদ্ধশেষে বদরের যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে হযরত নবী করীম (সা) মদীনার দিকে রওয়ানা হলেন। সাফরা নামক স্থানে এসে তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুসারে সমস্ত গনীমতের মাল মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করলেন এবং যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে নযর ইব্‌ন হারিছের প্রাণদণ্ডাদেশ দান করলেন। সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে আরকুয যাবিয়া নামক স্থানে পৌছে উকবা ইব্‌ন আবূ মুআয়ত ইব্‌ন আমর ইব্‌ন লায়তের প্রাণ দণ্ডাদেশ দান করলেন। বদর যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে এরা দু'জন হযরত মুহাম্মদ (সা) ও ইসলামের সঙ্গে চরম শত্রুতা করতো এবং বিবাদ ও ষড়যন্ত্র করার ব্যাপারে আবূ জাহেলের সমকক্ষ ছিলো। নযর ইব্‌ন হারিছকে সাফরা নামক স্থানে হযরত আলী (রা) এবং উকবা ইব্‌ন আবূ মুআয়তকে আরকুয যাবিয়া নামক স্থানে হযরত আসিম ইব্‌ন ছাবিত আনসারী (রা) কতল করেন। তারপর হযরত মুহাম্মদ (সা) বন্দীদেরকে এবং তাদের প্রহরায় নিযুক্ত বাহিনীকে পিছনে রেখে দ্রুত মদীনার দিকে রওয়ানা হন। তার একদিন পরে বন্দীরাও মদীনায় পৌছে।

যুদ্ধবন্দীদের প্রতি সদ্ব্যবহারের তাকীদ

যুদ্ধবন্দীরা মদীনায় পৌছলে হযরত নবী করীম (সা) তাদেরকে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে তাদের সাথে সদ্ব্যবহারের তাকীদ দিলেন। বন্দীদের মধ্যে আবূ আযীয ইব্‌ন উমায়র যুদ্ধে কাফির বাহিনীর পতাকাবাহক ছিলো। এ দিকে সে হযরত মুসআব ইব্‌ন উমায়র (রা)-এর ভাইও ছিলো।

স্বয়ং আবূ আযীযের বর্ণনা : যখন মুসলমানরা আমাকে বন্দী করে বদর থেকে মদীনার দিকে নিয়ে চলেছিলো তখন আমি আনসারদের একটি দলের প্রহরাধীন ছিলাম। ঐ আনসার দলটি যখন খাবার খেতে বসতেন, তখন তাঁরা আমাকে রুটি খেতে দিয়ে নিজেরা খেজুর খেয়েই দিন কাটাতেন। আমি লজ্জায় তাদের কোন একজনের দিকে রুটি ঠেলে দিলে সে ব্যক্তি পুনরায় আমাকে তা ফিরিয়ে দিতো। মদীনা পৌছার পর আবূ আযীয আবূ বশীর আনসারীর ভাগে পড়লো। হযরত মুসআব ইব্‌ন উমায়র (রা) আবূ বশীর আনসারীর সাথে দেখা করে বললেন : একে খুব দেখে শুনে রাখবে এবং এর সাথে খুবই কঠোর ব্যবহার করবে। এর মা খুবই ধনাঢ্য মহিলা। আবূ আযীয যখন লক্ষ্য করলো যে, তার আপন ভাই তার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শনের জন্য তার রক্ষাবেক্ষণকারীকে তাকীদ দিচ্ছেন, তখন সে বলে উঠলো : ভাইজান, এই কি ভাইয়ের প্রতি আপনার শুভ কামনা ? হযরত মুসআব (রা) জবাব দিলেন : তুই আমার ভাই না। আমার ভাই হচ্ছে তোর রক্ষণাবেক্ষণকারী-ই। আবূ আযীযের মা চার হাজার দিরহামের মুক্তিপণ পাঠিয়ে ছেলেকে মুক্ত করেন। বদর যুদ্ধে মুশরিকদের পরাজয়ের সংবাদ মক্কায় পৌছলে যেভাবে কাফিররা বিষন্ন হলো, ঠিক তেমনি যেসব মুসলমান হিজরত করে আসতে পারেননি বরং নিজেদের মুসলমান হওয়ার কথা গোপন করে মক্কায় বসবাস করছিলেন তাঁরা এ সংবাদে অত্যন্ত উল্লসিত হলেন। আবূ লাহাব কোন কারণে এ যুদ্ধে শরীক হতে পারেনি। সে যখন মক্কার বড় বড় সরদারদের নিহত ও কুরায়শদের পরাজিত হওয়ার সংবাদ জানতে পারলো তখন এতই মর্মাহত হলো যে, এর এক সপ্তাহ পরে সে মারাই গেলো।

যুদ্ধবন্দী সংক্রান্ত নীতি

যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য হযরত নবী করীম (সা) মসজিদে নববীতে সাহাবায়ে কিরামের সঙ্গে পরামর্শে বসলেন। হযরত উমর ফারূক (রা) বললেন : আমার

অভিমত হচ্ছে, বন্দীদের মধ্যে আমাদের যার যে নিকটাত্মীয় রয়েছে সে তাকে নিজ হাতে হত্যা করবে যাতে করে মুশরিকরা উত্তমরূপে উপলব্ধি করতে পারে যে, আমাদের অন্তরে আমাদের নিকটাত্মীয়দের চাইতে আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি অনুরাগ অনেকগুণ বেশী রয়েছে এবং ইসলামের মুকাবিলায় আত্মীয়তা বন্ধন আমাদের কাছে অতি তুচ্ছ ব্যাপার। হযরত আবূ বকর (রা) বললেন : আমার অভিমত হচ্ছে ফিদয়া (মুক্তিপণ) গ্রহণ করে এদেরকে ছেড়ে দেয়া হোক। এতে মুসলমানরা যেমন কিছু অর্থ লাভ করে যুদ্ধাস্ত্র প্রভৃতি কিনে নিতে পারবে, অপরদিকে যুদ্ধবন্দীদের অনেকেই হয়তো পরবর্তীকালে ইসলাম গ্রহণের তাওফীক লাভ করবে। হযরত আবূ বকর (রা)-এর অভিমতকেই হযরত নবী করীম (সা)-এর মনঃপূত হলো। কোনো কোনো বন্দীকে বিনা মুক্তিপণেই মুক্তি দেয়া হলো। মাথা প্রতি চার হাজার দিরহাম থেকে নিম্নতম এক হাজার দিরহাম মুক্তিপণ পাঠিয়ে মক্কাবাসীরা তাদের বন্দীদেরকে ছাড়িয়ে নেয়। যে সমস্ত বন্দী লেখাপড়া জানতো আর মুক্তিপণ আদায়ের সামর্থ্য তাদের ছিল না, তাদেরকে বলা হলো দশটি করে মুসলিম শিশুকে লেখাপড়া শিক্ষা দিয়ে নিজেদেরকে মুক্ত করে নাও। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কন্যা যয়নাব (রা) তখনো মক্কায় তাঁর স্বামী আবুল 'আসের সাথে বসবাস করতেন। আবুল 'আসও বন্দীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত যয়নাব (রা) তাঁর গলার হার খুলে আবুল 'আসের মুক্তিপণরূপে প্রেরণ করেছিলেন। হযরত মুহাম্মদ (সা) সাহাবায়ে কিরামকে ডেকে বললেন : তোমরা যদি সঙ্গত মনে করো তা হলে যয়নাবের হারটি ফিরিয়ে দাও। কেননা এটা তার মা খাদীজাতুল কুবরা (রা)-এর স্মৃতিরূপে তাঁর কাছে রয়েছে। সবাই খুশীমনে সে প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং আবুল 'আসকে ছেড়ে দিলেন। আবুল 'আস মক্কায় গিয়েই হযরত যয়নাব (রা)-কে মদীনায় হযরত নবী করীম (সা)-এর কাছে পাঠিয়ে দেন। এ ঘটনার দীর্ঘ ছয় বছর পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

মক্কায় কাফিরদের প্রতিশোধস্পৃহা

মক্কায় এ পরাজয়ের পর যে প্রতিক্রিয়া হয় তা হয় অতি সংগোপনে। নিহতদের উত্তরাধিকারীরা উচ্চৈঃস্বরে কোন বিলাপ করেনি। কেননা এ সংবাদে মুসলমানরা উল্লসিত হতো। সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া তার নিহত পিতা উমাইয়া ও সহোদর আলীর রক্তের প্রতিশোধ নেয়ার উদ্দেশ্যে উমায়র ইব্‌ন ওয়াহবকে মদীনায় গিয়ে গোপনে হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে হত্যা করার জন্যে প্ররোচিত করে। উমায়র ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব বিষমাখা তলোয়ার নিয়ে মক্কা থেকে মদীনায় গিয়ে হাযির হলো। তাকে দেখে কেন যেন হযরত উমর (রা)-এর মনে সন্দেহ হলো। তিনি উমায়রের তলোয়ারের হাতল ধরে তাকে নিয়ে নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হলেন। হযরত নবী (সা) বললেন, উমর! তুমি উমায়রকে ছেড়ে দাও! তারপর তিনি উমায়রকে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন : বল তো, তুমি কেন এসেছিলে ? জবাবে উমায়র বললো : আমার ছেলে আপনাদের হাতে বন্দী, তাকে মুক্ত করার জন্যে এসেছি। দয়া করে তাকে আপনি মুক্ত করে দিন ! হযরত নবী করীম (সা) বললেন : সত্যি কথা বলছো না কেন, আমাকে হত্যা করার জন্য সাফওয়ান তোমাকে প্ররোচনা দিয়ে পাঠায়নি ? তিনি সাফওয়ান ও উমায়রের গোপন পরামর্শের খুঁটিনাটি বিবরণ দিয়ে দিলেন। উমায়র তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন : আমি এক্ষুনি মুসলমান হচ্ছি এবং স্বীকার করছি যে, আপনি নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র রাসূল। কেননা, এ ব্যাপারটি সাফওয়ান ও আমি ছাড়া তৃতীয় কোনো ব্যক্তির ঘুণাক্ষরেও কিছু জানা ছিলো না।

বদর যুদ্ধে আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদের দ্বারা মুসলমানদের সাহায্য করেন। ফেরেশতাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণের কথা স্বয়ং কুরায়শরা মক্কায় গিয়ে বর্ণনা করে। মদীনার কোন কোন মুশরিক যুদ্ধের দৃশ্য উপভোগ করার উদ্দেশ্য যুদ্ধক্ষেত্রের আশেপাশে পাহাড়ের উপর বসেছিল অথবা ঘটনাচক্রেই তারা সেসব পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে যুদ্ধের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করছিলো। তাদের বর্ণনা: আমরা ঠিক যুদ্ধের সময় আমাদের মাথার উপর দিয়ে একটি মেঘখণ্ড যুদ্ধের দিকে যেতে দেখলাম। সে মেঘখণ্ড যখন আমাদের অতি নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলো তখন আমরা তাতে ঘোড়ার হ্রেষা ধ্বনি শুনতে পাই। কেউ একজন তখন বলছিলো, দ্রুত অগ্রসর হও ! বর্ণনাকারী বলেন, এ আওয়াজ শুনে আমরা এতই ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়লাম যে, ভয়ে আমার চাচাতো ভাই ঘটনাস্থলেই মারা গেলো।

বদর যুদ্ধশেষে ২২শে রমযান হযরত মুহাম্মদ (সা) মদীনায় আসেন। এ রমযান মাসের শেষ দিকে সাদাকায়ে ফিত্র ওয়াজিব হয়। ঈদের নামাযদ্বয় এবং কুরবানীও এ বছরই ধার্য হয়। এ বছরই হযরত মুহাম্মদ (সা) তাঁর দ্বিতীয় কন্যা উম্মে কুলছুম (রা)-কে হযরত উসমান (রা)-এর সাথে শাদী দেন এবং তিনি 'যিন্নূরায়ন' বলে অভিহিত হন। এ বছরই বদর যুদ্ধের পরে হযরত মুহাম্মদ (সা) তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা হযরত ফাতিমা (রা)-এর শাদী হযরত আলী (রা)-এর সাথে সম্পাদন করেন।

মক্কার কাফিরদের মনে দ্রুত প্রতিহিংসার বহ্নি জ্বলে উঠলো। বদর যুদ্ধের ছ'মাস পর আবূ সুফিয়ান দুইশ' অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে যুদ্ধার্থে মক্কা থেকে বের হলো। এরা মদীনার নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছতেই হযরত নবী করীম (সা) সংবাদ পেয়ে গেলেন। তিনিও মুসলমানদেরকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। আবূ সুফিয়ান খেজুর বাগান জ্বালিয়ে দিয়ে পলায়ন করলো। সাথে সাথে শিকারের উদ্দেশ্যে সেখানে আগত দুই ব্যক্তিকে তারা হত্যাও করে যায়। ঐ নিহত দু' ব্যক্তির একজন হলেন হযরত সাঈদ ইব্ন আমর আনসারী (রা) এবং অপরজন তাঁর একজন চুক্তিবদ্ধ মিত্র। মুসলমানদের আগমন সংবাদ পেতেই কাফির বাহিনী পালিয়ে গেল। তারা সংঘর্ষে লিপ্ত হতে সাহস পায়নি। পলায়নপর কাফির বাহিনী দ্রুত পলায়নের উদ্দেশ্যে ছাতুর বস্তাসমূহ ফেলে দিয়ে যায়। মুসলমানরা কিদর নামক স্থান পর্যন্ত তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং স্থানে স্থানে তাঁরা ছাতুর বস্তা পান। হযরত নবী (সা) সদলবলে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। আরবী ভাষায় ছাতুকে সাবীক বলা হয়ে থাকে। তাই এ যুদ্ধ পত্রটি সাবীক অভিযান নামে খ্যাত হয়। সাবীক অভিযানটি দ্বিতীয় হিজরীর যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দিকে পরিচালিত হয়। যিলহাজ্জ মাসের শেষ পর্যন্ত হযরত নবী করীম (সা) মদীনায় অবস্থান করেন এবং আর কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা এ বছর ঘটেনি।

হিজরী তৃতীয় বর্ষ

আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়্য ইব্ন সলুলের কথা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, মদীনাবাসীরা তাকে তাদের বাদশাহ বানাতে উদ্যত ছিলো। হযরত নবী করীম (সা)-এর মদীনা আগমনে তার সে বাদশাহীর স্বপ্ন ভণ্ডুল হয়ে যায়। তাই মুসলমানদের প্রতি সে অন্তরে গভীর বিদ্বেষ পোষণ করতো। কিন্তু যেহেতু সে ছিল ধুরন্ধর ব্যক্তি, তাই সে তা তার অন্তরে গোপন রাখে। তারপর তলে তলে মক্কাবাসীদের সাথে ষড়যন্ত্র করে মদীনাবাসীদেরকে প্রকাশ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উসকিয়ে দিতে প্রয়াস পায়। কিন্তু তাও পণ্ড হয়ে যায়। মুসলমানদের বদর যুদ্ধ বিজয় প্রত্যক্ষ

করে সে ভীত হয় এবং বাহ্যত ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু অন্তরে যেহেতু মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করতো, তাই এ বাহ্যিক ইসলাম গ্রহণে তার কোনই উপকার হয়নি বরং তার অন্তরে লালিত এ বিদ্বেষ মুসলমানদের জন্যে পূর্বের চাইতে বেশী মারাত্মক প্রতিপন্ন হয়। তার নেতৃত্বাধীন ইয়াহূদীটি বলে উঠলো : অধঃপাতে যাও ! মক্কাবাসীরা হচ্ছে আরবদের বাদশাহ এবং অভিজাত শ্রেণী। হযরত মুহাম্মদ (সা) যদি তাদেরকেই পদানত করে ফেলে, তবে এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকাটাই অর্থহীন।

এ সংবাদটির যথার্থতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর কা'ব ইব্‌ন আশরাফ মদীনা ছেড়ে মক্কায় চলে গেল। মক্কায় গিয়ে বদর যুদ্ধে নিহতদের শোকগাথা লিখতে এবং লোকদেরকে শোনাতে লাগলো। বেশ কয়েকদিন পর্যন্ত সে তাদেরকে এসব শোকগাথা শোনাতে শোনাতে তাদের প্রতিশোধ কামনাকে তীব্রতর করার কাজে ব্যস্ত রইলো। তারপর মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে মুসলমানদের নিন্দাসূচক কবিতা লিখে বিষোদগার করতে লাগলো। ইয়াহূদীদের গোটা সম্প্রদায়ই ছিলো সুদখোর এবং বড় বড় মহাজন। আওস ও খাযরাজ গোত্রের লোকেরা তথা মদীনায় গোটা আনসার সম্প্রদায় ছিলো তাদের খাতক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে অনেকটা তাদের উপর নির্ভরশীল। নিজেদের আর্থিক সমৃদ্ধি এবং ধুরন্ধর বুদ্ধির জন্যে তাদের গর্বের অন্ত ছিলো না। তারা নিজেদেরকে অত্যন্ত অভিজাত শ্রেণী এবং আশেপাশের প্রতিবেশী গোত্রসমূহের অশিক্ষিত ও গবেট মনে করে তাদেরকে পাত্তাই দিতো না। বদর যুদ্ধের পর তারা মক্কার কুরায়শদের পূর্ণ সমর্থক ও সহযোগী শক্তিরূপে সক্রিয় হয়ে উঠলো। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায়্য ও ইয়াহূদীদের মধ্যে সখ্যতা প্রতিষ্ঠিত হলো এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যেসব মুশরিক এ পর্যন্ত শির্‌ক, মূর্তিপূজা এবং মুসলমানদের প্রতি শত্রুতায় অবিচল ছিল, তাদেরকেও সে বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণের পরামর্শ দেয় এবং এ শ্রেণীর লোকদের নেতৃত্বে সে আসীন থাকে। এরাই মুনাফিক বলে কুখ্যাতি অর্জন করে। এই মুনাফিকদের সাথে কিছু ইয়াহূদীও এসে যোগ দেয় এবং বাহ্যত তারাও ইসলাম গ্রহণ করে ফায়দা লুটতে থাকে।

ইয়াহূদীদের শত্রুতামূলক আচরণ

মুসলমানদের কর্তৃত্ব এবং ইসলামের ব্যাপক প্রচার-প্রসারকে ইয়াহূদীরাও সুনজরে দেখত না। তারা আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবায়্যর চাইতেও অধিকতর শত্রুতা করতে থাকে। মদীনার আশেপাশের এলাকাসমূহে ইয়াহূদীদের তিনটি গোত্র অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলো। তারা নিজেদেরকে পৃথক পৃথক দুর্গ বানিয়ে রেখেছিলো। গোত্র তিনটি ছিলো : (১) বনী কায়নুকা, (২) বনী নযীর ও (৩) বনী কুরায়যা। হযরত নবী (সা) মদীনা আগমনের অব্যবহিত পরে যে সনদ প্রণয়ন করেন এতে ইয়াহূদীদের এ গোত্রগুলোও শামিল ছিলো। কুরায়শরা যেভাবে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায়্যর সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়, তেমনি এ ইয়াহূদী গোত্রগুলোকেও সমর্থনে নেওয়ার চেষ্টায় লিপ্ত থাকে। ইয়াহূদীরা যেহেতু মুসলমানদের উন্নতি দু'চোখে দেখতে পারতো না, তাই তারা কুরায়শদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন এবং মুসলমানদের ধ্বংস সাধনের জন্যে অহরহ সচেষ্ট থাকে। এবার বদর যুদ্ধের পর তাদের সে শত্রুতা আরো বৃদ্ধি পেলো এবং বিদ্বেষের বহ্নিতে জ্বলে তারা কাবাব হয়ে যাচ্ছিলো। তাই বদর যুদ্ধ জয়ের সুসংবাদ নিয়ে হযরত যায়দ ইব্‌ন হারিছা (রা) যখন মদীনায় পৌঁছলেন, তখন কা'ব ইব্‌ন আশরাফ নামক মদীনার মুনাফিকরাও ইয়াহূদীদের নিয়ে বিরাট বিরাট ও মারাত্মক ষড়যন্ত্র পাকাতে লাগলো। মক্কায় কুরায়শদের

অভিযানসমূহকে সাফল্যমণ্ডিত করার দায়িত্ব এবার যেন তারাই নিজ হাতে গ্রহণ করলো। হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জনপ্রিয়তা ও প্রভাবকে মুছে ফেলার জন্যে সাধারণভাবে তারা নানারূপে কুবাক্য ও অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ শুরু করে দিল। এমন কি তারা তাঁর মজলিসে পর্যন্ত উপস্থিত হয়ে অপমানজনক কথাবার্তা বলতে ও শুনতে লাগলো। আস্‌সালামু আলায়কুম (তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক) এর ন্যায় কুশল বাক্যের স্থলে তারা আস-সামু আলায়কুম (তোমার মৃত্যু হোক), راعنا (আমাদের প্রতি একটু নেক নজর দিন বা আমাদের কথাটুকু শুনুন) رکن (নির্বোধ) প্রভৃতি মূর্খতাব্যঞ্জক শব্দ তারা ব্যবহার করতে শুরু করলো। মুনাফিক ও ইয়াহূদীরা মিলে এ পরিকল্পনাও তৈরি করে যে, প্রথমে বাহ্যত মুসলমান হয়ে যেতে হবে, তারপর এই বলে মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী হতে হবে যে, আমরা মুসলমান হয়ে দেখলাম, এ ধর্মটি ভালো না। এভাবে অনেক মুসলমানও হয়ত প্রভাবান্বিত হয়ে মুরতাদ হয়ে যাবে এবং তাদের ঐক্য ক্ষুণ্ন হবে। মোদ্দাকথা, হযরত মুহাম্মদ (সা) ও মুসলমানদের জন্য মদীনায় নানারূপ সমস্যার উদ্ভব হলো। হযরত মুহাম্মদ (সা) ইয়াহূদীদের সভাসমিতি ও সমাবেশসমূহে গিয়ে তাদেরকে এ মর্মে বোঝাতে লাগলেন যে, তোমরা উত্তমরূপেই অবগত আছ যে, আমি আল্লাহ্‌র সত্য নবী। তোমরা নিজেরাও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নবী আগমনের প্রতীক্ষা করছিল। সর্বপ্রথম তোমরাই আমার সত্যতার অনুমোদন করবে এবং তোমাদের আসমানী কিতাবসমূহ লিখিত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ খুঁজে দেখা ছিল তোমাদের কর্তব্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তোমরা বিরোধিতার ক্ষেত্রই তৈরি করে যাচ্ছ! আল্লাহ্‌র গযবকে ভয় কর ! এমন যেন না হয় যে, আবূ জাহেল, উতবা প্রমুখের মত তোমাদের উপরও আল্লাহ্‌র শাস্তি নেমে আসে। এরা বদর প্রান্তরে অত্যন্ত লাঞ্ছনাগ্রস্ত হয়ে ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। ইয়াহূদীরা উপদেশ গ্রহণের পরিবর্তে তাঁকে উল্টো জবাব দেয় এবং বলে যে, কুরায়শরা যুদ্ধকৌশল সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল। আমাদের সাথে যখন মুকাবিলা হবে তখন মজাটা টের পাবেন। আমাদেরকে কুরায়শদের মতো মনে করবেন না।

ইয়াহূদী গোত্র বনী কায়নূকা

ইয়াহূদীরা নানা ধরনের অসঙ্গত ও কুরুচিপূর্ণ কথাবার্তা প্রকাশ্যেই বলাবলি করতে লাগলো। হযরত মুহাম্মদ (সা) তাদের অশ্রাব্য কথাবার্তা অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে শুনতে থাকেন এবং এভাবে এ হতভাগাদেরকে চুক্তির বিরুদ্ধাচরণ করে প্রায় চুক্তিভঙ্গ করতে দেখেও তাদেরকে কোনরূপ শাস্তি প্রদান সমীচীন বোধ করেননি। তাঁর একান্ত ইচ্ছে ছিলো যে, বুঝিয়ে-সুঝিয়ে উপদেশ দিয়ে তাদেরকে সুপথে আনয়ন করবেন এবং এ উদ্ধতদেরকে আপন ঔদার্য, ভদ্র আচরণ ও ক্ষমাপরায়ণতা দিয়ে জয় করবেন। কিন্তু তাদের দুর্ভাগ্য তাদের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করলো। একদিন বনী কায়নুকা বস্তিতে একটি মেলা বা বাজার বসেছিলো। সেখানে আনসারের জনৈক রমণী দুধ বিক্রি করতে গিয়েছিলেন। দুধ বিক্রির পর তিনি স্বর্ণকারের দোকানে একটি অলংকার ক্রয় করতে বা বানাতে যান। ইয়াহূদী স্বর্ণকারটি উক্ত মুসলিম রমণীটিকে উত্যক্ত করে। বাজারে আগত জনৈক আনসারী সাহাবী আনসারী মহিলাকে অপদস্থ হতে দেখতে পেয়ে তাঁর সাহায্যে এগিয়ে যান। আশেপাশের ইয়াহূদীরা এসে উৎপীড়নকারী ইয়াহূদীর পাশে দাঁড়ায় এবং তারা একযোগে উক্ত আনসারী সাহাবীর উপর হামলা করে তাঁকে হত্যা করে। তাঁর হাতেও একজন ইয়াহূদী প্রাণ হারায়। এ সংবাদ পেয়ে বাজারে উপস্থিত অন্যান্য মুসলমানও

এসে পৌছেন। ইয়াহূদীরা তাঁদের উপর সশস্ত্র আক্রমণ চালায়। সংবাদটি মদীনায় হযরত নবী করীম (সা)-এর কানে পৌছে। তিনি সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন এবং ইয়াহূদীদেরকে সশস্ত্র ও যুদ্ধংদেহী অবস্থায় দেখতে পান। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হলো এবং পরিস্থিতি এ পর্যন্ত গড়ালো যে, বনূ কায়নুকার সাত শ' যোদ্ধা যাদের মধ্যে তিনশ' বর্ম পরিহিত ছিলো, নিজেদের সংরক্ষিত দুর্গাভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হলো। বনূ কায়নুকার সঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন সালামের কুটুম্বিতা ছিলো। মুসলমানরা সে দুর্গ অবরোধ করলেন। পনের ষোল দিনের অব্যাহত অবরোধের ফলে মুসলমানরা দুর্গের আধিপত্য লাভ করলেন এবং বনী কায়নুকা গোত্রের সমস্ত লোককে বন্দী করলেন। আরব দেশে যুদ্ধবন্দীদেরকে নির্দয়ভাবে হত্যার নিয়ম প্রচলিত ছিলো। মক্কাবাসীদের তো বিস্ময়ের সীমা ছিলো না যখন তারা লক্ষ্য করলো যে, বদরের যুদ্ধবন্দীদের মধ্য থেকে সভ্যতা-ভব্যতার সমস্ত সীমা অতিক্রমকারী চরম দুরাচার দু'জন মাত্র বন্দীকেই হত্যা করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট সকলকে মুক্তি দেয়া হয়েছে। এমন কি বনী কায়নুকার সাতশ' লোক এক সাথে বন্দী হওয়ায় সকলেরই নিশ্চিত ধারণা ছিলো যে, এবার আর কারো রক্ষা নেই, সমস্ত বন্দীকে নির্ঘাত মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। কিন্তু মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়্য ইব্ন সলূল যে বাহ্যত মুসলমানদের মধ্যেই শামিল ছিলো, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে ইয়াহূদীদেরকে হত্যা না করার সুপারিশ করলো। হযরত মুহাম্মদ (সা) এ ব্যাপারে দ্বিধান্বিত ছিলেন। কিন্তু আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়্য-এর উপর্যুপরি অনুরোধে তিনি তাদেরকে প্রাণে রেহাই দেন। হযরত উবাদা ইব্ন ছামিত (রা) তাদেরকে খায়বার পর্যন্ত বের করে দিয়ে আসলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়্য পর্দার অন্তরালে ইয়াহূদীদের মিত্র ছিল। এজন্যে সে সুপারিশ করে তাদেরকে প্রাণে রক্ষা করে তাদের মিত্রের হক আদায় করে।

কা'ব ইব্ন আশরাফের কথা উপরেই বলা হয়েছে। এখন সে প্রকাশ্যে মুসলমান ললনাদের নাম তার প্রেমের কবিতায় ব্যবহার করতে লাগলো। এতে মুসলমানরা অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হতেন। তারপর সে হযরত নবী (সা)-কে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো। ফলে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এতটুকু সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন দেখা দিল যে, রাতের বেলায় তিনি ঘর থেকে বেরোতে খুবই সতর্ক থাকতেন। তার দৌরাত্ম্য যখন সীমা অতিক্রম করলো তখন জনৈক সাহাবী মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা (রা) হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট থেকে তাকে হত্যার অনুমতি নিয়ে কয়েকজন সহচরসহ তার বাড়িতে যান এবং তাকে হত্যা করে আসেন। কা'ব ইব্ন আশরাফের পর সালাম ইব্ন আবূ হাকীক ঐ একই ধরনের দৌরাত্ম্যে লিপ্ত হলো এবং সে কা'ব ইব্ন আশরাফের চাইতেও অধিকতর শত্রু হয়ে দাঁড়ালো। কা'বকে যেহেতু আওস গোত্রীয়রা হত্যা করেছিলেন, তাই এবার বনী খাযরাজের আট ব্যক্তি খায়বার অভিমুখে রওয়ানা হলেন এবং তাকে তার বাসস্থানে হত্যা করে নিরাপদে মদীনায় ফিরে আসেন।

উহুদের যুদ্ধ

(হিজরী তৃতীয় বর্ষ)

বদর যুদ্ধের পর একদিকে তো স্বয়ং মক্কাবাসীদের অন্তরে প্রতিশোধ বহ্নি দাউ দাউ করে জ্বলছিলো, অপর দিকে মদীনার ইয়াহূদী ও মুনাফিকরা তাদেরকে উত্তেজিত করতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেনি। অপরদিকে আবূ সুফিয়ানের পত্নী হিন্দাও তাকে ভর্ৎসনা করে উত্তেজিত করে

চলেছিল,-যার পিতা ও ভাই বদর যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে নিহত হয়েছিল। মক্কার সমস্ত বড় বড় সরদার নিহত হওয়ার পর আবূ সুফিয়ান তখন মক্কার প্রধান সরদার। সে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণে লিপ্ত হলো। শামের যে বাণিজ্য কাফেলা আবূ সুফিয়ানের নেতৃত্বে নিরাপদে মক্কায় পৌঁছেছিল তাতে পাঁচ হাজার মিছকাল স্বর্ণ ও এক হাজার উট মুনাফা স্বরূপ পাওয়া গিয়াছিল। এ মুনাফা মালিকদের মধ্যে বন্টন করা হলো না এবং এর পুরোটাই যুদ্ধ প্রস্তুতিতে ব্যয়িত হলো। আরবের বিভিন্ন গোত্রে কবিদেরকে প্রেরণ করে তাদেরকে কুরায়শদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসতে উদ্বুদ্ধ করা হলো। এর চমৎকার ফলও পাওয়া গেলো। গোটা বনী কিনানা এবং তিহামাবাসী কুরায়শদের সাথে মিলিত হলো। কুরায়শদের সমস্ত মিত্র গোত্র তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে এলো। মক্কার হাবশী গোলামদেরকেও সৈন্যবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হলো। বীর গাথা গায়ক পুরুষ এবং বীরত্বের জন্যে উদ্বুদ্ধকারিণী নারীদেরকেও সাথে নেয়া হলো। মোটকথা, পূর্ণ একটি বছর মক্কাবাসীরা যুদ্ধ প্রস্তুতিতে ব্যয় করলো। এ প্রস্তুতি গ্রহণে মদীনায় ইয়াহূদী ও মুনাফিকরা গোপনে গোপনে সংবাদ সরবরাহ করে এবং পরামর্শ দিয়ে দিয়ে কুরাযশদের সর্বাধিক সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করে।

মোটকথা তিন হাজার দুর্ধর্ষ সৈন্যের একটি বাহিনী শাওয়াল মাসের প্রথম দিকে রওয়ানা হয়ে পড়লো। বদর যুদ্ধে নিহত সরদারদের জায়া-কন্যারাও এ উদ্দেশ্যে সাথে রওয়ানা হলো যে, তাদের প্রিয়জনদের হত্যাকারীদের নিহত হওয়ার দৃশ্য স্বচক্ষে অবলোকন করবে। কবিরাও সাথে চললো। তারা তাদের কবিতাদি শুনিয়ে গোটা রাস্তায় সৈন্যদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রেরণা দান করছিলো। কুরায়শদের অভিজাত মহিলাদের মধ্যে আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিন্ত উতবা মহিলাদের সেনাপতিরূপে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে, যেমনটি আবূ সুফিয়ান ছিল পুরুষদের সেনাপতি। জুবায়র ইব্ন মুতঈম-এর ওয়াহ্শী নামক একটি হাবশী ক্রীতদাস ছিলো। ছোট বল্লম চালনায় সে ছিল অত্যন্ত দক্ষ। তাকেও সাথে নেয়া হলো। তার লক্ষ্য বড় একটা ভ্রষ্ট হতো না। জুবায়র ইব্ন মুতঈম তাকে বলে যে, তুই যদি হামযাকে হত্যা করতে পারিস, তা হলে তোকে আমি মুক্ত করে দেবো। আবূ সুফিয়ান-পত্নী ও উতবা-তনয়া হিন্দা বললো, তুই যদি আমার পিতার হন্তা হামযাকে হত্যা করতে পারিস তাহলে তোকে আমার সমস্ত গহনা খুলে দিয়ে দেবো। কোন কোন ইতিহাসে এ বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা পাঁচ হাজার ছিলো বলে উল্লেখ আছে। কিন্তু বিশুদ্ধ বর্ণনা হচ্ছে এটা যে, বাহিনী তিন হাজার যোদ্ধা নিয়েই গঠিত হয়েছিলো। ললনার এবং যুদ্ধ শিক্ষার্থীদের সংখ্যা তার অতিরিক্ত হয়ে থাকবে।

কাফির বাহিনী মক্কা থেকে বেরিয়ে মদীনার উপকণ্ঠে এসে উপনীত হলো। হযরত মুহাম্মদ (সা) এ সংবাদ পেয়েই সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে পরামর্শ সভায় বসলেন। মুসলমানদের মধ্যে গণ্য বলে পরিচিত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়্য মুনাফিকও সে মজলিসে উপস্থিত ছিলো। রাসূল আকরাম (সা)-এর অভিমত ছিল এই যে, আমরা মদীনার শহরাভ্যন্তরে অবস্থান করেই আক্রমণ প্রতিরোধ করবো। তাঁর এ অভিমতের একটি কারণ এও ছিল যে তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন, তলোয়ারের কিছুটা ধার কমে গিয়েছে। তাই তিনি (সা) এ যুদ্ধে মুসলমানদের কিছুটা ক্ষতির আশংকা করছিলেন। তারপর তিনি দেখেছিলেন যে, তিনি তাঁর পবিত্র হাত তাঁর বর্মের মধ্যে রাখলেন। বর্মের ব্যাখ্যা তিনি মদীনা শহর বলে স্থির করেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়্যরও অভিমত ছিল এই যে, মদীনার অভ্যন্তরে থেকেই প্রতিরোধ করতে হবে। সম্ভবত

নিজের বিশেষ কোন স্বার্থে সে এ অভিমত পোষণ করতো। কিন্তু অধিকাংশ সাহাবী শত্রুরা যেন মুসলমানদের মধ্যে দুর্বলতা দেখা দিয়েছে বলে সন্দেহ না করে এজন্যে শহরের বাইরে গিয়ে শত্রুদের মুকাবিলা করার পক্ষপাতী ছিলেন। প্রবীণ সাহাবায়ে কিরামের অধিকাংশই মদীনার শহরাভ্যন্তর থেকে আক্রমণ প্রতিরোধের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু যুবকদের তা মোটেই মনপূত ছিলো না। এটা হচ্ছে ১৪ই শাওয়াল শুক্রবারের কথা। এ পরামর্শ অনুষ্ঠানের পর তিনি জুমুআর নামায আদায় করেন। নামায পড়ে তিনি ঘরে চলে যান এবং সেখান থেকেই বর্ম পরিহিত অবস্থায় যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বেরিয়ে আসেন। তারপর যুবক সাহাবায়ে কিরামের ভাবনা হলো, আমরা নবী করীম (সা)-এর মতের বিরুদ্ধাচরণ করায় তাঁর অবাধ্য বলে না গণ্য হয়ে যাই। তখন তাঁরা আরয করলেন : আপনি যদি মদীনার অভ্যন্তর থেকে আক্রমণ প্রতিরোধ করাই সমীচীন মনে করেন তবে তাই করুন, এতে আমাদের পক্ষ থেকে কোনই আপত্তি নেই। কিন্তু তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠের মত এবং পরামর্শ সভার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কিছু করাটা এজন্যে সমীচীন বোধ করেন নি যে, এ মর্মে তিনি ওয়াহীযোগে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্দেশপ্রাপ্ত হননি। বদর যুদ্ধে যারা অংশ গ্রহণ করতে পারেননি তাদের মনরক্ষাও এর একটা উদ্দেশ্য ছিলো। কেননা, তাঁরা তাদের বীরত্ব প্রদর্শনের একটা সুযোগ লাভের জন্যে উন্মুক্ত ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) জুমুআর নামাযের অব্যবহিত পরেই সদলবলে মদীনা থেকে বেরিয়ে পড়লেন। মদীনায় তাঁর অনুপস্থিতিতে নামাযের ইমামতির ও মদীনার দেখাশোনা করার জন্য আবদুল্লাহ্ ইব্ন উম্মে মাকতুম সাহাবীকে রেখে গেলেন। এক হাজার লোক হযরত নবী করীম (সা)-এর সাথে মদীনা থেকে রওয়ানা হলেন।

মুনাফিকদের ঔদ্ধত্য

মদীনা থেকে বেরিয়ে দেড় দু'মাইল যেতে না যেতেই এক হাজার লোকের মধ্যে তিন শ' জনকে নিয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়্য মদীনায় ফিরে চললো। সে বললো, আমাদের মতামত অনুসারে যেহেতু কাজ করা হয়নি এজন্যে আমরা মদীনার বাইরে গিয়ে লড়তে প্রস্তুত নই। এ তিন শ' মুনাফিক দলত্যাগ করায় মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা কেবল সাত শ'তে এসে দাঁড়ালো। এ সাত শ'র মধ্য থেকেও অল্প বয়স্কদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় ফেরত পঠিয়ে দিলেন। দিনের অল্প কিছু সময় বাকী থাকতেই তিনি সদলবলে মদীনা থেকে তিন মাইল দূরবর্তী উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে এসে পৌছলেন। তাঁরা পৌছেই দেখতে পেলেন যে, কাফির বাহিনী ইতোপূর্বেই সেখানে পৌছে ছাউনি স্থাপন করেছে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসায় কোন পক্ষই যুদ্ধের কোন লক্ষণ দেখালো না। রাসূলুল্লাহ (সা) উহুদ পাহাড়কে পিছনে রেখে ছাউনি স্থাপন করলেন। রাত নির্লিপ্তভাবে অতিবাহিত হওয়ার পর পরদিন ১৫ই শাওয়াল ৩ হিজরী রোজ শনিবার উভয় পক্ষ সক্রিয় হয়ে উঠলো। যুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে হযরত নবী করীম (সা) পঞ্চাশ জন দক্ষ তীরন্দাজের একটি বাহিনীকে হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন জুবায়র আনসারী (রা)-এর নেতৃত্বে পিছনের ঘাঁটিতে এই আদেশ দিয়ে মোতায়েন করেন যে, যুদ্ধের অবস্থা যাই হোক না কেন, পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত তোমরা স্থান ত্যাগ করবে না। ব্যাপার ছিলো এই যে, ঐ সংকীর্ণ গিরিপথ দিয়ে শত্রুর পাহাড়ের পিছন দিক থেকে এসে হামলা করার আশংকা ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থান দেখেই রাসূলুল্লাহ (সা) ব্যাপারটি অনুধাবন করেছিলেন। এজন্যে

শত্রুপক্ষের সে সম্ভাব্য হামলা প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে তিনি এদেরকে ঐ স্থানে মোতায়েন করেছিলেন।

যোদ্ধাদেরকে সারিবদ্ধ করে নবী করীম (সা) ডানের বাহিনীর নেতৃত্ব হযরত যুবায়র ইব্‌ন আওয়াম (রা)-এর উপর এবং বামের বাহিনীর নেতৃত্ব হযরত মুনযির ইব্‌ন আমর (রা)-এর উপর ন্যস্ত করেন। হযরত হামযা (রা)-কে বাহিনীর অগ্রভাগে অগ্রপথিক সেনানী নিযুক্ত করেন এবং পতাকা হযরত মুসআব ইব্‌ন উমায়র (রা)-এর হাতে দেন। নবী করীম (সা) তাঁর নিজ তলোয়ার হযরত আবূ দুজানা (রা)-কে দেন। তিনি এ তলোয়ার নিয়ে গোটা যুদ্ধক্ষেত্রে উল্লাসের সাথে গর্বভরে প্রদক্ষিণ করতে থাকেন। তাঁর এতাদৃশ আচরণে তিনি বলেন যে, এরূপ পদক্ষেপ আল্লাহ্ পসন্দ করেন না। কিন্তু কাফিরদের সঙ্গে মুকাবিলা করতে যেয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে এভাবে চলা জাইয।

অপর দিকে কুরায়শরাও তাদের সারি বিন্যস্ত করলো। তারা একশত জন অশ্বারোহী সৈন্যে সম্বলিত ডান বাহিনীর নেতৃত্ব খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদের হাতে অর্পণ করে (তিনি তখনো ইসলাম গ্রহণ করেন নি)। কুরায়শের পতাকা বহনের দায়িত্ব প্রাচীনকাল থেকেই বনী আবদে দার-এর উপর ন্যস্ত ছিল। আবূ সুফিয়ান বনী আবদে দারকে উত্তেজিত করার জন্যে বললো, যদিও প্রাচীনকাল থেকেই তোমরা কুরায়শদের পতাকা বহন করে আসছো, কিন্তু বদর যুদ্ধে তোমাদের পতাকা বহনের অলক্ষুণে প্রভাবের কথাটি স্মরণ হলেই ইচ্ছে হয় যে, পতাকা বহনের দায়িত্ব অন্য কোন গোত্রকে অর্পণ করি। তোমরা যদি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও যে, পতাকা বহনের গুরুদায়িত্ব তোমরা প্রাণপণে পালন করবে তাহলে পতাকা তোমাদের কাছে রাখ, নতুবা তা ফিরিয়ে দাও। বনূ আবদের দার গোত্র পতাকা ফেরত দিল না বরং বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের অঙ্গীকার করলো। উক্ত দু'জন অশ্বারোহী ছাড়া দুইশ রিজার্ভ ঘোড়া প্রয়োজনের সময় ব্যবহারের জন্য তৈরী রাখা হয়। মুশরিকদের তীরন্দায বাহিনীর সরদার ছিলো আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রবীআ। ওদিকে কুরায়শ ও অন্যান্য গোত্রের বাছাই করা অন্তত তিন হাজার সশস্ত্র সৈন্যের দুর্ধর্ষ বাহিনী আর এদিকে সাতশ'রও কম সৈন্য হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর বাহিনী ছিল। এ বাহিনীতে পনের বছরের কম বয়সের বালকরাও ছিল। মুসলিম বাহিনীতে ঘোড়া ছিল কেবল দু'টি। মোটকথা সংখ্যার দিক থেকে মুসলমানরা এক-চতুর্থাংশেরও কম ছিলেন এবং যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জামের অনুপাত ছিল তার চাইতে অনেক গুণ কম।

যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেলো

যুদ্ধের সূচনা হয় এভাবে যে, সর্বপ্রথম আবূ আমির রাহিব কাফির বাহিনীর পক্ষ থেকে মাঠে অবতীর্ণ হয়। লোকটি ছিলো মদীনার অধিবাসী এবং আওস গোত্রের লোক। আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে সে একজন জ্ঞানীগুণী সম্মানিত ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হতো। মদীনায় মুসলমানদের আগমনে সে তীব্র অন্তর্জ্বালায় ভুগতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত মক্কায় গিয়ে বসবাস করতে থাকে। সে এই ভেবে কাফির বাহিনীর সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছিলো যে, আওস গোত্রের লোকদেরকে সে বিরুদ্ধপক্ষে টেনে নিতে পারবে। সে যুদ্ধক্ষেত্রে নেমেই আওস গোত্রীয়দেরকে আহবান করে, কিন্তু আওস গোত্রীয় আনসারগণ তাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন এবং সে অত্যন্ত অপদস্থ হয়।

তারপর উভয় পক্ষ একে অপরকে আক্রমণ করে। হযরত হামযা (রা), হযরত আলী (রা), হযরত আবূ দু'জানা (রা) প্রমুখ বীর সাহাবায়ে কিরামে যুদ্ধে যে অপূর্ব বীরত্ব প্রদর্শন করলেন তাতে প্রতিপক্ষের সাহস উবে গেল। আবূ দুজানা (রা) শত্রুদেরকে কতল করতে করতে তাদের ব্যূহ ভেদ করে আবূ সুফিয়ান পত্নীর এতই নিকটে পৌছে গেলেন যে, সে তাঁর আয়ত্তের মধ্যে চলে আসলো। তাকে হত্যার উপক্রম করতেই মহিলাটি প্রাণভয়ে চীৎকার করে উঠলো। নারীকণ্ঠের আওয়াজে আবূ দুজানা হকচকিয়ে যান। এ যে নারী! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তরবারি নারীরক্তে কলুষিত করা চলে না। এভাবে হিন্দা বিন্ত উতবার প্রাণ বেঁচে গেলো।

হযরত হামযা (রা)-এর শাহাদত বরণ

হযরত হামযা (রা) আক্রমণ চালিয়ে মুশরিকদের পতাকাবাহী তালহাকে হত্যা করেন। তিনি বীরবিক্রমে অসি চালিয়ে মুশরিকদেক ব্যূহ ভেদ করে সম্মুখপানে অগ্রসর হচ্ছিলেন। হাবশী গোলাম ওয়াহশী তাঁকে অগ্রসর হতে দেখে একটি পাথরের আড়ালে আত্মগোপন করে বসে থাকে। কাফিরদের হত্যা করতে করতে যখন তিনি আরো সম্মুখে অগ্রসর হন তখন সুযোগ বুঝে সে তার প্রতি বর্শা নিক্ষেপ করে এবং তা তাঁর নাভিমূলে আঘাত হেনে পার্শ্বদেশ ভেদ করে চলে যায়। তিনি শাহাদত লাভ করেন। ওয়াহশী হিন্দা বিন্ত উতবার নিকট গিয়ে হযরত হামযার শাহাদত লাভের খবর শোনায়। হযরত হানযালা (রা) আক্রমণ চালিয়ে কাফির-দের সম্মুখ হতে হটিয়ে দিয়ে আবূ সুফিয়ানের নিকট পৌছে যান। তিনি তাকে তরবারি দ্বারা আঘাত করতে উদ্যত হলে শাদ্দাদ ইবনুল আসওয়াদ আল-লায়ছী পেছন থেকে এসে তাঁকে আঘাত করে। ফলে তিনি শহীদ হন। এ যুদ্ধে হযরত নযর ইব্ন আনাস এবং সা'দ ইবনুর রবী তরবারি যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দেন। এই যুদ্ধে কুরায়শদের বারজন পতাকাবাহী পর পর মুসলমানদের হাতে নিহত হয়। এদের মধ্যে আটজনকে হযরত আলী (রা) একাই ধরাশায়ী করেন। এদের একজন নিহত হওয়ার পর পতাকা মাটিতে পতিত হলে আর একজন এসে তা উত্তোলন করতে থাকে। এমনিভাবে যখন তাদের শেষ পতাকাবাহী সওয়ার নিহত হয় তখন আর কেউ পতাকা উত্তোলন করার সাহস করেনি এবং তা ভূমিতেই পড়ে থাকে।

মুসলমানদের ব্যূহ ভেদকারী আক্রমণ এবং বীরত্বপূর্ণ তরবারি যুদ্ধ নৈপুণ্যে তিন হাজার বীর সৈন্যের পায়ের তলার মাটি সরে যায়। দুপুরের কাছাকাছি কাফিররা পশ্চাদপসরণ করতে থাকে। প্রথমে তারা উল্টো পায়ে যুদ্ধ করতে করতে পিছু হটতে থাকে। অতঃপর পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালাতে থাকে, এমন কি তারা নিজেদের সীমানার বাইরেও চলে যায়। যেসব কুরায়শ নারী পেছনে পেছনে দফ বাজিয়ে এবং কবিতা আবৃত্তি করে তাদের পুরুষ সৈন্যদের যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করছিল মুসলমানেরা দেখলো তারাও সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম ফেলে নিজেদের পলায়নপর সৈন্যদের সাথে মিলিত হচ্ছে। মুশরিকদের জেনারেল হিন্দা বিন্ত উতবাও দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে নিজের সমস্ত সামান ময়দানে ফেলে পালিয়ে যায়।

যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল!

মুশরিকদের শোচনীয় পরাজয় এবং মুসলমানদের বিজয় প্রায় সুনিশ্চিত হয়ে উঠলো। কাফির সৈন্যরা যখন পিছটান দিচ্ছিলো তখন বেলা দ্বিপ্রহর। পলায়নপর কাফির সৈন্যদের পলায়নের দৃশ্য এবং কাফির বাহিনীর পতাকা দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত ভূলুণ্ঠিত অবস্থায় প্রত্যক্ষ করে

ঘাঁটিতে মোতায়েন তীরবন্দাজবাহিনীর মনেও স্পৃহা জাগলো যে, আমরা কাফির সেনাদেরকে ধাওয়া করায় অংশ গ্রহণ করি। তাদের সরদার হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন জুবায়র আনসারী তাদেরকে অনেক করে বললেন যে, মহানবী (সা)-এর পুনরাদেশ না পাওয়া পর্যন্ত আমরা এ স্থান ত্যাগ করতে পারি না। কিন্তু যুদ্ধজয়ের আনন্দ এবং কাফিরদের পশ্চাদ্ধাবনের অতি আগ্রহ তাঁদেরকে তা শুনতে দেয়নি। ফলে তাঁরা স্থান ত্যাগ করলেন। কুরায়শদের ডান বাহিনীর পরিচালক খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ এ ঘাঁটির গুরুত্ব যে কত অধিক তা সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি তাঁর এক শ' সৈন্যসহ এক মাইল পথ ঘুরে পশ্চাৎ দিক থেকে ঐ ঘাঁটি দিয়ে এসে মুসলমানদের আচমকা হামলা চালালেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন জুবায়র (রা) এবং তাঁর অল্প ক'জন সঙ্গী সে আক্রমণ প্রতিরোধে ব্যর্থ হলেন। কেননা, তাঁর অধীনস্থ অন্য সকলে ইতিপূর্বেই স্থান ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন জুবায়র (রা) ঘটনাস্থলেই শহীদ হলেন। এ আকস্মিক হামলাটি ছিল একেবারেই অপ্রত্যাশিত। তীরন্দাজদের স্থান ত্যাগে মুসলমানদের মধ্যে বিব্রতকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। মুসলমানরা এবার কাফির সেনাদের পশ্চাদ্ধাবন ছেড়ে দিলেন।

মুসলমানদের এ বিব্রতকর অবস্থা লক্ষ্যে ইকরামা ইব্ন আবূ জাহেল তার অশ্বারোহী সৈন্যদেরকে নিয়ে অন্যদিক থেকে হামলা চালালো। সাথে সাথে ইতিপূর্বে ময়দান পরিত্যাগ করে পলায়নকারী আবূ সুফিয়ান ও পলায়নপর কুরায়শ সৈন্যদেরকে নিয়ে রুখে দাঁড়ালো। কাফির বাহিনী এবার নব উদ্যমে মুসলমানদের উপর হামলা চালালো। মুসলমানদের উপর অতর্কিতে এবং উপর্যুপরি এ সব হামলা পরিচালিত হয়। ফলে যুদ্ধের মোড় সম্পূর্ণ ঘুরে গেলো। মুসলমানরা চতুর্দিক থেকে কাফির বাহিনীর দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়লো। তারা ছত্রভঙ্গ ও দিশাহারা হয়ে গেলেন। যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা দাঁড়ালো এই যে, স্থানে স্থানে গুটি কয়েক মুসলমান বিরাট বিরাট কাফির দলের অবরোধের মধ্যে পড়ে গেলেন। তারা পরস্পরের সংযোগ হারিয়ে ফেললেন এবং এ অবস্থায় চতুর্দিক থেকে তাদের উপর তরবারি বর্ষিত হচ্ছিলো। হযরত মুহাম্মদ (সা) মাত্র বারজন সঙ্গীসহ কাফিরদের এক বিরাট দলের মধ্যে পড়ে গেলেন। হযরত মুসআব পতাকা হাতে ধরে তাঁর নিকটেই দাঁড়িয়েছিলেন। কাফির বাহিনীর জনৈক নামজাদা অশ্বারোহী ইব্ন কুমাইয়া লায়ছী আক্রমণ চালিয়ে হযরত মুসআব (রা)-কে শহীদ করে দিলো। হযরত মুসআব (রা)-এর অবয়ব যেহেতু দেখতে অনেকটা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর অবয়বের মতো ছিলো তাই সে ধারণা করলো যে, হযরত মুহাম্মদ (সা) শহীদ হয়ে গেছেন। সে একাই উঁচু স্থানে আরোহণ করে সে মুহূর্তেই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলো : قَدْ قَتَلْتُ مُحَمَّدًا আমি মুহাম্মদকে হত্যা করেছি। তার এ ধ্বনি শুনে মুশরিকদের মনোবল অনেক গুণে বৃদ্ধি পেলো। তারা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। মুসলমানদের জন্যে এ ধ্বনিটি ছিল প্রাণান্তকর। তাঁরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন। এমন সময় হযরত কা'ব ইব্ন মালিক (রা)-এর দৃষ্টি হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি নিবদ্ধ হলো এবং তিনি তৎক্ষণাৎ চীৎকার করে বলে উঠলেন : "মুসলমানরা! শুনে সুখী হও। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জীবিত এবং সুস্থই রয়েছেন।" তখনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) উচ্চৈঃস্বরে আহবান জানাল :

اِلَىَّ عِبَادَ اللّٰهِ اَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ .

"আল্লাহ্র বান্দারা, আমার দিকে এগিয়ে এসো; আমি আল্লাহ্র রাসূল।

এ ধ্বনি উচ্চারিত হওয়া মাত্র মুসলমানরা তা শুনতে পেয়ে চতুর্দিক থেকে এসে জমায়েত হতে শুরু করলেন। কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করে তাদের হামলা প্রতিরোধ করে, তাদেরকে মারতে মারতে তাঁরা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নিকটে আসতে লাগলেন। ওদিকে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সে আওয়াজ কাফিরদেরকেও তাঁর অবস্থান জানিয়ে দিলো। ফল দাঁড়ালো এই যে, তারাও সেদিকে মনোনিবেশ করলো এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অবস্থানস্থল যুদ্ধের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ালো। মুসলমানদের কিছু সংখ্যক সৈন্য এমন স্থানে এবং এমন অবস্থায় ছিলেন যে, তাঁরা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট পর্যন্ত পৌঁছতে পারেন নি। তাঁরা এদিক-সেদিক ছত্রভঙ্গ হয়ে যান। এই বিশৃংখল অবস্থায় আবদুল্লাহ ইব্ন শিহাব হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নিকটে এসে সজোরে তরবারির এমন একটি আঘাত হানে যে শিরস্ত্রাণের দু'টি কড়া তাঁর পবিত্র গণ্ডদেশে অক্ষির নিচের অস্থির মধ্যে ঢুকে পড়লো। হযরত আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ্ (রা) আপন দাঁত দিয়ে তা' সজোরে টেনে বের করে আনেন। এতে নবী করীম (সা)-এ দু'টি দন্ত মুবারক উঠে আসে। কাফির বাহিনী তাঁর উপর আক্রমণ পরিচালনায় সর্বশক্তি নিয়োগ করে।

নবুওয়াত দীপের পতঙ্গকুল

এদিকে কয়েকজন নিবেদিতপ্রাণ মুজাহিদ হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর চতুর্দিকে একটি ব্যূহ রচনা করে তাঁর চতুষ্পার্শ্বে দাঁড়িয়ে গেলেন। হযরত আবূ দুজানা (রা) হযরত নবী করীম (সা)-এর দিকে মুখ করে তাঁর নিজ পিঠকে ঢাল বানিয়ে ফেললেন। যদি মুখ কাফিরদের দিকে আর পিঠ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দিকে থাকতো তবে হয়তো তীর আসতে দেখলে স্বাভাবিকভাবে আত্মরক্ষার সহজ প্রবণতায় একটু সরে দাঁড়িয়ে আপন দেহকে বাঁচাবার প্রশ্নটা আসতো, কিন্তু এ অবস্থায় সে প্রশ্ন আর ছিলো না। পাছে তীর হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র দেহ স্পর্শ করে বসে এজন্যেই তাঁর এ সতর্কতা! তাঁর পিঠ তীরের পর তীরে ঝাঁঝরা হয়ে গেলো। তবু তিনি একচুলও নড়লেন না। হযরত সা'দ ইব্ন ওয়াক্কাস (রা), হযরত আবূ তালহা (রা) ও হযরত 'আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) হযরত রসূল আকরাম (সা)-এর চারপাশে লৌহপ্রাচীরের মত দাঁড়িয়ে যান এবং তীর ও তলোয়ার দিয়ে শত্রুদেরকে প্রতিহত করতে থাকেন। হযরত তালহা (রা) দুশমনদের তলোয়ারের আঘাত আপন হাত দিয়ে প্রতিহত করেন, এমন কি তাঁর দু'টি হাত যখম হতে হতে অচল হয়ে যায়। হযরত যিয়াদ ইব্ন সাকান আনসারী (রা) তাঁর পাঁচজন সঙ্গীসহ হযরত (সা)-এর হিফাযত করতে গিয়ে শাহাদত বরণ করেন। হযরত উমারা ইব্ন যায়দ (রা)-ও হুযূর আকরাম (সা)-এর হিফাযত করতে গিয়ে পতঙ্গের মত প্রাণ দান করে শহীদ হয়ে যান। উম্মে আমারা, যাঁর নাম ছিল নসীবা বিন্ত কা'ব (রা), যুদ্ধের অবস্থান স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার উদ্দেশ্যে মুসলিম বাহিনীর পিছু পিছু ছুটে আসেন। দুপুরের পর যখন যুদ্ধের গতি অকস্মাৎ পরিবর্তিত হয়ে গেল যখন দূরাত্মা ইবন কামিয়্যা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর তলোয়ারের আঘাত হানলো তখন তিনি উপর্যুপরি ইব্ন কামিয়্যার উপর তলোয়ার হানতে থাকেন। কিন্তু সে দু' দু'টি বর্মে সজ্জিত ছিলো বলে তাঁর সেসব আঘাত তার গায়ে লাগেনি। সে উম্মে আমারাকে একটি আঘাত হানলে স্কন্ধের নীচে তাঁর হাতটি যখমী হয়ে যায়।

হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর দৃঢ়তা

হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর চতুষ্পার্শ্বে যখন তুমুল যুদ্ধ চলছিলো, তখন একটি দুরাচার দূর থেকে তাঁর প্রতি একটি পাথর ছুঁড়ে মারে। তাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ঠোঁটে আঘাত লাগে এবং তাঁর নীচের একটি দন্ত মুবারক শহীদ হয়ে যায়। এ অবস্থায়ই তাঁর কদম মুবারক একটি গর্তের মধ্যে পড়ে যায় এবং তিনি পড়ে যান। হযরত আলী (রা) তাঁর হাত ধরেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এবং হযরত তালহা (রা) তাঁকে উঠিয়ে বের করেন। হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর চতুষ্পার্শ্বে যখন সাহাবায়ে কিরামের একটি ছোটো খাটো দল এসে সমবেত হয়ে গেলো এবং তাঁরা প্রাণপণে লড়তে লাগলেন তখন কাফিরদের হামলার তীব্রতা হ্রাস পেলো। সাহাবায়ে কিরাম এবার কাফিরদেরকে মেরে মেরে হটিয়ে দিলেন। এ অবস্থায় নবী (সা) সাহাবায়ে কিরামকে পাহাড়ের দিকে যেতে বললেন এবং তাঁদেরকে নিয়ে পাহাড়ের বেশ উঁচু অংশে আরোহণ করলেন। উদ্দেশ্য ছিলো কাফিরদের ব্যূহ থেকে বেরিয়ে গিয়ে পাহাড় পিছনে রেখে যুদ্ধের জন্য একটি ব্যূহ রচনা করা। এ কার্য প্রণালীটি অর্থাৎ যুদ্ধের জন্যে সুবিধামত অবস্থান গ্রহণ অত্যন্ত উপাদেয় প্রতিপন্ন হয়। মুসলমানদেরকে উচ্চ ভূমিতে অবস্থান নিতে দেখে আবূ সুফিয়ানও পাহাড়ে আরোহণের প্রয়াস পায়। সে কাফিরদের একটি বাহিনী নিয়ে ভিন্ন পথে উচ্চতর অবস্থানে আরোহণ করতে প্রয়াস পাচ্ছিলো। এমন সময় নবী করীম (সা) হযরত উমর ফারূক (রা)-কে তাদেরকে উচ্চভূমিতে আরোহণে বাধাদানের নির্দেশ দিলেন। হযরত উমর (রা) কতিপয় সঙ্গীসহ তৎক্ষণাৎ সেদিকে অগ্রসর হয়ে আবূ সুফিয়ানের দলকে নীচে অবতরণে বাধ্য করেন।

এবার মুসলমানরা দ্রুত এগিয়ে চললেন। যারা ইতিপূর্বে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন তাঁরাও পাহাড়ের ঐ উচ্চ স্থানে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চারপাশে এসে সমবেত হয়ে গেলেন। এবার আর কাফিররা মুসলমানদের উপর হামলা করতে সাহস পেলো না। কিন্তু পূর্ব থেকেই রাসূলুল্লাহ (সা)-কে হত্যার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এক কাফির উবায়্য ইব্‌ন খাল্‌ফ তার আপন ঘোড়ায় চড়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর হামলা করলো। তাকে আসতে দেখেই আল্লাহর রসূল (সা) বললেন, একে নিকটে আসতে দাও! সে কাছে এসে হামলা করতে উদ্যত হতেই হযরত নবী করীম (সা) জনৈক সাহাবী হারিছ ইব্‌ন সুম্মা (রা)-এর হাত থেকে বল্লম নিয়ে তার উপর আঘাত হানলেন। বল্লমের তীক্ষ্ণ ফলা তার স্কন্ধের নীচের হাড়ে স্পর্শ করলো। বাহ্যত এ আঘাত ছিল মামুলী, কিন্তু এ আঘাতেই সে দিশাহারা হয়ে ছুটে পলালো। সে যখন আক্রমণ করতে এসেছিল তখন চীৎকার করে করে বলছিল, আমি আজ মুহাম্মদ (সা)-কে হত্যা করবই। এবার যখন দিশাহারা হয়ে ছুটে পালাচ্ছিল তখন মুশরিকরা তাকে নিয়ে হাসাহাসি করছিল। এ আঘাতেই হতভাগা উবায়্য ইব্‌ন খাল্‌ফ ফেরার পথে মক্কায় পৌঁছবার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে।

আবূ সুফিয়ান চীৎকার করে জিজ্ঞেস করলো : افى القوم محمد -তোমাদের মধ্যে কি মুহাম্মদ রয়েছে ? হযরত মুহাম্মদ (সা) সাহাবাদেরকে এর উত্তর দিতে বারণ করলেন। তারপর সে দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করলো : তোমাদের মধ্যে কি আবূ বকর রয়েছে ? এবারও কোন জবাব মিললো না। তারপর সে প্রশ্ন করলো, তোমাদের মধ্যে কি উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) রয়েছে ? তারও কোন জবাব দেওয়া হলো না। তখন সে স্বগতোক্তি করলো : বোঝা গেলো এদের কেউই আর বেঁচে নেই, সবাই নিহত হয়েছে। এবার হযরত উমর ফারূক (রা) আর চুপ করে

থাকতে পারলেন না। তিনি চীৎকার করে বললেন : "হে আল্লাহ্‌র দুশমন! এঁদের সকলেই জীবিত রয়েছেন। অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবি তুইই।" এ জবাব শুনে সে আচমকা থতমত খেয়ে গেলো এবং অনেকটা গর্বের সুরে বলে উঠলো : اُعْلُ هُبَلُ اُعْلُ هُبَلُ "জয় 'হবলের, জয় 'হবলের-

হযরত মুহাম্মদ (সা) হযরত উমর (রা)-কে বললেন : এর জবাবে বল : اَللّٰهُ اَعْلٰى وَاَجْلُّ "আল্লাহ্‌ই সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক মর্যাদসম্পন্ন।" আবূ সুফিয়ান হযরত উমর (রা)-এর কণ্ঠে একথা শুনে বললো لَنَا عُزّٰى وَلَا عُزّٰى لَكُمْ

"আমাদের উজ্জা দেবী রয়েছে, তোমাদের কোন উজ্জা দেবী নেই।" হযরত উমর ফারূক (রা) হুযূর আকরাম (সা)-এর কথামতো জবাব দিলেন :

اَللّٰهُ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلٰى لَكُمْ .

"আল্লাহ আমাদের মওলা, তোমাদের কোন মওলা নেই।" আবূ সুফিয়ান বললো : এ যুদ্ধটি বদর যুদ্ধের সমান সমান হয়ে গেলো। অর্থাৎ আমরা এবার বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ কড়ায় গণ্ডায় নিয়ে নিলাম। হযরত উমর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কথামতো জবাব দিলেন : না না, সমান সমান হয়নি। কেননা, আমাদের নিহতরা জান্নাতে এবং তোমাদের নিহতরা জাহান্নামে। তারপর আবূ সুফিয়ান চুপ হয়ে গেলো। তারপর সে চীৎকার করে বললো : আবার আগামী বছর বদর প্রান্তরে তোমাদের সাথে বোঝাপড়া হবে। হযরত রসূল (সা) আদেশ করলেন বলে দাও :

نَعَمْ هُوَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ مَوْعِد .

হাঁ, এ চ্যালেঞ্জ আমরা গ্রহণ করলাম!

আবূ সুফিয়ান এরূপ বলাবলি করে এবং জবাব শুনে প্রস্থান করলো। নবী করীম (সা) হযরত আলী (রা)-কে তাদের প্রত্যাবর্তনের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করার জন্যে পিছু পিছু পাঠিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, লক্ষ্য রাখবে যদি তারা উটের উপর হাওদা বাঁধে এবং ঘোড়াগুলোকে আরোহী শূন্য রাখে তবে বুঝে নিতে হবে যে এরা মক্কায় ফিরে চলেছে। পক্ষান্তরে যদি তারা ঘোড়ায় আরোহণ করে এবং উটের উপর হাওদা না বেঁধে থাকে তবে বুঝে নিতে হবে যে, এরা মদীনায় হামলা চালাতে উদ্যত হয়েছে। যদি তারা একান্তই মদীনায় হামলা করতে উদ্যত হয় তবে আমরা এ মুহূর্তে তাদের উপর আঘাত হানবো। কিছুক্ষণ পরেই হযরত আলী (রা) ফিরে এসে জানালো যে, এরা উটের পিঠে হাওদা বেঁধে ঘোড়াগুলোকে আরোহী শূন্য অবস্থায় রেখেছে। অর্থাৎ সত্যি সত্যি তারা মক্কার পথে রওয়ানা হয়েছে।

যুদ্ধের ময়দানের দৃশ্য

এরপর নিশ্চিন্ত হয়ে তিনি পাহাড় থেকে নেমে এলেন। যুদ্ধের ময়দানে শহীদানের লাশগুলো দাফন করা হলো। ৬৫ জন আনসার এবং ৪ জন মুহাজির শাহাদত বরণ করেছিলেন। কাফিররা কোনো কোনো শহীদের লাশ টুকরো টুকরো করে ফেলেছিল। আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিন্‌ত উতবা সুযোগ পেয়ে হযরত আমীর হামযা (রা)-এর লাশের 'মুছলা' করলো। অর্থাৎ তাঁর নাক, কান প্রভৃতি কেটে চেহারা বিকৃত করে ফেলেছিল। চক্ষু বের করে নিয়েছিল।

বুক চিরে কলিজা বের করে দাঁত দিয়ে চিবালো। কিন্তু গিলতে পারলো না। উগরে ফেলে দিলো। এজন্য সে 'কলিজাখোর' নামে কুখ্যাত হলো। হযরত যুবায়র ইবনুল আওয়াম (রা)-এর মাতা এবং হযরত হামযা (রা)-এর সহোদরা ভগ্নী হযরত সাফিয়্যা (রা) তাঁর ভাইয়ের লাশ দেখার জন্য এলেন। হযরত নবী করীম (সা) যুবায়র (রা)-কে বললেন, সাফিয়্যা (রা)-কে লাশের কাছে যেতে বারণ করো। তিনি বারণ করলে হযরত সাফিয়্যা (রা) বললেন, আমি জানতে পেরেছি যে, আমার ভাইয়ের লাশ বিকৃত করা হয়েছে। আমি বিলাপ করতে আসিনি, আমি সবর করবো এবং তাঁর মাগফিরাত কামনা করবো। নবী করীম (সা) একথা শুনে অনুমতি দিলেন। সাফিয়া (রা) তাঁর ভাইয়ের লাশ ও তাঁর কলিজার টুকরোগুলো মাটির উপর পড়ে থাকতে দেখে নীরবে সবর করলেন এবং 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন' পড়লেন। মাগফিরাত কামনা করলেন এবং চলে এলেন। ইসলামের পতাকাবাহী হযরত মুসআব ইব্ন উমায়র (রা)-এর কাফনের জন্য কেবল একটি চাদর ছিল। এটি এতই ছোট ছিল যে, মাথা ঢাকলে পা উদোম হয়ে যেতো এবং পা ঢাকলে মাথা উদোম হয়ে যেতো। পরিশেষে মাথা ঢেকে দেয়া হয় এবং পায়ের উপর ইযখির ঘাস দ্বারা আবৃত করা হয়। বিনা গোসলে এক একটি কবরে দু' দু'জন করে শহীদকে দাফন করা হয়। যুদ্ধের ময়দান থেকে মদীনা মুনাওয়ারা ফেরার সময় পথে হযরত মুসআব ইব্ন উমায়েরের স্ত্রী হামনা বিন্ত জাহাশ (রা)-এর সাথে দেখা হল। তাঁকে তাঁর মামা হযরত হামযা (রা)-এর শাহাদতের খবর জানানো হলো। তিনি ইন্না লিল্লাহ ... পড়লেন। এরপর তাঁর ভাই হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন জাহাশ (রা)-এর শাহাদতের খবর দেয়া হলো। তিনি ইন্না লিল্লাহ ... পড়ে তাঁর মাগফিরাত কামনা করলেন। এরপর তাঁর স্বামী মুসআব ইব্ন উমায়র (রা)-এর শাহাদতের সংবাদ দেয়া হলো। একথা শুনে তিনি দিশেহারা হয়ে যান এবং কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। হযরত নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এই হাল দেখে বললেন, মেয়েরা স্বামীদের প্রতি অধিকতর প্রীত থাকে।

আনসারদের এক গোত্রের এক মহিলার পিতা, ভ্রাতা ও স্বামী তিনজনই শহীদ হয়েছিলেন। তিনি নবী (সা)-এর শাহাদতের গুজব শুনে মদীনা মুনাওয়ারা রওয়ানা করেন। পথে তাকে কেউ খবর দিল যে, তোমার পিতা শহীদ হয়েছেন। তিনি বললেন, হযরত মুহাম্মদ (সা) সুস্থ আছেন কিনা–তাই বলো। তারপর তাকে বলা হলো, তোমার ভাইও শহীদ হয়েছেন। তিনি এ খবর শুনে ঐ একই কথা বললেন : আমাকে হযরত নবী করীম (সা)-এর খবর শোনাও। তিনি নিরাপদ আছেন কিনা। তারপর তাঁকে বলা হলো, তোমার স্বামীও শহীদ হয়েছেন। তিনি এ খবর শুনেও সেই একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলেন : হযরত নবী করীম (সা) কেমন আছেন, তাই বলো। ইতিমধ্যে হযরত নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকটে পৌছে গিয়েছিলেন। মহিলাকে বলা হলো–ঐ তো তিনি আসছেন। হযরত নবী করীম (সা)-এর চেহারা মুবারক দেখে মহিলা বললেন : আপনি যখন সুস্থ আছেন তখন সব মুসীবতই তুচ্ছ। এ যুদ্ধ মদীনা থেকে মাত্র তিন-চার মাইল দূরে সংঘটিত হয়। চুক্তিপত্র অনুসারে মদীনা মুনাওয়ারার ইয়াহূদীদের মুসলমানদের পক্ষে এবং মক্কা মুয়াযযামার কাফিরদের বিপক্ষে যুদ্ধ করা উচিত ছিল।

আব্দুল্লাহ ইব্ন উবায়্য-এর ফিরে আসার দরুন লোকসংখ্যা হ্রাস পাওয়ার পর কোন কোন সাহাবী নবী করীম (সা)-কে বলেছিলেন ইয়াহূদীদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করতে। কিন্তু

হযরত রাসূল করীম (সা) ইয়াহূদীদের নিকট সাহায্য চাওয়া পসন্দ করলেন না। সুতরাং ইয়াহূদীরা পরম আনন্দে নিজ নিজ গৃহে অবস্থান করলো এবং যুদ্ধের ফলাফল প্রত্যক্ষ করার অপেক্ষায় থাকলো। ইয়াহূদীদের মধ্যে মুখায়রিক নামক জনৈক ব্যক্তি তার সম্প্রদায়কে বললো যে, মুহাম্মদ (সা)-কে সাহায্য করা তোমাদের উপর ফরয। তারা বললো, আজ শনিবার, তাই আমরা যুদ্ধ করতে পারি না। মুখায়রিক বললেন, এটা আল্লাহ্র নবী ও কাফিরের মধ্যে যুদ্ধ। এতে শনিবার অন্তরায় হতে পারে না। একথা বলে তিনি তলোয়ার হাতে তুলে নিলেন এবং সোজা যুদ্ধের ময়দানে পৌঁছে গেলেন। যাবার সময় ঘোষণা করে গেলেন : 'আমি মারা গেলে মুহাম্মদ (সা)-কে দোষারোপ করবে না।' যুদ্ধে শরীক হলেন এবং নিহত হলেন। হযরত নবী (সা) শুনে বললেন, ইয়াহূদীদের মধ্যে সে উত্তম ব্যক্তি ছিল। হারিছ ইব্ন সুওয়ায়দ নামক জনৈক মুনাফিক মুসলমানদের সাথে যুদ্ধের ময়দানে গিয়েছিল। তুমুল যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর সে মুজযির ইব্ন যিয়াদ (রা) ও কায়স ইব্ন যায়দ (রা) নামে দু'জন মুসলমানকে শহীদ করে মক্কার দিকে পালিয়ে গেল। এর কিছুদিন পর সে মদীনায় ফিরে এলো এবং গ্রেফতার হয়ে হযরত উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা)-এর হাতে নিহত হলো। এ যুদ্ধে মুসলমানদের সবচেয়ে বড় ফায়দা হলো এই যে, তারা মুনাফিকদের ভাল করে চিনতে পেরেছেন। শত্রু ও মিত্রের মধ্যে তফাৎ করার সুযোগ হলো। মদীনায় পৌঁছার পর দিন অর্থাৎ তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসের রোববার হযরত নবী করীম (সা) হুকুম দিলেন, যারা গতকাল আমাদের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল, কেবল তারাই কাফিরদের সাথে মুকাবিলা করার জন্য যেন বের হয়। উহুদ যুদ্ধে যোগদান করেনি এরূপ নতুন কোন ব্যক্তিকে সঙ্গে নেয়ার অনুমতি ছিল না। শুধু হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা)-কে তিনি সঙ্গে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। সুতরাং উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সমস্ত সাহাবী এমনকি আহতরাও নবী (সা)-এর সঙ্গে মদীনা থেকে বের হলেন। তিনি মদীনা থেকে রওয়ানা হয়ে আট মাইল চলার পর হামরাউল আসাদ নামক স্থানে তাঁবু গাড়েন এবং তিন দিন পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। ঘটনাক্রমে মক্কাগামী মা'বাদ ইব্ন আবী মা'বাদ খুযাঈ মক্কার দিকে এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। রূহা নামক স্থানে পৌঁছে মুশরিকরা ভাবলো, এ যুদ্ধে আমাদের মুসলমানদের মুকাবিলায় কোনো বিজয় হয়নি। বড়জোর সমান সমান প্রতিদ্বন্দ্বিতা বলা চলে। কেননা, আমরা যদি বলি যে, আমরা বিজয়ী বেশে ফিরে এসেছি, তবে লোকেরা বলবে যে, তোমাদের সাথে মুসলমান বন্দীরা কোথায় ? তারপর জিজ্ঞেস করবে, গনীমতের মাল কোথায় ? কাজেই আমাদের নিকট যখন কোন বন্দী নেই, গনীমতের মালও নেই এবং ওয়ালীদ ইব্ন আদী, আবূ উমাইয়া ইব্ন আবী হুযায়ফা, হিশাম ইব্ন আবী হুযায়ফা, উবায়্য ইব্ন খালাফ, আবদুল্লাহ্ ইব্ন হুমায়দ আসাদী, তালহা ইব্ন আবী তালহা, আবূ সাঈদ ইব্ন আবী তালহা, মাসাফি' ও জিলাস নামক তালহার দুই পুত্র, আরতাত ইব্ন শারজীল প্রমুখ সতের জন বিখ্যাত কুরায়শ নেতা এবং পাঁচ-ছয়জন অপর বাহাদুর ব্যক্তিকে হারিয়ে এলাম, তখন আমাদেরকে বিজেতা বলবে কে ? অন্যদিকে, আমরা কেবল হামযা (রা), মুসআব (রা) প্রমুখের মতো তিন-চারজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিকেই কতল করতে পেরেছি। একথা চিন্তা করে সবার মত পাল্টে গেলো। নতুন করে আবার যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুতি চললো। আবূ সুফিয়ান সমুদয় সৈন্য নিয়ে 'রূহা' থেকে মদীনার উপর হামলা করার প্রস্তুতি নিল। ইত্যবসরে মা'বাদ ইব্ন আবী মা'বাদ রূহায় এসে পৌঁছলো। সে আবূ সুফিয়ানকে

তথ্য সরবরাহ করল যে, মুহাম্মদ (সা) মদীনা থেকে বের হয়ে তোমার পশ্চাদ্ধাবনে এগিয়ে আসছেন। হামরাউল আসাদে আমি তাদের সেনাবাহিনী দেখতে পেয়েছি। সম্ভবত খুব শীঘ্রই তাঁরা তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবেন। এ খবর শোনা মাত্রই কাফির বাহিনী হতবুদ্ধি হয়ে সেখান থেকে সোজা মক্কার দিকে ছুটে চললো। মক্কায় পৌঁছে তারা যেনো হাফ ছেড়ে বাঁচলো। হযরত নবী করীম (সা) যখন নিশ্চিত হলেন যে, কাফিররা হতবুদ্ধি হয়ে মক্কার দিকে পালিয়ে যাচ্ছে, তখন তিনি মদীনায় ফিরে এলেন। তাঁর এ যুদ্ধযাত্রা 'গাযওয়ায়ে হামরাউল আসাদ' নামে খ্যাত। এর ফলে কাফিরদের অন্তরে মুসলমানদের ভয় দৃঢ় হয় এবং মদীনা তাদের আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকে। উহুদ যুদ্ধে তীরন্দাজদের রাসূলে করীম (সা)-এর নির্দেশ পালনে ভুল বুঝাবুঝির দরুন মুসলিম পক্ষে বিপদ দেখা দেয়। তারা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। এই যুদ্ধ সম্পর্কে সাধারণভাবে মশহুর হয়ে আছে যে, মুসলিম পক্ষ পরাজিত হয়েছে। কিন্তু এটা অত্যন্ত বিরাট ভুল। মুসলমানগণ কাফিরদেরকে তাদের সম্মুখ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং কাফিররা পরাস্ত হয়েছিল। পরে তারা পুনরায় আক্রমণ করে। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও মুসলিম বাহিনী যুদ্ধের ময়দান ত্যাগ করেননি। কাফিররাই পরবর্তী বছরের জন্য যুদ্ধ মুলতবি করে এবং মুসলিম বাহিনী তাদের যুদ্ধ বিরতি মেনে নেয়। ময়দান থেকে প্রথমে কাফিররা মক্কার দিকে রওয়ানা হয়। তারপর মুসলমানগণ সেখান থেকে মদীনায় রওয়ানা করেন।

হামরাউল আসাদে মুসলমানদের আগমন সংবাদ পেয়ে কাফিররাই হতবুদ্ধি হয়ে পলায়ন করে। তবে এটা ঠিক যে, নিহত কাফিরদের তুলনায় মুসলিম শহীদদের সংখ্যা বেশী ছিল। এ হচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্রে সাধারণ ঘটনা। এই যুদ্ধের পর যিলহাজ্জ মাস পর্যন্ত এ বছর আর কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি। এ বছরই রমযান মাসের প্রায় মাঝামাঝি হযরত হাসান ইবন আলী (রা) জন্ম গ্রহণ করেন। উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের আঘাত প্রাপ্তির দরুন মদীনার মুনাফিক ও ইয়াহূদীরা খুব খুশী হয় এবং তাদের স্পর্ধা বেড়ে যায়। কিন্তু হযরত নবী করীম (সা) তাদের উপেক্ষার চোখেই দেখতে থাকেন।

শঠতা ও বিশ্বাসঘাতকতা

হিজরতের চতুর্থ বছর

চতুর্থ হিজরীর পয়লা মুহাররম হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট খবর পৌঁছলো যে, কুতন নামক স্থানে বনূ আসাদ গোত্রের বহু সন্ত্রাসী সমবেত হয়েছে। তারা মুসলমানদের উপর হামলা করার পাঁয়তারা করছে। তালহা ইব্ন খুওয়ায়লিদ ও সালামা ইব্ন খুওয়ায়লিদ তাদের দলপতি। এই খবর পেয়ে নবী (সা) আবূ সালামা মাখযূমীকে দেড়শত মুসলমান সমভিব্যাহারে তাদের শাস্তি বিধানকল্পে প্রেরণ করেন। আবূ সালামা (রা) কুতনে পৌঁছে জানতে পেলেন যে, শত্রুপক্ষ মুসলমানদের আগমন সংবাদ পেয়ে পূর্বেই পলায়ন করেছে। শত্রুপক্ষের কিছু গবাদিপশু মুসলমানদের হস্তগত হলো। সেগুলো নিয়ে আবূ সালামা (রা) মদীনায় ফিরে এলেন। আরাফাত উপত্যকার অদূরে আরাফা নামক একটি স্থান আছে। সেখানে সুফিয়ান ইব্ন খালিদ হাযলী নামক এক কট্টর কাফির বাস করতো। সে কাফিরদের একত্রিত করে মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি শুরু করলো। তাদের এই প্রস্তুতির খবর হযরত নবী

করীম (সা)-এর নিকট ধারাবাহিকভাবে পৌছতে শুরু করলো। তিনি চতুর্থ হিজরীর ৫ই মুহাররম সুফিয়ান ইব্‌ন খালিদ হাযলীর উদ্দেশ্যে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উনায়স (রা)-কে প্রেরণ করেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উনায়স (রা) দিবাভাগে লুকিয়ে থেকে এবং রাতের বেলায় চলতে চলতে আরাফায় গিয়ে উপস্থিত হন। সেখানে উপস্থিত হয়ে কৌশলে তার মস্তক কর্তন করেন এবং সেই মস্তক নিয়ে নিরাপদে চলে আসেন। আঠার দিন পর চতুর্থ হিজরীর ২৩ শে মুহাররম তিনি মদীনায় পৌছেন এবং মস্তকটি হযরত নবী করীম (সা)-এর কদম মুবারকের কাছে রেখে দেন। চতুর্থ হিজরীর সফর মাসে মক্কার কুরায়শরা 'আযাল ওকারা'র (বনূ আসাদের ভ্রাতৃ গোষ্ঠী) সাত ব্যক্তিকে অপকৌশল এঁটে হযরত নবী করীম (সা)-এর নিকট প্রেরণ করে। তারা মদীনায় পৌছে নবী করীম (সা)-কে বললো যে, আমাদের গোটা গোত্র ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আপনি আমাদের সাথে কয়েকজন মুআল্লিম (শিক্ষক) প্রেরণ করুন যাতে তাঁরা আমাদেরকে ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষা দান করতে পারেন। তিনি দশজন সাহাবী এবং ইব্‌ন খালদূনের মতে ছয়জন সাহাবীকে তাদের সাথে পাঠান। মারছাদ ইব্‌ন আবী মারছাদ গানাবী বা আসিম ইব্‌ন ছাবিত ইব্‌ন আম্বিনে আফলাহ্‌কে এই শিক্ষক দলের নেতা নিযুক্ত করেন। চলতে চলতে যখন তাঁরা হুযায়ল গোত্রের রাজী নামক পুকুর পাড়ে পৌছেন, তখন ঐ বিশ্বাসঘাতকরা হুযায়ল গোত্রের দু'শ' যুবককে ডেকে আনলো। এই গোত্রটিও প্রথম থেকেই ষড়যন্ত্রকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মুসলমানগণ যখন নিজেদেরকে কাফিরদের দ্বারা অবরুদ্ধ দেখতে পেলেন, তখন তারা সহসা সাহস সঞ্চার করে নিকটবর্তী পাহাড়ে উঠে গেলেন এবং সেখান থেকেই তাদের মুকাবিলা শুরু করেন। কাফিররা এই দশ ব্যক্তিকে সহজে বন্দী করা কঠিন ভেবে প্রতারণার আশ্রয় নিলো। তারা বললেন, আমরা তোমাদের পরীক্ষা করে দেখলাম যে, মক্কাবাসী যদি তোমাদের সাথে যুদ্ধে রত হয়, তবে তোমরা তাদের মুকাবিলায় টিকে থাকতে পারবে, কি পারবে না। মুসলমানরা তাদের উক্তি ও অঙ্গীকার বিশ্বাস করলো না। অবশেষে মুসলমানদের দুই ব্যক্তিকে জীবিত বন্দী করতে সক্ষম হয়। অন্যরা কাফিরদের সাথে লড়াই করে শাহাদত বরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন)।

এই দু'জন বন্দী সাহাবীর নাম ছিল হযরত খুবায়ব ইব্‌ন আদী ও হযরত যায়দ ইব্‌ন দাছনা (রা)। এই দু'জনকেই তারা মক্কায় নিয়ে গেলো। কুরায়শরা গ্রেফতারকারীদেরকে যথোপযুক্ত পুরস্কার দিয়ে দু'জনকেই হারিছ ইব্‌ন আমিরের গৃহে কয়েক দিন অভুক্ত অবস্থায় আবদ্ধ করে রাখলো। একদিন হারিছের একটি ছোট্ট শিশু ছুরি নিয়ে খেলতে খেলতে হযরত খুযায়ব (রা)-এর কাছে এসে পৌছলো। তিনি শিশুটিকে তাঁর উরুর উপরে বসালেন এবং ছুরিটিকে একটু দূরে সরিয়ে রাখলেন। শিশুর মা যখন দেখলো যে, শিশুটি তাদের বন্দীর নিকট পৌছে গেছে এবং ধারালো ছুরিও সেখানে বিদ্যমান, তখন সে জ্ঞানহারা হয়ে চিৎকার দিয়ে কান্না শুরু করলো। হযরত খুবায়ব (রা) বললেন, আমি তোমার শিশুকে কস্মিনকালেও হত্যা করবো না। তুমি নিশ্চিত থাক। এর কয়েক দিন পর হযরত যায়দ (রা)-কে সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া নিয়ে গেলেন এবং তার পিতার (যে বদরের যুদ্ধে নিহত হয়েছিল) রক্তের বদলা নেয়ার জন্য তার গোলাম নিসতাসের হাতে দিয়ে বললো, যাও, একে হরম এলাকার বাইরে নিয়ে হত্যা করবে। সে হযরত যায়দ (রা)-কে বাইরে নিয়ে গেলো। কুরায়শ ও মক্কাবাসী এই হত্যালীলা উপভোগ করার জন্য দলে দলে এসে সমবেত হলো। উপভোগকারীদের মধ্য থেকে আবূ সুফিয়ান

সামনে অগ্রসর হয়ে বললো, যায়দ! এখন তুমি ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত অবস্থায় নিহত হতে যাচ্ছ। তুমি কি এটা পসন্দ করবে যে, এ সময় তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের মধ্যে আরামে থাকবে, আর আমরা তোমার পরিবর্তে মুহাম্মদ (সা)-এর গর্দান মারবো (নাউযুবিল্লাহ)। হযরত যায়দ (রা) অতি ইস্পাত কঠিন ভাষায় ও বীরদর্পে জবাব দিলেন : আল্লাহ্‌র কসম! আমি এটা কখনো পসন্দ করবো না যে, আমি আমার পরিবার-পরিজনের মধ্যে থাকবো আর হযরত নবী করীম (সা)-এর শরীরে একটি কাঁটাও বিদ্ধ হবে। আবূ সুফিয়ান বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি আজ পর্যন্ত কারো এমন কোন বন্ধু দেখিনি যেমনটি দেখলাম মুহাম্মদ (সা)-এর বন্ধুকে। এরপর হযরত যায়দ (রা)-কে শহীদ করা হলো। হযরত খুবায়ব (রা)-কে নিয়েছিল হুজায়র ইব্‌ন আবী আবাব।

হযরত যায়দ (রা)-এর পর হযরত খুবায়র (রা) বধ্যভূমিতে নীত হলেন। তিনি দু'রাকআত সালাত আদায় করার অনুমতি চাইলেন এবং অনুমতি লাভ করলেন। তিনি উযূ করেন এবং দু'রাকাআত সালাত আদায় করেন। সালাতের পর তিনি মুশরিকদের বললেন : আমার সালাত অনেক দীর্ঘ করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তোমরা বলবে যে, আমি মৃত্যুকে ভয় করছি এবং মৃত্যুভয়ে সালাতকে বাহানা হিসাবে দীর্ঘায়িত করছি। তাই আমি দ্রুত সালাত শেষ করে ফেলেছি। মুশরিকরা হযরত খুবায়ব (রা)-কে শূলের উপর ঝুলিয়ে দিল এবং চতুর্দিক থেকে বল্লম দিয়ে তাঁর শরীরকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ছিদ্র করতে থাকলো। এইভাবে ক্ষত-বিক্ষত হতে হতে এক সময় তাঁর প্রাণবায়ু নশ্বর দেহ ত্যাগ করলো। হযরত খুবায়ব (রা) যে বীরত্বের সাথে জীবন দান করলেন, তার দৃষ্টান্ত বিশ্ব ইতিহাসের কোথাও পাওয়া যাবে না।

মর্মান্তিক ঘটনা

কয়েক দিন পর চতুর্থ হিজরীর এই সফর মাসেই আবূ বারা' আমির ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন কিলাব ইব্‌ন রবীআ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন সা'সাআ নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সল্লামের কাছে এসে উপস্থিত হলো। তিনি তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। সে ইসলাম গ্রহণও করলো না আর ইসলামকে ঘৃণার দৃষ্টিতেও দেখলো না। বরং বললো, আমি আমার গোত্রের কথা ভাবছি। আপনি কয়েকজন লোক আমার সাথে প্রেরণ করুন। তারা নজদে গিয়ে আমার গোত্রকে ইসলামের দাওয়াত দেবেন ও শিক্ষা প্রদান করবেন। তিনি বললেন, আমি নজদবাসীদের তরফ থেকে মুসলমানদের ক্ষতির আশংকা করছি। আবূ বারা' বললেন, আপনি এ বিষয়ে মোটেই আশংকা করবেন না। আমি এঁদের আমার পৃষ্ঠপোষকতা দান করবো। নবী (সা) মুনযির ইব্‌ন আমর সামিদীকে সত্তরজন সাহাবীসহ প্রেরণ করেন। এঁরা সবাই ছিলেন কারী ও কুরআন করীমের হাফিয।

এঁরা যখন বনূ আমির ও বনূ সুলায়মের মধ্যবর্তী বীরই মাউনায় পৌঁছেন, তখন হযরত নবী (সা)-এর চিঠি হারাম ইব্‌ন মিলহান (রা)-এর মাধ্যমে আমির ইব্‌ন তুফায়লের নিকট পৌঁছলো। এই আমির ইব্‌ন তুফায়ল ছিল উপরোক্ত আবূ বারা' আমির ইব্‌ন মালিকের ভ্রাতুষ্পুত্র। সে এই চিঠিটা পাঠ পর্যন্ত করল না বরং হযরত হারাম ইব্‌ন মিলহানকে শহীদ করে দিলো। তারপর তার স্বগোত্র বনূ আমিরকে ঐসব মুসলমানকে হত্যা করতে উদ্বুদ্ধ করলো। কিন্তু বনূ আমির তাতে রাযী হলো না। তখন সে বনূ সালীমকে তাঁদের হত্যা করতে বললো।

বনূ সুলায়ম নেতা গাল্ল, যাকওয়ান ও উমাইয়া প্ররোচিত হলো এবং বিনা দোষে এই দুর্বৃত্তরা সবাইকে শহীদ করে দিলো। আবূ বারা' আমির ইব্ন মালিক এই দুর্ঘটনায় খুব মর্মাহত হলেন। কারণ, তার আমান (নিরাপত্তা) দানের মধ্যে তার ভ্রাতুষ্পুত্র ব্যাঘাত সৃষ্টি করলো। এই মনোকষ্টে তিনি কয়েক দিন পর মারা গেলেন। আমির ইব্ন তুফায়ল হযরত আমর ইব্ন উমাইয়া হামারীকে বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর তাঁর দাড়ি মুণ্ডিয়ে তাকে ছেড়ে দিয়েছিল। কেননা, তার মা একটি গোলাম আযাদ করার মানত করেছিল। আমির ইব্ন তুফায়েল এই মানত পুরা করার জন্য তাঁকে ছেড়ে দিলো। তিনি যখন মুক্তি পেয়ে বীর-ই মাউনা হয়ে মদীনা আগমন করছিলেন, তখন পথিমধ্যে বনূ আমিরের দু'জন লোকের সাথে সাক্ষাৎ হলো। আমর ইব্ন উমাইয়া হামারী (রা) তাদেরকে দুশমন মনে করে এবং সুযোগ পেয়ে প্রতিশোধ স্বরূপ হত্যা করলেন। মদীনা উপস্থিত হয়ে নবী করীম (সা)-কে সমস্ত বৃত্তান্ত খুলে বললেন। তিনি একমাস পর্যন্ত ঐ নরঘাতকদের বিরুদ্ধে বদ দু'আ করলেন। আমির ইব্ন তুফায়ল এক মাস পর প্লেগে মারা গেলো।

প্রতিশ্রুতি পালন

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সল্লাম যখন আমর ইব্ন উমাইয়া কর্তৃক পথিমধ্যে ঐ দুই ব্যক্তিকে হত্যা করার কাহিনী শুনলেন, তখন বললেন, ঐ দু'ব্যক্তি তো আমাদের যিম্মায় ছিল এবং আমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। এখন তাদের রক্তপণ দেয়া আবশ্যক। ইয়াহূদীদের বনী নাযীর গোত্র ছিল বনূ আমির গোত্রের মিত্রপক্ষ। এদিকে মুসলমানদের সাথেও ছিল তারা সন্ধিবদ্ধ। তাই রক্তপণ আদায়ে তাদের সাহায্যে করা ছিল কর্তব্য। এ জন্য হযরত নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এই রক্তপণের ব্যাপারে বনূ নাযীরের সাথে পরামর্শ করা প্রয়োজন মনে করলেন এবং এই উদ্দেশ্যে তাদের মহল্লা বা বস্তিতে স্বয়ং উপস্থিত হলেন। তাঁর সাথে হযরত আবূ বকর (রা), হযরত উমর (রা) ও হযরত আলী (রা)-ও গেলেন। বনূ নাযীর তাঁর আগমনের বাহ্যত রক্তপণে শরীক হতে প্রস্তুত বলে মত প্রকাশ করলো। তাঁকে তাদের দুর্গপ্রাচীরের ছায়ায় বসালো এবং মানুষজন সংগ্রহ ও ডাকার অজুহাতে এদিক-ওদিক চলে গেলো। তারা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে এমন এক স্থানে বসিয়েছিল যে, ঐ স্থান বরাবর দুর্গপ্রাচীরের উপর একটি মস্তবড় পাথর দেয়ালের মতো খাড়া করে রাখা ছিল। তারা তাঁর থেকে দূরে গিয়ে পরামর্শ করলো যে, এটা একটা মোক্ষম সুযোগ। কোন এক ব্যক্তি দুর্গের উপর আরোহণ করে উপর থেকে এই পাথরটি ধাক্কা দিয়ে যদি ফেলে দেয় তাহলেই মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর তিন সঙ্গী পিষ্ট হয়ে যাবে।

ইয়াহূদীর দুরভিসন্ধি

জনৈক আমর ইব্ন মুহাসিন ইব্ন কা'ব নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সল্লামের উপর পাথর গড়িয়ে ফেলার জন্য তৎক্ষণাৎ উপরে আরোহণ করলো। সে পাথর গড়িয়ে না ফেলতেই আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সল্লামকে ওয়াহীর মাধ্যমে ইয়াহূদীদের এই দুরভিসন্ধি সম্পর্কে অবহিত করলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং সাহাবায়ে কিরামকে সঙ্গে নিয়ে মদীনার দিকে রওয়ানা হলেন। ইয়াহূদীরা তাঁকে পুনরায় ডেকে পাঠালো। তিনি বললেন, তোমরা আমাদের হত্যা করার জন্য ষড়যন্ত্র করেছ। এখন তোমাদের

উপর আমাদের কোন আস্থা নেই। ইয়াহূদীরা তাদের এই ষড়যন্ত্রের কথা অস্বীকারও করলো না, অনুতাপও প্রকাশ করলা না। হযরত নবী (সা) মদীনায় পৌঁছে তাদের কাছে বার্তা পাঠালেন। পুনরায় চুক্তিপত্র লিখে নাও। তারা চুক্তিপত্র লিখতে অস্বীকার করলো। তিনি পুনরায় তাদের নিকট বার্তা পাঠান : চুক্তিপত্র না লিখলে তোমরা মদীনা থেকে দশ দিনের মধ্যে দেশান্তরিত হয়ে অন্যত্র চলে যাও। বনূ নাযীর এর প্রত্যুত্তরে দেশান্তরিত হতে অস্বীকার করলো এবং যুদ্ধের জন্য তৈরী হলো। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামও সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে তাদের উপর চড়াও হলেন। বনূ নাযীর তাদের দুর্গের মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে পড়লো। তিনি অবরোধ করে রাখলেন। পনেরো দিন পর্যন্ত এ অবরোধ অব্যাহত থাকলো। মদীনার মুনাফিকরা এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়্য বনূ নাযীরের কাছে বার্তা পাঠালো, আমরা তোমাদের শরীকদার। তোমরা যদি দুর্গ থেকে বের হয়ে ময়দানে যুদ্ধ কর, তাহলে আমরাও তোমাদের সাথে মিলে মুসলমানদের হত্যা করবো। তোমরা যদি দেশান্তরিত হতে চাও, তাহলে আমরাও তোমাদের সাথে মদীনা ত্যাগ করে দেশান্তরে চলে যাবো।

বনূ নাযীরের দেশান্তর

মুনাফিকদের এই পৃষ্ঠপোষকতা ও উস্কানি প্রদানে বনূ নাযীরের শক্তিও বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু শেষে পনেরো দিনের অবরোধ ও মুকাবিলায় ফল এই দাঁড়ালো, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়্যের মাধ্যমে প্রস্তাব পাঠালো যে, আমাদের জীবনের নিরাপত্তা দান করলে আমরা দেশান্তরিত হতে প্রস্তুত। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হুকুম দিলেন–অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া তোমরা তোমাদের যে মাল আসবাব উটের উপর করে নিয়ে যেতে পার তা নিয়ে মদীনা থেকে চলে যাও। সে মতে তারা অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া যে পরিমাণ মাল উটের উপর বহন করে নিতে পারলো নিয়ে গেলো। যাওয়ার সময় তারা তাদের ঘরদোর নিজেরাই ভেঙে ফেললো এবং ঘরের মটকা প্রভৃতি তৈজসপত্র চূর্ণবিচূর্ণ করলো। মদীনা থেকে বের হয়ে তারা কতক খায়বার চলে গেলো এবং কতক সিরিয়ায় গিয়ে বসতি স্থাপন করলো। হযরত নবী করীম (সা) তাদের অবশিষ্ট মালামাল, সহায়-সম্পত্তি ও অস্ত্রশস্ত্র মুহাজিরদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। আনসারদের মধ্য থেকে শুধু হযরত আবূ দুজানা (রা) ও সাহল ইব্ন হুনায়ফ এই মালে গনীমতের অংশ পেলেন। কেননা এই দু'জনও খুব গরীব ও অভাবগ্রস্ত ছিলেন। ইয়াহূদীদের মধ্য থেকে ইয়ামীন ইব্ন উমায়র (রা) ও সাঈদ ইব্ন ওয়াহব (রা) ইসলাম গ্রহণ করলেন। এজন্য তাদের মাল-আসবাব ও যুদ্ধাস্ত্রের উপর কোনো রকম হস্তক্ষেপ করা হলো না। এ যুদ্ধ গাযওয়া বনূ নাযীর নামে প্রসিদ্ধ। এটি চতুর্থ হিজরীর রবীউল আউয়াল মাস অর্থাৎ উহুদ যুদ্ধের পূর্ণ ছয় মাস পর সংঘটিত হয়। সূরা হাশ্‌র এই যুদ্ধের সময়ই অবতীর্ণ হয়। এই ঘটনার পর হযরত নবী করীম (সা) মাসাধিককাল মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থান করেন।

গাযওয়া যাতুর রিকা'

এই সময় বনূ মাহারিব ও বনূ ছা'লাবা (গাতফান গোত্রের দু'টি শাখা) সম্পর্কে উপর্যুপরি খবর আসলো যে, তারা সন্ত্রাসে প্রবৃত্ত ও আক্রমণ প্রস্তুতিতে লিপ্ত। হযরত নবী করীম (সা) হযরত উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা)-কে মদীনায় শাসনকর্তা নিয়োগ করে মাত্র চারশ' সাহাবাসহ তাদের মুকাবিলায় বের হলেন। প্রতিপক্ষ একটি খেজুর বাগানে সমবেত হয়েছিল। ইসলামী

লশকর যখন তাদের নিকটবর্তী হলো, তখন তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করলো। কোনো যুদ্ধ হলো না। এ অভিযানের নাম গাযওয়া যাতু'র রিকা'। চতুর্থ হিজরীর জমাদিউল আউয়াল মাসে এটি সংঘটিত হয়। 'যাতু'র রিকা' নামকরণের কারণ হলো, পার্বত্য ও কংকরময় যমীনে সফর করার দরুন সাহাবায়ে কিরামের পা যখম হয়ে গিয়েছিল। তাঁরা পায়ে কাপড় বেঁধে নিয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেন, যাতু'র রিকা' একটি পাহাড়ের নাম। হযরত নবী (সা) নজদে গিয়ে এই পাহাড়ে অবস্থান করছিলেন। তখন কাফিররা তাঁকে দেখে পলায়ন করেছিল।

গাযওয়া সাবীক

নজদের এই অভিযান থেকে ফিরে এসে প্রায় তিন মাসকাল হযরত মুহাম্মদ (সা) মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থান করেন। আবূ সুফিয়ান উহুদ যুদ্ধে বলে গিয়েছিল, আগামী বছর বদর প্রান্তরে আবার যুদ্ধ হবে। মুসলমানগণ সে প্রস্তাব মেনে নিয়েছিলেন। মদীনার মুনাফিকরা রাত-দিন মুসলমানদের ক্ষতি করার চিন্তায় লিপ্ত থাকত। তারা নাঈম ইব্‌ন মাসঊদকে মক্কায় প্রেরণ করলো। উদ্দেশ্য কুরায়শদের উহুদের প্রস্তাব স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা। নাঈম আবূ সুফিয়ানকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রস্তুত হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করলো। মক্কায় ঐ বছর কিছুটা দুর্ভিক্ষ ও অভাব-অনটন ছিল। আবূ সুফিয়ান বললো, আমরা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছি। কিন্তু তুমি একটি কাজ করবে। মদীনায় গিয়ে আমাদের বিরাট যুদ্ধ প্রস্তুতির কথা শোনাবে এবং মুসলমানদের মনে ত্রাস সঞ্চার করবে যাতে তারা মদীনা থেকে বের না হয় আর এ বছর যুদ্ধ না হয়। তুমি যদি এ কাজটি করতে পার, তাহলে তোমাকে বিশটি উট পুরস্কার দেয়া হবে। নাঈম মদীনায় এসে খুব ফলাও করে কুরায়শদের যুদ্ধ প্রস্তুতির কথা সর্বত্র প্রচার করতে শুরু করলো। এই প্রচারণা শ্রবণ করে মুসলমানরা কতকটা চিন্তান্বিত হয়ে পড়লেন। কিন্তু হযরত উমর ফারূক (রা) হযরত নবী করীম (সা)-এর নিকট গিয়ে বললেন, আপনি আল্লাহ্‌র সত্য রাসূল! তবু মুসলমানরা এই খবর শুনে ঘাবড়াচ্ছে কেন? হযরত মুহাম্মদ (সা) বললেন, একজন লোকও যদি আমার সাথে না যায়, তবু আমি একাকী ওয়াদা মতো কাফিরদের মুকাবিলায় বদর প্রান্তরে গিয়ে উপস্থিত হবো। এরপর তিনি যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলেন এবং বদরের দিকে রওয়ানা হলেন। তাঁর সাথে দেড় হাজার সাহাবা ছিলেন। রওয়ানার সময় তিনি আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা)-কে মদীনায় শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন। এবার তিনি তাঁর বাহিনীর ঝাণ্ডা সোপর্দ করেছিলেন হযরত আলী (রা)-কে। সমগ্র বাহিনীতে এবার দশটি ঘোড়া ছিল। আবূ সুফিয়ান যুদ্ধ থেকে জান বাঁচাতে ও পাশ কাটাতে চেয়েছিল। কিন্তু সে যখন নবী করীম (সা)-এর মদীনা থেকে রওয়ানা হওয়ার কথা জানতে পারলো, তখন মক্কা থেকে দু'হাজার যুদ্ধবাজ সৈন্য নিয়ে যাত্রা করলো। দুর্ভিক্ষের কারণে ঐ সৈন্যদের কাছে খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে সামান্য ছাতু ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এজন্য ঐ সৈন্যবাহিনীর নাম 'জায়শু'স সাবীক' (ছাতু বাহিনী) নামে মক্কায় প্রসিদ্ধি লাভ করে।

আবূ সুফিয়ানের বাহিনীতে এবার পঞ্চাশজন ঘোড়সওয়ার ছিল। এই দু'হাজার সৈন্য যখন 'উসফান' নামক স্থানে পৌঁছলো, তখন জানতে পারল যে, মুসলিম বাহিনীতে দেড় হাজার জানবাজ সৈন্য রয়েছে। মক্কাবাসী বদর ও উহুদ যুদ্ধে দেখেছিল যে, এক-তৃতীয়াংশ ও এক-চতুর্থাংশ মুসলমানের কাছেও তাদের পরাজয় মানতে হয়েছে। এবার যদিও মুসলমান সংখ্যায় কম অর্থাৎ মাত্র তিন-চতুর্থাংশ ছিল, কিন্তু এই সংখ্যার কথা শুনে কাফিরদের আক্কেল

গুড়ুম হয়ে গেলো এবং 'উসফান' থেকেই এই কথা বলে মক্কা প্রত্যাবর্তন করলো যে, আমরা দুর্ভিক্ষের সময় যুদ্ধ করা পসন্দ করি না। এই বাহিনী যখন রাস্তা থেকেই মক্কায় ফিরে গেলো, তখন মক্কার মহিলারা বললো, তোমরা কেবল ছাতু খাওয়ার জন্যই গিয়েছিলে। যুদ্ধ করার জন্য গিয়ে থাকলে ফিরে এলে কেন?

হযরত নবী করীম (সা) বদর প্রান্তরে উপস্থিত হয়ে আট দিন পর্যন্ত কাফিরদের অপেক্ষা করলেন। অষ্টম দিন মা'বাদ ইব্ন আবী মা'বাদ খুযাঈ এসে জানালো, আবূ সুফিয়ান মক্কা থেকে রওয়ানা হয়ে উসফান নামক স্থানে পৌঁছে পুনরায় মক্কায় ফিরে গেছে। হযরত রাসূলে করীম (সা) একথা শুনে বদর থেকে মদীনা মুনাওয়ারা চলে এলেন। চতুর্থ হিজরীর রজব মাসের শেষ দিকে এ ঘটনা ঘটে। এই অভিযান 'গাযওয়া বদর মাওয়িদ', 'গাযওয়া বদর ছানী', 'গাযওয়া বদর সুগ্রা' ও 'গাযওয়া বদর উখরা' নামে মশহুর। এ অভিযানে মুসলমানরা গনীমতের মাল না পেলেও এই সময় যেহেতু বদর প্রান্তরে মেলা বসার প্রচলন ছিল তাই তারা তেজারতের মাধ্যমে লাভবান হলেন।

হযরত নবী (সা) শা'বান মাসে মদীনায় ফিরে এলেন। এই বছরই ইমাম হুসায়ন ইব্ন আলী (রা) জন্মগ্রহণ করেন। এই বছরই মদ হারাম হয়। এই বছরই হযরত নবী করীম (সা)-এর দৌহিত্র আবদুল্লাহ ইব্ন উসমান (রা) ছয় বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। এই শিশুটির মৃত্যুর কারণ ছিল এই যে, মোরগে চোখের মধ্যে থাবা মেরেছিল। আর যন্ত্রণা থেকে তাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। এই বছরই উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নব বিন্ত খুযায়মা ইনতিকাল করেন। এই বছরই হযরত নবী করীম (সা) আবূ সালামা মাখ্যূমীর ইনতিকালের পর তার বিধবা স্ত্রী হযরত উম্মে সালামা (রা)-কে বিবাহ করেন। হযরত ফাতিমা বিন্ত উসায়দ (রা) হযরত আলী (রা)-এর মাও এই বছর ইনতিকাল করেন।

হিজরতের পঞ্চম বছর

গাযওয়া বদর ছানী থেকে প্রত্যাবর্তন করে হযরত নবী করীম (সা) ছয়-সাত মাস মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থান করেন। এ সময় কোনো উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেনি। পঞ্চম হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসের প্রথম দিকে হযরত নবী করীম (সা) জানতে পারেন যে, দূমাতুল জান্দালের শাসনকর্তা আকীদার ইব্ন মালিক ঈসায়ী মদীনা মুনাওয়ারা আক্রমণ করার জন্য এক বিরাট বাহিনী একত্রিত করেছে এবং মদীনা থেকে সিরিয়াগামী বাণিজ্য কাফেলাকে পথিমধ্যে লোপাট করেছে। এই নয়া দুশমন অধিক মারাত্মক হতে পারে এবং তাদের হামলার ফলে মুনাফিক, ইয়াহূদ ও আশেপাশের আরব গোত্রগুলো মুসলমানদের সংকট আরো বাড়িয়ে তুলতে পারে এই আশংকায় হযরত নবী করীম (সা) এই ফিতনাকে মাথাচাড়া দেয়ার আগেই দমন করা প্রয়োজনবোধ করলেন। তিনি মদীনায় সাব্বা' ইব্ন আরফাতা গিফারী (রা)-কে শাসক নিযুক্ত করে স্বয়ং এক হাজার মুসলিম সৈন্য সমভিব্যাহারে দুমাতুল জান্দাল অভিমুখে যাত্রা করলেন। দুমাতুল জান্দাল দামেশক থেকে পাঁচ মনযিল ও মদীনা থেকে দশ মন্যিল দূরে দামেশক ও মদীনার মধ্যবর্তী সিরিয়া সীমান্তে অবস্থিত ছিল। বান আয্রার নামক জনৈক ব্যক্তিকে তিনি পথ প্রদর্শক হিসাবে সঙ্গে নিলেন। এ অভিযাত্রায় তিনি রাতের বেলা পথ চলতেন ও দিনের বেলা তাঁবুতে অবস্থান করতেন। যখন দুমাতুল জান্দালে পৌছতে আর মাত্র

একরাতের পথ বাকী ছিল, তখন পথ প্রদর্শক বললো, দুশমনের চারণভূমি এখান থেকে নিকটেই। তাদের পশুগুলো এখনি করায়ত্ত করা উচিত। হযরত নবী (সা) অনুমতি দিলেন। দুমাতুল জান্দালের শাসনকর্তা আকীদর ইব্ন মালিক যখন এ খবর জানতে পারলো, তখন মুসলিম বাহিনীর আকস্মিক হামলায় ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেলো। হযরত নবী (সা) পরদিন সেখানে পৌঁছে দেখতে পেলেন ময়দান একেবারেই শূন্য। মুহাম্মদ ইব্ন সালামা (রা) একজন কাফিরকে বন্দী করলেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হলে সে পরিষ্কার বলে দিল, হযরত নবী করীম (সা)-এর আগমন সংবাদ পেয়ে তারা সবাই পালিয়ে গেছে। তিনি সেখানে কয়েক দিন অবস্থান করে ছোট্ট ছোট্ট বাহিনী এদিক-ওদিক প্রেরণ করলেন। কিন্তু কেউ মুকাবিলা করতে এগিয়ে এলো না। এভাবে সিরিয়া সীমান্তে ভীতি কায়েম করে তিনি মদীনা প্রত্যাবর্তন করেন। পথিমধ্যে এক আরব সরদার এসে হযরত নবী করীম (সা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং বলেন, আমার এলাকায় অনাবৃষ্টির দরুন ঘাস তৃণলতা পাওয়া যাচ্ছে না। মদীনায় বৃষ্টিপাত হয়েছে, তাই সেখানে প্রচুর ঘাস জন্মেছে। আপনি অনুমতি দিলে আমি আমার পশুগুলো মদীনার চারণভূমিতে চরানোর জন্য পাঠিয়ে দেবো। তিনি তাকে সানন্দে অনুমতি দেন। এই আরব সরদারের নাম ছিল উয়ায়না ইব্ন হুসায়ন। এই গাযওয়া দুমাতুল জান্দাল নামে পরিচিত। এবার মদীনায় ফিরে আসার পর প্রায় পাঁচ মাস পর্যন্ত কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা প্রকাশ পায়নি। হযরত নবী করীম (সা) সাহাবায়ে কিরামের তরবিয়াত (প্রশিক্ষণ) দান ও তাবলীগের কাজে মশগুল হন।

গাযওয়া বনূ মুসতালিক

পঞ্চম হিজরীর শা'বান মাসে খবর পৌঁছলো, বনূ মুসতালিকের সরদার হারিছ ইব্ন দারার যুদ্ধের আয়োজনে ব্যস্ত। আরবের অন্যান্য গোত্রকেও সে তার দলভুক্ত করছে। মুসলমানদের উপর হামলা করার জন্য সে তাদেরকে আহবান জানাচ্ছে। হযরত নবী করীম (সা) প্রকৃত অবস্থা অবগত হওয়ার জন্য হযরত বুরায়দা ইব্ন হাসীব আস্লামী (রা)-কে দূত হিসাবে প্রেরণ করেন। হযরত বুরায়দা (রা) ফিরে এসে জানালেন যে, হারিস ইব্ন দারার ইসলাম ও মুসলমানদের মূলোচ্ছেদ করার জন্য বদ্ধপরিকর। সে বহু গোত্রকে নিজের দলভুক্ত করেছে এবং কোন মতেই যুদ্ধ ও আক্রমণ থেকে বিরত থাকতে নারায। প্রায় একই সাথে খবর আসলো যে, হারিস তার সৈন্য-সামন্ত নিয়ে যাত্রা করছে। হযরত নবী করীম (সা) কালবিলম্ব না করে মুসলমানদের প্রস্তুত হওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন এবং মদীনায় হযরত যায়দ ইব্ন হারিছা (রা)-কে প্রশাসক নিযুক্ত করে মুসলিম বাহিনীর সাথে রওয়ানা হলেন। এ বাহিনীতে ত্রিশটি ঘোড়া ছিল। মুহাজিরদের দশটি এবং আনসারদের বিশটি। মুহাজির ও আনসারদের পৃথক পৃথক ঝাণ্ডা ছিল। আনসারদের ঝাণ্ডা ছিল হযরত সা'দ ইব্ন উবাদা (রা)-এর হাতে এবং মুহাজিরদের নিশানবরদার ছিলেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)। হযরত উমর ফারূক (রা)-কে মুকাদ্দামাতুল জায়শ (অধিনায়ক) নিযুক্ত করা হলো। যেহেতু উপর্যুপরি কয়েকটি অভিযানে মুসলমানদের বিজয় লাভ করতে দেখা গিয়েছিল, তাই এবার গনীমতের মালের লোভে মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়্যও তার দলসহ শরীক হলো।

এ মুনাফিকরা যেহেতু নিজেদেরকে মুসলমান বলেই দাবী করতো, সেহেতু তাঁরা সমস্ত ইসলামী সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতো এবং মুসলিম বাহিনীতে যোগদান করার ক্ষেত্রেও এদের

নিষেধ করা হতো না। এই প্রথমবারের মতো আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবায়্য ও তার মুনাফিক দল মুসলিম বাহিনীর পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য রওয়ানা করলো। উহুদ যুদ্ধে তো এরা যাত্রাপথ থেকেই ফিরে এসেছিল এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। হারিস ইব্‌ন দারার একজন গুপ্তচর প্রেরণ করেছিল। এই গুপ্তচরটি পথিমধ্যে হঠাৎ মুসলিম বাহিনীর নাগালে এসে পড়লো এবং গ্রেফতার হয়ে হযরত নবী করীম (সা)-এর নিকট নীত হলো। তার গুপ্তচর হওয়া যখন নিশ্চিত হলো এবং ইসলাম গ্রহণ করতেও সে অস্বীকার করলো, তখন আরবের প্রচলিত রীতি ও যুদ্ধনীতি অনুযায়ী তাকে হত্যা করার নির্দেশ জারি করা হলো। সে নিহত হলো। হারিস যখন তার গুপ্তচরের নিহত হওয়া ও নবী করীম (সা)-এর সান্নিকট পৌঁছার খবর পেলো, তখন সে খুব অস্থির ও হতবুদ্ধি হয়ে পড়লো।

অবশেষে হযরত নবী করীম (সা) হযরত উমর ফারূক (রা)-কে বললেন যে, তুমি সামনে অগ্রসর হয়ে তাকে ইসলামের দাওয়াত দাও। হযরত উমর ফারূক (রা) সামনে অগ্রসর হয়ে তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। সে তা তীব্রভাবে প্রত্যাখ্যান করলো। এরপর উভয় পক্ষ থেকে হামলা শুরু হলো। কাফিরদের পতাকাধারী হযরত আবূ কাতাদা (রা) কর্তৃক নিহত হলো। পতাকাধারী ধরাশায়ী হওয়ার সাথে সাথেই কাফিরদের পা ফসকে গেল এবং তারা যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে মুসলমানদের সম্মুখ থেকে পলায়ন করলো। কাফিরদের মধ্যে যারা বন্দী হলো, তাদের মধ্যে প্রধান সেনাপতির কন্যা জুওয়ায়রিয়াও ছিল। গনীমতেরও অঢেল মালামাল মুসলমানদের হস্তগত হলো। ইয়াহূদ বনূ মুসতালিকের সাথে 'মারীসী'তে যে যুদ্ধ হয়েছিল, তা ছিল মদীনা মুনাওয়ারা হতে নয় মনযিল দূরে অবস্থিত।

মুনাফিকদের ধৃষ্টতা

ফেরার পথে মুনাফিকরা তাদের গোপন শত্রুতাবশত এমন কিছু কূটকৌশল অবলম্বন করলো যে, কোন কোন মুহাজির ও আনসারের মধ্যে মনোমালিন্য ও তিক্ততার সৃষ্টি হয়ে গেলো। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায়্য আনসার ও মুহাজিরের প্রশ্নটি খুব ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তুললো এবং এমনকি সে এরূপ মন্তব্যও করে বসলো যে, মদীনায় গিয়ে এইসব মুহাজিরকে মদীনা থেকে বের করে দেয়া হবে। এই অভিযানে আরো একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ঘটে গেল। হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা)-ও হযরত নবী করীম (সা)-এর সফরসঙ্গিনী ছিলেন। একটি মনযিলে মুসলিম বাহিনী অবস্থান নিলো। সেখান থেকে প্রস্থান করার সময় হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা)-এর হাওদা উটের উপর রেখে দেয়া হলো। তিনি হাওদার মধ্যে আছেন, কি নেই তা অনুমান করা হয়নি। অথচ তিনি তখন প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর কিছুটা দেরী হয়ে যায়। তিনি তাঁর সহোদরার একটি হার পরেছিলেন। ঘটনাচক্রে ঐ হারের সুতা কোন এক ঝোপে আটকে গিয়ে ছিঁড়ে যায় এবং মুক্তাগুলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে। অপরের জিনিস বলে তিনি একটু বেশী মনোযোগ দিলেন। যমীনের উপর থেকে মুক্তাগুলো কুড়িয়ে নিতে বেশী লেগে গেলো। কিন্তু লোকজন ইতিমধ্যে রওয়ানা হয়ে গেলো। ফিরে এসে তিনি দেখতে পেলেন যে, মনযিল একেবারে ফাঁকা। খুব চিন্তিত ও বিচলিত হলেন। ইত্যবসরে হযরত সাফওয়ান ইব্‌ন মু'আত্তাল (রা)-কে দেখা গেলো পেছন দিক থেকে তার উট নিয়ে চলে আসতে। হযরত সাফওয়ান ইব্‌ন মু'আত্তাল (রা)-এর প্রতি নির্দেশ ছিল সবার

পেছনে অবস্থান করার এবং কাফেলা প্রস্থান করার পর মনযিল পরিদর্শন করে রওয়ানা করার, যাতে কারো কোন জিনিস পড়ে থাকলে তা তুলে আনতে পারেন এবং কারো কোন প্রকার ক্ষতি না হতে পারে। হযরত সাফওয়ান (রা)-কে এই দায়িত্ব দেয়ার কারণ হলো তিনি ছিলেন বেশী ঘুম-কাতুরে লোক। তিনি দেরীতে ঘুম থেকে জাগ্রত হতেন। নিয়মানুসারে হযরত সাফওয়ান (রা) অবস্থানস্থল পরিদর্শন করতে করতে চলে আসছেন। ইত্যবসরে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা)-কে দেখতে পেয়ে বিস্মিত ও হতভম্ব হয়ে যান। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর উট থেকে অবতরণ করে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা)-কে উটের উপর বসালেন। তারপর তিনি উটের রশি ধরে পথ চলেন এবং বাহিনীর সাথে গিয়ে মিলিত হন। তিনি যখন এইভাবে বাহিনীর সাথে গিয়ে মিলিত হলেন এবং লোকেরা এই ঘটনা জানতে পারলো, তখন তারা সবাই দুঃখ ও বিস্ময় প্রকাশ করলো। মুনাফিকরা কথা বানানো ও অপবাদ রটানোর এক মোক্ষম অস্ত্র পেয়ে গেলো। তারা নানা রকম কথা বানিয়ে লোকজনের মধ্যে এক তুফান সৃষ্টি করলো। হযরত নবী (সা) খুব কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও নীরব হয়ে গেলেন।

মোটকথা, মুনাফিকরা এবার মুসলিম বাহিনীর সাথে যোগদান করে মুসলমানদেরকে নিজেদের ধৃষ্টতা ও কুটিলতা দ্বারা বিচলিত করার বিরাট সুযোগ পেলো। হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা)-এর নামে মুনাফিকরা যে অপবাদ রটনা করলো, তার ফলে তিনি প্রায় দেড়মাস পর্যন্ত তাঁর পিত্রালয়ে অবস্থান করেন এবং মুসলমানদের সাধারণভাবে হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা)-এর সতীত্ব, সচ্চরিত্রতা ও নির্যাতিতা হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে। একমাস পর আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে তাঁর পুণ্যশীলতা ও পবিত্রতার রায় অবতীর্ণ হলো এবং স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা)-কে সিদ্দীকা হওয়ার সাক্ষ্য প্রদান করলেন। এর পূর্বে আরো একজন সিদ্দীকা অর্থাৎ হযরত মারয়াম সিদ্দীকার নামেও এরূপ অপবাদ ইয়াহূদীরা রটনা করেছিল। তারাও ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং এই সিদ্দীকাকে অপবাদ দানকারীদের পরিণামও ধ্বংস ও বিনাশই হলো।

এ অভিযানে মুনাফিকরা যেসব দুরভিসন্ধি এঁটেছিল হযরত নবী করীম (সা) তা সবই ধীরে ধীরে অবগত হতে থাকলেন। মদীনা মুনাওয়ারায় প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে একজন সাহাবী মুনাফিক আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়্যর কটুক্তির উল্লেখ করেন এবং সাক্ষী পেশ করে দাবী তোললেন যে, তাকে হত্যা করার আদেশ জারি করা হোক। হযরত নবী করীম (সা) বললেন, আবদুল্লাহ ইব্ন উবায়্য যেহেতু নিজকে মুসলমান বলে পরিচয় দিচ্ছে, তাই তাকে হত্যা করা হলে
বলবে মুহাম্মদ (সা) তাঁর বন্ধুদেরকে হত্যা করতে শুরু করেছে। আবদুল্লাহ ইব
খাঁটি মুসলমান ছিলেন। তাঁর নাম ছিল আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লা
ইব্ন আবদুল্লাহ্ যখন জানতে পারলেন যে, তাঁর পিতার
তখন তিনি হযরত নবী করীম (সা)-এর নি
উবায়্য অর্থাৎ আমার পিতাকে
নিজেই তার শিরশ্ছেদ
নবী করীম

উপর হামলা করার
এসে পৌঁছলো। সে আবূ সুফিয়ানকে

প্রবেশ করতে দেবো না, তখন নবী (সা) তা জানতে পেরে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়্যকে মদীনায় আসতে অনুমতি দিলেন।

যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি

বনূ মুস্তালিকের সরদার হারিসের কন্যা হযরত জুওয়ায়রিয়া (রা) সাবিত ইব্ন কায়স (রা)-এর ভাগে পড়লেন। হারিস কয়েক দিন পর মদীনায় আগমন করে তাঁর কন্যাকে মুক্ত করার ইচ্ছা জ্ঞাপন করলো। হযরত নবী করীম (সা) জুওয়ায়রিয়াকে নিজে মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত করিয়ে দিলেন। জুওয়ায়রিয়া পিতার সাথে যাওয়ার চাইতে হযরত নবী করীম (সা)-এর খিদমতে থাকা অধিকতর পসন্দ করলেন। তখন তিনি জুওয়ায়রিয়ার ইচ্ছা অনুসারে এবং হারিসের সম্মতিক্রমে জুওয়ায়রিয়াকে বিবাহ করলেন। এই বিবাহের ফলে সাহাবায়ে কিরাম বনূ মুস্তালিকের সমুদয় বন্দীকে এই বলে মুক্ত করে দিলেন যে, যে গোত্রের লোক হযরত নবী করীম (সা)-এর আত্মীয় হয়ে গেছেন, আমরা তাদেরকে বন্দী অথবা দাস বানিয়ে রাখতে পারি না। একই সাথে সমুদয় মালে গনীমতও তাঁরা ফিরিয়ে দিলেন। এভাবেই ইয়াহূদীদের একটি গোত্রের সাথে এই বিবাহের ফলে শত্রুতার স্থলে বন্ধুত্ব গড়ে উঠলো।

ইয়াহূদীর শাস্তি

এখানে স্মর্তব্য যে, বনূ নাযীর যখন দেশান্তরিত হয়ে খায়বার ও সিরিয়ার দিকে চলে গিয়েছিল, তখন থেকেই তারা অনবরত তাদের তৎপরতা ও ষড়যন্ত্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে অব্যাহত রেখেছিল। তাদের তৎপরতার কারণেই আরবের মুশরিক ও ইয়াহূদী গোত্রগুলো যত্রতত্র মুসলমানদের মূলোচ্ছেদ করার জন্য অনুপ্রাণিত হতে থাকে এবং তাদেরই ষড়যন্ত্রের ফলে খ্রিস্টান বাহিনীও সিরীয় সীমান্তে মুসলমানদেরকে আশংকার দৃষ্টিতে দেখতে থাকে। যেহেতু মুসলমানদের বিরুদ্ধে সমগ্র আরব দেশ ও সমগ্র আরব গোত্রকে বিক্ষুব্ধ করে তোলা হয়েছিল এবং যত্রতত্র সমগ্র আরব উপদ্বীপে মুসলমানদের মূলোৎপাঠন করার ব্যবস্থা করা হচ্ছিল, তাই হযরত নবী করীম (সা) দেশের প্রতিটি অংশ ও প্রতিটি গোত্র সম্পর্কে অবহিত থাকার চেষ্টা করতেন। আর যেখানেই বিপদ ও গণ্ডগোল মাথাচাড়া দেয়ার আশংকা দেখা দিতো নিজ মুসলিম বাহিনী দ্বারা তাকে শক্তি সঞ্চয় করার পূর্বেই দমন করতেন। এই পরিস্থিতিতে উপরে বর্ণিত ছোট ছোট অভিযানগুলো পরিচালিত হয়েছিল।

খন্দকের যুদ্ধ

বনূ নাযীরের হুই ইব্ন আখতাব ছিল সবচেয়ে বড় ফেতনাবাজ ও কলহপরায়ণ। সে এবং বনূ নাযীর গোত্রের বড় অংশটি খায়বরে বসতি স্থাপন করেছিল। হুই ইব্ন আখতাব, সালাম ইব্ন আবিল হাকীক, সালাম ইব্ন মাশকাম, ইব্ন কিনানা ইব্ন রবীঈ প্রমুখ বনূ নাযীর নেতৃবৃন্দ এবং হূদ ইব্ন কায়স ও আবূ আম্মারা প্রমুখ বনূ ওয়ায়িল নেতৃবৃন্দ একত্র হয়ে প্রথমে মক্কায় গেলো। চাঁদার তহবিলও খুললো। কুরায়শরা খুব বেশী বেশী যুদ্ধ তহবিলে চাঁদা দিলো। এখানে যখন খুব উত্তেজনা সৃষ্টি হলো, তখন মক্কার কুরায়শদের পরামর্শক্রমে তারা গাতফান গোত্রগুলোর কাছে গেলো এবং তাদেরকেও এভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উত্তেজিত করতে সফল হলো। বনূ কিনানা গোত্রগুলোও উদ্বুদ্ধ হলো। এরপর যেসব ইয়াহূদী

তখন পর্যন্ত মদীনায় বসবাস করছিল (অর্থাৎ বনূ কুরায়যা), তাদের সাথে গোপন ষড়যন্ত্র শুরু হলো। অথচ বনূ কুরায়যা তখনো পর্যন্ত নবী করীম (সা)-এর সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিল এবং চুক্তিপত্র অনুসারে মুসলমানদের সাহায্য করা তাদের কর্তব্য ছিল। বনূ সুলায়ম, ফাযারা, আশজা', বনূ সা'দ ও বনূ মুররা প্রভৃতি কুরায়শ গোত্র এবং বনূ নাযীর ও গাতফান প্রভৃতি গোত্রের নেতৃবর্গ যাদের সংখ্যা পঞ্চাশের কম ছিল না, কা'বা ঘরে গিয়ে কসম করলো যে, আমরা যতদিন বেঁচে থাকবো মুসলমানদের বিরুদ্ধাচরণ করতে পরাঙমুখ হবো না এবং ইসলামের মূলোৎপাটন করতে কোন সুযোগই হাতছাড়া করবো না। বিগত অভিজ্ঞতার আলোকে এই বিরাট ষড়যন্ত্রে সীমাতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হলো। আর এ জন্যই হযরত নবী করীম (সা)-এর নিকট মদীনা মুনাওয়ারায় ইসলাম বিরোধীদের এই বিরাটতম ষড়যন্ত্রের সংবাদ চরম মুহূর্তের পূর্বে পৌঁছতে পারে নি। প্রথমে আবূ সুফিয়ান কুরায়শ ও তার সাথে চুক্তিবদ্ধ গোত্রসমূহের চার হাজার সৈন্য সমভিব্যাহারে মক্কা থেকে যাত্রা করলো। মাররুয্-যাহ্রান নামক স্থানে বনূ সুলায়মান ফৌজও এসে মিলিত হলো। এভাবে সবগুলো গোত্র পথিমধ্যে এসে এসে এই বাহিনীতে শামিল হতে থাকলো। বনূ নাযীরের অধিনায়ক ছিল হুই ইব্ন আখতাব এবং গাতফান গোত্রগুলোর অধিনায়ক ছিল উআয়না ইব্ন হিসন। সমগ্র কাফির বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিল আবূ সুফিয়ান। মদীনার কাছে পৌঁছে সমুদয় শত্রুসেনার সংখ্যা দাঁড়াল বিভিন্ন বর্ণনা মতে ন্যূনপক্ষে দশ হাজার এবং ঊর্ধ্বপক্ষে চব্বিশ হাজার। এই বিশাল বাহিনীতে ছিল সাড়ে চার হাজার উট ও তিনশ' ঘোড়া।

হযরত নবী করীম (সা) যখন এই বিপুল বাহিনীর আক্রমণের কথা জানতে পারলেন, তখন তিনি মজলিসে শূরার বৈঠক ডাকলেন। সিদ্ধান্ত হলো যে, মদীনার ভেতরে থেকেই প্রতিরোধ করতে হবে। হযরত সালমান ফারসী (রা) পরামর্শ দিলেন যে, শত্রুবাহিনীর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে অবরুদ্ধ বাহিনীর চতুর্দিকে খন্দক (পরিখা) খনন করতে হবে। আরবরা এরূপ খন্দক খননের ধারণা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিল না। হযরত নবী করীম (সা) হযরত সালমান ফারসী (রা)-এর এই প্রস্তাব পসন্দ করলেন। একদিকে ছিল ছোট ছোট পর্বতমালা এবং আরেক দিকে মদীনা মুনাওয়ারার আবাস গৃহের দেয়ালগুলো প্রাচীরের কাজ করছিল। যে দিকটি খোলা ছিল এবং যে দিক থেকে শত্রুর আক্রমণ হতে পারতো, সেদিকে খন্দক খনন শুরু করা হলো। পবর্তমালা ও খন্দকের মাঝখানে একটি ডিম্বাকৃতির ময়দান সৃষ্টি হয়ে গেলো। এটিই যেন মুসলমানদের দুর্গ ছিল। এর মাঝখানে ছিল হযরত নবী করীম (সা)-এর তাঁবু। খন্দক পাঁচ গজ চওড়া ও পাঁচ গজ গভীর খনন করা হলো। খন্দকের গোটা দৈর্ঘ্য- সমান ভাগ করে দশ দশজন লোককে এক একটি অংশ খনন করার জন্য দেয়া হলো। হযরত নবী করীম (সা)-ও একটি অংশের খননকার্যে শামিল ও খন্দক খননে নিয়োজিত হলেন। খন্দক খননের সময় এক স্থানে একটি বিরাট পাথর দেখা গেলো। সবাই শক্তি পরীক্ষা করলেন কিন্তু পাথর ভাঙ্গতে পারলেন না। হযরত নবী করীম (সা)-এর নিকট নিবেদন করা হলো যে, খন্দকটি এই জায়গা থেকে ঘুরিয়ে অন্যদিকে নিয়ে খনন করার অনুমতি দিন। তিনি যে জায়গায় খন্দক খনন করছিলেন সেখান থেকে তাঁর কোদাল নিয়ে চললেন। পাথরের স্থানে পৌঁছে খন্দকে নেমে তাঁর কোদাল দ্বারা আঘাত করতেই পাথরটি দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে একটি আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হলো। তিনি আল্লাহু আকবর ধ্বনি দিলেন। সাহাবায়ে

কিরামও তাঁর অনুসরণে আল্লাহু আকবর ধ্বনি তুললেন। তিনি বললেন, আমাকে শাম দেশের (সিরিয়ার) চাবি দান করা হয়েছে। এরপর তিনি পাথরটিতে দ্বিতীয়বার আঘাত করলেন। এবার আরো খণ্ডিত হলো। এবারের আঘাতেও একটি আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হলো। সুতরাং অনুরূপ আল্লাহু আকবার ধ্বনি উত্থিত হলো। তিনি বললেন, আমাকে পারস্যের চাবি দান করা হয়েছে। তৃতীয় আঘাতে পাথরটি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেলো এবং পূর্বের মতো আলোকরশ্মি বের হলো। এবারো আল্লাহু আকবার ধ্বনি বুলন্দ হলো। তিনি বললেন, আমাকেই ইয়ামেনের চাবি দান করা হয়েছে। তারপর তিনি বললেন, আমাকে জিবরাঈল আমীন জানালেন যে, এই দেশগুলো আপনার উম্মতের করায়ত্ত হবে। এখানে লক্ষণীয় যে, চব্বিশ হাজার সশস্ত্র শত্রুসেনার মুকাবিলায় মুষ্টিমেয় মুসলমান তাদের নিরাপত্তা ও আত্মরক্ষার উপায় অন্বেষণে ব্যস্ত। গোটা আরবদেশ দুশমনীতে লিপ্ত ও রক্তপানে উদ্যত। বাহ্যত ধ্বংস অনিবার্য। কিন্তু এ সময়ও ইরান, রোম ও ইয়ামন দেশের রাজত্ব লাভের সুসংবাদ শোনানো হচ্ছে। এ কাজ আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো হতে পারে না এবং আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ এরূপ খবর দিতে পারেন না।

এই অবস্থায় হযরত নবী করীম (সা) খবর পেলেন যে, বনূ কুরায়যা প্রধান কা'ব ইব্ন উসায়দ ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুসেনাদের সাথে জোটবদ্ধ হয়েছে এবং হুই ইব্ন আখতাব বনূ কুরায়যার দুর্গে প্রবেশ করে তাদেরকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করছে। তিনি ঘটনা তদন্ত ও তাদের নিবৃত্ত করার জন্য সা'দ (রা) ইব্ন মুআয (রা) ও সা'দ ইব্ন উবাদা (রা)-কে বনূ কুরায়যার নিকট প্রেরণ করলেন। এই দু'জন মনীষীই তাদেরকে বোঝানোর আপ্রাণ চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁরা সফল হলেন না। বনূ কুরায়যা খুব ঔদ্ধত্যভরে জবাব দিলো যে, আমরা মুহাম্মদ (সা)-কে চিনি না। তাঁর সাথে আমাদের কোন চুক্তিও নেই।

কাফির বাহিনী যখন খন্দকের নিকট এসে পৌঁছলো, তখন খন্দক দেখে হতবাক হয়ে গেল এবং চিন্তায় পড়লো। কেননা, ইতিপূর্বে আরবরা এ ধরনের খন্দক কখনো দেখেনি। কাফিরদের বিরাট বাহিনী মদীনা অবরোধ করলো। এ হামলা ছিল কাফিরদের শক্তি ও সামর্থ্যের চূড়ান্ত প্রকাশ এবং ইসলামের মুকাবিলায় কুফরের সবচেয়ে বড় প্রয়াস। মুসলমানরা তাদের বিবি-বাচ্চাদের মদীনার একটি বিশেষ সুরক্ষিত গর্তের মধ্যে হিফাযত মানসে রেখে দিয়েছিলেন। মদীনায় অবস্থানকারী ইয়াহূদীদের তরফ থেকে সর্বদা হামলার আশংকা ছিল। অপরদিকে মুসলমানদের সাথে বসবাসকারী মুনাফিকদের তরফ থেকেও বড় ভয় ছিল। কাফিরদের তরফ থেকে একাধিকবার খন্দক পার হওয়ার প্রয়াস চললো। কিন্তু তারা খন্দক পার হতে পারলো না। খন্দকের এক স্থান দিয়ে প্রশস্ততা একটু কম ছিল। একবার দু'তিনজন কাফির সেনা সেখান দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলো। তন্মধ্যে আমর ইব্ন আবদ উদকে দুই হাজার পুরুষের সমান মনে করা হতো। সে ছিল আরব দেশের প্রখ্যাত বীর অপ্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধা। হযরত আলী (রা) তাকে হত্যা করলেন। অন্যরা পলায়ন করলো। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তীর দ্বারা যুদ্ধ চলতো। মুসলমানরাও কাফিরদের যথাযোগ্য জবাব দিতেন। প্রায় এক মাস পর্যন্ত এই অবস্থা বিদ্যমান ছিল। শত্রুদের অবরোধ ছিল বড় কঠোর। তারা অনবরত বাইরে থেকে সব ধরনের সাহায্য পাচ্ছিল। না রসদপত্র তাদের কম ছিল, না তাদের জনশক্তির কোন কমতি ছিল। মুসলমানদের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। কোথাও থেকে রসদপত্র যোগাড় করা যেতো না। উপোসের পর উপোস চলছিল। একবার এক সাহাবী তাঁর উপোসের কথা

জানালেন এবং জামা উঠিয়ে দেখালেন পেটে পাথর বেঁধে রেখেছেন। যাতে ক্ষুধার কারণে কোমর ঝুঁকে না পড়ে। হযরত নবী করীম (সা)-ও তাঁর জামা উঠালেন। দেখা গেলো তাঁর পেটে দুটি পাথর বাঁধা রয়েছে।

রাতে যেহেতু হামলার ভয় ও খন্দক রক্ষা করা আবশ্যক ছিল, সেহেতু রাতভর সবাইকে ময়দানে বিনিদ্র থাকতে এবং দিনভর দুশমনের মুকাবিলা করতে হতো। মুসআব ইব্‌ন কুশায়র নামক জনৈক মুনাফিক বললো, মুহাম্মদ (সা) তাঁর বন্ধুদেরকে সিরিয়া, ইরান ও ইয়ামন দেশ শাসন করার সুসংবাদ দিচ্ছেন, কিন্তু আমরা তো দেখছি যে, তিনি মদীনায়ও এখন থাকতে পারবেন না। কেউ কেউ বলতো, ঘর থেকে বের হয়ে পায়খানা করতেও যেতে পারছে না, অথচ কায়সার ও কিসরার দেশ ইরান ও রোম দখলের স্বপ্ন দেখছে। মোটকথা, মুনাফিকদের বিদ্রূপ, রাতের শিশির, দিনের রৌদ্র, ক্ষুৎ-পিপাসা, কাফিরদের মুকাবিলা, বনূ কুরায়যার আশংকা, মুনাফিকদের ভয়, কাফিরদের সংখ্যাধিক্য, মুসলমানদের সংখ্যাল্পতা—এই সামগ্রিক অবস্থায় মুসলমানরা যে সাহস ও দৃঢ়তার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন, তা এতেই অনুমিত হয় যে, কাফিররা যখন মুসলমানদের কাছে অপমানকর সন্ধির প্রস্তাব করলো, তখন তারা তা সরাসরি নাকচ করে দিলেন। এই অবস্থায়ও ভাগ্যবানেরা বের হয়ে আসতেন এবং ইসলাম গ্রহণ করতেন। যেমন নাঈম ইব্‌ন মাসউদ ইব্‌ন আমির নামীয় জনৈক ব্যক্তি গাতফান গোত্রের সৈন্য থেকে বের হয়ে হযরত রাসূলে আকরাম (সা)-এর নিকট এসে হাযির হলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করলেন। মুসলমান হওয়ার পর তিনি বললেন, আমি বনূ কুরায়যা ও কাফির বাহিনীর মধ্যে ফাটল ধরিয়ে দেবো। সুতরাং তিনি প্রথমে বনূ কুরায়যার কাছে গেলেন। তারপর গেলেন আবূ সুফিয়ানের কাছে। তিনি এমন এমন কথা বললেন যাতে বনূ কুরায়যা ও কুরায়শরা উভয়েই পরস্পর থেকে নিজ নিজ নিরাপত্তা দাবী করলো। তার ফল এই দাঁড়ালো যে, বনূ কুরায়যা কুরায়শদের ইচ্ছানুযায়ী প্রকাশ্যে কোন জঙ্গী তৎপরতা চালাতে বিরত থাকলো। নাঈম ইব্‌ন মাসউদ দুই তরফেই তার ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রাখলেন। এ জন্য তাঁর পরামর্শ দুই তরফেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হলো।

যখন অবরোধের সাতাশ দিন অতিবাহিত হলো, তখন একদিন রাতের বেলা প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু প্রবাহিত হলো। তাঁবুসমূহের পেরেকগুলো উপড়ে গেলো। চুলোর উপর থেকে ডেগচিগুলো উল্টে পড়ে গেলো। فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَجُنُوْدًا لَمْ تَرَوْهَا (এবং আমি তাদের বিরুদ্ধে ঝঞ্ঝাবায়ু প্রেরণ করেছিলাম এবং এমন এক বাহিনী, যা তোমরা দেখতে পাও নি (৩৩ : ৯)। এই ঘূর্ণিবায়ু ও ঝঞ্ঝাবাত্যা বিরাট কাজ করলো। সর্বত্র তাঁবুগুলোর আগুন নিভে গেলো। মুশরিকরা আগুন নিভে যাওয়াকে অশুভ লক্ষণ ভাবলো এবং রাতের মধ্যেই ডেরা-তাঁবু উঠিয়ে পলায়ন করলো। কাফিরদের পলায়নের খবর হযরত নবী করীম (সা)-কে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে জানিয়ে দেয়া হলো। তখনই তিনি হযরত হুযায়ফা ইব্‌নুল ইয়ামান (রা)-কে খবর নেয়ার জন্য অকুস্থলে পাঠালেন। তিনি এসে খবর দিলেন যে, কাফিরদের সৈন্যস্থল ফাঁকা পড়ে আছে এবং তারা পলায়ন করছে। হযরত নবী করীম (সা) বললেন, এরপর কুরায়শরা আমাদের উপর আর কখনো আক্রমণ করবে না। মুসলমানরা আনন্দের সাথে মদীনায় প্রবেশ করলেন। এ ঘটনা পঞ্চম হিজরীর যুল-কাদাহ মাসে সংঘটিত হয়। নবী করীম (সা) যখন কাফিরদের মুকাবিলায় মদীনার বাইরে খন্দকের দিকে অবস্থান করছিলেন, তখন ইব্‌ন উম্মে

মাকতূমকে মদীনার শাসক নিয়োগ করে গিয়েছিলেন। মদীনায় ফিরে এসে তিনি খুব অল্প সময় অবস্থান করলেন এবং যোহরের সালাত আদায় করে হুকুম দিলেন যে, আসরের সালাত যেন এখানে কেউ আদায় না করে। তাঁরা আসরের সালাত বনূ কুরায়যার মহল্লায় গিয়ে আদায় করলেন। কোন কোন সাহাবা হাতিয়ারও খুলে রাখতে পারেন নি, ইত্যবসরে এই নির্দেশ জারি হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে বনূ কুরায়যার দিকে গমন করলেন।

বনূ কুরায়যার বিশ্বাসঘাতকতার পরিণাম

হযরত সা'দ ইব্‌ন মুআয (রা)-যিনি খন্দকের যুদ্ধের সময় বনূ কুরায়যাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সঠিক পথে রাখার জন্য তাদের নিকট তাদের দুর্গের মধ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন এবং তারা অত্যন্ত রুক্ষভাবে তাঁকে বিমুখ করে ফিরিয়ে দিয়েছিল–বনূ কুরায়যার সাথে চুক্তিবদ্ধ ও তাদের সুহৃদ ছিলেন। তিনি খন্দকের যুদ্ধের সময় তীরের আঘাতে যখম হয়েছিলেন। তাঁকে মসজিদে নববীর নিকটে তাঁবুর মধ্যে অবস্থান করার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। তাই তিনি বনূ কুরায়যার মহল্লার দিকে মুসলিম মুজাহিদদের সাথে যেতে পারেন নি। হযরত আলী (রা)-কে হযরত নবী করীম (সা) ঝাণ্ডা দান করেন এবং অগ্রবর্তী দল হিসাবে আগে পাঠিয়ে দেন। মদীনায় ইব্‌ন উম্মে মাকতূম (রা)-কেই যথারীতি শাসক হিসাবে বহাল রাখেন। হযরত আলী (রা) যখন বনূ কুরায়যার দুর্গের কাছে পৌঁছেন, তখন তিনি শুনতে পেলেন যে, বনূ কুরায়যা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে গালি-গালাজ করছে। মোটের উপর সন্ধ্যা পর্যন্ত এমনকি ইশার সালাত পর্যন্ত সাহাবায়ে কিরাম আসতে থাকেন। যাদের কোন কারণে রওয়ানা হতে দেরী হয়ে যায়, তারা ইশার সময় এসে পৌঁছেন। তাঁরাও আসরের সালাত বনূ কুরায়যার মহল্লায় গিয়ে ইশার সময়ই আদায় করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের এ কাজকে জাইয রাখেন। বনূ কুরায়যার দুর্গে হুই ইব্‌ন আখতাবও উপস্থিত ছিল। আবূ সুফিয়ান ও আরব কাফিররা যখন খন্দকের যুদ্ধ থেকে পলায়ন করলো, তখন হুই ইব্‌ন আখতাব বনূ কুরায়যার দুর্গে চলে এসেছিল। সে তাদেরকে মুসলমানদের সাথে লড়াই ও মুকাবিলার জন্য উস্কানি দিয়েছিল। মুসলমানরা বনূ কুরায়যার দুর্গ অবরোধ করেছিলেন। এই অবরোধ পঁচিশ দিন স্থায়ী হয়েছিল। বনূ কুরায়যার সরদার ছিলেন কা'ব ইব্‌ন আসাদ। হুই ইব্‌ন আখতাব বনূ কুরায়যার সাথে অবরুদ্ধ ছিল। কা'ব ইব্‌ন আসাদ যখন দেখলেন, তাঁর গোত্র মুসলমানদের মুকাবিলা করতে পারছে না, তখন তিনি তাঁর গোত্রকে এক স্থানে সমবেত করে বললেন, মুহাম্মদ (সা) যে আল্লাহ্‌র নবী তাতে কোন সন্দেহ নেই। কেননা, তাঁর সম্পর্কে আমাদের আসমানী কিতাব তাওরাতে পরিষ্কার ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে এবং তিনিই হচ্ছেন আমাদের প্রতীক্ষিত নবী। কাজেই তাঁকে মেনে নিয়ে আমাদের জান-মাল ও সন্তান-সন্ততিকে রক্ষা করাই শ্রেয়। বনূ কুরায়যা এ পরামর্শের বিরোধিতা করলো এবং ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করলো। এরপর কা'ব ইব্‌ন আসাদ বললেন : আমার দ্বিতীয় পরামর্শ হচ্ছে এই যে, তোমরা তোমাদের স্ত্রী-পুত্র-পরিজনদের মেরে ফেলো এবং দুর্গ থেকে বের হয়ে খোলা ময়দানে মুসলমানদের সাথে প্রাণপণ যুদ্ধ করো। বিজয় লাভ করলে বিবি-বাচ্চা আবার যোগাড় হয়ে যাবে। মারা গেলে লজ্জা-শরমের দিক থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে মারা যাবে। বনূ কুরায়যা এ পরামর্শও গ্রহণ করলো না। কা'ব ইব্‌ন আসাদ বললেন, আমার তৃতীয় পরামর্শ হচ্ছে, শনিবার রাতে মুসলমানদের উপর হামলা করো। কেননা, ঐ দিন আমাদের কাছে হত্যা ও হামলা করা নাজাইয। মুসলমানরা ঐ রাতে আমাদের তরফ থেকে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ও গাফিল

থাকবে। তাই আমাদের আক্রমণ সফল হবে এবং আমরা মুসলমানদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেবো। এ ব্যাপারেও বনূ কুরায়যা সম্মত হলো না এবং বলল, আমরা শনিবারের সম্ভ্রম হানিও করতে চাই না। বনূ কুরায়যার তিনজন শরীফ ব্যক্তি ছা'লাবা ইব্‌ন সাঈদ, আসাদ ইব্‌ন উবায়দ ও উসায়দ ইব্‌ন সাঈদ ইসলাম গ্রহণ করলেন। আমর ইব্‌ন সা'দ্ নামক এক ব্যক্তি বললেন, আমার গোত্র বনূ কুরায়যা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আমি এই বিশ্বাসঘাতকতায় তাদের অংশীদার হতে চাই না। এই কথা বলে তিনি দুর্গের বাইরে চলে যান। মুসলিম বাহিনীর অন্যতম নেতা মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামা (রা)-যিনি প্রহরার কাজে নিয়োজিত ছিলেন–তাকে দুর্গ থেকে বের হতে দেখলেন। তার পরিচায় ও অভিপ্রায় জ্ঞাত হওয়ার পর বের হতে দিলেন এবং গ্রেফতার করলেন না। শেষে একদিন সকালে বনূ কুরায়যা হযরত নবী করীম (সা)-এর নিকট বার্তা পাঠালো : আমরা আমাদেরকে আপনার হাতে এই শর্তে সোপর্দ করছি যে, সা'দ ইব্‌ন মুআয (রা) আমাদের জন্য যে শাস্তির বিধান করবেন, আমরা তাই মাথা পেতে নেবো। তিনি এই শর্ত কবূল করলেন। বনূ কুরায়যা যখন নিজেদেরকে মুসলমানদের হাতে সোপর্দ করলো, তখন বনূ আওসের আনসার মুসলমানগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে বললেন যে, জাহিলিয়া যুগে যখন আওস ও খাযরাজের মধ্যে লড়াই হতো, তখন বনূ কুরায়যা আমাদের অর্থাৎ বনূ আওসের পক্ষ সমর্থন করতো। আপনি বনূ কায়নুকাকে বনূ খাযরাজের আনসারদের মর্যীর উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন, এবার আমাদের পালা। সুতরাং বনূ কুরায়যা সম্পর্কে আপনি আমাদেরকে বিচারক নিযুক্ত করুন। তিনি বললেন, আমরা প্রথমেই তোমাদের বনূ আওসের নেতা সা'দ ইব্‌ন মুআযকে বিচারক মেনে নিয়েছি। বনূ কুরায়যাও সা'দ ইব্‌ন মুআযকে তাদের তরফ থেকে একমাত্র প্রতিনিধি বানিয়েছে। একথা শুনে বনূ আওসের সকল আনসার খুশী হলেন এবং ঐ সময়ই আনসারগণ মসজিদে নববীর দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। সা'দ ইব্‌ন মুআয (রা) আহত ও চিকিৎসাধীন ছিলেন। তাঁকে পাল্কি বা ঐ ধরনের কোন বাহনে করে মুসলিম বাহিনীর দিকে আনয়ন করা হলো। পথে তাঁকে লোকেরা বলতে বলতে আসছিল যে, আপনার রায়ই চূড়ান্ত সাব্যস্ত হবে। এখন বনূ কুরায়যার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করার সুযোগ আপনার হাতে এসেছে। সা'দ ইব্‌ন মুআয (রা) যখন এই রকম কথাবার্তা তাঁর গোত্রের লোকদের মুখে শোনলেন, তখন তিনি বললেন, আমি ইনসাফ ও ন্যায়বিচার অনুযায়ী ফায়সালা করবো এবং কারো নিন্দা ও ভর্ৎসনার পাত্র হবো না। হযরত সা'দ ইব্‌ন মুআয (রা)-এর বাহন যখন অদূরে এসে পৌঁছলো, তখন নবী (সা) উপস্থিত আনসারদের বললেন যে, তোমাদের নেতার সম্মানার্থে উঠে দাঁড়াও। সবাই তাঁকে স্বাগত জানালেন। এরপর হযরত সা'দ ইব্‌ন মুআয (রা)-কে বলা হলো যে, নবী করীম (সা) আপনার পুরানো বন্ধুদের অর্থাৎ বনূ কুরায়যার ব্যাপারটি আপনার হাতে ন্যস্ত করেছেন। হযরত সা'দ (রা) তাঁর গোত্রের লোকদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা সবাই আল্লাহ্ তা'আলাকে হাযির-নাযির জেনে অঙ্গীকার করো যে, আমার ফায়সালা তোমরা সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিবে এবং কোন উচ্চবাচ্য করবে না। সবাই অঙ্গীকার করলো যে, আমরা আপনার রায়ের উপর সন্তুষ্ট থাকবো। তারপর হযরত সা'দ ইব্‌ন মুআয (রা) একই অঙ্গীকার হযরত নবী করীম (সা) ও মুহাজিরদের নিকট থেকেও নিলেন। নবী (সা) সা'দ ইব্‌ন মুআয (রা)-এর রায় মেনে নেয়ার অঙ্গীকার করলেন। এরপর হযরত সা'দ ইব্‌ন মুআয (রা) বললেন : আমি নির্দেশ দিচ্ছি যে, বনূ কুরায়যার সকল পুরুষ লোককে

হত্যা করা হোক। তাদের বিবি-বাচ্চাদের সাথে যুদ্ধবন্দীদের মতো ব্যবহার করা হোক এবং তাদের ধন-সম্পত্তি মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হোক। এই রায় ঘোষণার পর বনূ কুরায়যাকে দুর্গ থেকে বের হওয়ার নির্দেশ দেয়া হলো এবং তাদেরকে পাহারা দিয়ে মদীনায় আনয়ন করা হলো। তাদের পুরুষদের হত্য করা হলো এবং তাদের আবাসগৃহগুলো মুসলমানদের বাস করার জন্য দেয়া হলো।

পঞ্চম হিজরীর অন্যান্য ঘটনা

পঞ্চম হিজরীর যিলহাজ্জ মাসে হযরত আবূ উবায়দা ইব্‌নুল জাররাহ (রা) রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নির্দেশে 'সীফুল বাহ্‌র' অভিমুখে তিনশ' মুহাজির সহ রওয়ানা হন সেখানকার জুহায়না গোত্রের হাল-অবস্থা জানার জন্য। কেননা, সেদিক থেকে আশংকাজনক খবর এসেছিল। হযরত আবূ উবায়দা (রা) ও তাঁর সঙ্গীদেরকে এই অভিযানে পানাহারের ভীষণ কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল। শুধু দুই দুই, তিন তিনটি শুকনো খেজুর খেয়ে এক একটি দিন অতিবাহিত করতে হতো। শেষে সাগর সৈকতে একটি মস্তবড় মাছ পাওয়া গেলো। যা সবার জন্যই যথেষ্ট হলো।

বনূ কিলাব সম্পর্কে খবর এলো যে, তারা বিদ্রোহ করার সঙ্কল্প করছে। তাই পঞ্চম হিজরীর যিলহাজ্জ মাসেই মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামা (রা) ত্রিশজন লোকের একটি দলের সাথে সেদিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। বনূ কিলাব তাদের মুকাবিলা করলো। বনূ কিলাবের দশজন লোক মারা গেলো এবং অন্যরা পলায়ন করলো। পঞ্চাশটি উট ও তিন হাজার বকরী মুসলমানদের হস্তগত হলো।

অনুরূপভাবে আক্কাশা ইব্‌ন মুহসিনকে মক্কা অভিমুখে অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হলো এবং একটি ক্ষুদ্র বাহিনী নজ্‌দ অভিমুখে পাঠানো হলো। এরা ছুমামা ইব্‌ন আছালাকে গ্রেফতার করে নিয়ে এলেন। ছুমামা ইব্‌ন আছালা খাঁটি দিলে খুশী মনে ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং স্বদেশ ইয়ামামায় গিয়ে সেখান থেকে মক্কায় খাদ্যশস্য সরবরাহে বাধা দিলেন। মক্কার কুরায়শরা যখন খাদ্যাভাবে কষ্ট পেলো, তখন তারা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট অভিযোগ করলো। তিনি নির্দেশ জারি করলেন যে, মক্কায় খাদ্যশস্য পূর্বের মতোই যেনো সরবরাহ করা হয়। ঐ বছরই তিনি আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী মুহাজিরদের মদীনায় ডেকে পাঠান। কিন্তু মুহাজিরদের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যা আবিসিনিয়ায় থেকে গেলো।

হিজরতের ষষ্ঠ বছর

ইতিপূর্বে পঞ্চম হিজরীর ঘটনাবলীতে উল্লিখিত হয়েছে যে, গাযওয়া দুমাতুল জান্দাল থেকে প্রত্যাবর্তন করার সময় পথিমধ্যে উয়ায়না ইব্‌ন হুসায়ন নবী (সা)-এর নিকট থেকে মদীনার চারণভূমিতে তার উট চরানোর অনুমতি লাভ করেছিল। এই অনুমতি থেকে সে এক বছর পর্যন্ত অবাধে ফায়দা উঠালো এবং এই অনুগ্রহের প্রতিদান ঐ অকৃতজ্ঞ পাষণ্ড এইভাবে দিলো : একদিন সুযোগ বুঝে সে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উটের উপর হামলা করলো এবং বনূ গিফারের এক ব্যক্তিকে হত্যা করে তার স্ত্রীকে উটের সাথেই নিয়ে গেলো। আসলামা ইব্‌ন আমর ইব্‌নুল আকওয়া (রা) সর্বপ্রথম এই ঘটনা জানতে পান। তিনি মদীনায় উচ্চৈঃস্বরে লোকদেরকে জানিয়ে দেন এবং তৎক্ষণাৎ দুর্বৃত্তদের পশ্চাদ্ধাবনে ছুটে যান। আসলামা (রা)-এর আওয়াজ শুনে নবী (সা) উয়ায়নাকে গ্রেফতার ও পশ্চাদ্ধাবনে সওয়ার হলেন। তাঁর রওয়ানা

হওয়ার পর মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রা), আব্বাস ইব্ন বিশর (রা), সাআদ ইব্ন যায়দ (রা), উককাশ ইব্ন মুহ্সিন (রা), মুহাররিয ইব্ন ফাযল আসাদী (রা), আবূ কাতাদা (রা) প্রমুখ রওয়ানা হন এবং তার সাথে মিলিত হন। হযরত নবী (সা) সাআদ ইব্ন যায়দ (রা)-কে নেতা নিযুক্ত করে সাহাবাদের এই দলটির সাথে অগ্রে প্রেরণ করেন এবং তিনি নিজে 'যূকারাদ' ঝরনার কাছে অবস্থান করেন। হযরত আসলামা ইব্ন আমর (রা) শেষে ঐ দুর্বৃত্তদের ধরে ফেলেন। এদিকে এই পশ্চাদ্ধাবনকারী দলটিও গিয়ে পৌঁছলো। উয়ায়না ইব্ন হুসায়নের সাহায্যেও তার দলবল ছুটে এলো। তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলো। একজন সাহাবী এ যুদ্ধে শাহাদত বরণ করলেন। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর শত্রুপক্ষ পরাস্ত হলো। তারা সবাই পলায়ন করলো এবং ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলো। মুসলমানগণ নিজেদের উট ছাড়া শত্রুদের উটগুলোও হস্তগত করলেন এবং নিরাপদে গনীমতের মালসহ যূ-কারাদ ঝরনার কাছ ফিরে এলেন। হযরত নবী (সা) শত্রুদের একটি উট ঐ জায়গায় যবাহ করলেন এবং এক রাত এক দিন অবস্থান করে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

এই বছরই নবী (সা)-এর নিকট খবর এলো যে, বনূ বকর খায়বারের ইয়াহূদীদের সাথে ষড়যন্ত্র করে মদীনা আক্রমণ করতে চায়। তিনি হযরত আলী (রা)-কে দু'শ মুজাহিদসহ বনূ বকরকে দমন করার জন্য পাঠালেন। পথিমধ্যে বনূ বকরের একজন গুপ্তচরকে মুসলিম মুজাহিদরা গ্রেফতার করলেন। গুপ্তচর বললো, তোমরা আমার জীবনের নিরাপত্তা দাও, আমি তোমাদেরকে বনূ বকরের মিলন-স্থানের সন্ধান দেবো। হযরত আলী (রা) তার দ্বারা শত্রুর ঠিকানা অবগত হলেন এবং ওয়াদা মতো তাকে মুক্তি দিলেন। শত্রুপক্ষ ফাদাক নামক স্থানে সমবেত হয়েছিল। হযরত আলী (রা) হামলা করলেন। শত্রুপক্ষের সাথে জোর মুকাবিলা হলো। অবশেষে তারা সবাই পলায়ন করলো। মালে গনীমত হিসাবে পাঁচশ' উট ও দু' হাজার বকরী মুসলমানদের হস্তগত হলো। গনীমত নিয়ে হযরত আলী (রা) মদীনা মুনাওয়ারায় প্রত্যাগমন করলেন।

ইসলাম প্রচার

ষষ্ঠ হিজরীর শা'বান মাসে রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা)-কে দুমাতু'ল জান্দাল এলাকায় ইসলাম প্রচারের জন্য প্রেরণ করেন। এখানকার অধিবাসীরা তখন পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেনি। তাদের এক সরদার উসায়গ ইব্ন আমর কাল্বী খ্রিস্টধর্মের অনুসারী ছিলেন, হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা)-এর তাবলীগের ফলে উসায়গ ইসলাম গ্রহণ করলেন সেখানকার অধিকাংশ অধিবাসীই এই সরদারের অনুসরণ করলো। যারা ইসলাম গ্রহণ করলো না, তারা জিযয়া কর দিতে রাযী হলো। হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা)-এর সাথে উসায়গের কন্যা তামাসুরের বিবাহ হলো। তাঁরই গর্ভে আবূ সালামা (র) নামক ফিকাহবিদ ও শ্রেষ্ঠ তাবিঈর জন্ম হয়।

মুনাফিকদের একটি হিংস্র ঘটনা

উরায়না একটি উন্মুক্ত উপত্যকার নাম। সেখানকার বনূ উকুলের কিছু সংখ্যক লোক মদীনায় এসে বাহ্যত ইসলাম গ্রহণ করলো এবং কিছু দিন মদীনায় অবস্থান করে অভিযোগ করলো যে, আমরা গবাদি পশুর দুধ খেয়ে জীবন ধারণ করি। অন্যবিধ খাদ্যদ্রব্য আহার করতে

আমরা অভ্যস্ত নই। তাই মদীনায় থাকার ফলে আমাদের শরীরে খোস-পাঁচড়া হয়েছে। আমরা মারাত্মক শারীরিক পীড়ায় আক্রান্ত। হযরত নবী করীম (সা) তাদের তাঁর উটের চারণভূমি কুবা উপত্যকায় পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে দুধ খেয়ে খেয়ে যখন তারা খুব স্বাস্থ্যবান ও মোটাতাজা হলো, তখন ইয়াসার নামক নবী (সা)-এর একজন খাদিম ও উটরক্ষককে একাকী পেয়ে অতি নির্দয়ভাবে হত্যা করলো। তার হাত-পা কর্তন করলো, চোখের মধ্যে বাবলা কাঁটা ফুঁড়লো, হাত-পা কাটা লাশটি একটি গাছের ডালে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখলো এবং সমুদয় উট হাঁকিয়ে নিয়ে গেলো। এ খবর যখন মদীনায় পৌঁছলো, তখন নবী (সা) কুরয ইব্‌ন খালিদ আল-ফিহ্‌রীকে বিশজন অশ্বারোহীসহ তাদের পশ্চাদ্ধাবনে প্রেরণ করলেন। দুর্বৃত্তরা পথিমধ্যেই গ্রেফতার হলো। গ্রেফতার হয়ে মদীনায় আসার পর তাদের হত্যা করার নির্দেশ জারি হলো। এইভাবে তারা তাদের কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করলো।

হুদায়বিয়ার সন্ধি

আরবদেশে যদিও ইবরাহীমী দীনের প্রচলন ছিল এবং আরবরা শির্‌ক ও মূর্তিপূজায় লিপ্ত ছিল, কিন্তু কা'বাঘরের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সবাই স্বীকার করতো এবং সর্বদা কা'বাঘরের হজ্জ পালন করতো। হজ্জের দিনগুলোতে যুদ্ধ-বিগ্রহও মুলতবি করে দিতো। ষষ্ঠ হিজরীর শাওয়াল মাসে নবী করীম (সা) স্বপ্নে দেখলেন, সাহাবায়ে কিরাম নিয়ে তিনি কা'বাঘরে প্রবেশ করছেন। সাহাবায়ে কিরাম ও নবী করীম (সা)-এর কা'বাঘর তাওয়াফ ও যিয়ারত করার বাসনাও ছিল। এই স্বপ্ন দ্বারা তা আরো চাঙ্গা হয়ে উঠলো। নবী করীম (সা) উমরা অর্থাৎ কা'বা যিয়ারতের সঙ্কল্প করলেন। ষষ্ঠ হিজরীর যুল-কাদাহ মাসে তিনি এক হাজার চারশ' সাহাবা সমভিব্যাহারে মদীনা থেকে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা করলেন। উমরার ইহ্‌রাম বাঁধলেন এবং কুরবানীর জন্য সত্তরটি উট সঙ্গে নিলেন। ইহ্‌রাম বাঁধা এবং কুরবানীর উট সঙ্গে নেয়া থেকেই বোঝা যায় যে, তিনি যুদ্ধ করার অভিপ্রায় নিয়ে বের হননি বরং তাঁর উদ্দেশ্য ছিল নিছক বায়তুল্লাহ্‌র যিয়ারত করা। মক্কার কুরায়শদেরও কোন অধিকার ছিল না কা'বাঘরের যিয়ারত থেকে কাউকে বিরত রাখার।

যুল-হুলায়ফা নামক স্থানে পৌঁছে নবী করীম (সা) বনূ খুযাআর এক ব্যক্তিকে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে গুপ্তচররূপে প্রেরণ করলেন। তিনি আসফান নামক স্থানে ফিরে এসে নবী করীম (সা)-কে খবর দিলেন যে, কুরায়শরা আপনার আগমন সংবাদ পেয়ে মস্ত এক বাহিনী মুকাবিলার জন্য সমবেত করেছে। তারা আপনাকে কা'বাঘরে প্রবেশ করতে বাধা দেবে। তিনি সাহাবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শ করলেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বললেন, আমরা উমরার নিয়ত করে এসেছি–যুদ্ধ করার জন্য আসিনি। কিন্তু কেউ যদি আমাদের ও বায়তুল্লাহ্‌র মাঝখানে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, তবে বাধ্য হয়ে তার সাথে লড়াই করা উচিত। হযরত নবী করীম (সা) এই রায় শুনে সামনে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলেন। মক্কার কুরায়শরা মুসলমানদের বাধা দেয়ার জন্য খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদকে একদল অশ্বারোহী কুরাউল-গামীম' নামক স্থানে প্রেরণ করলো। নবী (সা) আসফান থেকে রওয়ানা হয়ে রাস্তা থেকে একটু ডান দিকে সরে গিয়ে সামনে অগ্রসর হলেন এবং দ্রুত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদের নিকটে পৌঁছলেন। খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ মুসলমানদের এই হঠাৎ আগমনে হতবুদ্ধি হয়ে মক্কার দিকে দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে দিল এবং মক্কাবাসীকে মুসলমানদের অদূরে পৌঁছে যাওয়ার সংবাদ

দিল। হযরত নবী করীম (সা) অগ্রসর হতে হতে সেই পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন, যেখান থেকে অপরদিকে অবতরণ করলে মক্কা নগরীর মাঠ শুরু হয়ে যেতো। তাঁর উটনী ঐ জায়গায় বসে গেলো। লোকেরা বললো, উটনী ধোঁকা দিয়েছে। নবী করীম (সা) বললেন, উটনী ধোঁকা দেয়নি। আল্লাহ্র মর্যীর বিরুদ্ধে তোমাদের বাসনা পূর্ণ হতে পারে না।

হুদায়বিয়া প্রান্তর

হযরত মুহাম্মদ (সা) বলতে চাচ্ছিলেন যে, বায়তুল্লাহ্ ও মক্কা মুকাররমায় যে 'বালাদুল হারাম' অবস্থিত, তার উপর হামলা করা কা'বাঘরের সম্ভ্রম বিরোধী। এজন্য আল্লাহ্ তোমাদেরকে থামিয়ে দিচ্ছেন। তারপর তিনি উটনীকে ধমক দিলেন। সে বসা থেকে উঠে চলতে আরম্ভ করলো। নবী করীম (সা) হুদায়বিয়া নামক স্থানের কূপের কাছে অবস্থান নিলেন। ঐ কূপের মধ্যে খুব সামান্য পানি ছিল। একটু পরেই তা নিঃশেষ হয়ে গেলো। লোকেরা পানির কষ্টে পড়লো। হযরত নবী করীম (সা) তাঁর তূণীর থেকে একটি তীর বের করে হযরত বারা' ইব্ন আযিব (রা)-কে দিয়ে বললেন, এই তীরটি কূপের মধ্যে ফেলে দাও। তীরটি কূপের মধ্যে ফেলে দিতেই কূপের পানি বেড়ে গেলো। মুসলিম বাহিনীর আর পানির কষ্ট হলো না। হযরত নবী করীম (সা) হুদায়বিয়ায় অবস্থান নিলেন। তখন মক্কার কুরায়শদের পক্ষ থেকে বুদায়ল ইব্ন ওয়ারাকা খুযাঈ তাঁর কাছে কয়েকটি গোত্রের লোকজনসহ এসে উপস্থিত হলো এবং তাঁর আগমনের কারণ জানতে চাইল। তিনি বললেন, তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ না যে, কাফেলার সামনে কুরবানীর উটগুলো সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে এবং আমরা ইহরাম বেঁধে আছি ? বুদায়ল একথা শুনে ফিরে চলে গেলো এবং মক্কার কুরায়শদের বললো, তোমরা অহেতুক শোরগোল করছো। মুহাম্মদ (সা) তো কেবল বায়তুল্লাহ্ যিয়ারত করতে এসেছেন, তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে আসেননি। কুরায়শের কলহপরায়ণ লোকেরা বললো, আমরা তাদেরকে বায়তুল্লাহ যিয়ারত করার জন্যও আসতে দেবো না। কিন্তু তাদের সমঝদার লোকেরা একটু নিশ্চুপ হয়ে চিন্তা করতে লাগলো। তারপর মক্কাবাসী আহাবীশ গোত্রগুলোর প্রধান সরদার উলায়স ইব্ন আলামা কিনানীকে দূত হিসাবে প্রেরণ করলো। তিনি নবী করীম (সা)-এর নিকট পর্যন্তও এলেন না বরং কুরবানীর উটগুলোকে দেখে রাস্তা থেকেই ফিরে গেলেন এবং বললেন, মুসলমানরা যুদ্ধ করার জন্য আসেনি, বরং উমরাহ্ করতে এসেছে। কা'বাঘর যিয়ারতে বাধা দেয়ার কোন অধিকার কারো নেই। একথা শুনে কুরায়শরা বললো, তুমি জংলী মানুষ, কিছুই জান না। আমরা মুসলমানদেরকে কস্মিনকালেও মক্কায় প্রবেশ করতে দেবো না। তাতে আমাদের বড় বেইজ্জতি হবে। উলায়স একথা শুনে চটে গেলেন। তিনি বললেন, তোমরা যদি মুসলমানদেরকে উমরাহ করতে না দাও, তাহলে আমি আমার সমস্ত লোকজন নিয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। এই অবস্থা দেখে কুরায়শরা উলায়সের গোস্সা ঠাণ্ডা করলো এবং অনুনয়পূর্বক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাকে নিরস্ত করলো। তখন নবী (সা) খিরাশ ইব্ন উমাইয়া খুযাঈ (রা)-কে তাগালুব নামক উট দিয়ে মক্কার কুরায়শদের নিকট প্রেরণ করলেন এবং বলে পাঠালেন যে, আমরা যুদ্ধ করার জন্য আসিনি। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে শুধু কা'বাঘর যিয়ারত করা এবং কুরবানী করা। হযরত খিরাশ (রা) এই বার্তাটি কুরায়শদের নিকটে পৌঁছে দিলেন। কুরায়শরা খিরাশের উটটিকে যবেহ করলো এবং খিরাশকেও মেরে ফেলতে চাইল। কিন্তু উলায়স ও তাঁর লোকজন খিরাশকে মক্কার কুরায়শদের কবল থেকে

উদ্ধার করে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। এরপর কুরায়শের একদল উগ্র নওজোয়ান মুসলমানদের আক্রমণ করার জন্য মক্কা থেকে বের হয়ে উপত্যকায় এলো। কিন্তু সাহাবায়ে কিরাম তাদেরকে দেখে ফেললেন এবং সবাইকে গ্রেফতার করলেন। কিন্তু পরে নবী করীম (সা)-এর নির্দেশক্রমে তাদেরকে ছেড়ে দিলেন। এবার নবী (সা) ইরাদা করলেন যে, হযরত উমর ফারূক (রা)-কে মক্কাবাসীদের নিকট পাঠাবেন। হযরত উমর ফারূক (রা) বললেন, মক্কাবাসীদের নিকট যেতে আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু মক্কায় আমার গোত্র বনূ আদী ইব্‌ন কা'বের এমন কোন লোক নেই, যে আমাকে তার যিম্মায় নিতে পারে। সুতরাং আমার যাওয়াটা আশংকার কারণ হতে পারে। আমার চেয়ে ভাল হচ্ছে হযরত উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান। কেননা তাঁর গোত্রে বনূ উমাইয়ার বহু প্রভাবশালী ও শক্তিশালী লোক বর্তমান আছে। হযরত নবী করীম (সা) হযরত উমর (রা)-এর এই প্রস্তাবটি খুব পসন্দ করলেন এবং হযরত উসমান গনী (রা)-কে দূত হিসাবে আবূ সুফিয়ানের নিকট প্রেরণ করলেন। মক্কায় হযরত উসমানের সাথে সর্বপ্রথম সাক্ষাৎ হলো আবান ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন আল-'আস-এর। আবান সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে তার যিম্মায় নিয়ে নিলো এবং আবূ সুফিয়ান ও অন্যান্য কুরায়শ সরদারের নিকট নিয়ে গেলো। কুরায়শ সরদারগণ হযরত উসমান গনী (রা)-এর নিকট হযরত নবী করীম (সা)-এর বার্তা শ্রবণ করে বললো, আমরা শুধু তোমাকে কা'বাঘর তাওয়াফ করার অনুমতি দিচ্ছি। হযরত উসমান (রা) বললেন, আমি হযরত নবী করীম (সা) ছাড়া একা তাওয়াফ করতে পারি না। একথা শুনে কুরায়শরা অসন্তুষ্ট হলো এবং হযরত উসমান (রা)-কে আটকে রাখলো।

বায়আতে রিযওয়ান

হযরত উসমান (রা)-এর ফিরে আসতে যখন দেরী হলো, তখন মুসলমানদের মধ্যে এই খবর রটে গেলো যে, উসমান (রা)-কে মক্কাবাসীরা শহীদ করে দিয়েছে। এই খবর শুনতেই নবী কারীম (সা) বললেন, উসমান হত্যার প্রতিশোধ না নিয়ে আমরা এখান থেকে একটুও নড়বো না। তিনি তখনই একটি গাছের নীচে বসে পড়লেন এবং সমস্ত সাহাবা থেকে প্রাণ বিসর্জন দেয়ার বায়'আত নিলেন। এই বায়'আতই বায়'আতে রিযওয়ান নামে খ্যাত। কুরআনুল করীমে এর উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে–

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ .

মু'মিনরা যখন বৃক্ষতলে আপনার নিকট বায়'আত গ্রহণ করলো, তখন আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন। (৪৮ : ১৮)

কিন্তু কিছুক্ষণ পরই হযরত উসমান গনী (রা) মক্কা থেকে চলে এলেন এবং তিনিও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট অনুরূপ বায়'আত গ্রহণ করলেন। মক্কার কাফিরদের দূরদর্শী ও বুদ্ধিমান লোকেরা লড়াই করা অপসন্দ করেছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোকই ছিল কলহপরায়ণ। এক্ষণে মুসলমানদের রণ-প্রস্তুতি দেখে এই ফাসাদী লোকেরাও কিছুটা সন্ধি ও সমঝোতার দিকে ঝুঁকলো। তাই মক্কাবাসীরা বনূ সাকীফের সরদার উরওয়া ইব্‌ন মাসউদকে হযরত নবী (সা)-এর নিকট প্রেরণ করলো। উরওয়া এসে বললো, মুহাম্মদ (সা)! কুরায়শের গোত্র তোমাদের মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত। তোমার সাথে যেসব লোক আছে মুকাবিলার সময়

তারা সবাই তোমাকে একাকী রেখে পলায়ন করবে। কুরায়শদের সামনে তারা কস্মিনকালেও তিষ্টাতে পারবে না। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) উরওয়ার এই কথা শুনে অতি কঠোর ভাষায় দাঁতভাংগা জবাব দিলেন। উরওয়া নীরব হয়ে গেলো। হযরত নবী করীম (সা) উরওয়াকে বললেন, আমরা যুদ্ধ করার জন্য আসিনি, উমরাহ্ করার জন্য এসেছি। কিন্তু মক্কাবাসী যদি লড়াই করতে চায়, তবে আমি আমার নবুওয়াতের কাজের জন্য আমার হাড় থেকে গোশত বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত কিংবা আল্লাহ্ তাঁর ফায়সালা ঘোষণা না করা পর্যন্ত তাদের সাথে লড়াই করবো। মক্কাবাসী যদি চায়, তবে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আমার সাথে যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি করতে পারে। এই সময়ে তারা আমাকে ইসলাম প্রচার করতে দেবে আর ইচ্ছা হলে স্বয়ং নিজেরাও ইসলাম গ্রহণ করে চিরতরে যুদ্ধ-বিগ্রহ শেষ করে দেবে।

রাসূল আকরাম (সা)-এর প্রতি সাহাবাদের প্রাণপূর্ণ ভালবাসা

উরওয়া যখন নবী করীম (সা)-এর সাথে কথা বলছিল, তখন সে তার হাত বিস্তার করে করে তাঁর দাড়ির কাছে নিয়ে যেত। হযরত মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) তার এই আচরণ বরদাশত করতে পারলেন না। তিনি তাঁর তরবারির হাতল উরওয়ার হাতের উপর মারলেন এবং তাকে আদবের সাথে কথা বলতে বললেন। উরওয়া মক্কার কুরায়শদের কাছে ফিরে গিয়ে বললো, হে কুরায়শ সম্প্রদায়! আমি রোমের কায়সার ও পারস্যের কিসরার দরবার দেখেছি, কিন্তু আমি কোন বাদশাহকে তাঁর সহচরদের মধ্যে এতো প্রিয় ও মর্যাদাবান পাইনি, যেমনটি মুহাম্মদ (সা)-কে তাঁর আসহাবদের মধ্যে প্রিয় ও মর্যাদাবান পেলাম। মুহাম্মদ (সা)-এর আসহাবদের অবস্থা এই যে, তাঁরা মুহাম্মদ (সা)-এর ওযূর পানি মাটিতে পড়তে দেন না। তিনি যখন কথা বলেন, তখন সবাই চুপ করে শোনেন এবং শ্রদ্ধাবশত তাঁর দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকান না। এঁরা কোনক্রমেই মুহাম্মদ (সা)-এর সঙ্গ ত্যাগ করতে পারবে না। মুহাম্মদ (সা) যে প্রস্তাব তোমাদের সামনে পেশ করেছে, তা কবূল করে নেওয়া এবং তাঁর সন্ধি প্রস্তাব মেনে নেয়াই তোমাদের পক্ষে শ্রেয়। এরপর মক্কার কুরায়শরা সুহায়ল ইব্‌ন আমরকে তাদের সর্বময় প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করলো এবং তাকে বলে দিলো যে, সন্ধি কেবল এভাবেই হতে পারে যে, এ বছর মুহাম্মদ (সা) তাঁর সহচরদের নিয়ে ফিরে যাবেন এবং আগামী বছর এসে উমরাহ করবেন। নবী করীম (সা) যখন দূর থেকে সুহায়লকে আসতে দেখলেন তখন বললেন, ব্যাপার এবার 'সহল' (সহজ) হয়ে গেলো। কুরায়শরা যখন ঐ ব্যক্তিকে পাঠিয়েছে, তখন তারা সন্ধি করারই নিয়ত করেছে। সুতরাং সুহায়ল সন্ধির শর্তাবলী পেশ করলো। নবী (সা)-ও সে শর্তগুলো মেনে নিলেন এবং তখনই হযরত আলী (রা)-কে সন্ধিপত্র লেখার জন্য ডেকে পাঠালেন। হযরত আলী (রা) সন্ধিপত্রের শীর্ষে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ লিখলেন। সুহায়ল বললেন, আমরা رحمن-কে চিনি না। তুমি আমাদের রীতি অনুসারে باسمك الله লিখ। নবী (সা) বললো, ঠিক আছে, ঐভাবেই লিখ। এরপর হযরত আলী (রা)-এর নাম محمد رسول الله লিখলেন, তখন সুহায়ল তার উপরও আপত্তি করলো এবং বললো, আমরা যদি তাঁকে রাসূলই মানতাম, তবে তো ব্যাপারটি এ পর্যন্ত গড়াতোই না। তুমি শুধু محمد بن عبد الله লিখ। নবী (সা) বললেন, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল, তোমরা তা মান বা না মান। তারপর হযরত আলী (রা)-কে সম্বোধন করে বললেন, সুহায়লের ইচ্ছা অনুযায়ী ঐ শব্দটি কেটে দাও। হযরত আলী (রা) বললেন, আমি আমার কলম দিয়ে رسول الله শব্দ কাটতে পারবো না। তিনি বললেন,

দাও, আমি আমার হাত দিয়ে কেটে দিচ্ছি। এই বলে তিনি স্বয়ং তাঁর হস্ত মুবারক দিয়ে ঐ শব্দটি কেটে দিলেন।

শর্তসমূহ

সন্ধিপত্র বা চুক্তিপত্রের শর্তসমূহ ছিল এরূপ :

১. মুসলমানরা এ বছর উমরাহ্ করবে না, আগামী বছর এসে উমরাহ করবে। মক্কায় প্রবেশকালে তরবারি ছাড়া কোন হাতিয়ার তাদের নিকট থাকবে না। তরবারিও কোষবদ্ধ থাকবে। আর তিন দিনের বেশী মক্কায় অবস্থান করবে না।

২. সন্ধির সময়কাল হবে দশ বছর। এই সময়ের মধ্যে কোন পক্ষ অপর পক্ষের জান ও মালের উপর আদৌ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না, পরস্পর শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে বসবাস করবে।

৩. আরবের প্রতিটি গোত্র ও প্রতিটি সম্প্রদায় যে কোন পক্ষের সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে পারবে। ঐ চুক্তিবদ্ধ গোত্র ও সম্প্রদায়ের উপরও এই সন্ধিপত্রের শর্তসমূহ একইভাবে প্রযোজ্য হবে। উভয় পক্ষেরই অন্যান্য গোত্রকে নিজেদের দলভুক্ত করার এখতিয়ার থাকবে।

৪. যদি কুরায়শদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি তার ওয়ালীর অনুমতি ছাড়া মুসলমানদের নিকট চলে যায়, তবে তাকে কুরায়শদের নিকট ফেরত পাঠাতে হবে। কিন্তু কোন মুসলমান কুরায়শদের কাছে এলে তাকে ফেরত পাঠানো হবে না।

সন্ধিচুক্তির প্রতিক্রিয়া

এই চুক্তির চতুর্থ শর্তটি সাহাবায়ে কিরামের নিকট অসহনীয় ঠেকছিল। ঘটনাক্রমে চুক্তিপত্র লেখার সময়ই খোদ সুহায়লের পুত্র আবূ জান্দাল (রা) যিনি মুসলমান হয়েছিলেন এবং এই অপরাধে তাঁকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল–কোনক্রমে কয়েদ থেকে বের হয়ে নবী করীম (সা)-এর নিকটে পালিয়ে এলেন। হযরত আবূ জান্দাল (রা)-কে কাফিররা ইসলাম গ্রহণের অপরাধে নির্মমভাবে দৈহিক নির্যাতন করেছিল। তাঁর শরীরে তখনো যখমের দাগ ও তাজা ঘা দগদগ করছিল। তিনি তাঁর সেই যখম দেখিয়ে নবী করীম (সা)-এর নিকট ফরিয়াদ করলেন যে, আমাকে অবশ্যই আপনার সাথে মদীনায় নিয়ে যাবেন। সুহায়ল বললো, চুক্তিপত্রের শর্ত অনুসারে আবূ জান্দালকে আমরা ফেরত পাবো। নবী করীম (সা) সুহায়লকে বোঝালেন কিন্তু সে সম্মত হলো না। শেষে আবূ জান্দালকে সুহায়লের নিকটে সোপর্দ করা হলো। সুহায়ল সেখান থেকেই আবূ জান্দালকে মারতে মারতে মক্কার দিকে নিয়ে গেলো। এই দৃশ্য দেখে হযরত উমর (রা) অধীর হয়ে উঠলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ নবী করীম (সা)-এর নিকট গিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি সত্য নবী নন? তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে আমি সত্য নবী। হযরত উমর (রা) বললেন, আমরা কি মুসলমান নই? তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে তোমরা মুসলমান। হযরত উমর (রা) আবার বললেন, তারা কি মুশরিক নয়? তিনি বললেন, তারা অবশ্যই মুশরিক। হযরত উমর (রা) বললেন, তাহলে আমরা দীনের ব্যাপারে এত অপমান কেন সহ্য করবো? তিনি বললেন, আমি আল্লাহ্র রাসূল। তাই তাঁর হুকুমের বরখেলাফ ও বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারি না। তিনি আমাকে কখনো অপদস্থ করবেন না। এরপর যখন হযরত উমর

(রা)-এর রাগ ঠাণ্ডা হলো, তখন তিনি তাঁর এই স্পর্ধা ও ঔদ্ধত্যের জন্য খুবই লজ্জিত হলেন। সারা জীবন তওবা ও ইস্‌তিগফার করতেন এবং গোলাম আযাদ করতে থাকেন।

সুস্পষ্ট বিজয়

সন্ধিপত্র সম্পন্ন হওয়ার পর নবী করীম (সা) ও মুসলমানগণ হুদায়বিয়ায় কুরবানী করলেন। ইহ্‌রাম খুললেন এবং ক্ষৌরকার্য করালেন। এই সন্ধিপত্র বা চুক্তিপত্রের পর বনূ খুযাআ নবী করীম (সা)-এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হলো। আর বনূ বকর চুক্তিবদ্ধ হলো মক্কার কুরায়শের সাথে। বনূ খুযাআ ও বনূ বকরের মধ্যে বহুকাল ধরে শত্রুতা চলে আসছিল। এরা উভয়েই যেহেতু এক এক পক্ষের চুক্তিবদ্ধ মিত্র বনে গেল, সেহেতু নবী করীম (সা) ও কুরায়শের মধ্যে যেমন শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে বসবাস করার চুক্তি হলো তেমনি ঐ দুই গোত্রের মধ্যেও সন্ধি হয়ে গেলো। নবী করীম (সা) যখন হুদায়বিয়া থেকে মদীনা প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন পথিমধ্যে সূরা ফাত্‌হ নাযিল হলো এবং সাহাবায়ে কিরাম যে সন্ধিকে এক রকম পরাজয় মনে করছিলেন আল্লাহ তা'আলা তাকে 'সুস্পষ্ট বিজয়' ঘোষণা করলেন। প্রকৃতপক্ষে এই সন্ধি ইসলামের জন্য সুস্পষ্ট বিজয়ই ছিল। সাহাবায়ে কিরামের এই সন্ধিকে পরাজয় ভাবার কারণ ছিল, বাহ্যত এর কোন কোন শর্তের মধ্যে তাঁদের হার ও দুর্বলতা প্রকাশ পাচ্ছিল। কিন্তু অনতিকাল পরেই জানা গেল যে, ঐ দুর্বল শর্তগুলোই ছিল অপরিসীম কল্যাণকর শর্ত। ইসলামের জন্য সবচেয়ে বড় বিজয় ছিল যুদ্ধবিগ্রহের পথ বন্ধ হয়ে শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিরতা লাভ। ইসলাম যতখানি শান্তি ও নিরাপদ অবস্থায় তার গণ্ডি বিস্তার করতে পারত, লড়াই ও যুদ্ধ-বিগ্রহের অবস্থায় ততখানি বিস্তার হতে পারত না। ইসলামের আসল উদ্দেশ্যই হচ্ছে দুনিয়ায় মানুষ শান্তি ও নিরাপদ জীবন যাপন করবে। ইসলামকে লড়াইও করতে হয় এই শান্তি ও নিরাপত্তা কায়েম করার জন্যই। ইসলামের যুদ্ধ যুদ্ধের জন্য নয়, বরং যুদ্ধ মিটানো ও শান্তি কায়েম করার জন্য। তাই দেখা যায়, হুদায়বিয়ার সন্ধির পর মাত্র দু'বছরের মধ্যেই মুসলমানদের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছিল।

হুদায়বিয়া সন্ধির ফলাফল

সাহাবায়ে কিরামের নিকট চুক্তির চতুর্থ শর্তটি সবচেয়ে বেশী অসহনীয় মনে হয়েছিল। এখন সেই শর্তের ফলাফল দেখুন : কয়েক দিন পর আবূ বাসীর (রা) নামক এক ব্যক্তি যিনি মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন—মক্কার জীবন যাত্রায় অতিষ্ঠ হয়ে পলায়ন করলেন এবং মদীনায় এসে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। কুরায়শরা দু'জন লোক নবী করীম (সা)-এর নিকট পাঠালো এবং চুক্তি মুতাবিক আবূ বাসীর (রা)-কে ফেরত চাইল। তিনি আবূ বাসীর (রা)-এর ইচ্ছার উপর চুক্তির পাবন্দীকে প্রাধান্য দিলেন এবং ঐ দু'ব্যক্তির সাথে আবূ বাসীরকে ফেরত পাঠালেন। আবূ বাসীর (রা) মক্কায় ফিরে যাওয়াকে মৃত্যুর চেয়েও নিকৃষ্টতর মনে করছিলেন। তাই যুল-হুলায়ফা পৌঁছে তিনি একটি মুক্তি-পথ খুঁজলেন। তিনি তাঁর রক্ষীদের মধ্য থেকে একজনকে বললেন, তোমার তলোয়ারটি খুব উন্নত মানের মনে হচ্ছে। অপর রক্ষী একথা শুনে তার সঙ্গীর তলোয়ারটি অনাবৃত করে হাতে নিলো এবং প্রশংসা করতে লাগলো। আবূ বাসীর (রা) বললেন, আমাকে একটু দেখাও তো! সে সরল মনে তলোয়ারটি আবূ বাসীরের হাতে দিয়ে দিল। আবূ বাসীর (রা) তলোয়ারটি হাতে নিয়েই এমন সুনিপুণভাবে আঘাত হানলেন যে, এক আঘাতেই তাদের একজনের মস্তক ছিন্ন হয়ে গেল। আর অপরজন দ্রুত উঠে পলায়ন করলো। আবূ বাসীর (রা) তলোয়ার নিয়ে তার পিছে পিছে ছুটলেন। সে সেখান থেকে সোজা

মদীনার দিকে পালালো এবং আবূ বাসীরের আগেই মদীনায় প্রবেশ করে বোধশূন্য অবস্থায় মসজিদে নববীতে উপস্থিত হলো। তারপর নবী করীম (সা)-কে তার সঙ্গীর নিহত হওয়ার ঘটনা বিবৃত করলো। সে যখন ঘটনা বর্ণনা করছিল, তখন আবূ বাসীরও তলোয়ার হাতে সেখানে উপস্থিত হলেন। নবী করীম (সা) আবূ বাসীরকে দেখে বললেন, এই লোকটি যুদ্ধের আগুন জ্বালাতে চায়। একে সাহায্য করা হলে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠবে। তাঁর পবিত্র যবানে এই কথা শুনে আবূ বাসীর (রা) নিশ্চিত বুঝতে পারলেন যে, মদীনায় তার অবস্থান করা কঠিন। তিনি নবী করীম (সা)-কে বললেন যে আপনি তো আপনার চুক্তি পালন করেছেন এবং আমাকে সেই মুশরিকদের হাতে সোপর্দ করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ আমাকে আবার মুক্ত করেছেন। আপনি আপনার চুক্তি পালনার্থে আমাকে আবার মুশরিকদের হাতে অর্পণ করবেন। তাই আমি চললাম। এই কথা বলে তিনি সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। কুরায়শ লোকটি মক্কায় চলে গেল এবং সকল বৃত্তান্ত মক্কার কুরায়শদের শোনালো। আবূ বাসীর (রা) মদীনা থেকে প্রস্থান করে সমুদ্র উপকূলের অদূরবর্তী 'ঈশ' নামক স্থানে বসতি স্থাপন করলেন।

আবূ জান্দাল (রা) ইব্‌ন সুহায়লের বৃত্তান্ত পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। তিনি আবূ বাসীরের কাহিনী শুনে মক্কা থেকে পালিয়ে সোজা আবূ বাসীরের নিকট ঈসে চলে গেলেন। তারপর একের পর এক যে ব্যক্তিই মক্কায় মুসলমান হতেন, তিনি মক্কা থেকে পালিয়ে আবূ বাসীরের দলে শরীক হতেন। ক্রমে ক্রমে তাদের একটি প্রকাণ্ড দল ঈসে গড়ে উঠলো। তখন এই দলটি মক্কার কুরায়শদের সিরিয়াগামী বাণিজ্যিক কাফেলার উপর হামলা করতে শুরু করলো। মক্কার কুরায়শদের জন্য এই দলটি এতই বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ালো যে, তাদের নাকে দম আটকে যাওয়ার উপক্রম হলো। তারা ত্যক্ত ও বিরক্ত হয়ে শেষে বিনয় সহকারে নবী করীম (সা)-এর কাছে এই মর্মে বার্তা পাঠালো যে, "আমরা চুক্তির চতুর্থ দফাটি বাতিল ঘোষণা করলাম। এখন থেকে যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে মক্কা থেকে মদীনায় যাবে, আমরা তাকে কখনো ফেরত নেবো না এবং অনুগ্রহ করে আপনি ঈসের মুসলমানদের অর্থাৎ আবূ বাসীরের দলকেও আপনার নিকট মদীনায় ডেকে নিন।" নবী করীম (সা) মক্কার কুরায়শদের এই দরখাস্ত মনযূর করলেন এবং আবূ বাসীরকে বলে পাঠালেন যে, তুমি তোমার জামাআতসহ মদীনায় চলে এসো। নবী করীম (সা)-এর এই বার্তা যখন ঈসে গিয়ে পৌঁছলো, তখন আবূ বাসীর (রা) রোগশয্যায় শায়িত ছিলেন। তিনি আবূ জান্দাল (রা)-কে ডেকে বললেন যে, তোমরা এই নির্দেশ পালন করো। এরপর আবূ বাসীর ইনতিকাল করলেন এবং আবূ জান্দাল (রা) তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে মদীনায় চলে এলেন। আবূ বাসীর (রা)-এর উল্লিখিত ঘটনা হুদায়বিয়ার চুক্তি প্রসঙ্গে এখানে ধারাবাহিক বর্ণিত হলো। অন্যথায় এর সম্পর্ক হচ্ছে ষষ্ঠ হিজরীর ঘটনারাজির সাথে।

আবিসিনিয়ায় মুহাজিরদের প্রত্যাবর্তন

হুদায়বিয়া থেকে ফিরে এসে নবী করীম (সা) আমর ইব্‌ন উমাইয়া (রা) দামরীকে আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজাশীর নিকট একটি পত্র দিয়ে পাঠালেন। উদ্দেশ্য-হযরত জা'ফর ইব্‌ন আবী তালিব ও সকল মুসলিম মুহাজিরকে আবিসিনিয়া থেকে মদীনায় ফিরিয়ে আনা। উক্ত পত্রে তিনি নাজাশীকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন। নাজাশী পত্র পাঠ করে সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং প্রচুর হাদিয়া তোহ্‌ফাসহ মুসলমানদের মদীনায় পাঠিয়ে দিলেন। নবী করীম (সা) হুদায়বিয়া থেকে ফিরে এসে যুলহাজ্জ মাসে মদীনায় পৌঁছলেন। সপ্তম

হিজরীর মুহাররম মাস পর্যন্ত মদীনায় অবস্থান করলেন। ষষ্ঠ হিজরীর শেষ দিকে তিনি মুসলমানদের মধ্যে ইট ও ঘোড়দৌড়ের রীতি প্রবর্তন করেন। হযরত আয়িশা (রা)-এর আম্মা এই বছরই ইনতিকাল করেন এবং হযরত আবূ হুরায়রা (রা) এই বছরই মুসলমান হন।

খায়বার বিজয়

হিজরতের সপ্তম বছর

হুদায়বিয়া সন্ধির পর নবী করীম (সা) মক্কার মুশরিকদের তরফ থেকে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু মদীনা এসে জানা গেল যে, খায়বার এলাকায় মুসলমানদের মূলোচ্ছেদ ও মদীনা আক্রমণের আয়োজন সম্পন্ন হতে চলছে। মদীনা থেকে বনূ নাযীর ও বনূ কুরায়যা দেশান্তরিত হয়ে খায়বারেই বসতি স্থাপন করেছিল। এইসব ইয়াহূদীর অন্তরে মুসলমানদের শত্রুতার অগ্নিকুণ্ড দাউ দাউ করে জ্বলছিল। তারা খায়বারের ইয়াহূদীদেরকেও মুসলমানদের বিরুদ্ধে দ্রুত সংগঠিত করে ফেললো। মক্কার পরে তখন মুসলমানদের বিরোধিতা ও শত্রুতার সবচেয়ে বড় কেন্দ্র ছিল খায়বার। তারা ইয়াহূদীদের প্রায় সবগুলো শক্তিশালী গোত্রকেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে ব্যাপৃত ছিল। এখন তারা মুসলমানদের মুকাবিলা ও মূলোৎপাটনের রণ-প্রস্তুতি আরম্ভ করলো। আরবের বনূ গাতফানকে তারা মদীনার অর্ধেক ফসলদানের শর্তে নিজেদের সাথে শরীক করলো।

ইয়াহূদীদের রণ-প্রস্তুতি সামান্য ছিল না বরং তার পরিধি ছিল অতি বিস্তৃত ও তাদের ষড়যন্ত্র ছিল অতি ভয়াবহ। তারা মদীনার মুনাফিকদেরকে তাদের দোসর বানিয়ে নিয়েছিল। ঐ মুনাফিক গুপ্তচরদের মাধ্যমে তারা খায়বারের দূর প্রদেশে বসেও মুসলমানদের প্রতিটি কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত থাকতো। হযরত নবী করীম (সা) ইয়াহূদীদের এইসব আয়োজনের কথা শুনে সপ্তম হিজরীর মুহাররম মাসে পনেরশ' সাহাবা নিয়ে—যাদের মধ্যে দু'শ' ছিলেন আরোহী-মদীনা থেকে খায়বারের দিকে যাত্রা করলেন এবং মদীনায় হযরত সাব্বাআ ইব্‌ন আরফাতা (রা)-কে শাসক বানিয়ে রেখে গেলেন। তিনি খায়বারের কাছাকাছি পৌঁছে খায়বার ও বনূ গাতফানের মধ্যবর্তী রাজী নামক স্থানে শিবির স্থাপন করলেন। বনূ গাতফান আশংকা করলো যে, মুসলমানরা তাদের বস্তির উপর হামলা করতে পারে। তাই তারা নিজেদের ঘরেই প্রতিরোধ ও মুকাবিলার জন্য অবস্থান করলো, খায়বারের ইয়াহূদীদের সাহায্যার্থে যেতে পারলো না।

খায়বার এলাকায় ইয়াহূদীদের নিকট পরস্পরের কাছাকাছি ছয়টি বিশাল দুর্গ ছিল। ইয়াহূদীরা ইসলামী সৈন্য পৌঁছার পর ময়দানে বের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী আহবান করলেন। তাদের মধ্যে মারহাব ও ইয়াসির নামক দুইজন মস্ত বড় বাহাদুর ও হস্তী-বপু যোদ্ধা ছিলেন। তারা যখন ময়দানে বের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী আহবান করলো, তখন মুসলমানদের পক্ষ থেকে হযরত মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামা (রা) ও হযরত যুবায়র ইবনুল আওয়াম (রা) সামনে এলেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামা (রা) মারহাবকে এবং যুবায়র ইব্‌নুল আওয়াম (রা) ইয়াসিরকে হত্যা করলেন। কোন কোন রিওয়ায়াতে মারহাব হযরত আলী (রা) কর্তৃক নিহত হয়েছে বলে বর্ণিত হয়েছে।

যুদ্ধের ময়দানে ইয়াহূদীরা মুসলমানদের মুকাবিলা করা কঠিন ভাবলো। তাই তারা কিল্লাবন্দী ও দুর্গাশ্রয়ী হওয়া শ্রেয় মনে করলো। এই দুর্গগুলোর মধ্যে মাআব ইব্‌ন মু'আযের দুর্গটি সবচেয়ে বেশী মজবুত ও এমন স্থানে অবস্থিত ছিল, যেখান থেকে অন্য সবগুলো দুর্গে সাহায্য পৌঁছে যেতো। মুসলিম বাহিনী সর্ব প্রথম নাঈম দুর্গে আক্রমণ করলেন এবং কঠিন পরিশ্রম ও মুকাবিলার পর নাঈম দুর্গ দখল করলেন। এই দুর্গ আক্রমণ করার সময় হযরত মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামা (রা)-এর উপর দুর্গবাসীরা উপর থেকে পাথরের একটি যাঁতা ফেলে দিয়েছিল এবং তাতেই তিনি শাহাদত বরণ করেন। তারপর আবুল হাকীক ইয়াহূদীর কামূস দুর্গ আক্রমণ করা হলো। এ দুর্গটিও মুসলমানদের দখলে এলো। এই দুর্গ থেকে সাফিয়্যা বিন্‌ত হুই ইব্‌ন আখতাব ও অন্যান্য বহু কয়েদী মুসলমানদের করায়ত্ত হলো। সাফিয়্যা বিন্‌ত হুই'র বিবাহ কিনানা ইব্‌নুর রবীঈ ইব্‌ন আবিল হাকীক-এর সাথে হয়েছিল। গ্রেফতারের পর তিনি হযরত দাহ্‌য়া কালবী (রা)-এর ভাগে পড়েছিলেন। তাঁর নিকট থেকে হযরত নবী করীম (সা) তাকে খরিদ করে আযাদ করে দেন। তারপর তিনি হযরত নবী করীম (সা)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। কামূসের পর সাইব ইব্‌ন মুআযের দুর্গ বিজিত হলো। এরপর খায়বারের চতুর্থ দুর্গও মুসলমানদের দখলে এলো।

অবশেষে ওয়াতীহ্ ও মুসলিম নামক দু'টি দুর্গ বাকী থাকলো। মুসলমানরা সে দু'টিকে দশ দিন পর্যন্ত অবরোধ করে রাখলেন। অবরুদ্ধ ইয়াহূদীরা যখন অবরোধের তীব্রতার দরুন কাবু হয়ে পড়লো, তখন তারা হযরত নবী করীম (সা)-এর নিকট বার্তা পাঠালো যে, খাজনা (খারাজ) হিসাবে অর্ধেক ফসল নেয়ার শর্তে যদি আমাদেরকে আমাদের জমির মালিক রাখা হয়, তাহলে আমরা আপনার আনুগত্য মেনে নিতে প্রস্তুত। সেমতে ঐ সব ইয়াহূদীকে কৃষি ভূমি ও বাগানের অর্ধেক ফসল খাজনা (খারাজ) দেয়ার শর্তে প্রজা হিসাবে তাদের ভূ-সম্পত্তি দখলে রাখতে ও বসবাস করতে দেয়া হলো। হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতের শেষ সময় পর্যন্ত খায়বারে তারা বসবাস করে।

খায়বারের এই যুদ্ধে পনের জন মুসলমান শাহাদত বরণ করেন : চারজন মুহাজির ও এগার জন আনসার। আর ৯২ জন ইয়াহূদী নিহত হয়। এই যুদ্ধেই গৃহপালিত গাধার গোশত মুসলমানদের জন্য হারাম ঘোষণা করা হয়। এই যুদ্ধে মুত্‌আ বিবাহ চিরদিনের জন্য হারাম করা হয়। ইয়াহূদীদের এক সরদার সালাম ইব্‌ন মাশকামের স্ত্রী যয়নাব বিনতুল হারিছ বিষ মিশ্রিত একটি আস্ত ভুনা বকরী নবী করীম (সা)-কে হাদিয়া স্বরূপ দান করেছিল। তিনি এবং তাঁর সাথে হযরত বিশর ইবনুল বারা' ইব্‌ন মারূর সেটি খেতে আরম্ভ করলেন। হযরত নবী করীম সেটি মুখে দিয়েই থু থু করে ফেলে দিলেন এবং বললেন, এই বকরীর হাড়গুলোই আমাকে বলছে যে, এতে বিষ মিশ্রিত রয়েছে। কিন্তু হযরত বিশর (রা) সেটির কিছু গোশ্‌ত চিবিয়ে গিলে ফেলেছিলেন। তাই তিনি তৎক্ষণাৎ শাহাদত বরণ করলেন। ইয়াহূদী নারী যয়নাবকে ডাকা হলো। সে বিষ মিশ্রণ করার কথা স্বীকার করলো। তাই তাকে হযরত বিশর (রা)-এর ওয়ারিছদের হাতে সোপর্দ করা হলো। কিন্তু তারা তাকে হত্যা করলেন না। কেননা সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

তখন খায়বার থেকে মদীনায় ফিরে আসার প্রস্তুতি চলছিল। এই সময় আবিসিনিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনকারী মুহাজিরদের কাফেলা আবিসিনিয়া সম্রাটের চিঠি ও হাদিয়া নিয়ে হযরত নবী

করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হলো। এই কাফেলায় হযরত জা'ফর ইব্ন আবী তালিব (রা), তাঁর স্ত্রী আসমা বিন্ত উমায়স (রা), তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ্ (রা), আওন (রা), মুহাম্মদ (রা) এবং হযরত খালিদ ইব্ন সাঈদ ইবনুল 'আস ইব্ন উমাইয়া (রা), তাঁর স্ত্রী আমীনা বিনত খুলাফা ও তাঁর পুত্র সাঈদ (রা) এবং হযরত উম্মে খালিদ (রা), হযরত আমর ইব্ন সাঈদ (রা), হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা), হযরত জাহ্ম ইব্ন কায়স (রা), হযরত হারছ ইব্ন খালিদ (রা), হযরত মুহায়না ইব্ন হাতিব ইব্ন আমর, হযরত মুআম্মার ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা), হযরত আবূ হাতিব ইব্ন আমর (রা), হযরত মালিক ইব্ন রবীআ ইব্ন কায়স (রা) ও হযরত আমর ইব্ন উমাইয়া দামরী (রা)– যিনি এঁদেরকে আনতে গিয়েছিলেন– শামিল ছিলেন। হযরত নবী করীম (সা) এই মু'মিনদের মাঝে মিলিত হয়ে খুব খুশী হলেন।

খায়বার থেকে ফেরার পথে অদূরেই ফাদাক নামক স্থান। সেখানকার ইয়াহূদীরা বার্তা পাঠালো যে, আমাদেরকে শুধু আমাদের জীবনের নিরাপত্তা দান করা হোক, আমাদের ধন-সম্পদের কোন প্রয়োজন নেই। হযরত নবী করীম (সা) তাদের এই আবেদন মনযূর করলেন। তাই ফাদাক আক্রমণ করা হলো না এবং তাদের উপর কোন আরোহী ও পদাতিকের অসি ও বর্শা চালানোর কোন সুযোগ মেলেনি। তাই আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ অনুসারে ঐ ধন-সম্পদগুলোকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সম্পদ মনে করা হলো এবং সেগুলো বায়তুল মালের সম্পদরূপে গণ্য হলো।

সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে মুসলিম বাহিনী ওয়াদিল কুরা' চলে এলেন। সেখানকার ইয়াহূদীরা মুসলমানদের উপর তীর নিক্ষেপ শুরু করলো। তাই তাদেরকেও অবরোধ করা হলো এবং অবশেষে খায়বারবাসীদের মতো অর্ধেক ফসল খাজনা (খারাজ) দেয়ার শর্তে আনুগত্য স্বীকার করলো। ওয়াদিল কুরায় মাত্র একজন সাহাবী হযরত মুদআম (রা) শহীদ হন। ওয়াদিল কুরার অদূরে তায়মা নামক একটি স্থান ছিল। সেখানকার ইয়াহূদীরাও ওয়াদিল কুরার অধিবাসীদের মতোই আনুগত্য স্বীকার করলো।

খায়বার বিজয়ের পর

খায়বার জয় করে ফেরার সময় একটি মনযিলে ভোর বেলা হযরত মুহাম্মদ (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের কারোই ঘুম ভাঙ্গলো না। সকল মুসলিম মুজাহিদ ঘুমিয়ে রইলেন। এদিকে সূর্য উপরে উঠে গেলো। সবার আগে হযরত নবী করীম (সা)-এরই ঘুম ভাঙ্গল। তিনি সবাইকে জাগালেন এবং সেখান থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে তিনি ও সকল সাহাবা ফজরের সালাত আদায় করলেন। তিনি বললেন, এইভাবে যদি তোমাদের ঘুম না ভাঙ্গে, তবে যখন ঘুম ভাঙ্গবে, তখনই তোমরা সালাত আদায় করবে।

ইয়াহূদীরা খুব বিত্তশালী ছিল। খায়বারের যেসব জমি ইয়াহূদীদের অধিকারে ছিল, তাও ছিল খুব উর্বর ও মূল্যবান। খায়বার জয়ের মালে গনীমত ও কৃষিজমি মুসলমানদের মধ্যে বণ্টিত হওয়ার পর মুহাজিরদের দুরবস্থা ও দারিদ্র্য দূর হয়ে গেল। মুহাজিরগণ সম্পদশালীও হয়ে গেলেন এবং আনসারদের আর্থিক সাহায্য দ্বারাও তাঁরা অভাবমুক্ত হয়ে গেলেন। হযরত নবী করীম (সা) তখনো পর্যন্ত তাঁর ব্যক্তিগত খরচপত্র ও পরিবার-পরিজনদের জন্য কোন সাহাবীকে কষ্ট দেননি। আনসার বা মুহাজিরদের তরফ থেকে কোন হাদিয়া আসলে তিনিও নিজের পক্ষ থেকে তাঁদেরকে হাদিয়া পাঠাতেন। খায়বারের যমীন থেকে হযরত নবী করীম

(সা)-এর ভাগে পড়েছিল ফাদাকের সম্পত্তি। এর দ্বারা তিনি তাঁর মেহমানদের মেহমানদারী এবং বনূ কুরায়যার যমীন থেকে তাঁর আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীন ও গরীব মুসলমানদের প্রতিপালন করতেন। মক্কার মুশরিকরা যখন মুসলমানদের খায়বার আক্রমণের খবর পেলো, তখন তারা অধীর হয়ে এই যুদ্ধের ফলাফল প্রত্যক্ষ করার অপেক্ষায় রইল। হাজ্জাজ ইব্‌ন ইলাত সালমী (রা) নামক জনৈক মক্কাবাসী খুব বিত্তশালী ছিলেন। তিনি ভ্রমণের অজুহাতে বের হয়ে হযরত নবী করীম (সা)-এর নিকট হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং খায়বারের যুদ্ধে তাঁর সঙ্গে ছিলেন। বিজয়ের পর তিনি তাঁকে বললেন, এখন পর্যন্ত মক্কাবাসী আমার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে কিছু জানতে পারেনি। আপনি অনুমতি দিলে আমি মক্কায় গিয়ে আমার স্ত্রীর কাছে রক্ষিত অর্থ এবং লোকদের দেয়া ঋণ আদায় করে নিয়ে আসতে পারি। তিনি অনুমতি দিলেন। হাজ্জাজ ইব্‌ন ইলাত (রা) মক্কায় পৌঁছে দেখতে পেলেন যে, মক্কাবাসী খায়বারের খবর জানার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। তিনি মক্কাবাসীদের সাথে এক আজব কৌতুক করলেন। তাদের কাছে খায়বারের আসল খবর বর্ণনা না করে তাঁর অর্থ আদায় করার ক্ষেত্রে সবার সাহায্য নিলেন। সমস্ত অর্থ বুঝে নিয়ে এবং কেবল হযরত আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা)-কে বিদায়ের সময় খায়বার বিজয়ের আসল সংবাদ শুনিয়ে মক্কা থেকে রওয়ানা দিলেন। এরপর কাফিররা যখন হাজ্জাজের মুসলমান হওয়া এবং খায়বারে মুসলমানদের জয় লাভ করার খবর জানতে পারলো, তখন তারা আফসোসে হাত কচলাতে লাগলো এবং হাজ্জাজের এইভাবে সকল সম্পদসহ নির্বিঘ্নে কেটে পড়ার দরুন আরো হা-পিত্যেশ করতে লাগলো।

খায়বার থেকে মদীনায় ফিরে এসে হযরত নবী করীম (সা) যেসব গোত্র মুসলমানদের মূলোচ্ছেদ করার অপচেষ্টা ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল, তাদের উচিত শিক্ষাদান ও ভীতির সঞ্চারের জন্য বিভিন্ন দিকে ভিন্ন ভিন্ন সেনাদল প্রেরণ করলেন; যাতে কোন বড় বিদ্রোহ ও ভয়ানক ষড়যন্ত্র পল্লবিত হতে না পারে। নজদের ফাযারা গোত্রের দিকে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) ও অন্যান্য সাহাবার সাথে প্রেরণ করলেন। হাওয়াযিন সম্প্রদায়ের প্রতি হযরত উমর ফারূক (রা)-কে ত্রিশজন আরোহীর সাথে প্রেরণ করা হলো। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা)-কে ত্রিশজন উষ্ট্রারোহীর সাথে বাশীর ইব্‌ন দারাম ইয়াহূদীকে গ্রেফতার করার জন্য পাঠানো হলো। এই ব্যক্তিই খায়বারের ইয়াহূদীদেরকে বিদ্রোহ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। বাশীর ইব্‌ন সাআদ আনসারী (রা) ত্রিশজন আরোহীর সাথে বনূ মুর্‌রাকে দমন করার জন্য প্রেরিত হলেন। হযরত উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা)-কে একটি দলের সাথে জুহায়না সম্প্রদায়ের হাররাকাত গোত্রের প্রতি পাঠানো হলো। হযরত গালিব ইব্‌ন আবদুল্লাহ কুলায়নীকে একটি দলের সাথে বনূ মালূহকে শাস্তিদানের জন্য পাঠানো হলো। হযরত আবূ দারদা সাল্‌মী (রা)-কে মাত্র তিনজন লোকের সাথে জু'শাম ইব্‌ন মুআবিয়া গোত্রের সরদার রিফাআ ইব্‌ন কায়সকে দমন করার জন্য প্রেরণ করলেন। হযরত আবূ কাতাদা (রা) ও মুহাল্লাম ইব্‌ন জুছামাকে আন-নাআম' নামক স্থানে প্রেরণ করা হলো। এই সবগুলো সেনাদলই জয় লাভ করে ফিরে এলো এবং সর্বত্রই মুসলমানদের বিজয় ও সাফল্য অর্জিত হলো। হযরত উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) যখন যুদ্ধকালে একজন ব্যক্তিকে হত্যা করার জন্য অসি উত্তোলন করলেন, তখন সে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করলো। কিন্তু হযরত উসামা

(রা) তাকে হত্যা করলেন। হযরত নবী করীম (সা)-এর নিকট এই ঘটনা বর্ণিত হলো। তিনি খুব নাখোশ হলেন। হযরত উসামার নিকট কৈফিয়ত তলব করা হলো। তিনি বললেন, ঐ ব্যক্তি ভণ্ডামি ও জান বাঁচানোর জন্য কালেমা পাঠ করেছিল। হযরত নবী করীম (সা) বললেন, তুমি কি তার অন্তর চিরে দেখেছিলে সে ভণ্ডামি করে কালেমা পড়েছিল ? হযরত উসামা (রা) তাওবা করলেন এবং ভবিষ্যতে আর কখনো এই ধরনের ভুল করবেন না বলে ওয়াদা করলেন। অনুরূপভাবে হযরত আবূ কাতাদা (রা) ও মুহাল্লাম ইব্ন জুছামা পথ চলছিলেন। এমন সময় আশজা' সম্প্রদায়ের আমির ইব্ন আযবাত নামক জনৈক ব্যক্তিকে তার মালপত্রসহ যেতে দেখলেন। আমির ইব্ন আযবাত এই মুসলিম বাহিনীকে দেখে ইসলামী কায়দায় আসসালামু আলায়কুম বলে সালাম দিলো। মুসলমানরা শত্রু সম্প্রদায়ের লোককে এইভাবে সালাম করতে দেখে মনে করলেন যে, সে তার জান বাঁচানোর জন্য আসসালামু আলায়কুম থেকে ফায়দা হাসিল করতে চায়। তাই তার জবাব দান ও ওয়া আলায়কুমুস সালাম বলতে সবাই ইতস্তত করলেন এবং মুহাল্লাম ইব্ন জুছামা তার উপর হামলা করে তাকে হত্যা করলেন। এই যুদ্ধযাত্রীরা যখন মদীনায় ফিরে এলো এবং নবী করীম (সা) এই ঘটনা জানতে পারলেন, তখন তিনি ভীষণ অসন্তুষ্ট হলেন এবং মুহাল্লামকে বললেন যে, তুমি একজন মু'মিন ব্যক্তিকে কেন হত্যা করলে ? তারপর তিনি আমির ইব্ন আযবাতের ওয়ারিশদের পঞ্চাশটি উট রক্তপণ দিয়ে সন্তুষ্ট করলেন এবং মুহাল্লাম ইব্ন জুছামা (রা) কিসাস হতে অব্যাহতি পেলেন।

দাওয়াতী চিঠিপত্র

ঐ বছরই হযরত নবী করীম (সা) আরবদেশ ও বহির্দেশসমূহের রাজা-বাদশাহদের নিকট চিঠিপত্র প্রেরণ করেন এবং তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের জন্য আহবান জানান। আবিসিনিয়ার বাদশাহর কাছে যে পত্র তিনি প্রেরণ করেছিলেন, তার উল্লেখ ইতিপূর্বেই করা হয়েছে। আবিসিনিয়ার বাদশাহ্ সানন্দে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এক্ষণে তিনি রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট হযরত দাহইয়া ইব্ন হুনায়ন কালবী (রা)-কে, মিসর ও ইসকান্দারিয়ার বাদশাহ মুকাওকিসের নিকট হযরত হাতিব ইব্ন আবী বালতা' (রা)-কে, বাহ্রায়নের বাদশাহ মুন্যির ইব্ন সাওযা'র নিকট হযরত আলা' ইব্ন হায়দামী (রা)-কে, আম্মানের বাদশাহ্র কাছে আমর ইবনুল 'আস (রা)-কে, ইয়ামামার বাদশাহ হাওযা ইব্ন আলীর নিকট হযরত সুলায়ত ইব্ন আমিরী (রা)-কে, দামেশকের বাদশাহ্ হারিছ ইবনুছ-ছামার গাস্সানীর নিকট হযরত শুজা' ইব্ন ওয়াহাব (রা)-কে, জাবালা ইব্ন আয়হামের নিকটও শুজাআ ইব্ন ওয়াহাব (রা)-কে, ইয়ামেনের বাদশাহ হারছ ইব্ন আব্দ্ কালাল হুমায়রীর নিকট মুহাজির ইব্ন আবী উমাইয়া মাখযূমীকে ও পারস্য সম্রাট কিস্রার নিকট হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন হুযাফা সাহ্মীকে ইসলামের দাওয়াতী চিঠি দিয়ে প্রেরণ করলেন। রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস তাঁর দূতের সাথে ভদ্র ব্যবহার করেন। তাঁর চিঠির প্রতিও সম্মান প্রদর্শন করেন। কিন্তু সম্রাট থাকার লিপ্সা ও খ্রিস্টানদের বিরোধিতার ভয়ে প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করতে পারলেন না। মিসর সম্রাট মুকাওকিসও তাঁর পত্র ও দূতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন এবং অতি শ্রদ্ধাসহকারে তাঁর পত্রের উত্তর দেন। পত্রের সাথে একটি খিলআত, একটি খচ্চর ও দু'টি দাসীও তাঁর নিকট উপহার পাঠান। অনুরূপভাবে মুন্যির ইব্ন সাওয়াও তাঁর পত্র ও দূতের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করেন। আম্মানের বাদশাহ তাঁর পত্র পেয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন। পারস্য সম্রাট কিস্রা তাঁর পত্রটি ছিঁড়ে ফেললো এবং হযরত

আবদুল্লাহ্ ইব্ন হুযাফা (রা)-এর সাথে অভদ্র ব্যবহার করলো। হযরত নবী (সা) শুনে বললেন, কিস্রার সাম্রাজ্যও ঐভাবে ছিন্নভিন্ন করা হবে। সুতরাং তাই হয়েছে।

মক্কায় আগমন

সপ্তম হিজরীর শাওয়াল মাসের শেষ নাগাদ হযরত নবী করীম (সা) মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থান করলেন। অষ্টম হিজরীর যুলকা'দা মাসের শুরুতে তিনি পূর্বের বছর তাঁর সাথে যেসব সাহাবা হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় উপস্থিত ছিলেন, তাদের সবাইকে সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলেন। সুতরাং তাঁরা ও অন্যান্য সাহাবাও উমরাহ করার জন্য তৈরি হলেন এবং সর্বমোট দু' হাজার লোক নিয়ে তিনি উমরাহ্ আদায় করার জন্য মদীনা থেকে মক্কার পথে যাত্রা করলেন। মদীনায় হযরত আবূ যর গিফারী (রা)-কে প্রশাসক নিযুক্ত করে গেলেন। পূর্বের বছর যে সন্ধিপত্র হুদায়বিয়ায় লিখিত হয়েছিল, তাতে শর্ত ছিল যে, "মুসলমানরা এ বছর উমরাহ আদায় ছাড়াই ফিরে যাবে এবং আগামী বছর এসে উমরাহ আদায় করবে।" সুতরাং সেই শর্ত অনুসারেই হযরত নবী করীম (সা) মদীনা থেকে রওয়ানা করেন। মক্কার নিকটবর্তী পৌঁছে তিনি এবং সকল মুসলমান শুধু নিজ নিজ তলোয়ার সঙ্গে রাখলেন এবং বাকী সমস্ত হাতিয়ার খুলে ফেললেন। মক্কায় প্রবেশ করে বায়তুল্লাহ্র মুখোমুখি পৌঁছে হযরত নবী করীম (সা) মুসলমানদের নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা তোমাদের স্কন্ধকে অনাবৃত করে নাও এবং ইহ্রামের কাপড় বগলের নীচ থেকে বের করে গর্দানে পেঁচিয়ে নেয়ার পর সুনিপুণভাবে সাঈ করতে করতে দ্রুত বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করবে। এই নির্দেশের উদ্দেশ্য ছিল—মুসলমানদের এই তাওয়াফের তামাশা দেখার জন্য মক্কায় যেসব মুশরিকের সমাগম হয়েছিল, তাদের সামনে মুসলমানদের উদ্যমশীলতা, শক্তি ও শৌর্যের প্রকাশ ঘটানো। মক্কার বহু মুশরিক মক্কার বাইরের আখড়া ও উপত্যকাসমূহে চলে গিয়েছিল যাতে মুসলমানদের তাওয়াফ করতে দেখে মনে দুঃখ পেতে না হয়। হযরত নবী করীম (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম মক্কায় তিন দিন অবস্থান করলেন। উমরার আরকান আদায় করার পর নবী করীম (সা) আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিবের স্ত্রী উম্মে ফযলের বোন মায়মূনা বিন্ত হারিছকে বিবাহ করলেন।

চতুর্থ দিন সকাল বেলা মক্কার মুশরিকদের পক্ষ থেকে সুহায়ল ইব্ন আমর ও হুওয়ায়তিব ইব্ন আক্দিল উযযা নবী করীম (সা)-এর নিকট এসে বললো, আপনার তিন দিন শেষ হয়ে গেছে। এক্ষণই মক্কা থেকে চলে যান। হযরত নবী করীম (সা) তখন আনসারদের মজলিসে বসে সাআদ ইব্ন উবাদা (রা)-এর সাথে কথা বলছিলেন। তিনি সুহায়লকে বললেন, তোমরা ভয় পাচ্ছো কেন? আমি নিজেই যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছি। কিন্তু তোমরা কি জানো যে, আমি এখানে একজন মহিলাকে বিয়ে করেছি? এখনো তার রুখসতি হয়নি। তোমরা অনুমতি দিলে আমি এখানে বৈবাহিক ভোজের আয়োজন করবো এবং সমস্ত মক্কাবাসীদের দাওয়াত করে খাওয়াবো। তারপর এখান থেকে চলে যাবো। এতে তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না। সুহায়ল বললো, আমরা তোমার খাবারের মুখাপেক্ষী নই। তোমরা চুক্তির পাবন্দী করো এবং এখান থেকে এখনই চলে যাও। সুতরাং নবী করীম (সা) তখনই বিদায়ের আয়োজন করতে বললেন এবং সওয়ারীতে আরোহণ করে মক্কার বাইরে চলে গেলেন। হারাম শরীফের সীমানার বাইরে গিয়ে তিনি সারাফ উপত্যকার ভিতর দিকের ময়দানে অবস্থান নিলেন। এখানেই মায়মূনা বিন্ত হারিছ হযরত নবী করীম (সা)-এর নিকট আগমন করেন। তিনি যখন মক্কা থেকে

রওয়ানা করলেন, তখন হযরত হামযা (রা)-এর কন্যা আম্মারা যিনি তখন ছোট্ট শিশু ছিলেন–চিৎকার করতে করতে দৌড়ে এসে বললেন, আমাকেও আপনার সাথে করে মদীনায় নিয়ে যান। হ্যরত আলী (রা) তৎক্ষণাৎ ঐ মেয়েটিকে উঠিয়ে তাঁর হাওদায় বসালেন। তখন হযরত জা'ফর ইব্ন আবূ তালিব (রা) ও হযরত যায়দ ইব্ন হারিছাও ঐ মেয়েটির দায়িত্ব গ্রহণ ও প্রতিপালনের দাবী করলেন। প্রত্যেকেই চাচ্ছিলেন এই মেয়েটিকে তার তত্ত্বাবধানে রেখে লালন-পালন করতে। যায়দ ইব্ন হারিছা (রা) বললেন, হযরত হামযা (রা) আমার দীনী ভাই ছিলেন, তাই আমার দাবী অগ্রগণ্য। হযরত জা'ফর (রা) বললেন, এটি আমার চাচাত বোন। আর আমার স্ত্রী হচ্ছেন, তার খালা। নবী করীম (সা) সবার বক্তব্য শুনে আম্মারাকে হযরত জা'ফরের নিকট সোপর্দ করলেন এবং বললেন, খালা হচ্ছেন মায়ের সমতুল্য। তাই তার লালন-পালন জা'ফরের ঘরেই হওয়া উচিত। হযরত আলী (রা) এবং যায়দ (রা)-কেও তিনি এ ব্যাপারে সম্মত করালেন।

আমর ইবনুল 'আস (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

মদীনা মুনাওয়ারায় ফিরে আসার পর নবী করীম (সা) মাত্র গুটি কতক দিন অতিবাহিত করেছিলেন। মক্কায় হযরত আমর ইবনুল 'আস মুসলমান হয়ে হিজরত করার ইরাদা করলেন। আমর ইবনুল 'আস সম্পর্কে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, মক্কার কুরায়শরা তাঁকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজাশীর নিকট দূত হিসাবে প্রেরণ করেছিল, যাতে মুসলমান মুহাজিররা আবিসিনিয়ায় আশ্রয় নিতে না পারে। নাজাশীর দরবারে তাঁকে অপমান ও ব্যর্থতা বরণ করতে হয়েছিল। এই অপমান ও ব্যর্থতাই তাঁর অন্তরে ইসলামের সত্যতার মোহর মেরে দিয়েছিল। এই প্রভাব অবিরাম ভেতরে ভেতরে তার ক্রিয়া করতে থাকে। আর পরবর্তী ঘটনাবলী তার সমর্থন ও সত্যায়ন করলো। সুতরাং তখন আমর ইবনুল 'আস আর ধৈর্য ধারণ করতে পারলেন না। খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। হুদায়বিয়া অভিযানে গাযবান নামক স্থানে রাতের বেলা ইশার সালাতে নবী (সা)-এর কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণ করে খালিদ ইব্ন ওয়ালীদের অন্তর নরম হয়ে গিয়েছিল। সেই দিন থেকেই তিনি ইসলামকে ভালবাসতেন। আমর ইবনুল 'আস খালিদ ইব্ন ওয়ালীদের কাছে তাঁর অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। খালিদ ইব্ন ওয়ালীদও তখনই আমর 'ইবনুল আসের সহযাত্রী হতে প্রস্তুত হলেন। এরপর উভয়ে মিলে তাদের তৃতীয় বন্ধু উসমান ইব্ন তালহাকে তাঁদের সংকল্পের কথা জানালেন। তিনিও নির্দ্বিধায় তাদের সঙ্গ দিতে তৈরি হয়ে গেলেন। কুরায়শের এই তিনজন সরদারই মক্কা থেকে রওয়ানা হয়ে মদীনায় হযরত নবী (সা)-এর নিকট হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এঁরা মুসলমান হওয়ার পর ইসলামের শক্তি অনেক বেড়ে গেলো। খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) ও আমর ইবনুল 'আস (রা) মুসলমান হওয়ার সময় যখন জানতে পারলেন যে, ইসলাম গ্রহণের ফলে তাঁদের পেছনের সব গুনাহ মাফ হয়ে গেছে, তখন খুব খুশী হলেন।

হিজরতের অষ্টম বছর

আরবদেশে তখন ইসলামের প্রকাশ্য কোন বড় বিপদ আর ছিলো না। ইসলাম গ্রহণ করা ও শির্ক পরিহার করার মধ্যে জানমালের ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী ছিল না। অভ্যন্তরীণ শক্তিগুলো একের পর এক সবাই নিজ নিজ ক্ষমতা ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যয় করে হতাশ হয়ে পড়েছিল। ইসলাম আরবদেশের মধ্যে সবচেয়ে বড় শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। ইসলামের শক্তি ও ক্ষমতা

যতই স্বীকৃত হতে চললো, আরবদেশে ফিতনা-ফাসাদ ততই হ্রাস পেতে লাগলো। এতদ্‌সত্ত্বেও মক্কার কুরায়শরা-যারা সারা আরবদেশে বিশেষ সম্মান ও স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী ছিল-তখনো পর্যন্ত কুফ্‌র ও শির্‌কের উপর প্রতিষ্ঠিত ও মুসলমানদের বিরোধিতায় সরগরম ছিল। মদীনার মুনাফিক, খায়বারের ইয়াহূদী ও মক্কার কুরায়শ-এই তিনটি শত্রু আরবদেশের আন্তঃ গোত্রগুলোকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে করে প্রতিবারই যখন ব্যর্থ হলো, তখন তারা পারস্য ও রোমের সম্রাট ও অধিকর্তাদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ করার প্রয়াস ও ষড়যন্ত্র শুরু করলো। হযরত নবী করীম (সা)-ও এ বিবাদ সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন না। তিনি আরবদেশের আশেপাশের সমস্ত রাজা-বাদশাহর নামে দাওয়াতী পত্র প্রেরণ করলেন। এই দাওয়াতী চিঠিপত্র অধিকাংশ রাজ-দরবারে খুবই সুপ্রভাব সৃষ্টি করলো এবং শত্রুদের ষড়যন্ত্রজাল ছিন্নভিন্ন করে দিল। কিন্তু কোন কোন রাজা-বাদশাহ্ শত্রুদের ষড়যন্ত্র ও তৎপরতায় প্রভাবিত হয়ে ইসলামী দাওয়াতে সাড়া না দিয়ে আরো বেশী বিরোধিতা ও শত্রুতা করা আরম্ভ করে দিল। ফলে এইসব বহিরাক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য উপায় অবলম্বন করা মুসলমানদের জন্য অনিবার্য হয়ে পড়লো। কোন বৈদেশিক বাদশাহ যদি মদীনার উপর আক্রমণ করতে সক্ষম হতো, তাহলে সমগ্র আরবদেশ কর্তৃক নবোদ্যমে শত্রুতায় অবতীর্ণ হওয়া এবং মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া ছিল অবধারিত।

মূতার যুদ্ধ

হযরত নবী করীম (সা) যে দাওয়াতী চিঠিপত্র রাজা-বাদশাহদের নামে লিখেছিলেন, তন্মধ্যে একটি চিঠি হারিছ ইব্‌ন উমায়র আযদী (রা) মারফত বসরার শাসনকর্তার নামে প্রেরণ করেছিলেন। হারিছ ইব্‌ন উমায়র আযদী (রা) রওয়ানা হয়ে বসরা যাওয়ার পথে সিরিয়া সীমান্তের সন্নিকটবর্তী মূতা নামক স্থানে পৌঁছতেই সেখানকার শাসনকর্তা শুরাহ্‌বীল ইব্‌ন উমর গাস্‌সানী যিনি রোম সম্রাটের তরফ থেকে ঐ এলাকার গভর্নর ছিলেন-তাঁকে গ্রেফতার করলেন এবং ইনি বসরার শাসনকর্তার নিকট হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর চিঠি নিয়ে যাচ্ছেন-একথা অবগত হয়ে তাঁকে শহীদ করে ফেললো। হারিছ্ ইব্‌ন উমায়র (রা)-এর অহেতুক হত্যাকাণ্ডের খবর যখন মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছল তখন মুসলমানগণ প্রচণ্ড আঘাত পেলেন। হযরত নবী করীম (সা) এই উদ্ধত গাসসানী সরদারকে শায়েস্তা করার জন্য একটি অভিযান প্রেরণ করলেন। এই অভিযান প্রেরণে যদি বিন্দু মাত্র বিলম্ব হতো, তাহলে সিরিয়ার পক্ষ থেকে মদীনা আক্রান্ত হওয়া ছিল অবশ্যম্ভাবী। হযরত নবী করীম (সা) মুসলমানদেরকে নিজ নিজ যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে হারাক নামক স্থানে সমবেত হতে বললেন। সুতরাং তিন হাজার ইসলামী সৈন্য হারাক নামক স্থানে সমবেত হলো। নবী করীম (সা) যায়দ ইব্‌ন হারিছা (রা)-কে এই দলের সৈনাপত্য দান করে বললেন-যায়দ ইব্‌ন হারিছা যদি শহীদ হয়, জা'ফর ইব্‌ন আবী তালিব এই দলের সেনাপতি হবে। জা'ফরও যদি শহীদ হয়, তবে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা সেনাপতি হবে। সেও যদি শহীদ হয়, তবে তারপর সেনাদল যাকে পসন্দ করবে, তাকে সেনাপতি বানিয়ে নেবে। হযরত নবী করীম (সা) এই দলটিকে কিছুদূর পর্যন্ত বিদায় জানাতে গেলেন। তারপর মদীনায় ফিরে এলেন।

হযরত যায়দ ইব্‌ন হারিছা (রা) তাঁর বাহিনী নিয়ে মাআন নামক স্থান পর্যন্ত অগ্রসর হলেন। মাআনে পৌঁছে সংবাদ পাওয়া গেলো মূতার শাসনকর্তা শারজীল ইব্‌ন আমর মুসলমানদের

মুকাবিলার জন্য একলাখ সুদক্ষ সৈন্য সমাবেশ করেছেন এবং এক লাখ সৈন্যসহ মূতা থেকে কিছুদূর পিছনে অবস্থিত বাল্‌কা' উপত্যকায় স্বয়ং রোম সম্রাট ডেরা ফেলে রয়েছেন। এই খবর শুনে মুসলিম বাহিনীর মধ্যে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার ভাব দেখা দিলো। মুসলিমপক্ষ দু'দিন পর্যন্ত মাআনে অবস্থান করলো এবং পরস্পরের মধ্যে এরূপ সলা-পরামর্শ চলতে লাগলো যে, নবী করীম (সা)-কে এ ব্যাপারে চিঠি লিখতে হবে এবং তাঁর নির্দেশ ও সাহায্যের অপেক্ষা করতে হবে। তখনো কোন বিশেষ সিদ্ধান্ত স্থির হয়নি। ইত্যবসরে হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা) উঠে দাঁড়ালেন এবং উচ্চকণ্ঠে লোকদেরকে সম্বোধন করে বললেন :

> তোমরা শাহাদতের অন্বেষণে বের হয়েছো। কাফিরদের সাথে আমরা লোক গণনা অর্থাৎ সংখ্যা, শুমার ও শক্তি দ্বারা যুদ্ধ করি না বরং আমরা সেই দীনের জন্য যুদ্ধ করি, যা আল্লাহ্ আমাদেরকে দান করেছেন। কাজেই তোমরা মূতা ও হিরাক্লিয়াস বাহিনীর দিকে অগ্রসর হও এবং নিজ বাহিনীর মায়মানা (ডান পার্শ্ব) ও মায়সারা (বাম পার্শ্ব) ঠিক করে কাফিরদের মুকাবিলা করো। এর পরিণাম এই দুই পুণ্যের যে কোন একটি অবশ্যই হবে : হয় আমরা জয়লাভ করবো, অথবা শাহাদত লাভ করবো।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা)-এর এই বীরত্বব্যঞ্জক ভাষণ শ্রবণ করে হযরত যায়দ ইব্‌ন হারিছা (রা) এক হাতে বর্শা ও অন্য হাতে ঝাণ্ডা নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। সমস্ত মুসলমানের মধ্যে জোশ ও শাহাদতের আকাঁক্ষা সৃষ্টি হলো। মুসলিম বাহিনী মাআন থেকে রওয়ানা হলো। মাশারিফ নামক একটি গ্রামের কাছে শত্রুপক্ষের একটি বিরাট দল সামনে দেখা গেলো। কিন্তু মুসলমানরা সেখানে তাদের মুকাবিলা করা উপযোগী মনে করলেন না। তারা সেখান থেকে পাশ কাটিয়ে মূতার দিকে অগ্রসর হলেন যাতে যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত ময়দান হস্তগত হয়। অবশেষে মূতা ময়দানে উভয় বাহিনীর মুকাবিলা হলো। একদিকে ছিল এক লাখ বীর যোদ্ধা। অপরদিকে ছিল তিন হাজার মুসলিম মুজাহিদ। এই মুজাহিদ বাহিনীর মধ্যে হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-ও শামিল ছিলেন এবং মুসলমান হওয়ার পর ইসলামের পক্ষ থেকে এই প্রথম বারের মতো তাঁর বীরত্ব প্রদর্শনের সুযোগ ঘটেছিল। রোমের কায়সার ও মুসলমানদের মধ্যে এটা ছিল প্রথম যুদ্ধ। এ যুদ্ধকে মুসলমান ও খ্রিস্টানদের প্রথম যুদ্ধও বলা যেতে পারে। যদিও সিরীয় সীমান্তের কাছাকাছি আরো কয়েকটি ছোট ছোট যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু উল্লেখযোগ্য লড়াইগুলোর মধ্যে এটি ছিল সর্বপ্রথম লড়াই, যা মুসলমানরা সিরিয়া সীমান্তে লড়েছিলেন। হযরত যায়দ ইব্‌ন হারিছা (রা) ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে কলব (মধ্যবর্তী বাহিনী)-এর সামনে সবার আগে ছিলেন। মায়মানা (রাইট উইং) কুতায়বা ইব্‌ন কাতাদা 'উযরীর উপর ন্যস্ত ছিল। মায়সারায় (লেফট উইং) ছিলেন আবায়া ইব্‌ন মালিক আনসারী (রা)। যায়দ ইবন হারিছা (রা) লড়াই করতে করতে এবং কাফিরদের কতল করতে করতে অনেক দূর অগ্রসর হলেন। কাফিররা চতুর্দিক থেকে তাঁকে ঘিরে ফেললো। তিনি শাহাদত বরণ করলেন। তিনি শহীদ হওয়ার পর হযরত জা'ফর (রা) ঝাণ্ডা তুলে নিলেন এবং বহু কাফিরকে হত্যা করলেন। শেষে তাঁর ঘোড়াটি যখমী হয়ে পড়ে গেলো এবং তিনি পদাতিক শত্রুর সাথে লড়তে লাগলেন। শত্রুরা তাঁকেও ঘেরাও করে ফেললো। তাঁর ডান হাত কেটে পড়ে গেলো। কিন্তু তিনি বাম হাত দিয়ে ঝাণ্ডা সামলে নিলেন। যখন বাম হাতও কেটে পড়ে গেলো, তখন গর্দানের সাথে ঝাণ্ডা লাগিয়ে সীনা দ্বারা তা উচিয়ে রাখলেন। এই অবস্থায়ই তিনি শাহাদত

বরণ করলেন। তাঁর শাহাদতের পর হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা) সামনে অগ্রসর হয়ে ঝাণ্ডা তাঁর হাতে নিলেন। কিছুক্ষণ লড়াই করে তিনিও শহীদ হলেন এবং ইসলামের ঝাণ্ডা মাটিতে পড়ে গেলো। মুসলমানদের মধ্যে অস্থিরতার চিহ্ন দেখা দিল। হযরত ছাবিত ইব্‌ন আকরাম (রা) চট করে সামনে অগ্রসর হয়ে ঝাণ্ডা তুলে নিলেন এবং উচ্চকণ্ঠে বললেন :

হে মুসলমানগণ! তোমরা সম্মিলিতভাবে কোন একজনকে তোমাদের সেনাপতি বানিয়ে নাও।

ইসলামী লশকরের তরফ থেকে সম্মিলিত কণ্ঠে উচ্চারিত হলো رضينابك (আমরা তোমার সৈনাপত্যেই সন্তুষ্ট!) হযরত ছাবিত ইব্‌ন আকরাম জবাব দিলেন :

مَا اَنَا بِفَاعِلٍ فَاتَّفِقُوْا عَلٰى خَالِدِ بْنِ وَلِيْدٍ .

(আমি এ দায়িত্ব পালন করতে অক্ষম। তোমরা খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদকে সেনাপতি বানিয়ে নাও)। ইসলামী লশকরের পক্ষ থেকে তৎক্ষণাৎ উচ্চারিত হলো–আমরা খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদের সৈনাপত্য মেনে নিলাম। একথা শুনেই হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) তৎক্ষণাৎ সামনে অগ্রসর হয়ে হযরত ছাবিত ইব্‌ন আকরামের হাত থেকে ঝাণ্ডা গ্রহণ করলেন এবং রোমক বাহিনীর উপর আঘাত হানলেন। তখনো পর্যন্ত রোমক বাহিনী বিজয়ী ও মুসলিম বাহিনী পরাজিত দৃষ্ট হচ্ছিল। কোন কোন মুসলিম সেনা এই অবস্থা দেখে হতোদ্যম হয়ে পড়েছিল। কিন্তু হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ ঝাণ্ডা হাতে নিয়েই মুসলিম বাহিনীকে হুঙ্কার দিয়ে যুদ্ধের আহবান জানালেন এবং ধিক্কার দিয়ে বীর-বিক্রমে যুদ্ধের জন্য নতুনভাবে প্রস্তুত করলেন। তারপর এমন সুনিপুণভাবে বিশাল শত্রুবাহিনীর উপর উপর্যুপরি আঘাত হানলেন যে, রোমকরা হতচকিত হয়ে গেলো। হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) কেবল নিজেই বীর-বিক্রমে লড়াই করেননি বরং তাঁর সৈন্যের বিন্যাস ও গতিবিধিকেও অতি দক্ষতার সাথে তাঁর আয়ত্তে রাখেন। তিনি কখনো মায়সারাকে সামনে অগ্রসর করান, কখনো মায়মানাকে পিছে হটান। নিজেও হামলা করতেন এবং নিজ বাহিনীর বিভিন্ন অংশ দ্বারাও শত্রুদের আক্রমণ করাতেন। হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) বিদ্যুতের মতো যুদ্ধক্ষেত্রে চমকাচ্ছিলেন এবং ইসলামী লশকরের প্রতিটি অংশকে স্বয়ং সাহায্য করছিলেন। মোটকথা, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) তাঁর তিন হাজার সৈন্যকে রোমের এক লাখ বীর সেনার সাথে যুদ্ধরত রাখলেন। যখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো, তখন রোমকরা মুসলমানদের মুকাবিলা থেকে পলায়নের গ্লানি স্বীকার করলো এবং ভগ্নোৎসাহ হয়ে পিঠটান দিলো। মুসলমানরা কিছুদূর পর্যন্ত পশ্চাদ্ধাবন করলেন এবং কিছু মালে গনীমতও হস্তগত হলো। এই যুদ্ধে মুসলিম পক্ষে মোট বারো জন সাহাবী শহীদ হন। নিহত কাফিরদের সঠিক সংখ্যা জানা যায় নি।

হযরত খালিদ সায়ফুল্লাহ্ (রা)

হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর সামরিক দক্ষতার কথা সবাই স্বীকার করেন। কিন্তু সবচেয়ে বড় স্বীকারোক্তি ছিল–স্বয়ং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর পক্ষ থেকে তিনি 'সায়ফুল্লাহ্' খেতাবে বিভূষিত হন। তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা এরূপ : যেদিন মূতা ময়দানে ইসলামী লশকর মদীনা থেকে হাজারো ক্রোশ দূরত্বে যুদ্ধরত ছিল, সেদিন নবী করীম (সা) মদীনা মুনাওয়ারায় বসেই ইলহামে ইলাহীর মাধ্যমে যুদ্ধের সমুদয় ঘটনা অবগত হলেন। তিনি

তখনই তামাম মুসলমানকে জড়ো করলেন এবং মিম্বরের উপর উঠে বললেন, তোমাদের মুজাহিদ বাহিনীর খবর হচ্ছে, তারা শত্রুদের মুকাবিলা করেছে। যায়দ শহীদ হয়েছে। আল্লাহ্ তাকে মাফ করে দিয়েছেন। তারপর জা'ফর ইসলামী ঝাণ্ডা তার হাতে তুলে নিলো। শত্রুরা তাকে চার দিক থেকে ঘিরে ফেললো। সেও শহীদ হলো। আল্লাহ্ তাকেও মাফ করে দিয়েছেন। তারপর আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা ইসলামী ঝাণ্ডা হাতে নিলো। সেও শত্রুদের সাথে লড়াই করে শহীদ হলো। এদের সবাইকে জান্নাতে তুলে নেয়া হয়েছে এবং সোনার সিংহাসনে তারা অবস্থান করছে। এই তিন জনের পর ইসলামী ঝাণ্ডা سيف من سيوف الله (আল্লাহ্র তলোয়ারসমূহের একটি তলোয়ার) অর্থাৎ খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ ধারণ করলো এবং যুদ্ধের অবনতিশীল পরিস্থিতি সামলে নিলো।

সেদিন থেকেই হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) সায়ফুল্লাহ্ (আল্লাহ্র তলোয়ার) নামে অভিহিত হতে থাকেন। হযরত জা'ফর (রা)-এর গৃহে তখনই মাতম শুরু হয়ে গেলো। অর্থাৎ তাঁর পরিবার-পরিজন শোকের আতিশয্যে ক্রন্দন করতে লাগলো। হযরত নবী করীম (সা) তাঁর ঘর থেকে খানা পাক করে হযরত জা'ফর (রা)-এর ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) যখন তাঁর বিজয়ী বাহিনী নিয়ে মদীনার অদূরে এসে পৌঁছলেন, তখন হযরত নবী (সা) মদীনা থেকে বের হয়ে কিছুদূর পর্যন্ত স্বাগত জানাতে গেলেন এবং হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদকে 'সায়ফুল্লাহ' খেতাবের খোশখবরী দিলেন। এক সাহাবী স্বপ্নে দেখলেন যে, হযরত জা'ফর (রা) জান্নাতের মধ্যে তাঁর দুই ডানা দ্বারা উড়ে বেড়াচ্ছেন। সেদিন থেকেই তাঁর নাম জা'ফর তাইয়াররূপে প্রসিদ্ধ হয়। একটি রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, হযরত নবী করীম (সা) বলেন, জা'ফরকে আল্লাহ্ তা'আলা দুটি ডানা দান করেছেন। এই দুটি ডানা দিয়ে সে জান্নাতে উড়ে বেড়াচ্ছে। সেদিন থেকেই তিনি 'যুল-জানাহায়ন' ও 'তাইয়ার' লকবে ভূষিত হন। মূতা যুদ্ধ অষ্টম হিজরীর জমাদিউল আউয়াল মাসে সংঘটিত হয়।

কুযাআ যুদ্ধ

এই যুদ্ধের একমাস পর মদীনায় খবর এলো সিরীয় সীমান্তের কাছে কুযাআ সম্প্রদায় মদীনা আক্রমণ করার জন্য সৈন্য সমাবেশ করছে। হযরত নবী করীম (সা) হযরত আমর ইবনুল 'আস (রা)-কে তিনশ' মুহাজির ও আনসার সৈন্যের সেনাপতি বানিয়ে সেখানে প্রেরণ করলেন। আমর ইবনুল 'আস (রা) রাতে সফর ও দিনে গোপন স্থানে অবস্থান করতে করতে পথ চললেন। শত্রুর কাছাকাছি পৌঁছে জানা গেলো যে, শত্রুসৈন্যের সংখ্যা অনেক বেশী। তাই মদীনায় একজন দূত পাঠানো হলো। এখান থেকে হযরত নবী করীম (সা) হযরত আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)-কে সাহায্য দিয়ে পাঠালেন। হযরত আবূ উবায়দা (রা) পৌঁছার পর মুসলিম বাহিনী হামলা করলো। শত্রুপক্ষ মুকাবিলা করতে না পেরে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলো। মুসলিম বাহিনী নিরাপদে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলো।

মদীনা থেকে পাঁচ মাইল দূরে সমুদ্র উপকূলের কাছে জুহায়না গোত্র বিদ্রোহ করে মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়েছে। হযরত নবী করীম (সা) অষ্টম হিজরীতেই একথা জানতে পারলেন। তাই তিনি হযরত আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)-কে তিনশ' মুহাজির ও আনসারের সাথে সেখানে প্রেরণ করলেন। এই বাহিনী কোন মুকাবিলা ও যুদ্ধ ছাড়াই ফিরে আসলো। শত্রুপক্ষ এই অভিযানের কথা শুনেই সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো।

মক্কা বিজয়

অষ্টম হিজরীর শাবান মাসে মক্কা মুকাররমায় এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। বনূ খুযাআ ও বনূ বকর হুদায়বিরার সন্ধিপত্র অনুসারে নিজেদের শক্রুতা ভুলে গিয়ে হযরত নবী করীম (সা) ও মক্কার কুরায়শদের মিত্র বনে গিয়েছিল। তারা তখন একে অপরের উপর হামলা করতে পারতো না। কিন্তু বনূ বকরের নিয়ত বদলে গেলো এবং তাদের সরদার নাওফিল ইব্‌ন মুআবিয়া বনূ খুযাআর উপর প্রতিশোধ নিতে চাইল। মক্কার কুরায়শদের কর্তব্য ছিল তাদের মিত্র বনূ বকরকে এই সঙ্কল্প থেকে বিরত রাখা এবং হযরত নবী করীম (সা)-এর মিত্র বনূ খুযাআর উপর হামলা করতে না দেয়া। কেননা, হুদায়বিয়ায় দশ বছরের জন্য সন্ধি হয়েছিল। কিন্তু মক্কার কুরায়শরা বনূ বকরকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করলো এবং কুরায়শের মধ্য থেকে সাফওয়ান ইব্‌ন আমর প্রমুখ বনূ বকরের সাথে হামলায় শরীক হলো। বনূ বকর কুরায়শ সরদারদের সঙ্গে নিয়ে বনূ খুযাআর উপর চড়াও হলো এবং আচানক তাদের কতল করা শুরু করলো। বনূ খুযাআ যখন রাতের বেলা বেঘোরে ঘুমাচ্ছিলো, তখন তারা এই হামলা করলো। বনূ খুযাআ মুকাবিলা করতে অক্ষম হয়ে হারাম শরীফে আশ্রয় নিলো। জালিমরা সেখানেও তাদের রেহাই দিলো না। বুদায়ল ইব্‌ন ওয়ারাকা খুযাঈর গৃহে প্রবেশ করে তার সমস্ত মালপত্র লুণ্ঠন করলো। এই হামলায় বনূ খুযাআর বিশ/বাইশজন লোক নিহত হলো। এদের কয়েকজনকে বায়তুল্লাহ্‌র ভিতরে হত্যা করা হয়। বুদায়ল ইব্‌ন ওয়ারাকা ও আমর ইব্‌ন সালিম বনূ খুযাআর কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে মদীনায় রওয়ানা করলেন। উদ্দেশ্য, হযরত নবী (সা)-এর নিকট বনূ বকর ও কুরায়শের এই চুক্তিভঙ্গের অভিযোগ করা। যে রাতে মক্কায় সন্ধিচুক্তির এরূপ নির্মম পরিসমাপ্তি ঘটানো হচ্ছিল, বনূ খুযাআর কয়েকজন লোক নবী করীম (সা)-এর নিকট ফরিয়াদ জানালো—হে খাতামুন্‌-নাবিয়্যীন! আমাদের সাহায্য করুন। আমাদের ফরিয়াদ শুনুন!! বনূ বকর আমাদের উপর জুলুম করেছে!! হযরত নবী (সা) উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মুনা (রা)-এর গৃহে তখন উযূ করছিলেন। তিনি মক্কার বনূ খুযাআর লোকদের এই ফরিয়াদ মদীনায় বসে শুনতে পেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তার উত্তরে 'লাব্বায়েক' 'লাব্বায়েক' বললেন। হযরত মায়মুনা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি 'লাব্বায়েক' বললেন কার কথার উত্তরে ? তিনি বললেন, এইমাত্র বনূ খুযাআর লোকদের ফরিয়াদ আমার কানে এসে পৌঁছলো। আমি তার উত্তর দিলাম। আরো আশ্চর্য এই যে, বনূ খুযাআর লোকরাও তাদের ফরিয়াদের উত্তরে হযরত নবী করীম (সা)-এর জবাব শুনতে পেলো। ভোর বেলা তিনি হযরত আয়িশা (রা)-কে বললেন যে, রাতে মক্কায় বনূ খুযাআর লোকদেরকে বনূ বকর ও কুরায়শরা মিলে হত্যা করেছে। হযরত আয়িশা (রা) বললেন, আপনি কি মনে করেন যে, কুরায়শরা চুক্তি ভঙ্গ করবে ? তিনি বললেন, তারা নির্ঘাত চুক্তি ভঙ্গ করেছে এবং অচিরেই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পর্কে তাঁর হুকুম জারি করবেন। কয়েকদিন পর বুদায়ল ইব্‌ন ওয়ারাকা ও আমর ইব্‌ন সালিম খুযাঈ মদীনা পৌঁছেন। তারা মক্কার কুরায়শদের চুক্তিভঙ্গ ও জুলুমের অভিযোগ করলেন। আমর ইব্‌ন সালিম খুযাঈ অতি করুণ কাব্যে তাঁদের মজলুম হওয়ার কাহিনী শোনালো। ঐ কাব্যের কয়েকটি পংক্তি এরূপ :

اِنَّ قُرَيْشَ اَخْلَفُوْكَ الْمَوْعِدَ * وَنَقَضُوْا مِيْثَاقَكَ الْمُوَكَّدَا

কুরায়শরা আপনার সাথে ওয়াদা ভঙ্গ করেছে। আর তারা আপনার সাথে যে মজবুত ওয়াদা করেছিল, তা ভঙ্গ করেছে।

وَجَعَلُوا لِي فِي كَدَاءِ رَصَدًا * وَزَعَمُوا أَنْ لَيْسَتْ أَدْعُوا أَحَدًا

আমাদেরকে শুকনো ঘাসের মতো পদদলিত করেছে। আর তারা মনে করেছে যে, আমাদের সাহায্যকারী কেউ নেই।

وَهُمْ أَذَلُّ وَأَقَلُّ عَدَدًا * هُمْ بَيَّتُونَ بِالْوَتِيرِ هَجَدًا

তারা অতি নীচ ও সংখ্যায় অতি অল্প। তারা ওয়াতীল মহল্লায় আমাদের উপর ঘুমন্ত অবস্থায় হামলা করেছে।

হযরত নবী (সা) বনূ খুযাআর ঐ লোকদেরকে সান্ত্বনা ও প্রবোধ দিলেন এবং বললেন, আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করতে আসবো। তাদেরকে তিনি মদীনা থেকে মক্কার পথে বিদায় করে দিলেন। তারা মদীনা থেকে রওয়ানা হওয়ার সময় হযরত নবী করীম (সা) বললেন, আবূ সুফিয়ান মক্কা থেকে সন্ধি ও চুক্তি মজবুত করার জন্য রওয়ানা করেছে। কিন্তু সে অকৃতকার্য হয়ে ফিরে যাবে।

মক্কাবাসীরা যখন তাদের কৃতকর্মের পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা করার সুযোগ পেলো, তখন তারা ভীত হয়ে পড়লো এবং মদীনায় গিয়ে সন্ধির শর্তাবলী নবায়ন করার জন্য আবূ সুফিয়ানকে প্রেরণ করলো। এদিকে হযরত নবী করীম (সা) মুসলমানদেরকে সফর ও যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করার জন্য নির্দেশ দিলেন। একই সাথে তিনি যুদ্ধের এই প্রস্তুতির কথা গোপন রাখার জন্যও তাকীদ করলেন। অপরদিকে বুদায়ল ইব্‌ন ওয়ারাকা তার সঙ্গীদের নিয়ে মদীনা থেকে মক্কায় ফিরে যাচ্ছিল এবং আবূ সুফিয়ান মক্কা থেকে মদীনায় আগমন করছিল। পথিমধ্যে উভয়ের সাথে সাক্ষাৎ হলো। আবূ সুফিয়ান জিজ্ঞেস করলো, তোমরা কোত্থেকে আগমন করছো। তারা জবাব দিলেন আমরা এই উপত্যকায় এসেছিলাম। আবূ সুফিয়ান মনে করেছিল যে, তখন পর্যন্ত হযরত নবী করীম (সা)-এর নিকট মক্কার এ ঘটনার খবর পৌঁছেনি। তাই সে অতিসত্বর সন্ধিপত্রের নবায়ন করাতে চাইল।

আবূ সুফিয়ানের মদীনায় আগমন

আবূ সুফিয়ান মদীনায় এসে হযরত নবী করীম (সা), হযরত উমর ফারূক (রা), হযরত আলী (রা)-এর সাথে পৃথকভাবে কথা বলতে চাইল। কিন্তু কেউই তাকে কোন জবাব দিলেন না। তিনি নিরাশ হলেন। শেষে হযরত আলী (রা) তার সাথে একটু কৌতুক করলেন। তিনি তাকে বললেন, তুমি বনূ কিনানার সরদার। মসজিদ-ই-নববীতে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে ঘোষণা করে দাও যে, আমি সন্ধির সময়সীমা বৃদ্ধি এবং ওয়াদা-অঙ্গীকার মজবুত করছি। আবূ সুফিয়ান তদ্রূপ দণ্ডায়মান হয়ে মসজিদে ঘোষণা করলো এবং তৎক্ষণাৎ মদীনা থেকে প্রস্থান করলো। সে যখন মক্কা পৌঁছলো, তখন মক্কার কুরায়শরা তাকে খুব ঠাট্টা-বিদ্রূপ করলো এবং বললো, আলী তোমার সাথে কৌতুক করেছেন। সন্ধিচুক্তি কি কখনো এভাবে হয়? আবূ সুফিয়ান তার এই আহাম্মকির জন্য খুব লজ্জিত হলো। আবূ সুফিয়ানের প্রস্থানের পর হযরত নবী করীম (সা) সাহাবায়ে কিরামকে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা করার নির্দেশ দিলেন। তখন পর্যন্ত সাহাবায়ে কিরাম (রা) গোপনে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁরা একথা কেউ-ই জানতেন না যে, ইসলামী লশকর কোন দিকে রওয়ানা হবে এবং কোন কওম বা এলাকার উপর হামলা হবে। হযরত নবী করীম (সা)-এর এই সাবধানতা অবলম্বনের উদ্দেশ্য ছিল যাতে কুরায়শরা পূর্বাহ্নেই

এই হামলার খবর জানতে না পারে। হাতিব ইব্ন আবী বাল্তাআ নামক জনৈক সাহাবী কুরায়শদের উপর মুসলমানদের হামলার খবর জানানোর জন্য এক মহিলার মাধ্যমে তাদের নিকট একটি পত্র প্রেরণ করেন। হযরত নবী করীম (সা) ওয়াহীর মাধ্যমে তা জেনে ফেললেন। তিনি হযরত আলী ইব্ন আবী তালিব (রা) ও হযরত যুবায়র ইব্ন আওয়াম (রা)-কে ঐ মহিলাকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসার জন্য প্রেরণ করলেন। তাঁরা রওযা-ই-জানাহ্-এ পৌছে তাকে গ্রেফতার করলেন। তার সমস্ত আসবাবপত্র তন্নতন্ন করে খুঁজলেন কিন্তু পত্রের সন্ধান পেলেন না। হযরত আলী (রা) বললেন, এটা হতেই পারে না যে, নবী করীম (সা) ভুল সংবাদ পেয়েছেন। পত্র অবশ্যই তার কাছে আছে। তিনি মহিলাকে ভয় দেখালেন ও ধমকালেন। তখন সে তার চুলের খোঁপার মধ্য থেকে চিঠি বের করে দিলো। পত্র পাঠ করে দেখা গেলো পত্রটি হাতিব ইব্ন আবী বাল্তাআর লেখা। পত্রসহ মহিলাটিকে নবী করীম (সা)-এর নিকট আনা হলো। হাতিবকে তলব করা হলো। তিনি বললেন, মক্কায় আমার আত্মীয়-স্বজন রয়েছে। তাই আমি মক্কাবাসীদের উপর একটু দয়া করতে চাইলাম এবং তাদের উপর আসন্ন হামলার খবর জানিয়ে দিতে চেয়েছিলাম, যাতে তারা কৃতজ্ঞতাবশত আমার আত্মীয়-স্বজনের উপর অত্যাচার না চালায়। একথা শুনে হযরত উমর ফারূক (রা) ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আদেশ দিন, এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দিই। তিনি বললেন, উমর! হাতিবের ভুল ক্ষমার্হ। হযরত হাতিব (রা)-এর ত্রুটি মার্জনা করা হলো। তিনি বদরী সাহাবী ছিলেন।

মক্কার পথে যাত্রা

অষ্টম হিজরীর ১১ই রমযান হযরত নবী করীম (সা) দশ হাজার সাহাবা সমভিব্যাহারে মদীনা থেকে রওয়ানা করলেন। কুরায়শরা আবূ সুফিয়ানের অকৃতকার্য হয়ে ফিরে আসায় খুব দুশ্চিন্তায় ছিল। তারা মুসলমানদের সংকল্প সম্পর্কে কোন খবর পায়নি। কোন গুপ্তচর ও মিত্র গোত্রও তাদের কোন সংবাদ জানায়নি। হযরত নবী করীম (সা) মদীনা থেকে রওয়ানা হয়ে খুব ত্বরিত গতিতে মক্কার পথ পাড়ি দিচ্ছিলেন। তিনি যখন জুহফা নামক স্থানে পৌছলেন, তখন তাঁর চাচা হযরত আব্বাস ইব্ন আবদিল মুত্তালিব (রা) পরিবার-পরিজনসহ মুসলমান ও মুহাজির হয়ে মদীনার পথে এসে মিলিত হলেন। নবী করীম (সা) তাঁর পরিবার-পরিজনকে মদীনায় পাঠিয়ে দিলেন এবং হযরত আব্বাস (রা)-কে তাঁর সঙ্গে নিলেন। ইসলামী লশকর অগ্রসর হতে হতে মক্কার অদূরবর্তী মাররুয্-যাহ্রান উপত্যকায় (মক্কার চার ক্রোশ দূরে অবস্থিত) পৌছে গেলো। মক্কাবাসী তখনো বেখবর ছিল। তারা এও জানতো না যে, মুসলমানরা তাদের ওয়াদা ভঙ্গের কি শাস্তি দেবে আর কি কর্মপন্থা গ্রহণ করবে? মাররুয-যাহ্রানে সন্ধ্যার সময় ইসলামী লশকর পৌছে শিবির স্থাপন করলেন। রাতে গো-রক্ষকদের মাধ্যমে খবর পৌছলো যে, মাররুয্-যাহ্রানে এক বিশাল বাহিনী শিবির স্থাপন করেছে। এ খবর শুনে আবূ সুফিয়ান অনুসন্ধান করতে বের হলো। বুদায়ল ইব্ন ওয়ারাকা ও হাকীম ইব্ন হিযামও তার সাথে ছিল। এদিকে হযরত নবী (সা) হযরত উমর ফারূক (রা)-এর নেতৃত্বে একদল টহল সেনা নিয়োগ করেন যাতে ঘুমন্ত অবস্থায় শত্রুপক্ষ অতর্কিত আক্রমণ করতে না পারে। হযরত আব্বাস (রা)-এর মন তাঁর কওমের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলো। তিনি জানতেন যে, প্রত্যূষে যখন ইসলামী লশকর মক্কা আক্রমণ করবে, তখন কুরায়শ ও মক্কার নাম-নিশানা অবশিষ্ট থাকবে না। তিনি কামনা করতেন কোন প্রকারে মক্কাবাসী মুসলমান হয়ে যাক। তাই তিনি

রাতের বেলায় নবী করীম (সা)-এর দুলদুল নামক খচ্চরে আরোহণ করে শিবির থেকে বের হয়ে মক্কার পথে গমন করলেন। ইসলামী লশকরগাহে নবী করীম (সা)-এর নির্দেশক্রমে হাজার হাজার সেনাগুচ্ছ পৃথক পৃথক ছাউনি স্থাপন করেছিল এবং সবাই আগুন জ্বেলে রেখেছিল।

আবূ সুফিয়ান দূর থেকে আগুন দেখে হতভম্ব হয়ে পড়লো। এত বড় বাহিনী কোথা থেকে এলো ? বুদায়ল ইব্‌ন ওয়ারাকা খুযাঈ বললো, এটি খুযাআ বাহিনী। আবূ সুফিয়ান শুনে অবজ্ঞামিশ্রিত কণ্ঠে জবাব দিলো, বনূ খুযাআর কি ক্ষমতা আছে এত বড় বাহিনী সমাবেশ করার ? তারা তো একটি দীন-হীন ও ছোট্ট গোত্র মাত্র।

রাতের অন্ধকারে হযরত আব্বাস (রা) আবূ সুফিয়ানের কথার আওয়াজ চিনে ফেললেন। তিনি এ উদ্দেশ্যেই বের হয়েছিলেন যে, মক্কার কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ হলে তাকে এই বিপদ সম্পর্কে অবহিত করে বলে দেবেন যে, এ মুহূর্তে মুসলমান হয়ে যাওয়াই তোমাদের জন্য শ্রেয়। তিনি তৎক্ষণাৎ আবূ সুফিয়ানকে আওয়াজ দিলেন এবং বললেন যে, এ বাহিনী মুহাম্মদ (সা)-এর বাহিনী। এরা প্রত্যুষে মক্কা আক্রমণ করবে। আবূ সুফিয়ান হতবুদ্ধি হয়ে গেলো এবং হযরত আব্বাস (রা)-এর নিকট এসে বললো, এখন উপায় কি! হযরত আব্বাস (রা) বললেন, তুমি আমার পশ্চাতে খচ্চরের উপর আরোহণ করো। আমি তোমাকে মুহাম্মদ (সা)-এর কাছে নিয়ে যাবো। সেখানে তুমি নিরাপত্তা পেতে পারো। আবূ সুফিয়ান নির্দ্বিধায় খচ্চরের উপর আরোহণ করলো এবং তার অন্য দুই সহচর মক্কায় চলে গেলো। হযরত আব্বাস (রা) আবূ সুফিয়ানকে তাঁর পশ্চাতে আরোহণ করিয়ে যখন ইসলামী লশকরগাহের দিকে ফিরে চললেন, তখন পথে হযরত উমর ফারূক (রা)-এর সাথে দেখা। তিনি আবূ সুফিয়ানকে চিনে ফেললেন এবং কতল করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু হযরত আব্বাস (রা) খচ্চর দাবড়িয়ে ত্বরিতগতিতে সটকে পড়লেন। হযরত উমর (রা) ছিলেন পদাতিক। তিনিও পিছনে পিছনে তলোয়ার নিয়ে ছুটলেন। হযরত আব্বাস (রা) নবী করীম (সা)-এর নিকট প্রথম পৌঁছলেন। তার পরপরই হযরত উমর (রা)-ও পৌঁছে গেলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এই কাফির বিনাশর্তে আমাদের আয়ত্তে এসে গেছে। আদেশ করুন, গর্দান উড়িয়ে দিই। হযরত আব্বাস (রা) বললেন, আমি আবূ সুফিয়ানকে আমান দিয়েছি। হযরত উমর (রা) পুনরায় অনুমতি চাইলেন। হযরত আব্বাস (রা) বললেন, উমর! তোমার বংশের কোন ব্যক্তি হলে তুমি তাকে হত্যা করার জন্য এত পীড়াপীড়ি করতে না এবং এত উদ্‌গ্রীবও হতে না। হযরত উমর ফারূক (রা) হযরত আব্বাস (রা)-এর কথার উত্তরে বললেন, আব্বাস! তুমি মুসলমান হওয়ায় আমি যত খুশী হয়েছি, আমার পিতা মুসলমান হলেও তত খুশী হতাম না। কেননা, আমি জানতাম যে, নবী করীম (সা) তোমার মুসলমান হওয়া কামনা করতেন। এই দুই মনীষীর মধ্যে এরূপ কথোপকথন চলছিল। তখন নবী (সা) বললেন, আচ্ছা! আবূ সুফিয়ানকে একরাত সময় দেয়া গেলো। তারপর হযরত আব্বাস (রা)-কে বললেন, আবূ সুফিয়ানকে তুমিই তোমার তাঁবুর মধ্যে রাখ। হযরত আব্বাস (রা) আবূ সুফিয়ানকে সারা রাত নিজের কাছে রাখলেন। সকাল বেলা আবূ সুফিয়ান মুসলমান হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং হযরত (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন।

আবূ সুফিয়ানের মর্যাদা বৃদ্ধি

হযরত আব্বাস (রা) হযরত নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, আবূ সুফিয়ান মর্যাদাপ্রিয় লোক। আপনি তাকে বিশেষ কোন মর্যাদা দান করুন। তিনি বললেন, আচ্ছা, যে ব্যক্তি কা'বাঘরে আশ্রয় নেবে, তাকে আমান (নিরাপত্তা) দেয়া হবে। যে ব্যক্তি আবূ সুফিয়ানের ঘরে আশ্রয় নেবে তাকেও আমান দেয়া হবে। যে ব্যক্তি তার আপন ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে থাকবে, সেও আমানে থাকবে। আর যাকে নিরস্ত্র অবস্থায় রাস্তায় পাওয়া যাবে, তারও কোন অসুবিধা ঘটানো হবে না। আবূ সুফিয়ান তাঁর এই মর্যাদা বৃদ্ধি দেখে খুব খুশী হলেন।

তখনই ইসলামী লশকর অস্ত্র-সজ্জিত হয়ে মক্কার দিকে ধাবিত হলো। ইসলামী লশকরের বিভিন্ন গোত্রের বিভিন্ন নিশান ছিল। আবূ সুফিয়ান উপত্যকার শীর্ষদেশে এক উঁচু টিলার উপর দাঁড়িয়ে ইসলামী লশকরের দৃশ্য অবলোকন করলেন এবং সবার আগে মক্কায় প্রবেশ করে ঘোষণা করে দিলেন যে, যে ব্যক্তি কা'বাঘরে কিংবা আমার ঘরে আশ্রয় নেবে, সে নিরাপদ থাকবে। নবী করীম (সা)-এর ইচ্ছা ছিল মক্কায় রক্তপাত না হওয়া। তিনি একদিন নিঃসম্বল অবস্থায় এই মক্কা থেকে বের হয়ে গিয়েছিলেন। আর আজ শাহী মর্যাদা ও বিশাল বাহিনীসহ মক্কায় প্রবেশ করছিলেন। একথা স্মরণ করে তিনি বারবার আল্লাহ্র শুকরিয়া জ্ঞাপন করছিলেন। তিনি মক্কায় বিনা বাধায় সাড়ম্বরে প্রবেশ করে কা'বাঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন। সওয়ারীর উপর বসে সাতবার বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করলেন। বায়তুল্লাহ্র সমস্ত প্রতিমা বাইরে নিক্ষেপ করলেন। তারপর কা'বার দ্বার-রক্ষক উসমান ইব্ন তাল্হা (রা)-এর নিকট থেকে চাবি নিয়ে কা'বাঘরে প্রবেশ করলেন। চাশ্ত সালাত আদায় করলেন। তারপর কা'বা ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে একটি ভাষণ দিলেন। মক্কাবাসীও সেখানে মাথা নীচু করে ভয় ও লজ্জায় তাঁর সামনে অপরাধীর ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছিল।

নবী করীম (সা)-এর ঐতিহাসিক ভাষণ

"আল্লাহ্ এক ও একক। তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি তাঁর ওয়াদা সত্যে পরিণত করেছেন। তিনি তাঁর বান্দাদের সাহায্য করেছেন এবং সকল সম্প্রদায়কে পরাভূত করেছেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান এনেছে তার জন্য মক্কায় রক্তপাত করা বৈধ নয়। এখানকার কোন সবুজ বৃক্ষ কাটাও বৈধ নয়। আমি জাহিলী যুগের সমস্ত রসম-রেওয়াজ পদদলিত করেছি। কিন্তু কা'বার আশপাশের লোক ও হাজীদেরকে যমযমের পানি পান করানোর ব্যবস্থা বহাল রাখা হবে। হে কুরায়শ সম্প্রদায়! তোমাদেরকে আল্লাহ্ জাহিলী অহংকার ও বংশের গৌরব করতে নিষেধ করেছেন। সমস্ত মানুষ আদম (আ) থেকে এবং আদম (আ) মাটি থেকে সৃষ্টি হয়েছিলেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ·

হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে

পার। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহ্‌র নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে অধিক মুত্তাকী। (৪৯ : ১৩)

"হে কুরায়শ সম্প্রদায়! তোমরা কি জান, আমি তোমাদের সাথে কিরূপ আচরণ করব?"

এই প্রশ্নমূলক বাক্যটি শুনে কুরায়শ অর্থাৎ মক্কাবাসীরা বললো, "আমরা আপনার কাছে মঙ্গল প্রত্যাশা করি। কেননা, আপনি আমাদের শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা ও শ্রদ্ধেয় ভ্রাতুষ্পুত্র!" হযরত নবী (সা) এই উত্তর শুনে বললেন :

"আচ্ছা, আমিও তোমাদের সেই কথাই বলছি যা ইউসুফ (আ) তাঁর ভাইদের বলেছিলেন:

لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ اِذْهَبُوْا فَاَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ

আজ তোমাদের প্রতি কোন ভর্ৎসনা নেই; যাও তোমরা সবাই মুক্ত।

এই ভাষণ শেষ করে তিনি সাফা পর্বতে গিয়ে বসলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের উপর লোকদের বায়'আত গ্রহণ শুরু করলেন। পুরুষদের বায়'আত গ্রহণ শেষ করে তিনি হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-কে নারীদের বায়'আত নেয়ার জন্য আদেশ করলেন এবং তিনি স্বয়ং তাদের জন্য ইসতিগফার করতে লাগলেন। সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া মক্কা বিজয়ের পর প্রাণের ভয়ে ইয়ামন পলায়ন করলো। ঐ গোত্রের উমায়র ইব্‌ন ওয়াহব (রা) নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে সাফওয়ানের জন্য আমান প্রার্থনা করলেন। তিনি তাকে আমান দিলেন এবং এই আমানের নিশ্চয়তাস্বরূপ মক্কায় প্রবেশের সময় তাঁর মাথায় যে পাগড়িটি বাঁধা ছিল, সেটি তাকে দান করলেন। উমায়র ইব্‌ন ওয়াহব (রা) সাফওয়ানকে ইয়ামনের সন্নিকট থেকে ফিরিয়ে আনলেন। সে নবী করীম (সা) থেকে দুমাসের সময় প্রার্থনা করলো। তিনি চার মাসের সময় দান করলেন। সাফওয়ান মুসলমানদের মক্কায় প্রবেশ করার সময় বাধা দিয়েছিল। কিন্তু প্রতিরোধ করতে না পেরে পলায়ন করেছিল। একই অবস্থা ইকরামা ইব্‌ন আবূ জাহেলেরও হলো। তাকেও নবী করীম (সা) ক্ষমা করে দিলেন। এ দু'জনই হুনায়ন যুদ্ধের পর সানন্দে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

সত্য সমাগত বাতিল ভূ-লুণ্ঠিত

কা'বাঘরে মূর্তি ভাঙ্গা সমস্ত আরবদেশের মূর্তি ভাঙ্গার শামিল ছিল। অনুরূপভাবে মক্কার কুরায়শদের ইসলামের দাখিল হওয়া এবং ইসলামের আনুগত্য অবলম্বন করা সারা আরবদেশের অনুগত হওয়ার সমতুল্য ছিল। কেননা, সমস্ত আরবের দৃষ্টি ছিল মক্কার কুরায়শদের প্রতি, তারা ইসলাম গ্রহণ করে কিনা। মক্কা বিজয়ের পর বহু কুরায়শ মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু অনেকে তাদের কুফর ও মূর্তিপূজায় অটল রইল। কাউকে জোর করে মুসলমান বানানোর চেষ্টা আদৌ করা হয়নি বরং লক্ষ্য ছিল শুধু শান্তি-নিরাপত্তা কায়েম করা এবং ফিতনা-ফাসাদ ও নিরাপত্তাহীনতা দূর করা। এখন সে আশংকা আর নেই এবং জনগণ ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভ করেছে। এই ধর্মীয় স্বাধীনতার অবস্থায় মূর্তিপূজকদের ইসলামকে জানা ও বুঝার সুযোগ হলো এবং তারা একের পর এক অতি দ্রুত সানন্দে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলো। এমনকি অল্পদিনের মধ্যেই সবাই ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হলো।

মক্কা বিজয় সমাপ্ত করে হযরত নবী করীম (সা) মক্কা শহরে ঘোষণা করলেন যে, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, তারা তাদের গৃহে কোন মূর্তি রাখতে পারবে না। তারপর তিনি মক্কার

আশপাশের মশহুর মূর্তিগুলো ভেঙে ফেলতে এবং দেবালয়গুলো ধ্বংস করার জন্য ছোট ছোট সেনাদল প্রেরণ করলেন। একটি খেজুর বাগানে স্থাপিত বনূ কিনানার উয্যা নামক মূর্তিটি ভাঙ্গার জন্য হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)-কে ত্রিশ হাজার আরোহীসহ প্রেরণ করলেন। হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) গিয়ে উয্যাকে টুকরো টুকরো করে ফেললেন এবং তার মন্দিরটি বিধ্বস্ত করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিলেন। হযরত আমর ইবনুল 'আস (রা)-কে হুযায়ল-এর সুআ' নামক মূর্তিটি ভেঙে ভূমিসাৎ করার জন্য প্রেরণ করা হলো। হযরত আমর ইবনুল 'আস (রা) যখন মন্দিরের নিকট পৌঁছলেন, তখন পূজারীরা বললো, তোমার কি ক্ষমতা আছে? হযরত আমর ইবনুল 'আস (রা) বললেন, তোমরা দেখতে থাক। একথা বলে মন্দিরে প্রবেশ করলেন এবং মূর্তিটি টুকরো টুকরো করে ফেললেন। পূজারীরা তৎক্ষণাৎ মূর্তিপূজা থেকে তওবা করে মুসলমান হয়ে গেলো। হযরত সা'দ ইব্ন যায়দ আশহালী (রা)-কে 'মানাত নামীয় মূর্তি ভাঙার জন্য কুদায়দ নামক স্থানে পাঠানো হলো। সেখানকার পূজারীরাও বিশ্বাস করত যে, মুসলমানরা কখনো মূর্তি ভাঙতে পারবে না। কিন্তু তারা দেখতে পেলো যে, মুসলমানরা সেখানে গিয়েই সেটি ভেঙেচুরে মন্দির মিসমার করে ফেললো। অনুরূপ আরো অনেক মন্দির ধ্বংস হলো। এরপর কোন কোন গোত্রে ইসলাম প্রচারের জন্য হযরত নবী করীম (সা) প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন। হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) বনূ জুযায়মা গোত্রে প্রেরিত হলেন। তাঁকে রক্তপাত করতে নিষেধ করা হয়েছিল। কিন্তু সেখানে ঘটনাচক্রে হযরত খালিদ (রা)-কে যুদ্ধ করতে হলো এবং বনূ জুযায়মার কয়েকজন লোক নিহত হলো। হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) যখন তাদের ধন-সম্পদ মালে গনীমত হিসাবে মক্কায় নিয়ে এলেন, তখন হযরত নবী করীম (সা) এই ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করলেন। তিনি হযরত আলী (রা)-এর মাধ্যমে বনূ জুযায়মার মাল-পত্র ও তাদের নিহতদের রক্তপণ তাদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। মক্কা বিজয়ের পর তিনি মক্কা মুআয্যমায় পনের দিন অবস্থান করেন এবং সালাতে কসর আদায় করতে থাকেন। মক্কায় তাঁর অনির্দিষ্টকাল অবস্থানে আনসারদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি হলো। তারা ভাবলেন, সম্ভবত তিনি মক্কায়ই বসবাস করবেন এবং মদীনায় ফিরে আসবেন না।

হুনায়ন যুদ্ধ

মক্কা বিজয় ও অধিকাংশ কুরায়শের ইসলাম গ্রহণের কথা শুনে যেসব গোত্র মুসলমানদের মিত্র ছিল না, তারা অস্থির ও হতবুদ্ধি হয়ে পড়লো। হাওয়াযিন ও সাকীফ গোত্র ছিল তাদের অন্যতম। এরা তায়িফ ও মক্কার মাঝামাঝি স্থানে বাস করত এবং কুরায়শের প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিপক্ষ হিসাবে বিবেচিত হতো। এই গোত্রগুলো না মুসলমানদের মিত্র ছিল, না মক্কার কুরায়শদের। তারা ভাবলো, মুসলমানরা মক্কার পর এখন আমাদের উপর হামলা করবে। বনূ হাওয়াযিনের সরদার মালিক ইব্ন আওফ বনূ হাওয়াযিন ও বনূ সাকীফের সবগুলো গোত্রকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করে নিজের চতুষ্পার্শ্বে একত্রিত করলো। নাসর, জুশাম, সা'দ প্রভৃতি গোত্রও অনুপ্রাণিত হয়ে যুদ্ধে শরীক হলো। আওতাস নামক স্থানে এই বিরাট বাহিনী সমবেত হলো। হযরত নবী করীম (সা) মক্কায় বসে যখন এই বিরাট সৈন্য সমাবেশের খবর পেলেন, তখন তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ হাদরাদ আসলামীকে গুপ্তচররূপে সংবাদ সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করলেন। তিনি ফিরে এসে বললেন, শত্রুদের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। তারা যুদ্ধের জন্য এখন প্রস্তুত। হযরত নবী করীম (সা) তৎক্ষণাৎ যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করলেন। দশ হাজার মুহাজির ও

আনসার তাঁর সাথে মদীনা থেকে এসেছিলেন। তারা সবাই এবং দু' হাজার মক্কাবাসীসহ মোট বারো হাজার লশকর তাঁর সঙ্গে মক্কা থেকে রওয়ানা হলেন। মক্কাবাসী দু' হাজার লোকের মধ্যে কিছু নও-মুসলিম ছিলেন। আর কিছু লোক ছিল যারা তখনো মুশরিকসুলভ মূলতত্ত্বে বিশ্বাসী ছিল।

অষ্টম হিজরীর পহেলা শাওয়াল ইসলামী লশকর তিহামা উপত্যকা অতিক্রম করে হুনায়নে পৌঁছলো। শত্রুপক্ষ ইসলামী লশকরের নিকটবর্তী হওয়ার খবর পেয়ে হুনায়নের উভয় দিকের গোপন ঘাঁটিতে ওঁৎ পেতে অপেক্ষা করলো।

মুসলমানগণ উপত্যকার শাখা-প্রশাখা ও অলিগলি ঘুরে নিম্নভূমিতে অবতরণ করছিলেন। সুব্‌হে কাযিবের অন্ধকার তখন সুবিস্তৃত। অকস্মাৎ শত্রুবাহিনী গোপন ঘাঁটি থেকে বের হয়ে তীর-নিক্ষেপ ও তীব্র আক্রমণ শুরু করলো। এই আকস্মিক আপতিত বিপদ ও অতর্কিত আক্রমণের ফলে মুসলিম পক্ষ ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলো। মক্কাবাসী দু'জাহার লোকই সর্বপ্রথম দিশেহারা হয়ে পলায়ন করলো। তাদের দেখাদেখি মুসলমানরাও যে যে দিকে পারলো ছুটাছুটি করতে লাগলেন। হযরত নবী করীম (সা) ছিলেন উপত্যকার ডান দিকে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা), হযরত উমর ফারূক (রা), হযরত আলী (রা), হযরত আব্বাস (রা), হযরত ফযল ইব্‌ন হাইয়ান (রা), আবূ সুফিয়ান (রা), ইবনুল হারিছ ও সাহাবায়ে কিরামের একটি ক্ষুদ্র দল। তিনি তাঁর দুলদুল নামক সাদা খচ্চরের উপর সওয়ার ছিলেন। হযরত আব্বাস (রা) তার লাগাম ধারণ করেছিলেন। এই কঠিন বিপদ ও সংকটাবস্থায় তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠলেন :

اَنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِبْ * اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ

আমি (আল্লাহ্‌র) নবী একথা মিথ্যা নয়, আমি আবদুল মুত্তালিবের বংশধর জানবেন নিশ্চয়।

হযরত নবী করীম (সা)-এর এরূপ দৃঢ়তা ও বীরত্ব মুসলমানদের হিম্মত বাড়িয়ে দিলো। তাঁর চতুষ্পার্শ্বে শত্রুপক্ষ পূর্ণ শক্তিতে হামলা করছিল আর এই মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক তাদের সাথে লড়াই করছিল। হযরত আব্বাস (রা) ছিলেন উচ্চ কণ্ঠস্বরের অধিকারী। হযরত নবী করীম (সা) তাঁকে বললেন-মুসলমানদের এদিকে ডাক দাও। হযরত আব্বাস (রা) প্রত্যেক গোত্রের নাম ধরে ধরে ডাক দেয়া শুরু করলেন : 'তোমরা এদিকে এসো।' এই ডাক শুনে মুসলমানগণ এই ডাকের দিকে এমনভাবে ছুটে এলো, যেমনিভাবে গো-শাবক তার মায়ের ডাক শুনে তার দিকে ছুটে যায়। কিন্তু নবী করীম (সা)-এর নিকট মাত্র শ' খানেক লোক পৌঁছতে সক্ষম হলো। অন্যরা শত্রুপক্ষ মাঝখানে অন্তরায় হওয়ার দরুন তাঁর নিকট পৌঁছতে পারেনি। সেখানে থেকেই তারা লড়াই চালাতে লাগলো। তিনি 'আল্লাহু আকবর' বলে তাঁর দুলদুল খচ্চরকে শত্রুপক্ষের দিকে ধাবিত করলেন এবং ঐ শ' খানেক লোকের ক্ষুদ্র দলটি এমন তীব্র আক্রমণ চালালো যে, সম্মুখ থেকে শত্রুরা সরে গেলো। এরপর তারা শত্রুপক্ষের লোকদের গ্রেফতার করা শুরু করলো। হযরত নবী করীম (সা)-এর না'রা-ই-তাকবীর শুনে এবং শত্রুদের উপর তাঁকে হামলা করতে দেখে মুসলমানরাও চতুর্দিক থেকে জড়ো হয়ে শত্রুপক্ষের উপর না'রা-ই-তাকবীর দিয়ে হামলা করলো। ফলে অনতিবিলম্বেই যুদ্ধের মোড় পাল্টে গেলো। শত্রুপক্ষ সম্পূর্ণ পরাজিত হলো। এই যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত মক্কাবাসী

মুশরিকদের কারণে প্রথমে মুসলিমপক্ষের পরাজয় হয়েছে। কেননা, তারা নিজেরা পলায়ন করে অন্যদের কদমও নড়বড়ে করে দিয়েছিল। কিন্তু হযরত নবী করীম (সা)-এর অসীম বীরত্ব ও দৃঢ়তা অত্যল্প কালের মধ্যেই মুসলমানদের সামলে নিলো এবং শত্রুপক্ষ চরম পরাজয় বরণ করলো।[১] যুদ্ধ পরিস্থিতি যখন জটিল হয়ে উঠেছিল এবং মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধের বিভীষিকা ছড়িয়ে পড়েছিল, তখন মক্কার এক ব্যক্তি উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে উঠলো—যাক, আজকে জাদুর পরিসমাপ্তি ঘটলো। আরেকজন বললো, মুসলমানদের পরাজয় আর ঠেকানো যাবে না। এরা এভাবেই পালাতে পালাতে সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত চলে যাবে। শায়বা নামক এক ব্যক্তি বললো, আজ আমি মুহাম্মদ (সা) থেকে প্রতিশোধ নেবো। এই বলে সে হযরত নবী করীম (সা)-এর দিকে এগিয়ে গেলো। কিন্তু রাস্তার মধ্যে বেহুশ হয়ে পড়ে গেলো।

যুদ্ধক্ষেত্রে হাওয়াযিন গোত্রের বহু লোক নিহত হলো এবং অবশেষে তারা ময়দান থেকে পলায়ন করলো। তাদের পর ছাকীফ গোত্রের লোকেরা কিছুক্ষণ যুদ্ধক্ষেত্র উত্তপ্ত রাখলো। শেষে তারাও পরাজয়ের গ্লানি বহন করতে বাধ্য হলো। এই যুদ্ধে শত্রুপক্ষের বড় বড় সরদার ও বাহাদুর ব্যক্তি মুসলমানদের হাতে নিহত হলো। কিন্তু তাদের প্রধান সেনাপতি মালিক ইব্ন আওফ পলায়ন করলো এবং তায়িফের দিকে চলে গেলো। আর বিরুদ্ধবাদী লোকেরা এই পলায়নকারীদেরকে আশ্রয় দিয়ে শহরের দরজা বন্ধ করে দিলো। পলায়নকারীদের একটি অংশ আওতাস নাম স্থানে সমবেত হলো এবং আরেকটি অংশ আশ্রয় নিলো নাখ্লা নামক স্থানে।

---

১. ইতোপূর্বে সংঘটিত বদর, ওহুদ ও খন্দকসহ সকল যুদ্ধেই মুসলমানরা ছিল সংখ্যালঘিষ্ঠ আর বিরুদ্ধ পক্ষ কাফির মুশরিকরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই প্রথম মুসলমানরা এমন এক শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে যাচ্ছিল যারা ছিল তাদের তুলনায় সংখ্যাশক্তিকে লঘিষ্ঠ। ফলে কিছু কিছু মুসলমান নিজেদের এই বিপুল সংখ্যাশক্তিতে বিভ্রান্ত ও গর্বিত হয়ে বলে ওঠেন ঃ আজ আর আমরা সংখ্যায় কম নই বিধায় আমাদের পরাজিত হবার কোন আশংকা নেই। বিজয় তো আমাদের হাতের মুঠোয়।

বিষয়টি সকল কিছুর যিনি নিয়ামক, যিনি জয়-পরাজয়ের মালিক, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পছন্দ হয় নি। কেবল আল্লাহ্র সাহায্যই যে মুসলমানদের প্রতিটি বিজয়ের পেছনে ক্রিয়াশীল, সংখ্যা কিংবা অস্ত্রশক্তি নয় একথা তিনি মুসলমানদের হৃদয়ে গেঁথে দিতে চাইলেন। মুসলমানদের প্রতি সাহায্য-সমর্থনের প্রসারিত হাত তিনি যুদ্ধের প্রাথমিক অবস্থায় গুটিয়ে নিলেন। ফলে হাওয়াযিন গোত্রের অতর্কিত আক্রমণের মুখে মুসলমানরা ঘাবড়ে গিয়ে এমনভাবে পেছনে ফিরলেন যে, কেউ কারো দিকে একবার তাকিয়ে দেখেন নি কে কোথায়। এমনকি এ সময় তাদের প্রাণপ্রিয় রাসূল (সা) কোথায় সেদিকেও কারও খেয়াল ছিল না। কেবল স্বল্প সংখ্যক সাথী নিয়ে এমনতরো সংকটময় মুহূর্তেও যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহ্র রাসূল সুস্থির দাঁড়িয়ে।

আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের যতটুকু শিক্ষা দেবার এবং ভবিষ্যতে যেন এ ধরনের ভুলের পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে জন্য যেটুকু সতর্ক করার দরকার ছিল যা তিনি চেয়েছিলেন তা হয়ে গেল। সংখ্যাধিক্য তাদেরকে যতটুকু উৎফুল্ল করেছিল, আত্মপ্রসাদে উজ্জীবিত করেছিল আল্লাহ তা'আলা (মক্কা) বিজয়ের মিষ্টতা উপভোগের পর পুনরায় পরাজয়ের তিক্ত স্বাদ চাখালেন যাতে তাদের ঈমান অধিকতর মজবুত হয়, বিজয়ে তাদের ভেতর আত্মশ্লাঘা এবং পরাজয়ে কোনরূপ হতাশা সৃষ্টি না হয়। সেজন্য তিনি তাদেরকে পুনরায় আক্রমণাত্মক ভূমিকায় পৌঁছে দিলেন এবং আপন রাসূল ও সকল মুসলমানের উপর এক ধরনের প্রশান্তি (সকীনা) নাযিল করলেন। সেই সঙ্গে আল্লাহ তাঁর পক্ষ থেকে অদৃশ্য এক সেনাবাহিনী পাঠান তাঁর প্রিয় রাসূল ও মু'মিনদের সাহায্যার্থে। অতঃপর মুহূর্তেই যুদ্ধের চিত্র পাল্টে যায়। হাওয়াযিনদের পরাজয় ঘটে এবং মুসলমানরা জয়লাভে সক্ষম হন। কুরআন করীমের সূরা তাওবার ২৫-২৬ নং আয়াতে এরই স্বীকৃতি মিলে।

"আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন বহু ক্ষেত্রে এবং হুনায়ন যুদ্ধের দিনে যখন তোমাদেরকে উৎফুল্ল করেছিল তোমাদের সংখ্যাধিক্য, কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসে নি এবং বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবী তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়েছিল এবং পরে তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিলে। অতঃপর আল্লাহ তাঁর নিকট থেকে তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের ওপর প্রশান্তি বর্ষণ করেন এবং এমন এক সৈন্যবাহিনী অবতরণ করেন যা তোমরা দেখতে পাওনি এবং তিনি কাফিরদেরকে শাস্তি প্রদান করেন। আর এটাই কাফিরদের কর্মফল।"—সম্পাদক

হযরত নবী করীম (সা) তাদের পশ্চাদ্ধাবনকল্পে আওতাস ও নাখলায় সেনাদল প্রেরণ করলেন এবং উভয় স্থানেই মুকাবিলা ও হতাহত হলো। কিন্তু মুসলিম পক্ষ উভয় স্থানেই শত্রুপক্ষকে পরাস্ত করে তাড়িয়ে দিলেন এবং মালে গনীমত ও যুদ্ধবন্দী নিয়ে ফিরে এলেন। হযরত নবী করীম (সা) সমস্ত যুদ্ধবন্দী ও মালে গনীমত জি'রানা নামক স্থানে জমা করার নির্দেশ দিলেন এবং হযরত মাসউদ ইব্ন উমর গিফারী (রা)-কে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত করে তায়িফের উদ্দেশ্যে গমন করলেন। এই যুদ্ধে ছয় হাজার যুদ্ধবন্দী, চুয়াল্লিশ হাজার উট, চুয়াল্লিশ সহস্রাধিক মেষ-বকরী, চার হাজার উকিয়া (প্রতি উকিয়া এক তোলা সাত মাশা পরিমাণ) রৌপ্য মুসলমানদের হস্তগত হলো। এই যুদ্ধ হুনায়ন যুদ্ধ নামে খ্যাত। সবগুলো সাকীফ গোত্র তায়িফে একত্রিত হয়েছিল এবং তায়িফবাসী তাদের সমব্যথী বনেছিল।

তায়িফ অবরোধ

হুনায়ন থেকে তায়িফ গমনকালে পথিমধ্যে মালিক ইব্ন আওফ-এর দুর্গ। হযরত নবী করীম (সা) এই দুর্গটি বিধ্বস্ত করান। তারপর আতাম দুর্গ। সেটিকেও বিধ্বস্ত করা হয়। তায়িফের অদূরে পৌঁছে তিনি তায়িফবাসীকে মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত দেখতে পান। তিনি তায়িফ অবরোধ করলেন। বিশ দিন পর্যন্ত তায়িফের অবরোধ অব্যাহত থাকলো। এই বিশ দিনের মধ্যে তায়িফের আশেপাশের এলাকাসমূহ থেকে অধিকাংশ গোত্র স্বেচ্ছায় আগমন করে এবং কোন কোনটি প্রতিনিধিদলের মাধ্যমে মুসলমান হতে থাকলো। হুনায়ন যুদ্ধে মাত্র চারজন মুসলমান শহীদ হয়েছিলেন। কিন্তু তায়িফ অবরোধকালে বারোজন মুসলমান শাহাদত বরণ করেন। এ অবরোধেও মুসলিম পক্ষের বিরাট লাভ হয়। তায়িফের আশেপাশের গোত্রসমূহ ইসলাম গ্রহণ করে। হযরত নবী করীম (সা) তখনই তায়িফ বিজয় আবশ্যক মনে না করে সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং জি'রানা পৌঁছে যুদ্ধবন্দী ও মালে গনীমত বণ্টন করেন।[১]

---

১. তায়িফ বিজয় যুদ্ধের মাধ্যমে হয়নি বরং এ বিজয় ছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দু'আর ফল ও ফসল। তায়িফ অবরোধ প্রায় একমাসকাল স্থায়ী হয়। এ সময় কাফিরদের তীর বর্ষণে কয়েকজন মুসলমান শাহাদত লাভ করেন। দীর্ঘ অবরোধ সত্ত্বেও তায়িফের লোকেরা নতি স্বীকার না করায় অবশেষে রাসূলুল্লাহ (সা) অবরোধ প্রত্যাহারপূর্বক ফিরে যাবার ঘোষণা দেন। এতে লোকেরা শোরগোল শুরু করে এবং তায়িফ জয় না করে ফিরে যেতে অনীহা প্রকাশ করে। তাঁরা বলতে থাকে : আমরা তায়িফ জয় না করে কিভাবে ফিরে যেতে পারি ? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : আচ্ছা ঠিক আছে, চলো আমরা লড়াই করি। তারা লড়াইয়ের সূচনা করেন এবং পরিণতিতে চরম আঘাত খান। অতঃপর তাদের বোধোদয় ঘটলে রাসূলুল্লাহ (সা) ঘোষণা দেন আমরা কাল ভোরে ইনশাআল্লাহ ফিরে যাব। মুসলমানরা এই ঘোষণা শুনে খুশী হন এবং সফরের প্রস্তুতিতে লেগে যান। আল্লাহ্র রাসূল (সা) এই দৃশ্যে হাসতে থাকেন।
হাসার কারণ সম্ভবত এই ছিল যে যখন ফেরার কথা বলা হয়েছিল, তখন সকলেই ফিরতে ইতস্তত ও অনীহা প্রকাশ করেছিল কিন্তু চপেটাঘাত পড়তে তারা খুশী হয়ে সফর প্রস্তুতি শুরু করে। মানব স্বভাবের এই ভোজবাজিতে তিনি হেসে ফেলেন।
এ সময় সাহাবায়ে কিরাম তাদের বিরুদ্ধে বদদো'আ করার জন্য বললে তিনি দো'আ করলেন اللهم ثقيفا وائت بهم হে আল্লাহ! তুমি সাকীফকে হিদায়াত দান কর এবং তাদেরকে আমার কাছে এনে দাও।
এরপর সাকীফ গোত্র থেকে গোত্র প্রধান ওরওয়া ইবন মাসউদ সাকাফী ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে মদীনায় আগমন করেন এবং ইসলাম কবুল করেন। অতঃপর ওরওয়া (রা) ইসলাম সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ইলম হাসিলের পর তাঁর কওমের মধ্যে ইসলামের প্রচারের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। তিনি অনুমতি প্রদান করেন, সেই সঙ্গে এই আশংকাও ব্যক্ত করেন যে, তোমার কওম তোমাকে হত্যা না করে বসে। ওরওয়া বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কওম আমাকে এত ভালবাসে যতটা একজন প্রেমিক তার প্রেমিকাকে ভালবাসে।

এই স্থানেই হাওয়াযিন গোত্রের পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধিদল হযরত নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয় এবং হালীমা সা'দিয়ার দোহাই দিয়ে ক্ষমার আবেদন করে। তিনি বললেন, তোমরা যুহরের সময় যখন সমস্ত মুসলমান সালাতের জন্য একত্রিত হবে, তখন আমার সামনে তোমাদের আবেদন পেশ করবে। তারা তাই করলো। হযরত নবী করীম (সা) হাওয়াযিন প্রতিদিধিদলকে বললেন, তোমাদের যে পরিমাণ বন্দী আমার ও বনূ আবদুল মুত্তালিবের অংশে পড়েছে, তাদের সবাইকে আযাদ মনে করো এবং সাথে করে নিয়ে যাও। একথা শুনে সকল মুহাজির ও আনসার বললো– مَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِرَسُوْلُ اللهِ (আমাদের অংশও রাসূলুল্লাহ্র অংশ) একথা বলে সবাই সকল হাওয়াযিন বন্দীকে আযাদ করে দিলেন। এইভাবে প্রায় ছয় হাজার বন্দীকে সামান্য সময়ের ব্যবধানে আযাদ করে দেয়া হলো। এই বন্দীদের মধ্যে হযরত নবী করীম (সা)-এর দুধবোন শায়মা বিন্ত হালীমা সা'দিয়াও ছিলেন। তিনি যখন তার দুধবোন হওয়ার দাবী করলেন, তখন নবী করীম (সা) তার প্রমাণ পেশ করতে বললেন। তিনি বললেন, আমার পিঠে তোমার দাঁতের চিহ্ন আছে। তুমি ছোট্ট সময় কামড় দিয়েছিলে। তিনি বললেন, যথার্থ। এই বলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর চাদর বিছিয়ে দিলেন এবং তার উপরে তাকে বসালেন। তারপর বললেন, তুমি যদি আমার কাছে থাকতে চাও, তবে আমি তোমাকে আদরযত্নে রাখবো। আর যদি আপন গোত্রে ফিরে যেতে চাও তবে তাও যেতে পারো। তিনি দ্বিতীয় প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। তখন নবী করীম (সা) তাকে নিজের মালিকানা থেকে বহু ধন-মাল, একটি দাসী, একটি গোলাম দান করে বিদায় করেন। শায়মা এই দাসী ও গোলামের মধ্যে বিবাহ দিয়ে দেন। শোনা যায়, তাদের বংশধারা এখনো অবশিষ্ট আছে।

আনসারদের রাসূল-প্রেম

হযরত নবী করীম (সা) জি'রানা নামক স্থানে মালে গনীমত বন্টনকালে মক্কাবাসী মুআল্লাফাতুল কুলূবদের বেশী অর্থ প্রদান করেন এবং কেউ কেউ তার প্রাপ্য অংশের চেয়ে কয়েক গুণ বেশী মালে গনীমত লাভ করেন। অধিকাংশ মক্কাবাসী যেহেতু কুরায়শ তথা নবী করীম (সা)-এর আত্মীয় ও স্বদেশী ছিলেন, তাই এ নিয়ে কোন কোন তরুণ আনসারের মধ্যে মৃদু গুঞ্জরণ শুরু হলো। তারা বলাবলি করতে লাগলো, নবী করীম (সা) তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও স্বদেশীদেরকে প্রাপ্য অংশের চেয়ে অনেক বেশী দিয়েছেন। কিন্তু আমাদেরকে সাধারণ অংশের চেয়ে এতটুকু বেশী দেননি। অথচ দান-দক্ষিণার বেশী হকদার ছিলাম আমরাই।

এই গুঞ্জরণ এক কান দু'কান হয়ে হযরত নবী করীম (সা)-এর পবিত্র কান পর্যন্ত পৌঁছে গেলো। তিনি সমস্ত আনসারকে এক স্থানে সমবেত করলেন। সবাই সমবেত হওয়ার পর তিনি তাদের সম্বোধন করে বললেন, তোমরা এরূপ কথা বলেছো। আনসারদের পক্ষ থেকে উত্তরে বলা হলো, হাঁ, আমাদের তরুণরা এরূপ কথা অবশ্যই বলেছে। কিন্তু আমাদের মধ্যে কোন পরিপক্ক, সম্মানিত ও সমঝদার ব্যক্তি এমন কথা ঘুণাক্ষরেও ভাবেননি, ভাবতেও পারে না।

ওরওয়া (রা) তাঁর কওমের মাঝে ফিরে আসেন এবং সর্বপ্রযত্নে ইসলামের প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। অতঃপর ইসলাম প্রচারের শুরুতেই তিনি জনৈক পাপাত্মা কর্তৃক নিক্ষিপ্ত তীরের আঘাতে শাহাদত লাভ করেন।

রাসূলুল্লাহ (সা)–এর দু'আর সঙ্গে ওরওয়া (রা)-র শহীদি খুন তায়িফবাসীদের মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করে থাকে নি। এর অল্প দিনের মধ্যেই সাকীফ গোত্রের একটি নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধি দল মদীনায় পৌঁছে এবং আন্তরিকতার সঙ্গে ইসলাম কবূল করে।—সম্পাদক

হযরত নবী করীম (সা) একথা শুনে বললেন, হে আনসার সম্প্রদায়। একথা কি সত্য নয় যে, তোমরা বিপথগামী ছিলে ? আল্লাহ তা'আলা আমার মাধ্যমে তোমাদের পথ-প্রদর্শন করেছেন ? আনসারগণ বললেন, অবশ্যই! আমাদের উপর আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের দান অপরিসীম! তারপর তিনি বললেন, একথা কি সত্য নয় যে, তোমরা পরস্পরে একে অপরের শত্রু ছিলে, আমার মাধ্যমে তোমরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছ ? তাঁরা বললেন, অবশ্যই। আপনি আমাদের উপর বিরাট অনুগ্রহ করেছেন। এরপর তিনি বললেন, একথা কি সত্য নয় যে, তোমরা দরিদ্র ছিলে এবং আমার বদৌলতে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ধনী করেছেন ? আনসারগণ বললেন, অবশ্যই! আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল আমাদের উপর বড় দয়া করেছেন। এরপর তিনি বললেন, না! তোমরা আমাকে এ উত্তর দিতে পারো যে, সারা দুনিয়া যখন আপনাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, আমরা তখন আপনাকে সত্যায়ন করেছি। সবাই আপনাকে ত্যাগ করেছে, আমরা আশ্রয় দিয়েছি। আপনি অভাবী ছিলেন, আমরা আপনাকে সাহায্য করেছি। আমি তোমাদের এসব কথাই স্বীকার করবো। হে আনসার সম্প্রদায়! তোমরা কি এটা পসন্দ করবে না যে, লোকেরা উট-বকরী নিয়ে তাদের ঘরে যাবে! এই বক্তৃতা শুনে আনসারগণ অজ্ঞাতে কেঁদে ফেললেন। অশ্রুপ্রবাহে তাঁদের দাড়ি ভিজে গেলো। তারপর হযরত নবী করীম (সা) বললেন, হিজরত যদি একটি ঐশী নির্দেশ না হতো, তবু আমি আনসারদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। আনসাররা যদি একপথে চলে আর অন্যরা ভিন্নপথ অবলম্বন করে, তাহলে আমি অবশ্যই আনসারদের পথ অবলম্বন করবো। হে আল্লাহ্! আনসার এবং আনসারদের সন্তান ও তাদের সন্তানদের উপর তুমি রহমত বর্ষণ কর।-একথা শুনে আনসারদের যে কি অবস্থা হয়েছিল এবং তাঁরা যে কি পরিমাণ উৎফুল্ল হয়েছিলেন, আমরা শুধু তা কল্পনাই করতে পারি–ভাষায় প্রকাশ করতে পারি না। এরপর তিনি আনসারদের এই মর্মে বুঝ দিলেন যে, এইসব লোক সদ্য মুসলমান হয়েছে। এদের মনোরঞ্জনের জন্য বেশী ধন-মাল দেয়া হয়েছে। একথা নয় যে, তাদের প্রাপ্য বেশী।

মক্কার প্রথম আমীর

এরপর তিনি জি'রানা দিয়ে গমনকালে উমরার নিয়ত করলেন। মক্কায় প্রবেশ করে উমরার আরকান সমাপ্ত করে বিশ বছরের কিছু বেশী বয়সের আত্তাব ইব্‌ন উসায়দ নামক জনৈক যুবককে মক্কার শাসক নিযুক্ত করলেন এবং কুরআন ও দীনের আহকাম শিক্ষাদানের জন্য মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা)-কে সেখানে রেখে মুহাজির ও আনসার সমভিব্যাহারে মদীনা যাত্রা করলেন। আত্তাব ইব্‌ন উসায়দকে শাসক ও মক্কার আমীর নিয়োগ করার কারণ হলো তাঁর দীনী জ্ঞান লাভ করার খুব আগ্রহ ছিল। তাঁর জন্য দৈনিক এক দিরহাম ভাতা নির্ধারণ করা হয়, যাতে তিনি কারো মুখাপেক্ষী না থাকেন। অষ্টম হিজরীর ২৪ শে যীকাআদা হযরত নবী করীম (সা) সাহাবায়ে কিরামসহ মদীনা মুনাওয়ারায় প্রবেশ করেন। হযরত আত্তাব ইব্‌ন উসায়দ সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যিনি ইসলামে আমীর হয়ে হজ্জ করেন। এ বছর মুসলমানরাও হজ্জ আদায় করেন এবং মুশরিকরাও তাদের নিয়মে হজ্জ আদায় করে। মুশরিকরাও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি তোলেনি, মুসলমানরাও মুশরিকদের বিরুদ্ধে কিছু বলেননি। এই মেলামেশার ফলে মুশরিকরা মুসলমানদের সংকার্যাবলী ও উত্তম আখলাক পর্যবেক্ষণ করার যথেষ্ট সুযোগ পেলো। অজ্ঞাতেই তাদের মুখে মুখে মুসলমানদের প্রশংসাবাণী উচ্চারিত হতে লাগলো।

অষ্টম হিজরীর আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হযরত নবী (সা) মক্কা থেকে মদীনা রওয়ানা করেন। বিরুদ্ধপক্ষীয় অন্যতম সরদার উরওয়া ইব্ন মাসউদ তায়িফ অবরোধকালে তায়িফে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি বাইরে কোথাও গিয়েছিলেন এবং অবরোধ তুলে নেয়ার পর তায়িফে এসেছিলেন। তিনি হযরত নবী করীম (সা)-এর মক্কা থেকে মদীনা রওয়ানা করার খবর শুনে তাঁর পিছনে যাত্রা করেন এবং হযরত নবী করীম (সা)-এর মদীনায় প্রবেশ করার পূর্বেই তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর তিনি হযরত নবী করীম (সা)-এর নিকট আর্জি পেশ করেন যে, ফিরে গিয়ে আমার কওমের মধ্যে ইসলাম প্রচার করার জন্য আমাকে অনুমতি দিন।' তিনি বলেন, 'তোমার কওমের অহংকার হচ্ছে, মুসলমানরা তাদের পরাজিত করতে পারবে না। তুমি তাদের ইসলামের দাওয়াত দিলে তারা তোমাকে মেরে ফেলবে। হযরত উরওয়া (রা) বললেন, আমার কওম আমাকে খুব ভালবাসে এবং আমার কথা মেনে চলে। আমি আশা করি, তারা কখনো আমার বিরুদ্ধাচরণ করবে না। তিনি পীড়াপীড়ি করায় হযরত নবী করীম (সা) তাঁকে অনুমতি প্রদান করলেন। তিনি তায়িফ আগমন করলেন এবং একটি উঁচুস্থানে দাঁড়িয়ে তায়িফবাসীকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া শুরু করেন। তায়িফবাসী এ কথা শুনেই তাঁর উপর তীর বর্ষণ শুরু করলো। তিনি শাহাদত বরণ করলেন। মৃত্যুকালে তাঁর পরিবার-পরিজন জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি তোমার রক্ত সম্পর্কে কি বলছো ? আমরা তাঁর প্রতিশোধ নেব কিনা, তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অসীম রহমতে আমাকে শাহাদতের মর্যাদা দান করেছেন। এখন আমার একমাত্র বাসনা হচ্ছে, তোমরা আমাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সেই আসহাবদের পাশে দাফন করবে, যাঁরা এখানে অবরোধকালে শহীদ হয়ে সমাধিস্থ হয়েছেন। হযরত নবী করীম (সা) উরওয়া ইব্ন মাস্উদ (রা)-এর শাহাদতের কাহিনী শ্রবণ করে বললেন, সূরা ইয়াসীনে বর্ণিত ইসলাম প্রচারক ব্যক্তি তাঁর কওমের মধ্যে যেমনটি ছিল, উরওয়ার অবস্থাও তাঁর কওমের মধ্যে ঠিক তদ্রূপ।

এই বছরই হযরত নবী করীম (সা)-এর সাহেবযাদা ইবরাহীম ভূমিষ্ঠ হন। সাহেবযাদা ইবরাহীম হযরত মারিয়্যা কিবতিয়্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এই বছরই তাঁর সাহেবযাদী হযরত যয়নাব (রা) ইনতিকাল করেন। এই বছরেরই শেষ দিকে তাঁর জন্য কাঠের মিম্বার তৈরি করা হয়। এই মিম্বারে বসে তিনি খুতবা দান করতেন। এই বছরই বাহরায়নের শাসনকর্তা মুনযির ইব্ন সারি– যিনি নবী করীম (সা)-এর পত্র দেখেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন—তাঁর লিখিত নির্দেশক্রমে ইয়াহূদী ও মাজুসীদের নিকট থেকে জিযিয়া কর আদায় করা শুরু করেন।

হিজরতের নবম বছর

মক্কা বিজয় ও হুনায়ন যুদ্ধের পর হযরত নবী করীম (সা) মদীনা মুনাওয়ারায় আগমন করলেন। তখন আরবদেশের মুশরিক লোকেরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে আরম্ভ করলো। নবম হিজরী শুরু হতেই আরব দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী তাদের প্রতিনিধি প্রেরণ করে হযরত নবী করীম (সা)-এর আনুগত্য স্বীকার করলো এবং ইসলাম গ্রহণ করলো। এ বছর অত্যধিক প্রতিনিধি দলের আগমন ঘটে এবং আরব জাতি-গোষ্ঠী সমানে মুসলমান হতে থাকে। এজন্য নবম হিজরী আমূল উফুদ বা প্রতিনিধির বছর নামে খ্যাত। তখন জাগতিক দিক থেকেও হযরত নবী (সা) আরবের শাহানশাহের মর্যাদা লাভ করেছিলেন। মুসলমানদের উপর যাকাত ফরয ছিল। যেসব গোত্র তখনো মুসলমান হয়নি,

তাদের নিকট থেকে সামান্য পরিমাণ অর্থ জিযিয়া হিসাবে আদায় করা হতো। এই যাকাত বা জিযিয়াই ছিল সেই খারাজ বা কর, যা হযরত নবী করীম (সা)-এর সাম্রাজ্যের প্রজাসাধারণ থেকে আদায় করা হতো। যাকাত আদায়ের জন্য তিনি সর্বত্র সরকারী কর্মচারী নিযুক্ত করে পাঠান। প্রথম প্রথম যাকাত আদায় নিয়ে কিছুটা জটিলতাও দেখা দেয়। কোন কোন কর্মচারীও শহীদ হন। কোন কোন গোত্রকে এই ব্যবস্থা কায়েম রাখার জন্য তিরস্কারও করা হয় এবং অবশেষে এই ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রনীতি সুষ্ঠুরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

তাবুক যুদ্ধ

মূতা যুদ্ধের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য গাস্সানী বাদশাহ এক বিরাট বাহিনী সংগ্রহ করে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল। হিরাক্লিয়াস চল্লিশ হাজার বাহাদুর সৈন্য গাস্সানী বাদশাহর সাহায্যে প্রেরণ করলেন এবং তিনি নিজেরও এক বিশাল বাহিনী নিয়ে পশ্চাতে রওয়ানা হওয়ার সংকল্প করলেন। পূর্বোক্ত খ্রিস্টান ধর্মযাজক আবূ আমির মক্কা থেকে রোম সম্রাটের নিকট চলে গিয়েছিল। মদীনা আক্রমণের জন্য রোম সম্রাটকে উদ্বুদ্ধ করাই ছিল তার কাজ ও লক্ষ্য। এ দিকে সে মদীনার মুনাফিকদের সাথেও বরাবর গোপন যোগাযোগ অব্যাহত রাখলো। তারই পরামর্শক্রমে মুনাফিকরা মসজিদে যিরার নির্মাণ করা শুরু করেছিল। মোটকথা, সিরীয় সীমান্তে খ্রিস্টান বাহিনীর সমাবেশ ও রোম সম্রাটের মদীনা আক্রমণের খবর অনবরত মদীনায় পৌঁছা শুরু হলো। হযরত নবী করীম (সা) এই খ্রিস্টানদের আক্রমণকে সিরিয়া সীমান্তেই বাধা দেয়া প্রয়োজন মনে করলেন। কেননা, আরব দেশের অভ্যন্তরে রোমক বাহিনী ঢুকে পড়লে গোটা আরবদেশেই নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি হওয়ার প্রবল আশংকা ছিল। তাছাড়া সীমান্তে এত বিরাট বাহিনীর সমাবেশ এমন কোন ব্যাপার ছিল না যে, নবী করীম (সা) তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে নীরব থাকতে পারতেন। তিনি সাধারণভাবে সমস্ত গোত্র-গোষ্ঠীকে জানিয়ে দিলেন যে, হিরাক্লিয়াস বাহিনীর মুকাবিলার জন্য সবাইকে এক জায়গায় সমবেত হতে হবে। মুসলমানরা চতুর্দিক থেকে এসে মদীনা মুনাওয়ারায় একত্রিত হতে লাগলো। মুনাফিকদের দল মদীনায় উপস্থিত ছিল। তারা মুসলমানদের সর্বদা বিভ্রান্ত ও ইসলামকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য তৎপর ছিল।

ইতিপূর্বে হযরত নবী করীম (সা) যখনই কোন দিকে সৈন্য পরিচালনার সংকল্প করতেন, পূর্বাহ্নে তিনি তা কাউকে অবহিত করতেন না, যাতে মুনাফিকরা আপত্তি করা এবং মুসলমানদের নিরুৎসাহিত করার সুযোগ পায়। যথাসময়ে মুসলমানরা ঠিকই জানতে পারতো তারা কোথায় যাচ্ছে। এবার যেহেতু বিরাট বাহিনী সংগ্রহ করতে হবে এবং তার উপায়-উপকরণও যোগাড় করা দুরূহ ব্যাপার, তাই তিনি ঘোষণা করে দিলেন যে, হিরাক্লিয়াস বাহিনীর মুকাবিলার জন্য সিরিয়া সীমান্তে মুসলমানদের যেতে হবে। গত বছর যেহেতু দুর্ভিক্ষ ছিল, তাই লোকদের আর্থিক অবস্থাও ভাল ছিল না। এ বছর ফসল ও শস্যাদি ভাল হয়েছে এবং ফসল কাটার সময়ও আগত। তাই লোকেরা তাদের শস্যক্ষেত্রে রেখে যাওয়াটা স্বভাবতই একটু অপসন্দ করলো। হিরাক্লিয়াস ও তাঁর পারিষদবর্গ তাদের এই আক্রমণ-প্রস্তুতি পর্বে মদীনার মুনাফিকদেরকে পূর্বেই তাদের দোসর বানিয়ে নিয়েছিল। মদীনার মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রমূলক বৈঠকাদি মুওয়ায়লিম নামক ইয়াহূদীর ঘরে প্রত্যহ অনুষ্ঠিত হতো। বারো জন মুনাফিক মিলে তাদের জন্য একটি পৃথক মসজিদ তৈরি করলো। উদ্দেশ্য ছিল : এই মসজিদে ষড়যন্ত্রমূলক বৈঠকাদি এবং ইসলাম

বিরোধী যাবতীয় সলা-পরামর্শ হবে। আর এই মসজিদের মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য ও বিভেদ সৃষ্টির উপকরণ তৈরি করা হবে। এই মুনাফিকরা যখন দেখলো, মুসলমানরা যুদ্ধযাত্রার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত, তখন নিরুৎসাহমূলক কথাবার্তা আরম্ভ করলো এবং গ্রীষ্মকালের এই দীর্ঘ সফরের কষ্ট-ক্লেশের কথা লোকদের শোনাতে লাগল। কেননা, তাদের উদ্দেশ্য ছিল হিরাক্লিয়াস বাহিনী দ্বারা মদীনা আক্রমণ করানো। মুসলমানরা সিরিয়া সীমান্তে গিয়ে পূর্বাহ্নেই হামলা করে খ্রিস্টান বাহিনীর সয়লাব আরবদেশে প্রবেশ করা প্রতিরোধ করুক মুনাফিকরা তা চাইত না।

হযরত নবী করীম (সা) মদীনায় সমস্ত সাহাবাকে প্রস্তুত হতে এবং মুজাহিদ বাহিনীর সাথে শরীক হতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। একই সাথে পথের সম্বল সওয়ারী। অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের অর্থের খুব প্রয়োজন ছিল। তাই চাঁদার জন্যও সাধারণ আহবান রেখেছিলেন। মুনাফিকরা লোকদের বিভ্রান্ত ও মুসলমানদের জন্য সংকট সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে কোন কার্পণ্য করেনি। হযরত উসমান গনী (রা) তাঁর বাণিজ্যিক মালামাল সিরিয়ার দিকে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি সেগুলো ইসলামী লশকরের সরঞ্জাম তৈরীর জন্য চাঁদা হিসাবে দান করলেন। এর পরিমাণ ছিল—নয়শত উট, যুদ্ধের সরঞ্জামসহ একশত ঘোড়া ও এক হাজার স্বর্ণ দীনার। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তাঁর গৃহের সমস্ত মাল আসবাব এনে চাঁদা হিসাবে দান করলেন এবং বললেন, পরিবার-পরিজনকে আল্লাহ্‌র কাছে সোপর্দ করেছি। হযরত উমর ফারূক (রা) তাঁর সমস্ত সম্পদের অর্ধেক আল্লাহ্‌র রাস্তায় পেশ করলেন আর অবশিষ্ট অর্ধেক পরিবার-পরিজনের জন্য রাখলেন। যারা খুব গরীব ছিলেন এবং মেহনত মযদূরী করে দিন গুযরান করতেন, তাঁরাও খুব সাহসিকতার সাথে সাধ্য অনুযায়ী যা পারলেন দান করলেন। মুনাফিকরা এ চাঁদার মধ্যেও অংশগ্রহণ করল না। ত্রিশ হাজার সৈন্য মদীনায় সমবেত হলো। ফৌজী সরঞ্জামের মধ্যে কেবল এতটুকুই যোগাড় হলো যে, প্রত্যেক সৈন্য তার জুতা বানাতে পারলো। নবী করীম (সা) নির্দেশ দিয়েছিলেন, তোমরা প্রত্যেকে জুতা বানিয়ে নাও। কেননা, পায়ে জুতা পরা থাকলে মানুষ সওয়ার বা আরোহী বিবেচিত হয়।

ইসলামী লশকরের যুদ্ধযাত্রা

মোটকথা, নবম হিজরীর রজব মাসে হযরত নবী করীম (সা) ত্রিশ হাজার লশকর নিয়ে মদীনা থেকে রওয়ানা করেন। মদীনা থেকে এক ঘন্টার দূরত্বে অবস্থিত বী-রাওয়াঁ নামক বস্তিতে পৌছার পর মুনাফিকরা এসে তাঁকে বললো, 'আমরা একটি মসজিদ বানিয়েছি। আমাদের বাসনা যে, আপনি সেখানে গিয়ে সালাত আদায় করুন। তাহলে এ মসজিদটিও ভক্তিযোগ্য বিবেচিত হবে। তিনি বললেন, আমি এক্ষণে যুদ্ধযাত্রায় ব্যস্ত, ফেরার পথে দেখা যাবে। তিনি মদীনা থেকে বের হয়ে ছানিয়াতুল বিদা' নামক পাহাড়ের উপর ছাউনি স্থাপন করলেন এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামা আনসারী (রা)-কে মদীনার শাসক নিযুক্ত করলেন। মুনাফিকদের প্রধান সরদার আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায়্যও তার দলবলসহ শহর থেকে বের হয়ে ছানিয়াতুল বিদা' পাহাড়ের পাদদেশে তাঁবু গাড়লো। এতে বোঝা যাচ্ছিল যে, সেও যুদ্ধে যেতে প্রস্তুত। কিন্তু পরে জানা গেলো যে, তার উদ্দেশ্য ছিল লোকদেরকে হযরত নবী করীম (সা)-এর সাথে যেতে বাধা দেয়া। তিনি যখন লশকরসহ সামনে অগ্রসর হলেন, তখন মুনাফিকরা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায়্যর সাথে মদীনায় ফিরে এলো। অবশ্য কোন কোন মুনাফিক গোয়েন্দাবৃত্তি চালিয়ে খ্রিস্টানদের সাহায্য করার জন্য ইসলামী লশকরে মিশে গেলো।

হযরত নবী করীম (সা) হযরত আলী (রা)-কে তাঁর পরিবার-পরিজনের নিরাপত্তার জন্য মদীনায় রেখে গিয়েছিলেন। মদীনায় মুনাফিকরা হযরত আলী (রা) সম্পর্কে বলাবলি করতে লাগলো যে, হযরত নবী করীম (সা) হযরত আলী (রা)-কে পরোয়া করেন না। তিনি তাকে অপসন্দ করেন, তাই তাঁকে রেখে গেছেন। হযরত আলী (রা) এ কথা শুনে সহ্য করতে পারলেন না। সশস্ত্র হয়ে মদীনা থেকে চলে গেলেন এবং মদীনা থেকে ক্রোশখানেক দূরে অবস্থিত মাজরাফ নামক স্থানে হযরত নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন যে, মুনাফিকরা আমার সম্পর্কে এরূপ কথা বলছে, তাই আমি আপনার নিকট চলে এসেছি। তিনি বললেন, তারা মিথ্যা বলছে। আমি আমার পরিবার-পরিজনের নিরাপত্তার জন্য তোমাকে মদীনায় রেখে এসেছিলাম। যাও, তুমি মদীনায় চলে যাও। আর তাঁর মনোসন্তুষ্টির জন্য বললেন, তুমি আমার সাথে ঠিক তদ্রূপ, যেমনটি হারূন ছিলেন মূসার সাথে। কিন্তু তফাৎ এতটুকু যে, আমার পর কেউ নবী হবে না। হযরত আলী (রা) সেখান থেকেই পুনরায় মদীনায় ফিরে এলেন। অলসতা বা দুর্বলতার কারণে যারা হযরত নবী করীম (সা)-এর সাথে রওয়ানা হতে পারেননি, তারা তাঁর রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর মদীনা থেকে রওয়ানা হলেন এবং পথিমধ্যে মনযিল ও বিরতিস্থানগুলোতে ইসলামী লশকরে যোগ দিলেন। যেসব মুনাফিক মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার জন্য ইসলামী লশকরের মধ্যে মিশেছিল, তারা রাস্তার বিভিন্ন মনযিল থেকে কেটে পড়তে লাগলো। কিন্তু তাদের এই অযৌক্তিক কাণ্ড দেখে মুসলমানগণ মোটেও প্রভাবিত হননি। হযরত নবী করীম (সা) কারো কার্যকলাপে কোনরূপ আপত্তি তোলেননি এবং পথিমধ্যে যারা কেটে পড়লো, তাদেরও কোন পরোয়া করলেন না। যাত্রাপথে ছামূদ জাতির ধ্বংসপ্রাপ্ত বস্তি নজরে পড়লো। এই অঞ্চলের নাম ছিল হিজর। ইসলামী লশকর এই এলাকায় প্রবেশ করার পর হযরত নবী করীম (সা) বললেন, তোমরা এ স্থানটি ইসতিগফার পড়তে পড়তে দ্রুত অতিক্রম করো আর এখানকার কূপের পানিও পান করো না। এই হিজর অঞ্চলের সীমানার মধ্যেই একটি রাত অবস্থান করতে হলো। হযরত নবী করীম (সা) নির্দেশ দিলেন, কোন ব্যক্তি একাকী শিবির থেকে বের হবে না। তিনি দুর্গত অঞ্চলের ধ্বংসস্তূপের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় চাদর দ্বারা মুখ ঢেকে নিলেন, সওয়ারীকে মেহমীয লাগিয়ে দাবড়ে দিলেন। তিনি বললেন, তোমরা যখন কোন জালিম ও পাপীদের বসতি অতিক্রম করবে, তখন ইসতিগ্ফার পড়তে পড়তে অতিক্রম করবে। মনে করবে, হয়তো আমাদের উপরও মুসীবত নাযিল হতে পারে।

তাবুক

ইসলামী লশকর সীমান্তের তাবূক প্রস্রবণের নিকট অবস্থান নিলেন। হিরাক্লিয়াস হযরত নবী করীম (সা)-কে সত্য নবী বলে বিশ্বাস করতেন। তিনি যখন তাঁর আগমন সংবাদ পেলেন, তখন ভয়ে পিছু হটে যাওয়া শ্রেয় মনে করলেন। খ্রিস্টান বাহিনী ও গাসসানী বাদশাহ ইসলামী বাহিনীর খবর পেয়ে এদিক-সেদিক চলে গেলো এবং ময়দান খালি পড়ে রইল। তাবূক মদীনা থেকে চৌদ্দ পনেরো মনযিল দূরে অবস্থিত। এখানে হযরত নবী করীম (সা) প্রায় বিশ দিন অবস্থান করলেন। এই সময়ে আতিয়্যার শাসনকর্তা বুহায়না ইব্ন রাবিআ আনুগত্য প্রকাশের জন্য তাঁর নিকট উপস্থিত হল। তিনি জিযিয়া আদায় করার শর্তে তার সাথে সন্ধি করলেন। আতিয়্যার শাসনকর্তা জিযিয়ার অর্থ তখনই আদায় করে দিলেন। এরপর জারবা নামক স্থানে লোকেরা এলো। তারাও জিযিয়া আদায় করার ওয়াদা করলো। হযরত নবী করীম (সা) তাদের

সন্ধিপত্র লিখে দিলেন। তারপর আওরাখ নামক স্থানের অধিবাসীরা এলো। তারাও জিযিয়া আদায় করার চুক্তিতে সন্ধিপত্র লাভ করলো।

তাবুকের অদূরে ছিল দুমাতুল জান্দাল এলাকা। সেখানকার শাসক আকীদর ইব্‌ন আবদিল মালিক ছিল বনূ কিন্দা গোত্রের লোক। সে ছিল খ্রিস্টধর্মাবলম্বী। সে নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হলো না; ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করলো। তিনি খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-কে একদল সৈন্যসহ প্রেরণ করলেন এবং বললেন, আকীদরকে তুমি নীল গাভী শিকাররত দেখতে পাবে। তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসবে। হযরত খালিদ (রা) তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে রওয়ানা করলেন। রাতভর সফর করার পর প্রাতকালে আকীদরে দুর্গের নিকট গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে আকীদর আশ্চর্য একটি ঘটনার সম্মুখীন হলো। গ্রীষ্মকাল। জ্যোস্না রাত। আকীদর তার স্ত্রীসহ মহলের ছাদে আরাম করছিল। একটি নীল গাভী জঙ্গলের দিক থেকে এসে মহলের দরজা তার শিং দ্বারা খোঁচাতে লাগলো। আকীদরের স্ত্রী আশ্চর্যান্বিত হয়ে তার স্বামীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। আকীদর তৎক্ষণাৎ তার ঘোড়া প্রস্তুত করিয়ে তার ভাই হাস্‌সানকে সঙ্গে নিয়ে ঐ নীল গাভী শিকার করার জন্য বের হলো। সে নীল গাভীর পেছনে পেছনে কিছুদূর যেতেই হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) তার সঙ্গীদের নিয়ে সেখানে পৌঁছে গেলেন এবং তাকে ঘিরে ফেললেন। আকীদর ও তার ভাই মুকাবিলা করলো। কিন্তু আকীদর জীবিত গ্রেফতার হলো এবং তার ভাই নিহত হলো। হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) আকীদরের রেশমী সুন্দর কাবা খুলে তৎক্ষণাৎ সেটি ঘোড় সওয়ারের মাধ্যমে নবী করীম (সা)-এর নিকট প্রেরণ করলেন এবং তিনি নিজে তাকে (আকীদরকে) তাঁর কাছে নিয়ে গেলেন। হযরত নবী (সা) তার প্রাণ রক্ষা করলেন। সে আনুগত্য ও জিযিয়া প্রদান করার অঙ্গীকার করলো। স্বীয় দুর্গে ফিরে এসে দু'হাজার উট, আটশ' ঘোড়া, চারশ' বর্শা নবী করীম (সা)-এর নিকট উপঢৌকন পাঠালেন এবং সন্ধিপত্র লিখিয়ে নিরাপদ হলো।

মসজিদে যিরারে অগ্নি-সংযোগ

সিরীয় সীমান্তবর্তী শাসক ও সরদারদের নিকট থেকে আনুগত্য, শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার অঙ্গীকার নিয়ে হযরত রাসূলে করীম (সা) সাহাবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শ করলেন। সবাই মত প্রকাশ করলেন যে, এখন আর এখানে অবস্থান ও অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। হিরাক্লিয়াস ও তাঁর সেনাবাহিনী ভীত হয়ে পড়েছে। তাদের সাহস থাকলে মুকাবিলা করতে আসতো। শেষে হযরত (সা) তাবূক থেকে মদীনা রওয়ানা করলেন। যখন মদীনার নিকটবর্তী পৌঁছলেন এবং মদীনা পৌঁছতে মাত্র এক ঘন্টার পথ বাকী রইল তখন তিনি মালিক ইব্‌ন ওয়াখ্‌শাম সালিমী ও মাইন ইব্‌ন আদী আজলীকে মুনাফিকদের তৈরী মসজিদে অগ্নি-সংযোগ ও ভূমিসাৎ করার জন্য নির্দেশ দিলেন। কেননা, ঐ মসজিদ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেছিলেন :

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا.....

এবং যারা মসজিদ নির্মাণ করেছে ক্ষতিসাধন, কুফরী ও মু'মিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং ইতিপূর্বে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যে ব্যক্তি সংগ্রাম করেছে তার গোপন ঘাঁটি স্বরূপ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে তারা অবশ্যই শপথ করবে। 'আমরা সদুদ্দেশ্যেই তা করেছি' ; আল্লাহ্ সাক্ষী, তারা তো মিথ্যাবাদী। (৯ : ১০৭)

আর এভাবে মুনাফিকদের ধোঁকা সম্পর্কে নবী করীম (সা) অবগত হয়েছিলেন। সুতরাং মসজিদে যিরারের নাম-নিশানা মিটিয়ে দেয়া হলো। হযরত নবী করীম (সা) নবম হিজরীর রমযান মাসে মদীনায় প্রবেশ করলেন। এই সফরে অর্থাৎ গাযওয়া তাবূকে দু'টি মাস অতিবাহিত হয়।

হযরত কা'ব ইব্‌ন মালিক, মারারা ইব্‌ন রবী'ঈ, হিলাল ইব্‌ন উমাইয়া—এই তিনজন সাহাবী ছিলেন নেক সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু নিছক আলস্যের কারণে আজ-কাল করে সফরের সামান যোগাড় করেন নি। এমনকি ইসলামী লশকর মদীনা থেকে রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর অলসতার দরুন রওয়ানা হতে পারলেন না। হযরত নবী করীম (সা) তাবূক থেকে মদীনা ফিরে এলে ঐ তিনজন সাহাবী তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে অকপটে নিজেদের ভুল স্বীকার করলেন। তাঁদের সম্পর্কে নির্দেশ জারি হলো যে, কেউ যেনো তাঁদের সাথে কথাবার্তা না বলে। পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত তাঁরা অনবরত তাওবা-ইস্‌তিগফার করতে থাকলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে হুকুম নাযিল হলো যে তাঁদের তাওবা কবূল হয়েছে। যে পর্যন্ত তাঁদের তাওবা কবূল না হয়েছে, তাবত তাঁদের পরিবার-পরিজনও তাঁদের কোন কথার জবাব দিতেন না। তাঁদের সালামের জবাবও দিতেন না। জীবন তাঁদের জন্য অসহ্য ও দুর্বিষহ ছিল। এই ঘটনা যখন প্রসিদ্ধি পেতে পেতে গাস্‌সানী বাদশাহর কান পর্যন্ত পৌঁছলো, তখন তিনি তার দূত মারফত কা'ব ইব্‌ন মালিকের নিকট এই মর্মে একটি পত্র লিখে পাঠান যে, আপনি একজন সরদার ও শরীফ লোক। আপনার সাথে মুহাম্মদ (সা) খুব খারাপ ব্যবহার করেছেন। আপনি আমার নিকট চলে আসুন। আমি আপনাকে উপযুক্ত সম্মান ও মর্যাদা দান করবো। হযরত কা'ব ইব্‌ন মালিকের নিকট যখন এই পত্র পৌঁছলো, তখন তিনি এই পত্র পাঠ করে চুলোয় নিক্ষেপ করলেন এবং দূতকে বললেন, যাও, এটাই হচ্ছে তার জবাব। হযরত কা'ব ইব্‌ন মালিকের তাওবা যখন কবুল হলো এবং হযরত নবী করীম (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম তাঁকে মুবারকবাদ দিলেন, তখন তিনি তাঁর সমস্ত সম্পদ আল্লাহ্‌র নামে দান করে দিলেন।

তায়িফবাসীদের ইসলাম গ্রহণ

তায়িফবাসী যখন নবী করীম (সা)-এর গাযওয়া তাবূক থেকে ফিরে আসার খবর পেলো, তখন তারা এই ব্যাপারে নিশ্চিত হলো যে, মুসলমানদের সাথে লড়াই করার ক্ষমতা আমাদের নেই। তায়িফে শাহাদত প্রাপ্ত হযরত উরওয়া ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর পুত্র আবুল মালীহ (রা) ও তায়িফের অন্য কয়েকজন লোক মদীনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাবূক থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর আব্‌দ ইয়ালীল ইব্‌ন আমর তায়িফবাসীদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিস্বরূপ হযরত নবী করীম (সা)-এর নিকট আগমন করলেন। তিনি তাদের জন্য মসজিদে একটি তাঁবু স্থাপন করলেন। আব্‌দ ইয়ালীল ও তার সঙ্গীরা ইসলাম কবূল করলেন এবং তাদের কওমের পক্ষ থেকে হযরত রাসূলে করীম (সা)-এর পবিত্র হাতে বায়'আত গ্রহণ করলেন। তিনি উসমান ইব্‌ন আবিল 'আস (রা)-কে তাদের শাসনকর্তা করে এবং মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা)-কে লাত প্রতিমা ও মন্দির ভাঙ্গার জন্য প্রেরণ করলেন। তাঁরা তায়িফে পৌঁছে লাত প্রতিমা ও মন্দির ভেঙ্গে ফেললেন। প্রতিমা গৃহের কর থেকে যে সম্পদ আমদানী হলো, তা দ্বারা প্রথমে হযরত উরওয়া ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর ঋণ পরিশোধ করা হলো এবং অবশিষ্টাংশ মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করা হলো। হযরত নবী করীম (সা) তাবূক থেকে মদীনা প্রত্যাবর্তন করার সাথে

সাথে পুনরায় প্রতিনিধিদল আগমনের সিলসিলা শুরু হলো। অনবরত প্রতিনিধিদল আসতো, ইসলাম গ্রহণ করতো, স্ব স্ব সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে বায়'আত গ্রহণ করতো এবং ইসলাম শিক্ষা দানের জন্য সঙ্গে করে মুবাল্লিগ নিয়ে যেতো। হযরত নবী করীম (সা) প্রতিটি প্রতিনিধিদলকে বিদায় দেয়ার সময় উপঢৌকন ও পারিতোষিকও অবশ্যই প্রদান করতেন। তাবূক থেকে প্রত্যাগমন করে তিনি হযরত আলী (রা)-কে একটি সেনাদলসহ তাঈ শহরে প্রেরণ করলেন। হযরত আলী (রা) তাঈ শহরের নিকটে পৌঁছে হামলা করলেন। আদী ইব্ন হাতিম পলায়ন করে সিরিয়া চলে গেলেন। হযরত আলী (রা) হাতিম তা'ঈর কন্যাকে বন্দী করে নিয়ে এলেন এবং তাদের মন্দির থেকে দু'টি তলোয়ার লুট করে নিয়ে এলেন। তলোয়ার দু'টি হারছ ইব্ন আবী উমর লটকিয়েছিল।

হাতিম তাঈর কন্যা হযরত নবী করীম (সা)-এর নিকট দয়া প্রার্থনা করলো। তিনি বললেন, আমি তোমাদের উপর দয়া করলাম অর্থাৎ তোমাকে মুক্ত করে দিলাম। কিন্তু তুমি যাওয়ার জন্য খুব তাড়াহুড়া করো না। কোন বিশ্বস্ত ও সম্মানিত লোক পেলে আমি তোমাকে তার সাথে তোমার দেশে পাঠিয়ে দেবো। ইতিমধ্যে সিরিয়া থেকে কয়েকজন লোক আসলো। তিনি তাদের সাথে ঐ কন্যাকে কিছু কাপড়-চোপড় ও পাথেয় দিয়ে বিদায় করলেন।

এই কন্যা যখন তার ভাই আদী ইব্ন হাতিমের নিকট পৌঁছলো, তখন আদী তার বোনকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তুমি ঐ ব্যক্তিকে (মুহাম্মদ (সা)) কিরূপ পেয়েছ ? সে বললো, তিনি সাক্ষাতের যোগ্য, অতি চরিত্রবান ও পরম দয়ালু। আদী একথা শুনেই উঠে দাঁড়ালেন এবং নিজ সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হয়ে হযরত নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি তাকে খুব সম্মান দিলেন এবং মসজিদে নববী থেকে নিজের সাথে ঘরে নিয়ে এসে বিছানায় বসালেন। একটি স্ত্রীলোক পথিমধ্যে হযরত নবী করীম (সা)-এর সাথে কিছু কথা বলতে চাইলো। তিনি তার কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ধৈর্যসহকারে দাঁড়িয়ে থাকলেন। আদী ইব্ন হাতিমকে হযরত নবী করীম (সা)-এর এই চরিত্র খুবই প্রভাবিত করলো। এরপর তিনি আদী ইব্ন হাতিমকে কিছু উপদেশ দিলেন। আদী ইব্ন হাতিম তার হাত বাড়িয়ে দিলেন, বায়'আত গ্রহণ করলেন এবং মুসলমান হয়ে নিজ সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেলেন।

আল্লাহ্র রাসূল (সা)-এর প্রথম প্রতিনিধি

তাবূক থেকে প্রত্যাগমন করার পর প্রতিনিধি দলগুলোর কাণ্ড এরূপ ছিল যে, হযরত নবী করীম (সা) মদীনা থেকে কোথাও যেতে পারতেন না। কেননা, আরব গোত্রগুলো অনবরত এসে এসে ইসলামে প্রবেশ করছিল। হজ্জের মওসুম এলে তিনি তাঁর স্থলে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে হজ্জের আমীর বানিয়ে রওয়ানা করে দিলেন এবং নিজের পক্ষ থেকে বিশটি উট কুরবানী করার জন্য তাঁর সাথে প্রেরণ করলেন। হযরত আবূ বকর (রা) কুরবানী করার জন্য নিজের পক্ষ থেকেও পাঁচটি উট দিলেন। তিনশ মুসলমানের কাফেলা রওয়ানা হলো। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর রওয়ানা হওয়ার পর সূরা বারাআতের চল্লিশটি আয়াত নাযিল হলো। এ আয়াতগুলোতে বলা হয়েছিল যে, এ বছরের পর মুশরিকরা মসজিদে হারামের নিকট যেতে পারবে না এবং উলঙ্গ হয়ে বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করতে পারবে না। আর যার সাথে রাসূলুল্লাহ (সা) কোন চুক্তি করেছেন, তা সেই সময় পর্যন্ত পূর্ণ করা হবে। হজ্জের সময় এই কথাগুলো ঘোষণা করা জরুরী ছিল।

হযরত নবী করীম (সা) হযরত আলী (রা)-কে এই আয়াতগুলো দিয়ে তাঁর উটনীর উপর সওয়ার করিয়ে রওয়ানা করে দিলেন এবং বলে দিলেন যে, হজ্জের পর কুরবানীর দিন দাঁড়িয়ে সবাইকে এই আয়াতগুলো শুনিয়ে দেবে। হযরত আলী (রা) রওয়ানা হলেন এবং দাওমাতুল হুলায়ফা নামক মনযিলে গিয়ে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর কাফেলার সাথে মিলিত হলেন। হযরত আবূ বকর (রা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আমীর হয়ে এসেছো, না মা'মূর (অধীন) হয়ে ? হযরত আলী (রা) জবাব দিলেন, আমি মা'মূর হয়ে এসেছি। আমীর আপনিই থাকবেন, আমাকে শুধু এই আয়াতগুলো শুনিয়ে দেয়ার জন্য আদেশ করা হয়েছে। সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে তাঁরা মক্কা পৌঁছলেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) আমীর হিসাবে হজ্জের রুকনগুলো আদায় করলেন। তারপর হযরত আলী (রা) সূরা বারাআতের আয়াতগুলো শুনিয়ে দিলেন।

এ বছর নবী করীম (সা)-এর কন্যা উম্মু কুলছুম ইনতিকাল করেন। এ বছরই হজ্জ ফরয হয়। এ বছরই হজ্জ মুসলমানদের পরিচালনাধীনে আসে। হযরত আবূ বকর (রা) লোকদেরকে আরকানে হজ্জের তা'লীম দেন। এই হজ্জের পর সকল মুশরিককে মাত্র চার মাসের সময় দেয়া হয় এবং ঘোষণা দেয়া হয় যে, চার মাসের পর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল মুশরিকদের বেলায় সম্পূর্ণ দায়িত্বমুক্ত। এই ঘোষণা শুনে মক্কায় যেসব লোক তখনো শিরকের উপর দৃঢ় ছিল, তারাও ইসলামে প্রবেশ করলো এবং সর্বদিক থেকে বিভিন্ন গোত্র দলে দলে এসে মুসলমান হতে লাগলো। কোন কোন ঐতিহাসিক লিখেন, এই বছরই তাবূক থেকে প্রত্যাগমন করে নবী করীম (সা) ইরানের বাদশাহ কিসরার কাছে পত্র প্রেরণ করেছিলেন, সপ্তম হিজরীর ঘটনাবলীতে যার উল্লেখ করা হয়েছে। এই বছরই মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায়্য মারা যায়।

বিদায় হজ্জ

দশম হিজরীর মুহাররম থেকে বছরের শেষ পর্যন্তই প্রতিনিধিদলের আগমন ও আরব গোত্রগুলোর ইসলাম গ্রহণের ধারা অব্যাহত রইল। রবীউস-সানীতে নবী করীমে (সা) হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-কে চারশ' সাহাবার সাথে নাজরান ও তার আশেপাশের লোকদের কাছে প্রেরণ করলেন এবং বলে দিলেন যে, লোকদেরকে তিনবার ইসলামের দাওয়াত দেবে এবং তারা যখন ইসলাম গ্রহণ করবে, তখন ইসলামের তা'লীম দেবে– লড়াই করবে না। হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) সেখানে পৌঁছার সাথে সাথে তারা সানন্দে ইসলাম গ্রহণ করলো। ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে বনূ হারিছ ইব্‌ন কা'বও শামিল ছিল। হযরত নবী করীম (সা) হযরত খালিদ (রা) ও অন্যান্য সাহাবাকে ডেকে পাঠালেন এবং আমর ইব্‌ন হুযায়মকে সেখানে ইসলাম শিক্ষাদানের জন্য প্রেরণ করলেন। দশম হিজরীর রমযান মাসে তিন সদস্য বিশিষ্ট গাস্‌সানী প্রতিনিধিদল এলো। তারা নবীর দরবারে হাযির হয়ে খুশীমনে ইসলাম কবূল করলো এবং আপন সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেলো। কিন্তু তাদের সম্প্রদায় ইসলাম কবূল করলো না। দশম হিজরীর শওয়াল মাসে সাত সদস্য বিশিষ্ট সালমান প্রতিনিধিদল আগমন করলো। প্রতিনিধিদলে তাদের সরদার হাবীব ইব্‌ন আমরও ছিলেন। এরাও মুসলমান হলো এবং দীনের জরুরী বিষয়গুলোর তা'লীম নিয়ে ফিরে গেলো। আরেক দিন হাবীব ইব্‌ন আমর হযরত নবী করীম (সা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, উৎকৃষ্টতম আমল কি ? তিনি বললেন, 'সময়মতো সালাত আদায় করা।' এই দিনগুলোতেই দশ সদস্য বিশিষ্ট আয্‌দের প্রতিনিধি দল আগমন করলো। এরাও সবাই ইসলাম গ্রহণ করলো এবং এদের তাবলীগে তামাম কবীলা ইসলাম

গ্রহণ করলো। আয্দ গোত্র ও জারশ গোত্রের মধ্যে এই ইসলাম গ্রহণ নিয়ে যুদ্ধ হলো। জার্শ্বাসী যুদ্ধে আগে তাদের দু'ব্যক্তিকে নবী করীম (সা)-এর অবস্থা জানার জন্য মদীনা প্রেরণ করেছিল। এরা দু'জন যখন নবী করীম (সা)-এর নিকট এলো, তখন তিনি তাদের বললেন যে, জারশবাসীর মধ্যে যুদ্ধ হয়েছে এবং জারশবাসী পরাজিত হয়েছে। এরা দু'জন যখন ফিরে গেলো এবং ঘটনা বর্ণনা করলো, তখন সমস্ত জারশ গোত্র মুসলমান হয়ে গেলো। এই বছরই নবী করীম (সা) হযরত আলী (রা)-কে ইয়ামন প্রেরণ করলেন সেখানকার লোকদেরকে মূর্তিপূজার অপকারিতা ও তাওহীদের উপকারিতা বোঝানোর জন্য অর্থাৎ ইসলাম প্রচারের জন্য। হযরত আলী (রা)-এর ইসলাম প্রচারের ফলে ইয়ামনের বিখ্যাত হামাদান গোত্রের সবাই মুসলমান হয়ে গেলো। এরপর ইয়ামনের সবগুলো গোত্র একের পর এক ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলো এবং তাদের প্রতিনিধিদলসমূহ মদীনা মুনাওয়ারায় এসে নবী করীম (সা)-এর সাথে মুলাকাত করলো। এই বছরই মুরাদ গোত্রের প্রতিনিধি দল কিন্দা রাজ্য থেকে আলাদা হয়ে মদীনা আগমন করলো এবং ইসলাম গ্রহণ করে ফিরে গেলো। এই বছরই কবীলা আবদ কায়সের প্রতিনিধিদল জারূদ ইব্ন আমরের নেতৃত্ব আগমন করলো। এরা খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী ছিল। সবাই মুসলমান হয়ে ফিরে গেলো এবং স্বীয় গোত্রের সবাইকে মুসলমান করলো।

মুসায়লামা কাযযাব

এ বছরই ইয়ামামা থেকে বনূ হানীফার প্রতিনিধি দল আগমন করলো। প্রতিনিধিদলে মুসায়লামা ইব্ন হাবীব কায্যাব, জুরজান ইব্ন আনহাম, তাল্ক ইব্ন আলী, সালমান ইব্ন হানযালা প্রমুখ অন্তর্ভুক্ত ছিল। এরা মদীনায় পৌঁছে ইসলাম গ্রহণ করলো। পনের দিন অবস্থান করে উবায়্যি ইব্ন কা'বের নিকট কুরআন মজীদ শিখতে থাকলো। এই প্রতিনিধি দলের অন্যান্য সবাই প্রায়ই হযরত নবী করীম (সা)-এর নিকট হাযির হতো, কিন্তু মুসায়লামা অনুমতি নিয়ে অবস্থানস্থলে আসবাবপত্র হিফাযত করার জন্য থাকতো। এই বছরই বনূ কিন্দা'র দশ বা ততোধিক সদস্যের প্রতিনিধিদল আগমন করলো। এই সময়ই কিনানার প্রতিনিধিদলের সাথে হাদরামাওতের প্রতিনিধিদলও আগমন করলো। এরা সবাই আনন্দচিত্তে ইসলাম গ্রহণ করলো। এই সময়ই ওয়ালিদ ইব্ন হুজর হযরত নবী করীম (সা)-এর দরবারে হাযির হয়ে মুসলমান হলো। হযরত নবী করীম (সা) তার ইসলাম গ্রহণের দরুন খুব আনন্দ প্রকাশ করলেন এবং মুআবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ানকে নির্দেশ দিলেন ওয়ায়িল ইব্ন হুজরকে নিয়ে গিয়ে অবস্থান করাতে। ওয়ায়িল ইব্ন হুজর ছিলেন আরোহী এবং হযরত মুআবিয়া (রা) ছিলেন পদাতিক। হযরত মুআবিয়া (রা) পথিমধ্যে বললেন, আপনি আপনার পাদুকা দু'টি আমাকে দিয়ে দিন। আমার পা দু'টি মাটির গরমে জ্বলে যাচ্ছে। ওয়ায়িল বললেন, আমি আমার পাদুকা দেবো না। কেননা, আমি তা পরিধান করেছি। হযরত মুআবিয়া (রা) বললেন, তবে আপনি আপনার সওয়ারীর পিছনে আমাকে বসিয়ে নিন। ওয়ায়িল জবাব দিলেন, তুমি বাদশাহ্র সাথে সওয়ারীর উপর বসতে পারবে না। হযরত মুআবিয়া (রা) বললেন, আমার পা দুটি তো জ্বলে যাচ্ছে। ওয়ায়িল বললেন, আমার উটনীর ছায়ায় চলাই তোমার জন্য যথেষ্ট। এই ওয়ায়িলই মুআবিয়া (রা)-এর খিলাফত কালে তাঁর নিকট প্রতিনিধি হয়ে গেলে তিনি তাকে খুব সম্মান করেছিলেন। এই বছরই মাহারিবের তিন সদস্যের এবং নাদ্হাজের পনের সদস্যের

প্রতিনিধিদল আগমন করলো। তারা কুরআন পাঠ শিখলো এবং ইসলামের বিধি-বিধান শিক্ষা করে নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে ফিরে গেলো।

মুবাহালা

এই বছরই নাজরানের খ্রিস্টানদের একটি প্রতিনিধি দল আগমন করলো। এই দলে সত্তরজন আরোহী, মতান্তরে চৌদ্দজন আরোহী ছিল। তাদের সরদার আবদুল মাসীহ্ ও তাদের প্রধান ধর্মযাজক আবূ হারিছাও ছিলেন। তারা মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে তর্ক-বিতর্ক শুরু করে দিলো। ইতিমধ্যে সূরা আলে-ইমরানের প্রথম আয়াত ও আয়াতে মুবাহালা নাযিল হলো। হযরত নবী করীম (সা) তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করতে বললে তারা অত্যন্ত অভদ্র আচরণ করলো। তিনি তাদের বললেন, ঈসা (আ) আল্লাহ্র নিকট ঠিক তেমনি ছিলেন, যেমনি ছিলেন আদম (আ)। আর আদম (আ) ছিলেন মাটি দ্বারা সৃষ্ট। খ্রিস্টানরা বললো : না, বরং ঈসা (আ) আল্লাহ্র পুত্র ছিলেন। তিনি বললেন : তোমরা যদি তোমাদের দাবীতে সত্যবাদী হও, তবে আমার সাথে ময়দানে চলো। আমার প্রিয় পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনও আমার সাথে থাকবে। উভয় পক্ষ পৃথক স্থানে বসে বলবে, যে মিথ্যাবাদী, তার উপর আল্লাহ্র আযাব নাযিল হোক। এ কথা শুনে তারা নীরব হয়ে গেলো। পরদিন সকালে হযরত নবী করীম (সা) হযরত আলী (রা), হযরত ফাতিমা (রা), হযরত হাসান (রা), হযরত হুসায়ন (রা)-কে সাথে নিয়ে ময়দানে হাযির হলেন এবং ঐ খ্রিস্টানদের বললেন যে, আমি যখন এই দু'আ করবো যে, আমাদের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী, তার উপর আল্লাহ্র আযাব নাযিল হোক, তখন তোমরা 'আমীন' বলবে। হযরত নবী (সা)-এর এই প্রস্তুতি দেখে খ্রিস্টানরা ভীত হয়ে বললো, আমরা মুবাহালা করবো না। হযরত নবী করীম (সা) বললেন, মুবাহালা না করলে ইসলাম কবূল করো এবং মুসলমান হয়ে যাও। তারা বললেন : আমরা জিযিয়া দেবো। নবী করীম (সা) বলেন : তারা যদি মুবাহালা করতো, তবে দুনিয়ায় কিয়ামত পর্যন্ত কোন খ্রিস্টান থাকতো না। যাওয়ার সময় খ্রিস্টানগণ তাদের জন্য একজন আমীন (তহসীলদার) নিযুক্ত করতে বললেন। তিনি হযরত আবূ উবায়দা ইব্নুল জার্রাহ (রা)-কে তাদের সাথে পাঠালেন। কিছুদিন পর নাজরানের সমস্ত খ্রিস্টান মুসলমান হয়ে গেল।

ইয়ামনের প্রায় সবগুলো গোত্র এবং ইয়ামনের বাদশাহ বাযান মুসলমান হয়েছিলেন। হযরত নবী করীম (সা) গোটা ইয়ামন দেশের শাসনভার বাযানকেই সোপর্দ করেছিলেন। এই বছরই বাযান ইনতিকাল করেন। হযরত নবী করীম (সা) বাযানের ইনতিকালের পর শাহ্র ইবন বাযান, 'আমির ইব্ন শাহর হামদানী (রা), আবূ মূসা আশআরী (রা), আলী ইব্ন উমাইয়া (রা), মুইয ইব্ন জাবাল (রা) প্রমুখকে ইয়ামন দেশের এক একটি অংশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন এবং হযরত আলী (রা)-কে অন্যান্য কয়েকজন সাহাবীসহ ইয়ামন প্রেরণ করেন। তিনি তাঁদেরকে এই মর্মে তাকীদ করলেন যে, যে পর্যন্ত কেউ মুকাবিলা শুরু না করবে, তোমরা অস্ত্র ধারণ করবে না। হযরত আলী (রা)-কে ইয়ামন দেশে থাকতে ও সাদাকা ওয়াসিল করার জন্য পাঠানো হয়েছিল। এই সব ঘটনার পর যূ-কাআদা মাস এলো। হযরত নবী করীম (সা) দশম হিজরীর যূ-কাআদা মাসে মদীনা মুনাওয়ারা থেকে বায়তুল্লাহ্র হজ্জ করার জন্য রওয়ানা হলেন। তাঁর সাথে মুহাজির, আনসার ও আরব নেতৃবৃন্দের একটি জামাআত এবং কুরবানীর একশ' উট ছিল। মক্কায় তিনি যুলহাজ্জ মাসের রোববার প্রবেশ

করলেন। হযরত আলী (রা) যিনি ইয়ামনে যাকাত ওয়াসিলের জন্য গিয়েছিলেন– মক্কায় তাঁর সাথে এসে মিলিত হলেন এবং হজ্জ আদায় করলেন।

বিদায় ভাষণ

হযরত নবী করীম (সা) এবার লোকদেরকে হজ্জের আহ্‌কাম শিক্ষা দেন এবং আরাফাতে একটি ভাষণ দান করেন। হাম্‌দ ও ছানার পর তিনি বলেন : জনমণ্ডলী! আমার কথা শ্রবণ করো। কেননা, আমি আগামী বছর কিংবা তারপর এই জায়গায় তোমাদের সাথে মিলিত হতে পারবো বলে মনে হয় না। জনমণ্ডলী ! আজকের এই দিন ও এই মাস যেমনি হারাম ও মর্যাদাপূর্ণ, তেমনি তোমাদের পরস্পরের জান-মালও তোমাদের পরস্পরের জন্য হারাম ও মর্যাদাপূর্ণ। অর্থাৎ মুসলমানের জান-মালের হিফাযত প্রত্যেক মুসলমানের করা উচিত। আমানতসমূহ তার মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেয়া উচিত। অন্যের উপর জুলুম করবে না, তাহলে তোমাদের উপরও জুলুম করা হবে না। সুদ হারাম। এই সরযমীনে শয়তানের পূজা করা হবে না। শয়তান এ ব্যাপারে নিরাশ হয়েছে। তবে ছোট ছোট বিষয়ে তার আনুগত্য করা হবে। সুতরাং শয়তানের আনুগত্য থেকে তোমরা দূরে থাকবে। হে লোকসকল ! তোমাদের উপর তোমাদের স্ত্রীদের অধিকার রয়েছে, যেমনিভাবে তোমাদের স্ত্রীদের উপর তোমাদের অধিকার রয়েছে। স্ত্রীদের সাথে সদাচরণ করবে। আমি তোমাদের জন্য দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি। একটি আল্লাহ্‌র কিতাব, অপরটি তাঁর নবীর সুন্নাত। যে পর্যন্ত তোমরা কিতাব ও সুন্নাতের উপর আমল করবে, পথভ্রষ্ট হবে না। মুসলমান একে অপরের ভাই। একজন মুসলমানের সম্পদ আরেকজন মুসলমানের বিনা অনুমতিতে ভোগ করা বৈধ নয়। তোমরা একে অন্যের উপর জুলুম করবে না। তারপর তিনি লোকদের জিজ্ঞেস করেন, আমি কি আল্লাহ্‌র বিধান তোমাদের কাছে পৌছে দিইনি ? সবাই সমবেতভাবে উত্তর দিলো, হাঁ, আপনি অবশ্যই আল্লাহ্‌র বিধান আমাদের কাছে পৌছে দিয়েছেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্ ! তুমি সাক্ষী থাক!

তিনি এই ভাষণে এমনিভাবে কথাগুলো বললেন যেমনিভাবে কেউ কারো থেকে বিদায় গ্রহণ করে কিংবা বিদায় দান করে। এজন্য এই হজ্জের নাম হুজ্জাতুল বিদা' বা 'বিদায় হজ্জ' নামে পরিচিত। তিনি এ বছর খুতবার মধ্যে বিশেষভাবে ইসলামী আহকাম প্রচার করেন। তাই এই হজ্জকে 'হুজ্জাতুল-বালাগ' নামেও নামকরণ করা হয়। এই ভাষণ শেষ হওয়ার পরই হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর মাতা এক পিয়ালা দুধ পাঠিয়ে দেন। তিনি তা পান করেন। এই হজ্জে লক্ষাধিক মুসলমানের সমাবেশ হয়। কারো কারো মতে, এক লাখ চব্বিশ হাজার সাহাবা এইবার তাঁর সাথে হজ্জ করেন। তিনি ঐদিন এও বলেন যে, ইতিপূর্বে সকল নবী যা কিছু বলেছেন, সবচেয়ে উত্তম বাণী হচ্ছে—

لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ·

(আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি এক ও একক। তাঁর কোন অংশীদার নেই। রাজত্ব তাঁরই। প্রশংসাও তাঁরই। তিনি সর্বশক্তিমান)।

আরাফাতের দিন নবী করীম (সা) মক্কায় থাকতেই

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ·

আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম (সূরা মায়িদা : ৩)।

উল্লিখিত আয়াত নাযিল হয়। এই আয়াত শ্রবণ করে অনেক সাহাবী খুশী হন। দীন-ইসলাম আজ পূর্ণাঙ্গ হয়েছে। কিন্তু আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর মতো রহস্যবিদ সাহাবা অশ্রুসজল নয়নে বললেন, এ আয়াত থেকে বিচ্ছেদের গন্ধ আসে। কেননা, দীন পূর্ণাঙ্গ হওয়ার পর নবীর প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেছে। হজ্জ সমাপন করে নবী করীম (সা) মদীনা রওয়ানা করেন।

হযরত আলী (রা)-কে সান্ত্বনা দান

হযরত আলী (রা) ইয়ামন থেকে আগমন করে হজ্জে শরীক হয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গীরা তাঁর সম্পর্কে হযরত নবী করীম (সা)-এর নিকট কিছু অভিযোগ করেছিল, যা ইয়ামনবাসীর কিছু ভুল বোঝাবুঝির দরুন সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি এই অভিযোগ শুনে গাদীরে খুম নামক স্থানে এক বক্তৃতা দিলেন এবং হযরত আলী (রা)-এর প্রশংসা করলেন। বক্তৃতায় তিনি বললেন, যে আমার বন্ধু, সে আলীর বন্ধু। যে আলীর শত্রু, সে আমার শত্রু। হযরত উমর (রা) তাঁর এই বক্তৃতার পর হযরত আলী (রা)-কে মুবারকবাদ দিলেন এবং বললেন, আজ থেকে আপনি আমার বিশিষ্ট বন্ধু। মদীনা মুনাওয়ারায় ফিরে আসার পর হযরত নবী করীম (সা)-এর পুত্র ইবরাহীম ইনতিকাল করেন।

নবী করীম (সা)-এর অসুস্থতা

হিজরতের একাদশতম বছর

একাদশতম হিজরীর মুহাররম মাসে হযরত নবী করীম (সা) জ্বরে আক্রান্ত হন এবং ক্রমে জ্বর বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাঁর অসুস্থতার খবর ছড়িয়ে পড়লে কোন কোন বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। মুসায়লামা, তুলায়হা, খুওয়ায়লিদ, আসওয়াদ, সাজাহ বিন্‌ত হারিছ পৃথক পৃথকভাবে নবুওয়াতের দাবী করলো। তারা মনে করলো যে, যেভাবে হযরত মুহাম্মদ (সা) কামিয়াব হয়েছেন, তেমনিভাবে তারাও কামিয়াব হবে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা হযরত নবী করীম (সা)-এর সত্যতার উপর আরেকটি সীল মেরে দিলেন। এদের সবাই ব্যর্থ, অপদস্থ ও পরাভূত হয়। এদের মধ্যে মুসায়লামা কায্‌যাব ইয়ামামায় এবং আসওয়াদ ইব্‌ন কা'ব আনাসী ইয়ামেনে খুব খ্যাতি লাভ করেছিল। হযরত নবী করীম (সা) পীড়িতাবস্থায় একদিন বাইরে বের হলেন। মাথাব্যথার কারণে তাঁর মাথায় একটি পট্টি বাঁধা ছিল। তিনি বললেন, আমি রাতে স্বপ্নে দেখেছি, আমার হাতের কবযীতে দু'টি সোনার কঙ্কন। আমি ঐ দু'টিকে অবাধ্য ভেবে ছুঁড়ে মেরেছি। এই স্বপ্নের আমি ব্যাখ্যা করেছি, এই কঙ্কন দুটিই ঐ দু'জন কাযযাব (মিথ্যাবাদী)। অর্থাৎ ইয়ামামাবাসী (মুসায়লামা কাযযাব) ও ইয়ামনবাসী (আসওয়াদ কাযযাব)।

আসওয়াদ কায্‌যাব নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায়ই ফিরোয নামক একজন সুপুরুষের হাতে নিহত হয়। আর মুসায়লামা কায্‌যাব হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফতকালে হযরত হামযা হন্তা ওয়াহ্‌শীর হাতে নিহত হয়। ওয়াহ্‌শী প্রায়ই বলতেন যে, আমি কাফির অবস্থায় একজন উৎকৃষ্ট মানুষকে এবং মুসলমান অবস্থায় একজন নিকৃষ্ট মানুষকে হত্যা করেছি।

রোগশয্যা থেকে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ

একাদশ হিজরীর সফর মাসের ২৬ তারিখ রোগ থেকে কিছুটা উপশম অনুভব করলেন। হযরত নবী করীম (সা) সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের সীমান্তসমূহের সংবাদাদি শ্রবণ করে মুসলমানদেরকে রোম যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে বললেন। কেননা, ইয়ামামা ও ইয়ামনের গোলযোগ-বিশৃঙ্খলা এবং আরবের খ্রিস্টানদের ষড়যন্ত্র -শত্রুতা রোমকদেরকে পুনরায় আরব দেশের প্রতি মনোযোগী করেছিল। তিনি পরদিন হযরত উসামা ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন হারিছা (রা)-কে প্রধান সেনাপতি করে বললেন, তুমি তোমার পিতার বধ্যভূমিতে এমনভাবে ছুটে যাবে যে, সেখানকার লোকেরা যেন তোমার আগমন-সংবাদ জানতে না পারে। ইনশাআল্লাহ্ তুমি বিজয় লাভ করবে। একাদশ হিজরীর সফর মাসের ২৮ তারিখ তাঁর রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেলো। ঐ রুগ্নাবস্থায়ই তিনি তাঁর নিজ হাতে উসামার (রা) ঝাণ্ডা ঠিক করে বাহিনী বিদায় করলেন এবং প্রবীণ ও জ্ঞানতাপস সাহাবাকে হযরত উসামা (রা)-এর সাথে গমন করার নির্দেশ দিলেন। হযরত আবূ বকর (রা), হযরত উসমান (রা), হযরত আলী (রা), হযরত আব্বাস (রা) সবাইকে উসামা ইব্‌ন যায়দের নেতৃত্বাধীন রওয়ানা করানো হলো। কিন্তু অসুস্থতার কারণে তিনি উসামার অনুমতিক্রমে হযরত হযরত আলী (রা) ও হযরত আব্বাস (রা)-কে শুশ্রূষার জন্য মদীনায় রেখে দিলেন। অন্যসব সাহাবায়ে কিরাম উসামার সাথে মদীনা থেকে রওয়ানা হলেন। হযরত উসামা (রা) মদীনা থেকে এক ক্রোশ পথ অতিক্রম করে জারাফ নামক স্থানে অবস্থান করলেন। সেখান থেকে হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা) উসামা (রা) থেকে অনুমতি নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গমনাগমন করতেন। উসামা (রা) লশকর নিয়ে জারাফে পড়ে রইলেন এবং হযরত নবী করীম (সা)-এর অসুস্থতা দেখে রওয়ানা করতে পারলেন না। হযরত নবী করীম (সা)-ও এ অবস্থায় তাঁকে রওয়ানা করার আদেশ দিলেন না। লশকরসহ তাঁকে জারাফে অবস্থান করতে অনুমতি দিলেন। উসামার নেতৃত্বের প্রশ্নে কারো কারো মধ্যে দ্বিধা-সংকোচ সৃষ্টি হলো। কেননা, উসামার পিতা যায়দ (রা) ছিলেন গোলাম। নবী করীম (সা) এই মন্তব্য শ্রবণ করে লোকদেরকে ডেকে বললেন, এর পিতা একজন সেনাপতি ছিল। সুতরাং এর সৈনাপত্যে আপত্তি কি? তারপর বললেন, যায়দ (রা) প্রথম যুগের মুসলমান। ইসলামে তার মর্যাদা অনেক উচ্চে। মোটকথা, আপত্তিকারীরা লজ্জিত হলো এবং সানন্দে তাঁর সৈনাপত্য মেনে নিলো।

রোগ বৃদ্ধি

রোগ দিন দিন বাড়তে লাগলো। হযরত নবী করীম (সা) তাঁর পবিত্রাত্মা স্ত্রীদের নিকট হযরত আয়িশা (রা)-এর কক্ষে অবস্থান করার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। সবাই সানন্দে অনুমতি প্রদান করলেন। তিনি হযরত আয়িশা (রা)-এর গৃহে গেলেন। তারপর বাইরে বের হয়ে তিনি মুসলিম সমাবেশে একটি বক্তৃতা দিলেন এবং বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌কে ভয় করার উপদেশ দিচ্ছি। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের হিদায়াত করুন। আমি তাঁকে তোমাদের জন্য রেখে যাচ্ছি। আর তোমাদেরকে তাঁর হাতে সোপর্দ করছি। আমি তোমাদেরকে জাহান্নাম সম্পর্কে সাবধান করছি এবং জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছি। আল্লাহ্‌র বান্দারা! তোমরা গর্ব ও অহংকার করবে না। জান্নাত তারাই পাবে, যারা অহংকার ও ফাসাদ করে না। আখিরাতের কল্যাণ মুত্তাকীদের জন্য। অহংকারীদের ঠিকানা জাহান্নাম। তারপর তিনি বললেন : আমাকে

আমার নিকট-আত্মীয় গোসল করাবে। এরপর বললেন : আমার লাশ আমার কবরের কাছে রেখে কিছুক্ষণের জন্য তোমরা দূরে সরে থাকবে, যাতে ফেরেশতারা আমার জানাযা পড়তে পারে। এরপর দলে দলে আমার জানাযা পড়বে। প্রথমে আমার খান্দানের পুরুষরা জানাযা পড়বে। তারপর তাদের স্ত্রীলোকরা। রোগের শেষাবস্থায় তিনদিন পর্যন্ত তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন।

হযরত আবূ বকর (রা)-কে ইমামতি করার নির্দেশ

হযরত নবী করীম (সা) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে তাঁর স্থলে মসজিদে নামাযের ইমামতি করার জন্য নিযুক্ত করলেন। আয়িশা (রা) বললেন, আমার পিতা এ দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে পারবেন না। কেননা, তিনি বেশী নরম-দিল। আপনি হযরত উমর (রা)-কে ইমাম নিযুক্ত করুন। তিনি বললেন : না, আবূ বকরই ইমামতি করবে। হযরত আবূ বকর (রা) মসজিদে নামায পড়াচ্ছিলেন। হযরত নবী করীম (সা) কিছুটা আরোগ্যবোধ করে মসজিদে গমন করলেন। নামায চলাকালে তিনি মসজিদে উপস্থিত হলে হযরত আবূ বকর (রা) ইমামের স্থান তাঁর জন্য খালি করতে এবং নিজে পিছনে হটতে মনস্থ করলেন। হযরত নবী করীম (সা) তাঁকে কাঁধের কাছে ধরে সেখানেই দণ্ডায়মান রাখলেন এবং নিজে তাঁর ইকতিদা করে নামায আদায় করলেন। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে উক্ত হয়েছে, হযরত নবী করীম (সা) হযরত আয়িশা (রা)-কে বললেন, তুমি তোমার পিতা ও ভাইকে ডেকে আন। আমি তোমার পিতার জন্য খিলাফতনামা লিখে দেবো। তারপর বললেন : থাক, তার প্রয়োজন নেই। কেননা, মুসলিম সমাজ তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে নেতা নিয়োগ করবে না। আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছাও তাই। অনুরূপ সহীহায়নে এও উক্ত হয়েছে যে, একদিন রোগশয্যায় বসে তিনি কাগজ ও কলম-দোয়াত চেয়ে পাঠালেন। কিন্তু তখন রোগ প্রকট ছিল বিধায় হযরত উমর ফারূক (রা) তাঁকে কষ্ট দিতে বারণ করলেন। বললেন, কুরআন মজীদই আমাদের জন্য যথেষ্ট। হযরত নবী করীম (সা)-ও তাই বলেছেন। তবু কোন কোন সাহাবা বললেন : না, নবী করীম (সা)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত। তাঁকে জিজ্ঞেস করা উচিত তিনি কি লিখতে চেয়েছিলেন। নবী করীম (সা) তাদের এই কথাবার্তা অপসন্দ করলেন। তাঁকে লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, আপনি কি লেখাতে চান বলুন! তিনি বললেন, তোমরা আমাকে আমার অবস্থায় থাকতে দাও এবং বাইরে চলে যাও। ঐ সময় নবী করীম (সা) তীব্র রোগ-যন্ত্রণা ও কষ্ট অনুভব করছিলেন। তাই হযরত উমর (রা) এই অবস্থায় তাঁকে কষ্ট দিতে চাননি। একটু পরেই নবী করীম (সা) কিছুটা আরাম বোধ করলে সবাইকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, কোন প্রতিনিধি দল আগমন করলে তাঁদেরকে ইনআম ও উপঢৌকন দিয়ে অবশ্যই খুশী করবে। মুশরিকদেরকে আরব উপদ্বীপ থেকে সম্পূর্ণ বের করে দেয়ার চেষ্টা করবে। উসামার বাহিনীকে অবশ্যই অভিযানে পাঠাবে। আনসারদের সাথে সদাচরণ করবে। তাদের ভুল-ভ্রান্তি মাফ করে দেবে। সহচর হিসাবে আবূ বকরের চেয়ে কাউকে উৎকৃষ্ট মনে করবে না। এরপর পুনরায় রোগ বৃদ্ধি পেলো এবং তিনি আবার সংজ্ঞা হারালেন।

ওফাতের কিছু পূর্বে

হযরত আলী (রা), হযরত আব্বাস (রা), ফযল ইব্ন আব্বাস (রা), হযরত আবূ বকর (রা), হযরত উমর (রা) প্রমুখ এই রোগাক্রান্তের দিনগুলোতে প্রায়ই নবী করীম (সা)-এর কাছে উপস্থিত থাকতেন। পাঁচ/ছয়টি দীনার তাঁর কাছে মওজুদ ছিল। হযরত আয়িশার

তহবিলে তা রাখা ছিল। তিনি সেগুলো সাদাকা করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন, যেন দুনিয়ায় তিনি কোন বস্তু রেখে না যান। হযরত আলী (রা)-কে তিনি সালাত ও সংশ্লিষ্টদের সম্পর্কে গাফিল না থাকতে উপদেশ দিলেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) নবী করীম (সা) অসুস্থ থাকাকালে তেরো ওয়াক্ত সালাত পড়িয়েছেন। একাদশ হিজরীর ১২ই রবীউল আউয়াল সোমবার ফজর সালাতের সময় নবী করীম (সা) মাথায় পট্টি বেঁধে বাইরে বের হলেন। তখন হযরত আবূ বকর (রা) লোকদেরকে ফজরের সালাত পড়াচ্ছিলেন। তিনি এবারও পিছনে সরে আসার ইরাদা করলেন। নবী করীম (সা) আবার তাঁকে নিজ হাতে বাধা দিলেন এবং ডানপাশে বসে সালাত আদায় করলেন। সালাতের পর তিনি লোকদেরকে কিছু ওয়ায-নসীহত করলেন। তিনি যখন তাঁর ওয়ায শেষ করলেন, তখন হযরত আবূ বকর (রা) বললেন, আল্লাহ্র ফযলে আজ আপনাকে প্রফুল্লচিত্ত মনে হচ্ছে। এরপর তিনি তাঁর গৃহে গমন করলেন এবং হযরত আয়িশার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন। হযরত আবূ বকর (রা) নিশ্চিন্ত হয়ে এবং নবী করীম (সা)-কে আজ খুব সুস্থ অবস্থায় দেখে স্বীয় পরিবার-পরিজনের নিকট আপন গৃহে গমন করলেন। এই সময় আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর (রা) একটি তাজা মিসওয়াক হাতে নিয়ে উপস্থিত হলেন। নবী করীম (সা) তার দিকে গভীরভাবে তাকালেন। হযরত আয়িশা (রা) বুঝে ফেললেন যে, তিনি মিসওয়াক চাচ্ছেন। তাই তিনি তাঁর ভাইয়ের হাত থেকে মিসওয়াকটি নিয়ে নিজের দাঁত দিয়ে চিবিয়ে নরম করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দিলেন। তিনি সেটি দিয়ে মিসওয়াক করলেন। তারপর সেটি রেখে দিয়ে তাঁর মাথা হযরত আয়িশার বুকের উপর রেখে পা বিছিয়ে দিলেন।

ওফাত

এরপর নবী করীম (সা)-এর কাছে একটি পানিভর্তি পেয়ালা রাখা হয়েছিল। তিনি তাতে তাঁর হাত ভিজিয়ে চেহারার উপর হাতে বুলাতেন এবং বলতেন-اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى سَكَرَاتِ الْمَوْتِ (হে আল্লাহ! মৃত্যু যাতনায় আমাকে সাহায্য করো)। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা) বারংবার তাঁর চেহারার প্রতি তাকাচ্ছিলেন। সহসা লক্ষ্য করলেন যে, তাঁর চক্ষু স্থির ও নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। তাঁর পবিত্র মুখে তখন اَلرَّفِيْقُ الْاَعْلٰى مِنَ الْجَنَّةِ উচ্চারিত হচ্ছিল। একাদশ হিজরীর ১২ই রবীউল আউয়াল সোমবার প্রায় দুপুরের সময় এই নশ্বর জগত থেকে তিনি জান্নাতবাসী হন। পরদিন মঙ্গলবার দুপুরের কাছাকাছি সমাহিত হন। তাঁর ইনতিকালের সময় হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) উপস্থিত ছিলেন না। তিনি 'সানাহ' নামক স্থানে আপন গৃহে পরিবার-পরিজনের কাছে গিয়েছিলেন। এই খবর যে শুনত, সে-ই অস্থির ও হতভম্ব হয়ে পড়ত।

হযরত উমর (রা)-এর অবস্থা

হযরত উমর ফারূক (রা)-এরও হুশ ও চেতনা অটুট ছিল না, তিনি তাঁর তলোয়ার কোষমুক্ত করে উঠে দাঁড়ালেন এবং উচ্চস্বরে বলতে লাগলেন—

اِنَّ رِجَالاً مِّنَ الْمُنَافِقِيْنَ زَعَمُوْا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ وَاِنَّهٗ ذَهَبَ اِلٰى رَبِّهٖ كَمَا ذَهَبَ مُوْسٰى وَلَيَرْجِعَنَّ فَيَقْطَعَنَّ اَيْدِىَ رِجَالٍ وَّاَرْجُلَهُمْ ۔

কিছু সংখ্যক মুনাফিক মনে করছে রাসূলুল্লাহ (সা) মৃত্যুবরণ করেছেন। অথচ তিনি মৃত্যুবরণ করেননি। তিনি তাঁর প্রভুর সান্নিধ্যে চলে গেছেন, যেমনিভাবে হযরত মূসা (আ) গিয়েছিলেন। তিনি অবশ্যই ফিরে আসবেন এবং লোকদের হাত-পা কর্তন করবেন।

হযরত উমর ফারূক (রা) উত্তেজনা ও ক্রোধবশে এই ধরনের কথা বলছিলেন। তাঁকে তাঁর তলোয়ার কোষবদ্ধ করতে বলবে এরূপ কারো সাহস ছিল না। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইনতিকালের একটু পরই হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এসে পৌঁছলেন এবং সোজা হুজরা মুবারকে গমন করলেন। হযরত আয়িশা (রা)-এর কোল থেকে তাঁর মাথা তুলে গভীরভাবে দেখে বললেন, আমার মা-বাপ আপনার জন্য কুরবান হোক। নির্ঘাত আপনি আপনার সেই মৃত্যু-স্বাদ আস্বাদন করেছেন, যা আল্লাহ্ তা'আলা আপনার জন্য নির্ধারণ করেছিলেন। এরপর আর কখনো মৃত্যু আপনাকে স্পর্শ করবে না। তারপর اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ পাঠ করে বাইরে চলে এলেন।

হযরত আবূ বকর (রা)-এর দৃঢ়তা

হযরত আবূ বকর (রা) হযরত উমর ফারূক (রা)-কে ঐ কথাই বলতে শোনলেন এবং তাঁকে বললেন, চুপ থাক। কিন্তু হযরত উমর (রা) তাতে কর্ণপাত করলেন না। তখন হযরত আবূ বকর (রা) পৃথকভাবে দাঁড়িয়ে একটি ভাষণ দিলেন। হযরত উমর (রা)-এর পাশে যারা জড়ো হয়েছিলেন, তারা তাঁকে একাকী রেখে হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিকট চলে এলেন। হযরত আবূ বকর (রা) হামদ ও ছানার পর বললেন, "জনমণ্ডলী! তোমরা যদি মুহাম্মদ (সা)-কে পূজা করে থাক, তবে মুহাম্মদ (সা) মৃত্যুবরণ করেছেন। আর আল্লাহ্ তা'আলাকে যদি পূজা করে থাক, তবে আল্লাহ্ তা'আলা নিঃসন্দেহে জীবিত আছেন এবং তিনি কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না। তারপর তিনি কুরআন করীমের এই আয়াতটি পাঠ করলেন–

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ -اَفَائِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ ۔ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا – وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ ۔

মুহাম্মদ একজন রাসূল মাত্র। তার পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছে। সুতরাং যদি সে মারা যায়, অথবা সে নিহত হয়, তবে তোমরা কি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে ? এবং কেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে সে কখনো আল্লাহ্র ক্ষতি করবে না বরং আল্লাহ শীঘ্রই কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কৃত করবেন। (৩ : ১৪৪)

হযরত আবূ বকর (রা) কুরআন মজীদের এই আয়াত তিলাওয়াত করতেই তৎক্ষণাৎ জনতার মধ্য থেকে অস্থিরতা দূর হয়ে গেলো। হযরত উমর (রা) বলেন, প্রথমে আমি আবূ বকরের কথায় কর্ণপাত করিনি। কিন্তু তিনি যখন এই আয়াতটি পাঠ করলেন, তখন আমার মনে হলো যেন এই আয়াত ঐ সময়ই নাযিল হয়েছে। ভয়ে আমার পা কেঁপে উঠলো। আমি বুঝতে পারলাম যে, নবী করীম (সা) ইনতিকাল করেছেন।

সাকীফা বনূ সায়িদা

এখানে মসজিদে নববীতে এই কথাবার্তা চলছিল। ইত্যবসরে খবর এলো যে, সাকীফা বনূ সায়িদায় আনসাররা সমবেত হয়েছেন এবং তারা সবাই সা'দ ইব্ন উবাদা (রা)-এর হাতে

বায়'আত হতে চাচ্ছেন। কোন কোন আনসার এ কথাও বলছেন যে, مِنَّا أَمِيْرٌ وَمِنْ قُرَيْشٍ أَمِيْرٌ (একজন আমাদের মধ্যে আমীর হবে, আরেকজন কুরায়শের মধ্যে আমীর হবে)। এ খবর শুনে হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা) একদল মুহাজিরকে সঙ্গে নিয়ে এই অনভিপ্রেত অবস্থার সংশোধন ও প্রতিরোধকল্পে সাকীফা বনূ সায়িদার দিকে গমন করলেন এবং নবী করীম (সা)-এর ওসীয়ত মুতাবিক তাঁর নিকটাত্মীয় হযরত আলী (রা), হযরত আব্বাস (রা), হযরত উসামা (রা), হযরত ফযল ইব্ন আব্বাস (রা) প্রমুখকে কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করার জন্য মোতায়েন করে গেলেন। হযরত আলী (রা) তাঁকে গোসল দিলেন। হযরত আব্বাস (রা) ও তাঁর উভয় পুত্র পাশ ফিরাতেন এবং হযরত উসামা (রা) পানি ঢালতেন।

সালাতে জানাযা ও কাফন-দাফনের ব্যবস্থা

হযরত নবী করীম (সা)-কে কাফন পরানোর পর তাঁর দাফন করার স্থান নিয়ে সাহাবাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলো। কেউ কেউ বলছিলেন তাঁর গৃহে দাফন করতে। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এসে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট শোনেছি, প্রত্যেক নবীকে তাঁর জান কবয করার স্থানে দাফন করা হয়েছে। লোকেরা একথা শোনা মাত্র যে বিছানায় নবী করীম (সা) ইনতিকাল করেছিলেন, সেটি তুলে ফেললো এবং ঐ স্থানে কবর খনন করা হলো। কবর বাগ্‌লী কায়দায় খনন করা হলো। কবর তৈয়ার হওয়ার পর সালাতে জানাযা পড়া আরম্ভ হলো। প্রথমে পুরুষরা, তারপর নারীরা, তারপর বালকরা জানাযা সালাত পড়লেন। কেউ কারও ইমামতি করলো না। নবী করীম (সা)-এর রোগের তীব্রতা বৃদ্ধি এবং তারপর তাঁর ইনতিকালের খবর শুনে উসামা ইব্ন যায়দ (রা) ও তাঁর গোটা বাহিনী মদীনায় ফিরে এসেছিল এবং ফৌজী ঝাণ্ডা হুজরা মুবারকের দরজায় খাড়া করে রাখা হয়েছিল। সালাতে জানাযা হযরত আয়িশা (রা)-এর হুজরায় পড়া হলো। কেননা, এখানেই নবী করীম (সা) ইনতিকাল করেন এবং এখানেই তাঁর কবর তৈরী হয়েছিল। তাই এটা স্পষ্ট যে, মদীনায় যেসব মুসলমান উপস্থিত ছিলেন, তারা সবাই একসাথে সালাতে জানাযা পড়তে পারতেন না। আবার এ সালাতে জানাযা কারো ইমামতিতেও অনুষ্ঠিত হয়নি বরং পৃথক পৃথক ভাবে আদায় করা হয়। কাজেই মদীনার সমস্ত মুসলমান, গোটা উসামা বাহিনী, সমস্ত নারী, বালক ও গোলামদের দলে দলে হুজরায় এসে সালাতে জানাযা আদায় করা কিংবা তাঁর ইনতিকালের পর তৎক্ষণাৎ তাঁকে দাফন করা সম্ভবপরই ছিল না। সালাতে জানাযার সিলসিলা নিশ্চিতরূপেই পরের দিন পর্যন্ত অনবরত চালু ছিল। আর তাই এতে এতোটুকুও আশ্চর্যান্বিত হওয়া উচিত নয় যে, নবী করীম (সা)-এর ওফাত হলো সোমবার এবং তাঁকে দাফন করা হলো তার পরের দিন মঙ্গলবার। কোন কোন দুর্বল রিওয়ায়াতে এও উল্লেখ আছে যে, নবী করীম (সা)-কে মঙ্গলবার ও বুধবারের মধ্যবর্তী রাতে দাফন করা হয় যা ইসলামী হিসাব মতে বুধবারের রাত ছিল। তবু এটা কোন বিস্ময়কর ও আশ্চর্যের ঘটনা নয়। কেননা, নবী করীম (সা)-এর ওফাত ও তাঁর দাফনের মধ্যে এভাবে উর্ধ্বপক্ষে ৩৬ ঘন্টার দূরত্ব মানা যেতে পারে। আর এটা উপরোক্ত অবস্থার প্রেক্ষিতে বেশী কিছু নয়।

হুলিয়া মুবারক

হযরত রাসূলে করীম (সা) অতি দীর্ঘকায়ও ছিলেন না, খর্বকায়ও ছিলেন না। কিন্তু তাঁকে অন্য মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে উচ্চ মনে হতো। তিনি লাবণ্যময় রক্তিমাভ উজ্জ্বল গম-রং

বিশিষ্ট ছিলেন। পবিত্র মস্তক সামান্য বড়, ঘন ও ভরপুর দাড়ি, কেশরাশি কালো ও কিঞ্চিৎ-কুঞ্চিত, চক্ষুদ্বয় গোল ও ডাগর, কৃষ্ণ, উজ্জ্বল। মাথার চুল প্রায়শ কানের নিম্নভাগ পর্যন্ত, কখনো কাঁধ পর্যন্ত এবং কখনো কানের নিম্নভাগ থেকেও উপরে থাকতো। ভ্রূযুগল পরস্পর সম্মিলিত এবং মধ্যস্থলে একটি সরু শিরা ছিল। ক্রোধের সময় তা দৃষ্ট হতো। চক্ষুর শ্বেতাংশে লাল ডোরাও ছিল। মুখমণ্ডল কোমল ও মাংসল ছিল। মাথায় তৈল দিতেন এবং চোখে সুরমা লাগাতেন। দন্ত মুক্তার মতো সাদা ও উজ্জ্বল ছিল। মুচকি হাসি ছাড়া কখনো খিলখিল করে হাসতেন না। তিনি প্রফুল্ল মুখ, মিষ্টভাষী, বাকপটু, সাহসী ও সমস্ত মানবিক গুণসম্পন্ন ছিলেন। তাঁর দু'বাহুমূলের মধ্যস্থলে মুহরে নবুওয়াত ছিল। তিনি তাঁর নিজের কাজ নিজ হাতেই করতেন। কারো প্রার্থনা অগ্রাহ্য করতেন না।

সন্তান-সন্ততি

হযরত মারইয়া কিবতিয়া (রা)-এর গর্ভজাত ইবরাহীম ছাড়া হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর অন্য সব সন্তান হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা)-এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। সর্বপ্রথম হযরত কাসিম ভূমিষ্ঠ হন। চার বছর বয়সে তিনি মক্কায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তাঁর নামানুসারেই নবী (সা)-এর উপনাম (কুনিয়াত) হয় আবুল কাসিম। তাঁর পর হযরত যয়নাব (রা), এরপর আবদুল্লাহ্ (রা) ভূমিষ্ঠ হন। এই আবদুল্লাহ্‌র লকবই তাইয়্যিব ও তাহির ছিল। তারপর যথাক্রমে হযরত রুকাইয়া (রা), হযরত কুলছুম (রা) ও হযরত ফাতিমা যুহ্‌রা (রা) ভূমিষ্ঠ হন। পুত্রগণ সবাই ছোট সময়ই মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু কন্যারা সবাই যুবতী হন এবং তাঁদের বিবাহ-শাদী হয়। কিন্তু তাঁদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠা কন্যা হযরত ফাতিমা (রা) ছাড়া আর কোন কন্যা থেকে বংশধারা চালু হয়নি। হযরত ফাতিমা (রা)-এর গর্ভে চারটি সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। দুই পুত্র হযরত হাসান (রা) ও হযরত হুসায়ন (রা) এবং দুই কন্যা হযরত যয়নাব (রা) ও হযরত উম্মু কুলছুম (রা)।

স্বভাব-চরিত্র

নবী করীম (সা)-এর জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করলে জানা যায়, তিনি মাতৃগর্ভেই ইয়াতীম হয়েছিলেন। তাঁর জীবন ইয়াতীম ও অসহায় অবস্থায় শুরু হয়। কিন্তু মৃত্যুকালে তিনি তামাম আরব জাহানের শাহানশাহ ছিলেন। আরবের এমন কোন প্রদেশ ছিল না, যেখানে তাঁর জাগতিক শাসন ও রাজত্ব কায়েম হয়নি। এই সমুদয় অবস্থা ও সমগ্র জীবন-পরতে তাঁর সরল জীবনযাত্রা একইরূপ দৃষ্ট হয়। সহীহ্ বুখারীতে উল্লেখ আছে, হযরত আয়িশা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) কখনো নিজেকে জাগতিক কর্মকাণ্ডে অন্যের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেননি বরং তোমরা যেভাবে তোমাদের আবাসগৃহে নিজ নিজ কাজ করে থাক, তেমনি তিনিও করতেন। তিনি নিজেই নিজের বকরীগুলোর দুধ দোহন করতেন এবং নিজেই নিজের পাদুকা সেলাই করতেন। মদীনা মুনাওয়ারায় মসজিদে নববী নির্মিত হচ্ছিল। তিনি সব কাজেই অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এমনকি সাধারণ মযদুরের ন্যায় তিনিও ইট তুলে তুলে বয়ে আনতেন। আহযাবের যুদ্ধে তিনিও খন্দক খননকারীদের মধ্যে শামিল ছিলেন। নিজ হাতে মাটি তুলতেন এবং পাথর ভাঙ্গতেন। তিনি সাধারণত যবের রুটি খেতেন। তাঁর ঘরে চালুনি ছিল না। ফুঁক দিয়ে ভূষি উড়িয়ে দেয়া হতো। কখনো একাধারে দু'দিন এই যবের রুটিও পেটভরে খেতে পেতেন না।

কোন কোন সময় মাসকে মাস পর্যন্ত তাঁর উনুনে আগুন জ্বলতো না। নিছক খেজুর ও পানি দ্বারা তিনি ও তাঁর পরিবার-পরিজন জীবন নির্বাহ করতেন। তিনি কখনো কোন খাদ্যকে খারাপ বলেননি। তার মধ্যে কোন দোষ-ত্রুটিও আবিষ্কার করেননি। যা কিছু পাওয়া যেতো তাই আহার করতেন। ক্ষুধা না থাকলে কিংবা খেতে ইচ্ছা না থাকলে হাত তুলে নিতেন।

হযরত আয়িশা (রা)-কে জিজ্ঞেস কা হলো, আপনার গৃহে নবী করীম (সা)-এর বিছানা কিসের তৈরী ছিল। তিনি বললেন, চামড়ার। তার মধ্যে খেজুরের বাকল ভরা ছিল। একই প্রশ্ন হযরত হাফসা (রা)-কেও জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, এক টুকরো চট ছিল। আমরা সেটিকে দুই ভাঁজ করে দিতাম। একদিন রাতে আমি সেটিকে চার ভাঁজ করে দিতে চাইলাম, যাতে নবী করীম (সা) একটু বেশী আরামবোধ করেন। সুতরাং তাই করা হলো। ভোরবেলা তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, রাতে তুমি আমার জন্য কি বিছিয়েছিলে ? আমি বললাম, আপনার সেই চটটিই বিছিয়ে ছিলাম। তবে সেটিকে চার ভাঁজ করেছিলাম যাতে আপনি একটু বেশী আরামবোধ করেন। তিনি বললেন, না! তুমি সেটিকে সেইরূপ করে দাও যেমন পূর্বে ছিল। ঐটি রাতে আমাকে তাহাজ্জুদ সালাত থেকে বিরত রেখেছে। ওফাতের পূর্বে তিনি বলেছিলেন, আমার ওয়ারিশরা আমার ত্যাজ্য সম্পত্তির মধ্যে অর্থকড়ি প্রভৃতি নগদ কিছু পাবে না। জনৈক ইয়াহূদীর নিকট ত্রিশ দিরহামের বিনিময়ে নবী করীম (সা)-এর একটি লৌহবর্ম বন্ধক রাখা হয়েছিল। সেটি ছাড়িয়ে আনার মতো তাঁর নিকট অর্থ ছিল না। তিনি ত্যাজ্য সম্পত্তির মধ্যে তাঁর হাতিয়ার, একটি খচ্চর ও একটি বর্ম রেখে যান। এসব জিনিসও দান–খয়রাত করার নির্দেশ ছিল। যারা বলছেন যে, নবী করীম (সা) (নাইযুবিল্লাহ) ব্যক্তিগত স্বার্থ, উচ্চাভিলাষ, ধন-দৌলত লাভ ও দেশজয়ের জন্য তাঁর কওমের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিলেন, তারা কি অন্ধ নয় ? হযরত আনাস (রা) বলেন, আমি আট বছর বয়সে নবী করীম (সা)-এর নিকটে আসি এবং একাধারে দশ বছর তাঁর নিকট থাকি। কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কখন একবারও তিনি আমার কোন কাজে বিরক্তি প্রকাশ করেননি এবং একথা বলেননি যে, তুমি এ কাজটি কেন করেছ আর ঐ কাজটি কেন করনি। তাঁর পবিত্র মুখ থেকে কখনো কোন অশ্লীল ও অনর্থক বাক্য বের হয়নি।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, একবার লোকেরা নবী করীম (সা)-কে বললো, মুশরিকদের জন্য বদ্‌দু'আ করুন। তিনি বললেন, আমি অভিশাপ দেয়ার জন্য আসিনি, বরং আল্লাহ তা'আলা আমাকে রহমত বানিয়ে পাঠিয়েছেন। হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা) বলেন, নবী করীম (সা)-এর স্বভাবে কোন বেহুদাপনা ও অনর্থকতা ছিল না। তিনি শিশুদেরকে তাঁর কোলে বসাতেন এবং তাদের সাথে খেলা করতেন। রোগীদের শুশ্রূষা ও পরিচর্যার জন্য তিনি শহরের প্রত্যন্ত পল্লীতে চলে যেতেন। কারো সাথে সাক্ষাৎ হলে প্রথমে তিনিই সালাম করতেন। কেউ তাঁর সাথে মুসাফাহা (করমর্দন) করলে তার হাত গুটিয়ে নিয়েছেন এমনটি কখনো ঘটেনি। শ্রদ্ধাবশত তিনি তাঁর সঙ্গীদের নাম ধরে ডাকতেন না বরং কোন কুনিয়াত ধরে ডাকতেন এবং স্নেহমিশ্রিত পসন্দনীয় নামে তাদের স্মরণ করতেন। তিনি কারো কথা শেষ হওয়ার পূর্বে নিজের কথা শেষ করতেন না। অবশ্য কেউ যদি অশোভন কথা বলতো, তবে তিনি তাকে বাধা দিতেন কিংবা উঠে দাঁড়াতেন যাতে সে নিজেই বিরত হয়।

পরম সুচরিত্র

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন হারিছের উক্তি : আমি কোন ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ (সা) অপেক্ষা অধিক সুচরিত্রবান দেখিনি। নবী করীম (সা) বলেন, বীর সেই ব্যক্তি নয়, যে লোকদেরকে কুস্তিতে হারিয়ে দেয়, বরং বীর সেই ব্যক্তি যে ক্রোধের সময় স্বীয় প্রবৃত্তিকে সংযত রাখে। হযরত আনাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ সাহসী ব্যক্তি। একবারের ঘটনা। মদীনাবাসী হঠাৎ সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। শত্রুর আক্রমণের মতো শোরগোল শুরু হয়। লোকেরা সেই শোরগোলের দিকে অগ্রসর হলো। কিন্তু তারা দেখতে পেলো যে, নবী করীম (সা) সেই দিক থেকে ফিরে আসছেন। তিনি সবার আগে ঘোড়ার শূন্য পৃষ্ঠে আরোহণ করে সেই দিকে গিয়েছিলেন। তিনি লোকদের বললেন, ঘাবড়িও না, কোন ভয় ও আশংকার কারণ নেই। বারা' ইব্ন আযিব (রা) বলেন, হুনায়ন যুদ্ধের দিন লোকেরা পলায়নপর ছিল আর এদিকে নবী করীম (সা) এই রিজ্য (কবিতার ছন্দ) পাঠ করছিলেন : اَنَا النَّبِىُّ لاَ كَذِبْ اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ সেদিন তাঁর চেয়ে বড় বাহাদুর ও সাহসী আর কোন লোককে দেখা যায়নি। যুদ্ধ যখন খুব তুমুল আকার ধারণ করতো, তখন আমরা তাঁর আশ্রয় খুঁজতাম। আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় বাহাদুর ও বীর সেই ব্যক্তি বিবেচিত হতো, যে যুদ্ধের ময়দানে নবী করীম (সা)-এর বরাবর দাঁড়িয়ে থাকতে পারতো। হযরত আনাস (রা) বলেন, একদা আমি নবী করীম (সা)-এর সহযাত্রী হয়েছিলাম। তিনি তখন একটি মোটা পাড়ের চাদর গায়ে দিয়ে ছিলেন। জনৈক বেদুঈন চাদরের আঁচল ধরে এমন জোরে টান দিলো যে, চাদরের পাড়ের ঘর্ষণে তাঁর কাঁধ ও ঘাড়ে দাগ পড়ে গেল। তিনি তার দিকে তাকালে সে বললো : হে মুহাম্মদ (সা)! আল্লাহ্র সেই সম্পদ থেকে যা তোমার নিকট গচ্ছিত আছে, আমার দু'টি উটের উপরও কিছু বোঝাই করে দাও। কেননা তার মধ্য থেকে তুমি আমাকে যা দেবে, তা তোমার বা তোমার বাবার সম্পত্তি নয়। এই তিক্ত ও রূঢ় কথা শুনে প্রথমে তিনি পরম ধৈর্য ও কৃপায় নীরব থাকলেন। তারপর বললেন, নিঃসন্দেহে সমস্ত সম্পদ আল্লাহ্র এবং আমি তাঁর বান্দা। কিন্তু তুমি বলো, তোমার সাথেও কি ঐ রকম আচরণই করা হবে, যা তুমি আমার সাথে করেছো ? সে বললো, না! তিনি বললেন, কেন নয় ? সে বললো, কেননা, তুমি মন্দের বদলে মন্দ করো না। একথা শুনে তিনি মৃদু হাসলেন। তারপর তিনি ঐ ব্যক্তির এক উটের উপর যব ও আরেক উটের উপর খেজুর বোঝাই করে দিতে আদেশ করলেন।

একবার যায়দ ইব্ন সু'আনী নামক জনৈক ইয়াহূদী ইসলাম গ্রহণের পূর্বে নবী করীম (সা)-এর নিকট নিজের দেয়া কিছু ঋণের তাগাদা দিতে এলো এবং অনেক রকম বকাঝকা করতে লাগলো। বললো, তোমরা, আবদুল মুত্তালিবের বংশধররা কখনো ঋণ পরিশোধ করো না এবং ওয়াদা পালন করো না। তার এই অবাধ্যাচরণ দেখে নবী করীম (সা) মুচকি মুচকি হাসছিলেন। কিন্তু হযরত উমর (রা) তাকে ধমক দিয়ে এরূপ অবান্তর উক্তি করতে বাধা দিতে চাইলে তিনি তাঁকে বললেন, উমর! আমাদের দু'জনের ক্ষেত্রে তোমার যে ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত ছিল, তা তুমি করতে ব্যর্থ হয়েছো। ওকে ধমক দেয়া তোমার উচিত হয়নি, বরং তাকে ভদ্র ও নম্রভাবে তাগাদা করার উপদেশ দেয়া এবং আমাকে ওয়াদা পালন ও ঋণ পরিশোধ করতে বলা উচিত ছিল। এরপর তিনি ঐ ইয়াহূদীর ঋণ পরিশোধ করে দেয়ার আদেশ দিলেন এবং ধমক ও ভর্ৎসনার বিনিময়ে অতিরিক্ত বিশ সা 'অর্থাৎ আরো দেড় মণ যব দিয়ে দিতে বললেন। অথচ

ঋণ পরিশোধের মেয়াদ তখনো তিনদিন অবশিষ্ট ছিল। ইয়াহূদী লোকটি মেয়াদ শেষ না হতেই তাগাদা করতে এসেছিল। দয়া-ধৈর্যের এই সুচরিত্র দেখে ইয়াহূদী মুসলমান হয়ে গেলো।

হযরত আনাস (রা) বলেন, আমি নবী করীম (সা)-এর সাথে আবূ সায়ফ কর্মকারের নিকট গেলাম। তাঁর স্ত্রী নবী করীম (সা)-এর পুত্র ইবরাহীমকে দুধ পান করাতো। ইবরাহীমের তখন মুমূর্ষু অবস্থা। তাঁর এই অবস্থা দেখে নবী করীম (সা)-এর চক্ষু অশ্রুসজল হয়ে উঠলো। তাঁকে অশ্রুসজল দেখে হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনিও অধৈর্য প্রকাশ করছেন ? তিনি বললেন : হে ইব্‌ন আওফ ! এ অশ্রু স্নেহ-মমতার কারণে; অধৈর্য ও অকৃতজ্ঞতার কারণে নয়। অন্তর অবশ্যই ব্যথিত হয় আর চক্ষু অশ্রু বিসর্জন করে। কিন্তু আমরা এমন কোন কথা উচ্চারণ করি না, যা আল্লাহ্‌র অসন্তোষ কুড়ায়।

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, একবার আনসারদের কিছু লোক নবী করীম (সা)-এর নিকট কিছু চাইল। তিনি তাদেরকে তা দিলেন। তারা আরো চাইল। তিনি তাদের আরো দিলেন। এমনকি তাঁর কাছে যা ছিল সবই দিয়ে দিলেন। তারপর তিনি বললেন, আমার কাছে যা কিছু আসে, তা তোমাদেরকে না দিয়ে জমা করে রাখি না। তবে যে ব্যক্তি নিজকে ভিক্ষার অপমান থেকে রক্ষার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করে, আল্লাহ্ তাকে সেই অপমান থেকে রক্ষা করেন। আর যে ব্যক্তি ধৈর্য অবলম্বন করে, আল্লাহ্ তাকে ধৈর্যশীল বানিয়ে দেন। ধৈর্য অপেক্ষা অধিক উত্তম কোন দান আল্লাহ্ কাউকে দান করেননি। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) বারংবার বলেছেন, আমার নিকট যদি উহুদ পর্বতের সমান স্বর্ণও থাকে, তবু তা তিনদিন অতিক্রম করার পূর্বে বণ্টন করে দেয়ার মধ্যেই আমার আনন্দ। তবে ঋণ পরিশোধের জন্য আমি যা তুলে রাখি সেগুলো ছাড়া। কখনো কখনো তাঁর নিকট যখন কিছু থাকতো না এবং কোন অভাবগ্রস্ত এসে পড়তো, তখন ঋণ করে হলেও তার অভাব দূর করতে তিনি দ্বিধাবোধ করতেন না। সাধারণত তিনি এই ধরনের ঋণই করতেন। নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজন মিটানোর জন্য তিনি কখনো ঋণ করতেন না।

জাবির ইব্‌ন আবদিল্লাহ্ (রা) বলেন, আমি এক যুদ্ধে হযরত নবী করীম (সা)-এর সাথে ছিলাম। আমার উটটি ক্লান্ত হয়ে পিছনে পড়ে গেলো। ইত্যবসরে নবী করীম (সা) এসে পড়লেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, জাবির ! তোমার কি হয়েছে ? আমি বললাম, আমার উটটি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তিনি আমার উটকে একটি তসমা (চামড়ার লম্বা টুকরো দ্বারা) মারলে সেটি খুব দ্রুত চলতে লাগলো। তারপর আমরা উভয়ে কথা বলতে বলতে চললাম। এক পর্যায়ে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এই উটটি বিক্রি করবে ? আমি বললাম, হাঁ।

তিনি সেটি আমার নিকট থেকে ক্রয় করলেন। তারপর তিনি আগে চলে এলেন এবং আমি কিছুটা বেলা বাড়ার পর পৌঁছলাম। আমি উট মসজিদের দরজায় বাঁধলাম। তিনি আমাকে দেখে বললেন, উট রেখে দাও এবং মসজিদে এসে দু'রাকাআত সালাত আদায় করো। আমি সালাত শেষ করলে তিনি হযরত বিলাল (রা)-কে উটের মূল্য পরিশোধ করতে বললেন। আমি মূল্য নিয়ে রওয়ানা হলাম। তিনি আবার আমাকে ডাকলেন। আমি আমার উট ফিরিয়ে দেয়ার আশংকা করলাম। কিন্তু আমি কাছে এলে তিনি বললেন, উটটিও নিয়ে যাও এবং তার মূল্যও তোমারই থাকবে।

একবার নবী করীম (সা) একটি জঙ্গলে প্রবেশ করলেন। তাঁর সাথে একজন লোক ছিল। তিনি মাটি খুঁড়ে দু'টি মিসওয়াক বের করলেন। একটি সোজা ছিল, আরেকটি বাঁকা। নবী করীম (সা) বাঁকাটি নিজে রাখলেন আর সোজাটি তাঁর সঙ্গীকে দিলেন। সঙ্গী বললেন, সোজাটি আপনি রাখুন। কিন্তু তিনি সেটি নিলেন না। বললেন, যে ব্যক্তি কারো সাহচর্যে থাকে, তা মুহূর্তের জন্যই হোক না কেন, কিয়ামতের দিন তাকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, সাহচর্যের দাবী তুমি পালন করেছিলে কিনা?

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, জনৈক ইয়াহূদী ও বিশর নামীয় জনৈক মুনাফিক মুসলমানের মধ্যে কোন ব্যাপারে বিবাদ বাঁধে। তারা উভয়ে নবী করীম (সা)-এর নিকট বিচার প্রার্থী হলো। তিনি উভয়ের অবস্থা তদন্ত করে ইয়াহূদীকে সত্যবাদী পেলেন এবং তার পক্ষে রায় ঘোষণা করলেন। বাইরে এসে বিশর বললো, এ রায় ঠিক হয়নি। চলো আমরা হযরত উমর (রা)-এর নিকট যাবো। সুতরাং তারা হযরত উমর (রা)-এর নিকট এলো। ইয়াহূদী এসেই বললো : আমরা দু'জনে নবী করীম (সা)-এর নিকট গিয়েছিলাম। তিনি আমার পক্ষে রায় দিয়েছেন, কিন্তু সে তা মানেনি এবং আপনার কাছে নিয়ে এসেছে। এখন আপনি যে ফায়সালা করবেন তাই মান্য করা হবে। হযরত উমর (রা) বিশরের দ্বারা ইয়াহূদীর এই বর্ণনায় সত্যতা যাচাই করলেন। বিশর বললো : হাঁ, সে (ইয়াহূদী) সত্যই বলেছে। আমরা উভয়ে নবী করীম (সা)-এর নিকট গিয়েছিলাম। কিন্তু আমি তাঁর রায়ের উপর আপনার রায়কে প্রাধান্য দেই। হযরত উমর (রা) বললেন : তোমরা উভয়ে একটু দাঁড়াও। আমি এখনই ফায়সালা করে দিচ্ছি। একথা বলে তিনি অন্দরে চলে গেলেন এবং তলোয়ার নিয়ে এসে মুনাফিক বিশরের শিরোশ্ছেদ করলেন। বললেন, যে ব্যক্তি মুসলমান হয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ফায়সালা মানে না, আমি তার ফায়সালা এভাবেই করে থাকি। এতে তার সঙ্গের মুনাফিকরা অনেক শোরগোল করলো। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা ওয়াহীর মাধ্যমে হযরত উমর (রা)-এর এই কাজকে সমর্থন করলেন এবং সেদিন থেকেই তাঁর লকব হলো 'ফারূক'।

মক্কা বিজয়ের পরের ঘটনা। বনূ মাখযূমের ফাতিমা বিনতুল আসওয়াদ নাম্নী জনৈক মহিলা চুরির অপরাধে গ্রেফতার হলো। অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পর নবী করীম (সা) তার হাত কাটার নির্দেশ দিলেন। কুরায়শের অভিজাত মহল এটা তাদের জন্য লজ্জাকর ভাবলো। তারা সুপারিশ করে ঐ মহিলাকে শাস্তি থেকে রক্ষা করতে চাইল। কিন্তু সুপারিশ করার সাহস হলো না। শেষে হযরত উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা)-কে অনেক ধরাধরি করে রাযী করালেন। তিনি নবী করীম (সা)-এর নিকট সুপারিশ করলেন। তখন নবী করীম (সা) বললেন : উসামা ! তুমি আল্লাহ্‌র নির্ধারিত দণ্ডের মধ্যে সুপারিশকে স্থান দিচ্ছ ! তারপর তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং জনসমাবেশে ভাষণ দিলেন : জনমণ্ডলী ! তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো এজন্যই ধ্বংস হয়ে গেছে। তাদের কোন অভিজাত পরিবারের কেউ চুরি করলে তারা তাকে ছেড়ে দিতো এবং কোন দুর্বল লোক চুরি করলে তাকে শাস্তি দিতো। আল্লাহ্ সাক্ষী, ফাতিমা বিন্‌ত মুহাম্মদ (সা)-ও যদি চুরি করতো, আমি নির্ঘাত তার হাত কেটে ফেলতাম।

সরলতা

একবার হযরত নবী করীম (সা) বলেন, তোমরা আমার প্রশংসা করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করবে না, যেমনভাবে নাসারারা হযরত ঈসা ইব্‌ন মারয়াম-কে সীমার অধিক বাড়িয়ে দিয়েছে।

আমি তো আল্লাহ্র একজন বান্দা মাত্র। তাই তোমরা আমাকে আবদুল্লাহ্ ওয়া রাসূলুহু (আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল) বলবে।

একবার তিনি বাইরে আগমন করলে সাহাবায়ে কিরাম সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন তিনি বললেন, আনারবরা যেরূপ একে অপরের সম্মানার্থে দাঁড়ায়, তোমরা সেরূপ দাঁড়াবে না। (শিফা, কাযী আয়ায)। তিনি তাঁর আসহাবদের সাথে সম্পূর্ণ মিলেমিশে থাকতেন এবং মজলিসের যেখানে জায়গা পাওয়া যেতো, সেখানে বসে পড়তেন। তিনি চাকরদের কাজে অংশ নিতেন এবং তাদেরকে নিজের কাছে বসাতেন।

বহুবার এমন ঘটনাও ঘটেছে যে, কোন ব্যক্তি কোন ইয়াহূদীর কাছে ঋণী হয়েছে এবং ইয়াহূদী কড়া তাগাদা দিয়েছে। তখন ঐ ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর নিকট এসেছে। তাঁর কাছে কিছু থাকলে তিনি তা দিয়ে দিয়েছেন। নতুবা ঐ ইয়াহূদীর নিকট তিনি নিজে গমন করেছেন এবং তাকে আরেকটু সময় দেয়ার জন্য বলেছেন। কিন্তু ইয়াহূদী ব্যক্তি তাঁর প্রতিও কোন ভ্রূক্ষেপ করত না। তখন তিনি এদিক-সেদিক চেষ্টা করে যেভাবে সম্ভব হতো ঋণ পরিশোধের বন্দোবস্ত করে দিতেন। তিনি বলেন, ক্ষুধার্ত ও গরীব-মিসকীনের জন্য তৎপর ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে জিহাদকারী, রাতভর ইবাদতকারী ও দিনভর সাওম পালনকারীর সমান মর্যাদা সম্পন্ন।

এক ব্যক্তি হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে আরয করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্। জান্নাত লাভের আমল কি ? তিনি বললেন : সিদ্ক (সততা)। কেননা, মানুষ যখন সৎ হয় তখন নেক কাজ করে। আর যখন নেক কাজ করে, তখন ঈমানের নূর পয়দা হয়। আর যখন ঈমানদার হয়, তখন জান্নাতে প্রবেশ করে।

অন্য এক উপলক্ষে তিনি বলেন, খবরদার ! সৎ থাকো। সত্যের মধ্যে যদি তুমি ধ্বংসও দেখতে পাও। কেননা, মুক্তি তাতেই নিহিত। মক্কা থেকে বদর প্রান্তরে আসার সময় পথিমধ্যে আহ্নাস ইব্ন শুরায়ক আবূ জাহেলকে বললো, হে আবুল হাকাম ! আমি তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞেস করছি। এখানে আমাদের দু'জন ছাড়া তৃতীয় কোন ব্যক্তি আমাদের কথা শ্রবণকারী নেই। তুমি আমাকে সত্যি সত্যি বলো, মুহাম্মদ (সা) মিথ্যাবাদী, না সত্যবাদী ? আবূ জাহেল জবাব দিল, আল্লাহ্র কসম ! অবশ্যই মুহাম্মদ (সা) সর্বদা সত্য কথা বলেন এবং সে কখনো ভুল তথ্য পরিবেশন করেনি।

হযরত আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা) বলেন, হযরত নবী (সা) শরীফ পর্দানশীন কুমারী বালিকার চাইতেও বেশী লজ্জাশীল ছিলেন। কোন কথা যদি তাঁর অপসন্দ হতো, তবে তা আমরা সহসা তাঁর চেহারা থেকে বুঝে ফেলতাম। কারো কথা যদি তাঁর ভাল না লাগতো তবে তিনি তা ইশারা-ইঙ্গিতে জানিয়ে দিতেন যাতে সে লজ্জিত না হয়। কিন্তু আল্লাহ্র কালাম ও সত্য প্রচারের ক্ষেত্রে তিনি কারো তোয়াক্কা করতেন না।

মধ্যপন্থা

হযরত আয়িশা (রা) বলেন, হযরত নবী করীম (সা) যদি কারো কোন অপসন্দনীয় কথা জানতে পারতেন, তবে তিনি তার নাম নিয়ে বিশেষভাবে কিছু বলতেন না বরং এভাবে বলতেন সেই ব্যক্তি কেমন লোক, যে এরূপ কথা বলে ! তিনি বেশীর ভাগ সময়ই নীরব থাকতেন এবং বিনা প্রয়োজনে কথা বলতেন না। তিনি পরিষ্কার এবং স্পষ্ট কথা বলতেন। এত

দীর্ঘও নয় যে, তাতে কোন অবান্তর ও অপ্রয়োজনীয় কথা থাকতো। আবার এত সংক্ষিপ্তও নয় যে, কোন কাজের কথা বাদ থেকে যেত কিংবা বুঝে আসতো না। তাঁর চলনভঙ্গিও খুব পরিমিত ছিল। এত ধীরগতিও ছিল না যে, সহযাত্রীদের উপর বোঝা মনে হতো। আবার এত ত্বরিতগতিও ছিলেন না যে, শ্রান্তি ও ক্লান্তি আসতো। মোটকথা, ভারসাম্য ও মধ্যপন্থা তাঁর প্রতিটি কাজ থেকেই পরিস্ফুটিত হতো।

হাস্য-কৌতুক

হযরত নবী করীম (সা) কখনো কখনো হাস্য-কৌতুকও করতেন। যেমন একবার তিনি কাউকে একটি উট দেয়ার ওয়াদা করেন। সে উট নিতে আসলে তিনি বললেন, আমি তোমাকে একটি উটনীর বাচ্চা দেবো। একথা শুনে ঐ ব্যক্তি বললো আমি উটনীর বাচ্চা দিয়ে কি করবো ? তিনি বললেন, উট যদি উটনীর বাচ্চা না হয়, তবে কার বাচ্চা ? তিনি কৌতুক করে উটকে উটনীর বাচ্চা বলেছিলেন। ঐ ব্যক্তি বুঝেছিল, সম্ভবত তিনি কমবয়সী ছোট বাচ্চা দিতে আদেশ দিয়েছেন। তিনি হাস্য-কৌতুক করতেন বটে, কিন্তু হাস্য-কৌতুকের মধ্যে সত্য ও বাস্তব ছাড়া তাঁর মুখ থেকে কোন অবাস্তব বা মিথ্যা কথা বের হতো না। তিনি লোকদেরকে খেলাধুলা বা নির্দোষ আনন্দফূর্তি করতেও নিষেধ করতেন না।

পরম প্রশংসিত চরিত্র

হযরত নবী করীম (সা) যখন বসতেন, তখন মানুষের মধ্যে এরূপ মিলেমিশে বসতেন যে, কোন নবাগত ব্যক্তি তাঁকে চিনতে পারতেন না এবং জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন হতো যে, নবী কোন্ ব্যক্তি। যে বস্তু খাইলে মুখ দুর্গন্ধযুক্ত হয়, তিনি তা পসন্দ করতেন না। তালিদার কাপড়ও পরিধান করতেন এবং ভাল কাপড় পাওয়া গেলেও তা ফেলে দিতেন না। তাঁর পোশাক সাদা কিন্তু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকত। প্রতিদিন কয়েক বার করে মিসওয়াক করতেন। তাঁর নিকট উপবেশনকারীরা সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তাঁর শরীর, পোশাক বা মুখ থেকে কখনো গন্ধ আসেনি। যেখানে মার্জনায় সংশোধন হতো, সেখানে তিনি মার্জনা করতেন। কিন্তু যেখানে শাস্তির প্রয়োজন হতো, সেখানে শাস্তিও প্রদান করতেন। কেননা, যে দুষ্টরা তাদের দুষ্টামি থেকে বিরত থাকে না, তাদেরকে শাস্তি না দেয়া মন্দের সাহায্য করার নামান্তর।

মুসলমানদের দান-খয়রাতকে তিনি মুসলমানদের মধ্যেই সীমিত রাখেন নি, খ্রিস্টান, ইয়াহূদী, মুশরিক সবার সাথে বদান্যতা দেখাতেন। তাঁর উপর যতবড় বিপদই আসুক না কেন তিনি তা সহজেই সহ্য করে নিতেন। কিন্তু অন্যের বিপদ দেখলে তিনি বিচলিত হয়ে পড়তেন। তিনি উপায়-উপকরণ গ্রহণ করতেন এবং ফলাফল আল্লাহ্‌র হাতে ছেড়ে দিতেন। ফলাফল প্রত্যাশা বিরোধী হতে পারে এমন আশংকায় তিনি ভীত হতেন না। তাঁর মধ্যে বিনয় ছিল, কিন্তু নীচতা ছিল না। ভীতি ছিল, কিন্তু রুক্ষতা ছিল না। বদান্যতা ছিল কিন্তু ব্যয়-বাহুল্য ছিল না। যে ব্যক্তি তাঁর সামনে হঠাৎ আগমন করতো, সে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়দ। আর যে কাছে এসে বসতো, সে ভক্ত বনে যেতো। সংক্রামক ব্যাধি থেকে নিরাপদ রাখতেন। সুস্থ ব্যক্তিদেরকে সাবধান থাকার নির্দেশ দিতেন। মূর্খ ডাক্তারকে ডাক্তারী করতে নিষেধ করতেন। হারাম বস্তুকে ওষুধরূপে ব্যবহার করা অপসন্দ করতেন। কোন ব্যাপারে যখন দু'টি পন্থা সামনে আসতো, তখন সহজ পন্থাটি অবলম্বন করতেন। যুদ্ধবন্দীদেরকে মেহমানদের মতো তত্ত্বাবধান করতেন। তীরন্দাযী, চাঁদমারি, ঘোড়াদৌড় প্রভৃতি পুরুষোচিত শারীরিক ব্যায়ামেও তিনি অংশ গ্রহণ করতেন।

হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত উপরে আলোচিত হলো। এতদ্‌সঙ্গে তাঁর খাতামুন-নাবিয়্যীন, রাহমাতুল্লিল আউয়ালীন ওয়ালা আখিরীন হওয়ার দলীল-প্রমাণও সন্নিবেশিত করার প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া, কুরআন করীমের সর্বশেষ কিতাব হওয়া, নূর ও হিদায়াত এবং পূর্ণাঙ্গ হিদায়াতনামা হওয়াও প্রমাণিত করা আবশ্যক ছিল। এই জরুরী বিষয় দু'টি হযরত নবী করীম (সা)-এর জীবনী লেখক প্রত্যেক ঐতিহাসিকই অবশ্য লিখতে চেয়ে থাকবেন। কিন্তু যেহেতু ইতিহাস, কালাম শাস্ত্র, দর্শন একেকটি স্বতন্ত্র বিষয়, তাই ঐতিহাসিকগণ এই বিষয়গুলোকে অন্যদের জন্য রেখে দিয়েছেন আর এটাই ছিল সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত। হুজ্জাতুল ইসলাম নামক গ্রন্থে আমি কুরআন ও নবুওয়াত সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছি। আগ্রহী পাঠক সেটি দেখে নিতে পারেন।

তৃতীয় অধ্যায়

খিলাফতে রাশিদা

খিলাফত ও খলীফা

খলীফা অর্থ স্থলবর্তী এবং খিলাফত অর্থ স্থলবর্তিতা। কিন্তু শরীআতের পরিভাষা ও ঐতিহাসিকদের পরিভাষায় খলীফা অর্থ বাদশাহ বা সম্রাটের কাছাকাছি। ইতিহাস ও ঘটনা পরম্পরা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত নবী করীম (সা)-এর পর প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফত বৃত্তান্ত আরম্ভ করার পূর্বে খলীফা বা খিলাফত শব্দের আলোচনায় নিজের ও পাঠকদের সময় ব্যয় করা কোন ঐতিহাসিকের পক্ষে জরুরী নয়। কিন্তু যেহেতু হযরত নবী করীম (সা)-এর স্থলবর্তিতার বিষয়টি একটি নৈতিক বিষয়ে পরিণত হয়ে দু'টি কওমের মধ্যে বিবাদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে আর এই বিবাদ ঐতিহাসিকগণ, ঐতিহাসিক বর্ণনাসমূহ, ঐতিহাসিক রচনাবলী ও ঐতিহাসিকদের বর্ণনাভঙ্গিতেও তার প্রভাব রেখেছে—যার ফলে একজন প্রতিবেদকের কাজ কতকটা কঠিন হয়ে পড়েছে—তাই ইতিহাস পাঠকারীদেরকে কোন রকম ভুল বোঝাবুঝির মধ্যে লিপ্ত হওয়া থেকে বাঁচানোর জন্য খিলাফত বিষয়টি সম্পর্কে আপন মতবাদ ও আকীদা-বিশ্বাস প্রথমেই বর্ণনা করে দেয়া এবং এরপর খিলাফতে রাশিদার বৃত্তান্ত বর্ণনা করা ইসলামের ইতিহাস লেখকদের পক্ষে আবশ্যক হয়ে পড়েছে।

কুরআনুল করীমে যেখানে যেখানে 'খলীফা' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তার পরে 'আল-আরদ' (পৃথিবী) শব্দও অবশ্য এসেছে। আর اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً (আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি) দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম অর্থাৎ বনী আদমকে পৃথিবীতে খলীফা বানিয়েছেন। বনী আদমের আশরাফুল মাখলুকাত হওয়া স্পষ্ট এবং মানব জাতির সৃষ্টিজগতের উপর শাসনকর্তা হওয়া পরিষ্কার ব্যাপার। তাই এই পার্থিব মানব-খিলাফত নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র খিলাফত এবং মানব জাতি হচ্ছে আল্লাহ্র খলীফা। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এক অনুপম সত্তা। তিনি সবার স্রষ্টা ও মালিক। সার্বিকভাবে কোন সৃষ্টির পক্ষে যে আশরাফুল মাখলুকাতই হোক না কেনো— তাঁর স্থলবর্তী অর্থাৎ খলীফা হওয়া সম্ভব নয়। তাই মানব জাতিকে আল্লাহ্র আংশিক খলীফা ভাবতে হবে। আর তা এ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না যে, যেভাবে আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টিজগতের প্রকৃত বাদশাহ ও হুকুমকর্তা, তেমনিভাবে পৃথিবীর বুকে কেবল মানব জাতিকেই অন্যান্য সমুদয় সৃষ্টির উপর বাহ্যত শাসক দৃষ্ট হয় এবং মানুষই প্রতিটি বস্তু ও পৃথিবীর প্রতিটি সৃষ্টি দ্বারা তার আনুগত্য করিয়ে নেয়। অতএব প্রমাণিত হলো আয়াতে–اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً -এর মধ্যে খলীফা অর্থ শাসনকর্তা, অন্য কিছু নয়। কুরআন করীমের এক স্থানে বলা হয়েছে—

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلٰئِفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ –

তিনিই তোমাদেরকে দুনিয়ার প্রতিনিধি করেছেন এবং তোমাদের কতককে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। (৬ : ১৬৫)

এখানে মানবের সেই সাধারণ খিলাফতের মধ্যে বিশেষত্ব বিদ্যমান। অর্থাৎ তোমাদের জাতিকে শাসক জাতি বানিয়েছেন। অন্যান্য মানব শ্রেণী তোমাদের অধীনস্থ এবং তোমরা শাসক জাতি। এখানেও সেই খলীফা শব্দই বিদ্যমান, যার অর্থ শাসক ছাড়া আর কিছু নয়। অন্যত্র বলা হয়েছে :

يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ ۔

হে দাউদ ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি। (৩৮ : ২৬)

এখানেও একজন ব্যক্তি অর্থাৎ হযরত দাউদ (আ)-এর রাজত্ব ও সাম্রাজ্যের উল্লেখ রয়েছে। এখানেও খলীফা শব্দটি বর্তমান যার অর্থ বাদশাহ বা সম্রাট ছাড়া আর কিছু নয়। হযরত দাউদ (আ)-এর এই রাজত্ব ও সাম্রাজ্য সম্পর্কে অন্যত্র বলা হয়েছে– وَشَدَدْنَا مُلْكَهٗ (আমি তার রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছিলাম। (৩৮ : ২০) অতঃপর বিশিষ্ট মুসলমানগণ বিশেষত সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে বলা হয়েছে :

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۔

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেনই, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে।" (২৪ : ৫৫)

অর্থাৎ যেমনিভাবে পৃথিবীতে আমি অন্যান্য লোককে শাসক বানিয়েছিলাম, তেমনিভাবে তোমাদের মধ্য থেকে (নবী (সা)-এর সম্বোধিত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে) যারা ঈমান আনবে এবং সৎকর্ম করবে, তাদেরকে পৃথিবীতে শাসন ক্ষমতা দান করা হবে।

খিলাফতের অধিকার

কুরআনুল করীম অধ্যয়ন করলে একথাও দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, পৃথিবীতে রাজত্ব ও সালতানাত তথা খিলাফত প্রদান করা কিংবা রাজত্ব ও সালতানাত কারো কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া আল্লাহ তা'আলারই বিশেষ কাজ। যদিও প্রত্যেক কাজের প্রকৃত কর্মকর্তা হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা, কিন্তু তিনি খিলাফত ও সালতানাত প্রদানকারীরূপে সর্বত্র নিজকে নিজেই জাহির করেছেন। এ কার্যকে রূপকভাবেও অন্য কারো সাথে সম্পৃক্ত করা হয় নি। এক স্থানে পরিষ্কারভাবে বলেছেন :

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ ۔

বলো, হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ! তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান করো এবং যার নিকট হতে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে লও (৩ : ২৬)।

এখন লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা কোন লোককে খিলাফত বা রাজত্ব দান করেন। অর্থাৎ যারা খিলাফত লাভ করেন, তাদের স্বতন্ত্র নিদর্শন ও বৈশিষ্ট্য কি ? আদম

বা বনী আদম যে পৃথিবীবাসীর উপর রাজত্ব লাভ করেছে, তার কারণ কুরআনুল করীম অধ্যয়ন করলে যা জানা যায় তা হচ্ছে, ইল্ম বা জ্ঞান। وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاۤءَ كُلَّهَا এবং তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন (২ : ৩১)। ফেরেশতারা রক্তপাত ও ফাসাদ সৃষ্টিকে আল্লাহ্‌র খিলাফত লাভের পরিপন্থী ভেবেছেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার গুণকীর্তন করাকে খিলাফতের অধিকার ও নিদর্শন সাব্যস্ত করেছেন। আমরা স্বচক্ষে অবলোকন করছি, মানব জাতি নিছক প্রশস্ত জ্ঞানের দরুনই অন্যসব সৃষ্ট বস্তুর উপর রাজত্ব লাভ করেছে। অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর চেয়ে মানুষ যদি অধিক জ্ঞানী না হয়, তবে বাতাসের একটু ধাক্কা, পানির একটি ঢেউ, গাছের একটি পাতা ও জড় পদার্থের একটি অণুও মানুষকে কাবু করতে পারে এবং তাকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করতে পারে। কিন্তু জ্ঞানের বদৌলতে বাঘ, হাতি, নদী, পাহাড়, বাতাস, আগুন, বিদ্যুৎ প্রভৃতি সবকিছুকেই মানুষের সেবা, আনুগত্য ও আরামদানের জন্য প্রস্তুত ও গোলামের মতো অনুগত দৃষ্ট হচ্ছে। কুরআনুল করীমের উপর চিন্তা করলে দেখা যায় তালুতের রাজত্বের উপর যখন লোকেরা আপত্তি তুললো, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীর মাধ্যমে আপত্তিকারীদের জবাব দিলেন যে,

اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهٗ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللّٰهُ يُؤْتِىْ مُلْكَهٗ مَنْ يَّشَاۤءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۰

আল্লাহ্ই তাকে তোমাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তিনি তাকে জ্ঞানে ও দেহে সমৃদ্ধ করেছেন। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা স্বীয় কর্তৃত্ব দান করেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়। (২ : ২৪৭)

হযরত দাঊদ (আ)-কে রাজত্ব ও খিলাফত দান করে আল্লাহ্ তা'আলা আদেশ করলেন যে, فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার করো এবং খেয়ালখুশীর অনুকরণ করো না। (৩৮ : ২৬)

আবার অন্যত্র বলেছেন :

وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا وَجَاۤءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ۰ ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلٰۤئِفَ فِى الْاَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ۰

তোমাদের পূর্বে বহু মানব গোষ্ঠীকে আমি ধ্বংস করেছি যখন তারা সীমা অতিক্রম করেছিল। স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ তাদের নিকট তাদের রাসূল এসেছিল, কিন্তু তারা বিশ্বাস করার জন্য প্রস্তুত ছিল না। এইভাবে অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়ে থাকি। অতঃপর আমি তাদের পর পৃথিবীতে তোমাদেরকে স্থলাভিষিক্ত করেছি, তোমরা কি প্রকার আচরণ করো, তা দেখার জন্য। (১০ : ১৩-১৪)

কুরআনুল করীমে এই ধরনের হাজারো আয়াতের সন্ধান পাওয়া যায় যাতে খলীফা অর্থ শাসক এবং খিলাফত অর্থ রাজত্ব। আর রাজত্ব ও রাজ্য শাসনের জন্য অপরিহার্য হচ্ছে জ্ঞান, সুবিচার, শক্তি, সংস্কার ও জনকল্যাণ, রাজা-বাদশাহ ও খলীফাদের জন্য যা সব সময় আবশ্যক ছিল এবং এসব শর্ত ও গুণ ছাড়া কোন বাদশাহ বা কোন সুলতান তার রাজত্ব ও সালতানাত টিকিয়ে রাখতে পারেন না। এই উত্তম গুণাবলী পয়গাম্বর ও রাসূলদের শিক্ষা

থেকেই লাভ করা যেতে পারে। কিন্তু এটা জরুরী নয় যে, প্রত্যেক রাসূল ও প্রত্যেক পয়গাম্বর অবশ্যই রাজা-বাদশাহও হবেন। খিলাফতের জন্য যদি নিছক ইবাদত ও আল্লাহ্ তা'আলার গুণ-কীর্তন করাই জরুরী হতো, তবে কেবল পয়গাম্বর বা ফেরেশতাকেই পৃথিবীতে শাসকরূপে দেখা যেতো এবং তাদের ছাড়া অন্য কেউ সালাতানাত বা রাজত্ব লাভ করতে পারতো না। কিন্তু পর্যবেক্ষণ তা সমর্থন করে না। অতএব, উপরোক্ত আলোচনা থেকে এই ফল বেরিয়ে আসলো যে, খিলাফত মূলত রাজত্ব ও সালতানাত ধৈর্য ছাড়া আর কিছু নয়। খলীফা বা রাজা-বাদশাহ আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা বানান এবং যখন কোন শাসক জাতি জাতিগতভাবে জুলুম-অত্যাচারে নেমে আসে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের নিকট থেকে রাজত্ব বা খিলাফত ছিনিয়ে নেন এবং অন্য যাকে ইচ্ছা তা দান করেন।

ইসলামী খিলাফত

মানব জাতির সমগ্র উন্নতি-উৎকর্ষ এবং মানুষের সমস্ত জ্ঞানগত ও চরিত্রগত শ্রেষ্ঠত্ব মূলত আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ)-এর শিক্ষাবলীরই ফল। হযরত আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ) পৃথিবীতে কখনো শিক্ষক হিসাবে আগমন করেছেন—যেমন, হযরত ঈসা (আ)। আবার কখনো বাদশাহ হিসাবে এসেছেন-যেমন হযরত দাউদ (আ)। বাদশাহ্ নবীর শরীআত শিক্ষক-নবীর শরীআতের তুলনায় অধিক পূর্ণাঙ্গ ও বৃহৎ। শিক্ষক-নবী তাঁর উম্মতের প্রত্যেক সদস্যের জীবনের জন্য একটি আদর্শ পেশ করেন। কিন্তু বাদশাহ নবী আদর্শ পেশ করা ছাড়াও ঐ আদর্শের উপর লোকদেরকে আমলকারী বানিয়ে তোলেন। অর্থাৎ তাঁর আনীত শারীআতকে প্রায়োগিক আইনের মর্যাদা দেয়া হয়। শিক্ষক-নবী যখন তাঁর মিশন শেষ করে এই দুনিয়া থেকে চলে যান, তখন নবুওয়াত কার্যে অন্য কেউ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না। কেননা, নবী আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম পেয়ে বান্দাদের নিকট খবর পৌঁছান। অর্থাৎ তাঁর উপর ওয়াহী নাযিল হয়। এখন এই কাজে কেউ যদি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন, তাহলে তার উপরও ওয়াহী নাযিল হওয়া উচিত এবং নবী যে কাজ করতেন, তিনিও তাই করবেন। এমতাবস্থায় খোদ ঐ স্থলাভিষিক্তকেও নবী বলা হবে এবং তার মধ্যে ও তার পূর্ববর্তীর মধ্যে কোন তফাৎ থাকবে না। প্রথম নবী দুনিয়া থেকে তখনই বিদায় হন, যখন নবুওয়াতের কার্য সমাপ্ত করে ফেলেন, তাই তাঁর জন্য কোন স্থলাভিষিক্ত অর্থাৎ অন্য কোন নবীর আদৌ প্রয়োজন হয় না। আর এ কারণেই সে নবী শুধু শিক্ষক-নবী ছিলেন, তাঁর কোন স্থলাভিষিক্ত ছিল বলে শোনা যায় না। কিন্তু বাদশাহ-নবী যেহেতু নবী হওয়া ছাড়া বাদশাহও হয়ে থাকেন, তাই তাঁর তিরোধানের পর নবুওয়াত কার্যে তাঁর কোন স্থলাভিষিক্ত হন না বটে, কিন্তু সালতানাত কার্যে অবশ্যই তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। বাদশাহ-নবীর স্থলাভিষিক্তও বাদশাহ্ হন এবং যেহেতু তিনি নবী কর্তৃক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও পূর্ণরূপে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন, সেহেতু তাঁর সালতানাত ও রাজত্বের নমুনা আরও উৎকৃষ্টতম হয়ে থাকে। এই স্থলাভিষিক্ত বা খলীফা নবীর আনীত শরীআতে তিল পরিমাণও পরিবর্তন সাধন করতে পারেন না। কেননা, নবুওয়াতকার্য অর্থাৎ শরীআতের কাজ তো নবীই শেষ করে গেছেন। রাসূলের এই খলীফার কাজ হচ্ছে কেবল আপন রাসূলের পূর্ণ তরীকা মতো রাজত্ব ও সালতানাতের কাজ চালানো। এ জন্যই তাঁর রাজত্ব ও সালতানাত অন্যান্য রাজত্ব থেকে অধিক শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট ও শ্রদ্ধার্হ বিবেচিত হয়। হযরত মুহাম্মদ (সা) যেহেতু পূর্ণ, পরিণত ও শেষ রাসূল ছিলেন এবং পরিপূর্ণ নির্দেশপত্র নিয়ে এসেছিলেন, সেহেতু তিনি বাদশাহ-নবী

ছিলেন। তাঁর রাজত্ব ও সালতানাত দুনিয়ার তামাম রাজত্ব ও সালতানাতের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত উৎকৃষ্টতম আদর্শ–যেমনিভাবে নবী করীম (সা)-এর জীবন কিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক মানুষের জন্য উৎকৃষ্টতম জীবনাদর্শ। নবী করীম (সা)-এর পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত বা খলীফা হওয়া প্রয়োজন ছিল। তাই সালতানাতের কার্যে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। এই স্থলাভিষিক্তদের মধ্যে যাঁরা সরাসরি নবী করীম (সা)-এর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও আশীর্বাদপ্রাপ্ত অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরাম ছিলেন, তাঁরা সালতানাতের খলীফা ছিলেন, তাঁরা সালতানাত ও রাজত্বকে নবী করীম (সা)-এর রাজত্ব ও সালতানাতের সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল রাখার অধিক যোগ্যতা ও দক্ষতা রাখতেন। সুতরাং তাঁদের রাজত্ব ও সালতানাত খিলাফাতে রাশিদা নামে অভিহিত হয়েছে। তারপর যতই নবী করীম (সা) থেকে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে খিলাফতের অবস্থা ও মর্যাদার মধ্যে ততই তারতম্য ঘটেছে।

খিলাফত প্রশ্নে মতানৈক্য

মুসলমানদের মধ্যে কোন কোন লোক এমনও সৃষ্টি হয়েছে, যারা নবী করীম (সা)-এর খলীফাগণ অর্থাৎ স্থলাভিষিক্তগণ সম্পর্কে উদ্ভট উদ্ভট আপত্তি উত্থাপন করেছে। কাউকে অপরাধী ও জালিম এবং কাউকে নিষ্পাপ ও মজলুম সাব্যস্ত করেছে। অথচ খিলাফত সম্পর্কে কোন মানুষের কোন অভিযোগ বা আপত্তি উত্থাপন করার কোন অধিকার নেই। আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর রাজত্ব ও খিলাফতকে কাউকে দান করা বা কারো নিকট থেকে ছিনিয়ে নেয়ার কাজটি কেবল নিজের সাথেই সম্পৃক্ত রেখেছেন। বাহ্যিক বা রূপকভাবেও খিলাফত দান বা তা ছিনিয়ে নেয়ার কাজকে কোন মানুষের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করেননি। আর এ কারণেই স্বয়ং নবী করীম (সা)-ও খলীফার নির্বাচন ও নিযুক্তি সম্পর্কে কোন নির্দেশ দান করেননি। কুরআনুল করীম বলে দিয়েছে খলীফাকে কি কাজ করতে হবে, কোন্ কাজ থেকে বিরত ও ভীত থাকতে হবে। কোন সৎকর্ম খিলাফতের উপযুক্ত বানায় তাও বলে দিয়েছে। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর খলীফা অর্থাৎ তাঁর পরে মুসলমানদের শাসক কে হবে–একথা বলেনি। সাওম, সালাত, হাজ্জ, যাকাত এবং বান্দার হক ও আল্লাহ্র হকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় ও ইসলামী শরীআত স্পষ্ট ও প্রমাণসিদ্ধরূপে বর্ণনা করেছে। কিন্তু নবী করীম (সা)-এর স্থলাভিষিক্ত নির্ধারণ করেনি। আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা খিলাফত দান করেন এবং স্বয়ং তিনিই খিলাফতের উপযুক্ত ব্যক্তিকে তাঁর খিলাফত লাভের উপকরণ যুগিয়ে দেন–এর মধ্যে এই গূঢ় রহস্যই নিহিত ছিল। খিলাফত লাভের কাজ যেহেতু মানবীয় চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও মানবীয় ফন্দি-কৌশলের উর্ধ্বে, তাই মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম খিলাফতের উপযুক্ত কে ছিলেন এবং তারপর কে ছিলেন, আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তাঁর কার্য দ্বারা তা বাতলে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে লড়াই-ঝগড়া করা ও প্রশ্ন তোলা একেবারে অবান্তর এবং আল্লাহ্ তা'আলার বিরুদ্ধে অভিযোগ করার নামান্তর। নবী করীম (সা)-এর পর কার খলীফা হওয়া উচিত ছিল ? তার জবাব পরিষ্কার : যিনি খলীফা হয়েছেন, তাঁরই। একথা বলা ঠিক নয় যে, যিনি খলীফা হয়েছেন, তিনি খলীফা হওয়ার উপযুক্ত ছিলেন না। অন্য দৃষ্টিকোণে একথা বলার অনিবার্য পরিণতি দাঁড়ায় এই যে, খলীফা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বানাননি। অর্থাৎ আল্লাহ যাকে খলীফা বানাতে চেয়েছিলেন, তাকে বানাতে পারেন নি এবং মানবীয় ফন্দি-কৌশলের কাছে (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ্ তা'আলা পরাজিত হয়েছেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফতের বিরুদ্ধে যারা আপত্তি তুলেছে,

তাদের অবস্থা হচ্ছে সেই ব্যক্তির মতো, যে বিচারকের আদালত থেকে নিজের প্রত্যাশা বিরোধী রায় শ্রবণ করে আদালত থেকে বের হয়ে আসে এবং বাইরে এসে বিচারককে গালাগাল করে। কিন্তু বিচারক তবু বিচারকই থাকেন এবং এই অপরাধী অপরাধীই থাকে। বিচারকের রায় এই অসন্তুষ্ট ব্যক্তির অসন্তোষ রদ করতে পারে না। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা খিলাফত সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন এবং যাকে খলীফা বানাতে চেয়েছেন, তাকেই খলীফা বানিয়েছেন। এখন আল্লাহ্‌র এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যদি কেউ অসন্তুষ্ট হয়, তবে হোক।

وَاللّٰهُ يُؤْتِىْ مُلْكَه مَنْ يَّشَاءُ

এবং আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন।

দীনী খিলাফত ও জাগতিক সালতানাতের পার্থক্য

খিলাফত সম্পর্কে উপরে যা উল্লিখিত হয়েছে তাতে এ সন্দেহ হতে পারে যে, খিলাফত বলা হয় নিছক রাজত্ব ও সালতানাতকে। এই হিসাবে প্রত্যেক রাজা-বাদশাহকেই খলীফা বলা যেতে পারে। বলা যেতে পারে, ধর্মের সাথে খিলাফতের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু একথা জ্ঞাত থাকা উচিত যে, মুসলমানদের মধ্যে খলীফা কেবল সেই রাজা-বাদশাহ বা শাসককেই বলা যেতে পারে, যিনি হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ও সালতানাতের উত্তরাধিকারী এবং সালতানাতে তাঁর স্থলাভিষিক্ত রূপে দীনী কার্যাবলী অর্থাৎ সালাত, ফাতওয়া, কাযা, আদালত, ইহতিসাব, জিহাদ প্রভৃতির বন্দোবস্ত ও শরীআতের আহকাম পালনের জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করেন। ইসলামী শরীআত ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় কল্যাণের বাহক। একজন অমুসলিম ও ইহলৌকিক রাজা-বাদশাহ্‌র দ্বারা মানব জাতির যে সেবা ও জনকল্যাণমূলক কর্ম সাধিত হয়, তার চেয়ে অনেক উত্তমভাবে এ কাজটি সমাধা হয় খলীফা অর্থাৎ রাসূলের আদর্শ অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালনাকারীর দ্বারা। ইসলামী শরীআত যেহেতু তার অনুসারীকে প্রতিটি পার্থিব সৌন্দর্যের অধিকারী করে তোলে, তাই যে রাষ্ট্র ইসলামী শরীআত অনুযায়ী পরিচালিত হবে, সেটিই মানব জাতির জন্য অধিক কল্যাণকর ও উত্তম বলে বিবেচিত হবে। ইসলামী শরীআত এও কামনা করে যে, মুসলিম জনগণ সেই রাষ্ট্র ও সালতানাতের অধীনেই জীবন যাপন করবে যা ইসলামী শরীআত অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হয়। অতএব, ইসলামী শরীআতের সাথে খিলাফতের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। ইসলামের সাথে খিলাফতের কোন সম্পর্ক নেই এ কথা সম্পূর্ণ ভুল। যে রাষ্ট্র ও সালতানাত শরীআতী আহকাম অনুযায়ী কায়েম হয়, আর যে রাষ্ট্র ও সালতানাত জোরজবরদস্তি তথা মানবীয় কলা-কৌশলের ভিত্তিতে স্থাপিত হয়, তা কখনো মানব জাতির জন্য ততটা কল্যাণকর ও মঙ্গলজনক প্রমাণিত হতে পারে না, যতটা শরীআতী কানুন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র মানব জাতির জন্য কল্যাণের কারণ হয়। শরীআতী কানুন অনুযায়ী যে রাষ্ট্র দুনিয়ায় কায়েম হয়েছিল, তা ছিল নবী করীম (সা) ও তাঁর সাহাবায়ে কিরামের রাষ্ট্র। দুনিয়ায় এর পূর্বে কিংবা এর পর এমন কোন রাষ্ট্র দেখা যায় না, যা নবী করীম (সা)-এর আসহাবদের রাষ্ট্র থেকে উত্তম এবং মানব জাতির জন্য কল্যাণকর প্রমাণিত করা যেতে পারে। সেই হুকুমাত ও সালতানাতেরই নাম খিলাফতে রাশিদা। তারপর যদিও খিলাফতের নামে ইসলামী রাষ্ট্রের ধারা আজ অবধি অব্যাহত রয়েছে, কিন্তু তাতে অল্প বিস্তর পার্থিব রাজা-বাদশাহদের রীতি-নীতি যোগ হতে থাকে এবং সেই হারেই শরীআতী রাষ্ট্র ও শরীআতী

কানুনের রূপ পাল্টে যেতে থাকে।

কোন জাতি, গোত্র বা পরিবারের সাথে খিলাফতের সম্পর্ক

কুরআনুল করীমে পরিষ্কারভাবে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন :

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ.

হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারো। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহ্র নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে অধিক মুত্তাকী। আল্লাহ্ সবকিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন। (১৫ : ৯)

ইসলাম দুনিয়ায় মানুষের খান্দানী অহমিকা এবং গোত্রীয় শ্রেষ্ঠত্ব ও আভিজাত্য দূর করে একই জাতি বানাতে চেয়েছে। اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ (মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই) বলে সমস্ত ভ্রাতৃসংঘকে একই ভ্রাতৃসংঘ এবং সমস্ত জাতিকে একই জাতি বানিয়ে দিয়েছে। আর এ জাতির নাম হচ্ছে মুসলমান বা মু'মিন জাতি।

সারা দুনিয়ায় জাতি গোষ্ঠী ইসলামী শিক্ষা অনুসারে কেবল দু'টিই হতে পারে : এক, মু'মিন ও মুসলিম, দ্বিতীয় কাফির ও মুশরিক। তাওহীদের গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করে জাতিগত বিভিন্নতা তাৎপর্যহীন হয়ে যায়। জাতি ও গোত্র-গোষ্ঠীর বিভিন্নতা দ্বারা আমাদের পরস্পরের মধ্যে চিনা-পরিচয়ের সুবিধা হয়–এ ছাড়া এর ভিন্ন কোন তাৎপর্য নেই। ইযযত, সম্মান, রাষ্ট্রক্ষমতা ও শ্রেষ্ঠত্ব আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সর্বদা ইযযত-সম্মানের যোগ্য লোকদেরই প্রদত্ত হয়ে থাকে। সে যে কোন গোত্র, গোষ্ঠী ও জাতিরই হোক না কেন। সম্মানের অধিকারী হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে তাকওয়া ও ঈমান। রাষ্ট্র-ক্ষমতা ও খিলাফতের জন্যও আল্লাহ্ তা'আলা জ্ঞান, স্বাস্থ্য, দৈহিক শক্তি (কেননা, সুস্থ জ্ঞান সর্বদা সুস্থ শরীরেই থাকে), তাকওয়া, সুবিচার, সংস্কার প্রভৃতি শর্ত জরুরী সাব্যস্ত করেছেন। কোন বিশেষ জাতি-গোষ্ঠীর শর্ত কখনো আরোপ করেননি। ইসলাম আনসারকে মুহাজিরদের ভাই বানিয়েছে। ইসলাম আবূ জাহেলের মতো কুরায়শকে মদীনাবাসী যুবকদের দ্বারা নিহত করিয়েছে। ইসলাম হাবশী বিলালকে আরব অভিজাতদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে। ইসলাম উসামা ইব্ন যায়দকে উমর ফারূক (রা)-এর নেতা ও অনুসরণীয় বানিয়েছে। ইসলাম বাদশাহ ও গোলামকে পাশাপাশি এক কাতারে দাঁড় করিয়েছে।

ইসলাম নবী করীম (সা)-এর দ্বারা ঘোষণা করিয়েছে যে, ফাতিমা বিন্ত রাসূলুল্লাহ (সা) দ্বারাও যদি চৌর্যবৃত্তি সংঘটিত হতো, তবে তাঁর হাতও তেমনিভাবে কাটা হতো, যেমনিভাবে অন্য কোন নারীর। ইসলাম হযরত নবী করীম (সা)-এর দ্বারা ঘোষণা করিয়েছে যে, জনমণ্ডলী! কোন সাধারণ হাবশী গোলামও যদি তোমাদের শাসক বা খলীফা নিযুক্ত হয়, তবে তোমরা তার আনুগত্য করবে। ইসলামই হযরত উমর ফরূক (রা)-এর দ্বারা তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্তগুলোতে বলিয়েছে যে, আজ যদি আবূ হুযায়ফার গোলাম সালিম জীবিত থাকতো, তবে আমি তাকে আমার স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করতাম। মোটকথা, ইসলাম গোত্রীয় ও বংশীয় অহমিকার প্রতিমাকে টুকরো টুকরো ও চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে। এটা নিতান্তই বিরাট ও

মূল্যবান খিদমত ছিল যা ইসলাম মানব জাতির জন্য আঞ্জাম দিয়েছে। আজ ইসলাম দুনিয়ার সমস্ত ধর্মমত ও আইন-কানুনের কাছে এই মর্মে গর্ব করতে পারে যে, তার কোনটি থেকেই খান্দানী অহমিকার ভয়ানক প্রতিমা তার স্থান থেকে হঠানো হয়নি। কিন্তু ইসলাম তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে তার ধূলি বাতাসে উড়িয়ে দিয়েছে।

কি আশ্চর্যের ব্যাপার! আজ ইসলাম ও ইসলামী আইন অনুসরণের দাবীদার কিছু মুসলমানকে বলতে শোনা যাচ্ছে যে, ইসলাম নির্দেশ দিয়েছিল এবং হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নির্দেশ ও কামনা ছিল খিলাফত কেবল কুরায়শ বংশ বা বনূ হাশিম গোত্র কিংবা হযরত আলী ও আলীর সন্তানদের মধ্যে সীমিত থাকবে, অপর অন্য কোন গোত্রের কোন ব্যক্তি কোন অবস্থায়ই খিলাফতের হকদার হতে পারে না। এমন যদি হতো, তবে সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনুল মজীদে তা পরিষ্কারভাবে বলে দিতেন এবং নবী (সা) সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট আহকাম ঘোষণা করে যেতেন। যদি বলা হয় যে, কুরআন মজীদে আল্লাহ্ এ সম্পর্কীয় আহকাম নাযিল করেছিলেন এবং সে আহকাম চালাকী করে খিলাফত ছিনতাইকারীরা গোপন করে ফেলেছে, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা মিথ্যাবাদী (নাউযুবিল্লাহ) প্রতিপন্ন হন। যিনি ওয়াদা করেছিলেন যে,

انَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَانَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ ـ

আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই তার সংরক্ষক। (১৫ : ৯)

আর নাউযুবিল্লাহ! নবী করীম (সা)ও ফরয প্রচারকার্যকে কখনো পূর্ণভাবে আঞ্জাম দেননি। বিদায় হজ্জের ভাষণেও স্বীয় স্থলাভিষিক্ত ও খিলাফত বনূ হাশিমের মধ্যে সীমিত থাকা সম্পর্কে কিছু বলেননি। অথচ এই ভাষণ শেষে তিনি সোয়া লাখ মানুষের সমাবেশে স্বীয় প্রচারকার্য পরিপূর্ণ করে দেয়ার ঘোষণা করেন। উপস্থিত জনতার কাছে তার সত্যায়ন চান। তারপর অন্তিমকালে তিনি প্রয়োজনীয় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয় সম্পর্কেও ওসীয়ত করেছেন। কারো কাছে এক দিরহাম বা এক দীনার ঋণী থাকলেও তিনি তা পরিশোধ করেন। কিন্তু খিলাফত সম্পর্কে এই বিরাট খিলাফত-ঋণটি পরিশোধ করেননি।

বস্তুত তিনি জানতেন যে, খলীফা বানানোর কাজ হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার এবং এ কাজটির জন্য তিনি নবীকে আদৌ কষ্ট দেননি। হাঁ, নবী করীম (সা) আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে জ্ঞান লাভ করে এটা অবশ্যই জ্ঞাত হয়েছিলেন যে, আমার পর আল্লাহ্ তা'আলা কাকে তাঁর খলীফা বানাবেন। তাই তিনি তাঁর অন্তিম রোগাক্রান্ত অবস্থায় হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে সালাতের ইমামতির জন্য স্বীয় স্থলাভিষিক্ত বানান এবং ওসীয়ত প্রসঙ্গে মুহাজিরদের বলেন যে, তোমরা আনসারদের সাথে সৎ ব্যবহার করবে। মুহাজিরদের প্রতি আনসারদের জন্য এইভাবে সুপারিশ করাই প্রমাণ করে যে, তিনি অবগত হয়েছিলেন তাঁর পরে তাঁর খিলাফত আনসাররা নয়, বরং মুহাজিররা লাভ করবে। তিনি এও বলেন যে, الخلافة بعدى ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك (আমার পরে ত্রিশ বছর খিলাফত, তারপর রাজতন্ত্র।) তারপর তিনি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে জ্ঞান লাভ করে এও অবগত হন যে, الائمة من قريش (ইমাম কুরায়শের মধ্য থেকে হবে)। এসব ছিল তাঁর পরবর্তী ঘটনাবলী সম্পর্কে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী, নির্দেশ ছিল না। এখন কেউ যদি الخلافة بعدى ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك (আমার পরে খিলাফত থাকবে ত্রিশ বছর। তারপর রাজতন্ত্র চালু হবে।)-কে নির্দেশ সাব্যস্ত করে, তবে সেটা

হবে একটি মস্ত প্রতারণা। প্রকৃত সত্য নয়। الائمة من قريش-এর অবস্থাও তদ্রূপ। নিঃসন্দেহে সেখানে কুরায়শের মধ্যেই সমুন্নত মেধা ও সমুন্নত জ্ঞান ও তাকওয়া বিদ্যমান ছিল এবং এই সব সৎ গুণের মধ্যেই নিহিত ছিল অন্যদের উপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে খিলাফতের জন্য নির্বাচিত করেন। তারপর যখন তাদের সেই অবস্থা আর থাকলো না, তখন অন্য লোকদের মধ্য থেকে যাকে খিলাফত পদের জন্য উত্তম মনে হতো আল্লাহ্ তা'আলা তাকে খিলাফত ও রাষ্ট্র-ক্ষমতা দান করেন। সে যা হোক, খিলাফত বা রাষ্ট্র ও সালতানাত কোন বিশেষ খান্দানের সম্পত্তি নয়, এটি আল্লাহ তা'আলার একটি দান। এটি সচরাচর তারাই লাভ করে, যারা নিজেদেরকে তার উপযুক্ত প্রমাণ করতে পারে। আবার তারা যখন অযোগ্য ও অনুপযুক্ত হয়ে যায়, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের নিকট থেকে ঐ দান ছিনিয়ে নেন এবং অন্যদেরকে দান করেন। আর এটাই আল্লাহ্র কাছে আমাদের প্রত্যাশা করা উচিত ছিল।

খিলাফত ও পীর-মুরীদী

কেউ কেউ মনে করেন, সূরা নূরের খিলাফত দান সংক্রান্ত আয়াতে যে খিলাফতের ওয়াদা আল্লাহ্ তা'আলা করেছেন, তার অর্থ হচ্ছে পীর-মুরীদীর সিলসিলা। আমার মতে, এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। পীরও তাঁর মুরীদদের শাসক। কিন্তু এই শাসন ও খিলাফতের ফরমান জারির মধ্যে আসমান-যমীন তফাৎ। কোন পীরকে পৃথিবীর শাসক ও পৃথিবীর বাদশাহ কখনো বলা যেতে পারে না। কুরআনুল করীম খলীফার অর্থ বোঝানোর জন্য হযরত আদম (আ) ও হযরত দাঊদ (আ)-এর নাম উচ্চারণ করে এবং তাদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহের সুযোগই অবশিষ্ট রাখেনি। আমাদেরকে সর্বাবস্থায় কুরআনুল করীমের পরিভাষাই গ্রহণ করতে হবে। কুরআনুল করীম তার শব্দের অর্থ সে নিজেই বলে দেয়।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীকী (রা)

নাম ও নসব

তাঁর নাম আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ কুহাফা ইব্ন আমির ইব্ন আমর ইব্ন কা'ব ইব্ন সা'দ ইব্ন তামীম ইব্ন মুররাহ ইব্ন কা'ব ইব্ন লুওয়াঈ ইব্ন গালিব ইব্ন ফিহ্র ইব্ন মালিক ইব্ন নাদর ইব্ন কিনানা। মুররাহ পর্যন্ত গিয়ে তাঁর নসবনামা নবী করীম (সা)-এর নসবের সাথে মিলে যায়। পূর্বপুরুষের দিক থেকে তিনি একই স্তরের ছিলেন। কেননা, দুই দিক থেকেই মুররাহ পর্যন্ত ছয় ছয় পুরুষের দূরত্ব ছিল। তাঁর মাতার নাম সালমা বিন্ত সাকার ইব্ন কা'ব ইব্ন সা'দ। ইনি আবূ কুহাফার চাচাত বোন ছিলেন এবং উম্মুল খায়র নামে পরিচিত ছিলেন। হযরত আবূ বকর (রা)-এর পিতা আবূ কুহাফা (রা)-এর নাম উসমান। জাহিলী যুগে তিনি আবদুল কা'বা নামে পরিচিত ছিলেন। হযরত নবী করীম (সা) তাঁর নাম রাখেন আবদুল্লাহ্। তাঁর এক নাম আতীকও ছিল। কিন্তু জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহমাতুল্লাহ আলায়হি তারীখুল খুলাফায় লিখেন, জমহূর উলামা এ ব্যাপারে একমত যে, আতীক তাঁর নাম নয়, বরং লকব ছিল। কেননা, হাদীস শরীফ মতে তিনি জাহান্নামের আগুন থেকে আতীক বা মুক্ত ছিলেন। কেউ কেউ বলেন, সৌন্দর্যের কারণে তিনি আতীক নামে অভিহিত হন। কারো কারো মতে, যেহেতু তাঁর নসবনামায় দূষণীয় কোন বস্তু নেই, তাই তিনি আতীক নামে পরিচিত।

তাঁর লকব ছিল সিদ্দীক। এ ব্যাপারে সকল উম্মতে মুহাম্মদী একমত। কেননা, তিনি নির্ভীকভাবে হযরত নবী করীম (সা)-কে নির্দ্বিধায় সমর্থন করেন এবং নিজেকে সত্যবাদী হিসাবে চিহ্নিত করেন। মি'রাজ সম্পর্কেও তিনি কাফিরদের মুকাবিলায় অনমনীয়তা প্রদর্শন করেন এবং হযরত নবী করীম (সা)-এর উক্তিসমূহ সমর্থন করেন। তিনি হযরত নবী করীম (সা) থেকে দু'বছর দু'মাস ছোট ছিলেন। কিন্তু কেউ কেউ বলেছেন, তিনি হযরত নবী করীম (সা) থেকে বয়সে বড় ছিলেন। তিনি মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই লালিত-পালিত হন। ব্যবসায় উপলক্ষে তিনি বাইরেও গমন করতেন। হযরত নবী করীম (সা)-এর সাথে তিনি মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন এবং মদীনায়ই তিনি ইনতিকাল করেন।

জাহিলিয়াত যুগ

জাহিলী যুগে কুরায়শের আভিজাত্য ও নেতৃত্ব ছিল দশটি পরিবারের মধ্যে সীমিত ও বিভক্ত। ঐ সম্ভ্রান্ত নেতৃ-পরিবারগুলো হচ্ছে এই :

(১) হাশিম, (২) উমাইয়া, (৩) নাওফিল, (৪) আবদুদ দার, (৫) আসাদ, (৬) তামীম, (৭) মাখযূম, (৮) আদী, (৯) আজ্জ, (১০) সাহ্ম। এদের মধ্যে বনূ হাশিমের দায়িত্ব ছিল সিকায়া-অর্থাৎ হাজীদেরকে পানি পান করানো। বনূ নাওফিলের দায়িত্ব ছিল নিঃসম্বল হাজীদেরকে অন্নদান ও পথ খরচা দেওয়া। বনূ আবদু'দ্-দার এর দায়িত্বে কা'বাগৃহের চাবি ও পাহারাদারি, বনূ আসাদের দায়িত্বে পরামর্শ ও পরামর্শ সভার বন্দোবস্ত করা, বনূ তামীম–

রক্তপণ ও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা, বনূ আদী-দৌত্যকার্য ও কওমী আভিজাত্য রক্ষা, বনূ 'আজ্জ-ভাগ্য-তীর সংরক্ষণ, মাখযূম-প্রতিমার নৈবেদ্য সংরক্ষণ। বনূ তামীমের মধ্যে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) রক্তপণ ও ক্ষতিপূরণের ফায়সালা করতেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) যা মেনে নিতেন, গোটা কুরায়শ বংশ তাই মেনে নিতো। কেউ যদি অন্য কিছু স্বীকার করতো, তবে কেউই তা সমর্থন করতো না। অনুরূপভাবে বনূ আদীর মধ্যে হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব দৌত্যকার্য আঞ্জাম দিতেন। যুদ্ধের ময়দানেও তিনি দূত হিসাবে গমন করতেন এবং মুকাবিলার মধ্যে কওমী আভিজাত্য বর্ণনা করতেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) কেবল তাঁর গোত্রের সরদার ও কুরায়শী দশ নেতার অন্যতমই ছিলেন না, তিনি বিত্ত-বৈভবের দিক থেকেও বিরাট ঐশ্বর্যশালী ও প্রতাপশালী ছিলেন। তিনি কুরায়শদের মধ্যে অত্যন্ত দয়ালু ও দানশীল ছিলেন। বিপদে ধৈর্যশীল ও অতিথিপরায়ণ ছিলেন। মানুষ তাদের সমস্যার ব্যাপারে তাঁর নিকট এসে পরামর্শ গ্রহণ করতো এবং তাঁকে একজন উঁচুদরের সুবিচারক মনে করতো। আর এ কারণেই তিনি যখন মক্কা থেকে বিদায় হয়েছিলেন, তখন ইব্নুদ-দাগিনা তাঁকে পথিমধ্য থেকে ফিরিয়ে এনেছিলেন, পূর্বেই সে কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বংশাবলী ও আরব তথ্য বিশারদ ছিলেন। প্রকৃতিগতভাবেই তিনি অন্যায় অপকর্ম ও নোংরামি থেকে দূরে থাকতেন। জাহিলী যুগেও তিনি কোন প্রকার মদ্যপান করেন নাই। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে কেউ জিজ্ঞেস করলো, আপনি কি কখনো শরাব পান করেছেন ? তিনি উত্তরে বললেন, নাউযুবিল্লাহ, কখ্খনো নয়। সে জিজ্ঞেস করলো, কেন পান করেননি ? তিনি উত্তর দিলেন, আমার শরীর থেকে গন্ধ আসুক এবং মনুষ্যত্ব অপসৃত হোক, তা আমি চাইনি। একথা নবী করীম (সা)-এর মজলিসে উত্থাপিত হলে তিনি দু'বার বলেন, আবূ বকর সত্য বলেছেন।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) সুঠাম, সুডৌল, ভদ্র, সত্যনিষ্ঠ ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। এ কারণেই নবী করীম (সা) তাঁকে যখন ইসলামের দাওয়াত দিলেন, তখন তিনি এতটুকু দ্বিধা-দ্বন্দ্ব করেননি। তৎক্ষণাৎ তা গ্রহণ করেন এবং সাহায্য-সহায়তার অঙ্গীকার করেন। সে অঙ্গীকার খুব সৌকর্যের সাথে পালন করেও দেখান। হযরত নবী করীম (সা) বলেন, আবূ বকর সিদ্দীককে আমি ইসলামের দাওয়াত দিলে সে তা গ্রহণ করতে কোন কুণ্ঠাবোধ করেনি। একবার হযরত নবী করীম (সা) বলেন, নবী ছাড়া আবূ বকরের চেয়ে আর কোন ভাল ব্যক্তির উপর সূর্যোদয় ঘটেনি। তিনি যেহেতু কুরায়শদের মধ্যে সর্বজনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন, তাই তাঁর প্রচারণায় বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত উসমান ইব্ন আফফান (রা), হযরত তাল্হা ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) ও হযরত সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা) প্রমুখ ব্যক্তিত্বও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

ইসলামী যুগে

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) সর্বপ্রথম নবী করীম (সা)-এর উপর ঈমান আনেন। যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম নবী করীম (সা)-এর সাথে সালাত আদায় করেন, তিনি ছিলেন আবূ বকর সিদ্দীক (রা)। মায়মুন ইব্ন মিহ্রান-এর নিকট কেউ প্রশ্ন করলো যে, আপনার মতে আলী (রা) উৎকৃষ্ট, না আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ? একথা শুনে তিনি ভীষণ রাগান্বিত হলেন এবং বললেন, আমার এটা জানা ছিল না যে, আমি এই দু'জনের মধ্যে তুলনা করার সময় পর্যন্ত

বেঁচে থাকবো। আরে! এ দু'জন তো ছিলেন ইসলামের মাথা স্বরূপ। পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন এবং বালকদের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত আলী (রা) ঈমান আনেন। আর মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন হযরত খাদীজাতুল-কুবরা (রা)।

আলিম সমাজ এ ব্যাপারে একমত যে, নবী করীম (সা)-এর অনুমতি ছাড়া হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) কখনো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গ ত্যাগ করেননি। তিনি তাঁর পরিবার-পরিজন ছেড়ে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের মুহাব্বতে হিজরতের গুহায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহচর্য গ্রহণ করেন। যুদ্ধের সময় তাঁর সাথে ছিলেন। বদরের যুদ্ধে নবী করীম (সা) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ও হযরত আলী (রা)-কে বলেন, তোমাদের একজনের সাথে আছেন জিবরাঈল এবং আরেকজনের সাথে আছেন মীকাঈল। বদরের যুদ্ধে আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর (রা) মুশরিকদের লশকরে শামিল ছিলেন। তিনি মুসলমান হওয়ার পর তাঁর পিতা আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে বললেন, বদরের দিন আপনি কয়েকবার আমার তীরের আওতায় এসেছিলেন, কিন্তু আমার হাত গুটিয়ে নিয়েছিলাম। হযরত আবূ বকর (রা) বললেন, আমি যদি এরূপ সুযোগ পেতাম, তবে আমি তোমাকে লক্ষ্যস্থল না বানিয়ে ছাড়তাম না।

বীরত্ব

হযরত আলী (রা) একবার লোকদের প্রশ্ন করলেন, তোমাদের মতে বীরশ্রেষ্ঠ কোন্ ব্যক্তি? সবাই জবাব দিলো–আপনি। তিনি বললেন, আমি সর্বদা আমার সমপর্যায়ের জুড়ির সাথে লড়াই করি। এটা কোন বীরত্ব নয়। তোমরা বীরশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির নাম বলো। সবাই বললো, আমরা জানি না। হযরত আলী (রা) বললেন, বীরশ্রেষ্ঠ হলেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)। বদর দিবসে আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য একটি ছাউনি বানিয়েছিলাম। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হযরত নবী করীম (সা)-এর কাছে কে থাকবে? তাঁর উপর মুশরিকদের হামলা কে প্রতিহত করবে? আল্লাহর কসম! আমাদের মধ্যে কেউ সাহস করলো না। কিন্তু আবূ বকর সিদ্দীক উলঙ্গ তরবারি নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং কাউকে তাঁর কাছে ঘেঁষতে দিলেন না। যে ব্যক্তিই নবী করীম (সা)-এর উপর হামলা করেছে আবূ বকর সিদ্দীক তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।

একবার মক্কা মুআয্যামায় মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে হেঁচড়াতে লাগলো এবং বলতে লাগলো যে, তুমিই হচ্ছো সেই ব্যক্তি, যে এক খোদার প্রবক্তা। আল্লাহ্র কসম! কাফিরদের মুকাবিলা করার সাহস কারো হলো না। কিন্তু আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এগিয়ে এলেন। তিনি কাফিরদের মারতে মারতে হটিয়ে দিচ্ছিলেন এবং বলছিলেন যে, হায় আফসোস! তোমরা এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করতে চাচ্ছ, যিনি বলছেন যে, আমার আল্লাহ্ এক ও একক। একথা বলে হযরত আলী (রা) কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, এখন তোমরা বলো, ফিরাউনের স্ত্রী উত্তম মু'মিন, না আবূ বকর (রা)? কিন্তু লোকেরা যখন কোন উত্তর দিলো না, তখন তিনি বললেন, তোমরা জবাব দিচ্ছ না কেন? আল্লাহ্র কসম! আবূ বকরের এক মুহূর্ত তার হাযার মুহূর্ত অপেক্ষা উত্তম। তিনি তো ঈমান গোপন করে রেখেছিলেন, কিন্তু আবূ বকর (রা) ঈমান প্রকাশ করে দিয়েছেন।

দানশীলতা

তিনি সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে সবচেয়ে বেশী দানশীল ছিলেন। وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِىْ يُؤْتِىْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى আর তা (জাহান্নাম) থেকে বহুদূরে রাখা হবে পরম মুত্তাকীকে, যে স্বীয় সম্পদ দান করে আত্মশুদ্ধির জন্য (৯২ : ১৭-১৮)।

এ আয়াতের শানে নুযুল হচ্ছেন তিনিই। তাই হযরত নবী করীম (সা) বলেন, হযরত আবূ বকর সিদ্দীকের সম্পদ দ্বারা আমার যতখানি উপকার হয়েছে, অন্য কারো সম্পদ দ্বারা ততখানি হয়নি। একথা শুনে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (সা) ক্রন্দন করে বললেন, আমি আর আমার সম্পদ বলতে কিছুই নেই–সব কিছুই আপনার বদৌলতে। অন্য এক হাদীসে আছে হযরত নবী করীম (সা) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর সম্পদ নিজের সম্পদের মতোই ব্যবহার করতেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) যেদিন ইসলাম গ্রহণ করেন, সেদিন তাঁর নিকট চল্লিশ হাযার দিরহাম ছিল। তিনি তাঁর সবটাই হযরত নবী করীম (সা)-এর জন্য ব্যয় করেন। একদিন হযরত উমর ফারূক (রা) জায়শে উসরত বা তাবূক যুদ্ধের চাঁদার কথা উল্লেখ করে বলেন, হযরত নবী করীম (সা) যখন আমাদেরকে চাঁদা দান করার আদেশ করলেন, তখন আমি হযরত আবূ বকরের চাইতে বেশী চাঁদা দেয়ার সঙ্কল্প করলাম এবং আমার অর্ধেক সম্পদ দান করলাম। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি পরিবার-পরিজনের জন্য কি রেখেছেন ? আমি বললাম, বাকী অর্ধেক ! ইতোমধ্যে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক তাঁর সমুদয় সম্পদ নিয়ে উপস্থিত। হযরত নবী (সা) তাঁকেও একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন। তিনি জবাব দিলেন, পরিবার-পরিজনের জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই যথেষ্ট। আমি এই অবস্থা দেখে বললাম, আমি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) থেকে কোন ব্যাপারেই অগ্রগামী হতে পারবো না।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত নবী করীম (সা) বলেন, আমি সবার অনুগ্রহ পরিশোধ করেছি, কিন্তু হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর অনুগ্রহ অবশিষ্ট রয়েছে। তার বিনিময় কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা দেবেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর সম্পদ দ্বারা আমার যতখানি উপকার হয়েছে, অন্য কারো সম্পদ দ্বারা ততখানি হয়নি।

জ্ঞান-বুদ্ধি

তিনি সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে সবচেয়ে বেশী তীক্ষ্ণধী ছিলেন। কোন ব্যাপারে যখন সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ হতো, তখন সে বিষয়টি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর সামনে উপস্থিত করা হতো। তিনি সে সম্পর্কে যে রায় দিতেন তাই সঠিক হতো। কুরআনুল মজীদের জ্ঞান ছিল তাঁর সব সাহাবীর চেয়ে বেশী। এ কারণেই হযরত নবী করীম (সা) তাঁকে নামাযের ইমাম বানিয়েছেন। সুন্নাতের জ্ঞানও ছিল তাঁর পরিপূর্ণ। এ কারণে সাহাবায়ে কিরাম সুন্নাতের মাসাইলের ব্যাপারে তাঁর দ্বারস্থ হতেন। তাঁর স্মরণশক্তিও ছিল প্রখর। তিনি অত্যন্ত ধীশক্তি সম্পন্ন ছিলেন। তিনি নবূওয়াতের শুরু থেকে ওফাত পর্যন্ত হযরত নবী করীম (সা)-এর সাহচর্য লাভ করেন। খিলাফতকালে যখন কোন সমস্যার উদ্ভব হতো তখন তিনি তা কুরআন মজীদে তালাশ করতেন। কুরআন মজীদে না পাওয়া গেলে হযরত নবী করীম (সা)-এর কথা ও কাজ অনুসারে সমাধান করতেন। যদি এরূপ কোন কথা ও কাজ পাওয়া না যেতো, তবে লোকদের জিজ্ঞেস করতেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ কি এ সম্পর্কে কোন হাদীস শ্রবণ করেছ ? কোন সাহাবী যদি এরূপ কোন হাদীস বর্ণনা না করতেন, তখন

তিনি সুবিখ্যাত সাহাবীদেরকে একত্রিত করতেন এবং তাঁদের অধিকাংশের অভিমত অনুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) সাধারণতভাবে সারা আরব এবং বিশেষভাবে কুরায়শের বড় নসববিদ ছিলেন। এমন কি জুবায়র ইব্ন মুত্ঈম– যিনি আরবের অন্যতম নসববিদ বা কুলপঞ্জি বিশারদ বলে পরিচিত ছিলেন– হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নিকট থেকে ফায়দা হাসিল করতেন এবং গর্ব করে বলতেন যে, আমি নসবশাস্ত্রের সবচেয়ে বড় নসববিদের নিকট শিক্ষা লাভ করেছি। স্বপ্নের তা'বীর শাস্ত্রেও তিনি সবচেয়ে অগ্রগণ্য ছিলেন। এমনকি হযরত নবী করীম (সা)-এর যুগেও তিনি স্বপ্নের তা'বীর বর্ণনা করতেন। ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (রা) বলেন, আল্লাহ্র রাসূলের পর আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হলেন স্বপ্নের সবচেয়ে বড় তা'বীর বর্ণনাকারী। তিনি সবচেয়ে বড় বাগ্মী ছিলেন। কোন কোন আলিম এ ব্যাপারে একমত যে, সাহাবাদের মধ্যে সবচেয়ে বাকপটু ছিলেন হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত আলী (রা)। সমস্ত সাহাবীর মধ্যে তাঁর জ্ঞান ছিল পূর্ণ এবং মতের সঠিকত্ব ছিল স্বীকৃত।

হযরত আলী (রা) বহুবার বলেছেন, এই উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তি হচ্ছেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)। একবার হযরত আলী (রা) বলেন, যে ব্যক্তি আমাকে হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা)-এর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করবে, তাকে আমি দোররা মারবো। হযরত আলী (রা) বর্ণনা করেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আবূ বকরের উপর রহম করুন ! তিনি তাঁর কন্যাকে আমার নিকট বিবাহ দিয়েছেন, আমাকে মদীনা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন এবং হযরত বিলাল (রা)-কে আযাদ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা হযরত উমর (রা)-এর উপর রহম করুন। তিনি হক কথা বলেন, তা যতই তিক্ত হোক না কেন। আল্লাহ তা'আলা হযরত উছমান (রা)-এর উপর রহম করুন! তার প্রতি ফেরেশতারাও লজ্জা প্রদর্শন করেন। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আলী (রা)-এর উপর রহম করুন! হে আল্লাহ্ ! আলী যেখানেই থাকুক, হককে তার সঙ্গে রেখো।

ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, লোকেরা সিদ্দীক আকবরকে সর্বসম্মতভাবে খলীফা বানিয়েছেন। কেননা, তখন ভূপৃষ্ঠে তাঁর চেয়ে উত্তম ব্যক্তি পাওয়া যায়নি। মুআবিয়া ইব্ন ফার্রাহ (রা) বলেন, হযরত আবূ বকরের খিলাফত সম্পর্কে সাহাবাদের মধ্যে কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিলো না। তাঁরা সর্বদা তাঁকে খলীফাতুর রাসূল বা রাসূলের খলীফা বলতেন। আর সাহাবীরা কখনো কোন ভুল বা গোমরাহীর উপর একমত হতেন না।

সুসামাজিকতা

'আতা ইবন সাইব (র) বলেন, খিলাফতের বায়'আত গ্রহণের পরদিন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) দুটি চাদর নিয়ে বাজারে রওয়ানা হন। হযরত উমর (রা) জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কোথায় যাচ্ছেন ? তিনি বললেন, বাজারে। হযরত উমর (রা) বললেন, এখন আপনি এই ধান্দা ছেড়ে দিন। আপনি মুসলমনদের আমীর হয়ে গেছেন। তিনি বললেন, তাহলে আমি ও আমার পরিবার-পরিজন কি খাবে ? হযরত উমর (রা) বললেন, এ কাজটি হযরত আবূ উবায়দাকে সোপর্দ করুন। তারপর দু'জনই হযরত আবূ উবায়দা (রা)-এর নিকট গেলেন এবং তাঁকে হযরত আবূ বকর (রা) বললেন যে, আমার এবং আমার পরিবার-পরিজনের খরচপত্র মুহাজিরদের নিকট থেকে আদায় করে দাও। সব জিনিসই সাধারণ মানের হতে হবে। গ্রীষ্ম ও

শীতের পোশাকেরও প্রয়োজন হবে। ছিঁড়ে গেলে আমি তা জমা দেবো এবং নতুন পোশাক নেবো। হযরত আবূ উবায়দা (রা) প্রতিদিন তাঁর ঘরে অর্ধ বকরীর গোশত পাঠিয়ে দিতেন। হযরত আবূ বকর ইব্‌ন হাফস (রা) বলেন, হযরত আবূ বকর (রা) ইনতিকালের সময় হযরত আয়িশা (রা)-কে বলেন, মুসলমানদের কাজ করার পারিশ্রমিক হিসাবে আমি পাই পয়সার ফায়দাও গ্রহণ করিনি।– সাদামাঠা গোছের খাওয়া-পরা ব্যতীত। এ মুহূর্তে এই হাবশী গোলাম, উটনী ও পুরাতন চাদরটি ছাড়া মুসলমানদের আর কোন মালামাল আমার কাছে নেই। আমার মৃত্যুর পর এগুলোকে হযরত উমর (রা)-এর নিকট পাঠিয়ে দিও।

হযরত ইমাম হাসান ইব্‌ন আলী (রা) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত আবূ বকর (রা)-এর ইনতিকালের সময় আয়িশা সিদ্দীকা (রা)-কে বলেন, আমার মৃত্যুর পর এই উটনীটি যার দুধ আমি পান করছি, এই পিয়ালাটি যাতে করে আমি পান করতাম এবং এই চাদরটি উমরের নিকট পাঠিয়ে দেবে। কেননা এগুলোকে আমি খলীফা হিসাবে বায়তুল মাল থেকে নিয়েছিলাম। হযরত উমর (রা)-এর নিকট এগুলো পৌঁছার পর তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আবূ বকরের উপর রহম করুন, আমার জন্য তিনি বহু কষ্ট করেছেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বায়তুল মালে কখনো কোন সম্পদ জমা হতে দেননি। যা-কিছু আসতো মুসলমানদের জন্য তা ব্যয় করে ফেলতেন। ফকীর-মিসকীনদের মধ্যে সমভাবে বন্টন করে দিতেন। কখনো ঘোড়া ও হাতিয়ার খরিদ করে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে দান করে দিতেন। কখনো কিছু পোশাক যোগাড় করে গরীব-মিসকীনদের দান করতেন। তাঁর ওফাতের পর হযরত উমর (রা) যখন অন্যান্য সাহাবাসহ বায়তুল মালের হিসাব-নিকাশ দিলেন, তখন তা সম্পূর্ণ শূন্য পেলেন। মহল্লার মেয়েরা তাদের বকরী নিয়ে তাঁর নিকট আসতো এবং তাঁর দ্বারা দুধ দোহন করে নিয়ে যেতো। সিদ্দীকে আকবর (রা) অনেক লোকের মধ্যে এমনভাবে মিলেমিশে বসতেন, কেউ চিনতেই পারতো না এদের মধ্যে খলীফা কে !

সিদ্দীকী খিলাফতের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী

সাকীফা বনূ সাইদা ও বায়'আতে খিলাফত

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, মসজিদে নববীতে সিদ্দীকে আকবর (রা) বক্তৃতা করে লোকদের বিস্ময় দূর করেছিলেন। সাকীফা বনূ সাইদায় আনসারদের সমবেত হওয়া এবং মুহাজিরদের পরামর্শ ছাড়া কোন আমীর বা খলীফা নির্বাচন সম্পর্কে আলোচনা করার খবর তাঁর কাছে পৌঁছলো। হযরত নবী করীম (সা)-এর ওফাতের পর এ ছিল ইসলামের সবচেয়ে বড় দুর্দিন। এই খবর শুনে যদি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) নীরব থাকতেন এবং এদিকে ভ্রূক্ষেপ না করতেন, তবে মুহাজির ও আনসারদের সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ব অচিরেই বিনষ্ট হয়ে ইসলামী ঐক্য চুরমার হয়ে যেতো। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা যেহেতু নিজেই তাঁর দীনের সংরক্ষক ও সাহায্যকারী, তাই তিনি সিদ্দীকে আকবর (রা)-কে হিম্মত ও দৃঢ়তা দান করলেন। যাবতীয় আশংকা ও বিপত্তি তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ও শক্তির সামনে বিজয় ও সংশোধনে রূপান্তরিত হলো। হযরত নবী করীম (সা)-এর পবিত্র শক্তি সমস্ত মুসলমানকে একই জাতি ও একই পরিবার বানিয়ে দিয়েছিল এবং ঈমানের নূরের বিস্ময়কর প্রভাবে গোত্র, পরিবার ও দেশের পার্থক্য সম্পূর্ণ মিটে গিয়েছিল। গোত্র ও পরিবারের নাম দ্বারা মানুষের পরিচয় ও ঠিকানা দান সহজ হওয়া ছাড়া এগুলো আর কোন তাৎপর্যই বহন করতো না।

হযরত নবী করীম (সা)-এর ওফাত এবং এই মহান আত্মার ঊর্ধ্বজগতে গমন করার পর মুহূর্তের জন্য এই জাতিগত বিভেদের বিপত্তির পার্শ্ব পরিবর্তন করা কোন আশ্চর্যের বিষয় নয়। লক্ষণীয় যে, সাহাবায়ে কিরামের পূত-পবিত্র জামাআত এই মুসীবতকে নিজদের জন্য আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভের কারণ বানিয়েছেন, ধ্বংসের উপকরণ নয়।

এই সার কথার ব্যাখ্যা এই যে, মদীনা মুনাওয়ারায় মুহাজিরদের সংখ্যা আনসারদের চেয়ে কম ছিল। কিন্তু আনসারও দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। আওস ও খাযরাজ ইসলামের পূর্বে প্রাচীনকাল থেকেই একে অপরের বৈরী ও প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। এইভাবে মদীনা মুনাওয়ারার তৎকালীন মুসলমানদেরকে তিনটি বড় বড় ভাগে বিভক্ত মনে করা যেতো। আওস, খাযরাজ ও কুরায়শ বা মক্কার মুহাজিরগণ। খাযরাজ গোত্রের সরদার ছিলেন হযরত সা'দ ইব্ন উবাদা। তাঁর গৃহ-সংলগ্ন একটি প্রশস্ত বৈঠকখানা ছিল। যার আকৃতি ছিল এরূপ : একটি প্রশস্ত চত্বর। তার উপরে রোদ-বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য সংযুক্ত ছিল। এটিকেই 'সাকীফা বনূ সাঈদা' বলা হতো।

বায়'আত

হযরত নবী করীম (সা)-এর ওফাতের খবর শুনে একদিকে মসজিদে নববীতে লোকজন জমা হয়ে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে প্রায় সকলেই ছিলেন মুহাজির। কেননা, মুহাজিরদের ঘরদোর ঐ মহল্লায়ই ছিল বেশী। এখানে আনসার অনেক কম ছিল। অপর দিকে বাজার সংলগ্ন সাকীফা বনূ সাইদায় ছিল মুসলমানদের আরেকটি সমাবেশ। এই সমাবেশের প্রায় সকলেই ছিলেন আনসার। ঘটনাক্রমে দু'একজন মুহাজিরও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ইসলামের সূচনা ও তার ক্রমবিকাশ, শত্রুদের অপচেষ্টা, যুদ্ধ-বিগ্রহের ডামাডোল, শিরকের পরাজয় ও বিলুপ্ত হওয়া এবং ইসলামী আইন-কানুনের সামনে সকলের মাথা নত করা– এসব

কিছুই ছিল তাঁদের দৃষ্টিপথে দেদীপ্যমান। তাঁরা এত জানতেন যে, হযরত নবী করীম (সা)-এর ওফাতের পর এই ব্যবস্থা কেবল তাঁর স্থলাভিষিক্ত নির্বাচনের মাধ্যমেই সুষ্ঠুভাবে কায়েম থাকতে পারে।

মসজিদে নববীতে হযরত উমর ফারূক (রা)-এর প্রেমিকসুলভ ভাবাবেগ লোকদেরকে খিলাফত বিষয়ে কিছু চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগই দেয়নি। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হযরত নবী করীম (সা)-এর ওফাতের খবর শুনে যদি দ্রুত এখানে না পৌঁছাতেন, তবে আল্লাহ্ জানেন মসজিদে নববীতে রাসূল-প্রেমিকগণের এই চিত্তচাঞ্চল্য ও অস্থিরতার ভাব কতক্ষণ পর্যন্ত অব্যাহত থাকতো। পক্ষান্তরে অপর সমাবেশটির—যা হযরত সা'দ ইব্ন উবাদার বৈঠকখানায় অনুষ্ঠিত হচ্ছিল—অবস্থা তদ্রূপ ছিল না। সেখানে খলীফা নির্বাচন সম্পর্কে আলোচনা হলো। এই সমাবেশ ছিল আনসারদের জনৈক গোত্রপতির বৈঠকখানায় যিনি ছিলেন খাযরাজ গোত্রের সরদার। আর খাযরাজ গোত্র ছিল জনসংখ্যা ও ধন-দৌলতে আনসারদের অপর গোত্র আওস থেকে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত। তাই এই সমাবেশের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ছিল, হযরত সা'দ ইব্ন উবাদা (রা)-কে খলীফা অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (রা)-এর স্থলাভিষিক্ত বানাতে হবে। মুহাজিরদের লোকসংখ্যা যদিও মদীনায় আনসারদের চেয়ে কম ছিল, কিন্তু তাঁদের গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব আনসারদের অন্তরে এতই প্রবল ছিল যে, হযরত সা'দ (রা) যখন খিলাফত আনসারদেরই প্রাপ্য বলে প্রমাণ করতে চাইলেন, তখন আনসারদের এক ব্যক্তি বাধা দিয়ে বললেন, মুহাজিরগণ আনসারদের খিলাফত কিভাবে মেনে নেবেন ? এর উত্তরে অপর একজন আনসার বললেন, তাঁরা যদি মেনে না নেন, তাহলে আমরা তাঁদের বলে দেবো যে, তোমরা তোমাদের মুহাজিরদের মধ্য থেকে একজন খলীফা বানিয়ে নাও, আর আমরা আমাদের আনসারদের মধ্য থেকে একজন খলীফা বানিয়ে নিয়েছি। হযরত সা'দ (রা) বলেন, না, এটা এক ধরনের দুর্বলতা। অন্য একজন আনসার বললেন, মুহাজিররা যদি আমাদের খলীফাকে মেনে না নেয়, তাহলে আমরা তাদেরকে তলোয়ারের মাধ্যমে মদীনা থেকে বের করে দেবো। ঐ সমাবেশে যে ক'জন মুহাজির ছিলেন, তারা উচ্চকণ্ঠে আনসারদের বিরোধিতা করলেন। এইভাবে ঐ সমাবেশে তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়ে গেলো। এমনকি এই অপ্রীতিকর অবস্থা বাড়তে বাড়তে যুদ্ধ ও সংঘাতের আশংকা দেখা দিলো।

এই ভয়াবহ রূপ দেখে হযরত মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লেন এবং মসজিদে নববীতে এসে সাকীফা বনূ সাইদার ঘটনা বর্ণনা করলেন। এ দিকে মসজিদে নববীতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তাঁর বক্তৃতা শেষ করে কাফন-দাফনের উপকরণ প্রস্তুত করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি এই আতঙ্কজনক খবর শুনে হযরত উমর ফারূক (রা) ও হযরত আবূ উবায়দা (রা)-কে সঙ্গে নিয়ে সাকীফা বনূ সাইদার দিকে গমন করেন এবং হযরত আলী (রা) ও অন্যান্য সাহাবাকে কাফনের কাজ সম্পন্ন করতে বলে গেলেন। তখন যদি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এতটুকু বিলম্ব করতেন, তাহলে আল্লাহ্ জানেন কি ভয়াবহ পরিস্থিতি মাথাচাড়া দিয়ে উঠতো। এই তিন বুযুর্গ যখন ঐ সমাবেশে পৌছলেন, তখন এক আশ্চর্য হুলস্থুল গোলমাল চলছিল। হযরত উমর ফারূক (রা) সেখানকার ঐ সমাবেশকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলতে চাইলেন। কিন্তু হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তাঁকে থামিয়ে দিলেন এবং নিজে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও শালীনতার সাথে বক্তৃতা করলেন।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) একটু আগেই হযরত উমর ফারূক (রা)-এর আত্মহারা অবস্থা অবলোকন করেছিলেন। তিনি মসজিদে নববীতে অসি হাতে চক্কর দিচ্ছিলেন আর বলছিলেন, যে ব্যক্তি বলবে যে, হযরত নবী করীম (সা)-এর মৃত্যু হয়েছে, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেবো। তাই হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) আশংকা করলেন যে, এখানেও তিনি চরম উত্তেজনা ও গভীর শোকে এরূপ কোন মন্তব্য করে না ফেলেন। তাই তিনি নিজেই সমাবেশকে সম্বোধন করে বক্তৃতা শুরু করলেন এবং তখন এরই প্রয়োজন ছিল। তিনি বললেন, প্রথমে মুহাজিরগণ আমীর হবেন এবং আনসারগণ হবেন ওয়াযীর। তাঁর বক্তব্য শুনে হযরত হুবাব ইব্‌নুল মুনযির ইব্‌নুল জামূহ (রা) বললেন, আমাদের মধ্য থেকে একজন আমীর এবং তোমাদের মধ্য থেকে একজন আমীর নির্বাচিত হওয়াই উত্তম। হযরত উমর ফারূক (রা) হযরত হুবাব আনসারীর কথার জবাব দিলেন। তিনি বললেন, তোমাদের অবশ্যই স্মরণ আছে যে, হযরত নবী করীম (সা) মুহাজিরদের উপদেশ দিয়েছিলেন যে, আনসারদের সাথে তোমরা সদ্ব্যবহার করবে। আনসারদের তিনি মুহাজিরদের সাথে সদ্ব্যবহার করার উপদেশ দেননি। এতেই প্রমাণিত হয় যে, হুকুমত ও খিলাফত মুহাজিরদের মধ্যে থাকবে। হযরত হুবাব ইব্‌নুল মুনযির (রা) তৎক্ষণাৎ হযরত উমর ফারূক (রা)-এর উক্তি খণ্ডন করলেন এবং তাদের স্বপক্ষে কিছু বলতে লাগলেন। ফলে, হযরত উমর ফারূক (রা) ও হযরত হুবাব (রা) উভয়েই উচ্চৈঃস্বরে কথা বলতে লাগলেন। হযরত আবূ উবায়দা (রা) উভয়কেই থামতে ও চুপ করাতে চেষ্টা করলেন। ইতিমধ্যে হযরত বাশীর ইব্‌ন নু'মান ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন খাযরাজ আনসারী উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, হযরত নবী করীম (সা) নিঃসন্দেহে কুরায়শ বংশের ছিলেন। সুতরাং তাঁর কওম অর্থাৎ কুরায়শের লোকই খিলাফতের বেশী হকদার। আমরা নিঃসন্দেহে দীন-ইসলামের সাহায্য করেছি এবং আমরা অগ্রবর্তী মুসলমান। কিন্তু আমাদের ইসলাম গ্রহণ এবং হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহায্যের জন্য প্রস্তুত হওয়া নিছক আল্লাহ্ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করার জন্যই ছিল। তার প্রতিদান আমরা এ দুনিয়ায় চাই না। আর না আমরা খলীফা ও আমীর হওয়ার ব্যাপারে মুহাজিরদের সাথে কোন ঝগড়া করা পসন্দ করি। হযরত হুবাব ইব্‌নুল মুনযির বললেন, বাশীর ! তুমি এখন কাপুরুষের মতো কথা বলছো ! আর একটি গুছিয়ে আনা কাজকে নষ্ট করে দিতে চাচ্ছো। হযরত বাশীর (রা) বললেন, আমি কাপুরুষতা প্রকাশ করিনি বরং যে কওম খিলাফতের হকদার আমি এ বিষয়ে তাদের সাথে বিবাদ করা অপসন্দ করছি। হে হুবাব! তুমি কি শোননি যে হযরত নবী (সা) বলেছেন : اَلْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ।

অর্থাৎ "নেতা কুরায়শদের মধ্য থেকে হবে !"

হযরত বাশীর (রা)-এর এ উক্তিকে অন্য কয়েকজন আনসারও সমর্থন করলেন। আর এইভাবে এই আল্লাহ্ পোরস্ত কওম তাদের পার্থিব ও বৈষয়িক খিদমতকে তাদের দীনী ও রূহানী প্রেরণার উপর বিজয়ী হতে দিলেন না। হযরত হুবাব ইব্‌নুল মুনযিরও একথা শুনে চুপ হয়ে গেলেন এবং তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর মত পরিবর্তন করলেন।

তিনি চুপ করার সাথে সাথে গোটা সমাবেশের উপর নীরবতা নেমে এলো এবং খিলাফত সম্পর্কে মুহাজির ও আনসারদের ঝগড়া তৎক্ষণাৎ দূর হয়ে গেলো। তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বললেন, এখানে হযরত উমর ও হযরত আবূ উবায়দা উপস্থিত আছেন। তোমরা এ দু'জনের একজনকে বেছে নাও। হযরত আবূ উবায়দা (রা) ও হযরত উমর (রা) বললেন,

না, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) মুহাজিরদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তি। তিনি গুহার মধ্যে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গী ছিলেন। সালাতের ইমামতি করানোর ক্ষেত্রে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহাকে তাঁর প্রতিনিধি বানিয়েছিলেন। অথচ সালাত হচ্ছে দীনের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট আমল। কাজেই হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর বর্তমানে অন্য কোন ব্যক্তি খলীফা ও আমীর হওয়ার যোগ্য হতে পারেন না। একথা বলেই সর্বপ্রথম হযরত ফারূক (রা) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর হাতে বায়'আত করলেন এবং তারপর হযরত আবূ উবায়দা (রা) ও হযরত বাশীর ইব্‌ন সা'দ আনসারী (রা) বায়'আত গ্রহণ করেন। এরপর এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, চারদিক থেকে লোকজন বায়'আত গ্রহণের জন্য ভেঙে পড়লো। এ খবর বাইরে পৌঁছে গেলো এবং লোকেরা শোনা মাত্র ছুটে এলো। মোটকথা, তামাম মুহাজির ও আনসার হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর হাতে বিনা মতানৈক্যে সর্বসম্মতভাবে বায়'আত গ্রহণ করলেন।

আনসারদের মধ্যে কেবল হযরত সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা) এবং মুহাজিরদের মধ্যে যারা কাফনের কাজে ব্যস্ত ছিলেন, তাঁরা ঐ সময় সাকীফা বনূ সাইদায় বায়'আত গ্রহণ করতে পারেন নি। হযরত সা'দ (রা) কিছুক্ষণ পর ঐ দিনই হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করলেন। মুহাজিরদের মধ্যে হযরত আলী (রা) এবং হযরত যুবায়র (রা) ও হযরত তালহা (রা) চল্লিশ দিন পর্যন্ত বায়'আত গ্রহণ করেননি। তাঁদের অভিযোগ ছিল, সাকীফা বনূ সাইদার বায়'আত অনুষ্ঠানে তাঁদেরকে কেন ডাকা হলো না!

হযরত আলী (রা) একদিন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নিকট আগমন করলেন এবং বললেন, আমি আপনার শ্রেষ্ঠত্ব ও খলীফা হওয়ার যোগ্যতাকে অস্বীকার করছি না, কিন্তু কথা হচ্ছে, আমরা হযরত রাসূলুল্লাহ্ (রা)-এর নিকটবর্তী আত্মীয়। আপনি সাকীফা বনূ সাইদায় আমাদের পরামর্শ ছাড়া কেন লোকদের নিকট থেকে বায়'আত নিলেন? আপনি যদি আমাদেরকেও সেখানে ডেকে পাঠাতেন, তাহলে সর্বপ্রথম আপনার হাতে বায়'আত গ্রহণ করতাম।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বললেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আত্মীয়বর্গের সাথে সদ্ব্যবহার করা আমি আমার নিজের আত্মীয়বর্গের সাথে সদ্ব্যবহার করার চাইতেও অধিক পসন্দ করি। আমি সাকীফায় বায়'আত গ্রহণের উদ্দেশ্যে যাইনি বরং মুহাজির ও আনসারদের ঝগড়া মীমাংসা করা অত্যাবশ্যক ছিল। উভয় শ্রেণীই লড়াই করে মারতে ও মরতে প্রস্তুত ছিল। আমি কাউকে আমার হাতে বায়'আত গ্রহণ করতে বলিনি বরং উপস্থিত জনতা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমার হাতে বায়'আত গ্রহণ করেছেন। ঐ সময় যদি আমি বায়'আত গ্রহণ অনুষ্ঠান স্থগিত রাখতাম, তবে এই আশংকা ও বিপত্তি পুনরায় ততোধিক শক্তি নিয়ে মাথাচাড়া দেয়ার প্রবল আশংকা ছিল। তুমি যখন কাফন-দাফনের সাজে মশগুল ছিলে, তখন আমি এই ত্বরিত কাজে তোমাকে কিভাবে সেখান থেকে ডেকে পাঠাতে পারতাম! হযরত আলী (রা) এই কথা শুনে তৎক্ষণাৎ তাঁর অভিযোগ প্রত্যাহার করলেন এবং তারপর দিন মসজিদে নববীতে সবার সামনে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করলেন।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর ভাষণ

বায়'আতে সাকীফা থেকে ফিরে এসে তার পরদিন হযরত নবী করীম (সা)-এর কাফন-দাফন শেষ করে মসজিদে নববীতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) মিম্বরের উপর উপবেশন করে

সাধারণ লোকদের বায়‘আত গ্রহণ করেন। তারপর দণ্ডায়মান হয়ে ভাষণ দেন এবং হামদ ও না’ত-এর পর জনগণকে উদ্দেশ্য করে বলেন :

আমি তোমাদের নেতা নির্বাচিত হয়েছি। অথচ আমি তোমাদের চেয়ে উত্তম নই। সুতরাং আমি যদি সৎকাজ করি, তবে তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে আমাকে সাহায্য করা। আর যদি আমি কোন ভুল পথ অবলম্বন করি, তবে তোমাদের দায়িত্ব হচ্ছে আমাকে সোজাপথে প্রতিষ্ঠিত করা। সত্যবাদিতা ও সত্যকথা বলা একটি আমানত এবং মিথ্যা কথা হচ্ছে একটি খিয়ানত। তোমাদের মধ্যে যে দুর্বল, সে আমার নিকট শক্তিশালী—যে পর্যন্ত আমি তার প্রাপ্য বুঝিয়ে না দিই। আর তোমাদের মধ্যে যে শক্তিশালী, সে আমার নিকট দুর্বল—যে পর্যন্ত আমি তার নিকট থেকে প্রাপ্য বুঝে না নিই। তোমরা জিহাদ পরিত্যাগ করবে না। যে জাতি জিহাদ পরিত্যাগ করে, সে জাতি অপমানিত হয়। আমি যতদিন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবো, ততদিন তোমরা আমার আনুগত্য করবে। আর আমি যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করি, তবে তোমরা আমাকে পরিত্যাগ করবে। কেননা, তখন তোমাদের উপর আমার আনুগত্য করা ফরয নয়।”

ঐ দিন ৩৩ হাজার সাহাবী হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর হাতে বায়‘আত গ্রহণ করেন।

বায়‘আতে সাকীফার পর মদীনা মুনাওয়ারা এবং মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে সেই মতবাদের লেশমাত্রও কোথাও ছিল না, বায়‘আতের কয়েক মিনিট পূর্বেও মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যা বিদ্যমান ছিল। সবাই পূর্বের মতই অভিন্ন হৃদয় ও পরস্পর ভাই ভাই ছিল। হযরত নবী করীম (সা)-এর শিক্ষালয় থেকে সরাসরি শিক্ষা গ্রহণকারী সাহাবায়ে কিরাম (রা) যে পূর্ণভাবে দুনিয়ার উপর দীনকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন, এটাও তার এক সর্বাপেক্ষা বড় প্রমাণ। দুনিয়ার কোন দল বা জামাআতই তাঁদের সমপর্যায়ে পৌঁছতে পারে না। যখন একথা চিন্তা করা হয় যে, ৩৩ হাজার সাহাবা একদিনে স্বেচ্ছায় ও সানন্দে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর হাতে বায়‘আত গ্রহণ করেছেন এবং সারা আরবদেশ ও সমস্ত মুসলমান তাঁকে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খলীফা মেনে নিয়েছেন, তখন খিলাফতে সিদ্দীকী থেকে বড় অন্য কোন ইজমায়ে উম্মাত পরিদৃষ্ট হয় না।

উসামা বাহিনীর যুদ্ধযাত্রা

হযরত নবী করীম (সা)-এর ওফাতের কয়েক মাস পূর্বে ইয়ামন ও নজদ এলাকায় আসওয়াদ ও মুসায়লামার ফিতনা দেখা দিয়েছিল। ঐসব দেশের অধিবাসীরা ছিল সদ্য ইসলাম গ্রহণকারী। এখনো তারা পূর্ণরূপে ইসলাম এবং ইসলামের মূলতত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞাত হতে পারেনি। ইতিমধ্যে ভণ্ড নবীদের শয়তানী ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং এই নও-মুসলিমরা তাদের প্রতারণার শিকার হয়। নজ্‌দ অঞ্চলের অবস্থাও ছিল তথৈবচ। কিন্তু হযরত নবী করীম (সা)-এর ওফাতের পূর্বেই আসওয়াদ আনাসীর দফা রফা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ইয়ামান অঞ্চলের বিষাক্ত ক্রিয়া ও ফিতনার কারণ তখনো সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়নি। হযরত নবী করীম (সা)-এর ওফাতের খবর সারা আরব উপমহাদেশে অতি দ্রুত ও তড়িৎ গতিতে ছড়িয়ে পড়লো এবং ছড়াতে লাগলো। এই খবর একদিকে নতুন ইসলাম ও শিক্ষার মুখাপেক্ষী গোত্রগুলোর ধ্যান-ধারণায় পরিবর্তন সৃষ্টি করলো, অপরদিকে ভণ্ড নবীদের দুঃসাহস ও হিম্মত বাড়িয়ে তাদের কর্মকাণ্ডে শক্তি ও তরক্কী দান করলো। সকল দেশ ও সকল জাতির মধ্যে যুদ্ধপ্রিয় ও ফিতনাবাজ লোকেরাও যুগে যুগে ইন্ধনই যুগিয়েছে। এই ধরনের লোকদের নতুনভাবে তাদের দুষ্টামির জন্য উপযুক্ত সুযোগ মেলে। খ্যাতি অন্বেষী ব্যক্তিবর্গ ও ক্ষমতালোভী গোত্রগুলোও তাদের স্বেচ্ছাচারিতা ও বিলাসিতার জন্য সুযোগ সন্ধান করতে লাগলো। ফলে, সব দিক থেকেই ধর্মত্যাগের খবর আসা শুরু হলো। এইসব খবরাখবর এতো উপর্যুপরি ও অধিক মাত্রায় মদীনায় এলো যে, যেগুলো শুনে শুনে সাহাবায়ে কিরামের চোখের সামনে যেনো ঘোর বিপদ ও দুঃখ-বেদনার পাহাড় ছিল। আর তাদের মন-মস্তিষ্কের উপর এতই বোঝা চেপেছিল যে তাঁরা যদি হযরত নবী করীম (সা)-এর শিক্ষালয় ও তাঁর তত্ত্বাবধানে ধৈর্য ও দৃঢ়তার শিক্ষা না পেতেন, তাহলে তাঁদের ও ইসলামের ধ্বংস ছিল বাহ্যত নিশ্চিত। মদীনা, মক্কা ও তায়িফ এই তিনটি স্থান ছাড়া অবশিষ্ট সমস্ত আরব উপমহাদেশে ধর্মত্যাগের অগ্নিশিখা প্রচণ্ড আকার ধারণ করেছিল। একই সাথে এ খবরও পৌঁছলো যে, মদীনা মুনাওয়ারার উপর সবদিক থেকে হামলা করার প্রস্তুতি চলছে। হযরত নবী করীম (সা) হযরত উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা)-কে তাঁর অন্তিম মুহূর্তে সিরিয়া অভিমুখে রোমানদের মুকাবিলা করার জন্য মুসলিম বাহিনীসহ প্রেরণ করেছিলেন এবং হযরত নবী করীম (সা)-এর রোগ বৃদ্ধির কারণে এই বাহিনী যাত্রা বিরতি করেছিল। এক্ষণে হযরত নবী করীম (সা)-এর ওফাতের পর হযরত আবূ বক্‌র সিদ্দীক (রা) এই বাহিনী প্রেরণ করতে চাইলেন। কিন্তু সাহাবায়ে কিরাম সব দিকে ধর্ম ত্যাগের খবর শুনে এবং মদীনার উপর হামলা করার আশংকা দেখা দেয়ায় এই বাহিনী প্রেরণ স্থগিত রাখার জন্য হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নিকট অনুরোধ করেন। সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর ঈমানী শক্তি, মনোবল, হিম্মত ও সাহসিকতা, উদ্যম ও দৃঢ়তা পরিমাপ করুন ! তিনি সবাইকে সাফ জবাব দিলেন, আমাকে যদি কেউ এ ব্যাপারে নিশ্চয়তাও প্রদান করে যে, এই বাহিনী প্রেরণ করার পর আমাকে মদীনায় কোন হিংস্র জন্তু একাকী পেয়ে ছিঁড়ে ফেলবে তবু আমি একটি বাহিনী

প্রেরণ কখনো মুলতবি করবো না। কারণ এ বাহিনী স্বয়ং নবী করীম (সা) প্রেরণ করেছিলেন। অতএব তিনি এই মর্মে নির্দেশ জারি করলেন যে, উসামা বাহিনীতে যেসব লোক অন্তর্ভুক্ত ছিল, তারা যেন যুদ্ধযাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং মদীনার বাইরে সেনা শিবিরে দ্রুত সমবেত হয়।

এই নির্দেশ পালনার্থে সাহাবায়ে কিরাম হযরত উসামার ঝাণ্ডার নিচে সমবেত হন। হযরত উসামা (রা)-এর পিতা যায়দ ইব্ন হারিছা (রা) ছিলেন নবী (সা)-এর মুক্ত গোলাম। তাই কোন কোন লোকের মনে তাঁর নেতৃত্ব সম্পর্কে কুণ্ঠাবোধ ছিল। হযরত উসামা (রা)-এর বয়স ছিল তখন সতের বছর। তাই কারো কারো ইচ্ছা বয়স্ক কোন কুরায়শী নেতা নির্ধারণ করা হোক। যখন সমস্ত লশকর মদীনার বাইরে সমবেত হলো, তখন হযরত উসামা (রা) হযরত উমর ফারূক (রা)-কে (তিনিও এই বাহিনীর একজন সৈন্য ছিলেন) হযরত সিদ্দীক আকবর (রা)-এর নিকট এই পয়গাম দিয়ে প্রেরণ করেন যে, বড় বড় লোক সবই আমার সঙ্গে রয়েছেন, আপনি তাঁদেরকে আপনার কাছে ডেকে নিন এবং আপনার কাছে রেখে দিন। কেননা, আমি আশংকা করছি যে, মুশরিকরা হামলা করে আপনাকে এবং মুসলমানদেরকে কষ্ট দেবে। হযরত উমর (রা) সেনা ছাউনী থেকে সেনাপতির পয়গাম নিয়ে যখন রওয়ানা করছিলেন, তখন আনসাররাও একটি পয়গাম হযরত উমর (রা)-এর মাধ্যমে খলীফার নিকট প্রেরণ করেন। পয়গামটি ছিল এরূপ : আপনি এই বাহিনীর অধিনায়ক এমন কোন ব্যক্তিকে নির্ধারণ করুন, যিনি হবেন উসামা থেকে বয়সে বড় ও শরীফ বংশের। হযরত উমর (রা) এসে সর্বপ্রথম আনসারদের পয়গাম পেশ করলেন। তখন হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) বললেন, এই বাহিনী প্রেরণ করার দরুন যদি সমস্ত বস্তি খালি হয়ে যায় এবং আমি স্বয়ং একাকী থেকে যাই আর হিংস্র জন্তুরা আমাকে তুলে নিয়ে যায়, তবুও এই বাহিনী প্রেরণ মুলতবি হতে পারে না। তারপর আনসারদের পয়গাম শুনে বললেন, তাদের অন্তরে এখন পর্যন্ত গর্ব ও অহংকারের চিহ্ন অবশিষ্ট রয়ে গেছে। একথা বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং ঐ বাহিনীকে বিদায় করার জন্য পায়ে হেঁটে মদীনার বাইরে সেনা নিবাস পর্যন্ত চলে গেলেন। হযরত উসামাকে বাহিনীসহ বিদায় করলেন এবং নিজে হযরত উসামা (রা)-এর ঘোড়ার পাশে থেকে আলাপ করতে করতে চললেন। হযরত উসামা (রা) বলরেন, হয়তো আপনি আরোহণ করুন অথবা আমি সওয়ারী থেকে নেমে পায়ে হেঁটে চলবো। সিদ্দীকে আকবর (রা) বললেন, আমি আরোহণ করবো না এবং তোমারও সওয়ারী থেকে নিচে নামার প্রয়োজন নেই। আর আমি যদি কিছু দূর আল্লাহর রাস্তায় বিদায় সম্বর্ধনাকারী হিসাবে তোমাদের ঘোড়ার সাথে পায়ে হেঁটে চলি, তাতে আমার কি ক্ষতি হবে ? সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর এই কার্য পদ্ধতিই ছিল আনসারদের উপরোক্ত পয়গামের মোক্ষম জবাব। উসামা (রা)-এর ঘোড়ার পাশাপাশি তাঁকে এইভাবে পায়ে হেটে চলতে দেখে গোটা বাহিনীই হতবাক হয়ে পড়লো এবং সবার অন্তরের সেই কুণ্ঠাবোধ দূর হয়ে তদস্থলে আনুগত্য ও একনিষ্ঠতার প্রেরণা সৃষ্টি হয়ে গেলো।

উসামা (রা)-কে উপদেশ দান

তিনি উসামা (রা)-কে তাঁর সওয়ারীর সাথে সাথে হাঁটতে হাঁটতে দশটি উপদেশ দান করলেন। তিনি বললেন :

(১) খিয়ানত করবে না। (২) মিথ্যা কথা বলবে না। (৩) অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে না। (৪) শিশু, বৃদ্ধ ও নারীদেরকে হত্যা করবে না। (৫) কোন ফলদার বৃক্ষ কাটবে না, জ্বালাবে না।

(৬) আহারের প্রয়োজনীয়তা ছাড়া উট, বকরী, গাভী প্রভৃতি যবেহ করবে না। (৭) কোন জাতির সাথে সাক্ষাৎ হলে তাদের নম্রভাবে ইসলামের দাওয়াত দিবে। (৮) কারো সাথে সাক্ষাৎ করলে তার মর্যাদা রক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখবে। (৯) তোমাদের সামনে কোন আহার্য এলে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে আহার শুরু করবে। (১০) ইয়াহূদী-খ্রিস্টানদের যেসব লোক পার্থিব সম্পর্ক ত্যাগ করে তাদের উপাসনালয়ে অধিবাস অবলম্বন করেছে, তাদের উত্যক্ত করবে না। হযরত নবী করীম (সা) তোমাদেরকে যেসব কাজ করার আদেশ করেছেন, তাতে হ্রাস-বৃদ্ধি করবে না। আল্লাহ্‌র পথে কাফিরদের সাথে লড়াই করবে।

হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) উসামা (রা)-কে এই নসীহতগুলো করে জারাফ নামক স্থান থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন। প্রত্যাবর্তনকালে তিনি হযরত উসামা (রা)-কে বললেন, "তুমি অনুমতি দিলে আমার সাহায্য ও পরামর্শের জন্য আমি উমরকে রেখে দিতে পারি।" হযরত উসামা (রা) তৎক্ষণাৎ হযরত উমর ফারূক (রা)-কে মদীনায় থাকার অনুমতি প্রদান করলেন। হযরত উমর (রা) ঐ বাহিনী থেকে আলাদা হয়ে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর সঙ্গে মদীনায় ফিরে এলেন।

এখানে লক্ষণীয় যে, খলীফা তাঁর আপন নির্দেশবলে হযরত উমর (রা)-কে রেখে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি হযরত উসামা (রা)-এর নিকট থেকে রীতিমত অনুমতি লাভ করা প্রয়োজন মনে করলেন। এটাও ঐ বাহিনীর জন্য একটি অতি প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ ছিল। খলীফা তাঁর দৃষ্টান্তের মাধ্যমে এই উপদেশটি প্রদান করলেন।

উসামা (রা)-এর সাফল্য

হযরত উসামা (রা) হযরত নবী করীম (সা)-এর নির্দেশ অনুসারে জর্দান ও বলকান উপত্যকায় পৌঁছে রোমান বাহিনীর সাথে যুদ্ধ আরম্ভ করেন। রোমকদের পরাজিত করে এবং বেশুমার মালে গনীমত ও যুদ্ধবন্দী নিয়ে চল্লিশ দিন পর মদীনায় ফিরে আসেন। এই বাহিনীর যুদ্ধযাত্রা বাহ্যত অতি ভয়াবহ মনে হচ্ছিল। কিন্তু তার ফলাফল ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য খুব ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়। দেশের এই শোরগোল ও নিরাপত্তাহীনতার সময়ও মুসলিম বাহিনীর এরূপ রোমকদের উপর হামলা করা যেন সকল মুরতাদ ও বিদ্রোহীদের একথা জানিয়ে দিচ্ছিল যে, আমরা তোমাদের এই বিদ্রোহ ও প্রস্তুতিকে এতটুকু পরোয়া করি না। এই সাহস ও শক্তির কার্যকর ঘোষণা বিদ্রোহীদের আশাহত ও নিরুৎসাহিত করে চিন্তা ও দ্বিধাদ্বন্দ্বে ফেলে দেয়। তারা মুসলমানদের মূলোচ্ছেদকল্পে সবাই অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার পরিবর্তে নিজ নিজ স্থানে বসে এরূপ চিন্তা করতে লাগলো যে, মুসলমানদের আদৌ পরাভূত করা যাবে কিনা ? আর এ কারণেই তুলায়হা আসাদী ও মুসায়লামা কায্‌যাব প্রমুখ নবুওয়াতের দাবীদাররা নিজ নিজ এলাকার বাইরে কদম রাখতে পারেনি এবং যাকাত অস্বীকারকারী বিদ্রোহী গোত্রগুলো ইসলামের বিরোধিতার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেনি। হযরত উসামা (রা)-এর রোমান বাহিনীর উপর বিজয় লাভ করা এবং নিরাপদে মালে গনীমতসহ ফিরে আসা আর এই সংবাদ দেশে প্রসিদ্ধি লাভ করা আরো ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়। যেহেতু এই যুদ্ধে প্রচুর মালে গনীমত হস্তগত হয়েছিল তাই ভাবী বিদ্রোহীদের দমন করা এবং দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা বহাল করার ক্ষেত্রে এই মালে গনীমত দ্বারা মুসলমানদের বিরাট সাহায্য মেলে এবং সামরিক বাহিনী প্রেরণের ক্ষেত্রে সাজসরঞ্জাম যোগাড় করতে তেমন বেগ পেতে হয়নি।

ধর্মত্যাগীদের ফিতনা

সাধারণত মানুষ মনে করে যে, হযরত নবী করীম (সা)-এর ওফাতের পর মদীনা, মক্কা ও তায়িফ ছাড়া সমগ্র আরবদেশ এরূপ মুরতাদ হয়ে যায় যে, লোকেরা তাওহীদ ছেড়ে শিরকে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল এবং আল্লাহ্‌র স্থলে মূর্তিপূজা শুরু করে দিয়েছিল। অথচ এটা মনে করা সম্পূর্ণ ভুল ও বাস্তবতাবর্জিত। প্রকৃত ঘটনা ছিল এই যে, মিথ্যাবাদীরা অর্থাৎ নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদাররাও সালাত প্রভৃতি ইবাদতকে অস্বীকার করতো না। তারা ইসলাম ত্যাগ করে কুফর ও শির্‌কও গ্রহণ করেনি, বরং ইসলামের কোন কোন রুকন বিশেষ করে যাকাত দিতে অস্বীকার করে। এ অস্বীকারের কারণ ছিল আরব জাতি-গোষ্ঠীর প্রাচীন লাগামহীনতা ও উচ্ছৃংখলতা। ইসলাম মানুষের উপর যাকাত ফরয করেছিল। এটা ছিল ট্যাক্স বিশেষ। মালের পরিমাণ হিসাবে সাহেবে নিসাব লোকদেরকে তা (ট্যাক্স) আদায় করতে হতো। এই ট্যাক্স বা খাজনাকে স্বাধীনচেতা লোকেরা তাদের জন্য একটি বোঝা স্বরূপ মনে করতো। যারা তখনো ভাল মতো ইসলামের স্বাদ আস্বাদন করেনি, তারা এই ইসলামী খাজনা পরিশোধ করতে অস্বীকার করে। অবশিষ্ট ইসলাম ধর্মকে তারা অস্বীকার করেনি। যাকাত অস্বীকার যেহেতু জাতি-গোষ্ঠীর মেজায ও বৈষয়িক স্বার্থের অনুকূল ছিল, তাই এই অস্বীকৃতির মধ্যে এক এক করে গোটা দেশ শরীক হয়ে যায়। কিন্তু এটা যেহেতু একটি বিদ্রোহ ছিল, তাই নও-মুসলিম বিদ্রোহীদেরকে মুসায়লামা ও তুলায়হা প্রমুখ মিথ্যাবাদী নিজেদের দিকে আকর্ষণ করার এবং আর্থিক ইবাদত ছাড়া দৈহিক ইবাদতের মধ্যেও লাঘব ঘটিয়ে নিজ নিজ নবুওয়াত মানানোর সুযোগ পায়।

যাহোক, শির্‌ক ও মূর্তিপূজার বিষয়টি আদৌ আলোচনাধীন ছিল না। কিন্তু দীন-ইসলাম মানব জাতির মধ্যে যে নিয়ম-শৃংখলা ও বিধি-ব্যবস্থা কায়েম করতে চেয়েছিল, তা বাহ্যত ওলট-পালট হতে বসেছিল। এই ঘোর বিপদের চিকিৎসা ছিল মুশরিক ও কাফিরদের যুদ্ধবাজি থেকেও অধিক শক্ত ও কঠিন। কেননা, যাকাত অস্বীকারকারীদের সংকল্প ও ঘোষণা শোনামাত্রই হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) সাহাবায়ে কিরামকে একত্রিত করে পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত করেন। সভায় কোন কোন সাহাবা এই মত প্রকাশ করেন যে, যাকাত অস্বীকারকারীদের সাথে মুশরিক ও কাফিরদের ন্যায় যুদ্ধ করা ঠিক হবে না। কিন্তু এ অভিমতটিও ছিল ঠিক তেমনি দুর্বল, যেমন উসামা বাহিনীর যুদ্ধযাত্রার বিরুদ্ধে কোন কোন লোক প্রকাশ করেছিল। আর যে ভাবে এই অভিমত হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) মানেননি, তেমনিভাবে এই দুর্বল মতটিও তিনি গ্রহণযোগ্য মনে করেন নি। তিনি বলেন, "আল্লাহ্‌র কসম! যাকাতের একটি জন্তু বা একটি শস্যকণাও যদি কোন গোত্র পরিশোধ না করে, তবে আমি তার বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ করবো।"

মুরতাদদের প্রতিনিধি দল মদীনা মুনাওয়ারায় আগমন করে আবেদন করেছিল : সালাত আমরা আদায় করছি, যাকাত আমাদেরকে মাফ করে দিন। কিন্তু হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নিকট থেকে ঐ সাফ জবাব শুনে তারা নিজ নিজ গোত্রের মধ্যে ফিরে গেল। তৎক্ষণাৎ সারা দেশে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর এই দৃঢ় সংকল্পের খবর পৌঁছে গেলো এবং মুরতাদ ও যাকাত অস্বীকারকারীরা মুকাবিলা ও যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলো। প্রদেশসমূহের আলিমগণ তাঁদের নিজ নিজ প্রদেশের লোকদের বিদ্রোহী হওয়া এবং

যাকাত আদায় না হওয়ার সংবাদ পাঠান। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) পূর্ণ প্রস্তুতি, পূর্ণ সাহস ও স্থৈর্যের সাথে একজন সজাগ-মস্তিষ্ক ও রাষ্ট্রনায়ক শাহানশাহরূপে আলিমদের প্রতি যথাযথ নির্দেশনামা এবং গোত্রপতিদের নামে পত্র প্রেরণ করেন। একদিকে উসামা বাহিনী রোমকদের সাথে যুদ্ধরত ছিল, অন্যদিকে মদীনার আশেপাশে সমবেত মুরতাদগণ মদীনার উপর হামলা করার হুমকি দিচ্ছিল। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) যেমন দূর-দূরান্তের মুরতাদদের নিকট চরম হুমকিমূলক পত্র প্রেরণ করেছিলেন, তেমনি আশেপাশের বিদ্রোহীদের হামলা প্রতিরোধ করার জন্যও প্রস্তুত ছিলেন।

তিনি মদীনা মুনাওয়ারার তদানীন্তন মুসলমানদের যুদ্ধযোগ্য লোকদেরকে মসজিদে নববীর সামনে সর্বক্ষণ উপস্থিত ও প্রস্তুত থাকার জন্য নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন এবং হযরত আলী (রা), হযরত যুবায়র (রা), হযরত তালহা (রা), হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা)-কে মদীনা মুনাওয়ারার আশপাশ পাহারা দেওয়ার জন্য আদিষ্ট করে রেখেছিলেন, যাতে মদীনার উপর কোন গোত্র আক্রমণ করলে সঙ্গে সঙ্গে সে খবর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নিকট পৌঁছতে পারে। আবরাক নামক স্থানে আব্স গোত্র এবং যুল-কিসসা নামক স্থানে যুবয়ান গোত্র অবস্থান করছিল। বনূ আসাদ ও বনূ কিনানারও কিছু লোক তাদের মধ্যে ছিল। আব্স ও যুবয়ান গোত্রদ্বয় যখন জানতে পারলো যে, মদীনা মুনাওয়ারায় তখন স্বল্প সংখ্যক লোক অবশিষ্ট রয়েছে এবং যাকাত মাফ করার কথা হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) পরিষ্কার অস্বীকার করেছেন, তখন তারা একমত হয়ে মদীনার উপর হামলা করলো। এই হামলাকারীদেরকে হযরত আলী (রা) মদীনার বাইরেই প্রতিরোধ করে মদীনায় সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন। এদিক থেকেও অনতিবিলম্বে সাহায্য প্রেরিত হলো। মুসলমানরা যূ-খাশাব পর্যন্ত তাদেরকে হটিয়ে দিলেন। শত্রুরা পরাজিত হয়ে পলায়ন করলো বটে, কিন্তু ভিন্ন পথে দফ ও নানারকম বাজনা বাজাতে বাজাতে ফিরে এলো। এতে মুসলমানদের উটগুলো ভয় পেয়ে মদীনায় পালিয়ে আসে। এই অবস্থা দেখে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) নিজে মদীনা থেকে বের হলেন এবং শত্রুর উপর হামলা করেন। পাঁচ-ছয় ঘন্টার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে মুরতাদরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় এবং মুসলমানদের হাতে বহু লোক নিহত হয়।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হযরত নু'মান ইব্ন মুকাররিন (রা) ও ছোট্ট একটি দলের মাধ্যমে গনীমতের মাল মদীনায় প্রেরণ করেন এবং স্বয়ং শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনে যুল-কিসসা নামক স্থান পর্যন্ত অগ্রসর হন। এদিকে শত্রুদের একটি বিরাট দল ধোঁকা দিয়ে এবং দৃষ্টি এড়িয়ে মদীনা আক্রমণ করলো। তারা কতক মুসলমানকে শহীদ করলো এবং মালে গনীমত পুনরুদ্ধার করে চলে গেল। আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ফিরে এসে এই ঘটনা শ্রবণ করে যারপরনাই দুঃখিত হলেন এবং শপথ করলেন যে, মুরতাদদের হাতে যতজন মুসলমান শাহাদাত বরণ করেছেন, ততজন মুরতাদ হত্যা না করে আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবো না। তিনি এই সংকল্প ও আয়োজনে রত থাকাবস্থায়ই হযরত উসামা (রা) মালে গনীমত্সহ মদীনায় প্রবেশ করেন। তিনি উসামা (রা) ও তাঁর বাহিনীকে সফরের ক্লান্তি দূরীকরণার্থে মদীনায় আরাম করার জন্য রেখে খোদ মদীনার মুসলমানদের ছোট্ট দলটি নিয়ে যুল-খাশাব ও যুল-কিসসার দিকে বের হয়ে পড়লেন। আবরাক নামক স্থানে আব্স, যুবয়ান, বনূ বকর, ছা'লাবা ইব্ন সা'দ প্রভৃতি গোত্র মুকাবিলায় প্রবৃত্ত হলো। ঘোর যুদ্ধ সংঘটিত হলো। শেষে মুরতাদরা পরাজিত হয়ে

পলায়ন করলো। আবরাক নামক স্থানে হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) অবস্থান করলেন এবং বনূ যুবয়ানের জায়গাগুলো মুসলমানদের প্রদান করলেন। তাদের চারণভূমিগুলো মুজাহিদদের ঘোড়ার জন্য ওয়াক্ফ করলেন। এরপর সেখান থেকে তিনি যুল-কিসসা নামক স্থান পর্যন্ত গমন করেন এবং দুশমনদের ইচ্ছামতো কানমলা দিয়ে মদীনায় প্রত্যাগমন করেন। এতক্ষণে উসামা বাহিনীরও ক্লান্তি দূর হয়েছিল।

আরবদেশে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) যেসব লোকের সাথে মুকাবিলা ও যুদ্ধ করেছিলেন, তারা দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম, সেসব লোক–যারা নজ্‌দ, ইয়ামান, হাযরামাউত প্রভৃতি এলাকায় মুসায়লামা, তুলায়হা, সাজা প্রমুখ মিথ্যা নবুওয়াতদাবীকারীদের সাথে একমত হয়ে গিয়েছিল। এদের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষেত্রে কোন সাহাবীর দ্বিমত ছিল না। দ্বিতীয় সেসব গোত্র-যারা যাকাত পরিশোধ করতে অস্বীকার করতো। এদের সাথে যুদ্ধ করা কোন কোন সাহাবী সমীচীন মনে করেননি। কিন্তু হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর রায় প্রদানের পর সব সাহাবীই তাঁর রায়ের সাথে একমত হন। এই দুই ধরনের লোকের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য তো অবশ্যই ছিল, কিন্তু মুসলমানরা যখন উভয়ের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করা সমান জরুরী সাব্যস্ত করেন, তখন ঐ দুই শ্রেণীর মধ্যে কোন পার্থক্য ও তফাৎ অবশিষ্ট ছিল না। আর প্রকৃত ঘটনাও এই যে, এই উভয় শ্রেণীই দুনিয়াদারী ও জড়বাদিতার একই সয়লাবে ভেসে গিয়েছিল যাদেরকে সিদ্দীকী কৌশল ও আধ্যাত্মিকতা ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা করে এবং এই ধ্বংসকারী তুফান থেকে নাজাত দিয়ে আরব সেনাবাহিনীকে বিজয়ের শীর্ষে নিরাপদে পৌঁছে দেয়।

সিদ্দীক আকবরের ফরমান

সিদ্দীকে আকবর (রা) মদীনায় আগমন করেই সর্বপ্রথম একটি ফরমান লিপিবদ্ধ করেন এবং তার বিভিন্ন কপি করিয়ে দূত মারফত প্রত্যেক মুরতাদ গোত্রের নামে এর এক-একটি কপি প্রেরণ করেন। দূতকে বলা হলো যে, সর্বপ্রথম গিয়ে গোটা গোত্রের লোকদেরকে একটি সমাবেশে ডেকে এই ফরমান শুনিয়ে দিতে হবে। এই ফরমান বা ঘোষণার সাধারণ বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপ :

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খলীফা আবূ বকরের তরফ থেকে প্রত্যেক সেই ব্যক্তির প্রতি, যার নিকট এই ফরমান পৌঁছবে সে ইসলামের উপর কায়েম থাকুক বা ইসলাম ত্যাগ করে থাকুক। জানা আবশ্যক যে,

فانی احمد الیکم اللّٰه الذی لا اله الا هو وحده لا شریك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وامن بما جاء واکلر من ابی واجاهده · اما بعد ·

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে সত্য নবীরূপে প্রেরণ করেছেন। যিনি সুসংবাদাতা, ভীতি প্রদর্শনকারী, আল্লাহ্‌র নির্দেশে মানুষকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারী এবং হিদায়াতের আলোকবর্তিকা। যে ব্যক্তি ইসলামের দাওয়াত কবূল করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে হিদায়াত দান করেন এবং সাফল্যের সোজা পথ প্রদর্শন করেন। আর যে ব্যক্তি অস্বীকার করে, আল্লাহ্‌র নির্দেশে তাকে জিহাদের মাধ্যমে বশ্যতা ও আনুগত্যের প্রতি ফিরিয়ে আনা হয়। আল্লাহ্‌র আইন বাস্তবায়ন করা, মুসলমানদের নসীহত করা এবং স্বীয় কর্তব্য ও প্রচার কার্য সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করার পর হযরত নবী করীম (সা) এ দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ্

তা'আলা এ খবর কুরআন মজীদে পূর্বেই দান করেছিলেন। اِنَّكَ مَيِّتٌ وَاِنَّهُمْ مَيِّتُوْنَ (তুমিও মরণশীল এবং তারাও মরণশীল) (সূরা যুমার, আয়াত ৩০)।

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ · اَفَائِنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخٰلِدُوْنَ ·

আমি তোমার পূর্বেও কোন মানুষকে অনন্ত জীবনদান করিনি। সুতরাং তোমার মৃত্যু হলে তারা কি চিরজীবী হয়ে থাকবে? (সূরা আম্বিয়া, আয়াত ৩৪)

এবং মুসলমানদেরকে এরূপ সম্বোধন করে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে-

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَائِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ · وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ ·

মুহাম্মাদ একজন রাসূল মাত্র। তার পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছে। সুতরাং যদি সে মারা যায় অথবা সে নিহত হয়, তবে তোমরা কি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে? এবং কেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে সে কখনো আল্লাহ্র ক্ষতি করবে না। বরং আল্লাহ্ শীঘ্রই কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কৃত করবেন (৩ : ১৪৪)।

কাজেই যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সা)-কে পূজা করতো, (তার জেনে রাখা উচিত যে,) মুহাম্মদ নিঃসন্দেহে ইনতিকাল করেছেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি একক আল্লাহ্র উপাসনা করতো, তার আল্লাহ্ জীবিত ও বর্তমান আছেন। তিনি না মৃত্যুবরণ করেছেন, না তাকে নিদ্রা ও তন্দ্রা স্পর্শ করতে পারে। তিনি তাঁর নির্দেশ রক্ষা করেন এবং আপন দলের মাধ্যমে শত্রুর নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্কে ভয় করা, নবীর আনীত নূর ও আল্লাহ্র রহমতে অংশ গ্রহণ করা, ইসলামের হিদায়াত কবূল করা এবং আল্লাহ্র দীনের মযবুত রশি আঁকড়ে ধরার উপদেশ প্রদান করছি। আল্লাহ্ যাকে হিদায়াত করেননি, সে পথভ্রষ্ট হয়েছে। আর যাকে আল্লাহ নিরাপত্তা দান করেননি, সে বিপদে পতিত হয়েছে। আল্লাহ্ যাকে সাহায্য করেন না, সে এক ও একাকী এবং বন্ধুহীন ও অসহায়। মানুষ যতক্ষণ ইসলামকে অস্বীকার করবে, দুনিয়া ও আখিরাতে তার কোন আমল কবূল হতে পারে না। আমি অবগত হয়েছি যে, তোমাদের মধ্য থেকে কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করা ও তার আজ্ঞা ও নির্দেশাবলী পালন করার পর আল্লাহ্ থেকে মুখ ফিরিয়ে মূর্খতা ও শয়তানের আনুগত্যের প্রতি ঝুঁকে পড়েছে। তোমরা কি আল্লাহ্কে ত্যাগ করে তোমাদের দুশমন শয়তান ও তার সন্তান-সন্ততিকে বন্ধু বানিয়ে নিচ্ছ? অথচ আল্লাহ্ বলছেন, শয়তান তোমাদের শত্রু। তাই তোমরাও তাকে তোমাদের শত্রু জ্ঞান করো। কেননা, তারা তো তাদের দলকে তোমাদের দোযখী বানানোর জন্য উদ্বুদ্ধ করছে। আমি তোমাদের প্রতি মুহাজির ও আনসার বাহিনীকে প্রেরণ করছি। তারা সত্যের অনুসারী। আমি তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছি যে, প্রথমে ইসলামের দাওয়াত দেয়া ছাড়া কারো মুকাবিলা করবে না। আমি আরো নির্দেশ দিয়েছি যে, যে ব্যক্তি ইসলাম কবূল করবে এবং মন্দ কাজ থেকে ফিরে থাকবে, নেক কাজ বর্জন করবে না, তাকেই সাহায্য করবে। আর যে ইসলামকে অস্বীকার করবে, তার মুকাবিলা করবে তাকে মোটেই শ্রদ্ধা ও সম্মান করবে না, আর ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করবে না। অতএব, যে ব্যক্তি ঈমান আনয়ন করবে, সে কল্যাণ লাভ করবে, অন্যথায় সে আল্লাহ্কে অপারগ করতে পারবে না। আমি আমার কাসিদকে নির্দেশ

দিয়েছি যে, আমার এই ঘোষণাকে প্রত্যেক জনসভায় পাঠ করে শোনাবে। ইসলামী লশকর যখন তোমরা নিকট পৌঁছে যাবে এবং তাদের মুআযযিন আযান দেবে, তখন তোমরাও তাদের মুকাবিলায় আযান দেবে। এতে প্রতীয়মান হবে যে, তোমরা ইসলাম কবূল করেছো। তখন তোমাদের উপর আক্রমণ করা হবে না। আর তোমরা যদি আযান না দাও, তবে তোমাদের নিকট কৈফিয়ত তলব করা হবে এবং অস্বীকার করলে তোমাদের উপর হামলা করা হবে।"

মুরতাদদের মূলোচ্ছেদ

এই ফরমানগুলো দূতদের মাধ্যমে প্রেরণ করার পর সিদ্দীকে আকবর (রা) এগারটি ঝাণ্ডা তৈরি করেন এবং এগারজন দলপতি নির্বাচিত করে একেকটি ঝাণ্ডা একেকজন দলপতির হাতে সোপর্দ করেন। এরপর প্রত্যেককে একেক দল সৈন্য প্রদান করে নির্দেশ দিলেন যে, মক্কা ও তায়িফ প্রভৃতি স্থান থেকে যেখানে যেখানে ইসলামের উপর দৃঢ়পদ গোত্র পাওয়া যাবে, তাদের মধ্য থেকে কিছু লোক ঐ গোত্র ও তাদের ঘরবাড়ী রক্ষার জন্য রেখে দেবে এবং কিছু লোক নিজ বাহিনীতে শরীক করে সামনে অগ্রসর হতে থাকবে। প্রথম ঝাণ্ডাটি হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)-কে দেয়া হয় এবং বলা হয় যে, সর্বপ্রথম তুলায়হা ইব্ন খুওয়ায়লিদ আসাদীর উপর আক্রমণ করবে।এই অভিযান শেষ হওয়ার পর বার্তা নামক স্থানে মালিক ইব্ন নুওয়ায়রার উপর আক্রমণ করবে। দ্বিতীয় ঝাণ্ডাটি দেয়া হয় হযরত ইকরামা ইব্ন আবূ জাহেলকে। তাকে ইয়ামামার মুসায়লামা কায্যাবের উপর হামলা করতে বলা হয়। তৃতীয় ঝাণ্ডা শোরাহবীল ইব্ন হাসানাকে সোপর্দ করা হয়। তাকে বলা হয় যে, তুমি ইকরামাকে সাহায্য করবে এবং ইয়ামামা অভিযান সম্পন্ন করে হাদরামাউতের বনূ কিন্দা ও বনূ কাযার উপর হামলা করবে। চতুর্থ ঝাণ্ডা হযরত খালিদ ইব্ন সাঈদ (রা) ইব্ন আসী লাভ করেন তাঁকে নির্দেশ দান করা হয় যে, সিরিয়ার সীমান্তে পৌঁছে সেখানকার গোত্রগুলোকে শায়েস্তা করবে। পঞ্চম ঝাণ্ডা হযরত আমর ইব্নু'ল 'আস (রা)-কে প্রদান করে হুকুম দেযা হয় যে, তুমি বনূ খুযাআর মুরতাদদের নিকট চলে যাও। ষষ্ঠ ঝাণ্ডা হযরত হুযায়ফা ইব্ন মুহসিন (রা)-কে দিয়ে আম্মান অভিমুখে যাত্রা করতে বলা হয়। সপ্তম ঝাণ্ডা আরফাজাহ্ ইব্ন হারছামাহ্ (রা)-কে প্রদান করে মুহ্রাবাসীদের দিকে যেতে বলা হয়। হুযায়ফাহ্ ও আরফাজাহ্কে আরো নির্দেশ দেয়া হয় যে, উভয়ে একসাথে থাকবে। আম্মানে থাকাকালে হুযায়ফা আমীর ও আরফাজাহ্ তার অধীনে থাকবে। আর যখন মুহরায় থাকবে, তখন আরফাজাহ্ আমীর হবে এবং হুযায়ফা তার অধীনে থাকবে। অষ্টম ঝাণ্ডা তুরায়ফা ইব্ন আজিযকে প্রদান করা হয়। তাঁকে বলা হয় যে, বনূ সুলায়ম ও তাদের মিত্র বনূ হাওয়াযিনের দিকে যাত্রা করো। নবম ঝাণ্ডা সুওয়ায়দ ইব্ন মুকাররিনকে প্রদান করা হয়। তিনি ইয়ামান (তিহামা) যাওয়ার নির্দেশ লাভ করেন। দশম ঝাণ্ডা আলা' ইব্ন হাদরামী-কে প্রদান করা হয়। তাঁকে বাহ্রায়নের দিকে যেতে বলা হয়। একাদশ ঝাণ্ডা মুহাজির ইব্ন আবী উমাইয়াকে দেয়া হয় এবং তাকে সানাআ অভিমুখে যাত্রা করতে বলা হয়।

এই দলপতিদের প্রেরণ করার সময় তাঁদের প্রত্যেককে একই বিষয়বস্তুর একেকটি ফরমান লিখে দেয়া হয়। এই ফরমানের বিষয়বস্তু ছিল এরূপ :

আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর ঘোষণা

"এই চুক্তিপত্র আল্লাহ্র রাসূলের খলীফা আবূ বকরের তরফ থেকে অমুক দলপতিকে প্রদান করা হচ্ছে– যখন তাকে ইসলামী লশকরের সাথে মুরতাদদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য

প্রেরণ করা হচ্ছে। ঐ দলপতির নিকট থেকে আমরা অঙ্গীকার নিয়েছি যে, তিনি আল্লাহ্ তা'আলাকে আপন প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল কাজের ব্যাপারে ভয় করতে থাকবেন। আমরা তাকে নির্দেশ দিয়েছি যে, আল্লাহ্ তা'আলার পথে মুরতাদদের সাথে তিনি লড়াই করবেন। কিন্তু সর্বপ্রথম দোষ এড়ানোর জন্য তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেবেন। যদি তারা সে দাওয়াত কবূল করে, তবে লড়াই থেকে বিরত থাকবেন। আর যদি তারা কবূল না করে, তবে তাদের উপর হামলা করবেন– যে পর্যন্ত না তারা ইসলাম কবূল করে। তারপর তাদেরকে তাদের দায়িত্ব ও অধিকার সম্বন্ধে জ্ঞাত করবেন। তাদের যা দেয়া কর্তব্য, তা তাদের নিকট থেকে আদায় করবেন এবং তাদের যা প্রাপ্য তা তাদেরকে প্রদান করবেন। এ ব্যাপারে কারো প্রতি কোনরূপ প্রশ্রয় বা অনুগ্রহ প্রদর্শন করা চলবে না। মুসলমানদেরকে শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করতে বাধা দেয়া হবে না। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র বিধান অমান্য করবে, তার সাথে লড়াই করা হবে। আর যে ব্যক্তি দাওয়াত কবূল করবে, তাকে নির্দোষ জ্ঞান করা হবে। আর যে ব্যক্তি মৌলিক স্বীকারোক্তির পর অন্তরে অন্য কোন আকীদা পোষণ করবে, তার হিসাব-নিকাশ আল্লাহ্ তা'আলা তার নিকট থেকে নেবেন। যে লোক অমান্য করে যুদ্ধ বাধিয়ে দেবে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর মুসলমানদেরকে বিজয় দান করবেন, এক-পঞ্চমাংশ ছাড়া তার সমস্ত মালে গনীমত বন্টন করে দেয়া হবে। আর এক-পঞ্চমাংশ আমাদের কাছে প্রেরণ করা হবে। আমরা আরো নির্দেশ দিয়েছি যে, দলপতি তাঁর সঙ্গীদেরকে তাড়াহুড়া ও নৈরাজ্য সৃষ্টি থেকে বিরত রাখবেন এবং অপর কোন লোককে তার দলের মধ্যে স্থান দেবেন না– যে পর্যন্ত তাকে উত্তমরূপে জেনে-বুঝে না নেবেন। তাহলে গুপ্তচরের ফিতনা থেকে রক্ষা পাবেন। তাকে আরো নির্দেশ দিয়েছি যে, মুসলমানদের সাথে সদ্ব্যবহার করবেন। ভ্রমণ ও অবস্থানকালে লোকদের সাথে কোমল ব্যবহার করবেন এবং তাদের উপর দয়া প্রদর্শন করবেন। ওঠা-বসা ও কথাবার্তায় পরস্পরের প্রতি ভদ্রতা ও নম্রতা রক্ষা করবেন।

এই দলপতি একাদশ হিজরীর জুমাদিউল আউয়াল মাসে মদীনা মুনাওয়ারা থেকে রওয়ানা হয়ে এবং নিজ নিজ নির্ধারিত স্থানে গিয়ে কর্মে নিয়োজিত হন।

তুলায়হা আসাদী

তুলায়হা ছিল একজন গণক ও জাদুকর। এই অবস্থায় সে ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু হযরত নবী করীম (সা)-এর শেষ জীবনে সে বিশ্বাসঘাতকতা করে স্বয়ং নিজে নবী হওয়ার দাবীদার সাজে। বনী ইসরাঈলের কোন কোন গোত্রও তার দলে শামিল হয়। তাকে দমন করার জন্য হযরত যিরার ইব্নুল-আযওয়ার (রা) গমন করেছিলেন। তিনি তাঁর কাজ সম্পন্ন না করতেই হযরত নবী করীম (সা)-এর ওফাতের খবর ছড়িয়ে পড়ে। তাই হযরত যিরার (রা) এই অভিযান অসম্পূর্ণ রেখে তাঁর সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে মদীনায় ফিরে আসেন। তুলায়হা এই অবসরে তার শক্তি সংহত ও দলবল বৃদ্ধি করার সুবর্ণ সুযোগ পায়। গাত্ফান ও হাওয়াযিন প্রভৃতি গোত্র যারা যুল-কিসসা ও যুল-খাশাব-এ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) দ্বারা পরাজিত হয়ে পলায়ন করেছিল– তুলায়হার নিকট গিয়ে তার দলভুক্ত হয়েছিল। নজ্দের বিখ্যাত বাযাখা কূপের কাছে তুলায়হা তার ক্যাম্প স্থাপন করে। তার আশপাশে গাত্ফান, হাওয়াযিন, বনূ আমির, বনূ তাঈ প্রভৃতি গোত্রের বিরাট সমাবেশ ঘটে।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) যখন একাদশ দলপতি নির্বাচিত করে প্রেরণ করতে চাইলেন, তখন হযরত আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) মদীনা মুনাওয়ারায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর রওয়ানার পূর্বে তাঁর তাঈ গোত্রের দিকে রওয়ানা হন এবং তাদেরকে বুঝিয়ে ইসলামের দিকে ফিরিয়ে আনেন। এই গোত্রের যেসব লোক তুলায়হার দলভুক্ত হয়েছিল, তাদের নিকট তাঈ গোত্রের লোক পাঠিয়ে বলেন, তোমরা খালিদ (রা)-এর হামলার পূর্বে নিজ গোত্রের লোকদের সেখান থেকে ডেকে নিয়ে আসো। সুতরাং বনূ তাঈ'র সমস্ত লোক তুলায়হার দল থেকে চলে এলো এবং সবাই ইসলামে ফিরে এসে হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর দলে যোগ দিলো। হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালিদ (রা) বাযাখার ময়দানে পৌঁছে তুলায়হা বাহিনীর উপর হামলা করেন। ব্যাপক যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে মুসলিম বাহিনীর দুই বাহাদুর হযরত উক্কাশা ইব্‌ন হিস্‌ন (রা) ও হযরত ছাবিত ইব্‌ন আকরাম আনসারী যারা নৈশ প্রহরায় রত ছিলেন শত্রুর হাতে শহীদ হয়েছিলেন। হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) ছাবিত ইব্‌ন কায়স (রা)-কে এবং বনূ তাঈর মধ্যে আদী ইব্‌ন হাতিমকে দলপতি নিয়োগ করে শত্রুর উপর হামলা করেন। তুলায়হা বাহিনীর সেনাপতি ছিল তার ভাই। আর তুলায়হা একটি চাদর মুড়ি দিয়ে লোকদের ধোঁকা দেয়ার জন্য আলাদা এক পাশে ওয়াহীর অপেক্ষায় বসেছিল। লড়াই খুব জোরেশোরে শুরু হলো।

মুরতাদ বাহিনীর উপর যখন বিপর্যয়ের চিহ্ন ফুটে উঠলো, তখন তুলায়হা বাহিনীর জনৈক নেতা উয়ায়মা ইব্‌ন হিস্‌ন তুলায়হার নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলো, কোন ওয়াহী নাযিল হয়েছে কিনা ? তুলায়হা বললো, এখনো হয়নি। কিছুক্ষণ পর উয়ায়মা আবার জিজ্ঞেস করলো এবং ঐ একই জবাব পেলো। তারপর ময়দানে গিয়ে সে যুদ্ধ করতে লাগলো। তখন প্রতি মুহূর্তে মুসলমানদের বিজয় সূচিত হতে যাচ্ছিল এবং মুরতাদদের কদম দুলে উঠছিল। উয়ায়মা তৃতীয় বার পুনরায় তুলায়হার নিকট গেলো এবং ওয়াহী সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে সে বললো, হাঁ, জিবরাঈল আমার নিকট এসেছিলেন। তিনি বলে গেলেন যে, তোমার জন্য তাই হবে, যা তোমাদের ভাগ্যে লেখা আছে।" উয়ায়মা একথা শুনে বললো, লোক সকল! তুলায়হা মিথ্যাবাদী! আমি চলে গেলাম। একথা শোনামাত্রই মুরতাদরা তৎক্ষণাৎ পলায়ন করলো। অনেকে নিহত, অনেকে পলাতক ও অনেকে বন্দী হলো। অনেকে তখনই মুসলমান হয়ে গেলো। তুলায়হা সস্ত্রীক ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সেখান থেকে পলায়ন করলো এবং সিরিয়া গমন করে খুযাআ গোত্রে আশ্রয় নিলো। কিন্তু ধীরে ধীরে যখন সমস্ত গোত্র মুসলমান হয়ে গেলো এবং স্বয়ং তার গোত্রও ইসলাম গ্রহণ করলো, তখন তুলায়হাও মুসলমান হয়ে হযরত উমর ফারূক (রা)-এর খিলাফতকালে মদীনায় আগমন করলো এবং তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করলো। উয়ায়না ইব্‌ন হিস্‌নও বন্দী হয়ে হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর সামনে এলো। তাকে হযরত খালিদ (রা) সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর নিকট মদীনায় প্রেরণ করলেন। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) ইসলাম পেশ করলেন। সে অত্যন্ত রূঢ়ভাবে তা প্রত্যাখ্যান করলো। ফলে নিহত হলো।

তুলায়হা বাহিনী যখন বাযাখা নামক স্থানে পরাজিত হয়ে পলায়ন করলো, তখন পলায়নকারীদের মধ্যে গাত্‌ফান, সুলায়ম, হাওয়াযিন প্রভৃতি গোত্রের লোক হাওয়াব নামক স্থানে গিয়ে সমবেত হলো। সেখানে তারা সালমা বিন্‌তে মালিক ইব্‌ন হুযায়ফা ইব্‌ন বদর

ইব্‌ন জা'ফরকে তাদের নেত্রী বানালো এবং মুকাবিলার প্রস্তুতি গ্রহণে আত্মনিয়োগ করলো। হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) এ ঘটনা অবগত হয়ে সেদিকে রওয়ানা হলেন। সাল্‌মাও তার বাহিনী নিয়ে মুকাবিলার জন্য এগিয়ে এলো এবং একটি উটনীর উপর সওয়ার হয়ে স্বয়ং সেনাপতির দায়িত্ব পালন করতে লাগলো। হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) হামলা করলেন। ঘোর যুদ্ধ হলো। সাল্‌মার উটনী রক্ষা করতে গিয়ে একশ' মুরতাদ নিহত হলো। শেষে সালমার উটনী যখমী হয়ে ভূমিতে পতিত হলো এবং সালমা নিহত হলো। তার নিহত হওয়ার সাথে সাথে মুরতাদরা পলায়ন করলো এবং নিমেষের মধ্যে ময়দান শূন্য হয়ে গেলো।

এদিকে এই হাঙ্গামা চলছিল, আর ওদিকে মদীনা মুনাওয়ারায় বনু সুলায়মের এক দলপতি আল-ফুজাত ইব্‌ন আব্‌দ ইয়ালীল হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো যে, আমি একজন মুসলমান। আপনি যুদ্ধাস্ত্র দিয়ে আমাকে সাহায্য করুন। আমি মুরতাদদের সাথে যুদ্ধ করবো। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) তাকে এবং তার সঙ্গীদেরকে যুদ্ধোপকরণ প্রদান করে মুরতাদদের মুকাবিলায় প্রেরণ করেন। কিন্তু সে মদীনা থেকে বের হয়ে স্বীয় মুরতাদ হওয়ার কথা ঘোষণা করলো এবং বনূ সুলায়ম ও বনূ হাওয়াযিনের যেসব লোক মুসলমান হয়েছিল, তাদেরকে হত্যা করার জন্য অগ্রসর হলো। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এই সংবাদ অবগত হয়ে আবদুল্লাহ ইব্‌ন কায়সকে প্রেরণ করেন। তিনি এই ধোঁকাবাজ মুরতাদদেরকে পথিমধ্যেই পাকড়াও করলেন এবং সংঘাত ও সংঘর্ষের পর আল-ফুজাত ইব্‌ন আব্‌দ ইয়ালীলকে বন্দী করে সিদ্দিকে আকবর (রা)-এর নিকট মদীনায় হাযির করা হলো এবং তাকে প্রাণদণ্ড প্রদান করা হলো।

সাজাহ্ ও মালিক ইব্‌ন নুওয়ায়রাহ্

বনূ তামীম কয়েকটি গোত্রে অন্তর্ভুক্ত এবং কয়েকটি বস্তিতে বসবাস করতো। এদের এলাকায় হযরত নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় এদেরই নিয়োগকৃত কয়েকজন কর্মকর্তা ছিলেন। তারা হলো মালিক ইব্‌ন নুওয়ায়রাহ, ওয়াকী ইব্‌ন মালিক, সাফওয়ান ইব্‌ন সাফওয়ান, কায়স ইব্‌ন আসিম প্রমুখ। হযরত নবী করীম (সা)-এর ওফাতের খবর পেয়ে কায়স ইব্‌ন আসিম মুরতাদ হয়ে গেলো। মালিক ইব্‌ন নুওয়ায়রাহও এই খবর শুনে আনন্দ প্রকাশ করলো। সাফওয়ান ইব্‌ন সাফওয়ান ইসলামের উপর বহাল রইল এবং কায়স ও সাফওয়ানের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলো। ইত্যবসরে তাগলিব গোত্রের সাজাহ্ বিনতুল হারছ ইব্‌ন সুওয়ায়দ নবূওয়াতের দাবী করলো এবং বনূ তাগলেবের সরদার হুযায়ল ইব্‌ন ইমরান, বনূ তামারের সরদার উক্‌বা ইব্‌ন হিলাল ও বনূ শায়বানের সরদার সুলায়ল ইব্‌ন কায়স তার নবুওয়াতের দাবী মেনে নিলো। সাজাহর চারপাশে প্রায় চার হাজার লশকর সমবেত হলো। সে এই লশকর নিয়ে মদীনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো। বনূ তামীমের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল। মালিক ইব্‌ন নুওয়ায়রাহ সাজাহ'র সাথে সন্ধি করে তাকে পরামর্শ দিলো বনূ তামীমের অন্যান্য গোত্রের উপর হামলা করতে। আর এইভাবে বনূ তামীমকে বাধ্য করে নিজেদের সঙ্গে নিয়ে মদীনার দিকে যাত্রা করতে সাজাহ বনূ তামীমের উপর হামলা করলো। বনূ তামীম মুকাবিরা করে তার লশকরকে পরাস্ত করলো। কিন্তু পরিশেষে সন্ধি হলো।

এক্ষণে সাজাহ মালিক ইব্‌ন নুওয়ায়রাহ ও ওয়াকী ইব্‌ন মালিককে সঙ্গে নিয়ে চললো। কিছু দূর গমন করে এবং কি চিন্তা করে ফেরত চলে গেলো। সাজাহ তার বাহিনী নিয়ে সামনে

অগ্রসর হলো। সাজাহ তার অনুসারীদের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামায অপরিহার্য রাখলো ও শূকরের গোশ্ত খাওয়া, শরাব পান করা ও জিনা করা জায়েয সাব্যস্ত করেছিল। বহু খ্রিস্টানও তাদের ধর্ম ত্যাগ করে সাজাহ'র দলভুক্ত হয়েছিল।

বনূ তামীমের বস্তিগুলো পার হয়ে সাজাহ জানতে পারলো যে, খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা) ইসলামী লশকর নিয়ে এদিকে আগমন করছেন। এদিকে মুসায়লামা কায্যাবের বিরাট বাহিনীর কথা শুনে তার সন্দেহ হলো, না জানি সেও নবুওয়াতের দাবীদার হওয়ার কারণে শত্রুতা ও বিরোধিতায় লেগে যায়। মুসায়লামা কায্যাব যখন সাজাহ বাহিনীর কথা শুনলো, তখন সেও দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে গেলো। একদিকে ইসলামী লশকরের আশংকা, আর অপর দিকে সাজাহ বিরাট বাহিনী নিয়ে রওয়ানা করেছে। তারা যদি এদিকে মনোনিবেশ করে, তবে বিরাট সংকট দেখা দেবে। এদিকে ইক্রামা (রা) ও শুরাহবীলও তাঁদের বাহিনী নিয়ে ইয়ামামার নিকটবর্তী পৌঁছে গিয়েছিলেন এবং মুসায়লামা ও সাজাহকে পরস্পরের দোসর ভেবে সাবধানতা অবলম্বন করেছিলেন। অবশেষে মুসায়লামা সাজাহকে এই মর্মে পত্র লিখলো যে, তোমার অভিপ্রায় কি ? সাজাহ উত্তর দিলো যে, আমি মদীনা মুনাওয়ারার উপর হামলা করতে চাই। আমি একজন নবী এবং শুনেছি আপনিও একজন নবী। তাই আমাদের উভয়কে সংঘবদ্ধভাবেই মদীনা আক্রমণ করা উচিত। মুসায়লামা সঙ্গে সঙ্গে পয়গাম পাঠালো যে, যতদিন হযরত মুহাম্মদ (সা) জীবিত ছিলেন, ততদিন অর্ধেক রাজ্য তাঁকে ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং অর্ধেক রাজ্য আমি আমার নিজের এলাকা মনে করতাম। এখন তাঁর ওফাতের পর গোটা রাজ্যের উপর আমার অধিকার প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু যেহেতু তুমিও নবুওয়াত দাবী করছো তাই আমি অর্ধেক পয়গাম্বরী তোমাকে দিয়ে দেবো। উত্তম এই যে, তোমার লশকর ওখানে রেখে একাকী আমার নিকট চলে এসো, যাতে তোমার সাথে পয়গাম্বরী বন্টন ও মদীনা আক্রমণ সম্পর্কিত যাবতীয় আলাপ-আলোচনা ও পরামর্শ অনুষ্ঠিত হতে পারে।

মিথ্যুক মহিলা নবীর বিবাহ

সাজাহ এই পয়গাম পেয়েই মুসায়লামার নিকট গমন করলো। সে তার দুর্গের সামনে একটি তাঁবু স্থাপন করলো। সাজাহকে সেখানে অবতরণ করালো। উভয়ের কথোপকথন হলো। সাজাহ মুসায়লামার পয়গাম্বরী মেনে নিলো। তার উপর ঈমান আনলো। তারপর উভয়ের বিবাহ হলো। বিবাহের পর সাজাহ তিন দিন পর্যন্ত মুসায়লামার নিকট থাকলো। সেখান থেকে বিদায় হয়ে তার লশকরের মধ্যে এলো। লশকররা বললো, বিবাহের মোহর কোথায় ? বিনা মোহরে তুমি কিরূপে বিবাহ করলে ? তারপর সে মুসায়লামার নিকট গেলো। মুসায়লামা বললো, আমি তোমার মোহরের বিনিময়ে তোমার দলের জন্য দুই ওয়াকত নামায অর্থাৎ ঈশা ও ফরয মাফ করে দিলাম। সাজাহ সেখান থেকে বিদায় হয়ে এলো। হুযায়ল ও উক্বাকে ইয়ামামার অর্ধেক ফসল আদায় করার জন্য নিয়োগ করে যাত্রা করেছিল। ইত্যবসরে খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) যিনি বনূ তামীমের দিকে অগ্রসর হয়ে আসছিলেন, সামনে পড়ে গেলেন। খালিদ ইব্ন ওয়ালীদের লশকর দেখেই সাজাহ'র সঙ্গীরা পলায়ন করলো। আর সে অতিকষ্টে আপন বনূ তাগ্লিব গোত্রের জাযীরা নামক স্থানে পৌঁছে অজ্ঞাত জীবন যাপন করতে লাগলো।

হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) বনূ তামীম এলাকায় পৌঁছে যারা ইসলামের উপর বহাল ছিল, তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন না। কিন্তু যারা মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল তারা গ্রেফতার ও নিহত হলো। মুরতাদ ও মুসলমানের পরিচয় হতো আযানের মাধ্যমে। যেমন পূর্বে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর ফরমানে আলোচিত হয়েছে। মালিক ইব্ন নুওয়ায়রার বস্তিগুলোর উপরও আযানের পরই হামলা হয়েছিল।

মালিক ইব্ন নুওয়ায়রার হত্যা

মালিক ইব্ন নুওয়ায়রার কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। সে নবী করীম (সা)-এর ওফাতের কথা শুনে আনন্দ প্রকাশ করেছিল। সাজাহ'র সাথেও সে আপোস রফা করেছিল। কিন্তু পরে তার লশকর থেকে পৃথক হয়ে চলে গিয়েছিল। মালিক ইব্ন নুওয়ায়রা যখন গ্রেফতার হয়ে এলো এবং হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)-এর সামনে তাকে পেশ করা হলো, তখন কোন কোন মুসলমান বললো, মালিক ইব্ন নুওয়ায়রার বস্তি থেকে প্রত্যুত্তরমূলক আযানধ্বনি এসেছিল। তাই তাকে হত্যা করা উচিত নয়। কেউ কেউ বললো, তারা প্রত্যুত্তরে আযান বলেনি। তাই তাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খলীফার নির্দেশ অনুযায়ী হত্যা করা ওয়াজিব। হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) যতটুকু তথ্য তালাশ করেছেন, তাতে এ ব্যাপারে কোন বিশ্বাসযোগ্য ও নিশ্চিত সাক্ষ্য প্রমাণ হস্তগত হয়নি। আরও আশ্চর্য এই যে, মালিক ইব্ন নুওয়ায়রা যখনি খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)-এর সাথে কথাবার্তা বললো, তখন তাঁর মুখ থেকে আলোচনার সময় কয়েকবার এরূপ কথা বের হলো যে, তোমাদের সাহিব এরূপ বলেছিলেন, কিংবা তোমাদের সাহিব এরূপ নির্দেশ দিয়েছিলেন ইত্যাদি। 'তোমাদের সাহিব' কথাটি দ্বারা সে হযরত নবী করীম (সা)-কে বুঝিয়েছিল। হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) এই শব্দটি শ্রবণ করে ক্রুদ্ধ হয়ে বললো, "তিনি কি তোমার সাহিব ছিলেন না ?" মালিক ইব্ন নুওয়ায়রা এর কোন সদুত্তর দিতে পারেনি। তাবারীর রিওয়ায়াত অনুযায়ী হযরত যিরার ইব্ন আযওয়ার (রা) এ সময় অসি হস্তে দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি হযরত খালিদ (রা)-এর ইঙ্গিতে তার শির উড়িয়ে দিলেন। এ ছিল যুদ্ধক্ষেত্রের একটি অতি ক্ষুদ্র ঘটনা। কিন্তু ঐতিহাসিকদের এই ঘটনাটি বিশেষভাবে এজন্য উল্লেখ করতে হয় যে, ঐ সময় হযরত আবূ কাতাদাও হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)-এর ফৌজের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং তিনি ছিলেন সেসব লোকের অন্যতম, যারা মালিক ইব্ন নুওয়ায়রার বস্তি থেকে আযানধ্বনি শোনা যাওয়ার প্রবক্তা ছিল। তাই তাঁর মতে মালিক ইব্ন নুওয়ায়রাকে হত্যা করা অনুচিত ছিল। কোন কোন ঐতিহাসিক একথাও লিখেন যে, মালিক ইব্ন ওয়ালীদ (রা) হত্যা করেননি বরং তিনি অতিরিক্ত ব্যবস্থা হিসাবে প্রকৃত ঘটনা তদন্তের জন্য মালিক ইব্ন নুওয়ায়রাকে যিরার ইব্ন আযওয়ার (রা)-এর তত্ত্বাবধানে সমর্পণ করেছিলেন এবং ঘটনাচক্রে রাতের বেলা প্রতারণামূলকভাবে মালিক ইব্ন নুওয়ায়রা যিরার ইব্ন আযওয়ারের হাতে নিহত হয়। যা হোক, হযরত আবূ কাতাদা (রা) অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং তিনি তাঁর অসন্তুষ্টি প্রকাশার্থে খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)-এর অনুমতি ব্যতিরেকে ক্রুদ্ধ হয়ে মদীনায় চলে আসেন এবং এখানে এসে অভিযোগ দায়ের করেন যে খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ মুসলমানদেরকে হত্যা করছেন। হযরত উমর ফারূক (রা) ও মদীনার অন্যান্য সাহাবা যখন একথা শুনতে পেলেন, তখন তাঁরা খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) সম্পর্কে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নিকট অভিযোগ করে বললেন যে, খালিদকে বরখাস্ত করে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া উচিত। মদীনা

মুনাওয়ারার খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) সম্পর্কে সাধারণ অসন্তোষ এজন্যও ছড়িয়ে পড়লো এবং মুসলিম হত্যার অভিযোগ তাঁর উপর আরো এজন্য দৃঢ় হলো যে, হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) পরবর্তী সময় মালিক ইব্ন নুওয়ায়রার স্ত্রীকে বিবাহ করেছিলেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) সব কথা শ্রবণ করে খালিদের অনুমতি ছাড়া তাঁর লশকর থেকে চলে আসার জন্য হযরত আবূ কাতাদাহ (রা)-কে অপরাধী সাব্যস্ত করেন। তাঁকে নির্দেশ দেয়া হলো ফেরত চলে যেতে এবং খালিদের লশকরে শামিল হয়ে তাঁর যাবতীয় নির্দেশ পালন করতে। সুতরাং তাকে ফিরে যেতে হলো। আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হযরত উমর ফারূক (রা) ও অন্যান্য সাহাবাকে বোঝালেন যে, খালিদের উপর বড়জোর একটি ইজতিহাদী ভুলের অভিযোগ আরোপ হতে পারে। সামরিক ব্যবস্থা ও যুদ্ধনীতি দৃষ্টে আল্লাহ্‌র অসি খালিদের ক্ষেত্রে কিসাস ও বরখাস্ত কোন দণ্ডই প্রযোজ্য নয়। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) মালিক ইব্ন নুওয়ায়রার রক্তপণ বায়তুল মাল থেকে পরিশোধ করে দিলেন। এই একটি মাত্র ঘটনা থেকেই অনুমান করা যায় যে, সাহাবায়ে কিরাম তাঁদের শত্রুদেরকে হত্যা করার ক্ষেত্রেও কি পরিমাণ সাবধানতা অবলম্বন করতেন এবং তাঁরা একজন সাধারণ মানুষের জন্য একজন উঁচুদরের সিপাহসালারকেও সত্য ও ন্যায়ের সম্ভ্রম রক্ষার্থে হত্যা করা ও মৃত্যুদণ্ড দেয়া জরুরী মনে করতেন।

মুসায়লামা কাযযাব

মক্কা বিজয়ের পর বিভিন্ন গোত্রের পক্ষ থেকে যেসব প্রতিনিধিদল নবী করীম (সা)-এর দরবারে হাযির হয়ে মুসলমান হয়েছিল তাদের মধ্যে মুসায়লামা ইব্ন হাবীবও বনূ হানীফার প্রতিনিধি দলে শামিল ছিল। নবীযুগের বিভিন্ন ঘটনা প্রসঙ্গে সে কথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। সে যখন তার স্বদেশ ইয়ামামায় ফিরে গেলো ঠিক সেই সময়ই নবী করীম (সা)-এর রোগাক্রান্ত হওয়ার খবর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো। মুসায়লামা তখন নবুওয়াতের দাবী করলো এবং নবী করীম (সা)-এর নিকট এই মর্মে কে পত্র প্রেরণ করলো যে, "নবুওয়াতের মধ্যে আপনি ও আমি উভয়ই অংশীদার। সুতরাং অর্ধেক রাজ্য কুরায়শের এবং অর্ধেক রাজ্য আমার। নবী করীম (সা) তার উত্তরে লিখলেন :

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد رسول الله الى مسيلمة الكذاب سلام على من اتبع الهدى - اما بعد فان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ·

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে। আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মদের তরফ থেকে মিথ্যাবাদী মুসায়লামার প্রতি। যে ব্যক্তি হিদায়াতের অনুসরণ করে, তার উপর সালাম। এরপর সমস্ত পৃথিবীর মালিকানা একমাত্র আল্লাহ্‌র। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। আর পরিণাম এক মাত্র মুত্তাকীদের জন্যই।

এই উত্তর পাঠানোর পর হযরত নবী করীম (সা) বনূ হানীফার জনৈক সম্ভ্রান্ত রিজাল ইব্ন 'আনফুহ্‌কে—যিনি হিজরত করে মদীনায় এসেছিলেন এবং হিজরত করার দরুন তাঁর গোত্রের মধ্যে তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল—মুসায়লামার নিকট পাঠিয়ে দিলেন, যাতে তিনি তাকে উপদেশ দিয়ে ইসলামের পথে কায়েম রাখতে পারেন।

রিজাল ইয়ামামায় পৌঁছে মুসায়লায়মাকে সমর্থন করলেন এবং তার অনুগত হয়ে গেলেন। ফলে মুসায়লামা খুব শক্তিশালী হয়ে উঠলো। হযরত নবী করীম (সা)-এর ওফাতের পর মুসায়লামা কাযযাবের তাৎক্ষণিক প্রতিকার সম্ভব হয়নি। কেননা, সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর মনোযোগ বিভিন্ন দিকে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। ইকরামা ইব্‌ন আবূ জাহ্‌লকে মুসায়লামা কাযযাবের শাস্তি বিধান কল্পে প্রেরণ করা হয়েছিল এবং তাঁর পিছনে শুরাহবীল ইব্‌ন হাসানাকে সাহায্যকারী হিসাবে পাঠানো হয়েছিল। ইকরামা (রা) মুসায়লামার নিকট পৌঁছে শুরাহবিলের শরীক হওয়ার পূর্বেই সহসা আক্রমণ করে পরাজিত হন। এই খবর শুনে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ইকরামা (রা)-কে লিখে পাঠালেন যে, তুমি এখন মদীনায় ফিরে আসবে না। বরং হুযায়ফা ও আরফাজার নিকট গমন করবে। আর তাদের অধীনে মুহ্‌রা ও আম্মানবাসীদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। তারপর এই অভিযান যখন শেষ হবে, তখন তুমি তোমার সৈন্যসহ ইয়ামন ও হাদরামাউতে মুহাজির ইব্‌ন আবী উমাইয়ার নিকট গমন করবে। আর শোরাহ্‌বীল ইব্‌ন হাসানাকে লিখলেন যে, তুমি খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদের প্রদেশগুলোর দিকে গমন করে সেখান থেকে কোযাআর দিকে চলে যাবে এবং আমর ইব্‌নুল 'আসের সাথে মিলিত হয়ে সেখানকার মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। ইতিমধ্যে হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) বাতাহ অঞ্চল অর্থাৎ বনূ তামীম অঞ্চলের অভিযান শেষ করেছিলেন। তিনি তাঁর অভিযান পূর্ণরূপে সম্পন্ন করে মদীনা মুনাওয়ারায় প্রত্যাবর্তন করলেন। এখানে খলীফার দরবারে হাযির হয়ে তাঁকে মালিক ইব্‌ন নুওয়ায়রার ব্যাপারে আত্মপক্ষ সমর্থনে সাফাই পেশ করতে হলো। হযরত উমর ফারূক (রা) যদিও হযরত খালিদ (রা)-এর বিরুদ্ধে কঠোরতা অবলম্বন ও শাস্তি বিধান করা জরুরী মনে করতেন, কিন্তু সিদ্দীকে আকবর (রা) তাঁকে নিরুপায় ও নির্দোষ দেখে শাস্তিযোগ্য মনে করেন নি বরং স্বীয় সন্তোষ প্রকাশ করে তাঁকে সসম্মানে মুহাজির ও আনসারদের একটি সেনাদল প্রদান করে মুসায়লামা কাযযাবের প্রতি প্রেরণ করলেন।

জাতীয়তার পথভ্রষ্টতা

মুসায়লামার চারপাশে রবীআ গোত্রের চল্লিশ হাজার যোদ্ধা সমবেত হয়েছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও ছিল যারা মুসায়লামাকে মিথ্যুক নবী মনে করতো। কিন্তু স্বজাতীয়তার দরুন তার সাফল্য কামনা করতো। তাদের বক্তব্য ছিল-মুসায়লামা মিথ্যুক এবং মুহাম্মদ (সা) সত্যবাদী বটে। কিন্তু আমাদের কাছে রবীআ গোত্রের মিথ্যুক নবী মুদার গোত্রের সত্য নবী অপেক্ষা অধিক প্রিয়। হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-কে বিদায় করার পর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তাঁর সাহায্যার্থে আরো সৈন্য প্রেরণ করেন, যারা পথিমধ্যে হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর সেনাদলে গিয়ে শামিল হতে থাকলো। হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদের সৈন্যসংখ্যা ছিল সর্বমোট তেরো হাজার। ইয়ামামা শহর যখন একদিনের দূরে ছিল, তখন হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) একটি ক্ষুদ্র দলকে অগ্রবর্তী দল হিসাবে প্রেরণ করেন।

ঐদিনই মুসায়লামা মুজাআ ইব্‌ন মুরারাকে বনূ তামীমের উপর হামলা করার জন্য ষাট জনের একটি দলসহ প্রেরণ করলো। ইসলামী অগ্রবর্তী দলের সাথে মুজাআর মুকাবিলা হলো। ফলে, সমস্ত মুরতাদ নিহত হলো এবং তাদের সরদার মুজাআকে গ্রেফতার করে হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর নিকট হাযির করা হলো। খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) সামনে অগ্রসর হয়ে ইয়ামামা শহরের নিকটবর্তী হলেন। মুসায়লামা ইয়ামামা শহর থেকে বের হয়ে শহর

তোরণ সন্নিহিত একটি উদ্যানে—যার নাম রেখেছিল যে হাদীকাতুর রহমান-তাঁবু স্থাপন করলো। এই উদ্যানের বাউন্ডারী ছিল খুব মযবুত ও দুর্গ সদৃশ। মুসায়লামা বাহিনীর সৈনাপত্য ছিল রিজাল ইব্‌ন আনফুহ ও মাহ্‌কাম ইব্‌ন তুফায়লের হাতে ন্যস্ত।

ঘোরতর যুদ্ধ

তাদের চল্লিশ হাজার বীর সৈনিক খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর তেরো হাজার সৈন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। এ হামলা ছিল অতি ভীষণ ও প্রলয়ংকারী। মুসলিম পক্ষ অত্যন্ত ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে এই হামলা প্রতিরোধ করলো। অতঃপর চতুর্দিক থেকে কুঞ্চিত হয়ে এবং নিজেদেরকে সামলে নিয়ে শত্রুর উপর ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো আক্রমণ করলো। ফলে মুসায়লামা বাহিনীর কদম দুলে উঠলো। তারা হতবুদ্ধি হয়ে ছত্রভঙ্গ ও পলায়ন করলো। মাহকাম ইব্‌ন তুফায়ল তার লশকরের এই অবস্থা দেখে উচ্চৈঃস্বরে বললো, "ওহে বনূ হানীফা! তোমরা উদ্যানে প্রবেশ করো। আমি তোমাদের পশ্চাদ্ধাবনকারী আক্রমণকারীদেরকে প্রতিরোধ করছি।" এই আহ্বান শ্রবণ করে পলায়নকারীরা সবাই উদ্যানে প্রবেশ করলো। মাহকাম ইব্‌ন তুফায়ল অল্প কিছুক্ষণ যুদ্ধরত ছিল। কিন্তু শেষে আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বকরের হাতে নিহত হলো। কিন্তু তখনো জয়-পরাজয়ের চূড়ান্ত ফায়সালা হয়নি। মুরতাদরাও নিজেদেরকে সামলে নিয়ে পুনরায় আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হলো। উভয় পক্ষ থেকেই বীর বিক্রমে যুদ্ধ আরম্ভ হলো। মুসলিম পতাকাবাহী ছাবিত ইব্‌ন কায়স (রা) শহীদ হলেন। হযরত যায়দ ইব্‌ন খাত্তাব (রা) পতাকা তাঁর হাতে তুলে নিলেন। মুসলমানরা এমন সামরিক বীরত্ব প্রদর্শন করলো যে, শত্রুপক্ষ পিছনে হটতে হটতে উদ্যান প্রাচীর প্রান্তে পৌঁছে গেলো। উদ্যান ফটকেও কিছুক্ষণ লড়াই চললো। শেষে মুসলমানরা উদ্যান-ফটকও ভেঙে ফেললো এবং এখানে-ওখানে প্রাচীর ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করলেন। লোকেরা মুসায়লামাকে জিজ্ঞেস করলো যে, "তোমার খোদা তোমার সাথে যে বিজয়ের ওয়াদা করেছে, তা কখন পূর্ণ হবে?" সে উত্তর দিলো, "এখন এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার সময় নয়। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তার পরিবার-পরিজন রক্ষার জন্য লড়াই করা উচিত।" উদ্যান-অভ্যন্তরেও যখন দাঙ্গা-হাঙ্গামা জোরে-শোরে শুরু হলো, তখন মুসায়লামা বাধ্য হয়ে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘোড়ার উপর সওয়ার হলো এবং তার লোকদেরকে লড়াই করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে লাগলো। কিন্তু সে যখন চতুর্দিকে মুসলমানদেরকে সবল ও শক্তিশালী দেখলো, তখন ঘোড়া থেকে অবতরণ করে সংগোপনে উদ্যান থেকে বের হয়ে যেতে লাগলো। ঘটনাক্রমে উদ্যান-ফটকের অদূরেই ওয়াহ্‌শী [হামযা (রা)-এর হন্তা] দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি তাঁর বর্শা নিক্ষেপ করলে তা মুসায়লামার লৌহবর্ম ফেটে তার উদর ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে গেলো। অবশেষে শত্রুপক্ষ যে যেদিকে পারলো পলায়ন করলো এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই মুসলমান ছাড়া মুরতাদদের কাউকে আর দেখা গেলো না। এই যুদ্ধে শত্রুপক্ষের সতের হাজার লোক মুসলিম মুজাহিদদের হাতে নিহত হয় এবং এক হাজারের কিছু বেশী মুসলমান শাহাদত বরণ করেন।.... কিন্তু মুসলিম পক্ষের আহতদের সংখ্যা ছিল খুব বেশী। শাহাদতবরণকারীদের মধ্যে কুরআনের হাফিযও ছিলেন অনেক। তিনশ' ষাটজন আনসার ও তিন শ' ষাটজন তাবিঈন এই যুদ্ধে শহীদ হন। যুদ্ধশেষে হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) মুজাআ ইব্‌ন মুরারা—কে যে বন্দী ছিল—সঙ্গে নিয়ে লাশ পরিদর্শন করেন। আর মুসায়লামা বাহিনীর নেতৃবর্গ ও স্বয়ং মুসায়লামার লাশ শনাক্ত করলো মুজাআ ইব্‌ন মুরারা।

বনূ হানীফা অর্থাৎ মুসায়লামা বাহিনীর জীবিত ব্যক্তিরা এদিকে-ওদিক পলায়ন করেছিল। ইয়ামামার শহর ও দুর্গে নারী ও শিশু ছাড়া কোন পুরুষ লোক অবশিষ্ট ছিল না। তাই আহতদের সেবা-শুশ্রূষা জরুরী ভেবে হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) ঐ দিনই ইয়ামামা শহর দখল করা প্রয়োজন মনে করেননি। তাঁর ইচ্ছা ছিল পরদিন ভোরে শহর দখলের পদক্ষেপ নেবেন মুজাআ ইব্ন মুরারা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ত্রুটি করলো না। সে খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)-কে বললো, আমাদের নেতৃবর্গ মুসায়লামাসহ মারা গেছে বলে আপনি মনে করবেন না যে, আপনি আপনার অভিযান পূর্ণ করে ফেলেছেন। এখানে তাদের চাইতে অনেক বড় বড় বীর যোদ্ধা জীবিত রয়েছে।

আর তারা শহরের মযবুত প্রাচীর ও রসদ সামগ্রী তথা যুদ্ধ-উপকরণের বিপুল ভাণ্ডারের সাহায্যে আপনাকে পরাভূত করে ছাড়বে। তাই উত্তম এই যে, আপনি কিছুক্ষণের জন্য আমাকে ছেড়ে দিন। আমি শহরে গিয়ে তাদেরকে আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নিষেধ করে আসবো এবং এইভাবে শহরকে তাদের সম্মতিতে সন্ধির মাধ্যমে আপনার হাতে ন্যস্ত করিয়ে দেবো। হযরত খালিদ মুজাআকে বললেন, আমি তোমাকে বন্দীত্ব হতে মুক্ত করে দিচ্ছি। তুমি গিয়ে তোমার সম্প্রদায়কে সন্ধির জন্য সম্মত করাবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলে দিচ্ছি যে, আমি কেবল তাদের প্রাণের জন্যই সন্ধি করবো।

মুজাআ মুসলিম বাহিনী থেকে রওয়ানা হয়ে শহরে গেলো এবং শহরের নারীদেরকে সশস্ত্র হয়ে নগর-প্রাচীরে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিয়ে যা কিছু বোঝানোর ছিল বুঝিয়ে এলো। সে ফিরে এসে বললো, আমার সম্প্রদায় নিছক তাদের প্রাণের জন্য সন্ধি করতে সম্মত নয়। হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) শহরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, সমস্ত নগর-প্রাচীর তলোয়ার ও বর্শা-বল্লমে চিকচিক করছে এবং সশস্ত্র লোকের আধিক্য সম্পর্কে মুজাআ যে বর্ণনা দিয়েছিল তার যথার্থতা প্রমাণিত হচ্ছিল। হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) আহতদের আধিক্য ও অভিযান দ্রুত সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সন্ধি করা উত্তম ভেবে এই মর্মে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন যে, অর্ধেক মাল আসবাব, অর্ধেক ফল-ফসলাদি ও অর্ধেক যুদ্ধবন্দী বনূ হানীফাকে ছেড়ে দেবেন। মুজাআ পুনরায় শহরে গেলো এবং ফিরে এসে বললো,তারা এতেও সম্মত নয়।আপনি এক-চতুর্থাংশ মাল-আসবাব ইত্যাদি নিয়ে সন্ধি করতে পারেন। হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) এক-চতুর্থাংশ মাল-আসবাব নিয়েই সন্ধি করলেন এবং সন্ধিপত্র লিখে দিলেন। এরপর দরজা খুলে যখন শহরে প্রবেশ করলেন, তখন সেখানে নারী ও শিশু ছাড়া একটি পুরুষ লোকও দেখতে পেলেন না। হযরত খালিদ তখন মুজাআকে বললেন, তুমি আমাদের সাথে প্রতারণা করেছো। মুজাআ বললো, আমার সম্প্রদায় সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যেতো। আমার কর্তব্য ছিল আপন সম্প্রদায়কে এই বিপদ থেকে রক্ষা করা। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। হযরত খালিদ (রা) নিশ্চুপ হয়ে রইলেন। চুক্তিপত্রের বরখেলাপ করার চিন্তা পর্যন্তও তাঁর অন্তরে উদয় হলো না। এর কিছুক্ষণ পরই মুসায়লামা ইব্ন ওয়াকাশ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর একটি পত্র নিয়ে এসে পৌঁছলেন। তাতে তিনি লিখেছিলেন, তুমি যদি বনূ হানীফার উপর বিজয় লাভ করতে পারো, তবে তাদের প্রাপ্তবয়স্ক লোকদের হত্যা করবে এবং তাদের নারী ও শিশুদেরকে বন্দী করবে। কিন্তু এই পত্র পৌঁছার পূর্বেই সন্ধিপত্র লেখা সম্পন্ন হয়েছিল। সুতরাং তাঁর হুকুম পালন করা সম্ভব হয়নি। অঙ্গীকার পালন ও ওয়াদা পূরণ করার দৃষ্টান্তসমূহের মধ্যে এ ঘটনাটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) বনূ হানীফার একটি প্রতিনিধিদল হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) সমীপে প্রেরণ করলেন। একটি পত্রও তিনি খলীফার নামে লিখে তাদের হাতে দিলেন। এই পত্রে বিজয়ের বিস্তৃত কাহিনী ও বনূ হানীফার পুনরায় ইসলাম গ্রহণের সংবাদ লিপিবদ্ধ ছিল। সিদ্দীকে আকবর (রা) এই প্রতিনিধি দলকে সসম্ভ্রমে সাক্ষাৎ দান করেন এবং সহৃদয়ে তাদের বিদায় দান করেন। ইয়ামামা যুদ্ধ ১১ হিজরীর যুলহাজ্জ মাসে সংঘটিত হয়।

হুতাম ইব্‌ন জুনায়আহ

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, হযরত আলা ইব্‌ন আল-হাযরামী (রা)-কে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) একটি সেনাদলের প্রধান নিযুক্ত করে বাহরায়নে প্রেরণ করেছিলেন। বাহরায়নে বনূ আবদুল কায়স, বনূ বকর ইব্‌ন ওয়াইল তাদের শাখা-প্রশাখাসহ এক বিরাট জনগোষ্ঠী ছিল। আপনারা এও পাঠ করেছেন যে, হযরত জারূদ ইবনুল-মুআল্লা (রা) তাঁর গোত্র বনূ আবদুল কায়স-এর পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হিসাবে হযরত নবী করীম (সা)-এর দরবারে হাযির হয়েছিলেন। হযরত নবী করীম (সা)-এর ওফাতের খবর পেয়ে বনূ আবদুল কায়সের লোকেরা একথা বলে মুরতাদ হয়ে গেলো যে, হযরত মুহাম্মদ (সা) যদি নবী হতেন, তবে তিনি কখনো ইনতিকাল করতেন না। হযরত জারূদ ইবনুল মুআল্লা (রা) তাঁর গোত্রকে এক স্থানে সমবেত করলেন এবং বললেন যে, আমি তোমাদের কাছে একটি কথা জিজ্ঞেস করবো। যে তার উত্তর অবগত আছে, সে চুপ থাকবে। এরপর তিনি তাঁর গোত্রকে সম্বোধন করে জিজ্ঞেস করলেন যে, তোমরা বলো, হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পূর্বেও দুনিয়ায় কোন নবী এসেছিলেন কিনা? সবাই বললো, হাঁ, এসেছিলেন। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে, তাঁরা সবাই সাধারণ মানুষের মতো জীবন যাপন করে ইহধাম ত্যাগ করেছেন কিনা? সবাই বললো, হাঁ, তাঁরা সবাই তাঁদের মিশন সম্পন্ন করে ইহধাম ত্যাগ করেছেন। এরপর হযরত জারূদ (রা) বললেন, অনুরূপভাবে মুহাম্মদ (সা)-ও তাঁর মিশন শেষ করে পরলোক গমন করেছেন। একথা বলে তিনি বললেন–

اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ۔

(আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই এবং হযরত মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল) এ দৃশ্য বনূ আবদুল কায়সের মনে এরূপ ক্রিয়া করলো যে, তারা তৎক্ষণাৎ তাওবা করলো এবং ইসলামের উপর কায়েম হয়ে গেলো।

বনূ আবদুল কায়স তো হযরত জারূদ ইব্‌নুল-মুআল্লাহর তাৎক্ষণিক প্রচেষ্টায় এইভাবে বেঁচে গেলো। কিন্তু বনূ বকর ইব্‌ন ওয়াইল মুরতাদ হয়ে হুতামকে তাদের নেতা নিযুক্ত করলো। হুতাম বনূ বকরের বিরাট বাহিনী নিয়ে বেরিয়ে পড়লো এবং উতায়ফ ও হাজরের মাঝখানে ডেরা ফেললো। আর কিছু লোককে বনূ আবদুল কায়সের প্রতি প্রেরণ করলো তাদেরকে মুরতাদ বানিয়ে নিয়ে আসার জন্য। কিন্তু বনূ আবদুল কায়স পরিষ্কারভাবে মুরতাদ হতে অস্বীকার করলো। ফলে তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলো। এরপর হুতাম মাগরূর ইব্‌ন সুওয়াদকে একটি সেনাদল প্রদান করে আশেপাশের মুসলমানদেরকে মুরতাদ বানানো কিংবা তাদের সাথে লড়াই করার জন্য প্রেরণ করলো। এই অবস্থায় হযরত আলা ইবনুল হাদরামী (রা) সসৈন্যে বাহ্‌রায়নে প্রবেশ করলেন। তিনি হযরত জারূদ ইবনুল মুআল্লার নিকট-যিনি দারায়ন নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন–নির্দেশ পাঠালেন যে, বনূ আবদুল কায়সকে সঙ্গে

নিয়ে হুতামের উপর হামলা করো। এই নির্দেশ পৌঁছা মাত্র এবং এই খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে আশেপাশের সকল মুসলমান হযরত আলা ইবনুল হাদরামী (রা)-এর নিকট এসে সমবেত হলো। আর যেসব মুরতাদ ও মুশরিক এই এলাকায় ছিল, তারা সবাই হুতামের দলে এসে জড়ো হলো। হযরত আলা ইবনুল-হাদরামী (রা) তাঁর লশকরসহ সামনে অগ্রসর হলেন এবং হুতামের সেনাছাউনির সন্নিকটে পৌঁছে তাঁবু স্থাপন করলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, হুতাম তার সেনাছাউনির চারপাশে একটি পরিখা খনন করিয়েছে। অবশেষে উভয় বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলো। এক মাস পর্যন্ত উভয় পক্ষ থেকে যুদ্ধ অব্যাহত রইল। কোন পক্ষই বিজয় লাভ করতে পারলো না। যখন পূর্ণ একটি মাস এই অবস্থায় অতিবাহিত হলো, তখন হযরত আলা ইবনুল-হাদরামী (রা) মুসলিম মুজাহিদদের সঙ্গে নিয়ে এক প্রচণ্ড আক্রমণ করলেন এবং মুসলিম বীর সেনারা পরিখা পার হয়ে কাফিরদের সেনাছাউনিতে ঢুকে পড়লো। হযরত কায়স ইব্ন আসিম (রা)-এর হাতে হুতাম নিহত হলো। বহু মুরতাদ নিহত হলো। অন্যরা পলায়ন করলো। পলায়নকারীদের পশ্চাদ্ধাবন করা হলো। অবশেষে ক্রমে ক্রমে সবাই ইসলামে ফিরে এলো। উপরোক্ত যুদ্ধে বহু গনীমতের মাল মুসলমানদের হস্তগত হলো। ফলে মুসলিম বাহিনীর অবস্থা খুব ভাল হলো।

লাকীত ইব্ন মালিক

উপরে উল্লিখিত হয়েছে যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হযরত হুযায়ফা ইব্ন হিস্ন (রা)-কে আম্মান এবং হযরত আরফাজা ইব্ন হারছামা (রা)-কে মুহরাবাসীদের প্রতি প্রেরণ করেছিলেন এবং উভয়কে একসাথে থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন। হযরত নবী করীম (সা)-এর ওফাতের খবর শুনে আম্মানে লাকীত ইব্ন মালিক নবুওয়াত দাবী করলো। আম্মানবাসী ও মুহরাবাসীরা মুরতাদ হয়ে গেলো এবং হযরত নবী করীম (সা)-এর পক্ষ থেকে যে সরকারী কর্মকর্তা সেখানে নিযুক্ত ছিলেন, তাকে বের করে দিলো। হযরত হুযায়ফা ইব্ন মিহ্সান হুমায়রী (রা)-কে সিদ্দীকে আকবর (রা) নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রথমে আম্মানে যেতে এবং সেখানকার অভিযান শেষ করে মুহ্রার দিকে গমন করতে। ওদিকে ইকরামা ইব্ন আবূ জাহেলকেও–যিনি ইয়ামামা প্রেরিত হয়েছিলেন–নির্দেশ দান করা হয়েছিল আম্মানে গিয়ে হুযায়ফা ও আরফাজার সাথে মিলিত হতে। সে মতে এই তিন নেতাই আম্মান প্রান্তরে মিলিত হয়ে তাঁবু স্থাপন করলেন। লাকীত ইসলামী লশকরের খবর পেয়ে সৈন্য সমাবেশ করলো এবং ওবা শহরে এসে সব রকম যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ইসলামী লশকরের মুকাবিলায় বের হলো। ইসলামী লশকরে ইকরামা (রা) ইব্ন আবী জাহেল ছিলেন মুকাদ্দামাতু'ল-জায়শ (অগ্রবর্তী বাহিনী)। সৈন্যব্যূহের ডান পাশে (রাইট উইং-এ) হুযায়ফা (রা), বাম পাশে (লেফট উইং-এ) আরফাজা (রা) এবং মাঝখানে ছিলেন আম্মানের সেই নেতৃবৃন্দ যারা ইসলামের উপর অটল ছিলেন এবং ইসলামী লশকর আগমনের খবর পেয়ে লশকরে শামিল হয়েছিলেন।

ফজরের সময় যুদ্ধ শুরু হলো। ইসলামী লশকর ছিল নিম্নভূমিতে। আর শত্রুপক্ষ সুযোগ পেয়েছিল উচ্চভূমিতে থাকার। প্রথমে যুদ্ধের গতিধারা ছিল মুসলমানদের বিপক্ষে এবং পরাজয়ের চিহ্ন ফুটে উঠেছিল। লাকীত খুব বীরত্বের সাথে ইসলামী লশকরের উপর হামলা করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের গতি পাল্টে গেলো এবং মুসলমানরা ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে মুকাবিলা করে শত্রুদের পিছনে হটিয়ে দিলো। শত্রুপক্ষ মুখ ফিরিয়ে পলায়ন করলো এবং মুসলমানদের

বিরাট বিজয় সাধিত হলো। এই যুদ্ধে দশ হাজার শত্রুসেনা নিহত হয় এবং চার হাজার গ্রেফতার হয়ে মুসলমানদের বন্দীত্বে আসে। সেই অনুপাতে সৈন্যরা মালে গনীমত নিয়ে মদীনায় আগমন করে এবং হযরত ইকরামা (রা) মুহরা গমন করেন। এর কয়েকদিন পর গোটা আম্মানে ইসলাম কায়েম হয়ে গেলো।

মুহরার অধিবাসীদের ধর্মত্যাগ

মুহরায় আম্মানের কিছু লোক অবস্থান করছিল। তাছাড়া বনূ আবদুল কায়সও সেখানে বিদ্যমান ছিল। আয্‌দ্ ও বনূ সা'দ ইত্যাদি গোত্র সেখানে বসবাস করছিল। এরা সবাই মুরতাদ হয়ে রাজত্ব ও নেতৃত্বের প্রশ্নে দুই দলে বিভক্ত হয়ে পরস্পরে দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত হয়েছিল। হযরত ইকরামা (রা) মুহরায় পৌঁছে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। একদল ইসলাম গ্রহণ করলো। অপর দল-যাদের নেতা ছিল মুসীহ–ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি ও ইসলাম ত্যাগে অটল থাকতে জিদ ধরলো। হযরত ইকরামা (রা) মুসলিম দলটি সঙ্গে নিয়ে মুরতাদদের উপর আক্রমণ করলেন এবং শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে তাদের দলপতিকে হত্যা করলেন। এই বিজয় আশপাশের উপর বিশেষ প্রভাব ফেললো। ফলে আশেপাশের গোত্রগুলো সানন্দে ইসলাম গ্রহণ করলো। হযরত ইকরামা (রা) মালে গনীমতসহ ইসলামী দেশ জয়ের বিশদ কাহিনী লিখে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর সমীপে প্রেরণ করেন। সেখান থেকে জবাব এলো, 'তুমি ইয়ামন গমন করে মুহাজির (রা) ইব্‌ন উমাইয়ার বাহিনীতে যোগদান কর।'

ইয়ামনবাসীর ধর্মত্যাগ

আসওয়াদ আনাসীর কথা উপরে আলোচিত হয়েছে। সে ইয়ামন দেশে নবুওয়াত দাবী করে প্রায় গোটা দেশেই নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু সে নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায়ই নিহত হয়ে স্বীয় অপকর্মের শাস্তি ভোগ করেছিল এবং ইয়ামন দেশে ইসলাম ত্যাগের পর পুনরায় ইসলামের প্রসার ঘটছিল। কিন্তু দিকচক্রবাল পুরাপুরি মেঘশূন্য না হতেই হযরত নবী করীম (সা) ইনতিকাল করেন। এই খবর প্রচার হওয়ার সাথে সাথেই গোটা ইয়ামন দেশে পুনরায় ইসলাম ত্যাগ মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়লো। এবার ইয়ামনের মুরতাদদের দু'জন বিখ্যাত নেতা ছিল। এক -কায়স ইব্‌ন মাকশূহ, দ্বিতীয়–আমর ইব্‌ন মা'দীকারাব। ইয়ামনের মুসলমানদেরকে সেখানকার মুরতাদরা বহু কষ্ট দিতে শুরু করলো। ছোট ছোট লড়াই চলতে লাগলো। মুসলমানদের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য। তারা ঘরবাড়ি ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছিল। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ইয়ামন দেশের সানআ অঞ্চলে মুহাজির ইব্‌ন আবী উমাইয়া (রা)-কে একটি সেনাদলসহ প্রেরণ করেছিলেন। মুহাজির ইব্‌ন আবী উমাইয়া (রা) মদীনা থেকে রওয়ানা করে পথিমধ্যে মক্কা ও তায়িফ হতে মুসলিম মুজাহিদদের সঙ্গে নিয়ে অতি দ্রুত নাজরানে প্রবেশ করে তাঁবু স্থাপন করলেন। কায়স ও আমর মুহাজিরের হামলার কথা পূর্বেই অবগত হয়েছিলেন। তারাও নাজরানে তাঁর আগমন প্রতীক্ষায় ছিল। আমর ইব্‌ন মা'দীকারাব একজন বিখ্যাত নেতা ছিল, যার শত্রু হনন ও বীরত্বগাঁথা সারা দেশে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। মুহাজির (রা) শত্রুদের অপরিমেয় ও অসংখ্য সৈন্যের মধ্যে নিজকে নিজে অবরুদ্ধ দেখতে পেয়ে স্বীয় সহচরগণকে লজ্জা ও ধিক্কার দিয়ে উৎসাহ যোগালেন। তারপর মুরতাদদের উপর হামলা করলেন। ঘোরতর যুদ্ধ হলো। শেষে ইসলামের জয় হলো। কায়স ও আমর উভয় নেতা গ্রেফতার হয়ে মুসলমানদের বন্দীত্বে এলো। বহু সংখ্যক মুরতাদ

নিহত, গ্রেফতার ও অবশিষ্টরা পলায়ন করতে বাধ্য হলো। কায়স ও আমরকে মদীনা মুনাওয়ারায় হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নিকট প্রেরণ করা হলো। মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছে উভয়ে তাদের ইসলাম ত্যাগের জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করলো এবং সানন্দে ইসলাম গ্রহণ করে বন্দীদশা হতে মুক্ত হলো। পরিশেষে অনুমতি নিয়ে ইয়ামন প্রত্যাবর্তন করলো।

মুহাজির ইব্ন আবী উমাইয়া (রা) নাজরান যুদ্ধে ইয়ামনের মুরতাদদের কোমর ভেঙ্গে দিয়ে সামনে অগ্রসর হন এবং সানআয় পৌঁছে মুকাবিলার জন্য আগত সেখানকার মুরতাদদেরকে চরমভাবে পর্যুদস্ত করে গোটা এলাকাকে শত্রুমুক্ত করেন। ঐ স্থানেই ইকরামা (রা) (ইব্ন আবী জাহল) এসে ইসলামী লশকরে যুক্ত হন এবং এখান থেকে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নির্দেশক্রমে উভয় নেতা বনূ কিন্দাকে শাস্তি দানের জন্য অগ্রসর হন। বনূ কিন্দা আশআছ ইব্ন কায়সকে তাদের নেতা বানিয়ে ইসলামী লশকরের মুকাবিলার জন্য বিরাট প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল এবং দিন দিন তাদের সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এই সংবাদ শ্রবণ করে মুহাজির ইব্ন আবী উমাইয়া (রা) ইসলামী লশকরের মধ্য থেকে দ্রুতগামী অশ্বারোহীদের একটি ইউনিট নির্বাচন করে নিজের সাথে নিলেন এবং বাকী লশকর ইকরামা (রা) (ইব্ন আবী জাহেল)-এর নেতৃত্বাধীন রেখে অতি দ্রুত ও তড়িৎ গতিতে পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে মুহাজ্জারে–যেখানে আশআছ ইব্ন কায়স মুরতাদ বাহিনীসহ অবস্থান করছিল–পৌঁছেন এবং অতর্কিতে অপ্রতিরোধ্যভাবে মুরতাদদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। মুরতাদরা এই হামলার তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে ইতস্তত পলায়ন করলো। আশআছ সেখান থেকে পলায়ন করে বুহায়র দুর্গে আশ্রয় নিল। অন্য মুরতাদরাও সেখানে গিয়ে দুর্গবদ্ধ হলো। মুহাজির ইব্ন আবী উমাইয়া (রা) দুর্গ অবরোধ করলেন। এই সময় ইকরামা (রা) (ইব্ন আবূ জাহেল) ও ইসলামী লশকরসহ এখানে এসে পৌঁছেন। অবরোধের কঠোরতা এবং সাহায্য ও রসদপত্র আমদানী থেকে নিরাশ হয়ে আশআছ সন্ধির আবেদন করলো। এই আবেদন এতই বিনয় ও মিনতিপূর্ণ ছিল যে, সে তার সম্প্রদায়ের শুধু নয়জন লোকের জন্য তাদের পরিবার-পরিজনের প্রাণভিক্ষা ও মুক্তি প্রার্থনা করলো। মুহাজির এই আবেদন মঞ্জুর করলেন। আশ্চর্য এই যে, আশআছ ভুলক্রমে ঐ নয় ব্যক্তির তালিকায় তার নিজের নাম উল্লেখ করতে ভুলে গেলো। সেমতে ঐ নয় ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে বাকী সবাইকে মুসলমানরা গ্রেফতার করলেন। এই যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে আশআছ ইব্ন কায়সও শামিল ছিল। এরা যখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর সামনে মদীনায় নীত হলো, তখন আশআছ তার অতীত কার্যকলাপ সম্পর্কে অনুতপ্ত হলো এবং সিদ্দীকে আকবর (রা)-কে বললো, আপনি আমার ইসলাম গ্রহণ করুন। আমি আনন্দচিত্তে ইসলামকে পসন্দ ও গ্রহণ করলাম। সিদ্দীকে আকবর (রা) কেবল আশআছকেই নয়, বরং বনূ কিন্দার সমস্ত বন্দীকে মুক্ত করে দিলেন এবং শুধু এতটুকুই বললেন যে, আমি আগামীতে তোমাদের তরফ থেকে কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই কামনা করি না।

ইসলাম ত্যাগের পূর্ণ মূলোচ্ছেদ

মোটকথা, এগার হিজরীর সমাপ্তি এবং বারো হিজরী আরম্ভ হওয়ার পূর্বে অর্থাৎ এক বছরের কম সময়ের মধ্যেই হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) আরব দেশের মুরতাদ সমস্যার

উপর পূর্ণ বিজয় লাভ করেন। এগার হিজরীর মুহাররম মাসে আরব উপদ্বীপ মুশরিক ও মুরতাদ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র হয়েছিল এবং উপদ্বীপের কোন অঞ্চল ও অংশের উপর শির্‌ক ও মুরতাদ হওয়ার কোন কালিমা অবশিষ্ট ছিল না। একদিকে কয়েক মাস পূর্বেকার এই অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করুন যে, মদীনা, মক্কা ও তায়িফ ছাড়া গোটা দেশের দিকচক্রবাল ছিল ধূলিতে আচ্ছন্ন। আর এই ধূলিমেঘ থেকে তলোয়ার-নেযা ও তীর-ধনুকের ঝড় বইতে দেখা যাচ্ছিল। অবস্থা এরূপ ছিল যে, প্রস্তর মোমের মতো গলে যেতে পারতো এবং ইস্পাতের তার কাঁচা সুতার মতো ছিঁড়ে যেতে পারতো। পর্বতের চেয়েও অধিক হিম্মত নদীর পানির মতো বয়ে যেতে পারতো এবং আকাশের মতো উচ্চ ও উন্মুক্ত উদ্দীপনা সংকীর্ণ ও অবনত হয়ে ভূ-পৃষ্ঠের অতল গহীনে হারিয়ে যেতে পারতো। কিন্তু মুহাম্মদী পাঠশালায় শিক্ষাপ্রাপ্ত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর হিম্মত ও সাহসের পরিমাপ করুন! তিনি একাকী এইসব ঝড়-ঝঞ্ঝার মুকাবিলার জন্য যে পরাক্রম ও বীরত্বের সাথে ময়দানে আত্মপ্রকাশ করেন আমরা তার দৃষ্টান্ত স্বরূপ না ব্যাঘ্র ও কুম্ভীরের নাম উল্লেখ করতে পারি, না রুস্তম ও ইস্‌ফান্‌দিয়ার (পারস্য সম্রাট)-এর নাম উচ্চারণ করতে পারি। বন্য-ব্যাঘ্র ও পারস্য বীর রুস্তম-হৃদয়ে যদি সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর হৃদয়শক্তির এক-শতাংশও বিদ্যমান থাকতো, তাহলে আমাদের কোন দৃষ্টান্ত অন্বেষণে হয়রান হতে হতো না। কিন্তু এখন আমরা এ ছাড়া আর কিছুই বলতে পারি না যে, খায়রুল-বাশার (মানবোত্তম) নবী (সা)-এর কর্তব্যপরায়ণ শিষ্য, খাতামুন্‌-নাবিয়্যীনের প্রথম খলীফা যথার্থই তাঁর মর্যাদা মাফিক সাহস ও দৃঢ়তা এবং ঐশী শক্তির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। যে কাজ গ্রীক-সম্রাট আলেকজাণ্ডার, রোম-সম্রাট জুলিয়াস সিজার ও পারস্য-সম্রাট কায়খসরু একত্রিত হয়েও সম্পন্ন করার সাহস করতেন না হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) তা কয়েক মাসের মধ্যে সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করে দেখিয়েছেন।

নিঃসন্দেহে সিদ্দীকী বাহিনীতে খালিদ (রা), ইকরামা (রা), শুরাহবিল (রা), হুযায়ফা (রা) প্রমুখের ন্যায় অতুলনীয় বীরগণ বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু এটাও ভেবে দেখুন যে, সিদ্দীকে আকবর (রা) কিভাবে মদীনা মুনাওয়ারায় বসে থেকে দেশের প্রতিটি অংশ ও প্রতিটি অঞ্চলের পরিস্থিতি অবহিত ছিলেন এবং কিভাবে সেনাদলের কাছে তাঁর নির্দেশাবলী পৌঁছে যেতো। চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে, প্রতিটি সেনাদল ও প্রতিটি সেনাপতি ছিলেন আরব শতরঞ্জীর উপর এক একটি দাবার গুটির মতো এবং সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর দক্ষ অঙ্গুলি যে গুটিটি যে-স্থানে চালা উপযোগী হতো, সেখানেই চালতো। বাহ্যত মনে হচ্ছে, ঐ এগারটি ইসলামী সেনাদল সর্বত্র অভিযান চালিয়ে আরবদেশ থেকে মুরতাদ সমস্যা মিটিয়ে ফেলেছে। কিন্তু সত্য কথা এই যে, রাসূলের খলীফা মদীনায় বসে বসে সিরিয়া ও নজ্‌দ হতে মাসকাত ও হাদরামাউত পর্যন্ত এবং পারস্যোপসাগর হতেই ইয়ামন ও আদন (এডেন) পর্যন্ত গোটা সাম্রাজ্যটিকে একা তাঁর কৌশল ও বুদ্ধি দ্বারা কয়েক মাসের মধ্যে যাবতীয় ময়লা-আবর্জনা ও জঞ্জালমুক্ত করেন। এই ফিতনার প্রারম্ভে সিদ্দীকে আকবর (রা) ছাড়া এমন কোন ব্যক্তি ছিল না, যে তার পরিসমাপ্তি দেখতে পারতো এবং কেবলমাত্র সিদ্দীকে আকবরই সেই তেজোদীপ্ত ঈমানের অধিকারী ছিলেন, যার বলে তিনি না উসামা বাহিনী প্রেরণ মুলতবি করা সমীচীন ভাবেন, না মসজিদে নববীতে হযরত উমর ফারূক (রা)-এর হাত-পা অবশকারী উক্তিতে প্রভাবিত হন, না যাকাত অস্বীকারকারীদের দাবী-দাওয়াকে তিনি তৃণতুল্যও মূল্য দেন। এখন

আপনি চিন্তা করুন ও ভাবুন, হযরত নবী করীম (সা)-এর স্থলাভিষিক্ত ও নবী করীম (সা)-এর প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের শাহানশাহ সিদ্দীকে আকবর (রা) ছাড়া আর কে হতে পারতেন ?

রোম ও ইরান

হযরত নবী করীম (সা)-এর আবির্ভাবকালে দুনিয়ায় দু'টি সাম্রাজ্য ছিল সবচেয়ে বড়। ঐ দু'টি সাম্রাজ্যই প্রায় গোটা দুনিয়ায় প্রভাব বিস্তার করেছিল। একটি রোম সাম্রাজ্য এবং দ্বিতীয়টি ইরানী (পারস্য) সাম্রাজ্য। তখনকার দুনিয়ায় কেবল দুটি সভ্যতাই বর্তমান ছিল। অর্ধেক দুনিয়ায় রোমান সভ্যতা বিস্তার লাভ করেছিল এবং অর্ধেক দুনিয়ায় ইরানী। আরবদেশ ছিল তখন ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত। সেখানে হযরত মুহাম্মদ (সা) আবির্ভূত হলেন। ইসলামের মাধ্যমে একটি নতুন সাম্রাজ্য ও নতুন সভ্যতার পত্তন হলো। সারা দুনিয়া তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো, আরব অথবা ইসলামী সাম্রাজ্যের মুকাবিলায় রোমক ও ইরানী সাম্রাজ্য শূন্যে মিলিয়ে গেলো এবং গোটা দুনিয়া ইসলামী হুকুমত ও ইসলামী সভ্যতার ছায়াতলে জীবন যাপন করতে লাগলো। এসব কথার বিস্তারিত ব্যাখ্যা আমরা পরে বর্ণনা করবো। এখন যেহেতু আরব সাম্রাজ্য এবং রোমক ও ইরানী সাম্রাজ্যের শক্তি পরীক্ষা শুরু হবে আর অতিদ্রুত আমরা ইরান ও রোমকে আরবের মুকাবিলায় টুকরো টুকরো হতে দেখবো, সেহেতু ঐ দু'টি বিখ্যাত ও সংস্কৃতিবান সাম্রাজ্য সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করা বাঞ্ছনীয়।

কোন এক সময় ইরানী সাম্রাজ্য ভূমধ্যসাগর, কৃষ্ণসাগর, পারস্যোপসাগর, সিন্ধুনদ, কাশ্মীর, তিব্বত, আলতাই পর্বত ও কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কায়ানী বংশের (কায়ান নামক সম্রাটের নামানুসারে এই বংশের পত্তন হয়। এই বংশের চারজন বিখ্যাত বাদশাহর নাম-(১) কায়কাউস, (২) কায়খসরু, (৩) কায়কোবাদ ও (৪) কায়লাহ্‌রাসপ্ (অনুবাদক)। রাজত্ব এবং রুস্তম যাবুলিস্তানের (সীস্তান) বীরত্ব-যুগ অতিক্রম করার পর গ্রীক আলোকজান্ডার ইরানী সাম্রাজ্যকে টুকরো টুকরো করে ফেলেছিলেন। কিন্তু ইরানী সভ্যতা তখনো অবশিষ্ট ছিল। হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আবির্ভাবের চারশ' বছর পূর্বে আরদ্‌শের বাবকান সাসানী বংশের পত্তন করেন। সাসানী বংশ কায়ানীদের বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকাংশ তাদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে পারস্যোপসাগর, ফুরাত নদী, কাস্পিয়ান সাগর, সিন্ধুনদ ও জায়হুন নদের মাঝখানে একটি বিস্তৃত ও নিবিড় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে গোটা এশিয়া মহাদেশের নেতৃত্ব লাভ করলো।

রোমক সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল ইটালীর রোম শহর। এখানে সম্রাট জুলিয়াস সিজার, সেন্ট আনমুস্তিস প্রমুখ বাস করেন। এই সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রায় গোটা ইউরোপ মহাদেশ এবং মিসর ও মধ্য এশিয়া অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিছুকাল পর এই রোমক সাম্রাজ্য দু'টুকরো হয়ে গেলো। পশ্চিমাংশের রাজধানী রোম শহরই ছিল। কিন্তু পূর্বাংশের রাজধানী হলো কনস্টানটিনোপল শহর। কনস্টানটিনোপলের কায়সারকেও (কায়সার প্রাচীন রোম সম্রাটদের উপাধি) রোমের কায়সার নামেই অভিহিত করা হতো; যাঁর শাসনাধীনে ছিল মিসর, আবিসিনিয়া, ফিলিস্তীন, সিরিয়া, মধ্য এশিয়া ও বলকান রাজ্যসমূহ। এই পূর্ব রোমক সাম্রাজ্যের শান-শওকত ও শক্তি-প্রভাবের কাছে পশ্চিম রোমের প্রভাব-প্রতিপত্তি ম্লান হয়ে গিয়েছিল। মধ্য এশিয়া ও ইরাকের প্রান্তরসমূহে এই দুই সাম্রাজ্য অর্থাৎ রোমক ও ইরানী সাম্রাজ্যদ্বয়ের সীমারেখা কোন নৈসর্গিক বস্তু অর্থাৎ পাহাড়, সমুদ্র প্রভৃতি না হওয়ার দরুন কখনো কখনো একে অপরের সাথে সংঘাত ও সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ারও নিমিত্ত ঘটতো।

হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জন্মগ্রহণের সময় ইরানের শাহানশাহ ছিলেন সাসানী বংশের ন্যায়বিচারক নওশেরওয়ান। হযরত নবী করীম (সা)-এর নবুওয়াত লাভের সময় ইরানে ক্ষমতাসীন ছিলেন নওশেরওয়ানের পৌত্র খসরু পারভেয। তখন কনস্টানটিনোপলে কায়সার ফুকাস-এর বিরুদ্ধে এক প্রচণ্ড বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। সাম্রাজ্যের আমীর-উমারা ও দেশের প্রজা-সাধারণ ফুকাশকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে হত্যা করলো এবং অধিকৃত আফ্রিকীয় অঞ্চলে গভর্নর অর্থাৎ মিসরের শাসনকর্তাকে কনস্টানটিনোপলের সিংহাসনে বসানোর আহ্বান জানালো। আফ্রিকার গভর্নর বার্ধক্যের কারণে যেতে পারলেন না। কিন্তু সৌভাগ্যবান যুবক পুত্র হিরাক্লিয়াস কনস্টানটিনোপলের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলেন। হিরাক্লিয়াসের শাসন কর্তৃত্ব সাম্রাজ্যের কর্মকর্তারাও সানন্দে মেনে নিলেন। নিহত কায়সার ফুকাস ও খসরু পারভেযের মধ্যে ছিল বন্ধুত্ব ও ভালবাসার সম্পর্ক। তাই খসরু পারভেয রোমক সম্রাট অর্থাৎ হিরাক্লিয়াসের উপর হামলা করলো-এমন এক ব্যক্তির ক্ষমতাসীন হওয়ার পর, যিনি উত্তরাধিকারসূত্রে সিংহাসনের অধিকারী ছিলেন না। এটা ছিল ইরানীদের জন্য রোমক সাম্রাজ্যের উপর হামলা করার একটি উত্তম সুযোগ। ইরানী ও রোমকদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলো। এই যুদ্ধ ছয়-সাত বছর অব্যাহত ছিল। অবশেষে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নবুওয়াত লাভের অষ্টম বছর ইরানীরা সিরিয়া জয় করে বায়তুল মুকাদ্দাস অধিকার করলো এবং খ্রিস্টানদের নিকট থেকে ক্রুশ ছিনিয়ে নিলো। একই সাথে তারা ফিলিস্তীনের গোটা দেশ জয় করে আলেকজান্দ্রিয়া পর্যন্ত পৌঁছে গেলো।

মক্কার মুশরিকরা ইরানীদের এই দেশ বিজয়ের খবর শুনে বেশ আনন্দ উদযাপন করলো। কেননা, রোমকরা ছিল কিতাবধারী, আর ইরানীরা ছিল মুশরিক। অপরদিকে মুসলমানরা ছিলেন মুশরিকদের বিপরীত কিতাবীদের প্রতি সহানুভূতিশীল। তাই এই খবরে মুসলমানরা ব্যথিত হলো। আল্লাহ্ তা'আলা সূরা রূমের আয়াত নাযিল করলেন। তাতে সংবাদ দিলেন যে, যদিও রোমকরা এবার পরাজিত হয়েছে, কিন্তু কয়েক বছর পরই তারা জয়লাভ করবে। আর মুসলমানরা তখন আনন্দিত হবে। অতএব, তাই হলো। হিরাক্লিয়াস ছয়-সাত বছর পর্যন্ত অনবরত সামরিক প্রস্তুতিতে ব্যাপৃত রইলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি তাঁর দেশের অভ্যন্তরীণ শৃংখলা বিধানেও পূর্ণ সক্ষম হন। এরপর তিনি ইরানীদের সীমান্ত অতিক্রম ও পূর্ববর্তী পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য বের হলেন এবং পরিশেষে সিরিয়া প্রান্তরে রোমক বাহিনী ইরানীদেরকে চরমভাবে পরাজিত করলো। ইরানীরা পলায়ন করলো এবং রোমের কায়সার নিজেদের এলাকা পুনর্দখল করা ছাড়াও ইরানীদের কয়েকটি প্রদেশ অধিকার করলেন।

এদিকে রোমকরা ইরানীদের উপর বিরাট বিজয় লাভ করলো, ওদিকে বদর প্রান্তরে মুসলমানরা মক্কার কাফিরদেরকে মারাত্মকভাবে পরাস্ত করলেন। আর এইভাবে কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হলো। এরপরও ইরানী ও রোমকদের মধ্যে লড়াই অব্যাহত ছিল। সপ্তম হিজরীর শুরুতে রোমক ও ইরানীদের মধ্যে সন্ধি হলো এবং ইরানীরা বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে যে ক্রুশ ছিনিয়ে নিয়েছিল, তা রোমকদের ফিরিয়ে দিলো। এই সন্ধি হিরাক্লিয়াসের দেশ বিজয়কে একদিকে সম্পূর্ণ করে দিলো, আর অন্যদিকে ইরানীরা তাদের হারানো এলাকা ও প্রদেশগুলো রোমকদের নিকট থেকে ফেরত নিলো। সুতরাং ইরানী ও রোমক উভয় দরবারেই সাবধানতার চিহ্ন ফুটে উঠেছিল এবং উভয়েই নিজ নিজ উন্নতি ও মযবুতীর জন্য উপযুক্ত উপায় গ্রহণে মশগুল হয়েছিল। এই বছরই হযরত মুহাম্মদ (সা) রাজা-বাদশাহদের

নামে পত্র প্রেরণ করেন। কায়ানী যুগে ইরানীদের রাজধানী ছিল ইস্তাখার, গ্রীক আলেকজান্ডার যাকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছাই-ভস্মে পরিণত করেছিলেন। তখন সাসানী বংশের রাজধানী ছিল মাদায়েন। ওদিকে হিরাক্লিয়াস তাঁর দেশ বিজয় ও ক্রুশ ফেরত পাওয়ার আনন্দে যিয়ারতের জন্য বায়তুল মুকাদ্দাস এসেছিলেন।

হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পত্র খসরু পারভেযের নিকট মাদায়েনে এবং হিরাক্লিয়াসের নিকট বায়তুল মুকাদ্দাসে পৌঁছেছিল। খসরু পারভেয তাঁর পত্রখানি ছিঁড়ে ফেললো এবং হিরাক্লিয়াস শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে তাঁর পত্রখানি গ্রহণ করলেন। হযরত নবী করীম (সা) ইরানী বাদশাহর অসৌজন্যমূলক আচরণের কথা শুনে বললেন : ইরানী বাদশাহর সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। খসরু পারভেয কেবল হযরত নবী করীম (সা)-এর চিঠি ও কাসিদের সাথে দুর্ব্যবহারই করলো না বরং তার ইয়ামনী গভর্নর বাযানকে লিখে পাঠালো যে, এই আরবী পয়গাম্বর (মুহাম্মদ (সা)-কে গ্রেফতার করে আমার নিকট পাঠিয়ে দাও। বাযান দু'জন লোক মদীনায় প্রেরণ করলো। তারা হযরত নবী করীম (সা)-এর দরবারে হাযির হলো এবং খসরু পারভেযের আদেশ সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলো। হযরত নবী করীম (সা) বললেন : তোমরা যাকে তোমাদের খোদা মনে কর অর্থাৎ খসরু পারভেয–সে গতরাতে তার পুত্র কর্তৃক নিহত হয়েছে। একথা শুনে তারা যখন বাযানের নিকট ফিরে গেলো, তখন সেখানে মাদায়েন থেকে সংবাদ এলো যে, খসরু পারভেযকে তার পুত্র শায়রুয়া হত্যা করেছে। এ হত্যাকাণ্ড ঠিক সেই রাতেই সংঘটিত হয়েছে, যে রাতের কথা হযরত নবী করীম (সা) বলেছেন। ইয়ামনের গভর্নর বাযান মুসলমান হয়ে গেলেন। আর এইভাবেই ইয়ামন দেশে অতিদ্রুত ইসলাম প্রসারিত হলো। হযরত নবী করীম (সা) বাযানকেই ইয়ামানের গভর্নর রাখলেন। শায়রুয়া অভ্যন্তরীণ কোন্দল মিটিয়ে আরব ও মুসলমানদের প্রতি মনোযোগ দেয়ার ফুরসতই পেলো না। কিছুদিন পর তার স্থলে তার স্বল্প বয়স্ক পুত্রকে ইরানের সিংহাসনে বসানো হলো। যার নাম ছিল আরদেশীর। এই স্বল্প বয়স্ক আরদেশীরকে ইরানী সিপাহসালার শাহরিয়ার কয়েক মাস পর হত্যা করে স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করেন। এর কয়েক দিন পর সাম্রাজ্যের কর্মকর্তারা তাকে হত্যা করে শায়রুয়ার-এর ভগ্নী ও খসরু পারভেযের কন্যা বুরানকে সিংহাসনে বসান। তিনি মাত্র এক বছর কয়েক মাস রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন। তার শাসনামলেই হযরত নবী করীম (সা) ইনতিকাল করেন। বুরানের পর কয়েকজন বালক ও নারী পরপর ক্ষমতাসীন হন। অবশেষে ক্ষমতায় বসেন ইয়াযদগরদ, যার শাসনামলে ইরান মুসলমানদের অধিকারে আসে। মোটকথা, যেদিন খসরু পারভেয হযরত (সা)-এর চিঠি ছিঁড়ে ফেলেছিল, সেদিন থেকেই ইরানী সাম্রাজ্যের উচ্চ প্রাসাদ প্রাকৃতিকভাবে ভূলুণ্ঠিত হওয়া আরম্ভ করেছিল এবং ইরানের সিংহাসনে দেশবিজয়ী ও বীরবিক্রমে বাদশাহদের স্থান বালক ও নারীরা অধিকার করেছিল। ইরানী সাম্রাজ্যের দখল থেকে তার একটি প্রদেশ অর্থাৎ মূলকে ইয়ামন বের হয়ে গিয়েছিল। এজন্য ইরানীরা মুসলমানদের প্রতি আরো বেশী শক্রতা পোষণ করতো।

ইরানীরা মুশরিক হওয়ার কারণে খুব অহংকারী ও উদ্ধত ছিল। তাই তারা আরবদেরকে খুব ঘৃণিত মনে করে তাদের শক্তি ও দৃঢ়তার খবর শুনে শুনে অতি বিচলিত ও মুসলমানদেরকে সমূলে বিনাশ করার সংকল্প করেছিল। কিন্তু প্রকৃতি তাদেরকে এমনিভাবে অভ্যন্তরীণ কলহ-কোন্দল ও রাজা-বাদশাহ্দের উত্থান-পতনের মুসীবতে লিপ্ত করলো যে, আরবদেশের প্রতি সহসা

মনোযোগ দিতে পারলো না। মদীনার মুনাফিক ও দেশান্তরিত ইয়াহূদীরা উপর্যুপরি মাদায়েনের রাজদরবারে তাদের বাকপটু ও চতুর দূতদের প্রেরণ করে করে ইরানীদেরকে মদীনা আক্রমণের জন্য উত্তেজিত করেছিল। অপরদিকে তারা হিরাক্লিয়াসের দরবারেও একই ধরনের তৎপরতা শুরু করে দিয়েছিল।

হিরাক্লিয়াসের দরবার যেহেতু অভ্যন্তরীণ কোন্দল থেকে মুক্ত ছিল, তাই তারা সেখানে অধিক সফলতা লাভ করলো। সিরিয়ার দক্ষিণাংশে আরব জাতির লোকেরা বসবাস করতো এবং তাদের অনেকগুলো ছোট ছেটে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। আরব লোকেরা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল। তাই তারা 'আরবী খ্রিস্টানরূপে পরিচিত ছিল। আরবী খ্রিস্টানদের স্বাধীন রাজ্যগুলোর সাথে হিরাক্লিয়াসের ছিল বন্ধুত্বসুলভ ও সহানুভূতিমূলক সম্পর্ক। যখনই ঐ আরব খ্রিস্টানদের রাজ্যগুলো। ইরানীদের দ্বারা আক্রান্ত হতো, কনস্টানটিনোপলের কায়সার এসে তাদের সাহায্য ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতো। এজন্যও তারা তাদেরকে রোমের কায়সারের পৃষ্ঠপোষকতায় রাখতে বাধ্য হতো। যেহেতু আরব বংশের লোক হওয়ার কারণে এরা খুব বাহাদুর ছিল, তাই রোমের কায়সার এদের অস্তিত্বকে অত্যন্ত মূল্যবান মনে করতো এবং প্রয়োজনের সময় তাদের যুদ্ধংদেহী যোগ্যতা দ্বারা ফায়দা উঠাতো। আরবদেশে একটি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হয়েছিল। এই ইসলামী রাষ্ট্র ও রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে সীমারেখা ছিল আরব খ্রিস্টানদের স্বাধীন রাজ্যগুলো। যেহেতু এই রাজ্যগুলো ছিল খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী, তাই বলা যেতে পারে যে, রোমক ও আরবদের মাঝখানে তো একটি সীমারেখা ছিল, কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র ও খ্রিস্টান রাজ্যের মধ্যে কোন সীমারেখা ছিল না। হযরত নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় যখন খ্রিস্টান রাজ্যগুলো ও মুসলমানদের মধ্যে মুকাবিলা ও সংঘাত শুরু হলো, তখন একদিকে এই আরব খ্রিস্টানগণ হিরাক্লিয়াসের নিকট সাহায্যের আবেদন করলো, অপরদিকে মুনাফিক ও ইয়াহূদীদের ষড়যন্ত্র হিরাক্লিয়াসকে মুসলমানদের মূলোচ্ছেদ করতে অনুপ্রাণিত করলো।

হযরত নবী করীম (সা) যে সময় হিরাক্লিয়াসের নিকট পত্র প্রেরণ করেছিলেন, তখন বসরা ও দামেশকের সরদারদের প্রতিও পত্র লিখেছিলেন। কিন্তু তারা উভয়ে হযরত নবী করীম (সা)-এর দূতদের সাথে দুর্ব্যবহার করেছিল। বসরার শাসনকর্তা শুরাহবীল তো হযরত নবী করীম (সা)-এর দূত হারিছ (রা)-কে শহীদ করেই ফেলেছিল। হযরত নবী করীম (সা) যায়দ ইব্ন হারিছ (রা)-কে শুরাহবীল ইব্ন আমর গাস্সানীর বিরুদ্ধে হযরত হারিছ (রা)-এর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য প্রেরণ করেন। মূতা যুদ্ধে হযরত যায়দ (রা), হযরত জা'ফর (রা), হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা) শহীদ হন। হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) যুদ্ধ পরিস্থিতি সামাল দেন। এই যুদ্ধে হিরাক্লিয়াস বাহিনী শুরাহবীল গাস্সানীর সমর্থনে মুসলমানদের মুকাবিলা করে। রোমকরা এরপর আরব দেশের উপর চড়াও হয় এবং স্বয়ং হযরত নবী করীম (সা)-কে তাবূক প্রস্রবণ পর্যন্ত লশকর নিয়ে যেতে হয়। তখন রোমকরা সামনে থেকে সরে গেলো। আর কোন বড় যুদ্ধ হলো না। বরং ঐ আরব খ্রিস্টান রাজ্যগুলো থেকে জিযিয়া নিয়ে এবং তাদের উপর প্রভাব প্রতিষ্ঠা করে হযরত নবী করীম (সা) ফিরে এলেন। এই সময় খবর এলো হিরাক্লিয়াস আরব দেশের উপর হামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং সিরিয়া সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ ঘটাচ্ছে। হযরত নবী করীম (সা) হযরত উসামা ইব্ন যায়দ (রা)-কে সেদিকে প্রেরণ করেন। কিন্তু তাঁর রোগ বৃদ্ধির কারণে এই বাহিনী মদীনার বাইরে গিয়ে থেমে রইল। এরপর

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) খলীফা হয়ে এই বাহিনীকে প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। এই বাহিনী সিরিয়া সীমান্ত পর্যন্ত গেলো এবং সেখানকার অবাধ্য ও বিদ্রোহী সরদারদের দমন করে ফিরে এলো।

হিরাক্লিয়াস বাহিনীর সাথে মুকাবিলা না হওয়ার কারণ হচ্ছে, আরব খ্রিস্টান সরদারদের মধ্য থেকে কেউ কেউ সানন্দচিত্তে ইসলামকে সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েছিল। হিরাক্লিয়াস এ ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিল যে, সীমান্ত রাজ্যগুলো ইসলাম গ্রহণ করেছে, না খ্রিস্টধর্মের উপর বহাল থেকে মুসলমানদের মুকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত! নিছক এই রাজ্যগুলোর কারণেই–যারা একাধিকবার ইসলামী শক্তির প্রদর্শনী অবলোকন করেছিল এবং ইসলামী নীতিমালা সম্পর্কে অবগত হওয়ার দরুন ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট মনে হচ্ছিল–হিরাক্লিয়াস যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হতে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছিলেন। তাছাড়া তিনি নিজেও ইসলামের সভ্যতাকে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন। তাই একদিকে মুসলমানদের উন্নতি ছিল তাঁর সাম্রাজ্য ধ্বংসের স্বরূপ এবং তিনি মুসলমানদের শক্তিকে আশংকার পূর্বেই মিটিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, অপরদিকে তাঁর পরিণাম ও পরিণতি সন্দেহপূর্ণ মনে হওয়ায় আগামীতে উত্তম সুযোগের অপেক্ষায় তিনি যুদ্ধ মুলতবি রাখতে চেয়েছিলেন। যা হোক, যে হিরাক্লিয়াস ইরানীদের বিশাল সাম্রাজ্যকে হেয় প্রতিপন্ন করেছিলেন, তিনি আপাদমস্তক ইসলামী শক্তিকেও ধ্বংস করার প্রতি মনোযোগী ছিলেন এবং এ ব্যাপারে কোন উপযুক্ত সুযোগকেই হাতছাড়া করতে চাইছিলেন না।

হযরত নবী করীম (সা)-এর ওফাতের পর গোটা আরবদেশে যে বিশৃংখলা ও গোলমাল সৃষ্টি হয়, তা একদিকে ইরানীরা এবং অপরদিকে রোমকরা বড় প্রসন্ন ও সন্তোষ সহকারে শ্রবণ করে। দুনিয়ায় এই প্রথমবারের মতই গোটা আরব উপদ্বীপ একটি সাম্রাজ্য ও একটি সম্মিলিত শক্তি আকারে নিজকে নিজে উদ্ভাসিত করেছিল। আর এ কারণেই রোমক ও ইরানীদের রাজ-দরবারগুলো, এদেশটিকে বিশেষ চিন্তা-ভাবনা ও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার দৃষ্টিতে দেখেছিল এবং এই উভয় সাম্রাজ্যই স্বস্থানে স্বতন্ত্রভাবে এই নবতর আরবী শক্তি অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রকে মিটিয়ে দিতে ও ধ্বংস করতে প্রস্তুত ছিল। হযরত নবী করীম (সা)-এর ওফাতের খবর শোনা মাত্রই মুরতাদ হওয়ার হিড়িক ঐ দুই সাম্রাজ্যকে বাতলে দিয়েছিল যে, আরবদেশকে পদদলিত করা ও ভবিষ্যত আশংকা দূর করার এটাই হচ্ছে মোক্ষম সুযোগ। সুতরাং একদিকে হিরাক্লিয়াস বাহিনী সিরিয়ায় এবং অপরদিকে ইরানের সেনাবাহিনী ইরাকে সমবেত হতে লাগলো। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর পরিণাম চিন্তা, দূরদর্শিতা, সুযোগ-সচেতনতা ও প্রয়োজনানুরূপতার এভাবেও পরিমাপ হতে পারে যে, তিনি মুরতাদ সমস্যাকে অতি দ্রুত মিটিয়ে ফেলেন। আর এই ফিতনা দমন করার পর একটি দিনও নষ্ট না করে তৎক্ষণাৎ রোমক ও ইরানীদের প্রতিরোধ করার জন্য গোটা আরবদেশকে প্রস্তুত করে ফেলেন। যদি হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) আর কয়েকটি দিন মুরতাদ সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে সক্ষম না হতেন কিংবা মুরতাদ সমস্যা মিটে যাওয়ার পর কয়েকটি দিন আলস্য ও নির্লিপ্ততায় কাটিয়ে দিতেন, তবে মদীনাতুন্নবী (সা) অর্থাৎ ইসলামের রাজধানী রোমক ও ইরানীদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে মুসলমানদের জীবনকাল সংকীর্ণ করে তুলতো। বিস্মিত হতে হয় যে, সিদ্দীকে আকবর (রা) কি কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ কিরূপ সঙ্গীন ও সীমিত সময়ের মধ্যে কত সতর্কতা ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেন। আর ইসলামের আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক অবস্থা এবং প্রচ্ছন্ন ও প্রত্যক্ষ মাহাত্ম্যকে কত আড়ম্বর ও

শক্তিমত্তার সাথে অক্ষুণ্ন রাখেন। এখন সামনের দিকে রোমক ও ইরানীদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ শুরু হতে যাচ্ছে। যে অবস্থা সিরিয়ার ছিল–তার দক্ষিণাংশে আরব খ্রিস্টানদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য ছিল, সম্পূর্ণ একই অবস্থা ছিল ইরাক ও আরবেরও। এখানেও আরবদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল, যার অধিকাংশই ছিল ইরানী সাম্রাজ্যাধীন এবং কোন কোনটিতে ইরানী রাজ-দরবার থেকে গভর্নর নিযুক্ত হয়ে আসতো এবং শাসন করতো।

মুসলমানদের কর্মকুশলতা

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) যখন উসামা বাহিনীকে সিরিয়া প্রেরণ করেছিলেন, তখন তিনি ইরানীদের ব্যাপারেও গাফিল ছিলেন না। তিনি এই ভয়াবহ অবস্থা ও দুশ্চিন্তাপূর্ণ সময়ে–যখন স্বয়ং মদীনা মুনাওয়ারার নিরাপত্তা ও আরবের প্রদেশসমূহের মুরতাদ সমস্যা নিরসনকল্পে সেনাবাহিনীর প্রয়োজন ছিল অপরিসীম–একটি ক্ষুদ্র বাহিনী উপরোক্ত এগারটি বাহিনী প্রেরণের পূর্বে মুছান্না ইবন হারিছা শায়বানী (রা)-এর নেতৃত্বে ইরাক প্রেরণ করেছিলেন এবং মুছান্নাকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, ইরাকে পৌঁছে কোন স্থানেই স্থির হয়ে যুদ্ধ শুরু করবে না বরং অতর্কিতভাবে আক্রমণ করে ইরাকী সরদারদের সন্ত্রস্ত করতে থাকবে। এর দ্বারা সিদ্দীকে আকবর (রা) (রা)-এর উদ্দেশ্য ছিল, যে পর্যন্ত আরবের মুরতাদ সমস্যা অবদমিত না হবে, সে পর্যন্ত যেনো ইরানীরা আরব আক্রমণ করার সাহস না পায় এবং তারা মুসলমানদের অস্থিরতা ও বিপদ সম্পর্কে পুরাপুরি অবহিত হতে না পারে। একই উদ্দেশ্য সিদ্দীক আকবর (রা) উসামা বাহিনী দ্বারাও হাসিল করতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ রোমকরা যেন আরব আক্রমণ করার আদৌ দুঃসাহস করতে না পারে। যখন নজ্‌দ্ ও ইয়ামামার অবস্থা আয়ত্তে এসে গেলো, তখন সিদ্দীকে আকবর (রা) আয়ায ইব্‌ন গানাম (রা)-কে যিনি নজদে অবস্থান করছিলেন–লিখে পাঠালেন যে, যেসব মুসলমান মুরতাদ হয়নি এবং ইসলামের উপর কায়েম রয়েছে, তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে উচ্চ ইরাকে হামলা করবে এবং হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-কে যিনি ইয়ামামায় অবস্থান করছিলেন– লিখে পাঠালেন যে, তুমি স্বীয় বাহিনী সঙ্গে নিয়ে নিম্ন ইরাকে চলে যাবে। পথে যেসব গোত্র বা গোত্রপতি পড়লো, তারা সবাই সানন্দে মুসলমান হলো বা ইসলামী নেতৃত্বে প্রবেশ করলো। সিদ্দীকী নির্দেশের মর্ম অনুযায়ী উব্‌লা নামক স্থানে হযরত মুছান্না ইব্‌ন হারিছা (রা) ও খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) উভয়ে এসে মিলিত হলেন।

গাযওয়ায়ে যাতুস-সালাসিল বা জিঞ্জির পরা যুদ্ধ

হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) উবলা নামক স্থানে ইসলামী লশকরের হাযিরা নিলেন। মোট আঠার হাজার লোক ছিল। তাঁর সামনে ছিল ইরাকের সেই ইরানী প্রদেশ– যার নাম ছিল হুদায়র। ইরানের রাজ-দরবার থেকে ঐ প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত ছিল হরমুয নামক জনৈক বাহাদুর ও যুদ্ধবাজ সরদার। এই হরমুযেরই ভীতি গোটা আরব, ইরাক ও হিন্দুস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কেননা, সে যুদ্ধজাহাজ নিয়ে হিন্দুস্তানের উপকূলেও আক্রমণ চালাতো। হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) বিবাদ মিটানোর শেষ চেষ্টা হিসাবে হরমুযকে একটি চিঠি লিখে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিলেন। হরমুয এই চিঠি পাওয়া মাত্রই তৎক্ষণাৎ ইরানের রাজদরবারকে

তা অবহিত করলো এবং স্বয়ং সৈন্য সমাবেশ করে হযরত খালিদ (রা)-এর মুকাবিলায় অগ্রসর হলো। ওদিকে হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) তাঁর লশকর তিন ভাগে বিভক্ত করে এক ভাগের নেতৃত্ব সমর্পণ করলেন হযরত আদী ইব্ন হাতিম (রা)-কে। দ্বিতীয় ভাগ সমর্পণ করলেন হযরত কা'কা' ইব্ন আমর (রা)-কে এবং তৃতীয় ভাগকে স্বীয় অধীনে রেখে তিন নেতাই ডান-বামে এক দিনের দূরত্ব বজায় রেখে হুদায়র অভিমুখে অগ্রসর হতে লাগলেন। ইরানী বাহিনীর কাছে পৌঁছে তিন ইসলামী নেতাই একত্রিত হলেন। ইরানীদের বিপরীত দিকে ইসলামী লশকর তাঁবু স্থাপন করলো। প্রথমে হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) ময়দানে উপস্থিত হলেন এবং হরমুযকে মুকাবিলার জন্য আহবান করলেন। হরমুয হযরত খালিদ (রা)-এর ডাক শুনে ময়দানে এলো। দুই নেতাই ঘোড়া থেকে নিচে নেমে পদাতিক হলেন। প্রথমে হযরত খালিদ (রা) আঘাত হানলেন। হরমুয চকিতে পিছে হটে এবং রণকৌশল পরিবর্তন করে আঘাত থেকে বাঁচলো। তারপর অতি ক্ষিপ্রতার সাথে হযরত খালিদের উপর আঘাত করলো। হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) হঠাৎ বসে পড়ে সামনে কুঁচকে গিয়ে হরমুযের কবজি ধরে তলোয়ার ছিনিয়ে নিলেন। হরমুয তলোয়ার ছিনতাই হতেই হযরত খালিদকে লেপ্টে ধরলো এবং কুস্তি শুরু হলো। হযরত খালিদ (রা) হরমুযের কোমর ধরে উপরে উঠালেন এবং যমীনের উপর এমন জোরে আছাড় মারলেন যে সে আর নড়চড় করতে পারলো না। খালিদ হরমুযের বুকের উপর উঠে বসলেন এবং শির কর্তন করে ছুঁড়ে মারলেন। ইরানীদের একটি সেনাদল তাদের সেনাপতিকে পরাস্ত হতে দেখে তার সাহায্যার্থে আক্রমণ করলো। এদিকে কা'কা' ইব্ন আমর (রা) সামনে অগ্রসর হয়ে তাদের বাধা দিলেন। এরপর উভয় বাহিনী সামনে বাড়লো। ঘোরতর যুদ্ধ শুরু হলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই ইরানী বাহিনী ময়দান ছেড়ে পালালো। বহু হতাহত ও বন্দী হলো। হরমুযের পোশাক ও অস্ত্রশস্ত্র হযরত খালিদ (রা) হস্তগত করলেন। হরমুয ছিল ইরানী রাজদরবারের এমন একজন সরদার, যার মাথায় সর্বদা মুকুট পরিহিত থাকতো। তার মুকুটের মূল্য ছিল এক লাখ দীনার যা হযরত খালিদ (রা)-এর হস্তগত হয়। এই যুদ্ধে ইরানী বাহিনীর একটি অংশ তাদের পায়ে জিঞ্জির বেঁধে নিয়েছিল, যাতে আরবদের মুকাবিলায় যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করতে না পারে। কিন্তু তারপরও তাদের জিঞ্জির ভেঙ্গে পালাতে হলো। এই জিঞ্জিরের কারণেই এই যুদ্ধ 'জঙ্গে যাতিস্-সালাসিল' (জিঞ্জির যুদ্ধ) নামে পরিচিত।

হযরত মুছান্না ইব্ন হারিছা (রা)-কে খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ (রা) ইরানীদের পশ্চাদ্ধাবনে প্রেরণ করলেন। তিনি সামনে অগ্রসর হয়ে হিস্নুল মারাআত (حصن المرأة) অবরোধ করেন এবং এই দুর্গটি জয় করেন। সেখানকার শাসনকর্তা নিহত হলো। তার স্ত্রী মুসলমান হলো এবং হযরত মুছান্না (রা)-কে বিয়ে করলো।

কারিনের যুদ্ধ

হরমুযের সাহায্যের আবেদন যখন ইরানের রাজদরবারে পৌঁছলো, তখন সেখান থেকে হযমুযের সাহায্যার্থে কারিন নামক এক মস্তবীর একদল বীর সেনাসহ যাত্রা করলো। কিন্তু তার পৌঁছার পূর্বেই হরমুযের ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছিল। পথিমধ্যে কারিনের সাথে হরমুযের পরাভূত বাহিনীর সাক্ষাৎ হলো। এদিক থেকে মুসলিম বাহিনীও সামনে অগ্রসর হলো। যুদ্ধ হলো। কারিন, আনুশ্জান ও কুবাদ নামক তিনজন বড় বড় সরদার মারা গেলো। ইরানীরা তাদের

তিন হাজার লাশ যুদ্ধক্ষেত্রে রেখে পলায়ন করার সময় নদীতে ডুবেও অনেকে মারা গেলো। বহু সংখ্যক বন্দী হলো। এই যুদ্ধের পর হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) এই প্রদেশের প্রজাদেরকে কোন রকম কষ্ট-ক্লেশ না দিয়েই জিযিয়া আদায়ে উৎসাহিত করে সেখানে ইসলামী শাসনকর্তা নিয়োগ করলেন। ইরানের প্রজাবৃন্দ ইসলামের প্রজা হয়ে অনুভব করলো যে, জাহান্নাম থেকে বের হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করলো।

দুল্‌জা'র যুদ্ধ

কারিন প্রমুখের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করে ইরানের রাজদরবার থেকে আ'দায্‌গর নামক জনৈক বিখ্যাত অশ্বারোহীকে একদল বাহাদুর লশকরসহ প্রেরণ করা হলো। এই বাহিনী মাদায়েন থেকে রওয়ানা হয়ে দুল্‌জা নামক স্থানে পৌঁছেছিল। ইতিমধ্যে পেছন থেকে বাহমান জাদওয়ায়হ নামক আরেক মস্ত সরদারকে এক বিরাট বাহিনীসহ মাদায়েন থেকে প্রেরণ করা হলো। দুল্‌জা নামক স্থানে পৌঁছে হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) ইরানী বাহিনীর উপর হামলা চালালেন। এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ইরানী বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলো। তাদের সরদারও প্রচণ্ড পিপাসায় যুদ্ধক্ষেত্রে মারা গেলো। বাহমান জাদওয়ায়হ লায়স নামক স্থানে পৌঁছামাত্র পলায়নপর ইরানীরা তার লশকরে গিয়ে শামিল হলো। এই যুদ্ধে বহু খ্রিস্টান আরব ও ইরানী বাহিনীতে এসে শরীক হয়েছিল। বাহমান জাদওয়ায় ইরানী ও আরবদের এই বিরাট বাহিনীকে লায়স নামক স্থানে রেখে স্বয়ং মাদায়েন অভিমুখে রওয়ানা করলো। কেননা, সেখানে তার প্রয়োজন ছিল না।

লায়সের যুদ্ধ

হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) যখন জানতে পারলেন যে, লায়স নামক স্থানে এক বিরাট বাহিনী অবস্থান করছে, যারা মুসলমানদের উপর হামলা চালাবে, তখন তিনি নিজেই লায়স অভিমুখে রওয়ানা করলেন এবং সেখানে পৌঁছে যুদ্ধ শুরু করলেন। প্রথমে হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) ময়দানে একা সামনে অগ্রসর হয়ে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে আহ্‌বান করলেন। প্রতিপক্ষ থেকে মালিক ইব্‌ন কায়স মুকাবিলা করতে এলো এবং এসেই খালিদ (রা)-এর হস্তে প্রাণ হারালো। এরপর ঘোরতর যুদ্ধ শুরু হলো। সত্তর হাযার শত্রুসেনা যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলমানদের হাতে প্রাণ হারালো।

হীরা বিজয়

লায়স যুদ্ধ সম্পন্ন করে হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) হীরা অবরোধ করলেন। দীর্ঘ অবরোধের পর শহরবাসী হতাশ হয়ে পড়লো। হীরার শাসনকর্তা আমর ইব্‌ন আব্‌দিল মাসীহ অন্যান্য কর্মকর্তার সাথে খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) সমীপে হাযির হলো। ইরানী সরদার ও ইরানী লশকর– যারা হীরায় অবস্থান করছিল– আরদেশীর কিসরার মৃত্যুখবর শুনে প্রথমেই পলায়ন করেছিল। আবদুল মাসীহ প্রায় দুই লাখ রূপী খারাজ (কর) স্বীকার করে সন্ধি করলো। হীরা জয়ের পর হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) যিরার ইব্‌নুল আয্‌ওয়ার (রা), যারার ইব্‌নুল খাত্তাব (রা), কা'কা' ইব্‌ন আমর (রা), মুছান্না ইব্‌ন হারিছা (রা), উআয়না ইব্‌নুল শাম্মাস (রা) প্রমুখ সেনাপতিকে হীরার আশেপাশে ছোট ছোট সেনাদলসহ প্রেরণ করলেন। প্রতিটি গোত্র এবং প্রতিটি বস্তি জিযিয়া কিংবা ইসলাম কবূল করলো। আর এই

ভাবে দজ্‌লা পর্যন্ত গোটা এলাকা হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর নেতৃত্বে বিজিত হলো। খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) হীরায় অবস্থান করে তার আশেপাশের অভিযানগুলো পরিচালনা করতে থাকেন।

খালিদ (রা)-এর পয়গাম

হীরা থেকে হযরত খালিদ (রা) ইরানী রঈসদের নিকট পত্র লিখেন এবং ইরাকের যেসব আমীর জমিদার ও জায়গীরদারের মর্যাদা রাখতো এবং তখনো পর্যন্ত আনুগত্য স্বীকার করেনি, তাদের প্রতি একটি সাধারণ ফরমান জারি করেন। ইরানী রঈসদের নিকট তিনি যে পত্র প্রেরণ করেছিলেন, তাতে তিনি লিখেন :

> অতঃপর সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি তোমাদের জীবনব্যবস্থায় অসুবিধা সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের ধূর্তামিকে পর্যুদস্ত করেছেন। তোমাদের ঐক্যজোটকে ভেঙ্গে দিয়েছেন। আমরা যদি তোমাদের দেশ আক্রমণ না করতাম তবে তোমাদের পক্ষে অমঙ্গল হতো। এখন উত্তম এই যে, তোমরা আমাদের আনুগত্য করবে। তাহলে আমরা তোমাদের এলাকা ছেড়ে দেবো এবং অন্যত্র চলে যাবো। আর তোমরা যদি আমাদের অনুগত না হও, তবে তোমরা এমন লোকদের পাল্লায় পড়বে যারা মৃত্যুকে ঠিক তেমনি ভালবাসে যেমনি তোমরা জীবনকে ভালবাস।

দ্বিতীয় সাধারণ ঘোষণার বিষয়বস্তু

> সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার, যিনি তোমাদের অহমিকা দমন করেছেন। তোমাদের একতা ভেঙ্গে দিয়েছেন। তোমাদের শান-শওকত মিটিয়ে দিয়েছেন। অতএব তোমরা ইসলাম কবূল করো, শান্তিতে থাকবে। অথবা আমাদের তত্ত্বাবধানে এসে যিম্মি বনে যাও ও জিযিয়া প্রদান করো। নতুবা আমি তোমাদের উপর এমন জাতিকে লেলিয়ে দেবো, যারা মৃত্যুকে ঠিক তেমনি ভালবাসে যেমনি তোমরা মদ্যপানকে ভালবাস।

এইসব পত্র ও ফরমানের প্রতিক্রিয়া এই হলো যে, ইরানের রাজদরবারে বাদশাহ সম্পর্কে যে বিবাদ চলছিল, তা সহসা মিটে গেলো এবং দরবারের আমীরগণ তৎক্ষণাৎ তাদের একজন বাদশাহ নির্বাচনে একমত হয়ে গেলো, যাতে আরববাসীদের মুকাবিলা সহজেই হতে পারে।

আম্বার বিজয় বা জঙ্গে যাতিল উয়ূন

ইরানীরা আম্বারে এক বিরাট সেনাদল সমাবেশ করে সাবাতের শাসক শেরযাদকে এই বাহিনীর সিপাহ্‌সালার বানিয়েছিল। হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) হীরায় এই সেনা সমাবেশের সংবাদ পেয়ে হীরা থেকে আম্বার অভিমুখে রওনা করলেন। শেরযাদ আম্বার প্রাচীর বাইরে মাটির দমদমাও তৈরি করিয়েছিল এবং তারা আরব বাহিনীর মুকাবিলা করার জন্য সর্বতোভাবে প্রস্তুত ছিল। হযরত খালিদ (রা) যখন আম্বার অবরোধ করলেন, তখন অবরুদ্ধরা দমদমা থেকে একযোগে তীরের বৃষ্টিবর্ষণ শুরু করলো। ফলে ইসলামী বাহিনীর এক হাজার মুজাহিদের চোখ তীরের আঘাতে যখমী ও নষ্ট হয়ে গেলো। কিন্তু ইসলামের লশকর ও তার সিংহ হৃদয় সিপাহসালারকে তীরের বৃষ্টি দমাতে পারে নি। হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) দুর্বল ও কৃশ উটগুলো যবেহ করিয়ে খন্দকে (পরিখায়) ফেলে দিলেন। আর এইভাবে যখন খন্দক পার হবার রাস্তা তৈরী হয়ে গেলো, তখন মুসলমানরা প্রথমে দমদমা দখল করলো।

তারপর শহর প্রাচীর পর্যন্ত পৌঁছে রক্তের নদী বইয়ে দিলো। ইরানীরা প্রতিরোধের ক্ষেত্রে বড় সাহস ও বীরত্বের প্রকাশ ঘটালো। কিন্তু মুসলমানদের বিপরীতে তা কোন কাজেই আসলো না। শেরযাদ যখন দেখলো যে, শহর মুসলমানদের দখলে চলে যাচ্ছে, তখন সে সঙ্গে সঙ্গে হযরত খালিদ (রা) সমীপে সন্ধির প্রস্তাব পাঠালো। হযরত খালিদ (রা) প্রত্যুত্তরে বলে পাঠালেন যে, শেরযাদ তার কয়েকজন বিশিষ্ট সহচরসহ শুধু তিন দিনের রসদ নিয়ে যদি শহর থেকে বের হতে চায়, তবে আমরা তাকে চলে যেতে দেবো। সুতরাং তাই হলো। শেরযাদ শহর ছেড়ে চলে গেলো। হযরত খালিদ (রা) বিজয়ী বেশে শহরে প্রবেশ করলেন। ইরানীরা ইসলামী লশকরের মুকাবিলা করার জন্য সর্বত্র সামরিক প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করে রেখেছিল। আম্বারে জানা গেলো, আয়নুত্ তামার' নামক স্থানে মাহ্রান ইব্ন বাহরাম চব্বিশ হাজার ইরানীর একটি বিরাট বাহিনী নিয়ে এবং উক্বাহ ইব্ন আবী উক্বাহ আরববাসীদের এক বিরাট দলসহ যুদ্ধের জন্য ডেরা ফেলেছে। আশেপাশের আরব গোত্র তাগলিব ও আবাদ প্রভৃতিও ইসলামী লশকরের মুকাবিলার জন্য দল বেঁধে এসেছিল। হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (র) যীবিরকান ইব্ন বদরকে আম্বার শহরের শাসক নিযুক্ত করে স্বয়ং 'আত্-তামার অভিমুখে রওয়ানা করলেন।

আয়নুত্-তামার বিজয়

উক্বাহ ইব্ন উক্বাহ হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)-এর আগমন সংবাদ পেয়ে ইরানী সিপাহ্সালার মাহরান ইব্ন বাহরামকে বললো, আরবদের লড়াই সম্পর্কে আরবরাই ভাল জানেন। সুতরাং আপনি প্রথমে আমাদেরকেই ইসলামী লশকরের মুকাবিলা করতে দিন। মাহরান এ প্রস্তাব সানন্দে মনযূর করলো। উক্বাহ সর্বপ্রথম ময়দানে অবতীর্ণ হলো। হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) তাকে সঙ্গে সঙ্গে জীবিত বন্দী করলেন। উক্বাহ বন্দী হওয়ার সাথে সাথে উক্বাহর সমস্ত লশকর পলায়ন করলো। বহু পলায়নকারীকে মুসলমানরা বন্দীও করলেন। মাহরান ইব্ন বাহরাম এই দৃশ্য অবলোকন করে এতই ভীত হয়ে পড়লো যে, সে দুর্গ ছেড়ে বিনা মুকাবিলায় পলায়ন করলো। উক্বাহর পলায়নপর সৈন্য ইরানীদের খালি দুর্গ দেখে তাড়াতাড়ি দুর্গে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিলো। আর এইভাবে তারা দুর্গ বন্ধ করে বসে থাকলো। চারদিন অবরোধের পর দুর্গের উপরও ইসলামী লশকরের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলো। মজুসীদের সাথে মিলে যে আরব খ্রিস্টানরা লড়াই করছিল, তারা নিহত হলো এবং তাদের মাল-আসবাব মুসলমানদের দখলে এলো।

উচ্চ ইরাক

উপরে উল্লিখিত হয়েছে যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নির্দেশ অনুযায়ী ইয়ায ইব্ন গানাম (রা) উচ্চ ইরাকে হামলা করেছিলেন। হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)-কে তো অতিশীঘ্রই আরব গোত্রসমূহ ও গোত্রপতিদের ছেড়ে ইরানী সরদার ও ইরানী বাহিনীর সাথে মুকাবিলা করতে হয়েছিল। যদিও আরব সরদার ও খ্রিস্টান গোত্রগুলোও যুদ্ধরত ছিল, কিন্তু তারা ইরানীদের থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। হযরত ইয়ায ইব্ন গানাম (রা) যিনি উচ্চ ইরাক আক্রমণ করেছিলেন, তিনিও তখন পর্যন্ত স্বাধীন খ্রিস্টান সরদারদের মুকাবিলা থেকে মুক্ত হতে পারেননি। তিনি যে এলাকায় যুদ্ধরত ছিলেন, সে এলাকা ছিল ইরাক, জাযিরা, ইরান ও সিরিয়া সংযুক্ত। আর এ কারণেই তাঁর যুদ্ধ চালনার প্রভাব যতটুকু ইরানী রাজ-দরবার পড়তো,

ততটুকুই হিরাক্লিয়াসের দরবারেও পড়ছিল। হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) যখন আয়নুত্-তামার জয় করেন, তখন হযরত ইয়ায ইব্‌ন গানাম (রা) আরবের মুশরিক ও খ্রিস্টান গোত্রগুলোকে দমনকল্পে দূমাতুল জান্দালের শাসকদের সাথে যুদ্ধরত ছিলেন। দুমাতুল জান্দালে দু'জন রঈস ছিলেন। একজন আকীদর ইব্‌ন আব্‌দিল মালিক (নবী-জীবনের ঘটনাবলী প্রসঙ্গে যার নাম উল্লিখিত হয়েছে), দ্বিতীয় জন জূদী ইব্‌ন রবীআ। এই দুই রঈসই একজোট হয়ে হযরত ইয়ায ইব্‌ন গানাম (রা)-এর সাথে যুদ্ধরত ছিলেন এবং তারা আশেপাশের সকল খ্রিস্টান গোত্রকে নিজেদের সাথে মুসলমানদের বিরুদ্ধে শরীক ও যুক্ত করে নিয়েছিলেন। হযরত ইয়ায ইব্‌ন গানাম (রা) আয়নুত্-তামারে হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর নিকট একটি পত্র পাঠালেন। পত্রে তিনি লিখলেন : আমাকে সাহায্য করুন। শত্রুপক্ষের বিপুল সৈন্য ও শক্তির মুকাবিলা আমাদের স্বল্প সংখ্যক লোক দ্বারা সম্ভবপর নাও হতে পারে।

দুমাতুল জান্দাল বিজয়

হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) কা'কা' ইব্‌ন আমর (রা)-কে হীরায় স্বীয় প্রতিনিধি নিয়োগ করে অগৌনে দূমাতুল জান্দাল রওয়ানা করলেন। হযরত খালিদ (রা)-এর আগমন সংবাদ শুনে আকীদর ইব্‌ন আব্‌দিল মালিক জূদী ইব্‌ন রবীআ ও অন্যান্য খ্রিস্টান সরদারকে বললেন, মুসলমানদের সাথে সন্ধি করা উচিত। কিন্তু তারা এই প্রস্তাব অপসন্দ করলো। আকীদর তাদের সঙ্গ ত্যাগ করে একা কেটে পড়লো। তার এইভাবে কেটে পড়ার খবর মুসলমানরাও জানতে পারলো। একটি ছোট্ট বাহিনী তাকে বন্দী করতে চাইলো। কিন্তু সে লড়াই করে প্রাণ হারালো।

দূমাতুল জান্দালের অদূরে পৌঁছে হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) প্রথমে খোঁজ নিলেন যে, ইয়ায ইব্‌ন গানাম (রা) কোন্ দিকে যুদ্ধরত আছেন। তার বিপরীত দিক দিয়ে হযরত খালিদ (রা) হামলা শুরু করলেন। খ্রিস্টান বাহিনীর সিপাহসালার জূদী ইব্‌ন রবীআ তার বাহিনীকে তৎক্ষণাৎ দুই ভাগে বিভক্ত করে এক ভাগ ইয়ায ইব্‌ন গানাম (রা)-কে মুকাবিলার জন্য পাঠালো আর দ্বিতীয় ভাগ নিজে নিয়ে হযরত খালিদ (রা)-এর মুকাবিলায় অবতীর্ণ হলো। হযরত খালিদ (রা) ব্যূহ থেকে সামনে অগ্রসর হয়ে ময়দানে সেনাপতি জূদীকে উচ্চৈঃস্বরে ভীতি প্রদর্শন করলেন এবং নিজের সাথে লড়াই করতে আহ্বান জানালেন। জূদী ময়দানে উপস্থিত হয়ে খালিদ (রা)-এর মুকাবিলায় অবতীর্ণ হলো। হযরত খালিদ (রা) তৎক্ষণাৎ তাকে বন্দী করে ফেললেন। জূদীর সহচরগণ এই দৃশ্য দেখে তৎক্ষণাৎ পলায়ন করতে শুরু করলো। ঘটনাক্রমে সেই সময়ই ইয়ায ইব্‌ন গানাম (রা) তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী খ্রিস্টানদের পরাস্ত করে তাড়িয়ে দিলেন। উভয় দিকের পলায়নকারীরা বিতাড়িত হয়ে দুর্গে প্রবেশ করলো এবং দরজা বন্ধ করে দিলো। হযরত খালিদ (রা) দুর্গ অবরোধ করে দুর্গবাসীদের সামনে জূদীকে হত্যা করলেন এবং দুর্গ আক্রমণ করে তলোয়ারের জোরে দুর্গ দখল করলেন। যে বাধা দিলো তাকে কতল করলেন। যে নিরাপত্তা চাইল, তাকে নিরাপত্তা দিলেন।

হাসীদ যুদ্ধ

পারস্যবাসী যখন দেখলো হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) হীরা প্রদেশ ত্যাগ করে দূমাতুল জান্দাল গমন করেছেন, তখন তারা হীরা ফিরে পাবার জন্যে এবং ইসলামী কর্মকর্তাদের

ঐ অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করার জন্য অগৌন জোর প্রয়াস চালায়। হীরাস্থ আরব গোত্রগুলোও তাদের নেতা উক্‌বাহ ইব্‌ন উক্‌বাহর হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য নবোদ্যমে সামরিক প্রস্তুতি তড়িঘড়ি সম্পন্ন করে ফেললো। ইরান থেকে যরমেহের ও রোযিয়াহ নামক দু'জন খ্যাতনামা সরদার এক বিরাট বাহিনী নিয়ে রওয়ানা করলো। হযরত কা'কা ইব্‌ন আমর (রা) এই হামলার কথা শুনে উপস্থিত মুসলমানদের দু'টি বাহিনীতে বিভক্ত করলেন। একটি বাহিনীর নেতৃত্ব হযরত আবূ লায়লা (রা)-কে সমর্পণ করলেন এবং অপর বাহিনীর সৈনাপত্য গ্রহণ করলেন হযরত কা'কা' ইব্‌ন আমর (রা) নিজেই। তারপর হীরা থেকে রওয়ানা হয়ে হাসীদ নামক স্থানে ইরানীদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন। ভীষণ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হলো। ইরানের উভয় সরদার ও অর্ধেকেরও বেশী সৈন্য মুসলমানদের হাতে নিহত হলো। অন্যরা পলায়ন করে খানাফিশ নামক স্থানে চলে গেলো। সেখানে ইরানীদের এক মস্ত সিপাহ্‌সালার বাহ্‌বুযান এক বিরাট বাহিনীসহ অবস্থান করছিল। আবূ লায়লা (রা) ঐ পলায়নকারীদের পশ্চাদ্ধাবনে খানাফিশ পর্যন্ত গমন করলে বাহ্‌বুযান খানাফিশ থেকে পলায়ন করে মাযীখ নামক স্থানে চলে গেলো–যেখানে হুযায়ল ইব্‌ন ইমরান অন্যান্য আরব সরদারসহ বিরাট আরব বাহিনী নিয়ে মুসলমানদের মুকাবিলার উদ্দেশ্যে অবস্থান করছিল। এখানে এসব কাণ্ড চলাকালে হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) দূমাতুল জান্দাল থেকে অভিযান শেষ করে হীরা প্রত্যাবর্তন করলেন।

মাযীখ যুদ্ধ

মাযীখে হুযায়ল ইব্‌ন ইমরান ছাড়া রবীআ ইব্‌ন বুহায়র তাগ্‌লিবীও বনূ তাগ্‌লিবসহ মুসলমানদের মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত ছিল। হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) কা'কা' ও আবূ লায়লাকে দুই ভিন্ন দিক থেকে নির্দিষ্ট তারিখে মাযীখ অভিমুখে প্রেরণ করে নিজেও সেই দিকে একা তৃতীয় দিক দিয়ে রওয়ানা করলেন। নির্দিষ্ট তারিখে সেখানে পৌঁছে তিন বাহিনী একযোগে হামলা করে শত্রুসেনাদের নিধন করা শুরু করলেন। হুযায়ল তো মুষ্টিমেয় লোকসহ আপন প্রাণ নিয়ে পলায়ন করলো, কিন্তু অপর সরদার ও অসংখ্য লোক নিহত হলো। নিহতদের মধ্যে আবদুল আযীয ইব্‌ন আবী রিহাম ও লাবীদ ইব্‌ন জারীরও ছিলেন, যারা মুসলমান হয়েছিলেন, কিন্তু চাপে পড়ে শত্রুদের সঙ্গে ছিলেন। এই দু'জনের নিহত হওয়ার খবর যখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) অবগত হলেন, তখন তিনি উভয়ের রক্তপণ পরিশোধ করলেন। আর তাঁদের পরিজনের সাথে সদ্ব্যবহারের কড়া নির্দেশ দিলেন। হযরত উমর ফারূক (রা) মালিক ইব্‌ন নুওয়ায়রাকে হত্যা করার জন্য পূর্ব থেকেই হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। এবার আবদুল আযীয ও লাবীদ নামক দুই ব্যক্তিও মালিক ইব্‌ন নুওয়ায়রার তালিকায় শামিল হলেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর কাছে এ ব্যাপারে কোন কৈফিয়ত তলব করলেন না। বরং বললেন, যে ব্যক্তি মুশরিকদের সাথে থাকবে, তার এরূপ পরিণতিই ঘটবে। রবীআ ইব্‌ন বুহায়র তাগ্‌লিবীও বেঁচে গিয়েছিল এবং একটি বিরাট দল সংগ্রহ করে পারস্যবাসীদের সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। হুযায়ল পলায়ন করে ইয়াসীর নামক স্থানে আত্তাব ইব্‌ন উসায়দ-এর নিকট চলে গিয়েছিল। এখানে আত্তাব ইব্‌ন উসায়দও মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিপুল সংখ্যক লোক জড়ো করছিল। হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) রবীআর পশ্চাদ্ধাবনে কা'কা' (রা) ও আবূ লায়লা (রা)-কে প্রেরণ করলেন এবং হুযায়লের পশ্চাদ্ধাবনে স্বয়ং নিজে গমন করলেন।

সুতরাং রবীআ ও তার সকল সঙ্গী ইয়াসীরে নিহত হলো এবং আত্তাব ইব্‌ন উসায়দ ও হুযায়ল উভয়ে তাদের অধিকাংশ সঙ্গী সাথীসহ মুসলমানদের হাতে প্রাণ হারালো। এরপরই জানা গেলো যে, রিফাযায় বিলাল ইব্‌ন উক্‌বা নিজের আশেপাশে মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক বিরাট বাহিনীর সমাবেশ ঘটিয়েছে। হযরত খালিদ (রা) অবিলম্বে ইয়াসীর থেকে রিফার অভিমুখে রওয়ানা করলেন। সেখানে খালিদ (রা)-এর আগমন সংবাদ শুনে শত্রুপক্ষ পলায়ন করলো এবং পালিয়ে রিযাব ও ফিরাযের দিকে চলে গেলো। এই স্থানগুলো দূমাতুল জান্দালের সংলগ্ন এবং পারস্য, সিরিয়া ও আরবের সংযোগ স্থলে অবস্থিত ছিল। এখানে বনূ তাগ্‌লিব, বনূ তামার ও বনূ আয়াদের পূর্ব থেকেই সমাবেশ ছিল এবং রোমক বাহিনী তাদের সাহায্যার্থে আগমন করে অদূরেই তাঁবু ফেলেছিল। এইভাবে ইরাকের নিম্নভূমি থেকে যে যুদ্ধের সিল্‌সিলা শুরু হয়েছিল, তা ইরানী বাহিনী অতিক্রম করে মধ্যবর্তী গোত্র ও রঈসদের মাধ্যমে রোমক বাহিনী পর্যন্ত পৌঁছে গেলো।

ফিরায যুদ্ধ

হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) ফিরাযে পৌঁছে যুদ্ধের প্রস্তাবনা পেশ করলেন। এই স্থানটি ছিল ফোরাত নদীর কূল ঘেঁষে। অপর পারে রোমক সৈন্য তাঁবু ফেলেছিল। রোমক সৈন্য বার্তা পাঠালো যে, হয়তো তোমরা ফোরাত নদীর এপারে এসো, অথবা আমাদেরকে ওপারে যেতে দাও যাতে আমরা এবং তোমরা একে অন্যের মুখোমুখি হতে পারি।

হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) জবাব দিলেন, তোমরাই এপারে এসো। সুতরাং রোমক বাহিনী নদী পার হয়ে . . . .ইসলামী লশকরের মুখোমুখি হলো। ইসলামী লশকর উপর্যুপরি সফর ও যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। রোমকরা ছিল সম্পূর্ণ সতেজ ও শ্রান্তিহীন। জনশক্তির দিক দিয়েও তারা আট-দশগুণ বেশি ছিল। যুদ্ধ শুরু হলো। সারা দিন দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও তুমুল যুদ্ধ চললো। অবশেষে রোমক বাহিনী চরমভাবে পরাজিত হলো এবং তারা যুদ্ধক্ষেত্রে একলাখ মৃতদেহ রেখে মুসলমানদের সম্মুখ থেকে পলায়ন করলো। এই যুদ্ধ শেষ করে ১২ হিজরীর ২৫শে যিলকাদ হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) শাজারা ইব্‌নুল আগার সহকারে গোটা বাহিনীকে হীরা অভিমুখে ফেরত পাঠালেন এবং নিজে কয়েকজন সহচর নিয়ে নিঃশব্দে ফিরায থেকে প্রস্থান করে মক্কা মুআযযমা পৌঁছে বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জে শরীক হলেন।

হজ্জ সমাপন করে তৎক্ষণাৎ তিনি হীরা অভিমুখে গমন করলেন। হীরা পৌঁছে যখন তিনি লশকরে শরীক হলেন, তখন কেউ ধারণাও করতে পারেননি তিনি হজ্জ করে এসেছেন। ঘটনাচক্রে এই খবর গোপন রইল না। ক্রমে ক্রমে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর কানে পৌঁছে গেলো। তিনি খালিদ (রা)-কে ভবিষ্যতে এই ধরনের কাজ করতে নিষেধ করলেন এবং কিছুটা অসন্তুষ্টিও প্রকাশ করলেন। এই বছর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-ও বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ আদায় করেন এবং হযরত উছমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)-কে মদীনা মুনাওয়ারায় স্বীয় স্থলবর্তী নিয়োগ করেন। হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) হীরায় ফিরে এসে সেখানকার অবশিষ্ট ছোট ছোট স্থানগুলো দখল করলেন।

হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) ১৩ হিজরীর রবীউল আউয়াল পর্যন্ত হীরায় অবস্থান করেন। ১২ হিজরীর মুহাররমের শেষ দিকে তিনি ঐ এলাকায় প্রবেশ করেছিলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি পায়ে পায়ে শত্রুর মুকাবিলা করেন এবং বিশটি রক্তক্ষয়ী বড় যুদ্ধ

পরিচালনা করেন। প্রতিটি যুদ্ধেই তার সৈন্যসংখ্যা কম এবং শত্রুপক্ষের সৈন্য কয়েকগুণ বেশী ছিল। প্রতিটি যুদ্ধেই তিনি জয়লাভ করেন। কোন স্থানেই তিনি পরাস্ত ও পরাভূত হননি। ইরানীদের অহংকারী মনে ও শত্রু সম্প্রদায়ের অন্তরে তাঁর বাহুবল ও দৃঢ়চিত্ততার বদৌলতে ভীতি সৃষ্টি হলো। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে তিনি যে বিশাল দেশ ও বড় বড় গোত্র-গোষ্ঠী বশীভূত করেছেন, তার দৃষ্টান্ত বিশ্ব-ইতিহাসে সহজে পাওয়া যাবে না। হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর অতুলনীয় বীরত্ব ও যোগ্যতাপূর্ণ সৈনাপত্যের জন্য তাঁর উপর দরূদ ও সালাম পাঠাতে আমরা বাধ্য। কিন্তু এই সমুদয় খালিদী কৃতিত্বের একটি মূলতত্ত্ব ও প্রাণশক্তি রয়েছে। সেই মূলতত্ত্ব ও প্রাণশক্তিও আমাদের খুঁজে বের করা উচিত। সেটা হচ্ছে, সিদ্দীকী নির্বাচন, সিদ্দীকী প্রশিক্ষণ ও সিদ্দীকী দিক-নির্দেশনা। মদীনা মুনাওয়ারা ও ইসলামী লশকরের মধ্যে অহরহ চিঠিপত্রের আদান-প্রদান চলতো। প্রত্যেকটি ঘটনার খবরাখবর অতিদ্রুত রাসূলের খলীফার নিকট পৌঁছে যেতো। আর এইভাবে সামান্য সামান্য ব্যাপারেও রাসূলের খলীফার তরফ থেকে দিক-নির্দেশনা পৌঁছাতে থাকতো।

সিরিয়ায় খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)

ইরানীদের তরফ থেকে মোটামুটি নিশ্চিন্ত হওয়া গিয়েছিল এবং খুব শীঘ্র তারা মদীনা মুনাওয়ারায় সৈন্য চালনার স্বপ্ন দেখবে সে আশংকাও ছিল না। আরবের সর্বত্র যখন মুরতাদ সমস্যা দমিত হলো এবং ইরানী আশংকার গুরুত্বও কোন দ্রুততার দাবী করলো না, তখন সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল সিরিয়ার শৃংখলা বিধান ও ঐদিক থেকে রোমক ও গাস্‌সানী আশংকা প্রতিরোধ করা। শুরাহবীল ইব্‌ন আমর নামক গাসসানী বাদশাহ হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর রাষ্ট্রদূতকে শহীদ করে ফেলেছিল, যার পর মু'তা যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তারপর রোমক ও গাসসানীরা মিলে মদীনা মুনাওয়ারায় সৈন্য পরিচালনার প্রস্তুতি নেয়। সেই খবর শ্রবণ করে স্বয়ং হযরত নবী করীম (সা) সৈন্য-সামন্ত নিয়ে তাবূক পর্যন্ত গমন করেন। কিন্তু তখনো পর্যন্ত খ্রিস্টানরা পূর্ণভাবে এতবড় আরবী ও ইসলামী লশকরের মুকাবিলা করার সাহস করতে পারেনি। তাই হযরত নবী করীম (সা) সিরীয় সীমান্তে ভীতিসঞ্চার করে প্রত্যাগমন করেন। এরপর পুনরায় খবর এলো যে, সিরীয় সীমান্তে সামরিক প্রস্তুতি চলছে। তখন হযরত নবী করীম (সা) হযরত উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা)-কে প্রেরণ করেন। তিনি হযরত নবী করীম (সা)-এর ওফাতের পর সিরীয় সীমান্তে গমন করেন এবং মুকাবিলাকারীদের পরাস্ত করে দ্রুত প্রত্যাবর্তন করেন কেননা, দেশের অভ্যন্তরে তখন মুরতাদ সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছিল। মুরতাদ সমস্যা নিরসন করার জন্য হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) যে এগারটি বাহিনী গঠন করে পাঠান তার একটি বাহিনী হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-কে দিয়ে বলে দিলেন যে, তুমি সিরীয় সীমান্ত অভিমুখে গমন কর। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-ও সিরীয় আশংকা উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি মুরতাদ সমস্যা মিটানোর ক্ষেত্রে সিরীয় আশংকাকে খুব দৃষ্টিগোচর রেখেছিলেন। তারপর মুরতাদ সমস্যা থেকে যখন নিশ্চিত হওয়া গেলো, তখন ইরানী আশংকা থেকে নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য তিনি খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-কে ইরাকে প্রেরণ করেন। আর আরবের সর্বত্র রাষ্ট্রদূত প্রেরণ করে যুদ্ধের জন্য প্রত্যেক গোত্র থেকে সৈন্য তলব করেন। উদ্দেশ্য ছিল, আরবের সম্মিলিত শক্তি দ্বারা রোমক ও ইরানী সম্রাটের মুকাবিলা করা–যাতে চিরতরে খ্রিস্টীয় ও মজুসী আশংকা থেকে আরবরা মুক্তি পায়। দ্বিতীয়ত, আরবের

যেসব যুদ্ধবাজ গোত্র চুপ করে বসে থাকায় অভ্যস্ত ছিল না, তাদেরকে দেশের সর্বত্র থেকে খুঁজে এনে অমুসলিম শত্রুদের মুকাবিলায় সিরিয়া ও ইরাকে পাঠিয়ে দেয়া–যাতে আরবের ঐক্য ও শক্তি এবং ইসলামের কেন্দ্রীয় শক্তির জন্য কোন অভ্যন্তরীণ গোলযোগের আশংকা অবশিষ্ট না থাকে। এই প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, মুরতাদ সমস্যাও ইসলামের বিজয় অভিযানের একটি বড় কারণ ছিল। আর আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর বুদ্ধি-কৌশল ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব বিকাশের সেই কাজটিই করেছিলেন, যা একজন অভিজ্ঞ বুদ্ধিমান মালি তার ফুল বাগানের সজীবতা ও শ্যামলিমার জন্য করতে পারেন।

হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)-এর সাথে খুব কম লোক ছিল। কিন্তু তিনি পথিমধ্যে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নির্দেশ অনুযায়ী যত মুসলমান সম্ভব সঙ্গে নিয়ে চললেন। হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)-কে নির্দেশ দান করা হয়েছিল যে, যতটা সম্ভব মুরতাদদের শায়েস্তা করবে। খ্রিস্টান বাহিনী মুকাবিলা করতে এলে যতটা সম্ভব ঝটিকা আক্রমণ করবে। এক জায়গায় স্থির হয়ে যুদ্ধ করবে না। এরপর নির্দেশ দানের কারণ ছিল, সিদ্দীকে আকবর (রা) সর্বপ্রথম আরবকে আয়ত্তে আনতে চেয়েছিলেন এবং যে পর্যন্ত মুরতাদ সমস্যা পুরোপুরি মিটে না যায়, তখন পর্যন্ত হিরাক্লিয়াস ও কিসরা বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করা সমীচীন মনে করতেন না। যেমনিভাবে অন্যান্য সেনাপ্রধানের সাথে খলীফার দরবার থেকে পত্র-বিনিময় চলছিল, তেমনি খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)-এর গতিবিধি সম্পর্কেও সিদ্দীকে আকবর (রা) ওয়াকিফহাল ছিলেন এবং নিয়মিত হযরত খালিদ (রা)-এর কাছে মদীনা মুনাওয়ারা থেকে নির্দেশাবলী পৌঁছতে থাকতো।

হিরাক্লিয়াস সিরীয় সীমান্তে ইসলামী লশকরের উপস্থিতির কথা শুনে প্রথমে সীমান্তবর্তী গোত্রসমূহ ও রঈসদেরকে মুকাবিলার জন্য উস্কানি দিলেন। কিন্তু এই ছোট ছোট রঈস ও আরব খ্রিস্টান গোত্রগুলো যখন ইসলামী লশকরের মুকাবিলায় হেরে যাচ্ছিল, তখন রোমের কায়সার হিরাক্লিয়াস মাহান নামক রোমক সেনাপতিকে এক বিরাট বাহিনীসহ মুকাবিলার জন্য পাঠান। যখন খ্রিস্টান ও ইসলামী লশকরের মুকাবিলা হলো, তখন মাহান বাহিনী পরাজিত হলো এবং বহু মালে গনীমত মুসলমানদের হস্তগত হলো। এই পরাজয়ের খবর শুনে হিরাক্লিয়াস স্বয়ং কনস্টানটিনোপল সাম্রাজ্য থেকে রওয়ানা হয়ে সিরিয়ায় এলেন এবং সমুদয় সৈন্য একত্রিত করে যুদ্ধ পরিচালনার ভার তিনি সরাসরি নিজের হাতে তুলে নিলেন। হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)-এর পত্র মারফত এই সমুদয় বৃত্তান্ত সিদ্দীক আকবর (রা) অবগত হলেন, যা তিনি পূর্ব থেকেই অনুমান করেছিলেন। ঘটনাক্রমে যেদিন এই পত্র মদীনায় এসে পৌঁছলো, ঐ দিন হযরত ইকরামা ইব্ন আবূ জাহেল তাঁর অভিযান শেষ করে মদীনায় পৌঁছেছিলেন। একই সঙ্গে দেশের সর্বত্র আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে বিভিন্ন গোত্রের আগমন আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। সিদ্দীকে আকবর (রা) ইকরামা (রা)-কে তৎক্ষণাৎ হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)-এর সাহায্যে প্রেরণ করলেন। তাঁর পর হযরত আমর ইবনুল 'আস (রা)-কে একটি বাহিনী দিয়ে প্রেরণ করলেন খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) ও তাঁর সহচরদের সঙ্গে নিয়ে ফিলিস্তীনের পথে আক্রমণ করার জন্য। এরপর আগত গোত্রসমূহের একটি বাহিনী গঠন করে ইয়াযীদ ইব্ন আবূ সুফিয়ানকে অধিনায়ক করে প্রেরণ করলেন এবং নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা দামেশকের দিক থেকে আক্রমণ করবে। এরপর আরেকটি বাহিনী গঠন করে তার

অধিনায়ক বানালেন হযরত আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ্ (রা)-কে। তাঁকে নির্দেশ দিলেন যে, তুমি হিম্‌সের দিকে গমন করে হামলা করবে। ঐ সময়ই শুরাহবীল ইব্‌ন হাসানা (রা) ইরাক থেকে মদীনা মুনাওয়ারায় আগমন করেছিলেন। সিদ্দীকে আকবর (রা) আরেকটি বাহিনী গঠন করে তার অধিনায়ক নিযুক্ত করেন শুরাহবীল ইব্‌ন হাসানা (রা)-কে। তিনি তাঁকে নির্দেশ দিলেন যে, তুমি জর্দানের দিক থেকে আক্রমণ করবে। এইভাবে সিদ্দীকে আকবর (রা) সিরিয়া আক্রমণ করার জন্য ১৩ হিজরীর মুহাররম মাসে চারটি বাহিনী গঠন করে চার দিক থেকে প্রেরণ করলেন।

এই চারটি বাহিনী যখন সিরীয় সীমান্তে পৌঁছলো এবং হিরাক্লিয়াস জানতে পারলো যে, আরবরা চার ভাগে বিভক্ত হয়ে চার জায়গায় হামলা করার সংকল্প করেছে, তখন তিনিও তার চারজন সেনাপতিকে চারটি বিরাট বাহিনী দিয়ে পৃথক পৃথকভাবে প্রেরণ করলেন। হযরত আমর ইবনুল 'আস (রা)-এর মুকাবিলার জন্য তিনি তাঁর সহোদর তাযারুককে নব্বই হাজার সৈন্য দিয়ে ফিলিস্তীনের দিকে প্রেরণ করলেন। জর্জ ইব্‌ন নুযারকে চল্লিশ হাজার সৈন্য দিয়ে ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ সুফিয়ানের মুকাবিলায় দামেশকের দিকে প্রেরণ করলেন। রাকিস নামক অধিনায়ককে পঞ্চাশ হাজার সৈন্যসহ শুরাহবীল ইব্‌ন হাসানার মুকাবিলায় জর্দানের দিকে এবং বফীকার ইব্‌ন নিস্তরাসকে ষাট হাজার সৈন্যসহ আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ্‌র মুকাবিলায় হিমসের দিকে প্রেরণ করলেন। হিরাক্লিয়াস তাঁর চারজন সেনাপতির অধীনে সর্বমোট দুই লাখ চল্লিশ হাজার সৈন্য মুসলমানদের মুকাবিলার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলেন। অথচ মুসলমানদের বাহিনী চতুষ্টয়ের সর্বমোট সৈন্য ছিল ত্রিশ হাজারের কাছাকাছি। এতেই প্রতীয়মান হয় যে, হিরাক্লিয়াস মুসলমানদের মূলোচ্ছেদ করার জন্য পূর্ব থেকেই কত বিরাট আয়োজন করে রেখেছিলেন। কিন্তু এতে সন্দেহ নেই যে, স্বয়ং হিরাক্লিয়াস ব্যক্তিগতভাবে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার আকাঙ্ক্ষী ছিলেন না। তিনি যুদ্ধ পরিহার ও যতটা সম্ভব মুসলমানদের সাথে সম্পর্কহীন থাকতে চাইতেন। কিন্তু তাঁর সমুদয় সভাসদ, মন্ত্রীবর্গ, সেনাপতিগণ ও গভর্নরগণ ছিলেন আরবদেশ আক্রমণ করার জন্য আপাদমস্তক প্রস্তুত। অন্য কথায়, হিরাক্লিয়াস যুদ্ধ করতে না চাইলেও রোমান সরকার পরিপূর্ণরূপে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল। সুতরাং রোমান সরকারের শাহানশাহ হিসাবে হিরাক্লিয়াসকে সব রকম উদ্যোগ আয়োজন একজন বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞ পরিচালকের মতই করতে হয়েছিল।

মুসলিম সেনাপতিগণ যদিও পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে অভিযাত্রা করেছিলেন, কিন্তু সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর নির্দেশ অনুযায়ী একে অপরের অবস্থা অবহিত ও পারস্পরিক খবরাখবর আদান-প্রদানের ব্যবস্থা চালু রেখেছিলেন। সিরীয় সীমান্তে প্রবেশ করার পর যখন তাঁরা জানতে পারলেন যে, প্রতিটি মুসলিম বাহিনীর মুকাবিলায় তার আটগুণ রোমক সৈন্য সব রকম অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আগমন করছে, তখন একদিকে সিদ্দীকে আকবর (রা)-কে এ সংবাদ প্রদান করলেন, অপরদিকে তাঁরা এক জায়গায় একত্রিত হয়ে শত্রুর মুকাবিলা করা সমীচীন মনে করলেন। ঘটনাক্রমে এদিকে চারজন সেনাপতিই নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে ইয়ারমুকের এক জায়গায় সমবেত হলেন। ওদিকে সিদ্দীকে আকবর (রা) রোমক সৈন্যের আধিক্য ও প্রস্তুতির কথা শুনে একদিকে সেনাপতি চতুষ্টয়কে এক জায়গায় জমায়েত হয়ে মুকাবিলা করার নির্দেশ পাঠালেন, অপর দিকে হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-কে লিখে পাঠালেন যে, তুমি হীরা

প্রদেশে তোমার স্থলে মুছান্না ইব্‌ন হারিছা (রা)-কে ওখানকার দায়িত্বশীল কর্মকর্তা বানিয়ে অর্ধেক সৈন্য মুছান্নার কাছে রেখে বাকী অর্ধেক সৈন্য নিয়ে সিরিয়া গমন করো এবং সেখানকার সমস্ত ইসলামী সৈন্যের দায়িত্বভার প্রধান সেনাপতি হিসাবে তুমি নিজ হাতে গ্রহণ করো। সিদ্দীকে আকবর (রা) দেখেছিলেন খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) ইরানী বাহিনীকে কিভাবে পরাভূত করে এক বিশাল এলাকা ইরান সাম্রাজ্য থেকে ছিনিয়ে এনেছিলেন। তাঁর দৃষ্টিতে এই ভয়াবহ অবস্থায় সার্থকভাবে রোমকদের মুকাবিলা করার জন্য খালিদের চেয়ে উপযুক্ত লোক আর কেউ ছিল না। তিনি এ কথাও জানতেন যে, খালিদের সবচেয়ে বড় ও সর্বপ্রথম কীর্তি ছিল মূতা যুদ্ধ। তিনি মূতা যুদ্ধে ইসলামী সৈন্যের বিক্ষিপ্ত অবস্থাকে সামলে নিয়েছিলেন, যার প্রতিদানস্বরূপ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তিনি 'সায়ফুল্লাহ্' (আল্লাহর তলোয়ার) উপাধি লাভ করেছিলেন। তাই সিদ্দীকে আকবর (রা) অতি জাঁদরেল সেনাপতি চতুষ্টয়ের কাছে সায়ফুল্লাহকে প্রেরণ করা এবং তাঁদের উপর তাঁকে প্রধান সেনাপতি করা অতীব ফলপ্রদ হবে বলে মনে করলেন। সেমতে খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) দশ হাজার সৈন্য মুছান্না ইব্‌ন হারিছা (রা)-এর নিকট রেখে বাকী দশ হাজার সৈন্য নিয়ে সিরিয়া রওয়ানা হলেন।

ওদিকে হিরাক্লিয়াস যখন দেখলেন যে, ইসলামী বাহিনী চতুষ্টয় এক জায়গায় জমায়েত হয়েছে, তখন তিনিও তাঁর সেনাপতি চতুষ্টয়কে নির্দেশ দিলেন এক জায়গায় হয়ে মুকাবিলা করার। রোমক বাহিনী চতুষ্টয় একত্রিত হয়ে ইয়ারমুক প্রস্রবণের অপর পাড়ে এমন এক ডিম্বাকার ময়দানে তাঁবু ফেললো, যা পশ্চাৎ দিক থেকে পাহাড় ও সম্মুখ দিক থেকে পানি বেষ্টিত ছিল। এই দুই লাখ চল্লিশ হাজার রোমক সৈন্যের প্রধান সেনাপতি ছিল হিরাক্লিয়াসের সহোদর তাযারুক। হিরাক্লিয়াস তাকে লিখলেন যে, আমি আরো একটি বড় বাহিনী তোমার সাহায্যার্থে প্রেরণ করছি। সে মতে মাহান নামক সেনাপতিকে ইয়ারমুকের দিকে প্রেরণ করলেন। ইসলামী লশকর ইয়ারমুকের এপারে খোলা ময়দানে পড়েছিল। তারা স্বীয় সংখ্যাল্পতার দরুন রোমকদের উপর আক্রমণ করতে পারছিল না। ওদিকে এক প্রাকৃতিক প্রাচীরে ঘেরা রোমক বাহিনীও বাইরে বের হয়ে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল।

ইয়ারমুকে যখন উভয় লশকর একত্রিত হলো, তখন ছিল সফর মাস। ঐ সময় কিংবা তার দু'চার দিন পর হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) ইরাক থেকে তাঁর দশ হাজার সৈন্য নিয়ে ইয়ারমুক অভিমুখে রওয়ানা করলেন। পথিমধ্যে হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-কে কয়েক স্থানে শত্রু গোত্র ও শত্রু রঈসদের সেনাবাহিনী বাধা দিলো : প্রত্যেক স্থানেই খালিদ (রা) লড়াই করে শত্রুদেরকে বিতাড়িত ও সামনে থেকে অপসারিত করে ১৩ হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে ইয়ারমুকে পৌঁছলেন। ইয়ারমুকে হিরাক্লিয়াসের পক্ষ থেকে আরো কয়েকজন সেনাপতি সামরিক সাহায্য সহকারে রোমানবাহিনীতে যোগদান করেছিল। হযরত খালিদ (রা)-এর আগমনের পূর্বে যদিও ছোট্ট খাটো ঠোকাঠুকি উভয় বাহিনীর মধ্যে বেঁধে গিয়েছিল, কিন্তু তেমন কোন উল্লেখযোগ্য বড় যুদ্ধ তখনো হয়নি।

ইয়ারমুক যুদ্ধ

হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) একজন অভিজ্ঞ সেনাধ্যক্ষ হিসাবে গোটা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করলেন। একদিন রাতে তিনি অনুভব করলেন যে, ভোর বেলা রোমক বাহিনী সম্মিলিতভাবে আক্রমণ চালাবে। তিনি রাতের বেলায়ই সমস্ত মুসলিম সৈন্যকে–যাদের সংখ্যা

বর্ণনা করা হয়েছে চল্লিশ থেকে ছেচল্লিশ হাজার–বহু ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত করে প্রত্যেক দলের জন্য এক একজন অভিজ্ঞ বাহাদুর ব্যক্তিকে প্রধান কর্মকর্তা নিয়োগ করলেন এবং বাছা বাছা বাহাদুরদের একটি ছোট্ট দল স্বীয় সাহচর্যের জন্য নির্ধারিত করে অতি সুনিপুণভাবে প্রত্যেক কর্মকর্তাকে তার কর্তব্য সম্পর্কে উপযুক্ত পরামর্শ প্রদান করলেন। রোমক বাহিনীর পক্ষ থেকে প্রথম চল্লিশ হাজার অশ্বারোহীর একটি বাহিনী আক্রমণ করলো। হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) তার মুষ্টিমেয় সহচরসহ সামনে অগ্রসর হয়ে ঐ বাহিনীটি বিতাড়িত করলেন। এরপর জর্জ ইব্‌ন যায়দ নামক রোমক সেনাপতি এগিয়ে এলো এবং খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-কে কিছু কথা বলার জন্য আহ্বান করলো। হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) তাঁর নিকট গেলেন। তিনি খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-কে ইসলাম সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন। হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) তাঁকে অতি সুন্দরভাবে ইসলামের মূলতত্ত্ব বুঝিয়ে দিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ মুসলমান হয়ে একা খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর সঙ্গে ইসলামী লশকরে চলে এলেন এবং মুসলমানদের সাথে শরীক হয়ে রোমক বাহিনীর উপর হামলা করলেন। ঐ যুদ্ধেই জর্জ (র) ইব্‌ন যায়দ অতি বীরত্বের সাথে লড়াই করে শহীদ হন।

উভয় দিক থেকে তুমুল যুদ্ধ শুরু হলো। মুসলিম সেনাপতিদের বিস্ময়কর বীরত্ব মুসলমানদের সংখ্যাল্পতা সত্ত্বেও কোন সৈন্যের অন্তরে হিম্মতহারা ও হতোদ্যম হওয়ার কল্পনা পর্যন্ত উদয় হতে দিলো না। উৎসাহ উত্তেজনার অবস্থা এরূপ ছিল যে, ইসলামী লশকরের নারীরাও লড়াই করে কাফিরদের হত্যা করতে যোগ দিলো। আবূ সুফিয়ান রাজায (যুদ্ধের কবিতা) পাঠ করে করে অন্তরে জোশ ও যুদ্ধের উন্মাদনা সৃষ্টি করছিলেন। হযরত ইকরামা (রা) উচ্চকণ্ঠে বললেন : কে আছো আমার হাতে মৃত্যুর জন্য বায়'আত করবে ? তৎক্ষণাৎ যিরার ইব্‌ন আযওয়ার ও অন্যান্য চারশ' লোক বায়'আত করলেন যে, হয়তো আমরা শহীদ হয়ে যাবো, অথবা বিজয়ী বেশে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে আসবো। এরপর এই দলটি রোমক বাহিনীর মধ্যে ক্ষুধার্ত নেকড়ের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন। হযরত মিকদাদ (রা) উচ্চকণ্ঠে সূরা আনফাল তিলাওয়াত করে মুসলিম যোদ্ধাদের মনে শাহাদতের উদ্দীপনা সৃষ্টি করছিলেন। খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা), আবূ উবায়দা (রা) ইব্‌ন জাররাহ, শুরাহবীল ইব্‌ন হাসানা (রা), আমর ইব্‌ন আস (রা), হারিছ (রা), যিরার (রা), জর্জ (রা) ইব্‌ন যায়দ প্রমুখ মুসলিম বীর যে কীর্তি আঞ্জাম দিলেন, তা আজ পর্যন্ত আকাশের সূর্য অবলোকন করেনি। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তলোয়ার ও খঞ্জর এবং তীর ও বর্শার ব্যবহার অতি তীব্র ও ক্ষিপ্রতার সাথে চালু ছিল। জুহর ও আসরের নামায মুসলিম যোদ্ধারা নিছক ইশারা-ইঙ্গিতেই যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে করতে আদায় করেছেন। দিন শেষ হয়ে গেলো, কিন্তু যুদ্ধ শেষ হলো না।

অবশেষে রোমকরা সারা দিনের কষ্ট-ক্লেশে ক্লান্ত ও শ্রান্ত হয়ে মুসলমানদের মুকাবিলায় তিষ্টিতে পারলো না। পিছনে হটলো এবং হটতে হটতে পাহাড়ের পাদদেশে গিয়ে পৌঁছলো। কিন্তু মুসলমানরা তাদের সাথে সাথে অগ্রসর হতে হতে এবং ঠেলতে ঠেলতে সামনে চলে গেলেন। যখন পিছনে হটা ও পলায়ন করার জায়গা রইল না, তখন এদিক-ওদিক দিয়ে চুয়ে চুয়ে তাদের স্রোত বইলো। তবু মুসলমানরা তাদের পেছন ছাড়লো না। বহু পানিতে ডুবে, বহু খানা-খন্দকে পড়ে মারা গেলো। এক লাখ ত্রিশ হাজার রোমক প্রাণ হারালো। অন্যরা তাদের প্রাণ নিয়ে পলায়ন করলো। পলায়নকারীদের মধ্যে অশ্বারোহীই বেশী ছিল। পদাতিকরা প্রায়

সবই মারা গেলো। যুদ্ধ সারা দিন ও সারা রাত চালু থেকে পরদিন ভোর বেলা মুসলমানদের বিজয় আকারে শেষ হলো। রোমক সৈন্য থেকে ময়দান সম্পূর্ণ শূন্য দেখা গেলো। রোমক বাহিনীর প্রধান সেনাপতি হিরাক্লিয়াসের সহোদর তাযারুকও মারা গেলো। আরও কতিপয় সেনাপতি মারা গেলো। মুসলমানদের তিন হাজার বাহাদুর শহীদ হলেন। এই তিন হাজারের মধ্যে নও-মুসলিম জর্জ (রা), ইব্‌ন যাযদ ইকরামা (রা), আমর ইব্‌ন ইকরামা (রা), সালামা ইব্‌ন হিশাম (রা), আমর ইব্‌ন সাঈদ (রা), আবান ইব্‌ন সাঈদ (রা), হিশাম, ইবনুল আসী (রা), হিবার ইব্‌ন সুফিয়ান (রা), তুফায়ল ইব্‌ন আমর (রা) প্রমুখ শহীদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইয়ারমুক যুদ্ধ ১৩ হিজরীর রবীউল আউয়াল বা রবীউস সানীতে সংঘটিত হয়েছে বলে বর্ণনা করা হয়। কিন্তু এটা সঠিক বলে মনে হয় না। ইয়ারমুক যুদ্ধ নির্ঘাত জুমাদিউস ছানীর শেষ দিনগুলোতে সংঘটিত হয়েছে। রোমক সৈন্য ইয়ারমুকে আসার আগে মুসলমানরা বসরা প্রভৃতি স্থান জয় করেছিলেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর ইনতিকাল পর্যন্ত ইয়ারমুক বিজয়ের খবর মদীনায় পৌঁছেনি। ইয়ারমুক বিজয়ের খবর দুই আড়াই মাস পর্যন্ত মদীনায় না পৌঁছা অসম্ভব ছিল।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর ইন্তিকাল

শামদেশে (সিরিয়ার) ইয়ারমুকের যুদ্ধ কায়সার হিরাক্লিয়াসকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। ইয়ারমুকের পলাতক সৈন্যরা যখন হিমসে হিরাক্লিয়াসের নিকট-যেখানে তিনি যুদ্ধের ফলাফলের অপেক্ষা করছিলেন–পৌঁছলো, তখন তিনি তার কয়েক লাখ লৌহ সৈনিকের মুষ্টিমেয় মুসলমানের হাতে তছনছ হওয়ার কথা শুনে হতভম্ব হয়ে পড়লেন এবং তৎক্ষণাৎ হিম্‌স থেকে রওয়ানা হয়ে অন্য কোথাও চলে গেলেন। যাওয়ার সময় এই নির্দেশ দিয়ে গেলেন যে, দামেশক ও হিম্‌স্ শহরকে ভালভাবে দুর্গবেষ্টিত ও সুদৃঢ় করতে হবে। মুসলমানগণ ইয়ারমুক থেকে অগ্রসর হয়ে দামেশক অবরোধ করেছিলেন। শামদেশ যেনো মুসলমানরা দখল করেই ফেলেছিলেন কিংবা দখল করার উপক্রম করেছিলেন। হিরাক্লিয়াসের কোমর ইয়ারমুকে ভেঙ্গে গিয়েছিল। তখন আরবের দিকে চোখ তুলে তাকানোর চাইতে রোমকদের চোখে স্বয়ং নিজেদের মৃত্যু ও ধ্বংসই ভেসে উঠেছিল। অনুরূপভাবে ইরাকের উর্বর ও বিস্তীর্ণ অঞ্চল মুসলমানদের দখলে এসেছিল। ইসলামী রাষ্ট্র আরব দেশে সুদৃঢ় ও সুস্থির হয়ে ইরান ও রোমের সীমানাকে পেছনে হটানো এবং নিজে বিস্তৃত হওয়ার ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করেছিল।

১৩ হিজরীর জমাদিউস-সানীর শুরুতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) জ্বরে আক্রান্ত হন। একনাগাড়ে ১৫ দিন মারাত্মক জ্বর ছিল। তিনি যখন নিশ্চিত হলেন যে, নিদানকাল ঘনিয়ে এসেছে, তখন তিনি সর্বপ্রথম হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা)-কে ডেকে খিলাফত সম্পর্কে পরামর্শ করলেন। হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা)-কে তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে, উমর সম্পর্কে তোমার ধারণা কি? তিনি বললেন, উমরের মেজাযে কঠোরতা বেশী। তিনি বললেন, উমরের কঠোরতার কারণ হচ্ছে আমি কোমল স্বভাবের ছিলাম। আমি স্বয়ং অনুমান করতে পেরেছি যে, আমি যে বিষয়ে কোমলতা অবলম্বন করতাম, তাতে উমরের অভিমত কঠোরতার দিকে আসক্ত মনে হতো। কিন্তু যেসব ব্যাপারে আমি কঠোরতা অবলম্বন করেছি, তাতে উমর সর্বদা কোমলতার দিক অবলম্বন করতো। আমার ধারণা, খিলাফত তাকে নিশ্চিতরূপেই নরম-দিল ও সংযত বানাবে। এরপর তিনি হযরত উছমান গনী (রা)-কে ডেকে একই প্রশ্ন

জিজ্ঞেস করলেন। তিনি জবাব দিলেন যে, উমরের অন্তর তার বহির্ভাগ অপেক্ষা উত্তম। আমাদের মধ্যে কেউ তাঁর সমকক্ষ হতে পারবে না। তারপর তিনি হযরত আলী (রা)-কে ডেকে এই প্রশ্নই তাঁকেও জিজ্ঞেস করলেন। তিনিও ঠিক সেই জবাবই দিলেন, যা হযরত উছমান গনী (রা) দিয়েছিলেন। তারপর হযরত তালহা (রা) আগমন করলেন। তিনি তাঁর সামনেও বললেন : আমার ইচ্ছা যে, উমর ফারূককে মুসলমানদের খলীফা নিযুক্ত করে যাবো। হযরত তালহা (রা) বললেন, আপনি আল্লাহ্ তা'আলাকে কি জবাব দেবেন যে, আপনি প্রজাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন ? একথা শুনে তিনি বললেন, আমাকে উঠিয়ে বসিয়ে দাও। অতঃপর তাঁকে বসানো হলো। তিনি বললেন, আমি আল্লাহ্ তা'আলাকে জবাব দেবো, আমি তোমার সৃষ্ট জীবের উপর তোমার সৃষ্ট জীবের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তিকে খলীফা নিযুক্ত করেছি। একথা শুনে হযরত তালহা (রা) চুপ হয়ে রইলেন। তারপর তিনি হযরত উছমান গনী (রা)-কে ডেকে ওসীয়তনামা লেখার নির্দেশ দিলেন। রোগের প্রকোপের দরুন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) থেমে থেমে কথা বলছিলেন এবং হযরত উছমান গনী (রা) তা লিখে যাচ্ছিলেন। যে ওসীয়তের বিষয়বস্তু ছিল এরূপ ঃ

"এটা হচ্ছে সেই চুক্তি, য্যা খলীফাতুর রাসূল (সা) হযরত আবূ বকর (রা) তাঁর ইহলৌকিক জীবনের শেষ সময় এবং পারলৌকিক জীবনের প্রথম সময় করেছেন। এরূপ অবস্থায় কাফির ব্যক্তিও ঈমান আনয়ন করে এবং কাফির (পাপী) ব্যক্তিও বিশ্বাস স্থাপন করে। আমি তোমাদের উপর হযরত উমর ইবনুল খাত্তাবকে নিযুক্ত করেছি এবং আমি তোমাদের মঙ্গল ও কল্যাণ করতে ক্রটি করিনি। অতএব উমর যদি সুবিচার ও সবর দ্বারা পরিচালিত হয় তবে তা হবে তাঁর সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতার ফল। আর যদি সে অন্যায় ও অবিচার করে, তবে আমি গায়ব সম্বন্ধে অবহিত নই। আমি তো মঙ্গল ও কল্যাণই কামনা করেছি। আর প্রত্যেক ব্যক্তিই তার কর্মফল ভোগ করে থাকে।

وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَىَّ مُنْقَلِبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ

অত্যাচারীরা শীঘ্রই জানতে পারবে তাদের গন্তব্যস্থল কোথায়।

সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর শেষ ভাষণ

যখন এই ইচ্ছাপত্র (Will) লিপিবদ্ধ হলো, তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) সেটি জনগণকে পাঠ করে শোনাতে বললেন। তারপর তিনি সেই মারাত্মক পীড়িতাবস্থায়ই বাইরে বেরিয়ে এলেন এবং মুসলিম জনতাকে উদ্দেশ্য করে বললেন :

"আমি আমার কোন প্রিয় আত্মীয়কে খলীফা বানাইনি। আর আমি কেবল আমার নিজের মত অনুসারেই হযরত উমর ফারূক (রা)-কে খলীফা বানাইনি বরং বিজ্ঞজনদের পরামর্শ নিয়েই খলীফা বানিয়েছি। এখন তোমরা কি এই ব্যক্তির খলীফা হওয়াতে সন্তুষ্ট, যাকে আমি তোমাদের জন্য নির্বাচন করেছি ? একথা শুনে জনতা বললো, আমরা আপনার নির্বাচন ও আপনার রায় পসন্দ করছি। তারপর সিদ্দীকে আকবর (রা) বললেন : তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে উমর ফারূকের কথা শোনা ও তাঁর আনুগত্য করা। সবাই তা মেনে নিলো।

এরপর উমর ফারূক (রা)-কে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন :

হে উমর! আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীদের জন্য আমার প্রতিনিধি বানালাম। তুমি আল্লাহ্ তা'আলাকে প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে ভয় করতে থাকবে। হে উমর! আল্লাহ্

তা'আলার কিছু হক আছে, যা রাতের সাথে সম্পর্কযুক্ত তা তিনি দিনে কবুল করবেন না। অনুরূপ কিছু হক দিনের সাথে সম্পৃক্ত--যা তিনি রাতে কবূল করবেন না। আল্লাহ্ তা'আলা নফলসমূহ কবূল করবেন না, যে পর্যন্ত ফরযসমূহ আদায় করা না হবে। হে উমর! যার সৎকর্ম কিয়ামতে ভারী হবে, সে-ই মুক্তি পাবে। আর যার সৎকর্ম কম হবে, সে বিপদগ্রস্ত হবে, হে উমর! মুক্তির পথ কুরআন মজীদের উপর আমল ও ন্যায়ের অনুসরণ দ্বারা লাভ করা যায়। হে উমর! তুমি কি জান না যে, উৎসাহ দান ও ভয় দেখান এবং ভীতি প্রদর্শন ও সুসংবাদদানের আয়াতসমূহ কুরআন মজীদে পাশাপাশি নাযিল হয়েছে। যাতে মু'মিনরা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করে এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। হে উমর! কুরআন তিলাওয়াতের সময় যখন জাহান্নামীদের আলোচনা আসিবে, তখন তুমি দু'আ করবে-হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করো না। আর যখন জান্নাতীদের আলোচনা আসবে, তখন দু'আ করবে-হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তাদের মধ্যে শামিল করো। হে উমর! তুমি যখন আমার এই উপদেশগুলো অনুসরণ করবে, তখন আমাকে যেনো তোমার কাছেই বসা দেখতে পাবে।

এই ইচ্ছাপত্র ও উপদেশ প্রভৃতি কার্যক্রম ১৩ হিজরীর ২২ শে জমাদিউস-সানী সোমবার অনুষ্ঠিত হয়। ২২ শে এবং ২৩ শে জমাদিউস-সানীর মধ্যবর্তী রাতে অর্থাৎ মঙ্গলবার রাত বাদ মাগরিব ৬৩ বছর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন। ইশার পূর্বেই তাঁকে দাফন করা হয়। সোয়া দু'বছর তিনি খিলাফত চালান। মক্কার গভর্নর আত্তাব ইব্ন উসায়দ (রা)-ও মক্কায় ঐদিনই ইনতিকাল করেন। যেদিন আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হযরত উমর ফারূক (রা)-এর খিলাফতের জন্য ইচ্ছাপত্র লিপিবদ্ধ করান এবং মুসলমানদেরকে তা অবহিত করেন সেটি ছিল তাঁর জীবনের শেষ দিন। এদিনই ইচ্ছাপত্র লেখার পর হযরত মুছান্না ইব্ন হারিছা যিনি হীরা (ইরাক) থেকে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা করেছিলেন, মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছেন। সেখানকার (ইরাকের) অবস্থা এই দাঁড়িয়েছিল যে, হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) স্বয়ং অর্ধেক সৈন্য নিয়ে এবং অর্ধেক মুছান্না ইব্ন হারিছার নিকট রেখে যখন সিরিয়া গমন করেছিলেন, তখন ইরানী সিপাহসালার বাহমান জাদুওয়ায়ং খালিদ ইব্ন ওয়ালীদের অনুপস্থিতিতে মুসলমানদেরকে ঐ দেশ থেকে বিড়াড়িত করা সহজ ভেবে এক বিরাট বাহিনী নিয়ে এলো। হযরত মুছান্না ইব্ন হারিছা (রা) হীরা থেকে অগ্রসর হয়ে ব্যাবিলনের নিকট ঐ ইরানী বাহিনীর সম্মুখীন হলেন। তুমুল যুদ্ধ হলো। বহু রক্তারক্তি ও হতাহতের পর ইরানীরা চরম পরাজয় বরণ করলো। হযরত মুছান্না ইব্ন হারিছা (রা) মাদায়েনের কাছাকাছি পর্যন্ত ইরানীদের ধাওয়া করে হীরায় প্রত্যাবর্তন করলেন। এই পরাজয়ের পর ইরানীরা তাদের অভ্যন্তরীণ ঝগড়া মুলতবি রেখে এবং ইরানী সেনাপতি ও মন্ত্রিবর্গ তাদের শত্রুতা ভুলে গিয়ে পুনঃপ্রস্তুতি আরম্ভ করলো। সারা দেশ ও প্রদেশসমূহে রণ-উন্মাদনা উথ্‌লে উঠলো। ইরানী জাতি-গোষ্ঠী ও দেশের নেতৃবর্গ সম্মিলিতভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে এবং লড়াই করে মরার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলো। হযরত মুছান্না (রা) যখন ইরানীদের সামরিক প্রস্তুতি সম্পর্কে অবগত হলেন, তখন তিনি তাঁর সৈন্য-স্বল্পতা চিন্তায় বিচলিত হলেন। তিনি বাশীর ইব্ন খাসাসা (রা)-কে তাঁর স্থলবর্তী করে স্বয়ং মদীনা ছুটে গেলেন। উদ্দেশ্য, খলীফাতুর-রাসূলকে মৌখিকভাবে সমস্ত বৃত্তান্ত খুলে বলা এবং পরিস্থিতির গুরুত্ব ও নাযুকতাকে উপলব্ধি করানো। হযরত মুছান্না (রা) যখন মদীনায়

পৌঁছলেন, তখন সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর জীবনের মাত্র কয়েকটি ঘণ্টা অবশিষ্ট ছিল। তিনি মুছান্নার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত শুনলেন এবং হযরত উমর ফারূক (রা)-কে বললেন; তুমি সৈন্য সমবেত করে মুছান্নার সাথে অবশ্য এবং দ্রুত রওনা করবে। হযরত উমর (রা) যখন তাঁর নিকট থেকে বাইরে গেলেন, তখন সিদ্দীকে আকবর (রা) বললেন : হে আল্লাহ! আমি উমরকে মুসলমানদের কল্যাণ ও ফিতনা-ফাসাদের আশংকা দূর করার জন্য আমার পরে খলীফা নির্বাচিত করেছি। আমি যা করেছি, মুসলমানদের মঙ্গলের জন্য করেছি। তুমি অন্তর্যামী। অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিফহাল। আমি মুসলমানদের পরামর্শও নিয়েছি এবং তাদের মধ্য থেকে সবচেয়ে উত্তম, শক্তিমান, মঙ্গলকামী বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে তাদের শাসক বানিয়েছি। অতএব, তুমি আমার খলীফাকে তাদের মধ্যে কায়েম রাখো। তারা তোমার বান্দা এবং তাদের কপাল তোমার হাতে। তাদের শাসকদেরকে সৎ বানিও। আর উমরকে উত্তম খলীফা বানিও এবং তার প্রজাদেরকে তার জন্য উত্তম প্রজা বানিও।

হযরত আলী (রা)-এর প্রতিক্রিয়া

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর ওফাতের খবর যখন মদীনায় ছড়িয়ে পড়লো, তখন গোটা শহরে ক্রন্দন ও বিলাপের উচ্চরোল পড়ে গেলো এবং নবী করীম (সা)-এর ওফাত দিবসের চিত্র পুনরায় মানুষের চোখে ভেসে উঠলো। হযরত আলী (রা) এই খবর শুনে কেঁদে ফেললেন এবং কাঁদতে কাঁদতে তাঁর [আবূ বকর (রা)] গৃহে উপস্থিত হলেন। তারপর তাঁর দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন :

"হে আবূ বকর! আল্লাহ্ আপনার উপর রহমত বর্ষণ করুন। আল্লাহ্র কসম! আপনি তামাম উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম ঈমান আনয়ন করেছেন এবং ঈমানকে আপনার চরিত্র বানিয়েছেন। আপনি সর্বাধিক (ঐশ্বর্যশালী) ও সবচেয়ে নবীর নিরাপত্তা বিধানকারী। আপনি সবচেয়ে ইসলামের পৃষ্ঠপোষক ও মঙ্গলকামী ছিলেন। আপনি স্বভাব-চরিত্র, দান-জ্ঞান ও হিদায়াতের ক্ষেত্রে ছিলেন নবী করীম (সা)-এর নিকটতর। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে ইসলাম ও মুসলমানের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দিন। অন্যরা যখন নবী (সা)-কে মিথ্যাবাদী বলেছে, আপনি তাঁকে তখন সত্যবাদী বলেছেন। অন্যরা যখন আল্লাহ্র রাসূলকে অবজ্ঞা করেছে, আপনি তখন তাঁকে সহানুভূতি দেখিয়েছেন। মানুষ যখন সাহায্য-সহযোগিতা থেকে বিরত ছিল, আপনি তখন উঠে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্র রাসূলের সাহায্য করেছেন। আল্লাহ্ আপনাকে তাঁর কিতাবে 'সিদ্দীক' বলে আখ্যায়িত করেছেন–

وَالَّذِىْ جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ

'যে সত্য এনেছে এবং সত্যকে সত্য বলে মেনেছে' (সূরা যুমার : ৩৩)। আপনি ছিলেন ইসলামের আশ্রয়স্থল ও কাফিরদের বিতাড়নকারী। না আপনার কোন যুক্তি ভিত্তিহীন হয়েছে, না আপনার দৃষ্টি শক্তিহীন হয়েছে। আপনার আত্মা কখনো ভীরুতা দেখায়নি। আপনি পাহাড়ের মতো দৃঢ় ছিলেন। ঝঞ্ঝাবায়ু না আপনাকে উপড়াতে পেরেছে, না টলাতে পেরেছে। আপনার সম্পর্কে নবী করীম (সা) বলেছেন : তুমি দুর্বলদেহী, মযবুত ঈমানদার, কোমলহৃদয়, আল্লাহ্র নিকট উচ্চ মর্যাদাশীল, যমীনে সম্মানিত, মু'মিনকুল শ্রেষ্ঠ। না তোমার সামনে কারো লালসা হতে পারে, না কামনা। দুর্বল আপনার কাছে সবল এবং সবল ছিল দুর্বল। যে পর্যন্ত না আপনি দুর্বলের হক বুঝিয়ে দিয়েছেন এবং সবলের নিকট থেকে হক বুঝে নিয়েছেন।

হযরত উমর ফারূক (রা) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর মৃত্যু-সংবাদ শুনে বললেন : হে খলীফাতুর রাসূল! তুমি তোমার পরে জাতিকে বড় কষ্ট দিলে! তাদেরকে বিপদে ফেলে গেলে। তোমার ধূলিকণা পর্যন্ত পৌঁছাও খুব কষ্টকর। আমি তোমার সমান কিভাবে করতে পারি!

সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর খিলাফতের কর্মকর্তাবৃন্দ

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফতকালে আমীরুল মিল্লাত হযরত আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ্ (রা) বায়তুল মালের কর্মকর্তা ও তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। বিচার বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন হযরত ফারূকে আযম (রা), হযরত আলী (রা) ও হযরত উছমান (রা)-কে 'কিতাবত' (পত্র লিখন) ও অফিস পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। উপরোক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেউ অনুপস্থিত থাকলে, যিনি উপস্থিত থাকতেন তিনিই তাঁর দায়িত্ব আন্জাম দিতেন। হযরত আত্তাব ইব্ন উসায়দ (রা) ছিলেন মক্কা মুয়ায্যমার কর্মকর্তা। তিনি এবং হযরত আবূ বকর (রা) একই দিনে ইন্তিকাল করেন। তায়িফের কর্মকর্তা ছিলেন হযরত উছমান ইব্ন 'আস (রা)। হযরত মুহাজির ইব্ন উমাইয়া (রা) সানআর এবং হযরত যিয়াদ ইব্ন লাবীদ (রা) হাদরামাউতের কর্মকর্তা ছিলেন। ইয়ালা ইব্ন উমাইয়া (রা) খাওলান প্রদেশের, হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা) ইয়ামনের, হযরত মুআয ইব্ন জাবাল (রা) জুনদের, হযরত আলা ইব্ন হাযরামী (রা) বাহরায়নের, হযরত আয়ায ইব্ন গানাম (রা) দূমাতুল জান্দালের এবং হযরত মুছান্না ইব্ন হারিছা (রা) ইরাকের কর্মকর্তা অথবা প্রশাসক পদে নিযুক্ত ছিলেন।

শেষ পর্যন্ত হযরত আবূ উবায়দা ইব্ন জাররাহ (রা)-কে প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব দিয়ে সিরিয়ায় পাঠানো হয়। ইয়াযীদ ইব্ন আবূ সুফিয়ান (রা), আমর ইব্ন 'আস (রা) এবং শুরাহ্বীল ইব্ন হাসানা (রা) ও সিরিয়ার বিভিন্ন ফ্রন্টে সেনাপতিত্বের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। সিদ্দীকে আকবর খিলাফতকালে হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) প্রধান সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কায়কাউস ও কায় খসরুর সাম্রাজ্যের সাথে একজন সেনাপতি হিসাবে রুস্তমের যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, খিলাফতে সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর সাথে হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)-এরও ছিলো সেরূপ সম্বন্ধ।

স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর প্রথম স্ত্রীর নাম ছিলো কাতীলাহ্ বিন্ত আবদুল উযায়রী (রা)। তাঁরই গর্ভে প্রথমে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর (রা), তারপর আসমা বিন্ত আবূ বকর [আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা)-এর মা]-এর জন্ম হয়। হযরত আবূ বকর (রা)-এর দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম ছিলো উম্মে রূমান। তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর (রা) এবং হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা)।

যখন হযরত আবূ বকর (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তাঁর প্রথমা স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। তাই তিনি তাকে তালাক প্রদান করেন। দ্বিতীয় স্ত্রী উম্মে রূমান ইসলাম গ্রহণ করেন। মুসলমান হওয়ার পরও হযরত আবূ বকর (রা) দু'টি বিবাহ করেন। ওদের একজনের নাম ছিল আসমা বিন্ত উমায়স (রা)। তিনি ছিলেন জা'ফর ইব্ন আবূ তালিব (রা)-এর বিধবা স্ত্রী। তাঁর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর (রা)। তাঁর অপর স্ত্রী ছিলেন খাযরাজ গোত্রের হাবীবা বিন্ত খারীজাহ্ আনসারিয়া (রা)। হযরত আবূ বকর (রা)-এর ইন্তিকালের পর তাঁরই গর্ভে কুলছুম নাম্নী একটি মেয়ের জন্ম হয়।

হযরত উমর ফারূক (রা)

জন্ম ও বংশ-পরিচয়

হযরত উমর (রা) ছিলেন কুরায়শের অভিজাত ব্যক্তিবর্গের অন্যতম। জাহিলিয়া যুগের দূতের কাজের দায়িত্ব তাঁরই গোত্রের জন্য নির্দিষ্ট ছিলো। অর্থাৎ যখন কুরায়শের সাথে অন্য কোন বংশের যুদ্ধ হতো তখন তাঁরই গোত্রের গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরকে রাষ্ট্রদূত হিসাবে ঐ বংশের কাছে পাঠানো হতো। কখনো বংশ-পরিচয়কে কেন্দ্র করে পরস্পর গর্ব প্রকাশের প্রয়োজন দেখা দিলে সর্বাগ্রে তাঁরই গোত্রের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সে কাজ সম্পাদনের জন্য বের হতেন। তাঁর বংশ-তালিকা হলো উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) ইব্‌ন নুফায়ল ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা ইব্‌ন রিবাহ্‌ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুওয়াই। কা'বের দুই ছেলে। একজন 'আদী এবং অপরজন মুররাহ্‌। মুররাহ্‌ ছিলেন হযরত রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রপিতামহগণের অন্যতম। অর্থাৎ অষ্টম স্তরে হযরত উমর (রা)-এর বংশ-তালিকা হযরত রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর বংশ-তালিকার সাথে মিলিত হয়েছে। উমর ফারূক (রা)-এর পিতৃ পরিচায়ক পারিবারিক খণ্ডনাম ছিল আবূ হাফ্‌স। হযরত রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাঁকে 'ফারূক' উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি হিজরতের চল্লিশ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তিনি উট চরাতেন। যৌবনে পৌঁছার পর আরবের ঐতিহ্য অনুযায়ী কুল্‌জী-বিদ্যা (বংশ-পরিচয় বিদ্যা), সমর বিদ্যা, অশ্বারোহণ ও মল্লযুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। জাহিলিয়া যুগে এবং ইসলাম গ্রহণ করার পরও তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত ছিলেন।

কতিপয় বিশেষ বৈশিষ্ট্য

হযরত ফারূকে আযম (রা) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে 'উকায নামক স্থানে, যেখানে বিষয় বিশেষজ্ঞদের বার্ষিক সমাবেশ হতো এবং এক বিরাট মেলা বসতো, সেখানে ভূমিতে প্রায়ই মল্লযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন। তখন তাঁকে আরবের অন্যতম বিখ্যাত মল্লযোদ্ধা হিসাবে গণ্য করা হতো। অশ্বারোহণে তিনি এতই পারদর্শী ছিলেন যে, এক লাফে ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে এরূপ স্থির হয়ে বসতেন যে, তাঁর দেহ মোটেই এদিক ওদিক হত না। 'ফুতুহুল বুলদান'-এর বর্ণনামতে, হযরত রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নবুওয়াত প্রকাশের সময় কুরায়শ বংশে শুধু সতের জন লোক লেখাপড়া জানতেন। আর হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) ছিলেন তাঁদের অন্যতম। চল্লিশ জন পুরুষ ও এগার জন মহিলার পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। কারো কারো মতে, উনচল্লিশ জন পুরুষ ও তেইশজন মহিলা, আবার কারো কারো মতে, পঁয়তাল্লিশজন পুরুষ ও এগারজন মহিলার পর তিনি ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেন। তিনি 'সাবিকীন' (ইসলাম গ্রহণে অগ্রবর্তী ব্যক্তিবৃন্দ) ও 'আশারায়ে মুবাশ্‌শারা' (জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশ ব্যক্তি)-এর অন্যতম। তিনি ছিলেন হযরত রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর শ্বশুর। তিনি আলিম ও যাহিদ (ধর্মের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ) হিসাবে সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হতেন। তাঁর থেকে পাঁচশ'

উনচল্লিশখানি হাদীস বর্ণিত আছে, যা তিনি হযরত উসমান (রা), হযরত আলী (রা), হযরত তালহা (রা), সা'দ (রা), ইব্‌ন মাসউদ (রা), আবূ যার (রা), আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা), আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা), আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র (রা), আনাস (রা), আবূ হুরায়রা (রা), আমর ইব্‌ন 'আস (রা), আবূ মূসা আশ'আরী (রা), বারা ইব্‌ন আযিব (রা), আবূ সাঈদ খুদরী (রা) এবং আরো কয়েকজন সাহাবী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, যে দিন হযরত উমর ফারূক (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন, সেদিন মুশরিকরা বলেছিল, 'আজ মুসলমানরা আমাদের থেকে কড়ায় গণ্ডায় প্রতিশোধ গ্রহণ করলো। ঐদিন নিম্নের আয়াত অবতীর্ণ হয় :

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ٠

হে নবী! আপনার জন্য ও আপনার অনুসারী বিশ্বাসিগণের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। (৮ : ৬৪)

হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত : যেদিন হযরত উমর ফারূক (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন, সেদিন থেকে ইসলামের সম্মান ও প্রতিপত্তি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাঁর ইসলাম গ্রহণ ছিল যেন ইসলামের জয়ের প্রতীক। তাঁর হিজরত ছিল যেন একটি নুসরাত বা বিরাট সাহায্য। তাঁর ইমামত বা নেতৃত্ব ছিল একটি রহমত। কা'বা শরীফে গিয়ে সালাত আদায় করব সে সাধ্য আমাদের ছিল না। কিন্তু যখন হযরত উমর ফারূক (রা) ঈমান আনেন, তখন তিনি মুশরিকদের সাথে এমন বাক-যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেন যে, আমাদের জন্য কা'বা শরীফে সালাত আদায়ের বাধা অপসারিত হয়। হযরত হুযায়ফা (রা) বলেন, যখন থেকে হযরত উমর ফারূক (রা) ঈমান আনেন, তখন থেকে ইসলাম যেন একজন ভাগ্যবান মানুষের রূপ নেয়। প্রতিটি পদে সে উন্নতি লাভ করতে থাকে। আর যখন তিনি শাহাদত বরণ করেন, তখন ইসলামের ভাগ্যাকাশে দুর্যোগ নেমে আসে এবং প্রতি পদেই উন্নতি ব্যাহত হতে থাকে।

হযরত ইব্‌ন সা'দ (রা) বলেন, যখন হযরত উমর (রা) ঈমান আনেন, প্রকৃতপক্ষে তখনই ইসলাম প্রকাশ লাভ করে। তখন হতে আমরা কা'বা শরীফের তাওয়াফ করতে, মুশরিকের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে এবং তাদের প্রত্যুত্তর দিতে শুরু করি। ইব্‌ন আসাকির হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, প্রত্যেক ব্যক্তিই গোপনে হিজরত করেছে, কিন্তু যখন হযরত উমর (রা) হিজরত করতে মনস্থ করেন, তিনি এক হাতে মুক্ত তরবারি নেন এবং অপর হাতে তীর ও পিঠে ধনুক ঝুলিয়ে পবিত্র কা'বা ঘরে আসেন, সাতবার কা'বা শরীফ তাওয়াফ করেন এবং মাকামে ইবরাহীমের কাছে দাঁড়িয়ে দু'রাকাআত সালাত আদায় করেন। তারপর কুরায়শ নেতাদের একটি সমাবেশে যান এবং একের পর এক তাদের সবাইকে সম্বোধন করে বলেন, 'তোমাদের সর্বনাশ হোক, যে কেউ আপন মাকে নিঃসন্তান এবং স্ত্রীকে বিধবা দেখতে চায়, সে আমার মুকাবিলা করুক।' তখন কেউই তাকে বাধা দেওয়ার দুঃসাহস করেনি।

ইমাম নববী (র) বলেন, হযরত উমর (রা) প্রত্যেকটি যুদ্ধে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথী ছিলেন এবং উহুদ যুদ্ধে তিনি স্বীয় স্থানে অটল থাকেন। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, একটি স্ত্রীলোক জান্নাতের একটি প্রাসাদের পাশে বসে ওক করছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ প্রাসাদটি কার ? জানতে পারলাম, এটা উমরের। তারপর তিনি হযরত

উমর (রা)-কে সম্বোধন করে ইরশাদ করেন, তোমার 'গায়রাত' (মর্যাদাবোধ)-এর কথা আমার মনে পড়ল এবং আমি সেখান থেকে ফিরে এলাম। হযরত উমর (রা) কান্নায় ভেংগে পড়েন এবং আরয করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার সাথে আমার কিসের গায়রাত ? একবার হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি দুধ পান করেছি এবং তার সজীবতা আমার নখ পর্যন্ত পৌঁছেছে। তারপর আমি সে দুধ উমরকে দিলাম। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হুযূর! এর তাবীর (ব্যাখ্যা) কি ? তিনি উত্তর দিলেন, দুধ অর্থ জ্ঞান। এক সময় হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমার সামনে কিছু লোক হাযির করা হয়েছে এবং তারা কামীস (জামা) পরে আছে। তাদের কারো কারো কামীস বক্ষদেশ পর্যন্ত, আবার কারো কারো কামীস তার চাইতেও অধিক লম্বা। কিন্তু উমরের কামীস এতই লম্বা যে, তা মাটি হেঁচড়ে যায়। লোকেরা আরয করল, এখানে কামীস দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে ? তিনি উত্তর দিলেন, 'দীন' (ধর্ম)। এক সময় হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত উমর (রা)-কে জানালেন, আল্লাহ্র কসম, তুমি যে রাস্তা দিয়ে যাবে শয়তান কখনো সে রাস্তা মাড়াতে পারবে না, বরং সে অন্য রাস্তা ধরবে। একবার নবী (সা) ইরশাদ করেন, আমার পরে যদি কেউ নবী হতো, তাহলে নিশ্চয় উমরই হতো। একবার নবী (সা) ঘোষণা করেন, উমর ফারূক (রা) জান্নাতবাসীদের মধ্যে উজ্জ্বল প্রদীপ। আরেকবার হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) মন্তব্য করেন, উমর যতক্ষণ তোমাদের মধ্যে থাকবেন ততক্ষণ বাহুল্য ও বাড়াবাড়ির দরজা বন্ধ থাকবে। নবী (সা) ঘোষণা করেন, আসমানের প্রত্যেক ফেরেশতা উমরকে সমীহ করে এবং যমীনের প্রত্যেক শয়তান তাকে ভয় করে। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-এর হাদীসে উল্লিখিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাসিত হলেন, যত নবী আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁদের উম্মতের মধ্যে একজন 'মুহাদ্দাছ' অবশ্যই ছিলেন। যদি আমার মধ্যেও কেউ মুহাদ্দাছ হতে পারেন, তাহলে তিনি উমর (রা)। লোকেরা আরয করল, 'মুহাদ্দাছ' কাকে বলে ? তিনি জবাবে ইরশাদ করেন, যার মুখ দিয়ে ফেরেশতারা কথা বলে।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বলেন, এ পৃথিবীতে আমার কাছে উমর (রা)-এর চাইতে আদরের কোন ব্যক্তি নেই। হযরত আলী (রা) বলেন, মহান আল্লাহ্র পিয়ারা রাসূলের পরে আমরা হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকেই অধিক প্রতিভাবান পেয়েছি।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেন, যদি দুনিয়ার সমগ্র জ্ঞান তুলাদণ্ডের এক পাল্লায় রাখা হয় এবং হযরত উমর (রা)-এর জ্ঞান অপর পাল্লায় রাখা হয় তাহলে হযরত উমর (রা)-এর পাল্লাই ভারী হবে। হযরত হুযায়ফা (রা) বলেন, সমগ্র বিশ্বের জ্ঞান হযরত উমর (রা)-এর কোলে পড়ে আছে। অথচ হযরত উমর (রা) ভিন্ন এরূপ কোন ব্যক্তি নেই, যে অত্যন্ত দুঃসাহসিকতার সাথে মহান আল্লাহ্র পথে বিশ্রী গালিগালাজ শুনেছে। হযরত আলী (রা) হযরত উমর (রা)-কে বস্ত্রে জড়ানো অবস্থায় দেখে বললেন, বস্ত্রে জড়ানো এ ব্যক্তির চেয়ে আমার কাছে প্রিয় আর কেউ নেই। জনৈক ব্যক্তির প্রশ্নের জবাবে হযরত আলী (রা) বলেন, হযরত উমর (রা) সংকল্পের দৃঢ়তা, বিচক্ষণতা ও বীরত্বে ভরপুর। হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেন, হযরত উমর (রা)-এর প্রকৃষ্টতার কথা এ চারটি ঘটনা থেকে জানা যায়। এক বদর যুদ্ধের বন্দীদেরকে তিনি হত্যা করার প্রস্তাব দেন। তারপর এ আয়াত নাযিল হয় :

لَوْ لَا كِتَابٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَا اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ـ

আল্লাহ্‌র পূর্ব-বিধান না থাকলে তোমরা যা গ্রহণ করেছ, সেজন্য তোমাদের উপর মহাশাস্তি আপতিত হতো। (৮ : ৬৮)

দুই. তিনি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহধর্মিণীদের পর্দা করার জন্য বলেন। তারপর পর্দার আয়াত নাযিল হয়। এজন্যই হযরত উমর (রা)-কে তাঁরা বলেছিলেন, ওয়াহী তো আমাদের ঘরে নাযিল হয়, কিন্তু তোমার অন্তরে পূর্বেই তা ঢেলে দেওয়া হয়। তিন. হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এ দু'আ-'হে আমাদের প্রতিপালক। উমরকে মুসলমান করে ইসলামকে সাহায্য কর। চার. সর্বাগ্র হযরত আবূ বকর (রা)-এর হাতে তাঁর বায়'আত করা। হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, আমরা প্রায়ই একথা বলাবলি করতাম যে, হযরত উমর (রা)-এর খিলাফত কালে শয়তান বন্দী ছিল এবং তার ইন্তিকালের পর সে বন্ধনমুক্ত হয়ে গেছে। হযরত আবূ উসামা (রা) বলেন, তোমরা তো জানই হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা) কে? তাঁরা ইসলামের জন্য পিতামাতা তুল্য। হযরত জাফর সাদিক (র)-এর উক্তি, আমি সেই ব্যক্তির প্রতি অসন্তুষ্ট, যে হযরত আবূ বকর ও হযরত উমর (রা)-এর প্রতি অশিষ্ট।

হযরত উমর ফারূক (রা)-এর গঠনাকৃতি

ফারূকে আযম (রা)-এর গায়ের রঙ সাদা-লাল মিশ্রিত; তবে লালের ভাগ বেশী। তিনি দীর্ঘাঙ্গী। পায়ে হেঁটে চলার সময়ে মনে হত যেন তিনি কিছুর উপর আরোহণ করে দ্রুত চলেছেন। তাঁর গণ্ডদ্বয়ে গোশতের পরিমাণ ছিল কম। শ্মশ্রু ঘন এবং গোঁফগুলো বড় বড়। মাথার সম্মুখ দিকের চুল উঠে গিয়েছিল। ইব্‌ন আসাকির বর্ণনা করেছেন, হযরত উমর (রা) দীর্ঘ ও হৃষ্টপুষ্ট দেহের অধিকারী। তাঁর বর্ণে লালিমার ভাগ বেশী। তার গণ্ডদ্বয় চাপা এবং গোঁফগুলো বড় বড় ও লালিমা মিশ্রিত। তার মা ছিলেন আবূ জাহেলের বোন। এ সম্বন্ধের কারণে তিনি আবূ জাহেলকে 'মামা' বলে ডাকতেন।

ফারূকী খিলাফতের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী

হিজরী ১৩ সনের ২৩শে জুমাদা উখরা মঙ্গলবার মুসলমানগণ কোনরূপ মতানৈক্য ছাড়াই ফারূকে আযম (রা)-এর হাতে বায়'আত করেন। তার আগের দিন ২২শে জুমাদাল উখরা সোমবার মুছান্না ইব্‌ন হারিছা মদীনা শরীফে আসেন। হযরত আবূ বকর (রা) তাঁর কাছ থেকে যুদ্ধের অবস্থাদি শোনার পর হযরত উমর (রা)-কে ডেকে পাঠিয়ে যে নির্দেশ দেন তা ছিল নিম্নরূপ :

আমার দৃঢ় আশা যে, আমি আজই মারা যাব। কাজেই, আমার মৃত্যুর পর আগামীকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই লোকদেরকে মুছান্নার সাথে যুদ্ধের জন্য রওনা করে দেবে। কোন প্রকার বিপদই যেন তোমাকে তোমার এ দীনী দায়িত্ব ও আল্লাহ্‌র হুকুম থেকে উদাসীন করে না রাখে। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্তিকালের পর আমি কি কি ব্যবস্থা নিয়েছিলাম, তা তুমি দেখেছ। অথচ, তা ছিল তখন সবচেয়ে বড় বিপদ। যখন সিরীয়দের উপর বিজয় অর্জিত হবে, তখন ইরাকবাসীদেরকে ইরাকের দিকে পাঠিয়ে দেবে। কেননা ইরাকবাসীরা ইরাকেরই কাজসমূহ সুষ্ঠভাবে সম্পাদন করতে পারে। আর ইরাকেই তাদের মন সুপ্রসন্ন থাকে।

তাঁর নির্দেশের এ ভাষা থেকে একথাও খুব ভালভাবে বোধগম্য হয় যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতের পর যা কিছু করেছেন, দীনী কাজ ও দীনী

লক্ষ্যকে অগ্রাধিকার প্রদান করেই করেছেন। মৃত্যুকালেও তাঁর মনে দীনী কাজেরই চিন্তা ছিল। তিনি তাঁর সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদের জন্য কোন ওসীয়ত (উইল) করে যাননি। ফারূকে আযম (রা) খিলাফতের বায়'আত গ্রহণের পর মানুষকে জিহাদের প্রতি বিশেষভাবে সম্বোধন করে মহান আল্লাহ্র পথে জিহাদের আহবান জানান। কিন্তু এতে জনগণের মধ্যে কোন ঔৎসুক্য বা ব্যগ্রতা পরিলক্ষিত হয়নি। হযরত উমর ফারূক (রা) জনগণকে একত্রিত করে তিন দিন পর্যন্ত জিহাদ সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। তবুও জনগণ নির্লিপ্ত থাকে। চতুর্থ দিন হযরত আবূ উবায়দ ইবন মাসউদ সাকাফী (রা) ইরাক-যুদ্ধের জন্য নিজের আগ্রহের কথা ব্যক্ত করেন, তারপর সা'দ উবায়দ আনসারী (রা), সালীত ইব্ন কায়স (রা) এবং আরো অনেক লোক একের পর এক দাঁড়িয়ে যুদ্ধের জন্য নিজেদের আগ্রহের কথা ব্যক্ত করেন। এভাবে ইরাকের জন্য একটি বাহিনী গড়ে উঠে। হযরত উমর ফারূক (রা) হযরত আবূ উবায়দ ইব্ন মাসউদ (রা)-কেই, যিনি সর্বাগ্রে নিজের আগ্রহের কথা ব্যক্ত করেছিলেন, ঐ বাহিনীর নেতা মনোনীত করে মুছান্না ইব্ন হারিছা (রা)-এর সাথে ইরাক অভিমুখে প্রেরণ করেন।

তিনদিন পর্যন্ত জনগণের নির্লিপ্ত থাকার বিষয়টি ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে। তাঁরা এর কারণ বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উমর ফারূক (রা) যেহেতু প্রথম দিনই হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)-এর পদচ্যুতির নির্দেশ লিখে সিরিয়ায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, তাই জনগণ তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছিল। আর এ কারণেই তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা সত্ত্বেও তারা উদ্বুদ্ধ হয়নি। কিন্তু এ ধারণা একেবারেই ভ্রান্ত ও অমূলক। মদীনা শরীফে কেউই হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর নির্দেশের এমন বিরোধিতা করেন নি, যার ফলে বিষয়টি সাধারণ মানুষ জেনে ফেলতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, যদি প্রথম দিনই হযরত ফারূক আযম (রা)-এর প্রতি মানুষ অসন্তুষ্ট হয়ে উঠত, তাহলে তা একটি মা'মুলী ঘটনা হিসাবে বিবেচিত হত না। ঐতিহাসিককে সে সম্পর্কে অবশ্যই কিছু না কিছু লিখতে হত এবং ঐ অসন্তুষ্টি দূর হওয়ার কারণসমূহও তাঁদেরকে বর্ণনা করতে হত। এটি এমন এক ভ্রান্ত ধারণা, যা সাহাবায়ে কিরামের প্রতি মারাত্মক অশিষ্টতা প্রদর্শনেরই শামিল। কেননা তাঁরা এমন ছিলেন না যে, কোন মতপার্থক্যের কারণে জিহাদের প্রতি উৎসাহ প্রদর্শনকে হেয় নযরে দেখবেন। মোদ্দাকথা, জিহাদের জন্য সবাই প্রস্তুত ছিলেন। তবে এর দায়িত্ব ও নেতৃত্ব গ্রহণের ব্যাপারে তারা ইতস্তত করছিলেন এবং একে অপরের অপেক্ষায় ছিলেন। তাঁদের প্রত্যেকেই মনে করতেন, আমার চাইতেও অধিক যোগ্য ও অধিক সম্মানিত লোক রয়েছেন। তারাই খলীফার এ সম্বোধনের জবাব দেবেন। এভাবে প্রত্যেকেই অপরের অপেক্ষায় ছিলেন। কোন কোন সময় বিরাট বিরাট জনসমাবেশে এ ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ে থাকে। আমরা আমাদের যুগের এ ধরনের অনেক ঘটনা প্রত্যক্ষ করে থাকি। এটা মানুষের এক প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য বলেই মনে হয়। এ কারণেই নেক কাজ সম্পাদন ও দান-খয়রাতের ক্ষেত্রে, (লোক দেখানো থেকে বাঁচার জন্য) একদিকে যেমন গোপনীয়তা রক্ষার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি তা প্রকাশ্যে করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে এ থেকে অন্যরা উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা লাভ করে এবং নীরবতার কারণে এ পথে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না হয়। খিলাফতের বায়'আত নেওয়ার পর পরই হযরত ফারূকে আযম (রা) তাঁর প্রথম ভাষণে ও প্রথম বৈঠকে সবাইকে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। কাজেই তিনি যদি তাঁর খিলাফতের প্রথম দিনই হযরত

খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর পদচ্যুতির নির্দেশনামা লিখে থাকেন, তাহলে তিনি তাঁর এ ভাষণে এবং উদ্বুদ্ধকরণের পরই তা লিখেছিলেন। এবার প্রশ্ন উঠতে পারে, তাঁর এ প্রথম আহবানের প্রতি জনগণের পক্ষ থেকে সাড়া পাওয়া যায় নি কেন ? তার জবাব হলো, কোন কোন সময় কোন শিক্ষক স্কুলের পাঠকক্ষে যখন তার ছাত্রদেরকে নির্দেশ দেন, ডাস্টার দিয়ে ব্ল্যাক বোর্ডটি পরিষ্কার করে ফেল কিংবা লেখাগুলো মুছে ফেল'–তখন সাথে সাথে কোন ছাত্র তাঁর সে নির্দেশ পালন করে না। তার কারণ এই নয় যে, ঐ শিক্ষকের নির্দেশ পালন করাকে ছাত্ররা জরুরী মনে করে না বরং যে শিক্ষক নির্দেশ দিয়েছেন, যদি সেই শিক্ষকই কোন একজন বা দু'জন ছাত্রের নাম ধরে সেই একই নির্দেশ দিতেন তখন সাথে সাথেই তার সে নির্দেশ পালিত হত। মোটকথা, জনগণের তিন দিন পর্যন্ত নীরব বা নির্লিপ্ত থাকাটা আর যে কারণেই হোক–নিশ্চয়ই এ কারণে নয় যে, তারা হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) পদচ্যুতি সম্পর্কিত নির্দেশের কারণে হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। কেননা, খোদ মদীনা শরীফেই আনসারগণের মধ্য এমন এক বিরাট দল বিদ্যমান ছিল যারা মালিক ইব্‌ন নুওয়ায়রার ব্যাপারে হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর প্রতি অসন্তুষ্ট থাকলেও আনসারগণ নিশ্চয়ই তার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। তবে কোন্ জিনিসটি তাদেরকেও তখন নীরব বা নির্লিপ্ত রাখলো ?

হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর পদচ্যুতি

হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-কে সিরিয়ায় যুদ্ধরত মুসলিম বাহিনীর প্রধান সেনাপতি করে পাঠিয়েছিলেন। হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) একজন বিরাট যোদ্ধা ও অসম সাহসী বীর সেনাপতি ছিলেন। ইরাকেও তখন পর্যন্ত হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-ই প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তাঁর বিস্ময়কর বীরত্ব ও সামরিক যোগ্যতা ইরানী ও সাসানী সাম্রাজ্যকে বিস্ময়াভিভূত ও ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। রোমান সাম্রাজ্যকেও এভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলার জন্য প্রথম দিকে একটি শক্ত ধাক্কার প্রয়োজন ছিল। কাজেই হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) হযরত খালিদ সায়ফুল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র অসি)-কে প্রধান সেনাপতি করে সিরিয়ার দিকে পাঠান এবং তাঁর সে অনুমান অত্যন্ত সঠিক বলে প্রমাণিত হয়। কেননা, হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) সিরিয়ায় উপনীত হয়ে ইয়ারমুকের যুদ্ধক্ষেত্রে এমন শক্ত ধাক্কা লাগান যে, তাতে রোমান সাম্রাজ্যের মাজা একেবারে ভেঙ্গে পড়ে এবং রোমান সম্রাট কায়সারের পরাক্রম ও প্রতাপের উপর দিয়ে এক প্রলয়ংকরী ঝড় বয়ে যায়। প্রথম দিকের এ সমস্ত যুদ্ধের পর ইরান ও রোমের আবাদকৃত সবুজ শ্যামল প্রদেশসমূহ মুসলিম বাহিনীর দখলে আসার এবং ঐ দুই সাম্রাজ্যের নিয়মিত সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ শুরু হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এমতাবস্থায় ইসলামী সেনাবাহিনীকে শুধু একজন দিগ্বিজয়ী সেনাপতিরই নয়, বরং একজন বিচক্ষণ ও সুকৌশলী অফিসারের কর্তৃত্বাধীনে নিয়োজিত রাখার প্রয়োজন ছিল।

হযরত ফারূকে আযম (রা) হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর সামরিক যোগ্যতার কথা অস্বীকার করতেন না, তবে তাঁকে তিনি কিছুটা অসতর্ক ও হঠকারী মনে করতেন। প্রথম থেকেই তাঁর এ আশংকা ছিল যে, হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর অসাবধানতার কারণে না যেন আবার মুসলিম বাহিনী ধ্বংসের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-ও হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর এ চিন্তাধারার বিরোধী ছিলেন না। তবে, ইরাক ও সিরিয়ার প্রাথমিক যুদ্ধসমূহে হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদের নেতৃত্বের অনুপম গুণাবলীর মুকাবিলায়

খুঁতগুলোর পরিমাণ খুবই কম। আর তাই তিনি বিশ্বের সবচাইতে শক্তিশালী দু'টি সাম্রাজ্য (ইরান ও রোম)-এর সামনে 'সায়ফুল্লাহ'র বীরত্ব ও পরাক্রম প্রদর্শনকে জরুরী বলে মনে করেছিলেন। যেহেতু তাঁর এ লক্ষ্য ইতিমধ্যে অর্জিত হয়ে গিয়েছিল, তাই এখন আর হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর প্রধান সেনাপতি থাকার প্রয়োজন ছিল না। এখানে ঐ কথাগুলো পুনরায় স্মরণ করা যেতে পারে, যা হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) তাঁর জীবনের অন্তিম মুহূর্তে ইরাকের মুসলিম বাহিনী সম্পর্কে হযরত ফারূকে আযম (রা)-কে সম্বোধন করে বলেছিলেন এবং যা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। হযরত ফারূকে আযম (রা) সর্বদা বলতেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আবূ বকর (রা)-এর প্রতি অজস্র ধারায় রহমত নাযিল করুন। কেননা, তিনি হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর নেতৃত্বের দোষত্রুটি গোপন করে গেছেন। তিনি আমাকে হযরত খালিদ (রা)-এর সংগীদের সম্পর্কে তাঁর জীবনের অন্তিম মুহূর্তে নির্দেশ দেন যে, তাদেরকে ইরাকের দিকে পাঠিয়ে দাও। কিন্তু, তিনি তাতে হযরত খালিদ (রা)-এর উল্লেখ করেননি।

এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, হযরত উমর ফারূক (রা) হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর পদচ্যুতির যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ছিল না। আর এটা কিভাবে সম্ভব যে, হযরত ফারূকে আযম (রা) খলীফা হওয়ার সাথে সাথে সর্বপ্রথম সে কাজই করবেন যা হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর ইচ্ছা ও বাসনার সম্পূর্ণ বিপরীত। হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর খিলাফতের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে ঐতিহাসিকগণ সাধারণভাবে একেবারে শুরুতেই একথাও ভুলে যান যে, হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) হযরত ফারূকে আযম (রা)-কে উসামা (রা)-এর বাহিনী থেকে পৃথক করে নিজের কাছে এজন্য রেখে দিয়েছিলেন যাতে খিলাফত সংক্রান্ত কার্যাবলীতে তিনি তাঁর পরামর্শ (থেকে সাহায্য) গ্রহণ করতে পারেন। আর হযরত সিদ্দীকে আকবরের খিলাফতের সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত হযরত ফারূকে আযম (রা)-ই হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর মন্ত্রী ও উপদেষ্টা ছিলেন। হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর সাথে আলোচনা-পর্যালোচনা ও বিচার-বিবেচনা না করে হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) কোন কাজই করতেন না। বিশ্বের অনেক লোকেরই দৃষ্টি স্থূল ও ভাসাভাসা। তারা তাদের বুদ্ধির অপরিপক্কতার কারণে মহান ব্যক্তিদের প্রতি এমন কিছু কথা আরোপ করতে মোটেই সতর্ক নয়। হযরত ফারূকে আযম (রা) হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর কোন কোন অসতর্কতামূলক কাজের প্রতি অবশ্যই অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন, কিন্তু তা ঐ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল যে পর্যন্ত শরীআত এবং তাঁর গবেষণা-পর্যালোচনা ইজতিহাদের সম্পর্ক ছিল। এ অসন্তোষ প্রকাশ বিদ্বেষ ও শত্রুতার পর্যায়ে পৌঁছতে পারে না এবং প্রকৃত পক্ষে পৌঁছেও নি। যে ফারূকে আযম (রা) বদর যুদ্ধের বন্দীদের সম্পর্কে নির্দ্বিধায় এ প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে, তাদের মধ্যে যে যার আত্মীয়কে হত্যা করবে—তার সম্পর্কে এ অভিমত ব্যক্ত করা যে, হযরত খালিদ (রা)-এর প্রতি তাঁর কিছুটা বিদ্বেষ বা ব্যক্তিগত শত্রুতা ছিল—সরাসরি জুলুম এবং নেহায়েত স্থূল ও অমূলক ধারণা বৈ কিছু নয়।

হযরত ফারূকে আযম (রা) হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-কে পদচ্যুত করে মুসলিম উম্মাহকে এক বিরাট কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেন এবং একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন যে, দীনকে দুনিয়ার উপর অগ্রাধিকার প্রদানের এবং দীনী খিদমতের মুকাবিলায় আপন সত্তাকে হেয়

জ্ঞান করার দৃষ্টান্ত খুঁজতে গেলে আমরা সর্বপ্রথম হযরত খালিদ (রা)-এর নামই স্মরণ করি। হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যদি মুসলিম বাহিনীর প্রধান সেনাপতি থাকতেন তবুও তিনি বীরত্ব ও সামরিক যোগ্যতার ক্ষেত্রে এর চাইতে বেশী খ্যাতি অর্জন করতে পারতেন না যা আজ তাঁর রয়েছে। কিন্তু, এ পদচ্যুতির ঘটনা হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর সম্মান ও মাহাত্ম্যের সাথে এমন এক বিরাট মর্যাদা সংযোজন করে দিয়েছে যার সামনে তাঁর সেনাপতিত্ব ও বীরত্বের মর্যাদা ম্লান হয়ে পড়ে। আমরা একদিকে হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর সামরিক কৃতিত্বপূর্ণ কার্যাবলীর উপর গর্ব করি। অন্যদিকে প্রশংসা করি মহান আল্লাহর প্রতি তাঁর একনিষ্ঠতার এবং 'উলুল আমর' বা খলীফার প্রতি কায়মনোবাক্যে তাঁর আনুগত্য প্রদর্শনের।

কোন কোন ঐতিহাসিক এক্ষেত্রে তাদের একটি সূক্ষ্ম অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আর তা হলো, যেহেতু হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) প্রত্যেকটি যুদ্ধেই জয় লাভ করছিলেন, তাই জনসাধারণের মনে এ ধারণার সৃষ্টি হতে পারত যে, হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর সেনাপতিত্বই এসব বিজয়ের কারণ। প্রকৃতপক্ষে, মুসলমানগণের সাফল্য ও বিজয় কোন ব্যক্তি বিশেষের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় বরং এর মূল কারণ মহান আল্লাহর ইচ্ছা এবং ইসলামের বরকত। এ বর্ণনার সত্যতা এভাবেও প্রমাণিত হয় যে, হযরত ফারূকে আযম (রা) যেভাবে সিরীয় বাহিনীর সেনাপতিত্বে পরিবর্তন ঘটান সেভাবে পরিবর্তন ঘটান ইরাকী বাহিনীর সেনাপতিত্বেও। তিনি হযরত মুছান্না ইব্‌ন হারিছাকে পদচ্যুত কর তাকে আবূ উবায়দা ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর অধীনস্থ করে দেন। আজো যদি মুসলমানগণ ইসলামের আনুগত্যের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কিরাম (রা)-কে নমুনা হিসাবে গ্রহণ করে তাহলে তারাও সেই বিজয় ও সাফল্য লাভ করতে পারবে যা প্রথম যুদ্ধের মুসলমানগণ করেছিলেন।

হযরত উমর ফারূক (রা) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর উল্লেখযোগ্য যেসব সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন, তার মধ্যে সর্বপ্রথম কাজ ছিল তিনি হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-কে সিরিয়ার মুসলিম বাহিনীর প্রধান সেনাপতিত্ব থেকে পদচ্যুত করে হযরত আবূ 'উবায়দা ইবনুল জাররাহ্ (রা)-কে সে পদে অধিষ্ঠিত করেন। এ আদেশ সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর হয়। তারপর খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) হযরত আবূ উবায়দা (রা)-এর অধীনে আত্মোৎসর্গ ও কাফির নিধনের ক্ষেত্রে শুধু পূর্বের চাইতে অধিক তৎপরতাই দেখান নি, বরং হযরত আবূ উবায়দা (রা)-কে সর্বদা যুদ্ধ সম্পর্কিত অত্যন্ত উপকারী পরামর্শও দিতে থাকেন। তা হলো, সেই বৈশিষ্ট্য যা হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) মর্যাদা ও সম্মানকে সমগ্র বিশ্ববাসীর সামনে অনেক বড় করে তুলে ধরে এবং বিশ্বের এমন একজন অতুলনীয় সেনাপতি ও বিশুদ্ধচিত্ত খাঁটি মুসলিম হিসাবে প্রতিপন্ন করে, আর একথাও প্রতিপন্ন করে যে, তাঁর অন্তরে ছিল শুধু মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের স্পৃহা! তাতে না ছিল সুখ্যাতি অর্জন বা লোক দেখানোর নাম-নিশানা। হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর দ্বিতীয় কাজ ছিল, তিনি হযরত আবূ উবায়দ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-কে একটি বাহিনীসহ ইরাকের দিকে প্রেরণ করেন এবং তাঁকে ইরাকে অবস্থানকারী সমগ্র মুসলিম বাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করেন। হযরত আবূ উবায়দা ইব্‌ন মাসউদ (রা)-কে যাত্রা করিয়ে দেয়ার পর হযরত ফারূকে আযম (রা) তৃতীয় যে কাজটি করেছিলেন তা হলো, তিনি হযরত ইয়া'লা ইব্‌ন উমাইয়া (রা)-কে ইয়ামানের দিকে রওয়ানা করিয়ে নেন যাতে

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সেই অন্তিম উপদেশ পরিপূর্ণতা লাভ করে যাতে তিনি বলেছিলেন, 'আরব দেশে মুসলমান ব্যতীত কোন ইয়াহূদী বা খ্রিস্টান যেন না থাকতে পারে।' যেহেতু মুসলমানগণ হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর সোয়া দু'বছরের খিলাফত কালে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদনে ব্যাপৃত ছিলেন, তাই হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ঐ অন্তিম উপদেশ বাস্তবায়নের সুযোগ তারা তখন পর্যন্ত পান নি।

নাজরানবাসী খ্রিস্টানদের নির্বাসন

হযরত ফারূকে আযম (রা) হযরত ইয়া'লা ইব্ন উমাইয়া (রা)-কে নির্দেশ দেন, 'তুমি ইয়ামনে গিয়ে নাজরানবাসী খ্রিস্টানদের বলো, তোমরা এ দেশ ছেড়ে দাও। আমরা তোমাদেরকে আরব-সীমান্তের বাইরে সিরিয়ায় তোমাদের এ জমির চাইতে অধিক পরিমাণ উর্বর জমি দেব। আর আমরা তোমাদেরকে কোনরূপ আর্থিক বা দৈহিক কষ্টের মধ্যে ফেলতে চাই না। এখন থেকে আরব দেশে শুধু মুসলমানগণই থাকবে। কাজেই অমুসলিম থাকা অবস্থায় এখানে তোমাদের অবস্থান সম্ভব নয়।

কোন কোন স্থূল বুদ্ধির লোক নাজরানের খ্রিস্টানদের এ নির্বাসনকে অন্যায় বলে ঘোষণা করে নানা ধরনের আপত্তি উত্থাপন করে থাকে। কিন্তু তারা একথা ভুলে যায় যে, মদীনার ইয়াহূদীরা মুসলমানগণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে রোমানদেরকে মুসলমানদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করতে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল। আর এখন নাজরানের খ্রিস্টানরাও মুসলমানগণের মধ্যে অবস্থান করে রোমান সাম্রাজ্যকে যার সাথে নিত্যদিন মুসলমানগণের সংঘর্ষ চলছিল গুপ্তচর বৃত্তিসহ ইসলাম বিরোধী বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্র সফল করার কাজে সহায়তা করছিলেন। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) আরবের খ্রিস্টানদের প্রতিবেশী থেকে এজন্য রক্ষা করতে চাইছিলেন যাতে তাদের ঐ সমস্ত গর্হিত স্বভাব-চরিত্র মুসলমানগণের মধ্যে সংক্রামিত হতে না পারে। তাই তিনি নাজরানের খ্রিস্টানদের সাথে যে অঙ্গীকার পত্র সম্পাদন করেছিলেন তাতে একটি শর্ত ছিল যে, ঈসায়ীরা সুদ খাওয়ার অভ্যাস পরিত্যাগ করবে। আর এ কারণেই তিনি ওসীয়াত করেছিলেন, যেন আরব দেশে ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানরা বসবাস করার সুযোগ না পায়। নাজরানে খ্রিস্টানরা রোমান-সম্রাট হিরাক্লিয়াসের সাথে সহানুভূতিশীল আচরণ করে এবং সুদ খাওয়ার অভ্যাস পরিত্যাগ না করে নিজে থেকেই সেই অবস্থায় পৌঁছে যায় যে, তাদেরকে নির্বাসন দেওয়া জরুরী হয়ে পড়ে। আজকালও আমরা পত্র-পত্রিকায়ই ইয়াহূদীদের দেশ থেকে দেশান্তরে নির্বাচিত হওয়ার খবর পড়ে থাকি। তাতে ইউরোপের সুসভ্য দেশসমূহ থেকে বাধ্যতামূলকভাবে তাদের নির্বাসিত হওয়ার এবং সেখানে আক্ষেপের বিবরণ থাকে। এতে প্রমাণ হয় যে, নাজরানের খ্রিস্টানদের নির্বাসন তাদের বিপদ নয় বরং সুযোগই ছিল।

দামিশ্ক বিজয়

ইয়ারমূক যুদ্ধে রোমান সেনাবাহিনী সম্পূর্ণ পরাজিত হয়ে পলায়ন করে এবং 'ফুহল' নামক স্থানে গিয়ে সমবেত হয়। হিরাক্লিয়াস এমন নির্দেশাদি জারি করেন, যাতে করে ফুহল এবং সেই সাথে দামিশ্ক ও রোমান বাহিনী মুসলমানগণের মুকাবিলা করতে উদ্যত হয়। দামিশ্ক নগরীকে খুব সুদৃঢ় ও দুর্ভেদ্য করে তোলা হয় এবং প্রয়োজনের সময় যাতে দামিশ্কবাসীদেরকে ফিলিস্তীন ও হিমসের দিক থেকে আরো সাহায্য পাঠানো যায় সে ব্যবস্থাও গৃহীত হয়।

দামিশ্‌ক বাহিনীর প্রধান সেনাপতি হিরাক্লিয়াস নাস্‌তাস ইব্‌ন নাসতূরাসকে সেখানে মোতায়েন করেন। মাহান নামীয় বিৎরীক (পাদ্রী) দামিশ্‌কের গভর্নর হিসাবে প্রথম থেকে সেখানে বিদ্যমান ছিলেন। ইসলামী বাহিনী তখন ইয়ারমূকেই অবস্থান করছিল। হযরত আবূ উবায়দা ইব্‌ন জার্‌রাহ্‌ (রা) হযরত ফারূককে আযম (রা)-এর নির্দেশ অনুযায়ী হাশিম ইব্‌ন উতবাকে ইরাকের সেই বাহিনীর আমীর নিযুক্ত করেন যারা হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর সাথে ইরাক থেকে এসেছিল। তারপর তাকে ইরাকের দিকে রওয়ানা করিয়ে দেন। একটি বাহিনী (ব্রিগেড)-কে ফুহ্‌লের দিকে প্রেরণ করা হয়। বাহিনীর বাকী সৈন্যগণকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে বিভিন্ন দিকে প্রেরণ করেন। 'যুলকিলা' (রা)-এর নেতৃত্বে একটি অংশকে এ উদ্দেশ্যে রওয়ানা করা হয়, যাতে তারা দামিশ্‌ক হিম্‌সের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করত হিরাক্লিয়াস প্রেরিত বাহিনীকে বাধা প্রদান করে। আর একটি অংশকে ফিলিস্তীন ও দামিশকের মধ্যে মোতায়েন করা হয়, যাতে তারা রোমান বাহিনীকে ফিলিস্তীনের দিক থেকে দামিশ্‌কের দিকে আসতে না দেয়। বাকী সৈন্য নিয়ে খোদ হযরত আবূ উবায়দা (রা) দামিশ্‌ক অভিমুখে রওয়ানা হন। দামিশ্‌কে পৌঁছার পূর্বে তিনি 'গূতা' জয় করেন। শেষ পর্যন্ত হিজরী ১৩ সনের রজব মাসে মুসলিম বাহিনী দামিশ্‌ক ঘিরে ফেলে। শহরের মধ্যে যথেষ্ট সৈন্য ছিলো, কিন্তু বাইরে বেরিয়ে এসে মুসলমানগণের মুকাবিলা করার মত সাহস রোমানদের ছিল না। তারা শহরের সুদৃঢ় প্রাচীর এবং নিজেদের প্রতিরক্ষা সামগ্রীর আশ্রয়ে থাকাকেই শ্রেয় জ্ঞান করে।

হযরত আবূ উবায়দা (রা) 'বাবুল জাবিয়া'য় তাঁবু ফেলেন। আর হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) ও হযরত আমর ইব্‌ন 'আস (রা) অবতরণ করেন বাবে তূমায়।

হযরত শুরাহ্‌বিল ইব্‌ন হাসানা (রা) ফারাদীসে এবং ইয়াযীদ ইবন আবূ সুফিয়ান বাবে সাগীর ও বাবে কায়সানে অবতরণ করেন। এভাবে ইসলামী বাহিনী দামিশ্‌ককে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে। অভ্যন্তরে আটক শত্রুরা প্রাচীরে আরোহণ করে কখনো 'মিনজানীক' (পাথর নিক্ষেপ যন্ত্র)-এর সাহায্যে মুসলমানগণের প্রতি অনবরত পাথর নিক্ষেপ, আবার কখনো ধনুকের সাহায্যে মুষলধারে তীর বর্ষণ করতে থাকে। মুসলমানগণও যথাযথ উত্তর দিতে থাকে। এভাবে মুসলমানগণের এ অবরোধ হিজরী ১৩ সনের রজব থেকে হিজরী ১৪ সনের মুহাররম পর্যন্ত মোট ছয়মাস থাকে।

সম্রাট হিরাক্লিয়াস দামিশ্‌কবাসীদের সাহায্যার্থে হিম্‌স থেকে যেসব বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন, যুলকিলা' (রা) পথিমধ্যে প্রতিরোধ সৃষ্টি করায় সেগুলো দামিশ্‌কে এসে পৌঁছতে পারে নি। কেননা, তিনি (যুলকিলা') এ কাজের জন্যই দামিশ্‌ক ও হিম্‌সের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান নিয়েছিলেন। যখন এভাবে ছয়মাস অতিক্রান্ত হলো তখন দামিশ্‌কবাসীরা হিরাক্লিয়াসের সাহায্য থেকে নিরাশ হয়ে গেল। সেই সাথে যুদ্ধ করার উৎসাহ-উদ্দীপনাও তারা হারিয়ে বসল। হযরত আবূ উবায়দা ইব্‌ন জার্‌রাহ (রা) এ পরিস্থিতির আলোকে দীর্ঘ ঘেরাও বহাল রাখা অপ্রয়োজনীয় বিবেচনা করে চারিদিকে অবস্থানকারী বাহিনীসমূহের সেনাপতিদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, আগামী কালই শহরের উপর আক্রমণ পরিচালনা করতে হবে।

মুসলমানগণের এ যুদ্ধ প্রস্তুতি ও আক্রমণ পরিচালনা সম্পর্কে অবহিত হয়ে দামিশ্‌কের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের এক প্রতিনিধিদল 'বাবে তূমার' দিক থেকে হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর কাছে এসে আশ্রয় প্রার্থনা করে। হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) তাদেরকে এক

আশ্রয় পত্র (Deed of Trust) লিখে দেন এবং কোনরূপ সংঘর্ষ ছাড়াই শহরে প্রবেশ করেন। তিনি দামিশ্‌কবাসীদেরকে যে আশ্রয় পত্র লিখে দিয়েছিলেন, তার বিষয়বস্তু নিম্নরূপ :

"খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) দামিশ্‌কবাসীদেরকে এ আশ্বাস প্রদান করেছেন যে, যখন ইসলামী বাহিনী দামিশ্‌কে প্রবেশ করবে তখন তাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করা হবে। তাদের জানমাল ও গির্জাসমূহের উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হবে না। দামিশ্‌কের দুর্গ-প্রাচীর কিংবা কোন ঘরবাড়িও ধ্বংস করা হবে না। ইসলামী বাহিনীর কোন ব্যক্তিই শহরবাসীদের কোন ঘরে অবস্থান করবে না। মুসলমান এবং তাদের খলীফা দামিশ্‌কবাসীদের সাথে শুধু সদ্ব্যবহার করবেন, কোনরূপ দুর্ব্যবহার করবেন না যতক্ষণ তারা জিযিয়া (নিরাপত্তা কর) দিবে। হযরত খালিদ (রা) এক দিক থেকে যখন শহরে প্রবেশ করেন ঠিক তখনি অন্য দিক থেকেও ইসলামী বাহিনীর সেনাপতিরা দুর্গ প্রাচীরে সিঁড়ি লাগিয়ে এবং দরজাসমূহ ভেংগে চুরমার করে বীর দাপটে শহরে প্রবেশ করেন। শহরের মধ্যস্থলে হযরত খলিদ (রা) ও আবূ উবায়দা (রা)-এর মধ্যে পরস্পর সাক্ষাৎ ঘটে। তখন হযরত আবূ উবায়দা (রা) বলেন, আমি অস্ত্রবলে শহর জয় করেছি, আর হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) বলেন, আমি আপোস চুক্তির মাধ্যমে শহর অধিকার করেছি। কোন কোন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, বিৎরীক হাসান একদিকে খোদ দামিশ্‌কের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরকে পাঠিয়ে হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর কাছ থেকে একটি চুক্তিপত্র লিখিয়ে নিয়েছিল এবং অপর দিকে সে মুসলমানগণের আক্রমণের তীব্রতা ও তার ফলশ্রুতি প্রত্যক্ষ করতে চাচ্ছিলো। অর্থাৎ মুসলমানগণ যদি তাদের সম্মিলিত আক্রমণে ও অন্তিম প্রচেষ্টায় বিফল হয় এবং তরবারির জোরে দামিশ্‌কে প্রবেশ করতে না পারে তাহলে আগামীতে প্রতিরোধ অব্যাহত রাখা হবে এবং হযরত খালিদ (রা)-এর চুক্তিপত্রের প্রতি কোন সম্মান প্রদর্শন করা হবে না। অপর দিকে মুসলমানগণ যদি তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সফলকাম হয় এবং শক্তিবলে শহরে ঢুকে পড়ে তাহলে হযরত খালিদ (রা)-এর সাথে সম্পাদিত চুক্তির মাধ্যমে তাদের ঐ সমস্ত আচরণ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে, যা অস্ত্রবলে কোন শহর বিজিত হওয়ার পর সমরনীতি অনুযায়ী সে শহরের অধিবাসীদের সাথে করা হয়। কাজেই একদিকে হযরত আবূ উবায়দা (রা) তরবারির বলে শহরে প্রবেশ করেন এবং অপরদিকে খোদ দামিশ্‌কবাসীরা দরজা খুলে দিয়ে হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-কে শহরের ভিতর ডেকে নিয়ে আসে। মোটকথা, এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমধর্মী কিছু একটা ঘটে থাকবে। তবে একথা নিশ্চিত যে, হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) আপোস চুক্তির মাধ্যমে এবং হযরত আবূ উবায়দা ইব্‌ন জার্‌রাহ (রা) তরবারির জোরে দামিশ্‌কে প্রবেশ করেছিলেন।

শহরের মধ্যস্থলে যখন উভয় সেনাপতি পরস্পরের সাথে মিলিত হন, তখন দামিশ্‌ককে অস্ত্রবলে জয় করা হয়েছে, না আপোস চুক্তির মাধ্যমে অধিকার করা হয়েছে, সে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। কেউ কেউ বলেন, যেহেতু হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) ইসলামী বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন না, তাই তাঁর ঐ চুক্তিকে বৈধ মনে করা হবে না।

এ ধরনের চুক্তিপত্র শুধু হযরত আবূ উবায়দা (রা)-ই লিখে দিতে পারেন। কিন্তু হযরত আবূ উবায়দা (রা) বললেন, না, মুসলিম বাহিনীর একজন সাধারণ সৈন্যও কাউকে কোন প্রতিশ্রুতি দিলে সমগ্র বাহিনীকেই সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে হবে। কাজেই হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর সম্পাদিত চুক্তিকে বৈধ মনে করা হবে। শেষ পর্যন্ত এ প্রস্তাব উত্থাপিত

হয় যে, শহরের মধ্যস্থল থেকে 'তূমা' পর্যন্ত অর্ধেক শহর অস্ত্রবলে অধিকৃত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে। কিন্তু সে প্রস্তাব হযরত আবূ উবায়দা (রা)-এর মনঃপূত হয় নি। তাই হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী সমগ্র শহর অধিকৃত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয় এবং হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ (রা) তাঁর চুক্তিপত্রে যে সমস্ত শর্তের উল্লেখ করেছিলেন সেগুলোকে অত্যন্ত কঠোরভাবে পালন করা হয়। আল্লামা ইব্ন খালদূনের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) তরবারি চালিয়ে যখন 'তূমা'র দিককার সিংহদ্বার দিয়ে শহরে প্রবেশ করেন, তখন শহরবাসীরা বাকি সব সদর দরজার সম্মুখবর্তী সরদারদের সাথে আপোস আলোচনা করে অবিলম্বে অপোস চুক্তির মাধ্যমে মুসলমানগণকে শহরের ভিতরে নিয়ে যায়। যা হোক, মুসলমানগণ দামিশ্‌কবাসীদের সাথে আপোসমূলক আচরণ করেন। ফলে তাদেরকে কোনরূপ কষ্ট, যন্ত্রণা বা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় নি। হযরত আবূ উবায়দা ইব্ন জার্‌রাহ (রা) হযরত ইয়াযীদ ইব্ন আবূ সুফিয়ানকে দামিশ্‌কের কর্মকর্তা নিয়োগ করেন এবং রোমান সেনাপতি ও সাধারণ সৈন্যদেরকে দামিশ্‌ক থেকে বের হয়ে যেখানে ইচ্ছা সেখানে চলে যাবার অনুমতি প্রদান করেন।

ফুহলের যুদ্ধ

হযরত আবূ উবায়দা ইব্ন জার্‌রাহ (রা) হযরত ইয়াযীদ ইব্ন আবূ সুফিয়ান (রা)-কে প্রয়োজনীয় সৈন্যসহ দামিকে রেখে ফুহল অভিমুখে রওয়ানা হন, হিরাক্লিয়াসের বিখ্যাত সেনানায়ক সাক্‌লার ইব্ন মিখরাক কয়েক লক্ষ সৈন্যের একটি বাহিনীসহ এখানে অবস্থান করছিলেন। দামিশ্‌ক থেকে রওয়ানা হওয়ার সময় হযরত আবূ উবায়দা (রা) হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)-এর 'মুকাদ্দামাতুল জায়শের' (সম্মুখ বাহিনী) শুরাহবীল হাসানাকে মধ্যভাগের, হযরত আমর ইব্ন 'আস (রা)-কে ডান পাশের বাহিনী, হযরত আয়ায ইব্ন গানামকে পদাতিক বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করেন এবং নিজে বাম পাশের বাহিনীর দায়িত্বে থাকেন। ফুহলের সন্নিকটে পৌঁছার পর ইসলামী বাহিনীসমূহ নিজ নিজ সেনাপতিদের অধীনে সুবিধাজনক স্থানে তাঁবু ফেলেন। মধ্যরাতে রোমানরা মুসলমানদের মধ্যবর্তী বাহিনীর উপর হামলা চালায়। শুরাহ্‌বীল ইব্ন হাসানা তাদের মুকাবিলা করতে থাকেন। রণধ্বনি শুনে সকল মুসলিম সেনাপতিও নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। ফলে অত্যন্ত জোরে-শোরে যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং বেশ কয়েকদিন পর্যন্ত রাত-দিন সে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ অব্যাহত থাকে। শেষ পর্যন্ত আশি হাজার রোমান সৈন্যসহ তাদের প্রধান সেনাপতি সাকলার মুসলমানদের হাতে নিহত হন। অবশিষ্টরা কোন মতে পালিয়ে গিয়ে নিজেদের প্রাণ রক্ষা করে। মুসলমানগণ বিপুল পরিমাণ মালে গনীমতের অধিকারী হয়। ফুহল জয়ের পর মুসলিম বাহিনী বীসান অভিমুখে রওয়ানা হয়।

বীসান বিজয়

মুসলিম বাহিনী বীসানের নিকটবর্তী হয়ে জানতে পারল যে, সেখানেও কাফিরদের সাথে তীব্র মুকাবিলা হবে। ইসলামী বাহিনী অনতিবিলম্বে শহর ও দুর্গ ঘিরে ফেলে। এমতাবস্থায় সংবাদ পাওয়া গেল যে, জনৈক রোমান সেনাপতি দামিশ্‌ককে মুসলমানগণের কবজা থেকে মুক্ত করার জন্য একটি তুখোর বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসছেন। এ সংবাদ শোনামাত্র হযরত আবূ উবায়দা (রা) এক অশ্বারোহী বাহিনী দিয়ে হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)-কে

দামিশ্‌কের দিকে প্রেরণ করেন। রোমান সেনাপতি যখন দামিশ্‌কের নিকটবর্তী হন, তখন সেখানকার কর্মকর্তা হযরত ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান (রা) তাদের মুকাবিলা করার জন্য বহির্গত হন। ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং ঠিক সে মুহূর্তে হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) পিছন দিক থেকে রোমান বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। ফলে রোমান বাহিনীর একটি লোকও পলায়ন করার সুযোগ পায় নি। সবাইকে মুসলমানগণের হাতে অঘোরে প্রাণ দিতে হয়। এ অভিযান সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) হযরত আবূ উবায়দা (রা)-এর কাছে ফিরে যান। বীসানবাসীরা প্রথম প্রথম মুসলমানদের মুকাবিলা করতে এবং তাদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করতে চেষ্টার কোন ত্রুটি করে নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেরাই নিজেদেরকে ইসলামী বাহিনীর মুকাবিলার অযোগ্য বিবেচনা করে সন্ধির আবেদন জানায় এবং ইসলামী বাহিনীর প্রধান সেনাপতি সন্তুষ্টচিত্তে তাদের সে আবেদন মঞ্জুর করেন এবং তাদের উপর জিযিয়া ধার্য করেন। জিযিয়া আদায়ের জন্য সেখানে একজন কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। হযরত আবূ উবায়দা (রা) হযরত আবুল আ'ওয়ার আসলামী (রা)-কে একটি বাহিনী নিয়ে তাবারিয়ার দিকে পাঠিয়েছিলেন। তাবারিয়াবাসীরা বীসানবাসীদের পরিণাম প্রত্যক্ষ করে এক সন্ধিচুক্তির মাধ্যমে আবুল আওয়ারের হাতে তাদের শহরের অধিকার অর্পণ করে।

সায়দা, আরকা, হাবীল ও বৈরূত বিজয়

হযরত ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান (রা) দামিশ্‌কের প্রশাসন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনার পর আপন সহোদর হযরত মুআবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান (রা)-কে প্রেরণ করেন। হযরত মুআবিয়া (রা) আরকা জয় করতে সক্ষম হন। তারপর হযরত ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান (রা) সায়দা, হাবীল ও বৈরূত জয়ের প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং ছোট-খাটো সংঘর্ষের পর ঐ সমস্ত স্থান দখল করেন। এভাবে দামিশ্‌ক এবং সমগ্র জর্ডান এলাকা মুসলমানগণের অধিকারে চলে আসে।

ইরাকের সংঘর্ষসমূহ

ইয়ারমূক বিজয়ের পর মুসলিমগণ উল্লিখিত এলাকাসমূহ নিজেদের অধিকারে নিয়ে আসে। তারপর তারা হিমসের দিকে অগ্রসর হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। কায়সার হিরাক্লিয়াস তখন সেখানেই অবস্থান করছিলেন। সিরীয় ও রোমান বাহিনীর সাথে মুসলিম বাহিনীর যেসব সংঘর্ষ হয়েছিল সেগুলোর বিবরণ পেশ করার পূর্বে আমরা ইরাকের তৎকালীন ঐ সমস্ত অবস্থা ও ঘটনা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা সমীচীন মনে করছি, যা ফারূকী খিলাফতের সূচনা থেকে তখন পর্যন্ত সংঘটিত হয়েছিল। কেননা, যদি আমরা শুধু সিরিয়ার ঘটনাবলীর বিবরণ পেশ করতে থাকি তাহলে সময়কালের দিক দিয়ে ইরাকের অবস্থা ও ঘটনাবলীর বর্ণনা অনেক পিছনে পড়ে যাবে। ফলে এগুলো অধ্যয়ন করার মধ্যে সে স্বাদ পাওয়া যাবে না, যা সিরীয় ও ইরাকী সংঘর্ষসমূহের সমান্তরাল অধ্যয়ন এবং সমসাময়িক স্বচ্ছ ও সঠিক ধারণা থেকে পাওয়া যেতে পারে।

হযরত আবূ উবায়দ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর প্রথম কীর্তি

উপরে উল্লিখিত হয়েছে যে, হযরত ফারূকে আযম (রা) তাঁর খিলাফতের প্রথম সপ্তাহে হযরত মুছান্না ইব্‌ন হারিছা (রা), সা'দ ইব্‌ন উবায়দ (রা), হযরত সালীহ ইব্‌ন কায়স (রা)

এবং হযরত আবূ ইব্ন মাসঊদ (রা)-কে ইরাকের দিকে প্রেরণ করেন। হযরত মুছান্না ইব্ন হারিছা (রা) উল্লিখিত সেনাপতিদের সাথে একই সময়ে মদীনা শরীফ থেকে রওয়ানা হয়েছিলেন বটে, তবে যেহেতু হযরত আবূ উবায়দ ইবন মাসঊদ (রা) (যাকে ইরাকে মোতায়েন সমগ্র মুসলিম বাহিনীর প্রথম সেনাপতি নিয়োগ করা হয়েছিল) পথিমধ্যে বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান করে আরবের বিভিন্ন গোত্র থেকে মুসলিম বাহিনীতে লোক নিয়োগ করে যাচ্ছিলেন, তাই তিনি মুছান্না ইব্ন হারিছা (রা)-এর এক মাস পর ইরাকে গিয়ে পৌঁছেন। হযরত মুছান্না ইব্ন হারিছা (রা) হীরায় উপনীত হয়ে লক্ষ্য করেন যে, ইরানীরা ইরাকের সকল নেতৃস্থানীয় লোককে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে ফেলেছে। তাছাড়া খুরাসানের গভর্নর রুস্তম ইরানের রাজধানী মাদায়েনে এসে মজবুত হয়ে বসেছেন। তিনি সামরিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাদি সুদৃঢ় করা ছাড়াও বিভিন্ন অমুসলিম গোত্রকে মুসলমানগণের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেছেন। সাওয়াদ ও হীরার প্রতিপত্তিশালী লোকগণ যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে বসেছিলেন। হযরত মুছান্না ইব্ন হারিছা ইরাকে উপনীত হতেই রুস্তম এক দুর্ধর্ষ বাহিনী তার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন এবং অপর এক বিরাট বাহিনী নারসী নামক রাজ-পরিবারের একজন অভিজ্ঞ বীর সেনানীর সেনাপতিত্বে কসকরের দিকে পাঠান। তিনি তৃতীয় আর এক বিরাট বাহিনী জাবান নামক একজন দলনেতার অধীনে ফুরাতের নিম্নভূমির দিকে প্রেরণ করেন। তারা নামারিক নামক স্থানে গিয়ে তাঁবু ফেলে। হযরত মুছান্না (রা) হীরা থেকে বের হয়ে 'খাফান' নামক স্থানে অবস্থান নেন। ইতিমধ্যে হযরত আবূ উবায়দ ইব্ন মাসঊদ (রা) সেখানে গিয়ে পৌঁছেন এবং সম্মিলিত বাহিনীর পরিচালনার দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে নেন। তিনি মুছান্না ইব্ন হারিছা (রা)-এর অশ্বারোহী বাহিনীর সেনাপতি নিয়োগ করে খাফানেই মোতায়েন করেন এবং নিজে নামারিক পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে জাবানের উপর আক্রমণ পরিচালনা করেন। ফলে একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। শেষ পর্যন্ত হযরত আবূ উবায়দ (রা) নিজেই 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি তুলে ইরানী বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং সারির পর সারি ছিন্ন ভিন্ন করে সম্মুখ দিকে অগ্রসর হন। ইসলামী বাহিনীও তাদের নেতাকে অনুসরণ করে ইরানী বাহিনীর উপর বীরোচিত হামলা চালায়। ইরানীরা টিকতে না পেরে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে। মাতার ইব্ন ফায়যা রাবীঈ নামক ইস্‌লামী বাহিনীর জনৈক বীর সেনানী 'সেনাপতি জাবান' বন্দী করে ফেলেন। ইনিই যে 'সেনাপতি জাবান' তা তার জানা ছিল না। জাবান তাকে বললেন, তুমি আমাকে বন্দী করে রেখে কি করবে? আমি তোমাকে অত্যন্ত দামী দু'টি ক্রীতদাস দেব, সেগুলোর বিনিময়ে তুমি আমাকে নিরাপত্তা প্রদান কর। মাতার তাকে নিরাপত্তা প্রদান করেন এবং মুক্ত করে দেন। যখন সে ছাড়া পেয়ে চলে যাচ্ছিলো তখন অপর একজন মুজাহিদ তার সঠিক পরিচয় জানতে পারেন এবং তাকে পুনরায় বন্দী করে হযরত আবূ উবায়দ ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর কাছে নিয়ে যান এবং বলেন, সে ইরানী সেনাপতি। সে ধোঁকা দিয়ে আমাদের কাছ থেকে নিরাপত্তা আদায় করে নিয়েছে। হযরত আবূ উবায়দ (রা) মাতার ইব্ন ফায়যাকে ডেকে পাঠিয়ে যখন এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন, তখন তিনি বলেন 'হাঁ, আমি তাকে নিরাপত্তা দান করেছি। হযরত আবূ উবায়দা (রা) তখন বলেন, যখন একজন মুসলমান তাকে নিরাপত্তা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তখন সে প্রতিশ্রুতির বিরুদ্ধাচরণ করা কোন মুসলমানের জন্যই বৈধ হবে না। তিনি জাবানকে নিরাপত্তা সহকারে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বিদায় দেন। জাবান

সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে পলায়নপর বাহিনীসহ কসকর নামক স্থানে গিয়ে সেনাপতি নারসীর সাথে মিলিত হন।

কসকর বিজয়

নারসী ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে পূর্ব থেকেই কসকরে অবস্থান করছিলেন। এবার জাবান এবং তার পরাজিত বাহিনীও তার সাথে গিয়ে মিলিত হয়। ইরানের রাজদরবারে যখন জাবানের পরাজয়ের সংবাদ গিয়ে পৌছল, তখন রুস্তম জালীনূস নামক জনৈক সেনাপতির অধীনে নারসীর সাহায্যার্থে এক বিশাল বাহিনী কসকরের দিকে প্রেরণ করেন। কিন্তু জালীনূস সেখানে পৌছার পূর্বেই হযরত আবূ উবায়দ ইব্ন মাসঊদ সাকাফী (রা) সাকাতিয়া'র ঢালু ভূমিতে নারসীর সাথে সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। নারসীর সাথে রাজপরিবারের আরো দু'জন উপসেনাপতি ছিলেন। এ রাজকুমাররা তাদের বাহিনীর মধ্যবর্তী এবং ডান ও বাম পার্শ্বস্থ সেনাদলের পরিচালনার দায়িত্ব নিজেদের হাতে তুলে নিয়ে মুসলিম বাহিনীর উপর আক্রমণ পরিচালনা করেন। মুসলিম বাহিনীর মধ্যবর্তী সেনাদল পরিচালনার দায়িত্ব হযরত আবূ উবায়দ (রা) স্বহস্তে গ্রহণ করেছিলেন। হযরত সা'দ ইব্ন উবায়দ (রা)-এর উপর ডান পার্শ্ববর্তী সেনাদলের এবং হযরত মুছান্না ইব্ন হারিছা (রা) উপর 'মুকাদ্দামাতুল জায়শ' তথা অগ্রবর্তী বাহিনীর পরিচালনাভার ন্যস্ত করা হয়েছিল। অত্যন্ত জোরেশোরে লড়াই শুরু হয়। হযরত মুছান্না ইব্ন হারিছা (রা) যখন দেখেন যে, লড়াই দীর্ঘায়িত হতে চলেছে তখন তিনি আপন সেনাদলকে পৃথক করে নিয়ে চার ক্রোশ আয়তনের একটি চক্কর কেটে ইরানী বাহিনীর পশ্চাৎদিক দিয়ে তাদের উপর হামলা চালান। সেনাপতি নারসী এ অপ্রত্যাশিত আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য সেদিকে আপন বাহিনীর একটি দলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। হযরত সা'দ ইব্ন উবায়দ (রা) বীরবিক্রমে শত্রু বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং আগে বেড়ে একেবারে নারসীর মাথার উপর পৌছে যান। হযরত আবূ উবায়দ (রা) ও শত্রুবাহিনীর সারির উপর সারি বিদীর্ণ করে ইরানী সেনা সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে মুসলমানগণ 'আল্লাহু আকবর" ধ্বনি তুলে দ্বিগুণ উৎসাহে শত্রুবাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। ফলে ইরানী বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করতে শুরু করে। নারসী হযরত সা'দ ইব্ন উবায়দ (রা)-এর মুকাবিলায় টিকতে না পেরে প্রাণ নিয়ে পলায়ন করেন। তার পলায়নের সাথে সাথে তার সমগ্র বাহিনীও পলায়ন করতে থাকে। হযরত মুছান্না (রা) তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং বাকী সৈন্যরা বন্দীদেরকে সামলে নিয়ে ইরানীদের তাঁবু এবং বাজারসমূহ দখল করে নেয়। তারপর হযরত আবূ উবায়দ (রা), হযরত মুছান্না (রা), হযরত আসিম (রা) এবং হযরত সালীত (রা)-কে এক এক বাহিনীর সৈনাপতি নিযুক্ত করে আশেপাশের ঐ সমস্ত এলাকায় প্রেরণ করেন যেখানে ইরানী সৈন্যরা অবস্থান করছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছিল। এ সেনাপতিগণ প্রত্যেক স্থানে বিজয় লাভ করে সমগ্র সাওয়াদ এলাকা মুসলমানগণের অধীনে নিয়ে আসেন।

বাকশিয়ার যুদ্ধ

জালীনূস কসকর পৌছার পূর্বেই নারসী দারুণ ভাবে পরাজয় বরণ করেন। এ সংবাদ শুনে জালীনূস বাকশিয়ায় থেমে যান। হযরত আবূ উবায়দ (রা) সাকাতিয়া এবং কসকর থেকে রওয়ানা হয়ে বাকশিয়ায় পৌছে জালীনূসের উপর আক্রমণ পরিচালনা করেন। জালীনূস সে আক্রমণ প্রতিহত করতে না পেরে সেখান থেকে দ্রুত পলায়ন করে একেবারে মাদায়েনে চলে যান।

হযরত আবূ উবায়দ মাসউদ সাকাফী (রা)-এর শেষ কীর্তি

জালীনূস পরাজিত ও পর্যুদস্ত হয়ে যখন মাদায়েন গিয়ে পৌঁছেন, তখন সমগ্র রাজধানী ও রাজদরবারে ভয়ানক আতংকের সৃষ্টি হয়। প্রধান মন্ত্রীর রুস্তম দরবারে প্রকাশ্যে ঘোষণা দেন এমন বীর কি কেউ আছে, যে আরবদের অগ্রযাত্রা প্রতিহত করতে পারে এবং এ যাবত ইরানীরা যে সমস্ত পরাজয় বরণ করেছে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারে ? উপস্থিত সবাই একবাক্যে বলল, বাহমান জাদাওয়ায়হ ছাড়া আমরা দ্বিতীয় কোন অভিজ্ঞ ও বীরোত্তম নির্ভরযোগ্য সেনাপতি দেখছি না, এবার রুস্তম তিন হাজার সৈন্য, তিনশ' জঙ্গী হাতি এবং সেই সাথে সর্বপ্রকার সামরিক উপকরণ ও রসদ সামগ্রী দিয়ে বাহমান জাদওয়ায়হকে মুসলিমগণের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন এবং তার সাহায্যের জন্য জালীনূসকে মনোনীত করেন। বাহবান জাদওয়ায়হকে বলেন, যদি এবারও জালীনূস যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে তাহলে তার গর্দান যেন অবশ্যই উড়িয়ে দেওয়া হয়। বাহমান জাদভিয়াকে সেই ঐতিহ্যবাহী রাজকীয় পতাকাও প্রদান করা হল, যে পতাকা সম্পর্কে ইরানীদের এ বিশ্বাস ছিল যে, যে বাহিনীর সাথে এ পতাকা থাকে সে বাহিনী কখনো পরাজিত হয় না। বাহমান জাদওয়ায়হ যাবতীয় যুদ্ধ-সামগ্রী নিয়ে অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে মাদায়েন থেকে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে তিনি যতগুলো শহর, জনবসতি ও গ্রাম-পল্লী অতিক্রম করেন সেখান থেকেই সেনাভর্তি করেন। সাথে সাথে স্থানীয় জনসাধারণকে মুসলমানগণের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি ফুরাত নদীর তীরবর্তী 'কিসসে নাতিফ' নামক স্থানে অবস্থান নেন। অপর দিকে হযরত আবূ উবায়দ ইব্‌ন মাসউদ (রা) এ বিশাল বাহিনীর আগমনের সংবাদ শুনে কসকর থেকে রওয়ানা হন এবং ফুরাত নদীর অপর তীরবর্তী মারূহা নামক স্থানে অবতরণ করেন। যেহেতু ফুরাত নদী মধ্যখানে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তাই উভয় বাহিনীই কিছুদিন পর্যন্ত নীরব নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকে। শেষ পর্যন্ত উভয় বাহিনীর সম্মতিক্রমে ফুরাত নদীর উপর সেতু নির্মাণ করা হয়। সেতু নির্মিত হলে বাহমান জাদওয়ায়হ হযরত আবূ উবায়দ (রা)-এর কাছে এ মর্মে এক পয়গাম পাঠান : তুমি নদী অতিক্রম করে এপারে আসবে, না আমি নদী অতিক্রম করে ওপারে যাবো ? যদিও অন্যান্য সেনাপতিরা এ মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে, ইরানী বাহিনীকেই এপারে আসার আহবান জানানো উচিত, কিন্তু হযরত আবূ উবায়দ (রা) সে অভিমত পসন্দ করলেন না। তিনি বললেন, আমরাই ওপারে গিয়ে ইরানীদের মুকাবিলা করবো। যাহোক তিনি ইসলামী বাহিনীকে ওপারে নিয়ে গেলেন। ওপারে ইরানী বাহিনী ও ফুরাত নদীর মধ্যখানে ছিল একটি ক্ষুদ্র মাঠ, তাই ইসলামী বাহিনীকে সেখানে একেবারে ঠাসাঠাসি অবস্থায় দাঁড়াতে হয়। শেষ পর্যন্ত উভয় বাহিনী সারিবদ্ধ হয়ে পরস্পরকে আক্রমণ করে। বাহমান জাদওয়ায়হ তার হস্তী বাহিনীকে মূল বাহিনীর সম্মুখভাগে রেখেছিলেন এবং তীরন্দাজরা সেগুলোর উপর চড়ে বসেছিলো আর মুসলিম বাহিনীর উপর অনবরত তীর নিক্ষেপ করছিলো। মুসলমানগণের ঘোড়া ইতিপূর্বে কখনো হাতি দেখেনি। তাই মুসলিম অশ্বারোহিগণ যখন আগে বেড়ে ইরানীদের হামলা করল তখন তাদের ঘোড়াগুলো হাতি দেখে শিউরে উঠল এবং বেকাবু হয়ে এদিক-ওদিক ছুটে পালাতে লাগলো। যুদ্ধের এ পরিস্থিতি লক্ষ্য করে হযরত আবূ উবায়দ (রা) হুকুম দিলেন ঘোড়া থেকে নেমে হামলা কর। অত্যন্ত বীরত্ব ও দুঃসাহসিকতার সাথে অনুরূপ হামলা চালানো হল, কিন্তু শত্রুপক্ষের হাতিসমূহ যখন ইসলামী বাহিনীর সারিসমূহ ছিন্ন ভিন্ন করে মুসলিম

যোদ্ধাদেরকে দলিত-মথিত্ করতে শুরু করল, তখন সারিবদ্ধ মুসলিম বাহিনীর মধ্যে ভাংগন ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। হযরত আবূ উবায়দ (রা) উচ্চৈঃস্বরে তাঁর বাহিনীকে উৎসাহ জুগিয়ে চললেন। তিনি নির্দেশ দিলেন, তরবারি চালিয়ে হাতির শুঁড় দ্বিখণ্ডিত করে ফেল। তিনি নিজেও হাতিগুলোকে আক্রমণ করলেন এবং পরপর কয়েকটি হাতির শুঁড় ও সামনের পা কেটে সেগুলোকে ভূলুণ্ঠিত করে তাদের উপরস্থ আরোহীদেরকে হত্যা করলেন।

নিজেদের সেনাপতির এ অতুলনীয় বীরত্ব প্রত্যক্ষ করে মুসলিম সেনাগণও ইরানী হাতিগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। এভাবে রণক্ষেত্র যখন উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল, ঠিক তক্ষুনি একটি ইরানী হাতি মুসলিম সেনাপতি হযরত আবূ উবায়দা (রা)-কে আক্রমণ করে বসে। হযরত উবায়দ (রা) অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে তরবারি চালিয়ে হাতির মাথা থেকে তার শুঁড়টি বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। কিন্তু এ অবস্থায়ও হাতিটি এগিয়ে এসে তাকে মাটিতে ফেলে দেয় এবং তার বুকের উপর পা রেখে তাকে এমনভাবে দলিত-মথিত করে যে, তার অস্থি একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। হযরত আবূ উবায়দ (রা) শহীদ হওয়ার সাথে সাথে তার ভাই হযরত হাকাম (রা) আগে বেড়ে ইসলামী পতাকা নিজ হাতে তুলে নেন। কিন্তু তিনিও হাতির আক্রমণ চালিয়ে হযরত আবূ উবায়দ (রা)-এর ন্যায় শাহাদত বরণ করেন। তারপর বনূ ছাকীফ গোত্রের ছয় ব্যক্তি একের পর এক ইসলামী পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরেন, কিন্তু তাদেরকে একইভাবে শাহাদত বরণ করতে হয়। অষ্টম ব্যক্তি যিনি পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছিলেন, তিনি হলেন হযরত মুছান্না ইব্ন হারিছা (রা)। পতাকা হাতে নিয়েই তিনি দৃঢ়তার সাথে শত্রুবাহিনীকে প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত দুঃসাহসিক পরিচয় দেন। কিন্তু মুসলিম সেনাগণ একের পর এক তাদের সাতজন সেনাপতিকে নিহত হতে দেখে এবং হাতিগুলোর আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে পলায়নপর হয়ে উঠেছিল। তাদেরকে নিরস্ত করার জন্য হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মারসাদ ছাকাফী সেতুর তক্তাগুলো বিচ্ছিন্ন করে এবং রশিসমূহ কেটে দিয়ে উচ্চৈঃস্বরে বলতে থাকেন : হে লোক সকল ! এবার পলায়নের রাস্তাও বন্ধ হয়ে গেল। কাজেই যেভাবে তোমাদের ভাই ও তোমাদের সেনাপতি শাহাদত বরণ করেছেন, তোমরাও সেভাবে শাহাদত বরণ কর। সেতু ভেঙ্গে ফেলার কারণে এ অসুবিধা দেখা দিয়েছিল যে, মানুষ এবার নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে হাবুডুবু খেতে থাকে। এমতাবস্থায়ও হযরত মুছান্না (রা) আবূ মিজহান ছাকাফী (রা) প্রমুখ দলনেতার সহায়তায় অবশিষ্ট সৈন্যদেরকে সামলে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পুনরায় শক্তভাবে দাঁড়িয়ে যান। সেই সাথে সেতুটিও পুনর্নির্মাণের নির্দেশ দেন। উপরন্তু তিনি সমগ্র মুসলিম বাহিনীর মধ্যে প্রচার করে দেন : আমি ইরানী বাহিনীকে রুখে দাঁড়িয়েছি। কাজেই আমাদের ব্যতিব্যস্ত হওয়ার কোন কারণ নেই। হযরত মুছান্না (রা) অত্যন্ত বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে ইরানীদের আক্রমণ প্রতিরোধ করেন। যখন মুসলিমগণ নদী অতিক্রম করে অপর পারে চলে যায়, তখন তিনিও একেবারে সবার শেষে সেতুপথ দিয়ে তাদের সাথে মিলিত হন। ঐ যুদ্ধে মুসলমানগণের সংখ্যা ছিল নয় হাজার। তার মধ্যে চার হাজার এবং কোন কোন বর্ণনা মতে ছয় হাজারই শাহাদত বরণ করেন। হযরত সামীত ইব্ন কায়স, উতবা, আবদুল্লাহ্ ইব্ন কায়স, উবাদা ইব্ন কায়স ইব্ন মাসকান, আবূ উমাইয়া ফাযারী (রা) প্রমুখ সাহাবাও ঐ শহীদগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইরানী বাহিনীরও ছয় হাজার লোক নিহত হয়। কিন্তু ইতিপূর্বেকার সব যুদ্ধের অনুপাতে এ যুদ্ধেই মুসলমানগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলো সবচাইতে বেশী। এ যুদ্ধে এমন পরিস্থিতিরও সৃষ্টি

হয়েছিল যে, ইরানীদের মুকাবিলায় কিছু সংখ্যক মুসলমান যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়েও গিয়েছিল। কিন্তু যারা এ কর্মটি করেছিল তারা আজীবন এতই লজ্জা ও অপমানবোধ করত যে, কাউকে নিজের চেহারাটি পর্যন্ত দেখাতে চাইত না। মুসলমানগণ সংখ্যায় অতি অল্প এবং মানসিক ও দৈহিক দিক দিয়ে বিপর্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও বাহমান জাদওয়ার এমন সাহস হয়নি যে, সেতু অতিক্রম করে এপারে এসে মুসলমানগণকে পুনরায় আক্রমণ করে। কাজেই তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সোজা মাদায়েনে প্রত্যাবর্তন করেন। এ যুদ্ধ হিজরী ১৩ সনের শা'বান মাসে সংঘটিত হয়েছিল।

বুয়াইবের যুদ্ধ

হযরত উমর ফারূক (রা)-এর কাছে যখন হযরত আবূ উবায়দ ইব্ন মাসউদ ছাকাফী (রা)-এর শাহাদত এবং মুসলমানগণের মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সংবাদ পৌঁছলো, তখন তিনি বিশেষ ব্যবস্থাধীনে ইরানীদের মুকাবিলা করার প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন। তিনি বিভিন্ন গোত্রের কাছে দূত পাঠালেন এবং জনসাধারণকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন। ফলে বেশ কয়েকটি গোত্রের লোক তার খিদমতে হাযির হল এবং তিনি হযরত মুছান্না ইব্ন হারিছার (রা) সাহায্যের জন্য মদীনা শরীফ থেকে ইরাক অভিমুখে এক বাহিনী প্রেরণ করলেন। ইতিমধ্যে হযরত মুছান্না (রা)-ও আরব-অন্তর্ভুক্ত ইরাক এলাকা থেকে সেনাদলে লোক ভর্তি করে ইরাকী আরবদের একটি নতুন বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন।

ইরানীদের কাছে যখন মুসলমানগণের এ প্রস্তুতির সংবাদ পৌঁছলো, তখন ইরানের প্রধানমন্ত্রী (সমর মন্ত্রীও বটে) রুস্তম, মাহরান হামাদানীকে সেনাপতি করে বার হাজার বাছাইকৃত সৈন্যের একটি দুর্ধর্ষ বাহিনী মুসলিমগণের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। হামাদানীকে সেনাপতি মনোনয়নের কারণ, তিনি আরবদেশেই প্রতিপালিত হয়েছিলেন। তাই আরব বাহিনীর শক্তির সঠিক মূল্যায়ন তার পক্ষেই সম্ভব ছিল। হযরত মুছান্না (রা) মাহরান হামাদানীর আগমন-সংবাদ শুনে আপন সমগ্র বাহিনীকে ফুরাত নদীর তীরে বুয়াইব নামক স্থানে একত্রিত করেন। মাহরানও বুয়াইব বরাবর ফুরাতের অপর তীরে এসে তাঁবু খাটান। তিনি হযরত মুছান্না ইব্ন হারিছা (রা)-এর কাছে পয়গাম পাঠান, হয় তুমি নিজে ফুরাত অতিক্রম করে এপারে চলে আস, নতুবা আমাকে সুযোগ দাও যাতে আমি নদী অতিক্রম করে ওপারে গিয়ে তোমার মুখোমুখি হতে পারি। হযরত মুছান্না (রা) যেহেতু গত যুদ্ধে ফুরাত নদী অতিক্রম করার তিক্ত অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাই এবার তিনি উত্তরে বলে পাঠালেন, তুমিই ফুরাত অতিক্রম করে এপারে চলে আস। কাজেই মাহরান জঙ্গী হাতিগুলোসহ সমগ্র ইরানী বাহিনী নিয়ে নদী অতিক্রম করে এপারে চলে এলেন। তিনি সর্বাগ্রে পদাতিক বাহিনীকে দাঁড় করালেন, তারপর সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করালেন হাতিগুলোকে। হাতির পিঠে বসেছিলো তীরন্দাজরা। ডানে বামে বাহিনীও ইরানীদের মুকাবিলা করার জন্য সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ইরানীরা প্রথমে হামলা প্রতিহত করে। তারপর শুরু হয় এক ভীষণ যুদ্ধ। শেষ পর্যন্ত ইরানীরা মুসলিমগণের হাতে পরাজয় বরণ করে। যখন ইরানীরা পালাতে শুরু করে, তখন মুসলিম সেনাপতি হযরত মুছান্না (রা) দৌড়ে গিয়ে সেতু ভেঙ্গে ফেলেন, যাতে ইরানীরা সহজে নদী অতিক্রম করে পালিয়ে যেতে না পারে। এর ফলে অনেক ইরানী সৈন্য নিহত হয় এবং অনেকে পানিতে ডুবে মারা যায়। মাহরান হামাদানীও যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। ইব্ন খালদূনের বর্ণনামতে, ঐ যুদ্ধে ইরানী বাহিনীর

যে সমস্ত সৈন্য পলায়ন করেছিল মুসলমানগণ সাবাত' পর্যন্ত তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। এ যুদ্ধের পর সাওয়াদ থেকে দজলা পর্যন্ত সমগ্র এলাকা মুসলমানগণের অধিকারে চলে আসে। এ যুদ্ধ হিজরী ১৩ সনের ১৩ই রমযান সংঘটিত হয়।

বুয়াইবের পরাজয়

মাহ্‌রান হত্যা এবং দুর্ধর্ষ ইরানী বাহিনীর বিপর্যস্ত হওয়ার সংবাদ শুনে শুধু ইরানী রাজদরবার নয় বরং সমগ্র ইরান সাম্রাজ্য প্রকম্পিত হয়ে উঠে। এক লক্ষ ইরানী এবং মাত্র একশ' আরব নিহত হয়েছে এ সংবাদ শুনে ইরানী মাত্রই হতভম্ব হয়ে পড়ে। মোটকথা, আরবদের বীরত্ব ও দুঃসাহসিকতা ইরানীদের অন্তরে দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ঐ সময় সাম্রাজ্যের পরিচালনার ভার রুস্তম ইব্‌ন ফাররূখ যাদের হাতে ন্যস্ত থাকলেও, 'নামকে ওয়াস্তে ইরানের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন সেখানকার রাজ-পরিবারেরই জনৈক মহিলা। এ শোচনীয় পরাজয় ও বিরাট ক্ষয়ক্ষতির সংবাদ শুনে ইরানীরা বলাবলি করতে শুরু করল যে, মহিলার রাজত্বে সেনাবাহিনীর জয়লাভ করা খুবই কঠিন। কাজেই দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও সভাসদবৃন্দ ইয়ায্‌দেজিরদ নামক শাহী বংশের জনৈক যুবককে খুঁজে বের করে উক্ত মহিলার স্থলে তাকেই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। রাজদরবারে রুস্তম ও ফিরূয নামক দু'ব্যক্তির প্রভাব ছিল অত্যন্ত বেশী। তবে তারা ছিল পরস্পর বিরুদ্ধাভাবাপন্ন এবং একে অন্যের কট্টর প্রতিদ্বন্দ্বী। তাদের মধ্যে একটি সমঝোতার ভাব গড়ে তোলা হলো। সিংহাসনে আরোহণকালে ইয়ায্‌দেজিরদের বয়স ছিল একুশ বছর। ইয়ায্‌দেজিরদ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও সভাসদবৃন্দ নিজেদের মধ্যকার শত্রুতা ও বিরোধিতার কথা ভুলে গিয়ে দেশ তথা সাম্রাজ্য রক্ষার প্রতি মনোনিবেশ করেন। ইরানী রাজদরবারের অব্যবস্থা ও বিশৃঙ্খলার কারণে যে সমস্ত প্রাদেশিক শাসনকর্তা ইতিমধ্যে নৈরাজ্যের শিকারে পরিণত হয়েছিলেন তারা আবার আশায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন। মোটকথা, ইরান সাম্রাজ্য আরবদের বিরুদ্ধে বেশ আলোড়ন দেখা দিল। ইতিমধ্যে যে সমস্ত প্রদেশ ও শহর মুসলমানগণের অধিকারে চলে গিয়েছিল সেগুলোতে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠলো। ইরানী সেনানিবাসসমূহ সেনাবাহিনীতে ভরে উঠলো। দুর্গসমূহ সুদৃঢ় করা হলো। ইরানীদের প্রশ্রয় পেয়ে যে সমস্ত এলাকা ইতিমধ্যে মুসলমানগণের দখলে চলে গিয়েছিল সেখানকার অধিবাসীরাও মুসলমানগণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল।

ইরানীদের বিরুদ্ধে স্বয়ং ফারূকে আযম (রা)-এর সরাসরি যুদ্ধে অংশ গ্রহণের সংকল্প

যুলকাদা মাসে হযরত ফারূকে আযম (রা) উপরোক্ত পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হন। তিনি তক্ষুনি হযরত মুছান্না ইবন হারিছা (রা)-এর নামে এ মর্মে এক নির্দেশ পাঠান : রাবীআ ও মুদার গোত্র, যারা ইরাক ও মদীনা শরীফের মধ্যস্থলে বসবাস করে তাদেরকে তোমার কাছে সোজাসুজি ডেকে পাঠাও এবং তাদের মাধ্যমে তোমার বাহিনীকে শক্তিশালী করে তোল। আর যে সমস্ত এলাকায় কিছু গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে সেখান থেকে আরব সীমান্তের দিকে পিছিয়ে এসো। এর সাথে তিনি সকল সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীর নামেও এ মর্মে নির্দেশ পাঠান : 'প্রত্যেক এলাকা থেকে যোদ্ধা লোক বাছাই করে মহান আল্লাহ্‌র পথে জিহাদের জন্য অবিলম্বে পাঠাবার ব্যবস্থা কর। এ সমস্ত নির্দেশ পাঠানোর পর তিনি হজ্জে বায়তুল্লাহ শরীফের উদ্দেশ্যে মদীনা শরীফ থেকে মক্কার দিকে রওয়ানা হন। হজ্জ সমাপনের পর তিনি যখন মদীনা শরীফে

ফিরে আসেন, তখন দেশের চতুর্দিক থেকে দলে দলে লোক মদীনায় আসতে শুরু করে। মদীনা শরীফের মাঠ-প্রান্তর লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠে। হযরত ফারূকে আযম (রা) হযরত তালহাকে অগ্রবর্তী বাহিনীর, হযরত যুবায়র ইব্‌ন আওয়ামকে ডান পাশের বাহিনীর এবং হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা)-কে বাম পাশের বাহিনীর নেতা মনোনীত করেন এবং নিজে প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করে সরাসরি যুদ্ধে অংশ গ্রহণের সংকল্প নেন। তিনি হযরত আলী (রা)-কে ডেকে পাঠিয়ে মদীনায় তার স্থলাভিষিক্ত করেন। তার সেনাবাহিনী নিয়ে মদীনা মুনাওয়ারা থেকে রওয়ানা হয়ে চাশ্‌মে যারায়ে এসে অবস্থান গ্রহণ করেন। সমগ্র বাহিনীর মধ্যে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। কেননা, খোদ খলীফাই যে হচ্ছেন মুসলিম বাহিনীর প্রধান সেনাপতি। কিন্তু উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা) হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর খিদমতে হাযির হয়ে নিবেদন করেন : স্বয়ং আপনার ইরানে গমন আমার কাছে সমীচীন মনে হয় না। তখন ফারূকে আযম (রা) বাহিনীর সকল সেনাপতি এবং সাধারণ যোদ্ধার এবং বিরাট বাহিনীর সভায় সকলের কাছে এ ব্যাপারে পরামর্শ চান। দেখা যায়, সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক খলীফারই অনুরূপ মত পোষণ করে। অর্থাৎ মুজাহিদগণ প্রধান সেনাপতিরূপে খোদ খলীফার ইরান গমনকে সমীচীন মনে করেন। কিন্তু হযরত আবদুর রহ্‌মান ইব্‌ন আউফ (রা) বললেন, আমি এ মতের বিরোধিতা করি। কেননা, খোদ খলীফার মদীনা তায়্যিবাহ ছেড়ে যাওয়াটা নিরাপদ নয়। কারণ যুদ্ধক্ষেত্রে কোন সেনাপতি পরাজিত হলে খলীফা অতি সহজেই তা তদারক করতে পারেন। কিন্তু মহান আল্লাহ্ না করুন, যদি যুদ্ধে খোদ খলীফার একটা কিছু হয়ে যায় তখন মুসলমানগণের শাসনকার্য পরিচালনা কঠিন হয়ে পড়বে। একথা শুনে হযরত ফারূকে আযম (রা) হযরত আলী (রা)-কেও মদীনা তাইয়িবা থেকে ডেকে পাঠান এবং নেতৃস্থানীয় সকল সাহাবায়ে কিরামের সাথেও এ সম্পর্কে সলা-পরামর্শ করেন। হযরত আলী (রা) এবং সকল গণ্যমান্য সাহাবায়ে কিরাম হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা)-এর অভিমতকেই গ্রহণ করেন। তখন ফারূকে আযম (রা) পুনরায় সেনাবাহিনীকে সম্বোধন করে বলেন, "আমি তোমাদের সাথে ইরাকে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু গণ্যমান্য সাহাবায়ে কিরাম মাত্রই আমার এ উদ্যোগকে অপসন্দ করেন। কাজেই আমি অনন্যোপায়। এবার অন্য কোন ব্যক্তি সেনাপতি হয়ে তোমাদের সাথে যাবেন।" এবার সাহাবায়ে কিরামের বৈঠকে এ বিষয়টি উত্থাপন করা হয় যে, এখন কাকে সেনাপতি করে ইরাকে পাঠানো হবে। হযরত আলী (রা) সে দায়িত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। হযরত আবূ উবায়দা এবং হযরত খালিদ (রা) তখন সিরিয়ায় যুদ্ধরত ছিলেন।

এ আলাপ-আলোচনা চলাকালে হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা) বলেন, "আমি আপনাদের কাছে এমন এক ব্যক্তির নাম বলছি, যার চাইতে শ্রেষ্ঠ কোন ব্যক্তির কথা কেউ বলতে পারবে বলে আমি মনে করি না।" তিনি হযরত সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-এর নাম উল্লেখ করেন। উপস্থিত সকলেই তাঁর প্রস্তাব সমর্থন করেন। হযরত উমর (রা)-ও এ কথায় সায় দেন। সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) ছিলেন হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মামা এবং অতি উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন একজন সাহাবী। ঐ সময়ে হযরত সা'দ হাওয়াযিন গোত্রে সাদকা আদায়ের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তক্ষুণি তাঁর কাছে পত্র লিখে অবিলম্বে তাঁকে মদীনায় আসার নির্দেশ দেওয়া হয়। তিনি কয়েক দিন পর মদীনা শরীফে এসে হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর

খিদমতে হাযির হন। সেনাবাহিনী তখন যারার নামক স্থানে অবস্থান করছিল। হযরত ফারুকে আযম (রা) হযরত সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-কে সেনাপতি মনোনীত করেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে তাঁকে ইরাকে প্রেরণ করেন। রওয়ানা হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে তাঁকে বার বার স্মরণ করিয়ে দেন যেন তিনি সেখানে পৌঁছে সেখানকার যাবতীয় ঘটনা সম্পর্কে তাঁকে (ফারুকে আযমকে) অবহিত রাখেন। সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) চার হাজার সৈন্য নিয়ে রওয়ানা হন। তিনি আঠারো মনযিল পথ অতিক্রম করে ছা'লাবাহ নামক স্থানে অবতরণ করেন। হযরত সা'দ (রা) রওয়ানা হওয়ার পর পরই হযরত ফারুকে আযম (রা) দু'হাজার ইয়ামানী ও দু'হাজার নজদী মুজাহিদের এক বাহিনী তাঁর সাহায্যে প্রেরণ করেন। তারা অবিলম্বে তাঁর সাথে গিয়ে মিলিত হন। মুছান্না ইব্ন হারিছা (রা) আট হাজার সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে 'যীকার' নামক স্থানে হযরত সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-এর আগমন প্রতীক্ষায় ছিলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল, সম্মিলিত বাহিনী নিয়ে ফুরাতের দিকে অগ্রসর হওয়া। হযরত মুছান্না ইবন হারিছা (রা) জাস্‌রের ঘটনায় (পুলের যুদ্ধে) আহত হয়েছিলেন। তাঁর ক্ষতস্থানগুলোর অবস্থা দিনের পর দিন শোচনীয় আকার ধারণ করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত হযরত সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) যখন ছা'লাবাহ্ নামক স্থানে পৌঁছেন তখন এ দুঃসংবাদ আসে যে, হযরত মুছান্না ইব্ন হারিছা (রা) আর ইহজগতে নেই।

হযরত সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-এর ইরাকে উপস্থিতি

হযরত মুছান্না ইব্ন হারিছা (রা) তাঁর জীবনের অন্তিম মুহূর্তে হযরত বশীর ইব্ন হুসামাকে (রা) আপন বাহিনীর নেতা মনোনীত করেছিলেন। তখন তাঁর বাহিনীতে আট হাজার সৈন্য ছিল। হযরত ফারুকে আযম (রা) হযরত সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-কে কোন্ রাস্তা দিয়ে যেতে হবে এবং কোন্ কোন্ মনযিলে অবতরণ করতে হবে তা সুনির্দিষ্ট করে বলে দিয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি প্রতিদিনই তাঁর কাছে প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাঠাতে থাকেন এবং সেই সাথে মুসলিম বাহিনীর দৈনন্দিন অবস্থাদি সম্পর্কেও অবহিত হতে থাকেন। হযরত সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) যখন ছা'লাবা থেকে সীরাফের দিকে অগ্রসর হন, তখন পথিমধ্যে বনী আসাদ গোত্রের তিন হাজার মুজাহিদ তাঁর বাহিনীতে এসে মিলিত হন। তারা হযরত ফারুকে আযম (রা)-এর নির্দেশ অনুযায়ী সেখানে হযরত সা'দ (রা)-এর অপেক্ষা করছিলেন। হযরত সা'দ (রা) যখন সীরাফে গিয়ে পৌঁছেন, তখন হযরত ফারুকে আযম (রা)-এর নির্দেশ অনুযায়ী আশআস ইব্ন কায়েস (রা) তাঁর গোত্রের দু'হাজার মুজাহিদসহ মুসলিম বাহিনীতে যোগদান করেন। হযরত মুছান্না (রা)-এর ভাই মুআন্না ইব্ন হারিছা শায়বানী (রা) এখানে এসে হযরত সা'দ (রা)-এর বাহিনীর সাথে মিলিত হন। হযরত সা'দ (রা) এবার গণনা করে দেখেন যে, সম্মিলিত মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা বিশ ও ত্রিশ হাজারের মধ্যে। এর মধ্যে তিনশ' সাহাবায়ে কিরাম এমনও রয়েছেন, যাঁরা বায়'আত রিদওয়ানে উপস্থিত ছিলেন। এমন কি সত্তর জন সাহাবায়ে কিরাম এমনও রয়েছেন যাঁরা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। হযরত সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) সীরাফেই অবস্থান করছিলেন। এমন সময় তাঁর নামে হযরত ফারুকে আযম (রা)-এর নির্দেশ আসে : 'কাদিসিয়ার দিকে অগ্রসর হও এবং সেখানে পৌঁছে এমন জায়গায় ব্যূহ রচনা কর যে, ইরানের সমভূমি তোমাদের সম্মুখে এবং আরবের পাহাড় তোমাদের পিছনে থাকে। যদি আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে জয়ী করেন তাহলে যতটুকু ইচ্ছা

এগিয়ে যাও। মহান আল্লাহ্ না করুন, যদি পরিস্থিতি এর বিপরীত হয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে পিছনে পাহাড়ে আশ্রয় নিবে। তারপর খুব কৌশলের সাথে শত্রুদের উপর পাল্টা আক্রমণ চালাও।'

নির্দেশ অনুযায়ী সা'দ (রা) সীরাফের দিকে রওয়ানা হন। তিনি হযরত যুবায়র ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন কাতাদা (রা)-কে অগ্রবর্তী বাহিনীর, হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মু'তাসিম (রা)-কে ডান পাশের বাহিনীর, হযরত শুরাহবীল ইব্ন সামাত কিনদী (রা)-কে বাম পাশের বাহিনীর, হযরত আসিম ইব্ন আমর তামীমী (রা)-কে পশ্চাৎবর্তী বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করেন। হযরত সালমান ফারসী (রা) বাহিনীর রসদ সামগ্রীর প্রধান কর্মকতা, হযরত আবদুর রহমান ইব্ন রাবীআ (রা) বিচারক ও কোষাধ্যক্ষ, হযরত হিলাল হাজরী (রা) অনুবাদক এবং হযরত যিয়াদ ইব্ন আবূ সুফিয়ান (রা) কাতিব বা সচিব ছিলেন। মুসলিম বাহিনী সীরাফ থেকে কাদিসিয়া অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যায়। পথিমধ্যে 'গাদীর' নামক একটি স্থানে ইরানীদের অস্ত্রাগার ছিল। হযরত সাদ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস সেটা দখল করে কাদিসিয়ায় গিয়ে উপনীত হন। কাদিসিয়া পৌঁছার পর তিনি আনুমানিক দু'মাস পর্যন্ত পারস্য বাহিনীর অপেক্ষায় বসে থাকেন। এ সময়ে ইসলামী বাহিনীর যখন কোন রসদ সামগ্রীর প্রয়োজন হত, তখন রাতের বেলায় কয়েকটি ক্ষুদ্র বাহিনী ইরানের বিভিন্ন এলাকা থেকে তা সংগ্রহ করে নিয়ে আসত।

ইসলামী প্রতিনিধি দল

এ সময় হযরত নু'মান ইব্ন মুকাররিন (রা), হযরত কায়স ইব্ন যারারাহ্ (রা), হযরত আশআস ইব্ন কায়স, ফুরাত ইব্ন হিব্বান (রা), আসিম ইব্ন উমর (রা), আমর ইব্ন মা'দীকারিব (রা), হযরত মুগীরা ইব্ন শু'বাহ, মুআন্না ইব্ন হারিছা (রা), উতারিদ ইব্ন হাজিব (রা), হযরত বশীর ইব্ন রুহাম (রা), হান্যালাহ ইব্ন রাবী (রা) এবং হযরত আদী ইব্ন সুহায়ল (রা)-এর সমন্বয়ে গঠিত একটি মুসলিম প্রতিনিধি দলকে কাদিসিয়া থেকে মাদায়েনের দিকে প্রেরণ করা হয়। তাঁরা অশ্বারোহণে পথিমধ্যে অবস্থানকারী রুস্তম-বাহিনীকে অতিক্রম করে সোজা মাদায়েনে গিয়ে পৌঁছেন, ইয়ায্দেজিরদ এ প্রতিনিধি দলের আগমনবার্তা পেয়ে স্বীয় দরবারকে সুসজ্জিত করেন। ইসলামী প্রতিনিধিদল অতি সাদাসিধে কাপড় পরে সিপাহীবেশে রাজদরবারে প্রবেশ করে। তা প্রত্যক্ষ করে রুস্তমের সভাসদ ও অমাত্যবর্গ যারপরনাই বিস্মিত হয়। প্রথমে ইয়ায্দেজিরদ তাদেরকে সাধারণ কয়েকটি প্রশ্ন করেন। মুসলিম প্রতিনিধিদল তার সন্তোষজনক উত্তর দেন। এবার ইয়ায্দেজিরদ প্রশ্ন করেন, আমাদের মুকাবিলা করার দুঃসাহস তোমরা পেলে কোথেকে ? আর তোমরা কী করেই বা এ কথা ভুলে গেলে যে, তোমাদের জাতিকে বিশ্বের এক লাঞ্ছিত ও পশ্চাৎপদ জাতি হিসাবে গণ্য করা হয় ? তোমরা কী করে একথা ভুলে গেলে যে, যখনই তোমাদের মধ্যে কোন অবাধ্যতা বা বিদ্রোহ লক্ষ্য করা যেত তখন আমরা আমাদের সীমান্তবর্তী কর্মচারী ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের নির্দেশ দিতাম যেন তারা তোমাদেরকে শায়েস্তা করে দেয় এবং তারা ঠিক ঠিকই তাই করত ? ইয়ায্দেজিরদের একথার উত্তরে হযরত নু'মান ইব্ন মুকারিরন (রা) বললেন, আমরা দুনিয়া থেকে পৌত্তলিকতা অংশীবাদিতা (শিরক) নির্মূল করার চেষ্টা করছি এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর সামনে ইসলাম পেশ করছি যাতে তারা এর মাধ্যমে ইহ্-পরকালে সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পারে। যদি কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ না করে তাহলে তার উচিত নিজেকে মুসলমানগণের হিফাযত ও নিরাপত্তায়

সমর্পণ করা এবং তার বদলে মুসলমানগণকে জিযিয়া প্রদান করা। যদি সে ইসলাম গ্রহণ ও জিযিয়া প্রদান উভয়টি অস্বীকার করে, তাহলে একমাত্র তরবারিই তার ও আমাদের মধ্যকার ব্যাপারটি মীমাংসা করবে।

হযরত কায়স ইব্‌ন যারারাহ (রা)-এর ভাষণ

ইয়াযদেজিরদ হযরত নু'মান (রা)-এর কথা শুনে খুবই ক্রুদ্ধ হন। কিন্তু নিজেকে কোনমতে সামলে নিয়ে বলেন : তোমরা তো অসভ্য জংলী লোক। তোমাদের জনসংখ্যাও অনেক কম। তোমরা আমাদের ভূখণ্ডের প্রতি লিপ্সা করো না। হাঁ, আমরা তোমাদের প্রতি এতটুকু সদয় ব্যবহার করতে পারি যে, আমরা তোমাদের আহারের জন্য খাদ্য এবং পরণের জন্য বস্ত্র প্রদান করবো এবং তোমাদের উপর এমন একজন শাসক নিয়োগ কর যিনি তোমাদের সাথে শালীন ব্যবহার করবেন। একথা শুনে হযরত কায়স ইব্‌ন যারারাহ সম্মুখে অগ্রসর হয়ে বললেন, এখানে যারা তোমাদের সামনে বিদ্যমান তারা আরবের নেতৃস্থানীয় ও অভিজাত শ্রেণীর লোক। আর আরবের অভিজাতেরা এ ধরনের বাজে কথার উত্তর দিতেও লজ্জাবোধ করে। যাহোক, আমি তোমার কথার জবাব দিব এবং তাঁরা সবাই আমার কথা সমর্থন করবেন। শোন, তুমি আরব ও আরববাসীদের যে অবস্থা বর্ণনা করেছ, আমরা তার চাইতেও খারাপ অবস্থার মধ্যে ছিলাম। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অপার করুণাগুণে আমাদের পথ প্রদর্শনের জন্য একজন নবী পাঠিয়েছেন। এ নবী আমাদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করেছেন, ন্যায় ও সত্যের শত্রুদেরকে পরাজিত ও লাঞ্ছিত করেছেন এবং এ মর্মে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন যে, অদূর ভবিষ্যতে দুনিয়ায় হবে আমাদেরই জয়জয়কার। কাজেই তোমাদের জন্য এই সমীচীন যে, তোমরা হয় জিযিয়া প্রদান কর, নয়ত ইসলাম গ্রহণ কর। যদি এর কোনটিই না কর, তাহলে আমাদের ও তোমাদের মধ্যকার ব্যাপারটির ফায়সালা একমাত্র তরবারিই করবে।

ইয়াযদেজিরদ একথা শুনে একেবারে বেসামাল হয়ে পড়লেন এবং চীৎকার দিয়ে বলে উঠলেন, যদি প্রতিনিধিদের হত্যা করা বৈধ হত, তাহলে আমি তোমাদেরকে অবশ্যই হত্যা করতাম। তারপর তিনি তার ভৃত্যদেরকে নির্দেশ দিলেন : এক ঝুড়ি মাটি নিয়ে এস এবং যে লোকটি এদের নেতা তার মাথায় তুলে দিয়ে এদের সবাইকে মাদায়েন থেকে বের করে দাও। তারপর তিনি মুসলিম প্রতিনিধিদলকে সম্বোধন করে বললেন : রুস্তম শীঘ্রই তোমাদেরকে কাদিসিয়ার গর্তে দাফন করবে।' ইতিমধ্যে মাটি ভর্তি ঝুড়ি এসে গেল। হযরত আসিম (রা) তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে ঝুঁড়িটি কাঁধে তুলে নিয়ে বললেন, আমিই এ প্রতিনিধি দলের নেতা। যাহোক মুসলিম প্রতিনিধি দল ইয়াযদেজিরদের দরবার থেকে বের হয়ে নিজ নিজ ঘোড়ায় আরোহণ করে মাটি ভর্তি ঐ ঝুড়িটি সঙ্গে নিয়ে হযরত সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-এর কাছে হাযির হন এবং শ্লোগান তুলে : 'ইরান সাম্রাজ্যের বিজয় শুভ হোক। আল্লাহ্ তা'আলা প্রথম পদক্ষেপেই আমাদেরকে ঐ দেশের মাটি দান করেছেন।" ইয়াযদেজিরদ প্রদত্ত মাটি দ্বারা প্রতিনিধি দলটি মুসলমানদের ভবিষ্যৎ সৌভাগ্য সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করে তাতে সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-ও অত্যন্ত আনন্দিত ও আশান্বিত হন।

এ প্রতিনিধি দলটি ফিরে আসার পর ইরানের শাহী দরবার থেকে সাবাতে অবস্থানকারী রুস্তমের কাছে একটি জরুরী নির্দেশ এল এবং সেই সাথে এক সহায়ক বাহিনীও এসে পৌঁছল। ষাট হাজার সৈন্যের সিংহভাগ রুস্তমের অধীনে ছিল। অগ্রবর্তী বাহিনীর সেনাপতি

ছিলেন জালীনূস। তার বাহিনীতেও চল্লিশ হাজার সৈন্য ছিল। পশ্চাদবর্তী বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল বিশ হাজার। ত্রিশ হাজার সৈন্য সম্বলিত ডান পাশের বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন হরমুযান এবং অপর ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে গঠিত বাম পাশের বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন মাহরান ইব্ন বাহ্রাম। এভাবে ইরানী সৈন্য সংখ্যা এক লক্ষ আশি হাজারে গিয়ে পৌছেছিল। এছাড়াও রুস্তমের সাথে মধ্যবর্তী বাহিনীতে ত্রিশটি যুদ্ধহস্তী ছিল। কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলা ও আসবাব সামগ্রীর সাথে রুস্তম সাবাত থেকে যাত্রা করে 'কুছ' নামক স্থানে গিয়ে পৌছেন এবং সেখানেই তাঁবু খাটান। কাদিসিয়া এবং মাদায়েনের মধ্যে দূরত্ব ছিল ত্রিশ থেকে চল্লিশ ক্রোশ। কাজেই ইরানী ও ইসলামী বাহিনীর দূরত্ব অনেকটা হ্রাস পেল। এবার রসদ সামগ্রী লুট করার জন্য প্রত্যেক দিনই উভয় পক্ষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাহিনীসমূহ একে অন্যের উপর আকস্মিক হামলা চালাতে থাকে। রুস্তম যুদ্ধ এড়িয়ে যেতে চাচ্ছিলেন। তাই, তিনি মাদায়েন থেকে কাদিসিয়া পর্যন্ত পৌছতে ছয় মাস সময় লাগিয়ে দেন। কুছা নামক স্থান থেকে যাত্রা করে রুস্তম কাদিসিয়ার সম্মুখবর্তী 'আতীক' নামক স্থানে তাঁবু ফেলেন। ইরানে শাহী দরবার থেকে বারবার রুস্তমের কাছে এ মর্মে তাকীদ আসছিলো : শীঘ্রই আরবদের মুকাবিলা ছাড়াই কাজ সেরে নিতে। কাদিসিয়ায় পৌছে তিনি হযরত সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-এর কাছে এ মর্মে পয়গাম পাঠান যে, সন্ধিচুক্তির ব্যাপারে আলাপ-আলোচনার জন্য যেন তার কাছে একটি প্রতিনিধি দল পাঠানো হয়।

হযরত সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) হযরত রিবঈ ইব্ন আমের (রা)-কে দূত হিসাবে রুস্তমের কাছে প্রেরণ করেন। ঐ দিন রুস্তম অত্যন্ত শান-শওকত ও জাঁকজমকের সাথে তার দরবার সজ্জিত করেন। সোনার সিংহাসন স্থাপন করা হয় এবং তার চারপাশে রেশমী ও রোমান কার্পেট বিছানো হয়। তাকিয়া ও সামিয়ানাসমূহের ঝালর ছিল মণি-মাণিক্যের। যাহোক হযরত রিবঈ ইব্ন আমের (রা) এ জাঁকজমকপূর্ণ দরবারে প্রবেশ করেন। কার্পেটের শেষ প্রান্তে যে বিরাট তাকিয়াটি পড়েছিল তিনি তার সাথেই আপন ঘোড়াটি বাঁধেন এবং তীরের ফলা ঠুকতে ঠুকতে এবং রুস্তমের বিছানো মহামূল্যবান কার্পেটের উপর ছিদ্র ও ক্ষতের সৃষ্টি করতে করতে সিংহাসনের দিকে অগ্রসর হন এবং একেবারে রুস্তমের পাশে গিয়ে বসেন। লোকেরা হযরত বিবঈ (রা)-কে সিংহাসন থেকে নামাতে এবং তার কাছ থেকে হাতিয়ারসমূহ কেড়ে নিতে চাইলো। তখন রিবঈ (রা) তাদেরকে বললেন, আমি নিজের কোন দাবী নিয়ে এখানে আসিনি, তোমরাই আমাকে ডেকে পাঠিয়েছ। আমাদের ধর্মে এটা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ যে, এক ব্যক্তি খোদা হয়ে বসবে এবং বাকি সবাই ক্রীতদাসের মত হাত জোড় করে তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে। রুস্তম নিজেই তার লোকদেরকে সতর্ক করে দিলেন যেন কেউ একে বিরক্ত না করে। কিন্তু হঠাৎ কি যেন চিন্তা করে রিবঈ (রা) নিজেই রুস্তমের নিকট থেকে উঠে যান এবং সিংহাসন থেকে নেমে আপন ছোরা দ্বারা বিছানো কার্পেটটি কেটে খালি ভূমির কিছু অংশ বের করে তাতে উপবেশন করেন। তারপর রুস্তমকে সম্বোধন করে বলেন, তোমার ঐ জাঁকজমকপূর্ণ শয্যার কোন প্রয়োজন আমার নেই। মহান আল্লাহ্র বিছানো মৃত্তিকা শয্যাই আমার জন্য যথেষ্ট। তারপর দোভাষীর সাহায্যে রুস্তম হযরত রিবঈ (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের এ যুদ্ধ-বিগ্রহের লক্ষ্য কি? হযরত রিবঈ (রা) উত্তরে বলেন :

আমরা মহান আল্লাহ্র বান্দাদেরকে দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে পরকালের বিশালতার দিকে নিয়ে যেতে চাই এবং বাতিল ধর্মসমূহের পরিবর্তে ন্যায়, সত্য তথা ইসলামের প্রচার ও

প্রসার কামনা করি। যে ব্যক্তি ন্যায়, সত্য ও ইসলামের উপর কায়েম থাকবে আমরা তার দিকে, তার দেশের দিকে এবং বিষয় সম্পত্তির দিকে ফিরেও তাকাবো না। যে আমাদের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে, আমরা তার সাথে যুদ্ধ করব, যতক্ষণ না শাহাদত বরণ করে জান্নাতে গিয়ে উপনীত হই, কিংবা জয়লাভ করি। যদি তোমরা জিযিয়া প্রদান করতে সম্মত হও, তাহলে আমরা তা গ্রহণ করব এবং তোমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসব এবং তোমাদের জান ও মালের হিফাযত করব।

এ সমস্ত কথা শুনে রুস্তম প্রশ্ন করলেন, তুমি কি মুসলমানদের নেতা? হযরত রিবঈ (রা) জবাব দিলেন, না, আমি নেতা নই, বরং আমি একজন সাধারণ সৈনিক। কিন্তু আমাদের একজন সাধারণ লোকও নেতৃস্থানীয় লোকের পক্ষ থেকে কোন কিছুর অনুমোদন দিতে পারে এবং প্রত্যেকটি ব্যক্তিই প্রতিটি ব্যাপারেই স্বাধিকার রাখে। একথা শুনে রুস্তম ও সভাসদরা একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তারপর রুস্তুম বললেন, তোমার তরবারির খাপ একেবারে জীর্ণ, মলিন। হযরত রিবঈ সঙ্গে সঙ্গে খাপ থেকে তরবারি বের করে বললেন, এটাকে এই মাত্র তেজ করা হয়েছে। তারপর রুস্তম বললেন, তোমার বর্শার ফলা খুবই ছোট ; যুদ্ধে কি কাজে আসবে? হযরত রিবঈ (রা) জবাব দিলেন, এ ফলা শত্রুদের বক্ষ ভেদ করে একবারে এপার-ওপার হয়ে যেতে পারে। তুমি দেখনি যে, আগুনের একটি ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গও সমগ্র শহর পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে পারে? এ ধরনের খোঁচা-খুঁচি কথাবার্তার পর রুস্তম বললেন, আচ্ছা, আমরা তোমার কথাগুলো ভেবে দেখব এবং আমাদের উপদেষ্টাদের সাথে এ ব্যাপারে সলা-পরামর্শ করব। তারপর রিবঈ (রা) সেখান থেকে উঠে অশ্বারোহী সোজা হযরত সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-এর কাছে চলে যান।

পরদিন রুস্তম হযরত সা'দ (রা)-এর কাছে পুনরায় পয়গাম পাঠালেন, আজও আপনার দূতকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। এবার হযরত সা'দ (রা) হযরত হুযায়ফা ইব্‌ন মুহসিন (রা)-কে পাঠান। হযরত হুযায়ফা (রা)-ও আজ সেইরূপ বেপরোয়া ভঙ্গিতে রুস্তমের দরবারে গিয়ে হাযির হন, যেরূপ গতকাল হযরত রিবঈ (রা) গিয়েছিলেন। উপরন্তু, তিনি রুস্তমের সামনে পৌঁছা সত্ত্বেও ঘোড়া থেকে অবতরণ করলেন না, বরং ঘোড়ার পিঠে বসেই তার সিংহাসন ঘেঁষে দাঁড়ালেন। যখন রুস্তম বললেন, এর মধ্যে কি কারণ থাকতে পারে যে, আজ তোমাকে পাঠানো হয়েছে এবং গতকালকের ঐ ব্যক্তিকে পাঠানো হয়নি? হযরত হুযায়ফা জবাব দিলেন, আমাদের নেতা অত্যন্ত ন্যায়নিষ্ঠ। তিনি প্রত্যেক কাজের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সুযোগ দিয়ে থাকেন। গতকাল ঐ ব্যক্তির পালা ছিল। আজ আমার পালা এসেছে। রুস্তম বললেন, তুমি আমাদেরকে কত দিনের অবকাশ দিতে পার? হযরত হুযায়ফা (রা) বললেন, আজ থেকে তিন দিন পর্যন্ত। রুস্তম এ কথা শুনে একেবারে চুপ হয়ে গেলেন। তখন হযরত হুযায়ফা (রা) লাগাম টেনে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে সোজা ইসলামী বাহিনীর কাছে ফিরে এলেন। আজ হযরত হুযায়ফা (রা)-এর এ বেপরোয়া ভাব ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রত্যক্ষ করে রুস্তমের সভাসদবৃন্দ আরো বেশি স্তম্ভিত হল। পরদিনও রুস্তম ইসলামী বাহিনীর একজন দূতকে ডেকে পাঠান। আজ হযরত মুগীরা ইবন শুবাহ (রা)-কে পাঠানো হয়। হযরত মুগীরা (রা)-কে রুস্তম একাধারে প্রলোভিত ও ভীতিগ্রস্ত করার চেষ্টা করেন। এতদসত্ত্বেও হযরত মুগীরা (রা) অত্যন্ত কড়া ও যথাযথ জবাব দেন। তাতে রুস্তম রাগান্বিত হয়ে বলে উঠেন, আমি তোমাদের সাথে

কখনো সন্ধি করব না, বরং তোমাদের সকলকে হত্যা করব। তখন হযরত মুগীরা (রা) সেখান থেকে উঠে মুসলিম বাহিনীর দিকে চলে আসেন।

কাদিসিয়া যুদ্ধ

হযরত মুগীরা (রা) ফিরে আসার সাথে সাথে রুস্তম তার বাহিনীকে প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেন। উভয় বাহিনীর মধ্যে একটি নদী প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রুস্তম সে নদীর উপর সেতু নির্মাণের নির্দেশ দেন এবং তার নির্দেশ সাথে সাথে কার্যকর হয়। পরদিন ভোর বেলা রুস্তম হযরত সা'দ (রা)-এর কাছে পয়গাম পাঠান : তুমি নদীর এপারে এসে লড়বে, না আমরাই ওপারে আসবো? হযরত সা'দ (রা) বলে পাঠান : তোমরাই নদীর এপারে চলে এসো। কাজেই সমগ্র ইরানী বাহিনী নদী অতিক্রম করে রণক্ষেত্রে এসে দাঁড়ালো। ডান পাশের বাহিনী বাম পাশের বাহিনী, অগ্রবর্তী বাহিনী, পশ্চাদবর্তী বাহিনী তথা সমগ্র বাহিনীর প্রত্যেকটি অংশকে রুস্তম জঙ্গী হাতি ও বর্ম পরিহিত অশ্বারোহী বাহিনী দ্বারা মজবুত ও সুদৃঢ় করে তুললেন। তিনি নিজে মধ্যবর্তী বাহিনীতে অবস্থান নেন। ইরানী বাহিনীর সংখ্যা ছিল দু'লক্ষেরও অধিক। তাছাড়া ইসলামী বাহিনীর তুলনায় ইরানী বাহিনী ছিল রণ-সজ্জায় অধিকতর সজ্জিত। ইসলামী বাহিনীর প্রধান সেনাপতি হযরত সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) 'ইরকুন্ নিসা' (উরু থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত অসহ্যকর ব্যথা) রোগাক্রান্ত ছিলেন বলে না ঘোড়ার উপর আরোহণ করতে পারছিলেন, আর না চলাফেরা করতে পারছিলেন। রণক্ষেত্রে ইসলামী বাহিনীর ঠিক সম্মুখভাগে প্রাচীন যুগে নির্মিত একটি দালান দাঁড়িয়েছিল। হযরত সা'দ (রা) স্বয়ং ঐ দালানের ছাদে উঠে একটি বড় তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে পড়েন এবং আপন জায়গায় হযরত খালিদ ইব্‌ন আরফাতা (রা)-কে যুদ্ধক্ষেত্রের নেতা মনোনীত করেন, তবে যুদ্ধের ছক প্রণয়ন এবং যুদ্ধ কৌশল রদবদলের যাবতীয় দায়িত্ব তিনি নিজ হাতেই রেখে দেন। সে অনুযায়ী তিনি সব সময় হযরত খালিদ ইব্‌ন আরফাতার কাছে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রেরণ করতে থাকেন। যা হোক ইরানী বাহিনীর প্রস্তুতির সংবাদ শুনে ইসলামী বাহিনীর মধ্যেও সাজ সাজ রব পড়ে যায়। হযরত সা'দ (রা)-এর নির্দেশ অনুযায়ী হযরত আমর ইব্‌ন মাদীকারিব (রা), হযরত আসিম ইব্‌ন আমর (রা), হযরত রিবঈ (রা), হযরত আমের (রা) প্রমুখ নেতা সমগ্র ইসলামী বাহিনী পরিক্রম করে মুসলমানগণকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে তোলেন। কবিরা রণসঙ্গীত গাইতে থাকে এবং কারী সাহেবরা সুমধুর সুরে যুদ্ধের বর্ণনাসম্বলিত সূরা 'আনফাল'-এর আয়াতসমূহ তিলাওয়াতের মাধ্যমে সমগ্র বাহিনীর মধ্যে এক অতুলনীয় প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে।

মোটকথা, উভয় বাহিনী যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সারিবদ্ধভাবে পরস্পরের সম্মুখীন হয়। সর্বপ্রথম ইরানী বাহিনীর পক্ষ থেকে হরমুয নামীয় একজন রাজকুমার যুদ্ধক্ষেত্রে আসে। তার মাথায় ছিল সোনার মুকুট। সে ছিল ইরানের বিখ্যাত বীরদের অন্যতম। তার সাথে মুকাবিলা করার জন্য মুসলিম বাহিনী থেকে হযরত গালিব ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) এগিয়ে যান এবং মুহূর্তের মধ্যে হরমুযকে বন্দী করে নিয়ে এসে হযরত সা'দ (রা)-এর হাতে সমর্পণ করেন। তারপর আর একজন বীর অশ্বারোহী পারস্য বাহিনী থেকে এগিয়ে আসে। তার মুকাবিলা করার জন্য মুসলিম বাহিনী থেকে হযরত আসিম (রা) এগিয়ে যান। উভয় পক্ষের মধ্যে দু'একটি সংঘাত হতে না হতেই ইরানী অশ্বারোহী পলায়ন করে। হযরত আসিম (রা) তার

পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং পারস্য বাহিনীর সম্মুখসারির নিকটবর্তী হতেই তার (প্রতিপক্ষের) ঘোড়ার লেজ টেনে ধরে তাকে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামিয়ে তারপর জাপটে ধরে নিজের ঘোড়ার উপর বসিয়ে বন্দী করে নিয়ে আসেন। হযরত আসিম (রা)-এর এ বীরত্ব প্রত্যক্ষ করে ইরানী বাহিনীর আর একজন বীর রৌপ্য নির্মিত একটি বিরাট গদা নিয়ে এগিয়ে আসে। তার মুকাবিলায় হযরত আমর ইব্‌ন মাদীকারিব (রা) এগিয়ে যান এবং চোখের পলকে তাকে বন্দী করে নিয়ে আসেন। রুস্তম তার বেশ কয়েকজন সেনাপতিকে এভাবে বন্দী হতে দেখে সমগ্র বাহিনীকে একসাথে মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেন। প্রথমে সারিবদ্ধ রণহস্তীদেরকে মুসলিম বাহিনীর মুখোমুখী দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। বুজায়লা গোত্র হস্তীদের এ আক্রমণ প্রতিরোধ করে। তবে এজন্য তাদেরকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। হযরত সা'দ (রা) যিনি অত্যন্ত গভীরভাবে যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিলেন, বনী আসাদ গোত্রের লোকদেরকে নির্দেশ দেন, যেন তারা অতি শীঘ্রই বুজায়লা গোত্রের সাহায্যে এগিয়ে যায়। বনী আসাদ সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে যায় এবং বীরদর্পে হস্তী বাহিনীকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের অবস্থাও যখন নাজুক হয়ে পড়ে তখন হযরত সা'দ (রা) কিনদাহ গোত্রকে সে দিকে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। বনূ কিনদাহ্ এমনভাবে হস্তী বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে যে, ইরানীরা অনন্যোপায় হয়ে পিছনে হটতে থাকে। রুস্তম এ পরিস্থিতি লক্ষ্য করে তার সমগ্র বাহিনীকে একসাথে মুসলমানদের উপর হামলা করার নির্দেশ দেন। শত্রুদের এ সম্মিলিত আক্রমণ লক্ষ্য করে হযরত সা'দ (রা) উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর ধ্বনি তোলেন। সমগ্র মুসলিম বাহিনীও তাঁর অনুসরণে তাক্‌বীর ধ্বনি তুলে এবং ইরানীদের উপর একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়ে। উভয় বাহিনীর আক্রমণ প্রতি আক্রমণ দেখে মনে হচ্ছিল, যেন দু'টি সমুদ্র পরস্পরের উপর আছড়ে পড়ছে বা দু'টি পর্বত পরস্পরকে সজোরে ধাক্কা মারছে। শীঘ্রই দু'টি বাহিনীর সৈন্যরা পরস্পরের সাথে মিশে গেল। এমতাবস্থায় ইরানী জঙ্গী হাতিরা ইসলামী বাহিনীর মারাত্মক ক্ষতিসাধন করতে থাকে। হযরত সা'দ (রা) তীরন্দাজদেরকে তৎক্ষণাৎ নির্দেশ দেন যেন তারা হাতি ও হাতির আরোহীদের উপর অবিলম্বে তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করে। হযরত আসিম (রা) বর্শা দিয়ে হাতির শুঁড় ক্ষতবিক্ষত করতে শুরু করলেন। মুসলিম তীরন্দাজরা এমন ভয়ানকভাবে তীর বর্ষণ করল যে, হাতির উপর আরোহী ইরানী তীরন্দাজরা তাদের তীর নিক্ষেপের অবকাশই পেল না। ফলে হস্তীবাহিনী পিছনে হটতে থাকে এবং এ সুযোগে মুসলিম বীরেরা তাদের তরবারি চালনার অপূর্ব কৌশল প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়। ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত রক্ষক্ষয়ী যুদ্ধ চলতে থাকে। রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে এলে, পরদিন ভোর পর্যন্ত যুদ্ধ আপনা আপনি স্থগিত হয়ে যায়। তা হলো হিজরী ১৪ সনের মুহাররম মাসের রোববারের ঘটনা।

পরদিন ফজরের নামাযের পর হযরত সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) শহীদগণকে কাদিসিয়ার পূর্ব প্রান্তে দাফনের ব্যবস্থা করেন। শহীদগণের সংখ্যা ছিল পাঁচশ'। রাতের বেলায়ই আহতদের ক্ষতস্থানে মলম পট্টি লাগানোর ব্যবস্থা করা হয়। শহীদগণের দাফন সম্পন্ন করে ইসলামী বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ায়। ইরানীরাও অবস্থান গ্রহণ করে। যুদ্ধ তখনো শুরু হয়নি। এমন সময় সংবাদ এলো যে, সিরিয়া থেকে যে মুসলিম বাহিনী পাঠানো হয়েছিল, তারাও কাদিসিয়ার সন্নিকটে পৌঁছে গেছে। হযরত আবূ উবায়দা ইব্‌ন জাররাহ (রা), হযরত হাশিম ইব্‌ন উতবা (রা)-এর নেতৃত্বে ঐ বাহিনী ইরাক থেকে পাঠিয়েছিলেন। এর সম্মুখভাগের

দায়িত্বে ছিলেন হযরত কা'কা ইবন আমর (রা)। তিনি তাঁর ভাগের এক হাজার মুজাহিদ নিয়ে সর্বপ্রথম কাদিসিয়ায় পৌঁছেন এবং হযরত সা'দ (রা)-কে অবশিষ্ট বাহিনীসমূহেরও আগমন সংবাদ দিয়ে তাঁরই অনুমতিক্রমে নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে চলে যান এবং প্রতিপক্ষের কাছে একজন প্রতিদ্বন্দ্বী পাঠাবার আহবান জানান। তাঁর সাথে মুকাবিলা করার জন্য বাহমান জাদওয়ায়হ এগিয়ে আসে। দীর্ঘক্ষণ আক্রমণ প্রতি-আক্রমণ চলে। শেষ পর্যন্ত হযরত কা'কা' (রা)-এর হাতে বাহমান নিহত হয়। অনুরূপভাবে আরো কয়েকজন নামকরা ইরানী যোদ্ধা একের পর এক হযরত কা'কা' (রা)-এর হাতে ধরাশায়ী হয়। অবস্থা বেগতিক দেখে এবার রুস্তম তার সমগ্র বাহিনীকে একজোটে মুসলমানদের উপর হামলা করার নির্দেশ দেন। জোরে লড়াই শুরু হয়। পথিমধ্যে হযরত হাশিম ইবন উতবা (রা) যখন এ ভীষণ যুদ্ধের সংবাদ পান, তখন তিনি তার বাহিনীর ছয় হাজার সৈন্যকে অনেকগুলো ছোট ছোট দলে বিভক্ত করেন এবং কিছুক্ষণ পর পর এক একটি দলকে তাকবীর ধ্বনি তুলে যুদ্ধরত মুসলিম বাহিনীর সাথে মিলিত হওয়ার নির্দেশ দেন। এভাবে মুজাহিদগণের এক এক খণ্ড বাহিনীর মূল বাহিনীর সাথে মিলিত হতে থাকে। আর মুসলিম বাহিনীর সাহায্যার্থে এভাবে একটির পর একটি বাহিনী আসতে দেখে ইরানীদের অন্তরে দারুণ ভীতির সঞ্চার হয়।

আজও হস্তীবাহিনী মুসলমানগণকে বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে ফেলে রাখে। কিন্তু তারা আজ একটি নতুন কোশল অবলম্বন করে। তারা তাদের উটের উপর থলের মত করে লম্বা লম্বা কাপড় ঝুলিয়ে দেয়। ফলে উটগুলোও হাতির মত ভয়ংকর রূপ ধারণ করে। আর তা দেখে ইরানী ঘোড়াগুলো ভীতিগ্রস্ত হয়ে এদিক-সেদিক ছুটে পালাতে শুরু করে। ফলে ইরানী হাতি দ্বারা এতক্ষণ ইসলামী বাহিনী যতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, এখন মুসলিম বাহিনীর কৃত্রিম হাতি দ্বারা ইরানী বাহিনীও সেরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। আর এ সুযোগে হযরত কা'কা' (রা) শত্রুপক্ষের অনেক পদাতিক সৈন্য ও অশ্বারোহীকে হত্যা করেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলে। এদিন মোট এক হাজার মুসলমান এবং দশ হাজার ইরানী যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারায়।

তৃতীয় দিন প্রত্যূষে ফজরের নামায আদায় করেই হযরত সা'দ (রা) প্রথমে শহীদগণের লাশ দাফনের ব্যবস্থা করেন। আহত সৈন্যদের দায়িত্ব মহিলাদের উপর অর্পণ করা হয়। মহিলারা আহতদের ক্ষতস্থানে মলম-পট্টি লাগাবার ব্যবস্থা করে। তারপর উভয় বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে একে অন্যের মুখোমুখি হয়। আজও ইরানীরা হাতিগুলোকে সম্মুখে ঠেলে দেয়। কিন্তু হযরত কা'কা' ও হযরত আসিম (রা) সম্মিলিতভাবে আক্রমণ চালিয়ে জঙ্গী হাতিদের সরদার সাদা হাতিটিকে বধ করে ফেলেন। তারপর অন্য একটি বিরাট হাতিকে বধ করে ফেলেন। তারপর অন্য একটি হাতিকে আক্রমণ করা হয় এবং সে আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে হাতিটি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালায়। আর ঐ পলায়নপর হাতিটিকে অনুসরণ করে অন্য হাতিরাও যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাতে শুরু করে। এভাবে আজ হাতিদের দ্বারা ইসলামী বাহিনী ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পরিবর্তে ইরানী বাহিনীই উল্টো ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। কেননা, হাতিগুলো পিছন ফিরে পালাবার সময় ইরানী বাহিনীকে দলিত-মথিত করে যাচ্ছিলো। এদিনও ঘোরতর যুদ্ধ হয় এবং সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। সূর্য অস্ত যাওয়ার পর কিছু সময়ের জন্য উভয় বাহিনী পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে যায়। তারপর তাৎক্ষণিক প্রস্তুতি গ্রহণ করে পুনরায় একে অন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মাগরিবের সময় থেকে শুরু করে ভোর পর্যন্ত যুদ্ধ অব্যাহত

থাকে। সারারাত ব্যাপী এমনভাবে হৈ চৈ চলে যে, হযরত সা'দ (রা) কিংবা রুস্তম কেউই যুদ্ধের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হতে পারছিলেন না। মোটকথা, এটি ছিল একটি বিস্ময়কর রাত। ইসলামী বাহিনীর প্রধান সেনাপতি হযরত সা'দ (রা) সারা রাত দু'আর মধ্যে কাটিয়ে দেন। মধ্যরাত্রির পর যুদ্ধক্ষেত্রের হৈ চৈ-এর মধ্যে তিনি হযরত কা'কা' (রা)-এর আওয়াজ শুনতে পান। তিনি তাঁর লোকদেরকে বলছিলেন : সব দিক গুটিয়ে নিয়ে মধ্যবর্তী বাহিনীকে আক্রমণ কর এবং রুস্তমকে বন্দী কর। এ আওয়াজ শুধু হযরত সা'দ (রা)-কে আশ্বস্ত করেনি, বরং সমগ্র মুসলিম বাহিনীর মধ্যে নবজীবনের সঞ্চার করে। সারাদিন এবং সারারাত লড়াই করে মুসলিম মুজাহিদরা একেবারে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। এতদসত্ত্বেও প্রত্যেক গোত্রের সরদার নিজ নিজ লোকদেরকে লড়াই চালিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করেন। পুনরায় মুসলমানরা নব উদ্যমে তরবারি চালাতে শুরু করে। হযরত কা'কা' (রা) তাঁর সেনাদল নিয়ে সেই স্থান পর্যন্ত পৌঁছে যান, যে স্থানে রুস্তম একটি সোনার সিংহাসনে বসে আপন বাহিনীকে পরিচালনা করছিলেন। মুসলিম আক্রমণকারীরা রুস্তমের নিকটবর্তী হতেই তিনি সিংহাসন থেকে নেমে স্বয়ং লড়তে শুরু করেন। কিন্তু কিছুটা আহত হওয়ার সাথে সাথে পিঠটান দেন। তখন হযরত হিলাল (রা) বিদ্যুৎ বেগে এগিয়ে গিয়ে তাকে লক্ষ্য করে বর্শা নিক্ষেপ করেন। ফলে তার (রুস্তমের) মাজা টুটে যায় এবং তিনি নদীতে গড়িয়ে পড়েন। হিলাল সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া থেকে নেমে রুস্তমের পা দু'টি টেনে ধরেন। তারপর তাকে উপরে তুলে এনে হত্যা করেন। এবার তিনি রুস্তমেরই সিংহাসনে দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করেন : মহান আল্লাহ্র শপথ, আমি রুস্তমকে হত্যা করেছি। এ ঘোষণা প্রচারের সাথে সাথে ইসলামী বাহিনীতে উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর ধ্বনি উঠে। ফলে ইরানীরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যায়। ইরানী বাহিনীতে অশ্বারোহীদের সংখ্যা ছিল ত্রিশ হাজার—এদের মধ্য থেকে শুধু ত্রিশ জন সেদিন প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। বাকী সবাই শোচনীয়ভাবে মৃত্যুবরণ করে। হযরত যেরার ইব্ন খাত্তাব (রা) ইরানের রাজকীয় পতাকাটি দখল করে নেন এবং তা ত্রিশ হাজার দীনারে বিক্রি করেন। প্রকৃতপক্ষে ঐ পতাকাটির মূল্যমান ছিল দু'লক্ষ দশ হাজার দীনার। এ যুদ্ধে মুসলমানদের সর্বমোট ছয় হাজার মুজাহিদ শাহাদত বরণ করে। হযরত সা'দ (রা) রুস্তমের সমগ্র সম্পদ ও অস্ত্রশস্ত্র হযরত হিলাল ইব্ন আলকামা (রা)-কে প্রদান করেন। হযরত কা'কা' (রা) ও হযরত শুরাহবীল (রা)-কে ইরানীদের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য প্রেরণ করা হয়। কিন্তু এর আগেও হযরত যুহরা ইব্ন হাওয়াহ একদল মুজাহিদসহ পলায়নপর ইরানীদের পশ্চাদ্ধাবনে রওয়ানা হয়ে গিয়েছিলেন। পথিমধ্যে একটি জায়গায় জালীনূস পলায়নপর ইরানী যোদ্ধাদেরকে একত্র করছিলেন। হযরত যুহ্রা (রা) তাকে হত্যা করেন এবং তার পরিত্যক্ত যাবতীয় আসবাব-সামগ্রীসহ হযরত সা'দ (রা)-এর কাছে নিয়ে যান। জালীনূসের আসবাব-সামগ্রী হযরত যুহ্রা (রা)-কে প্রদানের ব্যাপারে হযরত সা'দ (রা) কিছুটা দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে ছিলেন। শেষ পর্যন্ত বিষয়টি চূড়ান্ত বিবেচনার জন্য খলীফার দরবারে পেশ করা হয়। হযরত ফারূকে আযম (রা) যুহরা (রা)-এর এ বীরত্বপূর্ণ কাজের প্রশংসা করেন এবং জালীনূসের যাবতীয় আসবাব-সমগ্রী তাঁকে দিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন।

রণক্ষেত্রের হাঙ্গামা নিবৃত্ত হলে পর হযরত সা'দ গনীমত-সামগ্রী একত্র করেন এবং এ বিজয়-সংবাদ জানিয়ে হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর কাছে একটি পত্র লিখেন। একটি

দ্রুতগামী উট-সওয়ারের মাধ্যমে পত্রটি মদীনা মুনাওয়ারায় প্রেরণ করা হয়। মদীনা তাইয়িবায় তখন হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর এ অবস্থা ছিল যে, তিনি প্রত্যহ ভোর বেলা মদীনা শরীফ থেকে বের হয়ে অনেক দূর পর্যন্ত চলে যেতেন এবং সেখানে বেশ কিছুক্ষণ কাদিসিয়ার দূতের অপেক্ষা করে দুপুরের পর মদীনা শরীফে ফিরে আসতেন। একদিন যথারীতি মদীনা শরীফের বাইরে গিয়ে তিনি দূতের অপেক্ষা করছিলেন, এমন সময় অনেক দূরে একটি উট-সওয়ার তাঁর নজরে পড়ে। তিনি তার দিকে দ্রুতবেগে ছুটে যান এবং নিকটে পৌঁছে তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কোত্থেকে আসছো। সে উত্তর দিল, আমি কাদিসিয়া থেকে এ সংবাদ নিয়ে এসেছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকে বিজয়ী করেছেন। হযরত ফারূকে আযম (রা) তাকে যুদ্ধের অবস্থা এবং বিজয়লাভের খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করতে থাকেন এবং উট সওয়ারের জীনের রেকাব টেনে ধরে তাঁর সাথে ছুটতে ছুটতে মদীনায় প্রবেশ করেন। উট সওয়ার হযরত উমর ফারূক (রা)-এর কাছে যুদ্ধের অবস্থাদি বর্ণনা করতে করতে উটের পিঠে বসেই দরবারে খিলাফতের দিকে দ্রুত এগিয়ে যেতে থাকেন। কিন্তু শহরে দাখিল হওয়ার পর উট সওয়ার দেখতে পেলেন যে, প্রতিটি লোক সামনে এগিয়ে এসে তার সাথের লোকটিকে সালাম করছে এবং 'আমীরুল মু'মিনীন' বলে সম্বোধন করছে। তখন সে বুঝতে পারে যে, যে ব্যক্তি তার সাথে হেঁটে আসছেন তিনিই মুসলমানদের খলীফা। এটা বুঝতে পেরেই তিনি ভীত হয়ে উট থেকে অবতরণ করার চেষ্টা করেন। এতে হযরত ফারূকে আযম (রা) বললেন : তুমি যুদ্ধের অবস্থাদি বর্ণনা করতে থাক এবং উটের পিঠে বসেই সামনের দিকে এগিয়ে চল। এভাবে তিনি তাঁর ঘরে গিয়ে পৌঁছেন। তারপর মসজিদে নববীতে গিয়ে লোকজনদের জড়ো করে এ বিজয় সংবাদ প্রদান করেন। ঐ সমাবেশে তিনি একটি অতি হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দেন এতে তিনি এও বলেছিলেন–

> ভাইসব ! আমি বাদশাহ নই ; আমি তোমাদেরকে আমার গোলামে পরিণত করতে চাই না। আমি নিজেই তো মহান আল্লাহ্র গোলাম। তবে খিলাফতের দায়িত্বে এমনভাবে আঞ্জাম দিই যে, তোমরা শান্তির সাথে নিজ নিজ ঘরে বসবাস করতে পারি তাহলে তা হবে আমার জন্য সৌভাগ্যের বিষয়। মহান আল্লাহ্ না করুন, যদি আমার অভিলাষ হয় যে, তোমরা আমার দরজায় এসে ধর্না দাও– তাহলে তা হবে আমার জন্য দুর্ভাগ্যের বিষয়। আমি তোমাদেরকে শিক্ষা দেই এবং উপদেশ দেই– তবে শুধু বাক্য দ্বারা নয়, কর্মের দ্বারাও।

বাবেল ও কূছী বিজয়

ইরানীরা কাদিসিয়া থেকে বাবেলের দিকে পালিয়ে যায় এবং সেখানেই অবস্থান নেয়। পরে কয়েকজন ইরানী সেনাপতি পলাতক সৈন্যদের একত্র করে পুনরায় মুকাবিলার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। হযরত সা'দ (রা) কাদিসিয়া যুদ্ধের পর সেখানে দু'মাস পর্যন্ত অবস্থান করেন। তিনি হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষা করছিলেন। প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাওয়ার পর তিনি আপন পরিবার-পরিজনকে কাদিসিয়ায় রেখে স্বয়ং ইসলামী বাহিনীর সাথে মাদায়েনের দিকে যাত্রা করেন। তিনি হযরত যুহরা ইব্ন হাইওয়াকে অগ্রগামী বাহিনীর সেনাপতি নিয়োগ করেন এবং তাকে পূর্বাহ্নেই মাদায়েনের দিকে পাঠিয়ে দেন। হযরত যুহরা (রা) শত্রুদেরকে মেরে তাড়িয়ে ক্রমশ অগ্রসর হতে থাকেন এবং বাবেলের সন্নিকটে গিয়ে

পৌছেন। হযরত সা'দ (রা)-ও তাঁর পুরো বাহিনী নিয়ে সেখানে হাযির হন। ইরানী বাহিনী যখন হযরত সা'দ-এর আগমনের কথা জানতে পারে তখন তাদের কেউ কেউ বাবেল ত্যাগ করে মাদায়েনের দিকে, আবার কেউ কেউ হাওয়াযিন ও নিহাওয়ান্দের দিকে যাত্রা করে। যাবার সময় তারা রাস্তার সকল সেতু ধ্বংস করে দিয়ে যায়। ফলে মুসলমানদের জন্য দজলা ও তার শাখা নদীসমূহ অতিক্রম করার কোন পথ বাকী থাকেনি। ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে যে, ইরানীদের পলায়ন ও বিক্ষিপ্ত হওয়ার সংবাদ শুনে হযরত সা'দ (রা) হযরত যুহরা (রা)-কে আগেই মাদায়েনের দিকে পাঠিয়ে দেন এবং নিজে প্রধান বাহিনী নিয়ে তাকে অনুসরণ করেন। হযরত যুহরা (রা) যখন কূছী নামক স্থানে পৌছেন, তখন জানতে পারেন যে, সেখানে ইরানীদের বিখ্যাত সেনাপতি শাহরিয়ার তার মুকাবিলার জন্য তৈরী হয়ে আছেন। কূছী হচ্ছে সেই স্থান যেখানে নমরূদ হযরত ইবরাহীম (আ)-কে বন্দী করে রেখেছিল। শাহরিয়ার যখন জানতে পারলেন যে, হযরত যুহরা (রা) তার সন্নিকটে পৌছে গেছেন, তখন তিনি ছাউনি থেকে বেরিয়ে এসে নিজ বাহিনীকে মুসলমানদের মুখোমুখি করে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করান। তারপর স্বয়ং আগে বেড়ে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করেন : তোমাদের বাহিনীর মধ্যে যে বীরশ্রেষ্ঠ সে আমার মুকাবিলায় আসুক। হযরত যুহরা (রা) উত্তর দেন ঃ 'আমি নিজে তোমার মুকাবিলার জন্য তৈরী ছিলাম, কিন্তু এখন তোমার এ অসার লম্ফঝম্প দেখে আমি নিজে না এসে এ বাহিনীর একজন নগণ্য গোলামকে পাঠালাম। সে-ই তোমার সব জারিজুরি খতম করে দেবে।' এ বলে তিনি বনূ তামীম গোত্রের গোলাম হযরত নায়িল ইব্‌ন জু'শুম আ'রাজ (রা)-কে ইঙ্গিত প্রদান করেন। সঙ্গে সঙ্গে হযরত নায়িল (রা) ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে শাহরিয়ারের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ান। শাহরিয়ার হযরত নায়িল (রা)-কে খুবই শীর্ণকায় দেখে দ্রুত তার দিকে এগিয়ে আসেন এবং তার ঘাড় ধরে এমন জোরে হেচ্‌কা টান দেন যে, তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। এবার শাহরিয়ার তার বুকের উপর চড়ে বসেন। ঘটনাচক্রে শাহরিয়ারের অনামিকা হযরত নায়িলের মুখের নাগালের মধ্যে এসে যায় এবং তিনি সঙ্গে সঙ্গে তা এমন জোরে কামড়ে ধরেন যে, শাহরিয়ার যন্ত্রণায় একেবারে অস্থির হয়ে উঠে। আর সেই সুযোগে হযরত নায়িল ঝট করে তার বুকের উপর চড়ে বসেন এবং খঞ্জর বের করে তার পেট একেবারে বিদীর্ণ করে দেন। শাহরিয়ার নিহত হওয়ার সাথে সাথে ইরানী বাহিনী প্রাণ নিয়ে পলায়ন করে। শাহরিয়ারের বর্ম, মূল্যবান পোশাক, সোনার মুকুট, অস্ত্রশস্ত্র সব কিছুই হযরত নায়িলের ভাগে পড়ে। হযরত সা'দ (রা) কূছী পৌছে শাহরিয়ার হত্যা এবং তার বাহিনীর পলায়ন সংবাদ পান। তিনি সেই স্থানটি পরিদর্শন করেন যেখানে হযরত ইবরাহীম (আ)-কে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। তারপর তিনি হযরত নায়িল (রা)-কে নির্দেশ দেন যেন সে শাহরিয়ারের পোশাক পরে এবং তার অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তার সামনে আসে। নায়িল (রা) তাই করেন এবং মুসলিম বাহিনী এ দৃশ্য দেখে মহান আল্লাহ্‌র প্রশংসায় মেতে উঠে।

বাহ্‌রাশীর বিজয়

বাহ্‌রাশীর মাদায়েনের নিকটবর্তী একটি স্থানের নাম। সেখানে একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ ও একটি শহর ছিল। বাহ্‌রাশীরে শাহী বডিগার্ডের একটি দুর্দান্ত অশ্বারোহী দল এবং রাজধানীর নিরাপত্তা রক্ষার্থে একটি বিরাট রক্ষীবাহিনী মোতায়েন ছিল। দজলা নদী মাদায়েন ও বাহ্‌রাশীরকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। দজলার এ পারে ছিল বাহ্‌রাশীর এবং ওপারে ছিল

মাদায়েন। ইরানের শাহানশাহ কখনো কখনো বাহরাশীরেও বসবাস করতেন। তাই সেখানেও শাহী দরবার ও শাহী কাজ-কারবার বিদ্যমান ছিল। যাহোক, ইসলামী বাহিনী কূছী থেকে অগ্রসর হয়ে বাহরাশীর পৌঁছা পর্যন্ত বেশ কয়েক জায়গায় ইরানীদের মুখোমুখি হয় এবং তাদেরকে পরাজিত ও পর্যুদস্ত করে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত মুসলিম বাহিনী বাহরাশীর অবরোধ করে এবং এ অবরোধ তিন মাস পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। অবশেষে ইরানীরা বাধ্য হয়ে মুসলমানদের মুকাবিলা করতে মনস্থ করে এবং দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসে। সংঘর্ষ শুরু হয় এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই অনেক ইরানী নিহত হয় এবং অবশিষ্টরা পালিয়ে যায়। এবার ইসলামী বাহিনী বিজয়ী বেশে বাহরাশীরে প্রবেশ করে। বাহরাশীর বিজিত হওয়ার সাথে সাথে ইয়াযদেজিরদ মাদায়েন থেকে পালিয়ে যেতে মনস্থ করেন এবং সেখানকার ধন-সম্পত্তিও সরিয়ে ফেলার উদ্যোগ নেন। আর ধন-সম্পদসহ ইয়াযদেজিরদ যদি মাদায়েন থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন তাহলে তো মুসলমানদের বিপদাশংকা পূর্বের মতই থেকে যায়।

তারা ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন ভরা নদীতে

যতশীঘ্র সম্ভব মাদায়েন জয় করা ছিল হযরত সা'দ (রা)-এর উদ্দেশ্য। কিন্তু দজলা নদী যে মাঝপথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ইরানীরা পালাবার সময় যাবতীয় সেতু ধ্বংস করে গিয়েছিল। উপরন্তু তারা দূরা-দূরান্ত পর্যন্ত একটি নৌকাও অক্ষত রেখে যায়নি। এমতাবস্থায় দজলা অতিক্রম করা ছিল খুবই কঠিন। দজলার অপর পারে ইরানী বাহিনী অবস্থান করছিলো। কিন্তু নদীর কারণে তাদেরকে আক্রমণ করা সম্ভব হচ্ছিলো না। পরদিন হযরত সা'দ ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সমগ্র বাহিনীকে যুদ্ধের জন্য তৈরী করে নেন। তারপর উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করেন : তোমাদের মধ্যে এমন বীর সেনাপতি কে আছে, যে আপন সেনাদলসহ আমাকে এ প্রতিশ্রুতি দেবে যে, সাঁতরিয়ে নদী পার হওয়ার সময় সে আমাদেরকে শত্রুদের হামলা থেকে রক্ষা করবে? হযরত আসিম ইব্ন আমর (রা) সে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ছয়শত তীরন্দাজের একটি দল নিয়ে দজলা নদীর এপারে একটি উঁচু জায়গায় অবস্থান নেন। হযরত সা'দ

نَسْتَعِيْنُ بِاللّٰهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ·

(আমরা মহান আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা করি, তাঁর উপর ভরসা রাখি, মহান আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি উত্তম কর্মবিধায়ক, সমুন্নত ও মহান আল্লাহ্ সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্যের উৎস)-এ বলে আপন ঘোড়াটি নদীতে ছুটিয়ে দেন। তাঁকে অনুসরণ করতে গিয়ে অন্যরা দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিল এবং দেখতে দেখতে ইসলামী বাহিনী তরঙ্গমুখর দজলা অতিক্রম করে অপর পারের দিকে ছুটে চলল। ইসলামী বাহিনী এভাবে অর্ধেক নদী অতিক্রম করেছে এমন সময় ইরানী তীরন্দাজরা তাদেরকে লক্ষ্য করে অবিরাম তীর বর্ষণ করতে শুরু করে। এদিক থেকে হযরত আসিম (রা) ও তাঁর দলবল নিয়ে ইরানী তীরন্দাজদের লক্ষ্য করে তীর বর্ষণ করতে থাকেন। এতে ইরানীদের অনেকেই হতাহত হয় এবং নিজদের প্রাণ রক্ষায় এতই ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠে যে, ইসলামী বাহিনীকে নদী পার হওয়া থেকে রুখে রাখা তাদের পক্ষে আর সম্ভব হয়ে উঠেনি। আর এ সুযোগে মুসলমানরা অপর তীরে পৌঁছে ইরানীদেরকে পাইকারীভাবে হত্যা করতে শুরু করে।

মাদায়েন বিজয়

মুসলিম বাহিনী সেখানে পৌঁছার আগেই ইয়াযদেজিরদ মাদায়েন থেকে আপন পরিবার-পরিজন ও ধনরত্ন অন্যত্র সরিয়ে ফেলার যাবতীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন। এতদ্‌সত্ত্বেও কাসরে আব্‌ইয়ায (শ্বেতপ্রাসাদ) এবং রাজধানীতে প্রচুর ধনসম্পদ রয়ে গিয়েছিল। ইসলামী বাহিনীর নদী পাড়ি দেবার খবর পেয়ে ইয়াযদজিরদ মাদায়েন ছেড়ে পালিয়ে যান। মুসলমানগণ চতুর্দিক থেকে শহরে প্রবেশ করতে শুরু করে। মুসলমানদের পৌঁছার পূর্বেই শহরের অধিবাসীরা রাজপ্রাসাদ লুট করতে শুরু করেছিল। হযরত সা'দ (রা) যখন কাসরে আব্‌ইয়ায়েয় প্রবেশ করেন, তখন আপনা আপনি তাঁর মুখ থেকে নিম্নের আয়াতে কারীমা বেরিয়ে আসে :

كَمْ تَرَكُوْا مِنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ وَّزُرُوْعٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ وَّنَعْمَةٍ كَانُوْا فِيْهَا فٰكِهِيْنَ ۔ كَذٰلِكَ وَاَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ۔

ওরা পশ্চাতে রেখে গিয়েছিল কত উদ্যান ও প্রস্রবণ, কত শস্যক্ষেত্র ও সুরম্য প্রাসাদ, কত বিলাস-উপকরণ, যা ওদেরকে আনন্দ দিত। এরূপই ঘটেছিল এবং আমি এ সমুদয়ের উত্তরাধিকারী করছিলাম ভিন্ন সম্প্রদায়কে। (৪৪ : ২৫-২৮)

হযরত সা'দ (রা) সেখানেই এক সালামের সাথে আট রাকাআত 'সালাতুল ফাত্‌হ' (বিজয় উপলক্ষে শুকরিয়া নামায) আদায় করেন। ঐ দিন ছিল শুক্রবার। কাসরে আব্‌ইয়াযের' যে জায়গায় কিসরার (ইরানের শাহানশাহের) সিংহাসন ছিল সেখানে মিম্বর স্থাপন করা হয় এবং প্রাসাদের ভিতরেই জুমুআর সালাত আদায় করা হয়। এটাই ছিল ইরানের রাজধানীতে প্রথম জুমুআর সালাত আদায়। ঐ প্রাসাদে যে সমস্ত ছবি ও মূর্তি ছিল তা অবিকল সেই অবস্থায়ই রেখে দেওয়া হয়। হযরত সা'দ (রা) সেগুলোকে ভাঙ্গাননি বা অন্যত্র সরিয়েও ফেলেননি। "ইকামা (অবস্থান)-এর নিয়্যত থাকায় নামাযের মধ্যে 'কসর' (সংক্ষিপ্তকরণ)-ও করা হয়নি। ইরানীদের পশ্চাদ্ধাবন করার জন্য যুহরা ইব্‌ন হাইওয়াকে নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে পাঠানো হয়। মালে গনীমত একত্র করার কাজে হযরত আমর ইব্‌ন মুকাররিন (রা)-কে এবং তা বন্টনের কাজে সুলায়মান ইব্‌ন রাবী'আ বাহিনীকে নিয়োগ করা হয়। হীরা-জহরতের মূর্তি, কিসরার রাজকীয় পোশাক, মণি-মাণিক্য-খচিত রাজমকুট, বর্ম এবং এ ধরনের আরো অনেক জিনিস মুসলমানগণ ঐ সমস্ত লোকদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয় যারা রাজপ্রাসাদ থেকে সেগুলো নিয়ে ছুটে পালাচ্ছিল। রাজপ্রাসাদের ভাণ্ডারে ও যাদুঘরে খাকানে চীন (চীন সম্রাট) কায়সারে রূম (রূম সম্রাট), দাহির শাহ্ (সিন্ধুর রাজা), বাহরাম গোর, নুমান ইব্‌ন মুনযীর, কিসরা (পারস্য সম্রাট) হরমুয, ফিরূয প্রমুখ রাজা-বাদশাহদের ব্যক্তিগত বর্ম, তরবারি ও খঞ্জর পাওয়া যায়। পুরাতাত্ত্বিক বস্তু হিসাবে শাহীভাণ্ডারে সেগুলো সংরক্ষিত হয়ে আসছিল এবং ইরানীরা তা নিয়ে গর্বোবোধ করত। যাহোক, এসব জিনিস সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে হযরত সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) ও হযরত কা'কা' (রা) রূম-সম্রাট হিরাক্লিয়াসের তরবারিটি উঠিয়ে নেন। তারপর হযরত সা'দ (রা) নিজের পক্ষ থেকে হযরত কা'কা' (রা)-কে বাদশাহ 'বাহরাম গোর'-এর বর্মটিও দান করেন।

হযরত সা'দ (রা) 'খুমুস' (মালে গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ যা রাষ্ট্রের জন্য নির্ধারিত) ছাড়াও দরবারে খিলাফতে প্রেরণ করেন দুষ্প্রাপ্য বস্তুরাজি। কিসরার 'বাহার' নামক একটি

শয্যা ছিল ঐ সমস্ত বস্তুর অন্যতম। শয্যাটির দৈর্ঘ্য ছিল নব্বই গজ এবং প্রস্থ ছিল দশ গজ। তাতে ফুল, পাতা, কালি, গাছ, নদীসহ অনেক ধরনের প্রতিকৃতি শোভা পাচ্ছিল এবং সবগুলোই ছিল স্বর্ণ, রৌপ্য ও হীরা জহরতের তৈরী। বসন্ত বিদায় অনুষ্ঠানে বাদশাহ এ শয্যার উপর বসে মদ্যপান করতেন। যখন ঐ সমস্ত জিনিস মদীনা শরীফে গিয়ে পৌঁছে তখন তা দেখে জনসাধারণের বিস্ময়ের অবধি ছিল না। হযরত ফারূকে আযম (রা) যাবতীয় দ্রব্য জনসাধারণের মধ্যে বন্টন করে দেন। শাহী শয্যা সম্পর্কে সাধারণ অভিমত এ ছিল যে, তা বন্টন না করে যেন অক্ষত অবস্থায় রেখে দেওয়া হয়। কিন্তু হযরত আলী (রা) দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠেন : না, এটাকেও বন্টন করা উচিত। কাজেই ফারূকে আযম (রা) হযরত আলী (রা)-এর মতানুযায়ী তা কেটে টুকরো টুকরো করে জনসাধারণের মধ্যে বণ্টন করে দেন। হযরত আলী (রা)-এর ভাগে যে টুকরাটি পড়েছিল তা খুব আকর্ষণীয় না হলেও তিনি তা ত্রিশ হাজার দীনারে বিক্রি করেছিলেন।

জালূলার যুদ্ধ

যখন মাদায়েনের উপর মুসলিমগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় তখন ইয়াযদেজিরদ মাদায়েন থেকে হালওয়ানে পলায়ন করেন। রুস্তম ইব্‌ন ফাররূখ যাদ-এর ভাই খারযাদ ইব্‌ন ফাররূখযাদ মুসলমানগণের মুকাবিলা করার জন্য জালূলা নামক স্থানে সৈন্য সমাবেশ করেন। তিনি দুর্গ ও শহরের চারপাশে পরিখা খনন করেন এবং মুসলিম বাহিনীর আগমন ও আক্রমণের পথে নানা ধরনের প্রতিবন্ধক দাঁড় করিয়ে রাখেন। এ যুদ্ধের পরিস্থিতি ও সৈন্য সমাবেশ এতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, বিষয়টির প্রতি ইরানীরা যেমন আশার দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলো তেমনি মুসলমানগণের সতর্ক দৃষ্টিও সেদিকে নিবদ্ধ ছিল। হযরত সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) সমগ্র পরিস্থিতি সম্পর্কে হযরত ফারূকে আযম (রা)-কে অবহিত করেন। দরবারে ফারূকী থেকে নির্দেশ এলো হাশিম ইব্‌ন উতবা বার হাজার সৈন্য নিয়ে যেন জালূলা অভিযানে বহির্গত হন, আর হযরত কা'কা' (রা)-র হাতে যেন অগ্রবর্তী বাহিনীর, হযরত মা'শারা ইব্‌ন মালিক (রা)-এর হাতে বাম পাশের বাহিনীর এবং আমর ইব্‌ন সুররাহকে পশ্চাৎ বাহিনীর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর এ নির্দেশ অনুযায়ী হযরত হাশিম (রা) মাদায়েন থেকে রওয়ানা হয়ে চতুর্থ দিন জালূলায় গিয়ে পৌঁছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শহরটি ঘিরে ফেলেন। এ ঘেরাও বেশ কয়েক মাস পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ঐ সময়ে ইরানীরা মাঝে মাঝে দুর্গ থেকে বের হয়ে মুসলিমদের উপর ব্যর্থ হামলা চালাতে থাকে।

জালূলা অবরোধ চলাকালে মুসলমান ও ইরানীদের মধ্যে বহুবার অনুরূপ সংঘর্ষ হয় এবং প্রত্যেক বারই ইরানীরা পরাজিত হয়। জালূলায় যেখানে ইরানী যোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল কয়েক লক্ষ সেখানে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র কয়েক হাজার। ইরানীরা তাদের জনশক্তির আধিক্য এবং যুদ্ধাস্ত্রের প্রাচুর্যের উপর নির্ভর করে মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইরানীদেরকে শোচনীয় পরাজয় বরণ করতে হয়। ঐ যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে প্রায় একলক্ষ ইরানী নিহত হয় এবং তিন কোটি দীনার মূল্যের মালে গনীমত মুসলমানদের হাতে আসে। জালূলার পতন-সংবাদ যখন হাল্‌ওয়ানে অবস্থানরত ইয়াযদেজিরদের কাছে গিয়ে পৌঁছে তখন সেখানে একটি বাহিনীসহ খাসরা শানূমকে রেখে 'রাই'-এর দিকে পালিয়ে যান। জালূলার যুদ্ধ শেষ হওয়ার সাথে সাথে কা'কা' (রা) হাল্‌ওয়ানের দিকে যাত্রা করেন। খাসরা

শানূম হালওয়ান থেকে বের হয়ে মুসলিম বাহিনীর মুখোমুখি হন এবং পরাজিত হয়ে সেখান থেকে পলায়ন করেন। এরপর কা'কা' (রা) হাল্‌ওয়ান অধিকার করে নেন।

হযরত সা'দ (রা) এ বিজয় সংবাদ এবং সেই সাথে মালে গনীমতের খুমুস (এক-পঞ্চমাংশ) হযরত যিয়াদ (রা)-এর মাধ্যমে হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর কাছে পাঠান এবং ইরানের দিকে আরো অগ্রসর হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন। হযরত যিয়াদ (রা) মালে গনীমত নিয়ে সন্ধ্যার সময় মদীনা শরীফে প্রবেশ করেন। ফারূকে আযম (রা) তাঁর কাছ থেকে মোটামুটিভাবে বিজয় সংবাদ শ্রবণ করে জনসাধারণকে একত্র করেন। তারপর তাকে (যিয়াদকে) নির্দেশ দেন, যেন তিনি বিস্তারিতভাবে যুদ্ধের অবস্থাদি সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেন। যিয়াদ অত্যন্ত সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় জনসাধারণের সামনে মুসলিম বাহিনীর বীরত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো তুলে ধরেন। হযরত ফারূকে আযম (রা) মালে গনীমত মসজিদে নববীর আঙ্গিনায় স্তূপীকৃত করে রাখেন এবং তা পাহারার ব্যবস্থা করেন। পরদিন ফজরের পর তিনি জনসাধারণের মধ্যে মালে গনীমত বন্টন করে দেন। তাতে সোনা, রূপা ও হীরা-জহরতের অলংকার এবং বহু মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী ছিল। হযরত ফারূকে আযম (রা) সেগুলো দেখে কেঁদে ফেলেন। যখন হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা) বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন ! এ তো শুকরিয়া জ্ঞাপনের সময়, অথচ আপনি কাঁদছেন ? হযরত ফারূকে আযম (রা) জবাব দেন, আল্লাহ তা'আলা যে জাতিকে পার্থিব সম্পদ দান করেন তাদের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ জন্ম নেয় এবং তা থেকে দলাদলির সৃষ্টি হয়। সে কথা চিন্তা করেই আমি এখন কাঁদছি।

তারপর হযরত ফারূকে আযম (রা) হযরত সা'দ (রা)-এর কাছে নির্দেশ পাঠান : মুসলমানগণ যেহেতু একাধারে অনেক কষ্ট সহ্য করেছে, তাই আপাতত তাদেরকে কিছুদিন বিশ্রাম গ্রহণ করতে দাও।

হিজরী ১৬ সনে জালূলার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ পর্যন্ত যুদ্ধ পরিস্থিতি বর্ণনাকালে ইচ্ছাকৃতভাবেই সন-তারিখ উল্লেখ করা হয় নি। কেননা, কোন কোন ঘটনায় সন-তারিখ একদল ঐতিহাসিক একরূপ বলেছেন, তো অন্যদল বলেছেন অন্যরূপ। অর্থাৎ অনেক ঘটনারই সন-তারিখ নির্ধারণের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। কাজেই, সন তারিখ বর্ণনার পরিবর্তে ঘটনার ধারাবাহিকতা বর্ণনার উপরই আমরা অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছি। হিজরী ১৬ সনে জালূলার যুদ্ধ সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে ইরাকে ঘটনাসমূহ যেভাবে ঘটেছিল, উপরে ঠিক সেভাবে তা বর্ণিত হয়েছে। এবার আমরা ইরাকের ঘটনাবলীর পরিবর্তে সিরিয়ার ঘটনাবলী বর্ণনায় মনোনিবেশ করবো।

সিরিয়ার যুদ্ধ

ইতিপূর্বে আমরা ইরাকের যুদ্ধসমূহের বিবরণ পেশ করেছি। এবার সিরিয়ার যুদ্ধসমূহের বিবরণ পেশ করতে গেলে আমাদেরকে দু'বছর পিছন থেকে অর্থাৎ দামিস্ক, ফুহ্‌ল ও বীসান জয়ের পরবর্তী অবস্থা থেকে শুরু করতে হবে।

হিম্‌স বিজয়

আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি যে, হযরত আবূ উবায়দাহ্‌ ইব্‌ন জার্‌রাহ (রা) হিমস জয়ের উদ্দেশ্যে যুলকিলা' পর্যন্ত গিয়ে পৌছেন। যুলকিলা' হচ্ছে সিরিয়ার ছয়টি জেলার অন্যতম। যুলকিলা মূলত একটি শহরের নাম। এ শহরকে কেন্দ্র করেই উক্ত জেলা গঠিত হয়েছিল।

ইংরেজীতে হিম্‌সকে য়্যামেসা' বলা হয়। ঐ শহরে সূর্য-দেবতার মন্দির ছিল। তাই পৌত্তলিকরা দূর-দূরান্ত থেকে সেখানে এসে সমবেত হত। জর্ডান ও দামিশ্‌ক জয় করার পর মুসলিম বাহিনী হিম্‌স, ইনতাকিয়া, বায়তুল-মুকাদ্দাস প্রভৃতি সেসব বিখ্যাত স্থান যেগুলো তখন পর্যন্ত মুসলমানগণের অধিকারভুক্ত হয়নি সেগুলোর দিকে রোখ করলেন। যখন ইসলামী বাহিনী যুলকিলা' নামক স্থানে পৌঁছে তখন হিরাক্লিয়াস কূযার বাতরীক নামক জনৈক সেনাপতিকে তাদের মুকাবিলায় প্রেরণ করেন। শাম্‌স বাতরীককেও তার সাহায্যে পাঠান। উভয় বাতরীক (প্যাট্রিয়ক) মিলে ইসলামী বাহিনীর মুকাবিলা করেন। শেষ পর্যন্ত রোমান বাহিনী পরাজিত ও বিপর্যস্ত হয় এবং শাম্‌স্ বাতরীক হযরত আবূ উবায়দার হাতে নিহত হন। যে সমস্ত রোমান সৈন্য কোন না কোন মতে রক্ষা পেয়েছিল তারা প্রাণ নিয়ে পলায়ন করে। পলায়নপর সৈন্যরা যখন হিম্‌সে গিয়ে পৌঁছে, তখন সেখানে অবস্থানরত হিরাক্লিয়াস হিম্‌স ত্যাগ করে আলরাবার চলে যান। হযরত আবূ উবায়দা (রা) এবার হিম্‌স্ ঘেরাও করেন। হিরাক্লিয়াস হিমসবাসীকে সাহায্য করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর কোন সাহায্য হিমস্‌বাসীদের কাছে পৌঁছাতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত দামিশ্‌কবাসীদের ন্যায় বাধ্য হয়ে হিম্‌সবাসীরাও সন্ধির মাধ্যমে হিমসকে মুসলমানদের হাতে তুলে দেয়। হিম্‌স দখলের পর মুসলমানগণ হিম্‌স ও কিন্নাসরীনের মধ্যবর্তী হামাতের দিকে অগ্রসর হয়। হামাতবাসীরাও জিযিয়া প্রদানের শর্তে মুসলমানের সাথে সন্ধি করে। তারপর মুসলিমগণ শীরয্‌ ও মুয়াররাহ্‌ দখল করেন। তারপর আরো অগ্রসর হয়ে লায্‌কিয়াহ শহরে গিয়ে পৌঁছে। সেখানে খ্রিস্টানরা তাদের মুকাবিলা করে এবং পরাজিত হয়। লায্‌কিয়ার পর সাল্লামিয়াও মুসলমানগণ অস্ত্রবলে দখল করে নেয়।

কিন্নাসরীন বিজয়

সাল্লামিয়াহ্‌ বিজয়ের পর হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) হযরত আবূ উবায়দা (রা)-এর নির্দেশে তার অধীনস্থ বাহিনী নিয়ে কিন্নাসরীনের দিকে অগ্রসর হন। সেখানে মীনাস নামক জনৈক রোমান সরদার, হিরাক্লিয়াসের পর যিনি সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন, আগে বেড়ে হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর মুকাবিলা করেন। হযরত খালিদ (রা) জোর আক্রমণ চালিয়ে মীনাসকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতে বাধ্য করেন। মীনাস কিন্নাসরীনের দুর্গে প্রবেশ করেন। সঙ্গে হযরত খালিদ (রা)-ও আগে বেড়ে কিন্নাসরীন ঘেরাও করে ফেলেন। শেষ পর্যন্ত কিন্নাসরীনও মুসলমানদের দখলে চলে আসে। এ বিজয় সংবাদ পাওয়ার পর হযরত ফারূকে আযম (রা) হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং তার অধিকার ও সেনাপতির আওতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করে নেন।

হল্‌ব (আলেপ্পো) ও ইনতাকিয়া বিজয়

কিন্নাসরীন বিজয়ের পর হযরত আবূ উবায়দা (রা) হল্‌বের দিকে অগ্রসর হন। হল্‌বের নিকটবর্তী হতেই তাঁর কাছে সংবাদ আসে যে, কিন্নাসরীনবাসীরা তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। হযরত আবূ উবায়দা (রা) সঙ্গে সঙ্গে কিন্নাসরীনের দিকে একটি সেনাদল প্রেরণ করেন। কিন্নাসরীনবাসীরা অবরোধের মধ্যে পড়ে পুনরায় মুসলিমদের আনুগত্য স্বীকার করে নেয় এবং প্রচুর পরিমাণ জরিমানা দিয়ে নিজেদের প্রাণ রক্ষা করে। হযরত আবূ উবায়দা (রা) হল্‌বের সন্নিকটে অবস্থান নেন এবং অগ্রবর্তী বাহিনীর সেনাপতি হযরত আয়ায ইব্‌ন গানাম (রা)-কে হল্‌ব ঘেরাও করার নির্দেশ দেন। হলববাসীরা অন্যান্য

বিজিত শহরের অধিবাসীদের ন্যায় কয়েকটি শর্তাধীনে তাদের শহরটিও মুসলমানগণের হাতে সমর্পণ করে। হযরত আয়ায ইব্‌ন গানাম (রা) কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাদি হযরত আবূ উবায়দা (রা) অনুমোদন করেন এবং নিজের স্বাক্ষরে একটি চুক্তিপত্র লিখে দেন।

হল্‌ব বিজয়ের পর হযরত আবূ উবায়দা (রা) ইনতাকিয়ার দিকে অগ্রসর হন। ইনতাকিয়া ছিল হিরাক্লিয়াসের এশীয় রাজধানী। সেখানে রাজকীয় প্রাসাদসমূহ নির্মিত হয়েছিল। একটি রাজধানীর নিরাপত্তার জন্য যেসব ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন, তার সব কিছুই সেখানে বিদ্যমান ছিল। এ কারণেই বিভিন্ন স্থান থেকে পলায়নপর খ্রিস্টানরা ইনতাকিয়ায় এসে আশ্রয় নিয়েছিল। হলবেরও অনেক খ্রিস্টান ইনতাকিয়ায় চলে এসেছিল। মুসলমানগণ ইনতাকিয়ার নিকটবর্তী হলে খ্রিস্টানরা শহর থেকে বেরিয়ে এসে মুসলমানগণের মুকাবিলা করে, কিন্তু পরাজিত হয়ে পুনরায় শহরে ঢুকে পড়ে। ইসলামী বাহিনী ইনতাকিয়া ঘেরাও করে এবং কিছুদিন পর শহরবাসীরা বাধ্য হয়ে জিযিয়া প্রদানের প্রতিশ্রুতিতে মুসলমানগণের সাথে সন্ধি করে। কোন কোন খ্রিস্টান স্বেচ্ছায় দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়। মুসলমানগণ এ ব্যাপারে কোনরূপ বাধার সৃষ্টি করে নি। তারপর সংবাদ আসে যে, খ্রিস্টানরা হলবের নিকটবর্তী 'মুআর্‌রা মাসরীন' নামক স্থানে মুসলমানগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতি নিচ্ছে। হযরত আবূ উবায়দা (রা) সেদিকে রওয়ানা হন। সেখানে খ্রিস্টানদের সাথে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তাতে অনেক খ্রিস্টান ও রোমান নেতা নিহত হন। শেষ পর্যন্ত মুআররা মাসরীনের অধিবাসীরাও হলববাসীদের ন্যায় মুসলমানগণের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়। এ সন্ধির ব্যাপারটি চূড়ান্ত হওয়ার পূর্বেই ইনতাকিয়া-বাসীদের বিদ্রোহ ও অঙ্গীকার ভঙ্গের খবর আসে। অবশ্য আয়ায ইব্‌ন গানাম ও হাবীব ইব্‌ন মাসলামা (রা) সেখানে বিদ্যমান ছিলেন। তারা বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন এবং খ্রিস্টানদেরকে পরাজিত করে পুনরায় শহরটি নিজেদের দখলে নিয়ে আসেন। এ বিদ্রোহ ও অঙ্গীকার ভঙ্গের পর ইনতাকিয়াবাসীরা পুনরায় ইতিপূর্বেকার শর্তানুযায়ী মুসলমানগণের সাথে সন্ধি স্থাপনের আবেদন জানায় এবং আবূ উবায়দা (রা) তাদের ঐ আবেদন মঞ্জুর করেন।

বারবার খ্রিস্টানদের এ বিদ্রোহ ও অঙ্গীকার ভঙ্গের ব্যাপারটি লক্ষ্য করে হযরত আবূ উবায়দা (রা) হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর কাছে এ মর্মে একটি পত্র লিখেন : বার বার খ্রিস্টানদের ঐ অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে কোন কোন সময় মুসলিম বাহিনীকে ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। কাজেই ওদের সাথে বিশেষ ধরনের কি আচরণ করতে হবে সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিন। হযরত ফারূকে আযম (রা) জবাবে লিখেছেন : খ্রিস্টানদের যেসব বড় বড় শহর ও জনবসতি তোমরা ইতিমধ্যে জয় করেছ সেগুলোর প্রত্যেকটিতে স্থায়িভাবে এক একটি নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন কর। বায়তুল মাল থেকে ওদের বেতন ভাতার ব্যবস্থা করব। যা হোক, ইনতাকিয়া জয়ের পর আশেপাশের প্রত্যেকটি জনবসতিই স্বেচ্ছায় মুসলমানদের হস্তগত হয়।

বাফ্‌রাস, মারআশ ও হারস বিজয়

সিরিয়ার দিক থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে এবং প্রত্যেকটি শহরে ও জনবসতিতে নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করে হযরত আবূ উবায়দা ফিলিস্তীন জয়ের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন এবং মায়সারা ইব্‌ন মাসরূকের নেতৃত্বে বাহিনী বাফ্‌রাম (ইনতাকিয়া অঞ্চলের এশিয়া মাইনর সীমান্তে অবস্থিত একটি স্থান)-এর দিকে পাঠান। সেখানে গাস্‌সান, তানূখ, ইয়াদ প্রভৃতি

আরব গোত্র বসবাস করত। তারা খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী ছিল বিধায় ইনতাকিয়া বিজয়ের অবস্থাদি শুনে হিরাক্লিয়াসের কাছে চলে যাবার প্রস্তুতি নিতেছিল। হযরত মায়সরা ইব্ন মাসরূক (রা) সেখানে পৌঁছেই তাদের উপর হামলা চালান। খ্রিস্টানরাও পাল্টা হামলা চালায়। ফলে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হয়। হযরত আবূ উবায়দা (রা) হযরত মালিক ইব্ন আশতার নাখঈ (রা)-কে হযরত মায়সারা (রা)-এর সাহায্যার্থে ইনতাকিয়া থেকে প্রেরণ করেন। এ নতুন বাহিনী সেখানে পৌঁছার সাথে সাথে খ্রিস্টানরা ঘাবড়ে যায় এবং হতবুদ্ধি হয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করে। হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) একটি ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে মারআশে গিয়ে পৌঁছেন। সেখানকার খ্রিস্টানরা স্বেচ্ছা-নির্বাসনের অনুমতি নিয়ে শহরটি হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)-এর হাতে সমর্পণ করে। অনুরূপভাবে হযরত হাবীব ইব্ন মাসলামা (রা) একটি বাহিনী নিয়ে হারস দুর্গে গিয়ে পৌঁছেন এবং তা অধিকার করে নেন।

কায়সারিয়া (কায়সারাহ) ও আজনাদায়ন বিজয়

যে সময়ে ইসলামী বাহিনী ইনতাকিয়াহ ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা জয় করছিল ঠিক সেই সময়ে দামিশ্‌কের কর্মকর্তা হযরত ইয়াযীদ ইব্ন আবূ সুফিয়ান (রা) হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর নির্দেশ অনুযায়ী আপন ভাই হযরত মুআবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ান (রা)-কে কায়সারিয়ার দিকে প্রেরণ করেন। সেখানে মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাতে আশি-হাজার খ্রিস্টান মুসলমানগণের হাতে নিহত হয় এবং কায়সারিয়া মুসলমানদের অধিকারে চলে আসে।

'মারজেরূম' অভিযান এবং বীসান বিজয়ের পর হিরাক্লিয়াস আরতাবূন নামীয় বাতরীককে, যিনি একজন বীরবর ও বিখ্যাত সেনাপতি ছিলেন, আজনাদায়ন নামক স্থানে সৈন্য সংগ্রহের নির্দেশ দেন। আরতাবূন সৈন্য সংগ্রহ করে একটি বিরাট বাহিনী আজনাদায়নে নিজের কাছে রাখেন এবং একটি বাহিনী রামাল্লায় ও অপর একটি বাহিনী বায়তুল মুকাদ্দাসে মোতায়েন করেন। এ বাহিনীগুলো সব ধরনের সমরাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আক্রমণকারী মুসলমানদের অপেক্ষা করতে থাকে। হযরত আমর ইব্ন 'আস (রা) যিনি ঐ অঞ্চলের মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন, হযরত আবূ উবায়দা (রা)-এর নির্দেশ অনুযায়ী আলকামা ইব্ন হাকীম ফারাসী ও মাসরূর ইব্ন আল্-আকীকে বায়তুল্ মুকাদ্দাসের দিকে এবং হযরত আবূ আইয়ুব মালিকীকে রামাল্লায় প্রেরণ করেন। তিনি নিজে আরতাবূনের মুকাবিলায় আজনাদায়নের দিকে রওয়ানা হন। আজনাদায়নে ইয়ারমূক যুদ্ধের ন্যায় এক ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। শেষ পর্যন্ত আরতাবূন হযরত আমর (রা)-এর কাছে পরাজিত হয়ে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে পলায়ন করেন। হযরত আলকামা ইব্ন হাকীম ফারাস, যিনি বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশের সুযোগ দেন। আরতাবূন বায়তুল মুকাদ্দাসে ঢুকে পড়েন এবং হযরত আমর (রা) আজনাদায়ন দখল করে নেন।

বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়

আরতাবূন বায়তুল-মুকাদ্দাসে প্রবেশ করার পর হযরত আমর (রা) গাযওয়া, সুবুত, নাবলুস, লুদ্দ, আমওয়াস, জাবরীন, ইয়াফা প্রভৃতি স্থান দখল করেন। তারপর বায়তুল-মুকাদ্দাসের পার্শ্ববর্তী সমগ্র এলাকা দখল করে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে অগ্রসর হন এবং তা অবরোধ করেন। বায়তুল-মুকাদ্দাস-এর অধিবাসীরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে ঘেরাওকারীদের মুকাবিলা করেছিল। হযরত আবূ উবায়দা (রা)-এর আগমন সংবাদ শুনে তাদের সাহস কিছুটা দমে যায়

এবং তিনি সেখানে পৌঁছার পর তাঁর সাথে দূত-বিনিময় শুরু করেন। সন্ধির ব্যাপারে মুসলমানদের পক্ষ থেকে আপত্তির কিছু ছিল না। তাছাড়া মুসলমানগণ যেসব সন্ধিশর্ত পেশ করত, সেগুলো সরল ও সুনির্দিষ্ট ছিল যে, খ্রিস্টান মাত্রই সে সম্পর্কে অবহিত ছিল। কিন্তু বায়তুল-মুকাদ্দাসের খ্রিস্টানরা এবার সন্ধির ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ধরনের শর্ত জুড়ে দেয়। আর তা ছিল, খোদ মুসলমানদের খলীফা বায়তুল মুকাদ্দাসে এসে অঙ্গীকার পত্র লিখে দিবেন। ইতিমধ্যে আরতাবূন বাতরীক বায়তুল-মুকাদ্দাস থেকে মিসরের দিকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। এখন শুধু শহরের অভিজাত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা মুসলিম বাহিনীকে কোন মতে প্রতিহত করছিলেন। তাই শহর দখল করাটা এখন খুব একটা কঠিন ব্যাপার ছিল না। কিন্তু হযরত আবূ উবায়দা ইব্ন জাররাহ (রা) যথাসম্ভব রক্তপাত বন্ধ করতে চেয়েছিলেন এবং যুদ্ধের উপর সন্ধিকেই প্রাধান্য দিতেছিলেন। তাই এ মর্মে হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর কাছে একটি পত্র প্রেরণ করেন। তাতে তিনি লিখেছিলেন, 'আপনি এখানে আগমন করলে বিনা যুদ্ধে বায়তুল-মুকাদ্দাস আমাদের দখলে চলে আসতে পারে।" পত্র পেয়ে হযরত ফারূকে আযম (রা) প্রয়োজনীয় পরামর্শের জন্য গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরকে মসজিদে নববীতে আহবান করেন। হযরত উসমান (রা) বলেন, খ্রিস্টানরা এখন পরাজিত ও পর্যুদস্ত হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে মুকাবিলার বা প্রতিরোধের শক্তি বা সাহস কোনটিই নেই। আপনি বায়তুল্-মুকাদ্দাস সফরে যাবেন না। আল্লাহ তা'আলা খ্রিস্টানদেরকে আরো লাঞ্ছিত করবেন এবং তারা শেষ পর্যন্ত বিনা শর্তে ফিলিস্তীন শহর মুসলমানদের হাতে তুলে দেবে। কিন্তু হযরত আলী (রা) বলেন, আমার মতে আপনার ফিলিস্তীনে যাওয়া খুবই জরুরী। হযরত ফারূকে আযম (রা) হযরত আলী (রা)-এর অভিমতই গ্রহণ করেন।

হযরত ফারূকে আযমের ফিলিস্তীন সফর

এক থলে ছাতু, একটি উট, একজন ভৃত্য ও একটি কাঠের পেয়ালা সঙ্গে নিয়ে হযরত ফারূকে আযম (রা) ফিলিস্তীনের দিকে রওয়ানা হন। হযরত উসমান গনী (রা)-কে তিনি মদীনা শরীফে তাঁর প্রতিনিধি নিয়োগ করে যান। তাঁর এ সফরের আড়ম্বরহীনতা ও কষ্টসহিষ্ণুতার কথা ইতিহাস-খ্যাত। কখনো ভৃত্য উটের রশি ধরে পথ চলত এবং ফারূকে আযম (রা) উটের উপর সওয়ার হতেন। আবার কখনো ভৃত্য উটের উপর সওয়ার হত এবং স্বয়ং হযরত ফারূকে আযম (রা) উটের রশি ধরে হেঁটে চলতেন। এ ছিল সেই পরাক্রমশালী মহান বাদশাহ্র সফর, যাঁর সেনাবাহিনীর ঘোড়ার ক্ষুরের নীচে অতি সম্প্রতি কায়সার ও কিসরার রাজপ্রাসাদ, রাজসিংহাসন এবং রাজমুকুট দলিত-মথিত হয়েছে। হিজরী ১৬ সনের রজব মাসে হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর এ সফর শুরু হয়। এর কিছুদিন পূর্বেই মুসলিম বাহিনী মাদায়েন ও ইনতাকিয়া দখল করেছিল। সফরে রওয়ানা হওয়ার পূর্বেই তিনি এ সম্পর্কে দামিশ্ক্ ও বায়তুল মুকাদ্দাসে অবস্থানরত মুসলিম বাহিনীর সেনাপতিদেরকে অবহিত করেন। বায়তুল-মুকাদ্দাসে পৌঁছার পর সর্বপ্রথম হযরত ইয়াযীদ ইব্ন আবূ সুফিয়ান (রা), তারপর হযরত আবূ উবায়দা ইব্ন জাররাহ্ (রা), তারপর হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। সুন্দর ও আকর্ষণীয় পোশাক পরিহিত অবস্থায় এসব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে দেখে তিনি যারপরনাই বিচলিত ও রাগান্বিত হন এবং বলে উঠেন : তোমরা দেখছি মাত্র দু'বছরের মধ্যেই অনারবদের সব ঠাট্বাট্ গ্রহণ করে নিয়েছ। কিন্তু যখন নেতৃবৃন্দ বললেন, আমাদের এ জাঁকজমকপূর্ণ ঢিলা

জামার নীচে যুদ্ধাস্ত্র লুক্কায়িত রয়েছে, অন্যথায় আমরা আরব চরিত্রের উপরই কায়েম আছি, তখন তিনি আশ্বস্ত হন।

খ্রিস্টানদের জন্য নিরাপত্তা সনদ

হযরত ফারূকে আযম (রা) জাবিয়াহ্ নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করেন। সেখানেই বায়তুল মুকাদ্দাসের নেতৃবর্গ তাঁর সাথে মিলিত হন এবং তিনি তাদের জন্য নিম্নবর্ণিত নিরাপত্তা সনদ লিখে দেন।

এ হলো সেই নিরাপত্তা সনদ, যা আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর ফারূক (রা) ইলিয়াবাসীদের জন্য প্রদান করছেন। তার মাধ্যমে ইলিয়াবাসীদের জান, মাল, গির্জা, ক্রুশ সবকিছুকে এবং সুস্থ-অসুস্থ সকল মানুষকে নিরাপত্তা প্রদান করা হলো। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীকেও নিরাপত্তা প্রদান করা হলো। ঐ সমস্ত গির্জাকে আবাসস্থলে পরিণত করা হবে না, ধ্বংস করা হবে না, এমন কি সেগুলোর সীমানা প্রাচীরও নষ্ট করা হবে না। ধর্মীয় ব্যাপারে কোনরূপ বাড়াবাড়ি করা যাবে না এবং কেউ কারো ক্ষতি করতে পারবে না। ইলিয়ায় ওদের (খ্রিস্টানদের) সাথে ইয়াহূদীরা থাকতে পারবে না। ইলিয়াবাসীদের কর্তব্য হলো, জিযিয়া প্রদান করা এবং গ্রীকদেরকে দেশ থেকে বের করে দেওয়া। তবে গ্রীক তথা রোমানদের মধ্য থেকে যারা শহর ছেড়ে চলে যাবে, তাদের জানমালের নিরাপত্তা প্রদান করা হবে, যতক্ষণ না তারা একটা নিরাপদ স্থানে পৌঁছে যায়। যদি কোন রোমান ইলিয়ায় থাকা পসন্দ করে তাহলে তাকে শহরের অন্যান্য নাগরিকদের মত জিযিয়া দিতে হবে। আর যদি ইলিয়াবাসীদের কেউ রোমানদের সাথে চলে যেতে চায়, তাহলে তারও নিরাপত্তা প্রদান করা হবে, যতক্ষণ না সে একটা নিরাপদ স্থানে পৌঁছে। যা কিছু এ নিরাপত্তা সনদে লিপিবদ্ধ করা হলো, তার দায়-দায়িত্ব মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় রাসূল, খুলাফায়ে রাশিদীন এবং সমগ্র মুসলমানগণের উপর বর্তাবে, তবে তা এ শর্তে যে, ইলিয়াবাসীরা নির্ধারিত জিযিয়া পরিশোধ করতে কখনো অস্বীকার করবে না।

ঐ নিরাপত্তা সনদের উপর সাক্ষী হিসাবে স্বাক্ষর করেন হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা), হযরত আমর ইব্ন 'আস (রা), আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা) ও মুআবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ান (রা)। বায়তুল-মুকাদ্দাসবাসীরা অবিলম্বে জিযিয়া প্রদান করে শহরের দরজা খুলে দেয়। এভাবে রামাল্লাহ্বাসীরাও চুক্তির মাধ্যমে তাদের শহরটি মুসলমানদের হাতে সোপর্দ করে। হযরত ফারূকে আযম (রা) খালি পায়ে বায়তুল্-মুকাদ্দাসে প্রবেশ করেন। তিনি সর্বপ্রথম মসজিদে আকসায় যান। মিহ্‌রাবে দাউদে পৌঁছে সিজদা-ই-দাউদের আয়াত পড়ে সিজদা করেন। তারপর খ্রিস্টানদের গির্জায় যান এবং তা পরিদর্শন করে ফিরে আসেন। বায়তুল-মুকাদ্দাস জয়ের পর হযরত ফারূকে আযম (রা) ফিলিস্তীন প্রদেশকে দু'ভাগে বিভক্ত করে এক ভাগের উপর হযরত আলকামা ইব্ন হাকীম (রা)-কে কর্মকর্তা নিয়োগ করেন এবং তাঁকে রামাল্লায় অবস্থানের নির্দেশ দেন। অপর ভাগের কর্মকর্তা নিয়োগ করেন হযরত আলকামা ইব্ন মুহরিয (রা)-কে এবং তাঁকে বায়তুল-মুকাদ্দাসে অবস্থানের নির্দেশ দেন।

তিকরীত ও জাযীরা বিজয়

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে হিজরী ২৬ সনের রজব পর্যন্ত সিরিয়া ও ইরাকে সংঘটিত ইসলামের ইতিহাদের ঘটনা সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা করা যাবে। এবার রোম ও ইরানের অন্যান্য

ঘটনা বর্ণনার পূর্বে তিকরীত বিজয় ও মুসলিম বাহিনী কর্তৃক জাযীরা প্রদেশ দখলের ঘটনাবলী বর্ণনা করা প্রয়োজন। কেননা, তিকরীতে রোমান ও ইরানী বাহিনী সম্মিলিতভাবে মুসলমানদের মুকাবিলা করেছিল। অনুরূপভাবে মুসলমানদের ইরাকী ও সিরীয় উভয় বাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণে জাযীরা মুসলমানগণের দখলে এসেছিল। তাছাড়া উল্লিখিত ঘটনাসমূহের পরপরই তিকরীত ও আল-জাযীরার ঘটনাবলী ঘটেছিল।

তিকরীতে একজন ইরানী সুবাদার (প্রাদেশিক শাসনকর্তা) থাকতেন। তিনি যখন শুনলেন, মুসলমানগণ মাদায়েন দখল করে নিয়েছে, তখন তিনি রোমানদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। যেহেতু রোমানদের উপরও মুসলিম বাহিনী আঘাত হেনেছিলো তাই ওরা সহজেই ঐ সীমান্তবর্তী সুবাদারের সাহায্যে এগিয়ে আসে। সাথে সাথে আয়াদ, তাগলিব, নাহার প্রভৃতি আরব বংশোদ্ভূত খ্রিস্টান গোত্রগুলোও রোমানদের প্ররোচনায় তিকরীতের শাসকের সাথে যোগ দেয়। হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর নির্দেশ অনুযায়ী হযরত সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুতঈমকে পাঁচ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনীসহ তিকরীতের দিকে প্রেরণ করেন। ইসলামী বাহিনী তিকরীত ঘেরাও করে ফেলে। এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর রোমান ও ইরানীরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। আরব বংশোদ্ভূত অধিকাংশ গোত্রই ইসলাম গ্রহণ করে। অতি অল্প সংখ্যক ইরানী ও রোমান সৈন্য পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। বাকীরা ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারায়। এ যুদ্ধে এত বিরাট পরিমাণ 'মালে গনীমত' মুসলমানদের হস্তগত হয় যে, খুমূস (রাষ্ট্রীয় পঞ্চমাংশ) বের করে নিয়ে যখন অবশিষ্ট মাল-সম্পদ মুজাহিদের মধ্যে বন্টন করা হয়, তখন একজন অশ্বারোহীর ভাগে পড়ে তিন তিন হাজার দিরহাম।

জাযীরা প্রদেশ কখনো রোমান সাম্রাজ্যের প্রভাবাধীন থাকত, আবার কখনো ইরানী সাম্রাজ্যের অধিকারে চলে যেত। জাযীরাবাসীরা ইসলামী বিজয় অভিযানের পর্যালোচনা করে হিরাক্লিয়াসের কাছে লিখলো : আপনি সিরিয়ার পূর্ব সীমান্তের শহরসমূহের দিকে নিরাপত্তা বাহিনী প্রেরণ করুন। আমরা সকলে মিলে আপনাকে ও আপনার বাহিনীসমূহকে সাহায্য করবো। হিরাক্লিয়াস জাযীরাবাসীদের এ আবেদনকে একটি গাইবী মদদ মনে করে পূর্ব সীমান্তবর্তী শহরসমূহের দিকে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। হযরত ফারূকে আযম (রা) এ পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার সাথে সাথে হযরত সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-কে লিখেন : জাযীরাবাসীদেরকে প্রতিরোধ কর, যেন তারা বাইরে বেরিয়ে আসতে না পারে। অপর দিকে হযরত আবূ উবায়দা (রা)-কে লিখেন : কায়সারের বাহিনী রুখে রাখ, যাতে তারা হিমস্ ও কানসারীনের দিকে অগ্রসর হতে না পারে। ইরানী ও সিরীয় উভয় বাহিনী-ই যেন নিজ নিজ দায়িত্ব সুষ্ঠভাবে পালন করে। ফলে কয়েকটি ছোট খাটো যুদ্ধের পর সমগ্র জাযিরা প্রদেশ, হযরত আয়াস ইব্‌ন গানাম (রা)-এর নেতৃত্বে মুসলিম অধিকারে চলে আসে। এ হলো হিজরী ১৭ সনের ঘটনা।

ইয়াদ গোত্রের প্রত্যাবর্তন

ঐ বছর যখন সমগ্র জাযীরা প্রদেশ মুসলমানগণের অধিকারভুক্ত হয় তখন ইয়াদ নামক সেখানকার একটি খ্রিস্টান স্বেচ্ছায় স্বদেশ ছেড়ে হিরাক্লিয়াসের দেশে চলে যায় এবং সেখানে বসতি স্থাপন করে। হযরত ফারূকে আযম (রা) এ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর হিরাক্লিয়াসকে লিখেন :

আমার কাছে এ সংবাদ পৌঁছেছে, আরব বংশোদ্ভূত একটি গোত্র আমাদের দেশ ছেড়ে তোমাদের শহরসমূহে চলে গেছে। যদি তুমি ঐ আরবদেরকে তোমার দেশ থেকে বের করে না দাও তাহলে আমাদের দেশে যত খ্রিস্টান বসবাস করছে আমরা তাদের সকলকেই দেশ ছাড়া করে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেব।

হিরাক্লিয়াস হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর এ পত্র পাঠমাত্র ইয়াদ গোত্রের যে চার হাজার লোক তার এলাকায় অবস্থান করছিল, তাদের সকলকে সেখান থেকে বের করে দেন। তারা সিরিয়া ও জাযীরায় ফিরে এসে পুনরায় বসতি স্থাপন করে। হযরত ফারূকে আযম (রা) ইরাকের অনারব এলাকার উপর হযরত হাবীব ইব্‌ন মাসলামাহ (রা)-কে এবং আরব এলাকার উপর হযরত ওয়ালীদ ইব্‌ন উক্‌রা (রা)-কে ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা নিয়োগ করেন। আরব বংশোদ্ভূত ইয়াদ গোত্রের খ্রিস্টানরা দেশে ফিরে এলে তিনি হযরত ওয়ালীদ ইব্‌ন উকবা (রা)-কে লিখেন : এদেরকে ইসলাম গ্রহণের জন্য বাধ্য করো না। যদি তারা জিযিয়া দিতে সম্মত হয় তাহলে তা গ্রহণ কর। যে এলাকায় শুধু মাত্র ইসলাম গ্রহণ ছাড়া অন্য কিছুর আবেদন গ্রহণ করা হবে না, তা হলো পবিত্র মক্কা মদীনার মধ্যবর্তী আরব উপদ্বীপ এবং ইয়ামেন! তবে তাদেরকে এ শর্তটি অবশ্যই মানতে হবে যে, যে সমস্ত ছেলে মেয়ের পিতামাতা মুসলমান হয়ে গেছে তাদেরকে তারা খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করতে পারবে না। অর্থাৎ যে সন্তানাদির পিতামাতা মুসলমান হয়েছেন তাদেরকে যেন তারা খ্রিস্টান বানাবার চেষ্টা না করে এবং যে মুসলমান হতে চায় তাকে যেন বাধা প্রদান না করে।

হযরত ওয়ালীদ ইব্‌ন উকবাহ (রা) হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর ঐ নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। কিছু দিন পর ইয়াদ গোত্রের একটি প্রতিনিধিদল পবিত্র মদীনায় এসে আবেদন জানায়, যেন জিযিয়া হিসাবে কোন অর্থ তাদের কাছ থেকে আদায় করা না হয়। হযরত ফারূকে আযম (রা) তাদের ঐ আবেদন মঞ্জুর করেন এবং তাদের কাছ থেকে 'সাদাকাত' নামে জিযিয়ার দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ আদায় করার জন্য ওখানকার কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেন। ইয়াদ গোত্রও হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর ঐ নির্দেশ সানন্দে মেনে নেয়। কিছুদিন পর ইয়াদ গোত্র হযরত ওয়ালীদ ইব্‌ন উকবা (রা)-এর বিরুদ্ধে অভিযাগ পেশ করলে হযরত ফারূকে আযম (রা) তাকে পদচ্যুত করে হযরত ফুরাত ইব্‌ন হাইয়ান (রা) ও হযরত হিন্দ ইব্‌ন উমর জামালী (রা)-কে সেখানকার কর্মকর্তা নিয়োগ করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, জাযীরা বিজয়কে কোন কোন ঐতিহাসিক সিরিয়ার বিজয় অভিযানসমূহের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। মোটকথা, হযরত আয়ায ইব্‌ন গানাম (রা) হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) (যিনি আয়ায ইব্‌ন গানামের সাহায্যে এসেছিলেন) হযরত আবূ উবায়দা (রা)-এর বাহিনী তথা সিরীয় বাহিনী থেকেই এসেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, জাযীরা বিজয়কে সিরিয়া ইরাক-উভয় দেশেরই বিজয় অভিযানসমূহের অন্তর্ভুক্ত মনে করতে হবে।

হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর পদমর্যাদা হ্রাস

সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে যে, হযরত ফারূকে আযম (রা) খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েই হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-কে পদচ্যুত করেছিলেন। কিন্তু তা মানুষের বুঝার ভুল। প্রকৃতপক্ষে হযরত ফারূকে আযম (রা) তখন হযরত খালিদ (রা)-এর পদমর্যাদা কিছুটা হ্রাস করেছিলেন মাত্র। প্রথমে হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) ছিলেন প্রধান

সেনাপতি। হযরত ফারূকে আযম (রা) তাকে উপপ্রধান সেনাপতির মর্যাদায় নামিয়ে দেন। একটি স্তর নামিয়ে দেওয়ার কারণে তার দায়-দায়িত্বে খুব একটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়নি। এতে শুধুমাত্র এ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছিল যে, তিনি ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশীমতো মুসলিম বাহিনীকে কোন আশংকাজনক অবস্থায় ফেলতে পারতেন না। যে কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে হযরত আবূ উবায়দা (রা)-এর মতামত বা অনুমোদন তাকে নিতে হত। হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)-এর পদচ্যুতির মূল ঘটনা হিজরী ১৭ সনের শেষ মাসগুলোতে ঘটে।

ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, হযরত ফারূকে আযম (রা) মুসলিম বাহিনীর প্রত্যেক সেনাপতি, মুসলিম অধিকৃত প্রত্যেকটি অঞ্চলের কর্মকর্তা, প্রত্যেকটি সেনাদল এবং প্রত্যেকটি শহরের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত থাকতেন। তার গোপন সংবাদদাতারা প্রত্যেকটি বাহিনী এবং প্রত্যেকটি শহরেই মোতায়েন ছিল। তারা সব সময় খলীফাকে প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে অবহিত রাখত। অথচ প্রত্যেক কর্মকর্তা ও প্রত্যেক সেনাপতিও নিজ নিজ অবস্থা সম্পর্কে ফারূকে আযম (রা)-কে যথারীতি অবহিত রাখতেন। ফারূকে আযম (রা)-কে তার একজন গোপন সংবাদদাতা এ মর্মে সংবাদ দেয় যে, হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) জাযীরা বিজয়ের পর অতি সম্প্রতি সিরিয়ায় প্রত্যাবর্তন করেছেন। হযরত ফারূকে আযম (রা) সঙ্গে সঙ্গে হযরত আবূ উবায়দা ইব্ন জাররাহ্ (রা)-কে লিখেন : তুমি খালিদকে ভরা মজলিসে জিজ্ঞেস কর, তুমি আশআছকে যে পুরস্কার দিয়েছ তা কি নিজের পকেট থেকে দিয়েছ, না বায়তুল মাল থেকে দিয়েছ? যদি সে তার পকেট থেকে দিয়ে থাকে তাহলে তা নির্ঘাত অপব্যয়। আর যদি বায়তুল মাল থেকে দিয়ে থাকে তাহলে তা খিয়ানত ও অবিশ্বস্ততা বৈ কিছু নয়। উভয় অবস্থায়ই সে পদচ্যুত হওয়ার যোগ্য। তুমি খালিদের পাগড়ী খুলে তা তার গলায় বেঁধে দাও। দূতকে হযরত ফারূকে আযম (রা) আরো বলে দিয়েছিলেন, যদি খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ নিজের ভুল স্বীকার করে নেয় তাহলে তাকে যেন ক্ষমা করে দেওয়া হয়। যাহোক, হযরত খালিদ (রা)-কে জনসমাবেশে ডেকে পাঠানো হয়। হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর দূত তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি এ পুরস্কার কোথা থেকে দিয়েছেন ? হযরত খালিদ (রা) একথা শুনে চুপ থাকলেন, নিজের ত্রুটি স্বীকার করতে রাযী হলেন না। বাধ্য হয়ে দূত তাঁর পাগড়ী খুলে তাঁর গলায় বেঁধে দিলেন। তারপর পুনরায় একই প্রশ্ন করলেন। তখন হযরত খালিদ (রা) বললেন, আশআছকে আমি আমার পকেট থেকেই দিয়েছি, বায়তুল মাল থেকে দিই নি। দূত একথা শুনে হযরত খালিদ (রা)-এর গলা থেকে পাগড়ী খুলে দিলেন এবং পবিত্র মদীনায় গিয়ে হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর কাছে সব ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। তখন হযরত ফারূকে আযম (রা) হযরত খালিদ (রা)-কে জবাবদিহির জন্য পবিত্র মদীনায় তলব করেন। হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) খলীফার দরবারে হাযির হয়ে বললেন, 'হে উমর! আল্লাহ্র কসম, আপনি আমার সম্পর্কে ন্যায় বিচার করেন নাই। হযরত ফারূকে আযম (রা) বললেন, আপনার কাছে এত ধন-সম্পদ এল কোত্থেকে? আর কোত্থেকেই বা আপনি একজন কবিকে এত বিরাট পরিমাণ পুরস্কার দিলেন ? হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) জবাবে বললেন, আমি আমার ভাগে যে মালে গনীমত পেয়েছিলাম তা থেকেই এ পুরস্কার দিয়েছি। তারপর হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) বললেন, ষাট হাজারের অধিক যে অর্থ আমার কাছে আছে তা আমি বায়তুল মালে জমা দিলাম। হিসাব করে দেখা গেল, বিশ হাজারের কিছু অধিক মুদ্রা তাঁর হাতে

রয়েছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সে অর্থ বায়তুল মালে জমা দিয়ে দেন। এখানেই উভয়ের মধ্যকার যাবতীয় ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটে। হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) সম্পর্কে প্রথম থেকেই এ অভিযোগ ছিল যে, তিনি সামরিক আয়-ব্যয়ের হিসাবাদি ঠিকমত রাখেন না এবং সম্পূর্ণ হিসাব বুঝিয়েও দেন না। আর তা এ কারণে যে, তিনি বেহিসাব খরচ করেন। অনেক অর্থ তিনি এমনভাবেও খরচ করেন, যা কোন নিয়ম বা বিধানের আওতায় পড়ে না। এ কারণে হযরত ফারূকে আযম (রা) পদমর্যাদা কিছুটা হ্রাস করে দিয়েছিলেন। এবারকার ঘটনা আরো বেশি আপত্তিকর ছিল বিধায় তিনি তাকে রাজধানীতে ডেকে পাঠিয়ে কিছুটা কড়া ভাষায় সতর্ক করে দেন।

বসরা ও কূফা

হিজরী ১৪ সন থেকে হযরত ফারূকে আযমের কাছে প্রেরিত ইসলামী বাহিনীর সেনাপতিগণের রিপোর্ট এবং ইরাকের দিক থেকে আগত সৈন্যদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এ বিষয়টি মোটামুটিভাবে জানা হয়ে গিয়েছিল যে, ইরাকের আবহাওয়া আরবগণের স্বাস্থ্যের অনুকূল নয়। এ প্রেক্ষিতে হযরত ফারূকে আযম (রা) নির্দেশ জারি করেন, যেন আরববাসিগণের জন্য এমন জায়গায় সেনাছাউনি নির্মাণ করা হয়, যেখানকার আবহাওয়া আরব এলাকার আবহাওয়ার অনুরূপ এবং আরবগণের স্বাস্থ্যের অনুকূল, যাতে করে মুজাহিদগণ যুদ্ধের ফাঁকে ফাঁকে যখন কিছুটা অবসর পান, তখনি ঐ সমস্ত সেনাছাউনিতে গিয়ে বিশ্রাম গ্রহণ করতে পারেন। ঐ সময়ে দজলার সন্নিকটে বসরা শহর প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং সেখানে একটি সেনাছাউনি নির্মাণ করা হয়। ঐ ছাউনিতে খড় বিচালির চালার নীচেই সৈন্যগণ বসবাস করতেন এবং যখন তাঁরা কোন অভিযানে বের হতেন, তখন আগুন লাগিয়ে ঐ চালাগুলো পুড়িয়ে ফেলতেন। অভিযান শেষে যখন আবার সেখানে ফিরে আসতেন, তখন প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন ভাবে চালা তৈরী করে নিতেন। হিজরী ১৭ সনে হযরত ফারূকে আযম (রা) বসরায় গৃহাদি নির্মাণ করেন এবং কূফায়ও একটি সেনাছাউনি স্থানের আবহাওয়া আরবগণের স্বাস্থ্যের খুবই অনুকূল প্রমাণিত হওয়ায় অল্প কিছু দিনের মধ্যেই কূফা ও বসরা ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির দু'টি কেন্দ্রে পরিণত হয়।

আহওয়ায বিজয় এবং হরমুযানের ইসলাম গ্রহণ

ইরানের প্রখ্যাত নেতা হরমুযান কাদিসিয়ার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে আহওয়ায প্রদেশের রাজধানী খুজিস্তানে গিয়ে পৌঁছেন এবং ঐ এলাকার শহরগুলোর উপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে সৈন্য সংগ্রহে মনোনিবেশ করেন। ধীরে ধীরে তিনি ঐ এলাকার উপর আপন রাজ্যের সীমা সম্প্রসারিত করতে থাকেন। কূফা ও বসরার সেনাছাউনি থেকে মুসলিম বাহিনী তার উপর হামলা চালায় এবং হরমুযান শোচনীয় ভাবে পরাজিত হন। শেষ পর্যন্ত আহওয়ায প্রদেশের উপর নিজের দখল অব্যাহত রাখার জন্য হরমুযান জিযিয়া প্রদানের শর্তে মুসলমানগণের সাথে সন্ধি করেন। কিন্তু কিছুদিন পরই তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং 'সূকে আহ্ওয়ায' নামক স্থানে মুসলমানগণের হাতে পরাজিত হয়ে 'রাম হরমুয' নামক স্থানে গিয়ে আশ্রয় নেন। এবারও হরমুযান অনন্যোপায় হয়ে সন্ধির আবেদন জানান। মুসলমানগণ শেষ পর্যন্ত বাকী এলাকা হরমুযানের দখলে ছেড়ে দিয়ে জিযিয়া শর্তে তার সাথে সন্ধি করে। আহওয়ায বিজেতা হযরত হরকূম ইব্ন মুহায়র সা'দী (রা) আহওয়ায পর্বতে তাঁবু স্থাপন করে

আহওয়ায এলাকার ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরসমূহ পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু করেন। ঐ সময়ে এ মর্মে সংবাদ আসে যে, পারস্য সম্রাট ইয়াযদেজিরদ একটি বিরাট বাহিনী গঠন করে মুসলমানগণের উপর আক্রমণ পরিচালনার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেছেন।

এ সংবাদ পেয়ে হযরত ফারূকে আযম (রা) হযরত সা'আদ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-কে লিখেন : এ আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য বিভিন্ন দিকে ও বিভিন্ন পথে ইসলামী বাহিনী মোতায়েন কর। সে অনুযায়ী হযরত সা'আদ (রা) সাবধানবশত একটি বাহিনী হরমুযানের মুকাবিলায় রাম হরমুযানেও মোতায়েন করেন। কেননা, হরমুযানও ইয়াযদেজিরদের নির্দেশ পালন ও তার সংকল্প বাস্তবায়নে সচেষ্ট ছিলেন। হরমুযান তার বাহিনী নিয়ে মুসলিম বাহিনীর মুকাবিলা করেন কিন্তু তাকে শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করতে হয়। মুসলমানগণ রাম হরমুযান দখল করে নেয়। হরমুযান পরাজিত ও পর্যুদস্ত অবস্থায় তাশতর নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছেন এবং মুসলমানগণের বিরুদ্ধে পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করতে থাকেন। তিনি তাশতর দুর্গ পুনর্নির্মাণ করেন, চতুর্দিকে পরিখা খনন করেন এবং টাওয়ারগুলো মজবুত ও সুদৃঢ় করেন। ইরানী বাহিনীর সৈন্যরাও তার কাছে সমবেত হতে থাকে। এ পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার সাথে সাথে হযরত ফারূকে আযম (রা) হযরত আবূ মূসা (রা)-কে বসরার সমগ্র বাহিনীর সেনাপতি করে পাঠান।

হযরত আবূ মূসা (রা) তাশতরের দিকে অগ্রসর হন এবং 'হারকাত' নামক স্থানের নিকটবর্তী হয়ে ইরানীদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন। হরমুযান কয়েকবারই মুসলমানগণের মুখোমুখি হন, কিন্তু টিকতে না পেরে শেষ পর্যন্ত তাশ্তর দুর্গে আশ্রয় নিয়ে সেখান থেকেই মুসলিম বাহিনীকে প্রতিহত করার চেষ্টা করেন। অনেকগুলো সংঘর্ষের পর তাশতর মুসলমানগণের দখলে আসে। হরমুযান তাশতর দুর্গে আশ্রয় নেন। দুর্গটির উপরও মুসলমানগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এমন সময় হরমুযান হযরত আবূ মূসা (রা)-এর কাছে এ মর্মে আবেদন পেশ করেন যে, তিনি নিজেই মুসলমানগণের হাতে নিজেকে সমর্পণ করবেন, তবে এ শর্তে যে, তাকে হযরত ফারূকে আযমের (রা) কাছে পাঠাতে হবে এবং তার ব্যাপারটি খলীফার সিদ্ধান্তের উপর ছেড়ে দিতে হবে। হযরত আবূ মূসা (রা) তার এ শর্ত মেনে নেন। হরমুযানকে হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা), হযরত আহনাফ ইব্ন কায়স (রা) প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তির এক প্রতিনিধিদলের সাথে মদীনা শরীফে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মদীনা শরীফের নিকটবর্তী হয়ে হরমুযান তার মণিমুক্তা খচিত মুকুট এবং জাঁকজমক পূর্ণ পোশাক পরিধান করেন। হযরত ফারূকে আযম (রা) এতবড় একজন সর্দারকে যখন এভাবে বন্দী অবস্থায় দেখতে পান, তখন তিনি মহান আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করেন। তারপর তিনি হরমুযানকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি বহুবার তোমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছ। এখন বলো, তোমার সাথে কিরূপ আচরণ করা হবে? এ সম্পর্কে তোমার কোন ওযর-আপত্তি থাকলেও অনায়াসে বলতে পার। হরমুযান বললেন, আমি আশংকা করছি, না জানি আমার ওযর-আপত্তির কথা না শুনেই আপনি আমাকে হত্যা করে ফেলেন। হযরত ফারূকে আযম (রা) বললেন, না, তুমি সে আশংকা করো না। তোমার ওযর-আপত্তি অবশ্যই শোনা হবে। তারপর হরমুযান পানি চাইলেন এবং পানির পাত্র হাতে নিয়ে বললেন, আমি আশংকা করছি, না জানি পানি পান করার অবস্থায়ই আপনি আমাকে হত্যা করে ফেলেন। হযরত ফারূকে আযম (রা) বললেন, তুমি মোটেই ভয় করো না। যতক্ষণ

পর্যন্ত তুমি পানি পান না কর, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার কোন ক্ষতি করা হবে না। একথা শোনার সাথে সাথে হরমুযান হাত থেকে পাত্রটি রেখে দেন এবং বলেন, আমি পানি পান করবো না। আর এ শর্ত অনুযায়ী আপনি আমাকে হত্যাও করতে পারেন না। কেননা, আপনি আমাকে নিরাপত্তা দান করেছেন।

হযরত উমর (রা)-এর চমৎকার ব্যবহার

হরমুযানের কথা শুনে হযরত ফারূকে আযম (রা) বললেন, তুমি মিথ্যা কথা বলছ, আমি তোমাকে নিরাপত্তা দান করিনি। কিন্তু হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! হরমুযান সত্য কথাই বলেছে। আপনি তো এই মাত্র বলেছেন তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত সম্পূর্ণ অবস্থা বর্ণনা না কর এবং পানি পান না কর ততক্ষণ তোমার ভয়ের কোন কারণ নেই। হযরত ফারূকে আযম (রা) একথা শুনে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে যান। তিনি হরমুযানকে সম্বোধন করে বলেন, তুমি আমাকে ধোঁকা দিয়েছ, কিন্তু আমি তোমাকে ধোঁকা দেব না। এটাই সমীচীন যে, তুমি মুসলমান হয়ে যাও। হরমুযান তখন তখনই কালিমায়ে তাইয়িবা পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেলেন। এতে হযরত ফারূকে আযম (রা) অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। তিনি হরমুযানকে মদীনায়ে তাইয়িবাতে বসবাসের ব্যবস্থা করে দেন এবং দু'হাজার দীনার তার বার্ষিক ভাতা মঞ্জুর করেন। তখন থেকে হযরত ফারূকে আযম (রা) পারস্য অভিযানের সময় প্রায়ই হরমুযানের পরামর্শ নিতেন। তারপর হযরত ফারূকে আযম (রা) হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা), হযরত আহনাফ ইব্‌ন কায়স (রা) প্রমুখ প্রতিনিধি দলের সদস্যগণকে সম্বোধন করে বললেন, সম্ভবত আপনারা যিম্মীদের সাথে ভাল ব্যবহার করেন না, তাই ওরা বারবার বিদ্রোহী হয়ে উঠে। একথা শুনে হযরত আহনাফ ইবন কায়স (রা) বলেন, 'হে আমীরুল মু'মিনীন! আমরা সর্বদা আমাদের প্রতিশ্রুতি পালন করি এবং যিম্মীদের সাথে অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করি। তাদের বার বার বিদ্রোহী হয়ে উঠার মূল কারণ, আপনি আমাদেরকে পারস্য ভূখণ্ডের দিকে আরো অগ্রসর হতে নিষেধ করেছেন। পারস্যের বাদশাহ্ ইয়াযদেজিরদ পারস্য শহরসমূহে বিদ্যমান। আর যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি পারস্য ভূখণ্ডে জীবিত ও নিরাপদ থাকতেন, ততক্ষণ পর্যন্ত পারস্যবাসীরা আমাদের মুকাবিলা থেকে কখনো নিরস্ত হবে না। হযরত ফারূকে আযম (রা) হযরত আহনাফ (রা)-এর কথার যৌক্তিকতা স্বীকার করেন এবং এরপর থেকে ইসলামী বাহিনীকে পারস্য ভূখণ্ডের দিকে এগিয়ে যাবার অনুমতি প্রদান করেন।

মিসর বিজয়

হযরত ফারূকে আযম (রা) বায়তুল মুকাদ্দাসে যান, তখন হযরত আমর ইব্‌ন 'আস (রা) তার কাছ থেকে মিসর অভিযানের অনুমতি আদায় করে নেন। উপরন্তু হযরত ফারূকে আযম (রা) হযরত যুবায়র ইব্‌ন আওয়াম (রা)-কে হযরত আমর ইব্‌ন 'আস (রা)-এর সাহায্যকারী বাহিনীর সেনাপতি নিয়োগ করেন। হযরত আমর ইব্‌ন 'আস (রা) চার হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী নিয়ে মিসরের দিকে অগ্রসর হন এবং হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর নির্দেশ অনুযায়ী মিসরের বাদশাহ্ মুকাওকাসের কাছে নিম্নোক্ত লিপি প্রেরণ করেন : "হয় তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর, নয়ত জিযিয়া দাও, নয়ত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। এ সময় রোমান সেনাপতি আরতাবূন তাঁর সমগ্র বাহিনীসহ মিসরে অবস্থান করছিলেন। সর্বাগ্রে তিনি তাঁর বাহিনী নিয়ে মুসলমানগণের মুখোমুখি হন এবং পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। মুসলমানগণ আরো অগ্রসর হয়ে 'আইনে

শাম্‌স্‌' নামক স্থানটি ঘিরে ফেলে এবং সেখান থেকে মিসরের 'হিসার ফরমা' নামক সেনাছাউনি ও ইসকান্দারিয়া (আলেকজান্দ্রিয়া) ঘেরাও করার জন্য দু'টি সেনাদল প্রেরণ করেন। তিনটি স্থানেই বেশ কয়েকদিন পর্যন্ত সংঘর্ষ ও অবরোধ অব্যাহত থাকে। শেষ পর্যন্ত 'আহলে শাম্‌স্‌'বাসীরা জিযিয়া দানের শর্তে সন্ধি করে। সন্ধির পর হযরত আমর ইব্‌ন 'আস (রা) বন্দীদেরকে ফেরত দিতে অস্বীকার করেন, বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর কাছে পেশ করা হলে তিনি মিসরের সকল বন্দীকে মুক্ত করে দেওয়ার নির্দেশ দেন। তারপর হযরত আমর ইব্‌ন 'আস (রা) হযরত যুবায়র ইব্‌ন আওয়াম (রা)-কে সেনাপতি করে একটি বাহিনী ফুসতাতের দিকে প্রেরণ করেন। সেখানে একটি সুদৃঢ় দুর্গ ছিল। একটি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর মুসলমানগণ তা অধিকার করে নেয়। তারপর আমর ইব্‌ন 'আস (রা) ইস্কান্দারিয়া আক্রমণ করেন। তিন মাস অবরোধ করে রাখার পর ইস্কান্দারিয়াও মুসলমানগণের দখলে আসে। মিসরের বাদশাহ মুকাওকাস, যিনি তখন ইস্কান্দারিয়ায়ই অবস্থান করছিলেন, মুসলমানগণের সাথে এ মর্মে সন্ধি করেন যে, যে ব্যক্তি ইস্কান্দারিয়া থেকে চলে যেতে চায়, তাকে থাকতে দেওয়া হবে। ইসকান্দারিয়া বিজয়ের পর হযরত আমর ইব্‌ন 'আস (রা) তার সকল বাহিনীর সেনাপতিগণকে ইসকান্দারিয়ায় ডেকে পাঠিয়ে মিসরের বিভিন্ন শহর দখল এবং তথায় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োগ করেন। সমগ্র মিসর দখল এবং তথায় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পর তিনি 'তূবাহ্‌' জয়ের প্রতি মনোনিবেশ করেন।

নিহাওয়ান্দের যুদ্ধ

মাদায়েন ও জাল্‌লা জয়ের পর ইয়ায্‌দেজিরদ 'রাই' নামক স্থানে বসবাস করতে থাকেন। কিন্তু সেখানকার শাসনকর্তা আবান জাদভিয়া ইয়াযদেজিরদের এ অবস্থানকে তার রাষ্ট্রীয় অধিকার ও ক্ষমতার প্রতি হুমকিস্বরূপ মনে করে ইয়াযদেজিরদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে মনস্থ করে এবং যখন এর চিহ্নাদি প্রকাশ পায় তখন ইয়াযদেজিরদ 'রাই' থেকে ইসফাহান চলে যান। সেখানে কিছুদিন অবস্থান করার পর তিনি কিরমানের দিকে যাত্রা করেন। তারপর পুনরায় ইসফাহানে ফিরে আসেন। মুসলমানগণ যখন আহওয়ায প্রদেশ দখল করে নেন, তখন ইয়ায্‌দেজিরদ পূর্ব ইরান অর্থাৎ খুরাসানের মার্ভ শহরে চলে যান। সেখানে তিনি পূজা-অর্চনার উদ্দেশ্যে একটি অগ্নিকুণ্ড তৈরী করে নিশ্চিন্তভাবে বসবাস করতে থাকেন। তার ধারণা ছিল, আরবরা আর সম্মুখে অগ্রসর হবে না। কিন্তু মুসলিম বাহিনী কর্তৃক সমগ্র আহওয়ায দখল এবং হরমুযানকে বন্দী করে মদীনায় নিয়ে যাওয়ার সংবাদ যখন তার কানে গিয়ে পৌঁছে, তখন তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত তিনি সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করে মুসলমানগণের মূলোৎপাটনের উদ্দেশ্যে পুনরায় সেনা সংগ্রহে মনোনিবেশ করেন। তিনি বিভিন্ন অঞ্চলের শাসনকর্তা ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের কাছে চিঠি পাঠিয়ে মুসলমানগণের মুকাবিলায় তাদেরকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেন।

ইয়ায্‌দেজিরদের এ সমস্ত প্রচেষ্টার ফলে হঠাৎ যেন তাবারিস্তান, জুরজান, খুরাসান, ইসফাহান, হামাদান, সিন্ধু প্রভৃতি রাজ্যে ও প্রদেশে মুসলমানগণের বিরুদ্ধে ভীষণ রকমের যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। চতুর্দিক থেকে দলে দলে লোক এসে ইয়ায্‌দেজিরদের কাছে সমবেত হতে থাকে। ইয়ায্‌দেজিরদ ফিরূযকে (অপর বর্ণনা মতে মার্দান শাহকে) সেনাপতি নিয়োগ করে দেড় লক্ষ সৈন্যের একটি বিরাট বাহিনী নিহাওয়ান্দের দিকে প্রেরণ করেন। হযরত

ফারূকে আযম (রা)-এর কাছে যখন এ সংবাদ পৌঁছে, তখন ইরানী বাহিনীর মুকাবিলা করার জন্য তিনি স্বয়ং নিহাওয়ান্দের দিকে রওয়ানা হতে মনস্থ করেন। কিন্তু হযরত আলী, হযরত উসমান গনী এবং হযরত তাল্‌হা (রা) এ ব্যাপারে তার সাথে দ্বিমত পোষণ করায় তিনি নিজে যুদ্ধাভিযানে অংশ গ্রহণ না করে নু'মান ইব্‌ন মুকরিম (রা)-কে কূফায় অবস্থানকারী মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি নিয়োগ করেন এবং তাকে নির্দেশ দেন : তুমি কূফার নিকটবর্তী কোন জলাশয়ের ধারে অবস্থান গ্রহণ কর। ঐ সময়ে হযরত ফারূকে আযম (রা) হযরত সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-কে মদীনা শরীফে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। হযরত সা'দ (রা) তখন হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর সাথেই ছিলেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কূফায় কাকে আপনার স্থলাভিষিক্ত করে এসেছেন ? তিনি জবাবে বললেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উতবান (রা)-কে। তখন হযরত ফারূকে আযম হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উতবান (রা)-কে লিখেন : আপনি কূফার সেনাবাহিনীকে সংগঠিত করে হযরত হুযায়ফা (রা) ও ইব্‌ন ইয়ামান (রা)-এর নেতৃত্বে হযরত নাঈম ইব্‌ন মুকরিন (রা)-এর কাছে পাঠিয়ে দেন। উপরন্তু তিনি আহওয়াযে অবস্থানরত সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দেন : আপনারা ফারিস ও ইসফাহানের পথে প্রতিরোধ সৃষ্টি করুন, যাতে নিহাওয়ান্দবাসীদের কাছে ইরানী সাহায্য পৌঁছতে না পারে। হযরত নু'মান ইব্‌ন মুকরিন (রা)-এর কাছে যখন সৈন্যরা একত্র হলো, তখন তিনি তার ভাই হযরত নাঈম ইব্‌ন মুকরিন (রা)-কে অগ্রবাহিনীর, হযরত হুযায়ফাকে দক্ষিণ বাহিনীর এবং মুজাশি' ইব্‌ন মাসউদ (রা)-কে পশ্চাৎ বাহিনীর সেনাপতি নিয়োগ করেন। এ সমগ্র বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল ত্রিশ হাজার। মুসলিম বাহিনী কূফা থেকে রওয়ানা হয়ে নিহাওয়ান্দের দিকে এগিয়ে যায় এবং সেখান থেকে আট মাইল দূরত্বে অবস্থান নেয়। ইরানী বাহিনীও তাদের দিকে এগিয়ে আসে। ইরানী বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল দেড় লক্ষ।

বুধবার যুদ্ধ শুরু হয়ে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। তবু জয়-পরাজয়ের কোন ফায়সালা হয় নি। শুক্রবার দিন ইরানী বাহিনী পুনরায় শহর ও শহর-প্রাচীরের অভ্যন্তরে চলে যায়। তারা শহরের বহির্ভাগে লোহার কাঁটা বিছিয়ে রেখেছিল, যার কারণে ইসলামী বাহিনী শহরের প্রাচীরের ধারে কাছেও ঘেষতে পারছিল না। অথচ, ইরানীরা যখন ইচ্ছা দরজা দিয়ে বের হয়ে মুসলমানদের উপর হামলা চালিয়ে যাচ্ছিল। এ অবস্থা দেখে হযরত নু'মান (রা) মুসলিম বাহিনীর বিভিন্ন সেনাপতিকে পরামর্শের উদ্দেশ্যে ডেকে পাঠান। প্রত্যেকেই তাদের মতামত পেশ করেন। শেষ পর্যন্ত হযরত তুলায়হা ইব্‌ন খালিদ (রা)-এর পরামর্শ সকলের কাছেই গ্রহণীয় হয়। সে অনুযায়ী ইসলামী বাহিনী সশস্ত্র ও সুশৃঙ্খল অবস্থায় শহর থেকে ছয়-সাত মাইল পিছিয়ে গিয়ে এক জায়গায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে এবং হযরত কা'কা' (রা) একটি ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে শহরবাসীদের উপর হামলা চালান। একটি ক্ষুদ্র বাহিনী দেখে ইরানীরা সাহসী হয়ে উঠে এবং তাদের মুকাবিলার জন্য শহর থেকে বেরিয়ে পড়ে। হযরত কা'কা' (রা) ইরানীদের মুকাবিলা করতে করতে আস্তে আস্তে পিছনে হটতে থাকেন। ইরানীরা এ জয়ের খুশীতে দ্বিগুণ উৎসাহে মুসলমানগণকে হাঁকাতে হাঁকাতে দ্রুতবেগে এগিয়ে চলে। এভাবে অজান্তে তারা তাদের পরিখাসমূহ থেকে অনেক দূরে চলে যায় এবং মূল ইসলামী বাহিনীর নাগালের মধ্যে চলে আসে। এবার হযরত নু'মান ইব্‌ন মুকরিন (রা) এবং সমগ্র ইসলামী

বাহিনী এক সাথে তাকবীর ধ্বনি তুলে এমনভাবে ইরানী বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে যে, তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পলায়ন করতে শুরু করে এবং মুসলমানগণ নির্বিঘ্নে তাদেরকে হত্যা করতে থাকে। সংঘর্ষ চলাকালে হযরত নু'মান ইব্ন মুকরিন (রা) ভীষণভাবে আহত হয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে গেলে তার ভাই হযরত নাঈম ইব্ন মুকরিন (রা) সাথে সাথে তার (নু'মানের) পোশাক পরিধান করে ইসলামী পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরেন। ফলে মুসলিম বাহিনীর কেউই যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত জানতে পারে নি যে, তাদের প্রধান সেনাপতি শাহাদতবরণ করেছেন। ইরানী বাহিনী ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাবার সময় তাদেরই বিছানো লোহার কাঁটায়ই বিদ্ধ হতে থাকে। শুধু এ সমস্ত কাঁটায় বিদ্ধ হয়েই কয়েক হাজার ইরানী প্রাণ ত্যাগ করে। ইরানী সেনাপতি নিহাওয়ান্দ থেকে পলায়ন করেন। এবার পলায়নকারীরা হামাদানে এসে সমবেত হয়। হযরত নাঈম (রা) ও হযরত কা'কা' ওদের পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে শেষ পর্যন্ত হামাদান অবরোধ করে ফেলেন এবং তা অতি সহজেই মুসলমানগণের দখলে চলে আসে। হযরত নু'মান (রা)-এর শাহাদতের পর হযরত হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামান (রা) ইসলামী বাহিনীর প্রধান সেনাপতি মনোনীত হন। তিনি নিহাওয়ান্দে পৌঁছে মালে গনীমত একত্রিত করেন এবং সেখানকার অগ্নিকুণ্ডের আগুনও নিবিয়ে দেন।

জনৈক অগ্নিপূজারী পুরোহিত অতি মূল্যবান হীরা-জহরতে ভর্তি একটি ছোট সিন্দুক, যা তার কাছে শাহী আমানত স্বরূপ রাখা হয়েছিল, স্বয়ং হযরত হুযায়ফা (রা)-এর হাতে তুলে দেয়। হযরত হুযায়ফা (রা) গনীমত-সামগ্রী মুজাহিদগণের মধ্যে বণ্টন করেন এবং খুমুসের সাথে ঐ হীরা-জহরতের কাকনটিও হযরত সায়িব ইব্ন আকরা' (রা)-এর মাধ্যমে হযরত ফারূকে আযমের কাছে প্রেরণ করেন। হযরত সায়িব ইব্ন আকরা' (রা) হীরা-জহরত এবং সেই সাথে জয়ের সুসংবাদ নিয়ে পৌঁছেন। বেশ কয়েকদিন যাবত হযরত ফারূকে আযম (রা) মুসলিম বাহিনীর কোন সংবাদ না পেয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি সায়িবের মাধ্যমে বিজয় সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং হীরা-জহরতের সিন্দুকটি বায়তুল মালে জমা করে নেন। তিনি হযরত সায়িব (রা)-কে সঙ্গে সঙ্গে ফিরে যাবার নির্দেশ দেন। কিন্তু হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর একজন দূত তার পিছনে পিছনে কূফায় প্রবেশ করেন এবং তাকে পুনরায় মদীনা তাইয়িবাতে ফিরিয়ে নিয়ে যান। হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর হযরত সায়িব (রা)-কে বলেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, এ হীরা-জহরত রাখার কারণে ফেরেশতারা আমাকে ধমকাচ্ছে। কাজেই, এগুলো আমি বায়তুল মালে রাখব না। তুমি বরং এগুলো নিয়ে যাও এবং বিক্রি করে যে অর্থ পাবে তা মুসলিম বাহিনীর মধ্যে বণ্টন করে দাও। হযরত সায়িব (রা) কূফায় গিয়ে এ হীরা-জহরত হযরত আমর ইব্ন হুরায়স (রা) মাখযূমীর কাছে দু'লাখ দিরহামে বিক্রি করে দেন এবং মুসলিম বাহিনীর মধ্যে সে অর্থ বণ্টন করে দেন। পরে আমর ইব্ন হুরায়স এ হীরা-জহরত ফারিসে নিয়ে গিয়ে চার লাখ দিরহামে বিক্রি করেছিলেন। হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর হত্যাকারী আবূ লূলূ নিহাওয়ান্দের অধিবাসী ছিল এবং ঐ যুদ্ধেই সে মুসলমানগণের হাতে বন্দী হয়েছিল।

বিভিন্ন অনারব অঞ্চল অধিকার

নিহাওয়ান্দের পর হামাদান জয় করা হয়। কিন্তু কিছু দিন পরই হামাদানবাসীরা বিদ্রোহ করে। তারপর হযরত ফারূকে আযম (রা) ইরানের বিভিন্ন প্রদেশ ও বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য

এক-একজন সেনাপতি নিয়োগ করে তাঁদেরকে নির্দেশ দেন : 'একের পর এক দেশ জয় কর, তাতে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা কর, এবং আরও সামনের দিকে এগিয়ে যাও।' কাজেই, কূফা, বসরা উভয় ছাউনির সৈন্য ও সেনাপতিগণ সমগ্র ইরান দখলের কাজে মনোনিবেশ করেন। উপরোক্ত ঘটনাবলীর পর হিজরী ২১ সনে এ অগ্রাভিযানের সূচনা হয়। ইরানীদের নিত্যদিনের বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের কারণে হযরত ফারূকে আযম (রা) বাধ্য হয়ে এ নির্দেশ দিয়েছিলেন। অন্যথায় তার একান্ত বাসনা ছিল মুসলমানরা তাদের দখলকৃত এলাকা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকুক এবং এমন অবস্থায় বসবাস করুক যে, ইরানীদের পক্ষ থেকে কোনরূপ হামলার আশংকা নেই। মোটকথা, এবার সমগ্র ইরান দখলের কাজ শুরু হয়। প্রথম হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) ইস্পাহান জয় করেন। হযরত নাঈম ইব্ন মুকরিন (রা) এ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর রাই ও আযারবায়জান দখল করেন। নাঈম ইব্ন মুকরিন (রা)-এর ভাই হযরত সুওয়ায়দ ইব্ন মুকরিন (রা) কূমাস জয় করেন। ইতিপূর্বে মুসলমানগণের হাতে নিহত সেনাপতি রুস্তমের ভাই ইসকান্দিয়ার হযরত উকবা (রা)-এর হাতে বন্দী হন। তারপর জিযিয়া প্রদানের শর্তে জুরজান জয় করেন। তারপর সম্পূর্ণ তাবারিস্তান প্রদেশ মুসলমানগণের দখলে চলে আসে। হযরত বুকায়র (রা) আর্মেনিয়া জয় করেন। হযরত আবদুর রহমান ইব্ন রাবীআ (রা) 'বায়যা' নগরী এবং খাযার এলাকা মুসলমানগণের অধিকারে নিয়ে আসেন।

আসিম ইব্ন উমর (রা) হিজরী ২৩ সনে সীস্তান এবং সুহায়ল ইব্ন আদী (রা) কিরমান জয় করেন। হযরত হাকাম ইব্ন আমর তাগলী (রা) মাকরান অর্থাৎ বেলুচিস্তান রাজ্য দখল করেন। এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ইরানীদের ঐ করদরাজ্যের শাসক মুসলমানগণের হাতে পরাজিত হন। হযরত হাকাম ইব্ন আমর (রা) গনীমতরূপে প্রাপ্ত কয়েকটি হাতিসহ ঐ বিজয় সংবাদ হযরত সাহ্হার আবাদী (রা)-এর মাধ্যমে হযরত ফারূকে আযমের কাছে পাঠান। হযরত ফারূকে আযম (রা) হযরত সাহ্হার আবাদী (রা)-এর কাছ থেকে বিজিত অঞ্চলের যাবতীয় সংবাদ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর হযরত হাকাম বিন আমর (রা)-কে লিখেন : আপনারা যে পর্যন্ত পৌঁছেছেন সেখানেই থাকুন, আর সামনে অগ্রসর হবেন না।

ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, ইয়াযদেজিরদ খুরাসানের রাজধানী অর্থাৎ মার্ভে অবস্থান করছিলেন। হযরত ফারূকে আযম (রা) আহনাফ ইব্ন কায়স (রা)-কে খুরাসান জয়ের হুকুম দেন। তিনি প্রথমে হিরাত জয় করেন। তারপর মার্ভের দিকে অগ্রসর হন। ইয়াযদেজিরদ এ সংবাদ পেয়ে সেখান থেকে মার্ভেরূদ চলে যান। সেখান থেকে তিনি চীনের 'খাকান' (বাদশাহর উপাধি) ও অন্যান্য রাজা-বাদশাহদের কাছে চিঠি মারফত সাহায্যের আবেদন জানান। হযরত আহনাফ ইব্ন কায়স (রা) মার্ভ (মার্ভ শাহজাহান) দখল করে 'মার্ভেরূদ'-এর দিকে অগ্রসর হন। ইয়াযদেজিরদ সেখান থেকেও পলায়ন করেন এবং বল্খে গিয়ে আশ্রয় নেন। ইয়াযদেজিরদ যেহেতু খুরাসানে অবস্থান করছিলেন এবং সেখানে এক ভয়ানক সংঘর্ষের সম্ভাবনা ছিল, তাই ফারূকে আযম (রা) আহনাফ ইব্ন কায়স (রা)-এর সাহায্যার্থে কয়েকজন বাহাদুর সেনাপতির নেতৃত্বে বেশ কয়েকটি সেনাদল প্রেরণ করেন। এ সজীব সতেজ দলগুলো যখন হযরত আহনাফ ইব্ন কায়স (রা)-এর কাছে গিয়ে পৌঁছে, তখন তিনি সমগ্র বাহিনীকে নতুন ভাবে সজ্জিত করে বল্খের উপর আক্রমণ পরিচালনা করেন। তাতে ইয়াযদেজিরদ পরাজিত হয়ে তুর্কিস্তানের দিকে পলায়ন করেন। হযরত আহনাফ ইবন কায়স (রা) সমগ্র খুরাসান দখল করে

মার্ভের্রূদকে মুসলমানগণের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত করেন। যখন খুরাসান জয়ের সংবাদ হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর কাছে পৌঁছে, তখন তিনি হযরত আহনাফের (রা) এ বীরত্বপূর্ণ কাজের প্রশংসা করেন। তবে সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলেন, "হায়! যদি আমাদের ও খুরাসানের মধ্যে একটি আগুনের দরিয়া প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াত।" তাঁর এ কথার উদ্দেশ্য শুধু জয়ের বিস্তৃতি প্রশংসনীয় কিছু নয়, যদি না সেখানে শান্তি-শৃঙ্খলা কায়েম করা যায়। তিনি হযরত আহনাফ ইব্‌ন কায়স (রা)-কে লিখলেন, আপনি যেখানে পৌঁছেছেন সেখান থেকে আর অগ্রসর হবেন না।

ইয়ায্‌দেজিরদ যখন ফারগানায় গিয়ে খাকানের দরবারে হাযির হন, তখন খাকান তার প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করেন এবং একটি বিরাট বাহিনী নিয়ে ইয়ায্‌দেজিরদের সাথে খুরাসানের দিকে যাত্রা করেন। বলখ পর্যন্ত পৌঁছে খাকান মার্ভের্রূদের উপর হামলা চালান।

অপর দিকে ইয়ায্‌দেজিরদ হামলা চালান মার্ভে শাহজাহানের উপর। খাকান মার্ভের্রূদে, হযরত আহনাফ ইব্‌ন কায়স (রা)-এর কাছে পরাজিত হন। তার কয়েক জন বিখ্যাত সেনাপতিও মুসলমানগণের হাতে নিহত হয়। এবার খাকান ফারগানার দিকে যাত্রা করেন। এ খবর পেয়ে ইয়ায্‌দেজিরদ ও মার্ভে শাহজাহান থেকে অবরোধ উঠিয়ে তুর্কিস্তানের দিকে চলে যান। ইয়ায্‌দেজিরদের আমীর-উমরা ও সেনাপতিরা এবার সুযোগ বুঝে ইয়ায্‌দেজিরদের বিরুদ্ধে চলে যায় এবং তিনি যেসব হীরা-জহরত ও মূল্যবান দ্রব্য-সামগ্রী সঙ্গে নিয়ে তুর্কিস্তানের দিকে যাচ্ছিলেন তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়। এবার খাকান একেবারে শূন্যহস্তে ফারগানায় গিয়ে পৌঁছেন। এ জয়ের সুসংবাদ হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর কাছে যখন মদীনা তাইয়িবাতে গিয়ে পৌঁছে, তখন তিনি ঘোষণা দিয়ে সমগ্র শহরের জনসাধারণকে মসজিদে নববীতে একত্র করে একটি ভাষণ দেন, যার সারমর্ম ছিল নিম্নরূপ :

অগ্নি উপাসকদের সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটেছে। এখন, আর তারা তাদের দেশের এক বিঘত জমিরও মালিক হতে পারবে না এবং মুসলমানগণেরও কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

হে মুসলমানগণ! আল্লাহ্ তা'আলা আপনাদেরকে অগ্নি উপাসকদের ভূসম্পত্তি, তাদের রাজ্য এবং যাবতীয় ধন-সম্পদের অধিকারী করেছেন, যাতে এখন আপনাদের কাজকর্ম ও স্বভাব-চরিত্র যাচাই করতে পারে না। কাজেই, হে মুসলমানগণ! আপনারা আপনাদের চরিত্র পরিবর্তন করবেন না। অন্যথায় আল্লাহ্ তা'আলা আপনাদের কাছ থেকেও সাম্রাজ্য ছিনিয়ে নিয়ে অন্য কোন জাতির হাতে তুলে দেবেন।

এর কিছুদিন পরই হযরত ফারূকে আযম (রা) মদীনা তাইয়িবাতে শাহাদত বরণ করেন।

দুর্ভিক্ষ ও মহামারী

হিজরী ১৭ সনের শেষ দিনগুলোতে ইরাক, সিরিয়া ও মিসরে প্লেগ রোগ দেখা দেয় এবং হিজরী অষ্টাদশ সনের প্রথম দিকে তা মহামারী আকার ধারণ করে। সেই সাথে আরব ভূখণ্ডে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। খাদ্যশস্যের অভাবে দেশ জুড়ে হাহাকার উঠে। হযরত ফারূকে আযম (রা) দুর্ভিক্ষ দূরীকরণ এবং মানুষকে বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য আঞ্চলিক কর্মকর্তার কাছে দূত পাঠিয়ে মদীনাবাসীদের যথাসম্ভব খাদ্যশস্য পাঠাবার নির্দেশ দেন। এ নির্দেশ অনুযায়ী হযরত আমর ইব্‌ন 'আস (রা) মিসর থেকে বিশটি জাহাজ ভর্তি খাদ্যশস্য মদীনার দিকে প্রেরণ করেন। এ সমস্ত জাহাজের আগমন সংবাদ পেয়ে খোদ হযরত ফারূকে আযম

(রা)-এর নির্দেশে মদীনা শরীফ থেকে খাদ্যশস্য খালাস করে একটি সুরক্ষিত স্থানে রাখা হয় এবং অভাবগ্রস্তদের তালিকা তৈরী করে তাদের মধ্যে তা বিতরণ করা হয়। হযরত ফারূকে আযম (রা) এ মর্মে অঙ্গীকার করছিলেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ দুর্ভিক্ষ কবলিত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি কিছুতেই ঘি এবং দুধ নিজের আহার্য হিসাবে গ্রহণ করবেন না। খরার কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য হযরত ফারূকে আযম (রা) মদীনাবাসীদেরকে সঙ্গে নিয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরে ইস্‌তিসকার নামায আদায় করেন। নামাযান্তে দু'আর জন্য হাত উঠান এবং দু'আ শেষ হওয়ার পূর্বেই বৃষ্টি বর্ষিত হতে থাকে। সিরিয়ায় মহামারীরূপে প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে জানতে পেরে হযরত ফারূকে আযম স্বয়ং সিরিয়ার ইসলামী বাহিনীর দিকে রওয়ানা হন। তিনি যখন 'সারাগ' নামক স্থানে পৌঁছেন তখন হযরত আবূ উবায়দা ইব্‌ন জাররাহ্ (রা) এবং অন্যান্য সেনানায়ক এগিয়ে এসে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। কোন কোন সাহাবী আবেদন করেন, আপনি আর অগ্রসর হয়ে প্লেগ আক্রান্ত এলাকায় যাবেন না। হযরত আবদুর রহ্‌মান ইব্‌ন আওফ (রা) বলেন, আমি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যেখানে মহামারী দেখা দেয় সেখানে যাবে না। আর যদি ঘটনাক্রমে তুমি যেখানে রয়েছ সেখানে মহামারী দেখা দেয় তাহলে সেখান থেকে পলায়ন করো না। এ হাদীস শোনার পর হযরত ফারূকে আযম (রা) সেখান থেকে মদীনা শরীফে ফিরে আসেন। আসার সময় তিনি ইসলামী বাহিনীর সেনানায়কদেরকে সতর্ক করে দেন, যেন তারা যতদূর সম্ভব এ রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। হযরত আবূ উবায়দা প্লেগ রোগে আক্রান্ত হন। রোগ যখন মারাত্মক আকার ধারণ করে এবং তাঁর বাঁচার কোন আশাই রইলো না, তখন হযরত আবূ উবায়দা (রা) আপন জায়গায় হযরত মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা)-কে প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করেন এবং এর কিছুক্ষণ পরই চিরদিনের জন্য দুনিয়া ছেড়ে চলে যান। হযরত মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা)-ও বেশি দিন বেঁচে থাকতে পারেন নি। প্রথমে তার ছেলে প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। তারপর তিনি নিজেও আক্রান্ত হন। তিনি তাঁর ইনতিকালের পূর্বে হযরত আমর ইব্‌ন 'আসকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে যান।

হযরত মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা)-এর ইনতিকালের পর হযরত আমর ইব্‌ন 'আস (রা) ইসলামী বাহিনী নিয়ে পাহাড়ের উপর উঠে যান এবং সেনাবাহিনীকে ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে প্রত্যেকটি দলকে পৃথক পৃথক পর্বত চূড়ায় অবস্থানের নির্দেশ দেন। কিছুদিন পর মহামারীর প্রকোপ হ্রাস পায়। এ মহামারী দেখা দেওয়ার পূর্বেই মিসর বিজিত হয়ে গিয়েছিল। তাই মহামারীর দিনগুলোতেই হযরত আমর ইব্‌ন 'আস (রা) মিসর থেকে মদীনা শরীফে প্রচুর খাদ্যশস্য প্রেরণ করেন। যখন তিনি জানতে পারেন যে, হযরত ফারূকে আযম (রা) সিরিয়া সীমান্তে আগমন করেছেন, তখন তিনি নিজেও সিরিয়ায় চলে আসেন। তার উদ্দেশ্য ছিল, হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর খিদমতে স্বয়ং হাযির হয়ে তার কাছে মিসরের অবস্থা বর্ণনা করা এবং সেখানকার প্রশাসনিক ব্যাপারে তার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ লাভ করা। হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর প্রত্যাবর্তনের পর হযরত আবূ উবায়দা (রা) ও হযরত মুআয (রা)-এর পরপর ওফাতের কারণে হযরত আমর ইব্‌ন 'আস (রা) সঙ্গে সঙ্গে মিসরে ফিরে যেতে পারেনি। এ মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে দামিশ্‌কের কর্মকর্তা ইয়াযীদ ইবন আবূ সুফিয়ান (রা) ইনতিকাল করেন। তার ইনতিকালের সংবাদ শুনে হযরত ফারূকে আযম (রা) তার ভাই

হযরত মুআবিয়া ইবন আবূ সুফিয়ান (রা)-কে দামিশ্কের কর্মকর্তা নিয়োগ করেন। ঐ ব্যবস্থার অধীন হযরত শুরাহবিল ইব্ন হাসনাহ (রা) উরদূন (জর্দান) এলাকায় নিযুক্ত হন। এ মহামারীতে অনেক নেতৃস্থানীয় সাহাবী ইনতিকাল করেন। ফলে ইসলামী বিজয় অভিযান স্তিমিত হয়ে পড়ে। কেননা, ইসলামী সেনাবাহিনী তখন নিজেরাই বিপন্ন অবস্থায় ছিল। এ বছরই (হি. ১৮ সনে) হযরত ফারূকে আযম (রা) হযরত শুরায়হ্ ইব্ন হারছ কিন্দি (রা)-কে কূফায় এবং হযরত কাআব ইব্ন সওয়ার আরযী (রা)-কে বসরার বিচারক নিয়োগ করেন, এ বছরই হযরত ফারূকে আযম (রা) মুসাফিরগণের সুবিধার জন্য মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফের মধ্যবর্তী স্থানে গৃহাদি নির্মাণ ও কূপ খননের ব্যবস্থা করেন এবং কা'বাঘর সংলগ্ন মানুষের ঘরবাড়ি খরিদ করে কা'বা ঘরের বারান্দার আয়তন বৃদ্ধি করেন।

ফারূকী আমলে বিজিত দেশসমূহ

হযরত ফারূকে আযমের (রা) খিলাফত আমলে যে সমস্ত দেশ, প্রদেশ ও অঞ্চল বিজিত হয়, সেগুলোর মধ্যে পারস্য, ইরাক, জাযীরাহ, খুরাসান, বেলুচিস্তান, সিরিয়া, ফিলিস্তীন, মিসর, আর্মেনিয়া প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর দশ বছরের খিলাফত আমলে যে বিজয় অর্জিত হয় তা ছিল অস্বাভাবিক ও অবিশ্বাস্য। হযরত ফারূকে আযম (রা) হি. ২২ সনে ইসলামী রাষ্ট্রকে বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত করেন। আর সেগুলো হলো মক্কা মুকাররমাহ, মদীনা মুনাওয়ারাহ, সিরিয়া, জাযীরা, বসরা, কূফা, মিসর, ফিলিস্তীন, খুরাসান, আযারবায়জান ও পারস্য। এগুলোর মধ্যে কোন কোন প্রদেশের আয়তন ছিল দু'টি প্রদেশের সমান। কোন কোন প্রদেশের আবার দু'দুটি কেন্দ্র ছিল এবং প্রত্যেকটি কেন্দ্রে পৃথক পৃথক কর্মকর্তা ও কর্মচারী ছিলেন। প্রত্যেক প্রদেশের, একজন ওয়ালী বা কর্মকর্তা, একজন কাতিব (সচিব) বা মীর মুনশী, একজন সেনানায়ক, একজন সাহিবুল খারাজ বা কালেক্টর, একজন পুলিশ অফিসার, একজন ট্রেজারী অফিসার এবং একজন বিচারক অবশ্যই থাকতেন। ফারূকী খিলাফত নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনার পূর্বে আমরা তাঁর শাহাদত (মৃত্যুবরণ) সম্পর্কে কিঞ্চিত আলোচনা করছি।

হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর শাহাদত বরণ

ফিরূয নামীয় মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা)-এর জনৈক ক্রীতদাস (যার ডাক নাম ছিল আবূ লূ'লূ') মদীনা তাইয়িবাতে বসবাস করত। একদিন সে বাজারে হযরত ফারূকে আযমের কাছে অভিযোগ করল : আমার প্রভু মুগীরা ইবন শু'বা আমার কাছ থেকে অধিক মাশুল আদায় করে থাকেন। কাজেই, আপনি এর পরিমাণ হ্রাস করে দিন। হযরত ফারূকে আযম (রা) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি কাজ কর ? সে উত্তরে বললো, আমি কামার, চিত্রকর ও ছুতারের কাজ করি। হযরত ফারূকে আযম (রা) বললেন, তোমার এসব শিল্পকর্মের অনুপাতে মাশুলের পরিমাণ তো অধিক নয়। একথা শুনে আবূ লূ'লূ' মনে মনে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়। হযরত ফারূকে আযম (রা) তারপর তাকে বললেন, আমি শুনেছি তুমি এমন চাক্কি বানাতে পার, যা বাতাসের উপর ভর করে চলে। তুমি আমার জন্যও এ ধরনের একটি চাক্কি বানিয়ে দাও না? সে উত্তর দিল, বেশ আমি আপনাকে এমন একটি চাক্কি বানিয়ে দেব, যার শব্দ প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সর্বত্র শোনা যাবে। পরদিন লোকেরা ফজরের নামাযের জন্য মসজিদে নববীতে সমবেত হন। আবূ লূ'লূ' একটি খঞ্জর নিয়ে মসজিদে ঢুক্‌ল। যখন নামাযের জন্য সারি বাঁধা হল এবং হযরত ফারূকে আযম

(রা) ইমাম হিসাবে আগে বেড়ে নামায পড়াতে শুরু করলেন, তখন মুক্তাদিগণের প্রথম সারিতে দণ্ডায়মান আবূ লূ'লূ' খানিকটা এগিয়ে গিয়ে খঞ্জর দ্বারা হযরত ফারূকে আযম (রা)-কে একে একে ছয়টি আঘাত করল। একটি আঘাত ঠিক নাভীর নীচে পড়ে। হযরত ফারূকে আযমন (রা) হযরত আবদুর রহ্মান ইব্ন আওফ (রা)-কে টেনে নিয়ে ইমামতি করার জন্য নিজের জায়গায় দাঁড় করিয়ে দেন এবং আঘাতের যন্ত্রণায় বেহুঁশ হয়ে সঙ্গে সঙ্গে মেঝেতে লুটিয়ে পড়েন।

হযরত আবদুর রহ্মান ইব্ন আওফ (রা) এমন অবস্থায় নামায পড়ালেন যে, ভীষণভাবে আহত হযরত ফারূকে আযম (রা) তার সামনেই পড়েছিলেন। আবূ লূ'লূ' আঘাত হেনেই মসজিদ থেকে পালিয়ে যায়। লোকেরা তাকে ধরার চেষ্টা করে এবং এ অবস্থায় আরো কয়েকজন তার হাতে আহত হয়। শেষ পর্যন্ত তাকে বন্দী করা হয়। কিন্তু বন্দী হওয়ার সাথে সাথে সে আত্মহত্যা করে। ফজরের নামায আদায় করার পর লোকেরা হযরত ফারূকে আযম (রা)-কে মসজিদ থেকে উঠিয়ে তাঁর ঘরে নিয়ে যায়। চেতনা ফিরে আসতেই তিনি জিজ্ঞেস করেন, আমার হত্যাকারী কে ? লোকেরা আবূ লূ'লূ'র কথা বললে তিনি বললেন মহান আল্লাহ্র শোক্র, আমি এমন কোন লোকের হাতে মারা পড়িনি, যে নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করেছে কিংবা যে মহান আল্লাহ্কে একটিবারের মত হলেও সিজদা করেছে। একজন চিকিৎসক এসে তাকে দুধ ও নাবীয (খেজুরের নির্যাস থেকে তৈরী পানীয়) পান করালেন। কিন্তু তা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতস্থান দিয়ে বের হয়ে গেল। এ অবস্থা দেখে উপস্থিত সকলেই তাঁর জীবন সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়েন এবং তাঁর কাছে আবেদন করেন : হে আমীরুল মু'মিনীন! যে ভাবে হযরত আবূ বকর (রা) আপনাকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে গেছেন, সেভাবে আপনিও কাউকে আপনার স্থলাভিষিক্ত করে যান।

হযরত ফারূকে আযম (রা) তখন আবদুর রহ্মান ইব্ন আওফ (রা), হযরত সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা), হযরত যুবায়র ইব্ন আওয়াম (রা), হযরত তালহা (রা), হযরত আলী (রা) ও হযরত উসমান ইব্ন আফফান (রা)-কে তলব করেন। হযরত তালহা (রা) তখন মদীনা মুনাওয়ারাতে ছিলেন না। হযরত ফারূকে আযম (রা) বাকী পাঁচজনকে সম্বোধন করে বললেন, আপনারা তিন দিন পর্যন্ত হযরত তালহা (রা)-এর জন্য অপেক্ষা করবেন। যদি তিনি তিন দিনের মধ্যে চলে আসেন, তাহলে তাকেও আপনাদের দলভুক্ত করে নেবেন। তারপর তিনি স্বীয় পুত্র আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-কে ডেকে বললেন, যদি খলীফা নির্বাচনের ক্ষেত্রে মতবিরোধের সৃষ্টি হয়, তাহলে তুমি সেই দলে যোগ দেবে, যে দলে আবদুর রহ্মান ইব্ন আওফ (রা) রয়েছে। তারপর তিনি হযরত আবূ তালহা আনসারী (রা) এবং হযরত মিকদাদ ইব্ন আসওয়াদ (রা)-কে পাঠিয়ে নির্দেশ দেন : যখন তাঁরা খলীফা নির্বাচনের উদ্দেশ্যে পরামর্শ করার জন্য কোন জায়গায় সমবেত হবেন, তখন তোমরা দু'জন দরজায় দাঁড়িয়ে থাকবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা সলা-পরামর্শের কাজ শেষ না করবেন, তোমরা কাউকে ভিতরে ঢুকতে দেবে না। তারপর তিনি উপরোক্ত ব্যক্তিবৃন্দকে সম্বোধন করে বললেন : "আপনাদের মধ্যে যিনি খলীফা নির্বাচিত হবেন, তাঁর উদ্দেশ্যে আমার ওসীয়ত তিনি যেন আনসারগণের অধিকারের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখেন। কেননা, তাঁরা হচ্ছেন সেই লোক যাঁরা হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সাহায্য করেছিলেন এবং মুহাজিরগণকে নিজেদের ঘরে স্থান

দিয়েছিলেন। আনসারগণ আপনাদের অনেক উপকার করেছেন। কাজেই, আপনাদের উচিত, তাদের উপকার করা, তাঁদের ভুল-ভ্রান্তিকে যথাসম্ভব উপেক্ষা করা এবং তাঁদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া। আপনাদের মধ্যে যিনি খলীফা হবেন, তাঁর উচিত হবে, মুহাজিরগণের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা। কেননা, তাঁরাই ইসলামের মূল উপাদান। অনুরূপভাবে যিম্মীদের প্রতিও পুরাপুরি লক্ষ্য রাখা উচিত। সেই সাথে মহান আল্লাহ্ ও মহান আল্লাহ্র পিয়ারা রাসূলের প্রতি একজন মুসলমানের যেসব দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে, সেগুলোর প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে। আর যিম্মীদেরকে যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হবে, সেগুলো যেন অবশ্যই পূরণ করা হয়। তাদের থেকে তাদের শত্রুদেরকে যেন প্রতিহত করা হয় এবং তাদেরকে সামর্থ্যের অধিক কষ্ট যেন দেওয়া না হয়।”

তারপর তিনি পুত্র হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-কে নির্দেশ দিলেন : তুমি হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা)-এর কাছে গিয়ে আবেদন জানাও, যেন তিনি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর পাশে আমাকে দাফন করার অনুমতি দান করেন। হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা)-এর কাছে গিয়ে হযরত ফারূকে আযম (আ)-এর অন্তিম আকাঙ্ক্ষার কথা তাঁকে জানান। হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা) বলেন, আমি সাব্যস্ত করেছিলাম এ জায়গায় আমারই কবর হবে। কিন্তু হযরত উমর ফারূক (রা)-এর অন্তিম ইচ্ছা অনুযায়ী আমি তাঁকেই আমার উপর প্রাধান্য দিলাম। এ জায়গায় যেন তাঁকেই দাফন করা হয়। হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) যখন হযরত ফারূকে আযম (রা)-কে ঐ সংবাদ শোনান, তখন তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং বলেন : আমার সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষাটি পূরণ হল। হিজরী ২৩ সনের ২৭ যুলহাজ্জাহ বুধবার তিনি আহত হন এবং হিজরী ২৪ সনের ১লা মুহাররম শনিবার ইনতিকাল করেন।

তাঁর খিলাফতের মেয়াদ কাল সাড়ে দশ বছর। হযরত সুহায়ব (রা) তাঁর জানাযার নামায পড়ান। হযরত উছমান গনী (রা), হযরত আলী (রা), হযরত যুবায়র (রা), হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) এবং হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হযরত ফারূকে আযম (রা)-কে কবরে নামিয়ে শেষবারের মত শুইয়ে দেন।

হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি

হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর প্রথম স্ত্রী ছিলেন হযরত যয়নব (রা) বিন্ত মাযঊন ইব্ন হাবীব ইব্ন ওয়াহাব ইব্ন হুযাফা ইব্ন জামাহ্। জাহিলিয়া যুগে তাঁর এ বিবাহ হয়েছিল। এ স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) ও হযরত আবদুর রহমান ‘আকবর’ (রা) (বড়) ও হযরত হাফসা (রা)। হযরত যয়নাব (রা) মক্কা শরীফে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সেখানেই ইনতিকাল করেন। তিনি ছিলেন হযরত উসমান ইব্ন মাযঊন (রা)-এর বোন। হযরত উসমান ইব্ন মাযউন (রা) ছিলেন প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম। এক্ষেত্রে তার ক্রমিক নম্বর ছিল চৌদ্দ। হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর স্ত্রী ছিলেন মালীকা বিন্ত জারূল খুযাঈ। এ স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন উবায়দুল্লাহ্। যেহেতু এ স্ত্রী ঈমান আনেন নি তাই হিজরী ৬ সনে হযরত ফারূকে আযম (রা) তাকে তালাক দেন। হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর তৃতীয় স্ত্রী ছিলেন কারীবা বিন্ত আবী উমাইয়া মাখযূমী। এ বিবাহও জাহিলিয়া যুগে হয়েছিল। কিন্তু ইসলাম গ্রহণ না করার দরুন এ স্ত্রীকেও হযরত ফারূকে আযম (রা) হিজরী ৬ সনে হুদায়বিয়া সন্ধির পর তালাক দেন। হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর চতুর্থ স্ত্রী ছিলেন উম্মে

হাকীম বিন্‌ত আল-হারছ ইব্‌ন হিশাম মাখযুমী। এ বিবাহ হয় হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের পর। এ স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন ফাতিমা। হযরত উমর (রা) মদীনা শরীফে হিজরত করার পর হিজরী ৭ সনে জামীলা বিন্‌ত আসিম ইব্‌ন ছাবিত ইব্‌ন আবূ আফালাহ আওসী আনসারীকে বিবাহ করেন। এ ছিল তাঁর পঞ্চম বিবাহ। এ স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন আসিম। কিন্তু, কোন এক কারণে ফারূকে আযম (রা) এ স্ত্রীকে তালাক প্রদান করেন। হযরত ফারূকে আযম (রা) ৪০ হাজার দিরহাম মোহরের বিনিময়ে ষষ্ঠ বিবাহ্ করেন হিজরী ৭ম সনে হযরত উম্মে কুলছুম বিন্‌ত আলী (রা) ইব্‌ন আবূ তালিবকে। এ স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন রুকাইয়া ও যায়দ। হযরত ফারূকে আযম (রা) তাঁর চাচাত বোন আতিকা বিন্‌ত যায়দ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নাযীলকেও বিবাহ করেন। ফাকীহা ইয়ামীনিয়াহও ছিলেন তাঁর স্ত্রীদের অন্যতম। কারো কারো মতে, ফাকীহা ছিলেন তার ক্রীতদাসী। এরই গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন আবদুর রহমান। 'আওছাত' (মধ্যম)। ফারূকে আযম (রা)-এর সন্তানদের মধ্যে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহধর্মিণী হযরত হাফছা (রা) এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) ছিলেন স্বনামখ্যাত। হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) প্রায় সকল জিহাদেই হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে ছিলেন।

ফারূকে আযম (রা)-এর উদ্ভাবিত বিধানসমূহ

হযরত ফারূকে আযম (রা) অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত অনেক বিধান উদ্ভাবন করেন। এগুলোকে আউয়ালিয়াতে ফারূকী (হযরত ফারূকে আযম কর্তৃক উদ্ভাবিত বিধান) বলা হয়।

হযরত ফারূকে আযম (রা) নিয়মিতভাবে বায়তুল মাল বা ট্রেজারী স্থাপন করেন। তিনিই হিজরী সনের উদ্ভাবক। আমীরুল মু'মিনীন' খিতাবে তিনিই প্রথম ভূষিত হন। তিনিই সর্বপ্রথম সেনাবাহিনীর জন্য নিয়মিত দফতর (অফিস) স্থাপন করেন। পৃথক আর্থিক দফতর স্থাপনও তারই কীর্তি। তিনিই সর্বপ্রথম স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর বেতন নির্ধারণ করেন।

তিনি ভূমি জরীপ আদমশুমারী ও খাল খননের ব্যবস্থা করেন; বিভিন্ন শহর (যেমন কূফা, বসরা, জাযীরা, ফুসতাত ইত্যাদি) স্থাপন করেন; মুসলিম অধিকৃত এলাকাসমূহকে সুবা বা প্রদেশে বিভক্ত করেন; বিদেশী বণিকদেরকে ইসলামী রাষ্ট্রে আগমন ও ব্যবসা পরিচালনার অনুমতি দেন, দুররাহ্ মারার প্রচলন করেন, জেলখানা নির্মাণ করেন এবং পুলিশ বিভাগও স্থাপন করেন। জনসাধারণের অবস্থাদি সম্পর্কে সরাসরি অবহিত হওয়ার জন্য খোদ খলীফার রাতের বেলা পায়চারি করার নিয়ম তিনিই প্রবর্তন করেন। তিনিই গুপ্ত সংবাদ দাতা নিয়োগ করেন, মুসাফিরদের সুবিধার্থে কুয়া ও সরাইখানা নির্মাণ করেন এবং অসহায় ও অভাবগ্রস্ত খ্রিস্টান ও ইয়াহূদীদের জন্য ভাতা নির্ধারণ করেন। তিনি জামাআতের সাথে তারাবির নামায আদায়ের প্রচলন করেন এবং তেজারতী (বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ক্রীত) ঘোড়াসমূহের উপর যাকাত নির্ধারণ করেন। তিনিই জানাযার নামাযের মধ্যে চার তাকবীরের সর্বসম্মত বিধান প্রবর্তন করেন।

ফারূকে আযম (রা)-এর আচার-আচরণ ও বৈশিষ্ট্যাদি

হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর খাবার ছিল অত্যন্ত সাদাসিধে ধরনের। বহির্দেশ থেকে কিংবা ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে যেসব দূত বা প্রতিনিধি দল মদীনা শরীফে

আসতেন, তারা অতিথি হিসাবে হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর সাথেই আহার করতেন। তাতে তাদের কিছুটা কষ্টের সম্মুখীন হতে হত এজন্য যে, তারা সাদাসিধে খাবারে সাধারণত অভ্যস্ত ছিলেন না। হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর পোশাকও ছিল অত্যন্ত সাদাসিধে ধরনের। তাঁর বেশীর ভাগ পোশাকই ছিল তালিযুক্ত। এমন কি কোন কোন সময় তার পরিহিত সুতিবস্ত্রের মধ্যে চামড়ার তালিও থাকত। কোন কোন সময় তিনি দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত ঘরের মধ্যে বসে থাকতেন। এরূপ করাটা ছিল তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ। কিন্তু, যখন তিনি বাইরে আসতেন তখন জানা যেত যে, তাঁর গায়ের কাপড়গুলো ময়লা হয়ে যাওয়ায়, ধুয়ে রৌদ্রে শুকাতে দেওয়া হয়েছিল এবং তা শুকানো পর্যন্ত ঘর থেকে বের হওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। কেননা, এগুলো ব্যতীত তার আর দ্বিতীয় কাপড় ছিল না। হিজরতের পর তিনি প্রথম প্রথম মদীনা শরীফ থেকে দু'তিন মাইল দূরবর্তী একটি পল্লীতে থাকতেন। খলীফা হওয়ার পর তিনি মদীনা শরীফের শহর এলাকায় চলে আসেন। এখানে তাঁর ঘর মসজিদে নববীর নিকটে এবং বাবুস-সালাম ও বাবুর রহমতের মধ্যবর্তী স্থানে ছিল। শাহাদতের সময় তিনি ঋণী ছিলেন। তিনি নির্দেশ দিয়ে যান, যেন তার ঘরটি বিক্রয় করে সে অর্থ দ্বারা ঋণ পরিশোধ করা হয়। হযরত আমীর মু'আবিয়া (রা) ঘরটি খরিদ করেন এবং তা থেকে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারাই হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর ঋণ পরিশোধ করা হয়। এক সময় তিনি খুতবায় বলেন, 'হে লোক সকল! আমার জীবনে এমন সময়ও গিয়েছে, যখন আমি ঘরে ঘরে পানি সরবরাহ করতাম, লোকেরা তার বিনিময়ে আমাকে কিছু খেজুর দিত এবং আমি তা দিয়েই জীবিকা নির্বাহ করতাম। লোকেরা বলল, আপনি এসব ঘটনার উল্লেখ করেছেন কেন ? তিনি উত্তর দিলেন, আমার মনে কিছুটা দম্ভের সৃষ্টি হয়েছিল এবং এটাই তার ওষুধ। তিনি বহুবার মদীনা তাইয়িবা থেকে মক্কা মুকাররমা পর্যন্ত এবং মক্কা মুকাররমা থেকে মদীনা তাইয়িবা পর্যন্ত সফর করেছেন। কিন্তু তাঁর সাথে কখনো কোন তাঁবু বা ছোট খাটো শামিয়ানাও থাকত না। প্রয়োজন মত কোন বাবলা বৃক্ষের উপর কাপড় ছড়িয়ে দিতেন, তারই ছায়ায় তিনি বিশ্রাম নিতেন। শোয়ার প্রয়োজন হলে মাটির উপরস্থ কংকর ও পাথরসমূহ সমান করে, তারপর কয়েকটি পাথর স্তূপীকৃত করে সেগুলোকে বালিশ বানিয়ে এবং নীচে একটি কাপড় বিছিয়ে তিনি শুয়ে পড়তেন। তিনি বদর যুদ্ধ ও বায়আতুর রিদওয়ানে অংশ গ্রহণকারী ব্যক্তিবৃন্দ, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহধর্মিণীবৃন্দ এবং সমগ্র উচ্চ মর্যাদাশীল সাহাবীবৃন্দের জন্য বায়তুল মাল থেকে ভাতা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তিনি তাঁর ছেলে আবদুল্লাহ্ (রা)-এর চাইতে হযরত উসামা (রা)-এর ভাতা বেশী পরিমাণ নির্ধারণ করলে হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) তাতে আপত্তি জানান। তখন তিনি তার ছেলে হযরত আবদুল্লাহ্ (রা)-কে সম্বোধন করে বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত উসামা (রা)-কে তোমার চাইতে এবং হযরত উসামা (রা)-এর পিতাকে তোমার পিতার চাইতে অধিক ভালবাসতেন।

হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর উপদেষ্টা ও সভাসদের সকলেই ছিলেন আলিম ও বিজ্ঞ–চাই তারা অধিক বয়স্ক হোন অথবা অল্প বয়স্ক। তিনি আলিম সমাজকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখতেন। মানুষ চেনা ও মানুষের গুণাবলী আবিষ্কার করা ছিল তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। একটি মানুষের মধ্যে কি কি গুণ রয়েছে তা তিনি সহজেই বুঝে নিতেন এবং সে অনুযায়ী তার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতেন। অনুরূপভাবে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যিনি যে দায়িত্ব

পালনের জ্ঞান ও যোগ্যতা রাখতেন হযরত ফারূকে আযম (রা) তার উপর ঠিক সেই দায়িত্বই অর্পণ করতেন। যিনি যে পদের যোগ্য তিনি তাকে সে পদেই অধিষ্ঠিত করেছিলেন। যদিও তিনি নিজে সংসারবিমুখ ও আল্লাহ্‌ভীরু ছিলেন এবং অত্যন্ত সরল জীবন যাপন করতেন, কিন্তু দায়িত্বপূর্ণ কাজে, সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে কিংবা প্রাদেশিক প্রশাসনে তিনি সমস্ত ব্যক্তিকে নিয়োগ করতেন, তাদের মনোনয়নের ক্ষেত্রে শুধু যুহ্‌দ (সংসারবিমুখতা), তাকওয়া (পরহিযগারী)-কে মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করতেন না, বরং যে কাজে যাকে নিয়োগ করতেন সে কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পাদনের পুরাপুরি যোগ্যতা তার মধ্যে আছে কিনা তা পূর্বাহ্নে পরখ করে নিতেন। তাঁর দশ বছরের খিলাফত আমলে ইরাক, সিরিয়া, ফিলিস্তীন, মিসর, খুরাসান প্রভৃতি দেশে শতশত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যদিও তিনি স্বয়ং ঐ সমস্ত যুদ্ধে শরীক হননি, তবু সেগুলোর আয়োজন, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা তাঁর হাতেই ছিল। বিভিন্ন খুঁটিনাটি ব্যাপারেও সেনাপতিগণের কাছে তিনি নির্দেশাদি পাঠাতেন এবং সেগুলো খুবই মোক্ষম ও সময়োপযোগী হত। তাই যুদ্ধ, সংঘর্ষ কিংবা প্রশাসনিক ব্যাপারে একথা বলা কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি যে, হযরত ফারূকে আযম (রা) এক্ষেত্রে ভ্রান্তিকর বা খাপছাড়া নির্দেশ প্রদান করেছেন। তিনি সকল প্রদেশের কর্মকর্তাদের কাছে এ মর্মে লিখিত নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন যে, কোন মুজাহিদকে যেন একাধারে চারমাসের বেশী যুদ্ধক্ষেত্রে আটকিয়ে রাখা না হয়; বরং চার মাস পরপর যেন তাকে তার পরিবার-পরিজনের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। একদা কোন একটি অসুখের কারণে জনৈক ব্যক্তি তাকে মধু সেবন করতে বলেছিল। কিন্তু তাঁর কাছে মধু ছিল না এবং কোথাও তা পাওয়াও যাচ্ছিল না। অবশ্যই বায়তুল মালে সামান্য পরিমাণ মধু ছিল। লোকেরা বললো, আপনি এ মধুই ব্যবহার করুন। তিনি উত্তর দিলেন, এ তো সমগ্র মুসলমানের সম্পত্তি। যতক্ষণ পর্যন্ত জনসাধারণ আমাকে অনুমতি না দেবে, ততক্ষণ আমি এ মধু ব্যবহার করতে পারি না। শেষ পর্যন্ত তিনি ঐ মধু ব্যবহার করেন নি।

তিনি খলীফা হওয়ার পর প্রথমে অনেক দিন পর্যন্ত বায়তুল মাল থেকে একটি শস্যকণাও ভাতা হিসাবে গ্রহণ করেনে নাই। ক্রমে ক্রমে তাঁর অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছল যে, দারুণ অভাব তাঁকে ঘিরে ধরল, ক্ষুধা নিবৃত্তির কোন পথই তাঁর সামনে খোলা রইল না। অগত্যা তিনি সাহাবায়ে কিরামকে মসজিদে নববীতে একত্রিত করে বললেন, আমাকে খিলাফতের কাজে এ পরিমাণ ব্যস্ত থাকতে হয় যে, নিজের পারিবারিক খরচের কথা চিন্তাই করতে পারি না। অতএব, আপনারা সবাই মিলে আমার জন্য বায়তুল মাল থেকে কিছু পরিমাণ ভাতা নির্ধারণ করে দিন। তখন হযরত আলী (রা) বললেন, আপনি আপনার সকাল-সন্ধ্যার খাবার বায়তুল মাল থেকেই পাবেন, হযরত ফারূকে আযম (রা) তাতেই সম্মত হন।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) বলেন, এমনটা হয় নি যে, হযরত ফারূকে আযম (রা) রাগান্বিত হয়েছেন, তখন কেউ তাঁর সামনে মহান আল্লাহ্‌কে স্মরণ করল কিংবা কুরআন শরীফের কোন আয়াত পাঠ করল কিংবা তাঁকে মহান আল্লাহ্‌র ভয় দেখালো এবং তাতে তাঁর রাগ প্রশমিত হল না। হযরত বিলাল (রা) একবার হযরত আসলাম (রা)-কে হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি জবাব দেন, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তিনি সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তি; কিন্তু যখন তিনি রাগান্বিত হন তখন অবস্থা গুরুতর হয়ে দাঁড়ায়। তখন হযরত বিলাল (রা) বলেন, ঐ সময়ে তুমি পাক কুরআনের কোন একটি আয়াত পাঠ কর

না কেন, যাতে তাঁর সমস্ত রাগ উবে যায় ? হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলেন, একবার হযরত ফারূকে আযম (রা) হযরত সারিয়াহ (রা) নামক জনৈক ব্যক্তিকে একটি সেনাদলের নেতা করে পাঠান। কিছুদিন পর হঠাৎ এক জুমু'আর খুতবায় হযরত ফারূকে আযম (রা) তিন তিন বার উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠেন, "হে সারিয়া! পাহাড়ের দিকে যাও।"

এক সময় তিনি উটের ক্ষতস্থান ধুইয়ে দিচ্ছিলেন এবং বলছিলেন, আমার ভয় হয়, হয়ত কিয়ামতের দিন এ সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করা হবে। এক সময় তিনি হযরত সালমান (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, 'বলুন তো, আমি বাদশাহ্ না খলীফা ? তিনি জবাব দিলেন, যদি আপনি কোন মুসলমানের কাছ থেকে এক দিরহাম কিংবা তার চাইতেও অল্প বা অধিক আদায় করে তা আপনার ব্যক্তিগত কাজে খরচ করেন, তাহলে আপনি বাদশাহ্– অন্যথায় খলীফা।

প্রায় একমাস পর একজন দূত হযরত সারিয়াহ্ (রা)-এর কাছ থেকে মদীনা তাইয়িবাতে আসেন। তিনি সেখানকার অবস্থাদি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আমরা যুদ্ধে প্রায় পরাজিত হতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় তিন তিন বার জনৈক ব্যক্তির কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। তিনি বলছিলেন, "হে সারিয়া! পাহাড়ের দিকে যাও।" আমরা তখন দ্রুত পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গেলাম। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের শত্রুদেরকে পরাস্ত করলেন। যেদিন হযরত ফারূকে আযম (রা) তাঁর খুতবার মধ্যে এ শব্দগুলো উচ্চারণ করেছিলেন সেদিন লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, আপনি এখানে হযরত সারিয়া (রা)-কে ডাকছেন কেন ? তিনি তো নিহাওয়ান্দে কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করছেন ? হযরত ফারূকে আযম (রা) জবাবে বললেন, তখনি আমি এরূপ একটি দৃশ্য দেখলাম যে, মুসলমানগণ যুদ্ধ করছে এবং এমন পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে যে, তখনই পাহাড়ের দিকে না গেলে শত্রুরা তাদের পর্যুদস্ত করে ফেলবে, তাই হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে ঐ শব্দগুলো বের হয়ে গেল। হযরত সারিয়া (রা)-এর পত্রেও উল্লেখ করা হয়েছিল যে এ একই তারিখে ঠিক জুমু'আর দিন এবং জুমু'আর নামাযের সময়ে ঐ ঘটনা ঘটেছিল। একবার হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) হযরত ফারূকে আযম (রা)-কে বলেন, মানুষ আপনাকে এত ভয় করে যে, না তারা আপনার দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারে, আর না আপনার সামনে কথা বলতে পারে। হযরত ফারূকে আযম (রা) তখন বললেন, মহান আল্লাহ্র শপথ, তারা আমাকে যতটুকু ভয় করে আমি ওদেরকে তার চাইতেও বেশী ভয় করি।

হযরত ফারূকে আযম (রা) প্রদেশসমূহের উলামা ও গভর্নরদেরকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন, যেন তারা সবাই হজ্জের সময় হজ্জ করতে আসেন। তিনি নিজেও প্রতি বছর হজ্জ করতে যেতেন। গভর্নর বা কর্মকর্তাদেরকে হজ্জ উপলক্ষে মক্কা মুকাররমাতে একত্র করার মধ্যে একটি বিশেষ সুবিধা ছিল যে, তখন প্রত্যেক প্রদেশের ও প্রত্যেক অঞ্চলের লোকেরাও খলীফার সাথে সাক্ষাৎ করার সুযোগ পেত এবং তাদের অঞ্চলে নিযুক্ত কর্মকর্তাদের মধ্যে কোন দোষত্রুটি থাকলে তা খলীফার কাছে অবাধে বলতে পারত। আবার ঐ কর্মকর্তা যেহেতু ঐ সময় সেখানে হাযির থাকতেন, তাই খলীফা তার থেকে ঐ অভিযোগের ব্যাখ্যা তলব করতে পারতেন। এ ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে কর্মকর্তাগণ নিজেদের দায়িত্ব পালনে সদাসতর্ক থাকতেন। তাদের ভয় ছিল, কর্তব্য পালনে সামান্যতম ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটলে হজ্জের সমাবেশে তাদের লাঞ্ছিত ও অপমানিত হতে হবে। হযরত ফারূকে আযম (রা) সাম্য ও গণতন্ত্রের প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এবং বাস্তবে তা প্রতিষ্ঠা করতে চাইতেন। আজকালকার ইউরোপীয় গণতন্ত্র, যা

ইসলামী শিক্ষা ও ইসলামী আদর্শের বিরোধী, তার প্রতি হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর কোন আকর্ষণ ছিল না। একবার মিম্বারে দাঁড়িয়ে খুতবা দানকালে জনৈক স্ত্রীলোক তাঁকে সম্বোধন করে বলে উঠেন, আপনার এ কথা ভুল। স্ত্রীলোকটি যেহেতু ঠিক কথাই বলেছিল, তাই হযরত ফারূকে আযম (রা) জনসমাবেশের মধ্যেই নির্দ্বিধায় নিজের সে ভুল স্বীকার করে নেন।

বিজয় অভিযানসমূহ : একটি পর্যালোচনা

বলা হয়ে থাকে যে, হযরত ফারূকে আযম (রা) কর্তৃক বিজিত ভূখণ্ডের আয়তন ছিল সাড়ে বাইশ লক্ষ বর্গমাইল। ইরান ও রোম সম্রাটের মুকাবিলায় আরবের অভাবগ্রস্ত ও ক্ষুদ্র একটি জাতি কর্তৃক এই বিজয় লাভ শুধু বিস্ময়কর নয় বরং অভাবিতও বটে। রোমান সাম্রাজ্য ছিল বলকান উপদ্বীপ থেকে শুরু করে এশিয়া মাইনর, সিরিয়া, ফিলিস্তীন, মিসর ও সুদান পর্যন্ত বিস্তৃত। রোমানরা ইরানীদেরকে পরাজিত করে সিরিয়া, ভূমধ্যসাগরের পূর্ববর্তী অঞ্চল, এমন কি মিসরও অধিকার করে নিয়েছিল। ইরানী সাম্রাজ্যের আয়তন রোমান সাম্রাজ্যের চাইতে কম ছিলো না। তখনকার দিনে এ দুই সাম্রাজ্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতের সমাজ ও সংস্কৃতির উপর নিজেদের একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছিল। তাদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এমন কোন তৃতীয় শক্তির অস্তিত্ব তখনকার বিশ্বে ছিল না। মুসলমানগণের এ বিস্ময়কর সাফল্য ও অভূতপূর্ব বিজয়ের কারণসমূহ বর্ণনা করতে গিয়ে খ্রিস্টান ও অন্যান্য অমুসলিম ঐতিহাসিকরা বলেন, রোমান ও ইরানী উভয় রাষ্ট্রই তখন দুর্বল হয়ে পড়ায় মুসলমানগণ অতি সহজেই সেগুলো দখল করে নিয়েছিল। কিন্তু তার বর্ণনা করতে গিয়ে তারা ভুলে যান যে, আরবদের তথা মুসলমানগণের শক্তি এ দুই দুর্বল সাম্রাজ্যের অনুপাতে কিছুই ছিলো না। তাছাড়া যখন মুসলমান এবং ঐ দুই সাম্রাজ্যের মধ্যে একই সময়ে যুদ্ধবিগ্রহ শুরু হয় তখন রোমান ও ইরানীদের মধ্যে পরস্পর কোন মতবিরোধ বা লড়াই-ঝগড়া ছিলো না। কাজে তারা উভয়েই তাদের সম্পূর্ণ শক্তি মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত রাখতে পেরেছিল। অপর দিকে মুসলমানদেরকে একই সময়ে রোমান ও ইরানী– এ দু'টি বৃহৎ শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছিলো। তখনকার দিনে এ দুই ঐতিহ্যবাহী সাম্রাজ্যকে সভ্যতা-সংস্কৃতির দিক দিয়ে অত্যন্ত উন্নতমানের মনে করা হত। তাদের হাতে ছিল প্রচুর যুদ্ধাস্ত্র, উন্নতমানের রণকৌশল, সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী এবং অভিজ্ঞ সেনানায়কবৃন্দ। আরব তথা মুসলমানগণ এসব ক্ষেত্রে ছিল অনেক পিছনে– বলতে গেলে একেবারে নিঃস্বের পর্যায়ে। মুসলমানগণের অনুপাতে রোমান ও ইরানী শক্তির ব্যাপকতা এভাবেও অনুমান করা যেতে পারে যে, ইরানী এবং রোমানরা এক এক যুদ্ধক্ষেত্রে লৌহবর্ম ও মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত দু'লক্ষের চাইতেও অধিক সৈন্যকে সাহায্য করার জন্য আবার তাদেরই সমপরিমাণ, অপর একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সেনাবাহিনী পিছনে অপেক্ষমাণ থাকত। ফলে যুদ্ধরত দু'লাখ প্রকার মানসিক প্রশান্তি নিয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়ে যেত। অপর দিকে মুসলমানগণের সর্ববৃহৎ বাহিনীর সৈন্য সংখ্যাও ত্রিশ-চল্লিশ হাজারের বেশী ছিল না। অথচ, তারাই প্রায় সর্বক্ষেত্রে দু'লক্ষ সৈন্যকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মেরে ভাগিয়ে অভূতপূর্ব বিজয়ের অধিকারী হয়েছিল–এমতাবস্থায় যে, তাদেরকে সাহায্য করার জন্য তাদের পিছনে কোন বিরাট সেনাবাহিনী বা সেনাছাউনি ছিল না। কাজেই একথা বলা বোকামি ছাড়া কিছু নয় যে, ইরানী ও রোমান সাম্রাজ্য তখন পূর্বের চাইতে দুর্বল হয়ে পড়ায় মুসলমানগণ তাদেরকে অতি সহজেই পদানত করতে পেরেছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে এর মূল কারণ হলো ইরানী ও রোমান উভয় জাতিই ছিল মুশরিক (অংশীবাদী)। অপর দিকে আরবগণ ছিল ঈমানের বলে বলীয়ান। তারা তাওহীদ বা একত্ববাদের উপর নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছিল। আর একথা অনস্বীকার্য যে শির্ক বা অংশীবাদিতা মানুষকে কাপুরুষে পরিণত করে, আর ঈমানের বলে বলীয়ান মানুষ স্বভাবতই দুঃসাহসী হয়। কাজেই, ঈমান ও তাওহীদের বদৌলতেই আরবদের মধ্যে সত্যিকার অর্থে সেই বীরত্বের উদ্ভব হয়েছিল যা ঈমানের জন্য এক অতি জরুরী শর্ত এবং যা কোন ক্ষমতার দাপটে কখনো স্তিমিত হয়ে যায় না। এক্ষেত্রে এ বিষয়টিও বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্র মাধ্যমে ইসলাম আরবগণকে দিগ্বিজয় ও দেশ শাসনের এমন এক নীতি বা আদর্শ শিক্ষা দিয়েছিল যা ছিল উদার ও জনকল্যাণকর। অপরদিকে ইরানী ও রোমানদের দিগ্বিজয় ও দেশ শাসননীতি ছিল নিম্নমানের, এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে অমানবিক ও উৎপীড়নমূলক। এ কারণেই মুসলিমগণ যখন কোন শহর বা জনবসতি দখল করতেন তখন সেখানকার অমুসলিমগণই তাঁদের আগমন এবং তাঁদের হুকুমত বা রাষ্ট্রকে জান্নাত তুল্য মনে করত। বিজিত জাতিগুলো বিজয়ী আরবগণের চরিত্র, মহান আল্লাহ্র সৃষ্টির প্রতি তাদের করুণা প্রদর্শন, ন্যায়বিচার, দয়া, নেতৃত্বসুলভ আচরণ, উচ্চ মানসিকতা প্রভৃতি দেখেই সানন্দচিত্তে তাদের অধীনতা স্বীকার করে নিয়েছিল। সত্যি কথা বলতে গেলে, তখন মানব জাতি তাঁদের মনুষ্যত্বকে এ বিজয়ী আরবগণেরই মাধ্যমে রক্ষা করতে পেরেছিল। এমতাবস্থায় মুসলমানগণের বিরুদ্ধে ইরানী বা রোমানদের জয়লাভ কী করে সম্ভব হতে পারে? এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, ইসলাম আরবগণকে শুধু বীরত্বই দেয় নি, বরং অতুলনীয় ঐক্য ও পরের স্বার্থে নিজেকে উৎসর্গ করার শুভ প্রেরণাও যুগিয়েছে। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে সামগ্রিক এসব গুণ যেরূপ শিকড় গেড়ে বসে ছিল তার দৃষ্টান্ত কোন দেশে বা কোন জাতিতে কখনো পাওয়া যাবে না– পাওয়া যেতে পারে না।

খিলাফতে রাশিদার প্রথমার্ধ

হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) ও হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর খিলাফতকালীন যুগকে ইসলামের দীনী ও মাযহাবী রাষ্ট্রের অর্থাৎ খিলাফতে রাশিদার প্রথমার্ধ বলা যেতে পারে। এর শেষার্ধ হযরত উসমান গনী (রা), হযরত আলী (রা) ও হযরত ইমাম হাসান (রা)-এর খিলাফতকালে। খিলাফতে রাশিদার প্রথমার্ধের অবস্থা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এ সময় কালের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এখানে কোথাও দীনকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দেওয়া হয় নি। মহান আল্লাহ্র কালিমা তথা ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে অজান্তে ও ব্যক্তিস্বার্থের প্রতি সামান্যমাত্র ঝুঁকে পড়ে নি বরং বিশুদ্ধ ইসলামী রং, নিখুঁত ইসলামী আচার-আচরণ, বিশুদ্ধ আরবী ও সংস্কৃতি সর্বত্রই মুসলমানগণের মধ্যে বিদ্যমান ঝিল। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে উঠাবসা করেছেন, তাঁর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন এমন সাহাবায়ে কিরামের সংখ্যা তখন ছিল প্রচুর। তাঁরা সকলের কাছেই ছিলেন শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁদের নমুনা বা আদর্শ ছিল সকলেরই অনুকরণীয়। তখন মুসলমানদের মধ্যে পরস্পর অনৈক্য বা মতবিরোধের নাম-নিশানাও ছিল না। যুদ্ধক্ষেত্রে, মসজিদে, সেনাছাউনিতে, দেশ ভ্রমণের কাফেলাসমূহে মোটকথা সর্বত্রই মুসলমানগণ ছিল পারস্পরিক ঐক্য ও স্নেহ ভালবাসার প্রকৃষ্ট নমুনা। ঈর্ষা, শত্রুতা ও স্বার্থপরতা তখন ইসলামী সমাজের কোথাও দৃষ্টিগোচর হতো না। তখন মুসলমানগণ সব কাজই শুধুমাত্র মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করত। তাঁদের জীবন এত সাদাসিধে ছিল যে, তারা রোমান

ও ইরানীদের আড়ম্বরপূর্ণ আসবাব-সামগ্রী ও জাঁকজমকপূর্ণ জীবনোপকরণসমূহকে অবজ্ঞার চোখেই দেখতেন। মুসলমানগণের মধ্যে মতবিরোধের সৃষ্টি করতে পারে, এমন কোন বিষয়ের উদ্ভব তখনো হয়নি। প্রত্যেক লোকই তখন নিজেকে মহান আল্লাহর সামনে হাযির জ্ঞান করত। মোটকথা তা ছিল এমন এক যমানা, যেখানে সর্বত্র শুধু পুণ্য, শুভেচ্ছা ও সদিচ্ছা ব্যতীত কিছুই দৃষ্টিগোচর হত না। খিলাফতে রাশিদার শেষার্ধও নিঃসন্দেহে সততা ও সৌভাগ্যের যুগ। কিন্তু তা প্রথমার্ধের সমকক্ষ বা সমতুল্য নয়। কেননা, প্রথমার্ধের মধ্যে রাসূল-জীবনের পরিপূর্ণ নমুনা ও স্বচ্ছ প্রতিচ্ছবি যেভাবে পাওয়া যায় দ্বিতীয়ার্ধে সেরূপ পাওয়া যায় না।

মুসলমানগণের সাহস ও বীরত্ব মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন তথা ইসলামের মর্মবাণী প্রচারের চেষ্টায় নিয়োজিত থাকত। পার্থিব ধনসম্পদ ও দৈহিক সুখ-সম্ভোগের পিছনে তাদেরকে কখনো ছোটাছুটি করতে দেখা যায় নি। খলীফা তাঁর খিলাফত লাভের পূর্বেও তাঁকে ঐ একই কাপড় পরিধান করতে দেখা যেত। খিলাফতের উচ্চ মর্যাদা খলীফাগণের খাওয়া-পরা ও চলাফেরার মধ্যে কোনরূপ তারতম্যের সৃষ্টি করতে পারে নি। মুসলমানগণ ইরাক, সিরিয়া ও মিসরের উর্বর ও সবুজ শ্যামল এলাকা এবং বিলাস সামগ্রীতে ভরপুর ইরানী শহরসমূহ জয় করেন কিন্তু হযরত ফারুকে আযম (রা)-এর খিলাফতের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁরা সিরিয়ার খ্রিস্টান বা ইরানের অগ্নি-উপাসকদের জাঁকজমকপূর্ণ জীবন দ্বারা এতটুকুও প্রভাবিত হয় নি। যে মুসলমানগণ ইরাক ও পারস্য জয় করেন তাদের অবস্থান ছিল কূফা ও বসরার কয়েকটি ছাপড়া ও তাঁবুর মধ্যে। অনুরূপভাবে সিরিয়াস্থ ইসলামী বাহিনী ও সিরিয়ার শহরসমূহকে নিজেদের অবস্থানস্থল হিসাবে বেছে নেন নি বরং তারা মোসেল ও দামিশকের পাহাড়-প্রান্তরে ছাউনি তৈরী করে সেখানেই অবস্থান করতেন। শহর ও শহুরে জীবনের প্রতি তাঁহাদের কোন মোহ ছিল না। তাঁরা নিজেদের সৈনিক জীবন এবং সে জীবনের কষ্ট সহিষ্ণুতা নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন। যে ইসলামী বাহিনী মিসর জয় করে, তারা সেখানকার জাঁকজমকপূর্ণ শহুরে জীবন পরিত্যাগ করে ফুসতাতের সেনা ছাউনিকেই (পরবর্তী কালে কায়রো শহরে রূপান্তরিত হয়েছে) নিজেদের অবস্থানস্থল হিসাবে বেছে নেয়। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) ও হযরত ফারূকে আযম (রা) মানুষকে শুধু সহজ সরল জীবন যাপনের প্রতি উদ্বুদ্ধই করেন নি, বরং ব্যক্তিগতভাবে নিজেরাও প্রতিটি ক্ষেত্রে সহজ সরল ও অনাড়ম্বর জীবনের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন।

বায়তুল মালের একটি পয়সাও তারা অযথা খরচ করতেন না এবং অপরকেও অপব্যয় করার অনুমতি দিতেন না। খলীফা সকল মুসলমানকে সমভাবে ভালবাসতেন। এতে বর্ণ-গোত্রের মধ্যে কোন বৈষম্য করা হত না। দোষী ব্যক্তি– চাই সে যে কোন বংশের বা যে কোন গোত্রের হোক, খলীফা তাকে উচিত শাস্তিই দিতেন। কখনো কোন ব্যক্তি খলীফার দৃষ্টি আকর্ষণ করে একথা বলতে পারে নি যে তিনি নিজের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল করার দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। প্রচুর ধন-সম্পদ অর্জন করে নিজেকে বিত্তশালী করে তোলার প্রতি সে যুগের সাধারণ মানুষের কোন ঝোঁক ছিল না।

পরবর্তীতে আমরা খিলাফতে রাশিদার শেষার্ধ নিয়ে আলোচনা করবো। তখন লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, প্রথমার্ধের বৈশিষ্ট্যসমূহ ক্রমে ক্রমে লোপ পেতে শুরু করেছে। আর খিলাফতে রাশিদার আমল শেষ হওয়ার সাথে সাথে সেগুলোর অস্তিত্বও সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়ে গেছে।

চতুর্থ অধ্যায়

(খিলাফতে রাশিদার শেষার্ধ)

হযরত উসমান গনী (রা)

নাম ও বংশ-পরিচয়

তাঁর নাম উসমান ইব্‌ন আফফান ইব্‌ন আবুল 'আস ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন আবদে শাম্‌স ইব্‌ন কুসাই ইব্‌ন কিলাব ইব্‌ন মুররাহ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লূওয়াই ইব্‌ন গালিব। আর তাঁর নাম আবূ আমর আবূ আবদুল্লাহ। জাহিলিয়া যুগের পারিবারিক নাম আবূ আমর। মুসলমান হওয়ার পর হযরত রুকাইয়া (রা)-এর গর্ভে তাঁর ছেলে হযরত আবদুল্লাহ (রা)-এর জন্ম হয়। তখন থেকে তিনি হযরত আবূ আবদুল্লাহ (রা) নামে পরিচিত হন। হযরত উসমান (রা)-এর মাতামহী হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পিতা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিবের সহোদরা ছিলেন এবং তারা ছিলেন যমজ ভাইবোন। এদিক দিয়ে হযরত উসমান (রা) ছিলেন হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ফুফাতো বোনের ছেলে।

গুণাবলী ও প্রকৃষ্টতা

লজ্জা ও শালীনতার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সবিশেষ মর্যাদার অধিকারী। হযরত যায়দ (রা) ইব্‌ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, হযরত উসমান আমার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় একজন ফেরেশতা আমাকে বললেন, তাঁকে দেখলে আমি লজ্জায় কুঞ্চিত হয়ে পড়ি। কেননা, তাঁকে তাঁর জাতির লোকেরাই হত্যা করবে। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, যেভাবে উসমান মহান আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)-কে লজ্জা (সমীহ) করেন ফেরেশতাগণও তাকে তেমনি লজ্জা (সমীহ) করেন। হযরত ইমাম হাসান (রা)-এর কাছে উসমান গনী (রা)-এর লজ্জার (শালীনতার) কথা উঠলে তিনি বলেন, হযরত উসমান গনি (রা) কখনো গোসল করতে গেলে গোসলখানার দরজা বন্ধ করা সত্ত্বেও পরিধেয় বস্ত্র খুলতে গিয়ে এতবেশী লজ্জাবোধ করতেন যে, শিরদাড়া সোজা করতে পারতেন না। তিনি 'যূ-হিজরাতায়ন' বা 'জোড় মুহাজির' ছিলেন। অর্থাৎ তিনি প্রথম আবিসিনিয়া, তারপর মদীনা তাইয়্যিবাতে হিজরত করেন। আকার-আকৃতি ও স্বভাব-প্রকৃতিতে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে তাঁর অনেক মিল ছিল। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুওয়াত প্রকাশিত হবার পূর্বেই তিনি আপন কন্যা রুকাইয়াহ্ (রা)-কে তাঁর সাথে বিবাহ দেন। বদর যুদ্ধের দিন হযরত রুকাইয়া (রা) ইনতিকাল করেন। তারপর হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর অপর কন্যা হযরত উম্মে কুলছুম (রা)-কে তাঁর সাথে বিবাহ দেন। এ কারণে তিনি 'যুননূরাইন' (দুই আলোর অধিকারী) উপাধিতে ভূষিত হন। হযরত কুলছুম (রা)-ও হিজরী ৯ সনে ইনতিকাল করেন। পৃথিবীতে হযরত উসমান গনী (রা) ব্যতীত দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি নেই, যিনি কোন নবীর দু'কন্যা

পরপর বিবাহ করেছেন। হজ্জের ইবাদত ও অনুষ্ঠানসমূহ তিনি সবচাইতে ভাল জানতেন। এ ক্ষেত্রে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) ছিলেন দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী। হযরত উসমান গনী (রা) ছিলেন চতুর্থ মুসলিম অর্থাৎ তাঁর পূর্বে মাত্র তিন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

হযরত উসমান গনী (রা) হযরত আবূ বকর (রা)-এর তাবলীগ বা প্রচারের ফলে মুসলমান হয়েছিলেন। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে তিনি যেমন প্রভূত ধন-সম্পদের মালিক ছিলেন, তেমনি ছিলেন সর্বাধিক বদান্য ও মহান আল্লাহ্র পথে বড় দানশীল। তিনি হযরত রুকাইয়া (রা)-এর কঠিন অসুখের কারণে বদর যুদ্ধে শরীক হতে পারেন নি। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুমোদন ও নির্দেশক্রমে তিনি মদীনা শরীফে রয়ে গিয়েছিলেন। তাই বদর যুদ্ধের মালে গনীমতের অংশ তিনি সেই পরিমাণই পেয়েছিলেন যা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন মুজাহিদের ভাগে পড়েছিল। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন, উসমান 'আসহাব-ই-বদরের' (বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী) অন্তর্ভুক্ত।

ইবাদতে গভীর নিমগ্নতার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল। তিনি সারারাত নামাযে দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং বছরের পর বছর রোযা রাখতেন। মসজিদে নববীর পার্শ্বস্থিত কিছু জমি তিনি নিজস্ব অর্থ দ্বারা 'আযওয়াজে মুতাহ্হারাত' [হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহধর্মিণীবৃন্দ]-এর জন্য খরিদ করে দিয়েছিলেন।

এক সময় মদীনা তাইয়িবাতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি অভাবগ্রস্ত সকল লোকের আহার্যের ব্যবস্থা করেন। মুসলমানগণ যখন মদীনা শরীফে আসেন তখন পানির খুব অভাব ছিল। জনৈক ইয়াহূদীর একটি কুয়া ছিল। সে ঐ কুয়ার পানি অত্যন্ত চড়া দামে বিক্রি করত। হযরত উসমান (রা) পঁয়ত্রিশ হাজার দিরহাম দিয়ে ইয়াহূদীর কাছ থেকে ঐ কুয়াটি খরিদ করে জনসাধারণের জন্য 'ওয়াক্ফ' (উৎসর্গ) করেছেন। তিনি কখনো মিথ্যা কথা বলেন নি। ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনি প্রতি সপ্তাহে একটি ক্রীতদাস খরিদ করে আযাদ (মুক্ত) করে দিতেন। তিনি তাঁর বিত্তবৈভব নিয়ে কখনো অহংকার করেন নি। জাহিলিয়ার যুগেও তিনি কখনও মদ পান করেন নি। তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে ও সতর্কতার সাথে হযরত রাসূলে করীম (রা)-এর হাদীস বর্ণনা করতেন। তাবুক যুদ্ধ উপলক্ষে তিনি সাড়ে ছয়শ' উট ও পঞ্চাশটি ঘোড়া মহান আল্লাহ্র রাহে দান করেছিলেন। জাহিলিয়া যুগেও তিনি মক্কা মুকার্‌রমার উমরা তথা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে পরিগণিত হতেন।

মুবারক আকার-আকৃতি

তিনি মধ্যমাকৃতির এবং ঘন শ্মশ্রুবিশিষ্ট সুশ্রী চেহারার লোক ছিলেন। তবে চেহারায় বসন্তের দাগ ছিল। দাড়িতে মেহেদী রং লাগাতেন। তাঁর হাড় ছিল চওড়া, দেহের গৌর বর্ণের মধ্যে লালিমা ঝিলমিল করত। পায়ের নলি ছিল ভরা ভরা। হাত অপেক্ষাকৃত লম্বা, মাথার চুল কোঁকড়ানো এবং দুই কাঁধের মধ্যে বেশ খানিকটা দূরত্ব ছিল। দাঁতগুলো ছিল খুবই সুন্দর; কানের পার্শ্ববর্তী কেশদাম ছিল নীচের দিকে প্রলম্বিত। আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাযম (রা) বলেন, আমি হযরত উসমান (রা)-এর চাইতে অধিক সুন্দর কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোক দেখি নি।

নির্বাচন

হযরত ফারূকে আযম (রা) খলীফা নির্বাচনের জন্য তিনদিন সময় দিয়েছিলেন। উপরন্তু, তিনি হযরত মিকদাদ (রা)-কে ওসীয়ত করে গিয়েছিলেন যাঁদের নাম খিলাফতের জন্য প্রস্তাব

করা হয়েছে, তাঁরা মজলিসে বসে পরস্পর আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে খলীফা নির্বাচন না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত যেন অন্য কাউকে ভিতরে যেতে দেওয়া না হয়। অবশ্য নিজস্ব অভিমত প্রদানের জন্য শুধু হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-কে ভিতরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, যাতে অভিমত প্রদানকারীদের সংখ্যা বেজোড় (অর্থাৎ সাত) হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতা নির্ণয়ও সহজ হয়। আর হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) সম্পর্কে হযরত ফারূকে আযম (রা) প্রথম থেকেই এ নির্দেশ জারি করে রেখেছিলেন যে তাঁকে কখনো খলীফা নির্বাচন করা যাবে না। তখন জনৈক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা)-কে খলীফা নির্বাচন করার জন্য হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর কাছে সুপারিশ করলে তিনি উত্তরে বলেছিলেন, খিলাফতের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আমার ভোগান্তি কি কম হয়েছে যে, আমি আমার বংশের অন্য লোকের উপরও এ বোঝা উঠিয়ে দিয়ে যাব এবং তাদেরকে জীবনের আরাম-আয়েশ থেকে বঞ্চিত রাখব ? জনৈক ব্যক্তি যখন হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর কাছে এ মর্মে আবেদন জানায় যে আপনি নির্দিষ্ট কোন এক ব্যক্তিকে খলীফা মনোনীত করে যান—তখন তিনি বলেন, হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর রীতি অনুযায়ী যদি আমি কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে খলীফা মনোনীত নাও করি তবু তা আমার জন্য অবৈধ হবে না। আমি আমার পর যদি কাউকে খলীফা মনোনীত করি, তাহলে তিনি হবেন হযরত আবূ উবায়দা ইব্‌ন জাররাহ্ (রা)। কিন্তু, তিনি তো আমার আগেই ইনতিকাল করেছেন। হযরত আবূ হুযায়ফা (রা)-এর ক্রীতদাস হযরত সালিম (রা)-কেও আমি আমার পরবর্তী খলীফা মনোনীত করতে পারতাম। কিন্তু তিনিও তো আমার পূর্বেই দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন। তারপর তিনি খলীফা পদের জন্য ছয় ব্যক্তির নাম পেশ করেন যা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

হযরত মিকদাদ ইব্‌ন আল-আসওয়াদ (রা) এবং হযরত আবূ তালহা আনসারী (রা) হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর ওসীয়াত মুতাবিক নতুন একজন খলীফা নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত হযরত সুহায়ব (রা)-কে সাময়িকভাবে (তিন দিনের জন্য) মদীনার শাসনকর্তা (ইমাম) নিয়োগ করেন এবং হযরত আলী (রা), হযরত উসমান (রা), হযরত যুবায়র (রা), হযরত সা'দ (রা), হযরত আবদুর রহমান (রা) এবং হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা)-এর ঘরে হযরত মিসওয়ার ইবন মাখরামা এবং অন্য এক বর্ণনামতে, হযরত আয়িশা (রা)-এর ঘরে একত্রিত করেন এবং অন্য কেউ যাতে সে ঘরে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য নিজের লোকদের নিয়ে দরজায় বসে থাকেন। হযরত তালহা (রা) তখন মদীনা শরীফ ছিলেন না। কাজেই অন্য কারো সে ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি ছিল না। হযরত আমর ইবন 'আস (রা) ও হযরত মুগীরা ইব্‌ন শু'বাহ (রা) একবার ঘরের দরজায় এসে বসেছিলেন। হযরত সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা) তা জানতে পেরে তাঁদের সেখান থেকে উঠিয়ে দেন, যাতে তারা কখনো একথা বলতে না পারেন যে, আমরা মজলিসে শূরার অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। যখন সবাই সুস্থির হয়ে সেখানে এসে বসেন, তখন সর্বপ্রথম হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) দাঁড়িয়ে বলেন, খলীফা পদের জন্য যাদের নাম প্রস্তাব করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে এমন কে আছেন, যিনি এ পদ থেকে তাঁর নাম প্রত্যাহার করে নিতে আগ্রহী ? যিনি তা করবেন তাঁকে এ অধিকার দেওয়া হবে যে, তিনি যেন তোমাদের মধ্যে যাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক যোগ্য মনে করেন, তাঁকেই খলীফা

নির্বাচত করেন। একথা শুনে মজলিসের সবাই নিরুত্তর থাকেন। অল্প কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) পুনরায় ঘোষণা করেন, আমি আমার নাম প্রত্যাহার করে নিলাম এবং খলীফা নির্বাচনের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করলাম। এ কথায় উপস্থিত সকলেই সায় দিলেন এবং হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা)-কে এ অধিকার প্রদান করলেন যেন তিনি তাঁদের মধ্য থেকে যাকে চান তাঁকেই খলীফা নির্বাচন করেন। অবশ্য হযরত আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) তখন সম্পূর্ণ নীরব থাকেন। তিনি হ্যাঁ বা না কিছুই বলেন নি। তখন হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) হযরত আলী (রা)-কে সম্বোধন করে বলেন, 'আপনি তো কিছু বললেন না। আপনিও আপনার মত প্রকাশ করুন। হযরত আলী (রা) তখন বলেন, আমিও আপনাদের সাথে একমত, তবে এ শর্তে যে, আপনি প্রথমে এ মর্মে প্রতিশ্রুতি দেবেন যে, আপনি যে সিদ্ধান্ত নেবেন, তা শুধুমাত্র ন্যায়, সত্য ও উম্মতের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে নেবেন এবং তাতে পক্ষপাতিত্ব বা ব্যক্তিস্বার্থ স্থান দেবেন না। হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) বলেন, আমি আপনাকে সে প্রতিশ্রুতি দিলাম যে আমি যে সিদ্ধান্ত নেব তা পক্ষপাতিত্ব বা ব্যক্তিস্বার্থের বশবর্তী হয়ে নয় বরং উম্মতের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধন এবং ন্যায় ও সত্যের খাতিরেই নেব। কিন্তু আপনাদেরকেও এ প্রতিশ্রুতি প্রদান করতে হবে যে, যাঁকেই আমি নির্বাচন করবো, আপনারাও সন্তুষ্টচিত্তে তাঁকে মেনে নেবেন এবং যে আমার মতের ও আমার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করবে, আপনারা সকলে তাঁর বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করবেন। একথা শুনে হযরত আলী (রা)-সহ উপস্থিত সকলেই অঙ্গীকার করেন : আমরা নির্দ্বিধায় আপনার সিদ্ধান্ত মেনে নেব এবং তা বাস্তবায়নে আপনাকে সাহায্য করবো।

এ অঙ্গীকার ও পাল্টা অঙ্গীকারের পর সেদিনের বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয় এবং সবাই নিজ নিজ ঘরে চলে যান। তারপর হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) প্রাজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ এবং বিখ্যাত সাহাবায়ে কিরামের সাথে সাক্ষাৎ করে এ ব্যাপারে তাঁদের মতামত জানার চেষ্টা করেন। নিজেও এ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে থাকেন। হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) থেকে বর্ণিত আছে– তিনি বলেন, আমি হযরত উসমান (রা)-কে একান্ত নিভৃতে জিজ্ঞেস করলাম, আমি যদি আপনার হাতে বায়'আত না করি, তাহলে আপনি প্রস্তাবিত ছয়জনের মধ্য থেকে কার হাতে বায়'আত করতে বলবেন ? তিনি জবাব দেন, হযরত আলী (রা)-এর হাতেই বায়'আত করা উচিত। তারপর আমি হযরত আলী (রা)-কেও একান্ত নির্জনে অনুরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে তিনি হযরত উসমান (রা)-এর নাম উল্লেখ করেন। তারপর আমি অন্যান্য বিজ্ঞ ব্যক্তিকেও অনুরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলাম। তখন দেখা গেল, সংখ্যাগরিষ্ঠের মত হযরত উসমান (রা)-এর পক্ষে রয়েছে। নির্ধারিত তিন দিনের শেষ রাত্রিতে উল্লিখিত ব্যক্তিবৃন্দ পুনরায় ঐ ঘরে সমবেত হন। তখন আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) হযরত যুবায়র (রা) ও হযরত সা'দ (রা)-কে পৃথকভাবে ডেকে নিয়ে বলেন, সাধারণভাবে সবাই হযরত আলী (রা) ও হযরত উসমান (রা)-এর পক্ষেই মত প্রকাশ করেছেন। একথা শুনে হযরত সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) বলেন, আপনি স্বয়ং আমাদের বায়'আত নিয়ে নিন এবং এসব ঝগড়া থেকে আমাদের মুক্ত করে দিন। হযরত আবদুর রহমান (রা) বলেন, তা কি করে সম্ভব। আমি তো খলীফা পদের জন্য প্রস্তাবিত ব্যক্তিবর্গের তালিকা থেকে আমার নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছি। তারপর হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা)

হযরত উসমান ও হযরত আলী (রা)-কে পৃথক পৃথকভাবে ডেকে নিয়ে তাঁদের সাথে কথাবার্তা বলেন। একলা পরামর্শ ও কথোপথনের মধ্যে সারা রাত কেটে যায়। পরবর্তী ভোরেই কিন্তু খলীফা নির্বাচনের ঘোষণা দিতে হবে। ফজরের নামাযের পর সমগ্র মসজিদ লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) খলীফা পদের জন্য কার নাম ঘোষণা করেন, তা শোনার জন্য সকলে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) কিছু বলার পূর্বেই এমন কিছু লোক এ ব্যাপারে নিজেদের মত প্রকাশ করতে শুরু করেন, যাঁরা উপদেষ্টা কমিটির সদস্য ছিল না। যেমন, হযরত আম্মার (রা) বলেন, আমি হযরত আলী (রা)-কে খলীফা পদের জন্য সর্বাধিক যোগ্য মনে করি। হযরত ইব্‌ন আবূ সারাহ্ ও হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাবীআ (রা) বলেন, আমরা হযরত উসমান (রা)-কেই এ পদের জন্য সর্বাধিক যোগ্য মনে করি। যখন এ ধরনের কথাবার্তা শুরু হল, তখন হযরত সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা)-কে বললেন, আপনি এখনো দেরি করছেন কেন ? মুসলমানগণের মধ্যে ফিত্‌না (বিশৃঙ্খলা) সৃষ্টি হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। কাজেই যত শীঘ্র সম্ভব আপনি আপনার অভিমত ব্যক্ত করে বিষয়টি মিটমাট করে ফেলুন। তখন হযরত আবদুর রহমান (রা) উঠে দাঁড়িয়ে জনতাকে সম্বোধন করে বলেন, খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে আমি প্রত্যেক স্তরের ও প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মতামত জানার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। এক্ষেত্রে আমি মোটেই আলস্য করি নাই বা অসতর্কও হইনি। কাজেই আমার সিদ্ধান্ত কেউ অস্বীকার করবে সে সুযোগ বাকী নেই। কেননা, পরামর্শ কমিটি এবং খলীফা পদের জন্য যাঁদের নাম প্রস্তাব করা হয়েছিল, তাঁদের সকলেই আগ্রহ সহকারে ও সানন্দচিত্তে আমার সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা স্বীকার করে নিয়েছেন এবং এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে গিয়ে আমি আমার সমগ্র শক্তি কাজে লাগিয়েছি। একথা বলার পর তিনি হযরত উসমান গনী (রা)-কে তাঁর কাছে ডেকে নিয়ে বলেন, আপনি অস্বীকার করুন যে, মহান আল্লাহ্ ও মহান আল্লাহ্‌র পিয়ারা রাসূলের হুকুম এবং হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা)-এর আদর্শ অনুসরণ করে চলবেন। হযরত উসমান (রা) অঙ্গীকার করেন যে, তিনি সে অনুযায়ী চলার যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। তারপর হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) হযরত উসমান (রা)-এর হাতে বায়'আত করেন এবং তাঁর দেখাদেখি অন্যান্য সবাই হযরত উসমান (রা)-এর হাতে বায়'আত করতে থাকে। প্রথম এ দৃশ্য হযরত আলী (রা)-এর মনঃপূত হয়নি। তাই তিনি মসজিদ থেকে বেরিয়ে যেতে থাকেন, তারপর কি চিন্তা করে অত্যন্ত দ্রুত বেগে ও ব্যস্তত্রস্ত হয়ে সারির পর সারি অতিক্রম করে সোজা এগিয়ে গিয়ে হযরত উসমান গনী (রা)-এর হাতে বায়'আত করেন। হযরত তালহা (রা) ঐ দিন অর্থাৎ ১লা মুহাররম মদীনা শরীফে ছিলেন না। তাই তিনি পরামর্শ সভায় যোগদান করতে পারেননি। হযরত তালহা (রা) পরদিন অর্থাৎ ২রা মুহাররম (হিজরী ২৪ সন) মদীনা তাইয়িবাতে আসেন। যখন তিনি শোনেন যে সকল লোক সর্বসম্মতিক্রমে হযরত উসমান (রা)-এর হাতে বায়'আত করেছেন তখন নিজেও বায়'আত করার উদ্দেশ্যে হযরত উসমান (রা)-এর দরবারে উপস্থিত হন। হযরত উসমান (রা) তাঁকে দেখেই বলেন, আপনার অনুপস্থিতিতেই আমাকে খলীফা নির্বাচন করা হয়েছে। আপনার জন্য বেশী দিন অপেক্ষা করা সম্ভবও ছিল না। তবু আপনি যদি খলীফা পদের দাবীদার হন, তাহলে আমি আপনার পক্ষে খিলাফতের দায়িত্ব ছেড়ে দিতে প্রস্তুত আছি। হযরত তালহা (রা) বলেন,

যখন সবাই খলীফা হিসাবে আপনার হাতে বায়'আত করেছে তখন আমিও আপনাকে খলীফা হিসাবে মেনে নিতে সম্মত আছি। মুসলমানগণের মধ্যে কোন বিশৃঙ্খলা বা মতানৈক্যের সৃষ্টি হোক আমি তা চাই না। এ বলে তিনি হযরত উসমান (রা)-এর হাতে বায়'আত করেন।

বায়'আত গ্রহণ পর্ব শেষ হওয়ার পর হযরত উসমান গনী (রা) মিম্বরে দাঁড়িয়ে সকলকে সম্বোধন করে পুণ্যকর্মের (আমলে সালিহার) প্রতি উৎসাহিত করেন, বিত্ত-সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে মানুষের মধ্যে যে শৈথিল্য ও কর্মবিমুখতা দেখা দেয় সে সম্পর্কে সতর্ক করেন এবং মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিকে সব কিছুর উপর প্রাধান্য দেওয়ার উপদেশ দেন। তারপর প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও কর্মকর্তাদের নামে এক নির্দেশ জারি করেন, যাতে হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর ইনতিকাল এবং তাঁর নিজের খলীফা নির্বাচিত হওয়ার বিবরণ ছিল। তাতে সবাইকে তাগিদ দেওয়া হয় যেন তারা হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর খিলাফতকালে যেরূপ বিশ্বস্ততার সাথে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করেছেন, তাঁর খিলাফত কালেও সেরূপ করে যান।

হযরত উসমান (রা)-এর দরবারে প্রথম ভূমিকা

হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর শাহাদতের (মৃত্যুর) কয়েক দিন পূর্বে একবার আবূ লুলূ একটি খঞ্জর নিয়ে হরমুযানের কাছে যায়। ইনি সেই ইরানী নেতা হরমুযান যিনি হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায়ই বসবাস করছিলেন। আবূ লুলূ হরমুযানের কাছে বসে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে। সেখানে তখন হীরার অধিবাসী জাফীনাহ্ নামীয় একজন ক্রীতদাসও বসা ছিল। হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বকর (রা) এ তিনজনকে একত্রে বসে আলাপ-সালাপ করতে দেখেছিলেন। কিন্তু তাকে সেদিকে আসতে দেখে আবূ লুলূ সেখান থেকে উঠে চলে যায়। কিন্তু যে খঞ্জরটি সে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল, উঠে দাঁড়াবার সময় তা তার হাত থেকে পড়ে যায়। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই সে তা উঠিয়ে নেয়।

হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বকর (রা) এ বিষয়টিও লক্ষ্য করছিলেন। কিন্তু এতে তার অন্তরে কোনরূপ সন্দেহের সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু যখন আবূ লুলূ হযরত ফারূকে আযম (রা)-কে আহত করে এবং ধৃত হয়ে আত্মহত্যা করে, তখন তার কাছ থেকে যে খঞ্জরটি উদ্ধার করা হয় তা হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বকর (রা) চিনে ফেলেন। এ সেই খঞ্জর, যা কিছু দিন পূর্বে তিনি আবূ লুলূর কাছে দেখেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঐ হরমুযানের কাছে আবূ লুলূর গমন, তাদের পরস্পর আলাপ-সালাপ, জাফীনাহ্ নামক খ্রিস্টান ক্রীতদাসের সেখানে উপস্থিতি সবাইকে বলে দেন। হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর শাহাদতের পর যখন তাঁর অপর ছেলে উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) উপরোক্ত ঘটনার কথা শোনেন, তখন অত্যন্ত রাগান্বিত হন এবং প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করতে গিয়ে প্রথম সুযোগেই হরমুযানকে আক্রমণ করে বসেন। হরমুযানকে আহত হয়ে ভূলুণ্ঠিত হতে দেখে হযরত সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) হযরত উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-কে পাকড়াও করতে ছুটে যান। কিন্তু তখন হযরত উবায়দুল্লাহ্ (রা) জাফীনাহকে হত্যা করার জন্য তার তালাশে অত্যন্ত দ্রুতবেগে ছুটতে থাকেন। অবশ্য জাফীনাহকে হত্যা করার পূর্বেই হযরত সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস হযরত উবায়দুল্লাহ্‌কে ধরে ফেলেন। যেহেতু তখন পর্যন্ত কেউ খলীফা পদে নির্বাচিত হন নি এবং হযরত সুহায়ব (রা) সাময়িকভাবে খিলাফতের প্রয়োজনীয় দায়িত্বসমূহ পালন করছিলেন, তাই

হযরত সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) হযরত উবাদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-কে সুহায়ব (রা)-এর হাতে অর্পণ করেন। তিনি হযরত উবায়দুল্লাহ্ (রা)-কে বন্দী করে রাখেন।

যখন হযরত উসমান গনী (রা) খলীফা নির্বাচিত হলেন, মসজিদে নববীতে সাধারণভাবে বায়'আত গ্রহণ করা হলো এবং হযরত উসমান (রা) খলীফা হিসাবে তাঁর উদ্বোধনী ভাষণও পেশ করলেন, তখন সর্বপ্রথম তাঁর দরবারে উপরোক্ত মকদ্দমা পেশ করা হল। হযরত উবায়দুল্লাহ্ (রা)-কে খলীফার সামনে পেশ করার পর যখন হরমুযানের হত্যা সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়, তখন তিনি তাঁর সত্যতা স্বীকার করেন। তারপর হযরত উসমান গনী (রা) সাহাবায়ে কিরামের সাথে এ সম্পর্কে সলা-পরামর্শ করলেন। হযরত আলী (রা) এ অভিমত ব্যক্ত করলেন যে, হরমুযানের হত্যার কিসাসে (বদলা স্বরূপ) উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-কে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া উচিত। কিন্তু হযরত আমর ইব্ন 'আস (রা) হযরত আলী (রা)-এর ঐ মতের বিরোধিতা করে বললেন, তা কোনমতেই সমীচীন নয় যে, এ মাত্র (তিন দিন পূর্বে) যাঁর পিতা শহীদ (নিহত) হয়েছেন তাকে এখন আপনারা হত্যা করে ফেলবেন। উপস্থিত সবাই হযরত আমর ইব্ন 'আস (রা)-এর রায়কে সমর্থন করেন। হযরত উসমান গনী (রা) প্রথমে কিছুটা ইতস্তত করেন। তারপর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠেন, এ ঘটনাটি না হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর খিলাফতকালে ঘটেছে, আর না আমার খিলাফতকালে। আর যেহেতু তা আমার খিলাফতকালে ঘটেনি বরং আমি খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পূর্বেই ঘটেছে, তাই এজন্য আমাকে দায়ী করা চলে না। তারপর তিনি এ উৎকৃষ্টতম পন্থাটি গ্রহণ করেন যে, তিনি স্বয়ং হযরত উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর অভিভাবক হয়ে নিজের কাছ থেকেই হরমুযান হত্যার 'দিয়াত' (রক্তমূল্য) পরিশোধ করে দেন। তারপর মিম্বরে দাঁড়িয়ে একটি জ্বালাময়ী বক্তৃতা করেন। এভাবে সকল লোক তার এ ফায়সালায় রাযী হয়ে গেল এবং হযরত উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) কিসাস থেকে রক্ষা পেলেন।

বিভিন্ন রাজ্যের গভর্নর বা কর্মকর্তা

হযরত উসমান গনী (রা) যখন খলীফা নির্বাচিত হন, তখন ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশে ও রাজ্যে হযরত ফারূকে আযম (রা) কর্তৃক নিয়োগকৃত যেসব প্রশাসক বা কর্মকর্তা কার্যরত ছিলেন।

প্রদেশ বা রাজ্যের নাম	নিয়োগকৃত প্রশাসক বা কর্মকর্তার নাম
১. মক্কা মুকাররমা	হযরত নাফি' ইব্ন আবদুল্লাহ্ হারাছ (রা)
২. তায়িফ	হযরত সুফিয়ান ইব্ন আবদুল্লাহ্ সাকাবী (রা)
৩. ইয়ামন	হযরত ইয়ালা ইব্ন উমাইয়া (রা)
৪. আম্মান	হযরত হুযায়ফা ইব্ন মুহসিন (রা)
৫. দামিশক	হযরত মুআবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ান (রা)
৬. মিসর	হযরত আমর ইব্ন 'আস (রা)
৭. হিম্স	হযরত উমর ইব্ন সাআদ (রা)
৮. উর্দূন (জর্দান)	হযরত উমর ইব্ন উতবা (রা)
৯. বসরা	হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা)

১০. কূফা — হযরত মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা)
১১. বাহরায়ন — হযরত উসমান ইব্ন আবুল 'আস (রা)

কর্মকর্তাগণের পদচ্যুতি ও নিযুক্তি সম্পর্কে হযরত উসমান গনী (রা) সর্বপ্রথম যে হুকুম জারি করেন, তা ছিল এই যে, তিনি হযরত মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা)-কে কূফার গভর্নর পদ থেকে অপসারণ করে মদীনা তাইয়িবাতে ডেকে পাঠান এবং তার জায়গায় হযরত সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-কে কূফার গভর্নর নিয়োগ করেন। জনগণ এ নিযুক্তি ও পদচ্যুতির কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, হযরত মুগীরা (রা)-কে কোন ত্রুটির কারণে পদচ্যুত করা হয়নি, বরং হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর ওসীয়ত অনুযায়ী এ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। তিনি ইনতিকালের পূর্বে তাঁর এ অন্তিম ইচ্ছার কথা আমার কাছে ব্যক্ত করেছিলেন।

উসমানী খিলাফত আমলের উল্লেখযোগ্য ঘটনাসমূহ

ইসকান্দারিয়া (আলেকজান্দ্রিয়া) বিজয়

হযরত উসমান গনী (রা)-এর খিলাফতের প্রথম বছর অর্থাৎ হিজরী ২৪ সনে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ইসকান্দারিয়া বিজয়ের সাত মাস পর রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস কনস্টানটিনোপলে পরলোকগমন করেন। বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়ের পর হিরাক্লিয়াস এশিয়া মাইনর ও সিরিয়া থেকে পলায়ন করে কনস্টান্টিনোপলে চলে গিয়েছিলেন এবং মুসলমানগণ ইতিমধ্যে তার সাম্রাজ্যের যেসব এলাকা অধিকার করে নিয়েছিল তা উদ্ধার এবং বাকি এলাকার উপর দখল টিকিয়ে রাখার জন্য তিনি যারপরনাই ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। তারপর হযরত আমর ইব্ন 'আস (রা) যখন মিসর আক্রমণ করে তখন মিসরের শাসনকর্তা মুকাওকিস জিযিয়া দেয়ার শর্তে সন্ধি করে মিসর ও ইসকান্দারিয়া মুসলমানগণের হাতে সমর্পণ করেন। হিরাক্লিয়াস মিসরকে আপন সাম্রাজের একটি প্রদেশ মনে করতেন এবং মুকাওকিস ছিলেন তাঁরই অধীনস্থ ব্যক্তি। তাই যখন তিনি মুসলমানগণের মিসর অধিকারের খবর শোনেন তখন অত্যন্ত ব্যথিত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং সাত মাস পর এ দুশ্চিন্তার মধ্যেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। এ হলো হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর খিলাফতকালীন ঘটনা। হিরাক্লিয়াসের পর তাঁর ছেলে কনস্টানটাইন সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ইসকান্দারিয়া থেকে মুসলমানগণকে হটিয়ে দিয়ে সেখানে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য একটি বিরাট সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। রোমান বাহিনী জাহাজযোগে কনস্টান্টিনোপল থেকে রওনা হয়ে ইসকান্দারিয়া উপকূলে অবতরণ করে। কিন্তু মুকাওকিস রোমানদেরকে ইসকান্দারিয়া প্রবেশ করতে দেন নি। তিনি মুসলমানদেরকে প্রদত্ত আপন প্রতিশ্রুতির উপর অটল থাকেন।

মুসলমানগণ যখন রোমানদের এ আক্রমণ সংবাদ পায় তখন তারা ফুসতাত (কায়রো) থেকে বেরিয়ে পড়েন। অপর দিকে রোমানরা ইসকান্দারিয়া থেকে ইসলামী সেনাছাউনির দিকে অগ্রসর হয়। পথিমধ্যে দু'দলের মধ্যে সংঘর্ষ হয় এবং তা এক ঘোরতর যুদ্ধের রূপ ধারণ করে। তাতে রোমান সেনাপতি ও হাজার হাজার রোমান সৈন্য নিহত হয়। যারা প্রাণে রক্ষা পায়, তারা দ্রুত পালিয়ে গিয়ে নিজেদের জাহাজে আরোহণ করে কনস্টানটিনোপলের দিকে যাত্রা করে। হযরত আমর ইব্ন 'আস (রা) রোমানদেরকে বিতাড়িত করে ইসকান্দারিয়া ও

তৎপার্শ্ববর্তী এলাকার বাসিন্দাদের যাবতীয় ক্ষয়-ক্ষতি, যা রোমান বাহিনীর হামলার কারণে হয়েছিল, নির্ধারণ করে তা সঙ্গে সঙ্গে পূরণের ব্যবস্থা করেন। কেননা, তিনি মনে করতেন যে, যিম্মীদের নিরাপত্তা দান এবং তাদের ধন-সম্পদকে যাবতীয় ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা করা ইসলামী রাষ্ট্রের একজন শাসক হিসাবে তাঁর দায়িত্ব। তারপর হযরত আমর ইব্‌ন 'আস (রা) ইসকান্দারিয়া শহরের রক্ষাপ্রাচীর ধ্বংস করে ফুসতাতের সেনাছাউনিতে ফিরে আসেন। রোমানদের পুনঃ আক্রমণ ও ইসকান্দারিয়া শহরের রক্ষাপ্রাচীর ধ্বংস করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। এ হলো হিজরী ২৫ সনের ঘটনা।

আর্মেনিয়া বিজয়

হযরত ফারূকে আযম (রা) যে অবস্থায় ও যেভাবে শাহাদত বরণ করেন, সে সংবাদ পেয়েই রোমানদের মধ্যে ইসকান্দারিয়া আক্রমণের দুঃসাহস জন্মে। এ খবরে হামাদান, রাই প্রভৃতি ইরানী অঞ্চলেও বিদ্রোহ দেখা দেয়। ইরানীরা বলতে শুরু করে, আমরা আরবদের প্রজা হয়ে থাকব না, বরং নিজেদেরই স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবো। এ সমস্ত বিদ্রোহের খবর শুনে তা দমন করার জন্য হযরত উসমান গনী (রা) হযরত হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা), হযরত বারা ইব্‌ন আযিব (রা), কুরত ইব্‌ন কা'ব (রা) প্রমুখ সেনাপতিকে নির্দেশ দেন এবং তাঁরা শীঘ্রই তা দমন করতে সক্ষম হন। হযরত সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর খিলাফতকালেই পদচ্যুত হয়ে মদীনা শরীফে চলে এসেছিলেন। হযরত উসমান গনী খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েই হযরত সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-কে পুনরায় গভর্নর পদে নিয়োগ করেন। ঐ সময়ে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) কূফায় বায়তুল মালের কর্মকর্তা বা ট্রেজারী অফিসার ছিলেন।

হযরত সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) যিনি কূফার গভর্নর হয়ে এসেছিলেন, ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ট্রেজারী অফিসার হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর কাছ থেকে কিছু ঋণ গ্রহণ করেন। কিছু দিন পর যখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) ঐ ঋণ পরিশোধের জন্য তাগাদা দেন, তখন হযরত সা'দ (রা) তা পরিশোধ করতে পারেন নি। এ বিষয়টি কেন্দ্র করে তাঁদের উভয়ের মধ্যে মন কষাকষি ও অসন্তোষের সৃষ্টি হয় এবং এ খবর যখন মদীনা শরীফে হযরত উসমান গনী (রা)-এর কানে গিয়ে পৌঁছে তখন তিনি হযরত সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-কে (হিঃ ২৫ সনে) পদচ্যুত করে তাঁর স্থলে হযরত ওয়ালীদ ইব্‌ন উকবা ইব্‌ন আবূ মুয়ীত (রা)-কে কূফার গভর্নর নিয়োগ করেন। আযারবায়জান রক্ষার জন্য যে বাহিনী মোতায়েন ছিল তাও কূফার গভর্নরের অধীন মনে করা হত। আর কূফার ছাউনী থেকে পালাক্রমে এক একজন সেনাপতিকে নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য দিয়ে আযারবায়জানে প্রেরণ করা হত। হযরত সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-এর সময়ে উতবা ইব্‌ন ফারকাদ আযারবায়জানে নিযুক্ত ছিলেন। হযরত সা'দ (রা)-কে পদচ্যুত করার পর উতবা ইব্‌ন ফারকাদ (রা)-কেও পদচ্যুত করে আযারবায়জান থেকে ডেকে পাঠানো হয়। আর উতবার সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের সাথে সাথে আযারবায়জানবাসীরা বিদ্রোহ করে বসে। ওয়ালীদ ইব্‌ন উতবা সঙ্গে সঙ্গে আযারবায়জান সৈন্য প্রেরণ করেন। শেষ পর্যন্ত আযারবায়জানবাসীরা পুরাতন শর্তাদির উপরই পুনরায় সন্ধি করে এবং নিয়মিত জিযিয়া পরিশোধ করতে থাকে। ওয়ালীদ ইব্‌ন উকবা যিনি হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর খিলাফতকালে জাযীরার কর্মকর্তা ছিলেন এবং এখন কূফার

গভর্নর নিযুক্ত হয়েছেন, তিনি হযরত উসমান গনী (রা)-এর রিযায়ী ভাই (দুধভাই) ছিলেন। হযরত সা'দ (রা) যেহেতু অত্যন্ত মুত্তাকী ও আল্লাহ্ভীরু লোক ছিলেন এবং যেহেতু ওয়ালীদ ইব্ন উকবা পরহিযগারী ও ইবাদত বন্দেগীর ক্ষেত্রে হযরত সা'দ (রা)-এর সমপর্যায়ে ছিলেন না, তাই কূফাবাসীরা ওয়ালীদ (রা)-এর আগমনে ও হযরত সা'দ (রা)-এর নির্গমনে খুব একটা সন্তুষ্ট ছিল না। ঐ সময়েই ওয়ালীদ ইব্ন উকবা আযারবায়জানে সৈন্য প্রেরণ করেছিলেন।

দামিশকের কর্মকর্তা হযরত আমীর মুআবিয়া (রা) হযরত হাবীব ইবন মাসলামা (রা)-কে আর্মেনিয়ার দিকে প্রেরণ করেছিলেন এবং তিনি সেখানকার বেশীর ভাগ শহর ও দুর্গ জয় করে রোমানদেরকে জিযিয়া প্রদানে বাধ্য করেছিলেন। এ সংবাদ শুনে রোমান সম্রাট কনস্টান্টিনোপলের নির্দেশ অনুযায়ী একজন রোমান সেনাপতি মালীতাবাহ, সিওয়াম, কাউনিয়া প্রভৃতি শহর ও সেনাছাউনি থেকে আশি হাজার সৈন্য সংগ্রহ করে সোজা কনস্টান্টিনোপল উপসাগর দিয়ে হাবীব ইবন মাসলামা (রা)-কে আক্রমণ করে। হযরত হাবীব (রা) শত্রুপক্ষের এ বিরাট বাহিনীর আগমন সংবাদ শুনে সঙ্গে সঙ্গে হযরত আমীরে মুআবিয়া (রা)-কে সে সম্পর্কে অবহিত করেন। হযরত আমীরে মুআবিয়া (রা) সঙ্গে সঙ্গে কূফার গভর্নর ওয়ালীদ ইবন উকবা (রা)-কে লিখেন : "তুমি হাবীব ইব্ন মাসলামা (রা)-এর সাহায্যার্থে অবিলম্বে দশ হাজার সৈন্য আর্মেনিয়ার দিকে পাঠাও।" হযরত উসমান গনী (রা)-এর এ নির্দেশ হযরত ওয়ালীদ ইবন উকবা (রা) মূসেলে প্রাপ্ত হন। তখন তিনি আযারবায়জান বিজয়ের পর কূফার দিকে আসছিলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে হযরত সালমান ইব্ন রাবীআ (রা)-এর নেতৃত্বে আট হাজার সৈন্য আর্মেনিয়ার দিকে প্রেরণ করেন।

হযরত হাবীব ইবন মাসলামা (রা) ও হযরত সালমান ইবন রাবীআ (রা) সম্মিলিতভাবে সমগ্র আর্মেনিয়া দখল করে নেন এবং কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী কোহে কাফে (ককেশাস পর্বতে) গিয়ে পৌঁছেন। সেখানে হযরত সালমান ইবন রাবীআ (রা) শিরওয়ান এবং সমগ্র পার্বত্য এলাকা জয় করে কূফার দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। আর হযরত হাবীব ইবন মাসলামা (রা) দামিশকে হযরত আমীরে মুআবিয়ার কাছে চলে যান। তারপর হযরত আমীরে মুআবিয়া (রা) খোদ একটি বাহিনী নিয়ে রোমান এলাকার উপর চড়াও হন। তখন রোমান বাহিনী আতংকিত হয়ে ইনতাকিয়াহ্ ও তারবাউসের মধ্যবর্তী সমগ্র এলাকা ছেড়ে দ্রুতবেগে পলায়ন করে। হযরত আমীরে মুআবিয়া (রা) ঐ এলাকার কয়েকটি দুর্গে নিজের সেনাছাউনি প্রতিষ্ঠা করেন এবং কিছু কিছু দুর্গ ধ্বংস করে ফেলেন। এ সমস্ত ঘটনা ঘটে হিজরী ২৫ সনে।

মিসরের ঘটনা-বিচিত্রা ও পরিবর্তনসমূহ

হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন সা'দ (রা), যিনি ইব্ন আবূ সারাহ (রা) নামে পরিচিত ছিলেন, হযরত উসমান গনী (রা)-এর দুধভাই ছিলেন। তিনি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে একবার মুরতাদ হয়ে গিয়েছিলেন। পরে অবশ্য আন্তরিকতার সাথে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত উসমান গনী (রা) তাঁকে মিসরের কর্মকর্তা ও ট্রেজারী অফিসার করে পাঠান এবং হযরত আমর ইব্ন 'আস (রা)-কে শুধু সেনাবাহিনীর দায়িত্বে রাখেন। এতে সামরিক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তার মধ্যে মন কষাকষির সৃষ্টি হয়।

হযরত উসমান গনী (রা)-এর কাছে যখন এ সংবাদ পৌঁছে, তখন তিনি হযরত আমর ইব্ন 'আস (রা)-কে সামগ্রিকভাবে পদচ্যুত করে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন সা'দ (রা)-কে মিসর

ও ইসকান্দারিয়ার সম্পূর্ণ অধিকার প্রদান করেন। যদিও আবদুল্লাহ্ ইব্ন সা'দ (রা) হযরত আমর ইব্ন 'আস (রা)-এর মতই আরবের বিখ্যাত বীরযোদ্ধা ও অশ্বারোহীদের মধ্যে গণ্য হতেন, কিন্তু তিনি হযরত আমর ইব্ন 'আস (রা)-এর মত অভিজ্ঞ ও সূক্ষ্মদর্শী ছিলেন না এবং হযরত 'আমর (রা)-এর পদচ্যুতিতে মিসরবাসীরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়– এমন কি, তারা তাদের নতুন শাসক আবদুল্লাহ্ ইব্ন সা'দ (রা)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কায়সার কনস্টানটাইন যখন মিসরের এ অবস্থা এবং হযরত আমর ইব্ন 'আস (রা)-এর পদচ্যুতির কথা জানতে পারেন, তখন তিনি তাঁর একজন অতি পরাক্রমশালী ও অভিজ্ঞ সেনাপতিকে একটি বিরাট সৈন্যবাহিনীসহ নৌকাযোগে ইসকান্দারিয়ার দিকে প্রেরণ করেন। শহরের মধ্যে যত রোমান তথা গ্রীক নাগরিক ছিল, তারা সকলেই এ রোমান বাহিনীর সাথে একাত্ম হয়ে যায়। তারপর মামুলী সংঘর্ষ ও কিঞ্চিৎ রক্তারক্তির পর ইসকান্দারিয়া রোমান সৈন্যদের অধিকারে চলে যায়। এ সংবাদ শুনে হযরত উসমান গনী (রা) হযরত আমর ইব্ন 'আস (রা)-কে পুনরায় মিসরের গভর্নর নিয়োগ করেন। হযরত আমর ইব্ন 'আস (রা) মিসরে উপনীত হয়ে রোমান বাহিনীর বিরুদ্ধে এমন প্রস্তুতি নেন এবং এমনভাবে তাদের মুকাবিলা করেন যে, রোমানরা বিপুল ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয় এবং বাধ্য হয়ে ইসকান্দারিয়া থেকে পলায়ন করে। এবার নিয়ে হযরত আমর ইব্ন 'আস (রা) মোটি তিনবার ইসকান্দারিয়া জয় করেন। এবার ইসকান্দারিয়া আক্রমণের পূর্বে তিনি শপথ নিয়েছিলেন যে, সমগ্র শহরকে একেবারে ধূলিসাৎ করে দেবেন। কিন্তু জয় করার পরই তিনি তাঁর সেনাবাহিনীকে হত্যা, রক্তারক্তি ও লুটপাট থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকার নির্দেশ দেন। যেখানে তিনি এ নির্দেশ দিয়েছিলেন সেখানে একটি মসজিদও নির্মাণ করেন। মসজিদটি 'রহমত' (দয়া) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। যখন হযরত আমর ইব্ন 'আস (রা) মিসরের মুসলমানদের পুরাপুরি অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সুষ্ঠভাবে আইনের শাসন কায়েম করেন, তখন খলীফা হযরত উসমান গনী (রা) হযরত আমর ইব্ন 'আস (রা)-কে মিসরের প্রশাসকের পদ থেকে অপসারণ করে তথায় হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন সা'দ (রা)-কে পুনরায় নিয়োগ করেন। এবার হযরত আমর ইব্ন 'আস (রা) এ পদচ্যুতির কারণে ব্যথিত হন। অপরদিকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন সা'দ তাঁর এ পুনঃ নিয়োগে কিছুটা লজ্জিত হন। কেননা, তিনি মিসরের বিশৃঙ্খলা ও বিরূপ পরিস্থিতি সামাল দিতে না পারায় হযরত আমর ইব্ন 'আস (রা)-কে সেখানে পুনর্নিয়োগ করা হয়েছিল। আর হযরত আমর ইব্ন 'আস সমগ্র পরিস্থিতি শুধরিয়ে নেওয়ার পর পুনরায় তাঁকেই (আবদুল্লাহ্‌কে) মিসরের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করা হল। অবশ্য আগামীতে কিভাবে নিজের অতীতের দুর্নাম মুছে ফেলা যায়, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন সা'দ (রা) এখন সে চিন্তায় নিমগ্ন হন।

আফ্রিকা বিজয়

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন সা'দ (রা) হযরত উসমান গনী (রা)-এর কাছে উত্তর আফ্রিকায় বিজয় অভিযান পরিচালনার অনুমতি প্রার্থনা করেন। এ যুগে তো আফ্রিকা একটি মহাদেশের নাম, কিন্তু ঐ যুগে আফ্রিকা নামে একটি রাজ্যও ছিল, যা ত্রিপলী থেকে তান্‌জা (তাঞ্জানিয়া) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অবশ্য ঐ যুগে সম্মিলিতভাবে ঐ সমস্ত দেশকেও আফ্রিকা বলা হত, যা আজকাল আফ্রিকা মহাদেশের উত্তরাংশে অবস্থিত (যেমন ত্রিপলী, আলজিরিয়া, তিউনিসিয়া, মরক্কো ইত্যাদি)।

হযরত উসমান গনী (রা) হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন সা'দ (রা)-কে উত্তর আফ্রিকায় সৈন্য প্রেরণের অনুমতি প্রদান করেন। হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) দশ হাজার সৈন্য নিয়ে মিসর থেকে বের হন এবং বারকাহ্ এলাকার সীমান্তবর্তী গোত্রপতিদের পরাজিত করেন। হযরত আমর ইব্ন 'আস (রা)-এর শাসনামলেও ঐ সমস্ত গোত্রপতিদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করা হয়েছিল এবং তারা জিযিয়া প্রদানের শর্তে হযরত আমর ইব্ন 'আস (রা)-এর সাথে সন্ধি স্থাপনে বাধ্য হয়েছিল। অবশ্য পরে সুযোগ বুঝে তারা স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল। এবারও তারা জিযিয়া প্রদানের শর্তে সন্ধি করে মুসলমানদের বশ্যতা স্বীকার করে। তারপর যখন হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন সা'দ (রা) রাজ্যের মধ্যাংশ এবং ত্রিপলীর দিকে অগ্রসর হন, তখন হযরত উসমান গনী (রা) তাঁর সাহায্যের জন্য মদীনা শরীফ থেকে একটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা), হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা), হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা), হযরত আমর ইব্ন 'আস (রা), হযরত হুসায়ন ইব্ন আলী (রা), হযরত ইব্ন জা'ফর (রা) প্রমুখ ঐ বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ঐ বাহিনী যখন মিসর অতিক্রম করে বারকায় গিয়ে পৌঁছে তখন হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন সা'দ (রা) তাঁদেরকে অভ্যর্থনা জানান। এবার সম্মিলিত বাহিনী ত্রিপলীর দিকে অগ্রসর হয়। রোমানরা ত্রিপলী থেকে বের হয়ে মুসলমানদের মুখোমুখি হয়, কিন্তু পরাজিত হয়ে পলায়ন করে। মুসলমানগণ ত্রিপলী দখল করে সেখানে নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করে। তারপর মূল আফ্রিকা রাজ্যের দিকে রওয়ানা হয়। তখন আফ্রিকার রাজা ছিলেন জর্জীর (গ্রেগরী) এবং আফ্রিকা ছিল কায়সারের অধীনে একটি করদ রাজ্য। রাজা জর্জীর যখন ইসলামী বাহিনীর আগমন সংবাদ জানতে পারেন তখন তিনি এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্য একত্র করে একদিন ও এক রাত্রির দূরত্ব অতিক্রম করে আগে বেড়েই মুসলমানগণের মুকাবিলা করেন। উভয় বাহিনী যখন মুখোমুখি দাঁড়ায় তখন হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন সা'দ সর্বপ্রথম খ্রিস্টান বাহিনীকে ইসলামের দাওয়াত দেন। জর্জীর যখন পরিষ্কার ভাষায় এ দাওয়াত অস্বীকার করল, তখন তাকে জিযিয়া প্রদানের জন্য বলা হল। যখন সে পরিষ্কার ভাষায় তাও অস্বীকার করল তখন মুসলমানগণ সারিবদ্ধভাবে তাদেরকে আক্রমণ করে বসল। এমন ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হয় যে, জয় পরাজয় সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা এক দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এরই মধ্যে মুসলিম বাহিনীর সাহায্যার্থে একদল সৈন্য এসে পৌঁছে এবং তাদেরকে দেখে সমগ্র বাহিনী উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর ধ্বনি দিয়ে উঠে।

মূল ঘটনা হলো, অতিশয় দূরত্বের কারণে আফ্রিকার মুসলিম বাহিনীর সংবাদ যথাসময়ে মদীনা শরীফে পৌঁছতে পারেনি। হযরত উসমান গনী (রা) যখন দেখেন যে, আফ্রিকার ঐ বাহিনীর সংবাদ পেতে অনেক বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে তখন তিনি হযরত আবদুর রহমান ইব্ন যুবায়র (রা)-এর নেতৃত্বে একদল সৈন্য আফ্রিকার দিকে প্রেরণ করেন। হযরত আবদুর রহমান ইব্ন যুবায়র (রা) তাঁর সেনাদল নিয়ে যখন মূল ইসলামী বাহিনীর সাথে মিলিত হন, তখন মুসলমানগণ তাকবীর ধ্বনি দিয়ে উঠে। জর্জীরের বাহিনী এ তাকবীর ধ্বনি শুনে যখন জিজ্ঞেস করল, মুসলমানগণের মধ্যে এ ধরনের ধ্বনি উঠল কেন–তখন তাদেরকে বলা হল, মুসলমানদের একটি নতুন দল মূল বাহিনীর সাহায্যার্থে এসে পৌঁছেছে। জর্জীর এটা শুনে খুবই চিন্তিত হন। কিন্তু ঐ দিন যুদ্ধের কোন ফায়সালা হলো না। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে উভয় বাহিনী নিজ নিজ তাঁবুতে ফিরে গেল। পরদিন যখন যুদ্ধ শুরু হলো তখন হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন

যুবায়র (রা), হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'দ (রা)-কে যুদ্ধক্ষেত্রে না দেখে তাঁর অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞেস করেন। তখন তাঁকে বলা হয় যে, জর্জীর আজ এ মর্মে এক ঘোষণা দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'দ (রা)-এর ছিন্ন মস্তক নিয়ে আসতে পারবে সে পুরস্কার স্বরূপ এক লক্ষ দীনার পাবে এবং তার সাথে জর্জীর আপন মেয়েকেও বিয়ে দেবেন। কাজেই, হযরত আবদুল্লাহ, ইব্‌ন সা'দ (রা) প্রাণের ভয়ে আজ যুদ্ধক্ষেত্রে আসেন নি। একথা শুনে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'দ (রা)-এর তাঁবুতে গিয়ে তাঁকে বললেন : তুমিও তোমার সেনাবাহিনীর মধ্যে এ ঘোষণা দাও যে, যে ব্যক্তি জর্জীরের ছিন্ন মস্তক নিয়ে আসতে পারবে, তাকে মালে গনীমত থেকে এক লক্ষ দীনার দেওয়া হবে এবং জর্জীরের মেয়েকেও তার সাথে বিয়ে দেয়া হবে। উপরন্তু, তাকে জর্জীরের রাজ্যের প্রশাসকও নিযুক্ত করা হবে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন সা'দ (রা) তাঁর সমগ্র বাহিনীর মধ্যে ঐ ঘোষণা প্রদান করেন। ফলে জর্জীর ভয়ানক বিপদের সম্মুখীন হন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'দ (রা)-ও যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হন। আজও উভয় বাহিনীর মধ্যে ফায়সালা হয়নি। রাতের বেলা পরামর্শ সভা বসল। তাতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) এ অভিমত প্রদান করেন যে, আগামীকাল ইসলামী বাহিনীর অর্ধেক সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে শত্রুদের মুকাবিলা করবে এবং বাকী অর্ধেক নিজ নিজ তাঁবুতে অবস্থান করবে। যখন উভয় বাহিনীর মধ্যে যথারীতি সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধ চলবে এবং ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে একে অপর থেকে পৃথক হয়ে নিজ নিজ তাঁবুতে চলে যাবে, ঠিক তখনি তাঁবুতে অপেক্ষমাণ সৈন্যরা তরবারি নিয়ে রোমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। এতে শীঘ্রই যুদ্ধের একটা চূড়ান্ত ফায়সালা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা)-এর এ অভিমত সকলেই পছন্দ করেন। পরদিন অর্থাৎ যুদ্ধের তৃতীয় দিন মুসলিম বাহিনীর অর্ধেক সৈন্য যুদ্ধ করতে থাকে এবং বাকি অর্ধেক হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা)-এর নেতৃত্বাধীন নিজ নিজ তাঁবুতে অপেক্ষা করতে থাকেন। দুপুর পর্যন্ত উভয় বাহিনী লড়তে থাকেন এবং দুপুরের পর একে অপর থেকে পৃথক হয়ে যান। ঠিক সেই মুহূর্তে হযরত ইব্‌ন যুবায়র (রা) তাঁবুতে অপেক্ষমাণ সৈন্যদের নিয়ে রোমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। রোমানরা এ আকস্মিক অথচ জোরদার অভিযান সহ্য করতে না পেরে নিজ নিজ তাঁবুতে আশ্রয় নেয়। কিন্তু সেখানেও তারা পরিত্রাণ পায়নি। মুসলমান সৈন্যগণ তাদেরকে বন্দী ও হত্যা করতে থাকে।

জর্জীর হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা)-এর হাতে নিহত হন। পরদিন মুসলমানগণ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এগিয়ে চলে এবং আফ্রিকার রাজধানী সাবীতালাহ্ মুসলমানগণের অধিকারে আসে এবং সেখান থেকে গনীমতস্বরূপ অপরিসীম ধন-সম্পদ মুসলমানগণের হস্তগত হয়। বন্টনের পর এক একজন অশ্বারোহীর ভাগে তিন হাজার দিরহাম পড়ে। সাবীতালাহ নগরী দখলের পর মুসলমানগণ আরো অগ্রসর হয়ে 'জাম্ম' দুর্গ অবরোধ করেন। দুর্গটি ছিল অত্যন্ত মজবুত ও সুদৃঢ়। তাও মুসলমানগণ যুদ্ধ ব্যতীতই জয় করেন। আফ্রিকানরা ইসলামী শক্তির সামনে নিজেদেরকে দুর্বল ও অসহায় দেখে দশ লক্ষ দীনার জিযিয়া প্রদানের শর্তে সন্ধি স্থাপন করে। হযরত ইব্‌ন যুবায়র (রা) আফ্রিকা বিজয়ের সুসংবাদ এবং প্রচুর 'খুমুস' (মালে গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ যা রাষ্ট্রের প্রাপ্য) নিয়ে মদীনা শরীফের দিকে রওয়ানা হন। খলীফা

হযরত উসমান গনী (রা)-এর সামনে যখন এ খুমুস পেশ করা হয়, তখন তিনি তা মারওয়ান আল-হাকামের কাছে পাঁচ লক্ষ দীনারে বিক্রি করেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন সা'দ (রা) এক বছর তিন মাস পর হিজরী ২৭ সনে আফ্রিকা থেকে মিসরে প্রত্যাবর্তন করেন। আফ্রিকানবাসীরা জর্জীরের পরিবর্তে নিজেদের একজন বাদশাহ নির্বাচিত করে এবং মুসলমানগণকে নির্ধারিত জিযিয়া প্রদান করতে থাকে। আফ্রিকার সেই রাজ্য বা দেশের নাম কার্থজানাহ কার্থেজ বলা হয়।

কাবরিস (সাইপ্রাস) ও রোডস বিজয়

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন সা'দ (রা) কার্থজানাহ্ (কার্থেজ) এলাকা তথা আফ্রিকা থেকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ঐ বছর (হিজরী ২৭ সনে) তাঁর স্থলে আবদুল্লাহ্ ইব্ন নাফি' (রা) মিসরের গভর্নর নিযুক্ত হন। তখন থেকে কনস্টানটাইন আবার যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করেন। হিজরী ২৮ সনে তিনি একটি নৌবাহিনী আফ্রিকার দিকে প্রেরণ করেন। ঐ বাহিনী আফ্রিকার সমুদ্র উপকূলে অবতরণ করে আফ্রিকানদের কাছে ঐ রাজস্ব দাবী করে যা তারা কায়সারকে প্রদান করত। আফ্রিকানরা রাজস্ব প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়। তারা বলে, যখন মুসলমানগণ আমাদের দেশ আক্রমণ করে তখন তো কায়সার আমাদেরকে কোন সাহায্য করতে পারেননি। কাজেই এখন তার অধীনতা স্বীকার করা এবং তাকে কর দেওয়া আমাদের জন্য অপরিহার্য নয়। শেষ পর্যন্ত এ বিষয়কে কেন্দ্র করে আফ্রিকান ও রোমান বাহিনীর মধ্যে লড়াই বাঁধে এবং আফ্রিকানরা রোমানদের হাতে পরাজিত হয়।

তারপর রোমানরা ইসকান্দারিয়ার দিকে অগ্রসর হয়। এখানে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন নাফি' (রা) রোমানদের প্রতিরোধ এবং তাদের সাথে মুখোমুখি যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। রোমান নেতা যখন আফ্রিকা থেকে ইসকান্দারিয়ার দিকে আসে, তখন 'কায়সারে রূম' স্বয়ং ছয়শ' যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে ইসকান্দারিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। মোটকথা, উভয় দিক থেকেই রোমান সৈন্যরা ইসকান্দারিয়া দখলের পাঁয়তারা চালায়। ইসলামী বাহিনী এক সাথে উভয় সেনাদলের মুকাবিলা করে। ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। শেষ পর্যন্ত কনস্টানটাইন ও তাঁর বাহিনী ইসকান্দারিয়া থেকে পলায়ন করে সাইপ্রাসের দিকে চলে যায়। সাইপ্রাসকে তিনি তাঁর নৌবাহিনীর দফতর এবং যুদ্ধ সরঞ্জাম তৈরীর কেন্দ্রস্থলে পরিণত করেছিলেন। আমরা এ ধারা বর্ণনাটি এখানে স্থগিত রেখে এ সুযোগে হযরত মুআবিয়া (রা) সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা অত্যন্ত জরুরী মনে করছি, যাতে মুসলমানগণের বিজয় অভিযানসমূহের বর্ণনার মধ্যে একটি সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব হয়।

হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর ওফাতকালে হযরত আমীর মুআবিয়া (রা) দামিশক ও জর্দানের গভর্নর ছিলেন। আর হিম্স ও কিন্নাসরীনের শাসনকর্তা ছিলেন উমায়র ইব্ন সাঈদ আনসারী (রা)। ফারূকে আযম (রা)-এর ওফাতের পর হযরত উমায়র ইব্ন সাঈদ (রা) পদত্যাগ পত্র পেশ করলে হযরত উসমান গনী (রা) হিম্স ও কিন্নাসরীন এলাকাকেও হযরত আমীরে মুআবিয়া (রা)-এর শাসনাধীন এলাকার অন্তর্ভুক্ত করেন। তারপর যখন ফিলিস্তীনের শাসক হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আলকামা (রা) ইন্তিকাল করেন, তখন হযরত উসমান গনী (রা) ফিলিস্তীন রাজ্যকেও হযরত আমীর মুআবিয়ার শাসনাধীনে দিয়ে দেন। এভাবে ধীরে ধীরে হিজরী ২৭ সনে আমীরে মুআবিয়া (রা) সিরিয়ার সমগ্র জেলাসমূহের একক শাসকে পরিণত হন। হযরত আমীরে মুআবিয়া ফারূকী খিলাফতের শেষ দিকে হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর

কাছে সিরিয়া উপকূল থেকে আরম্ভ করে সাইপ্রাস দ্বীপ পর্যন্ত সমগ্র এলাকাব্যাপী আক্রমণ পরিচালনার অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু হযরত ফারূকে আযম (রা) সেই আক্রমণের অনুমোদন প্রদানের বিষয়টি গভীরভাবে বিচার বিবেচনা করছিলেন। শেষ পর্যন্ত অনুমোদন প্রদানের পূর্বেই তিনি শাহাদত বরণ করেন। তারপর হযরত আমীরে মুআবিয়া (রা) পরবর্তী খলীফা হযরত উসমান গনী (রা)-এর কাছে এ ব্যাপারে অনুমোদন প্রার্থনা করলে তিনি কয়েকটি শর্তের অধীনে অনুমোদন প্রদান করেন। এর অন্যতম শর্ত এ ছিল যে, ঐ নৌযুদ্ধে যার ইচ্ছা সে অংশ গ্রহণ করবে, এজন্য কাউকে বাধ্য করা যাবে না।

হযরত মুআবিয়া (রা)-এর আন্দোলন ও প্রচেষ্টার ফলে সাইপ্রাস আক্রমণের জন্য একদল সেনা তৈরী হয়ে গেল। তাদের মধ্যে হযরত আবূ যর গিফারী (রা), আবূ দারদা (রা), হযরত শাদ্দাদ ইব্ন আওফ (রা), হযরত উবাদা ইব্ন সামিত (রা) এবং তাঁর স্ত্রী উম্মে হারাম বিন্ত মিলহান (রা) ছিলেন অন্যতম। এ মুজাহিদ দলের নেতৃত্ব হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন কায়স (রা)-কে প্রদান করা হয়। মুজাহিদরা নৌকাযোগে সাইপ্রাসের দিকে রওয়ানা হন। রোম সম্রাট কনস্টানটাইন ইসকান্দারিয়া পরাজিত হয়ে সাইপ্রাসে চলে এসেছিলেন এবং তাকে পশ্চাদ্ধাবন করে মিসরের ইসলামী বাহিনীও নৌকাযোগে সেখানে এসে পৌঁছেছিল। ঠিক সেই সময় সিরিয়া থেকে প্রেরিত ইসলামী বাহিনীও সাইপ্রাস উপকূলে অবতরণ করে। উম্মে হারাম (রা) যখন নৌকা থেকে তীরে নামেন, তখন তাঁর ঘোড়া হঠাৎ ভীত চকিত হয়ে পালাতে শুরু করে। ফলে তিনি ঘোড়া থেকে পতিত হয়ে ঘটনাস্থলেই প্রাণ ত্যাগ করেন। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদা তার সম্পর্কে এ ভবিষ্যদ্বাণীই করেছিলেন, যা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হলো। কনস্টানটাইন সাইপ্রাসেও মুসলমানগণের মুকাবিলায় দাঁড়াতে পারেন নি। তাই অনেক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে কনস্টানটিনোপলে গিয়ে পৌঁছান এবং সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অপর বর্ণনা মতে, সাইপ্রাসবাসীরা যখন দেখল যে, কনস্টানটাইন মুসলমানদের কাছে বার বার পরাজিত হয়ে চলেছে, তখন একদিন সুযোগ বুঝে তারা তাকে স্নানরত অবস্থায় হাম্মামের (বাথরূমের) মধ্যে হত্যা করে। যা হোক, অতি সহজেই সাইপ্রাস মুসলমানগণের দখলে চলে আসে। তারপর হযরত মুআবিয়া (রা)-ও একটি বাহিনী নিয়ে সাইপ্রাসে গিয়ে পৌঁছেন। সেখানকার শাসনব্যবস্থা সুসংহত করে তিনি রোড্স দ্বীপের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। রোড্সবাসীরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে মুসলমানগণের মুখোমুখি হয়। কিন্তু বেশ কয়েকটি রক্তাক্ত সংঘর্ষের পর ইসলামী বাহিনী রোড্স দ্বীপের উপর নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। ঐ দ্বীপে তাম্র নির্মিত একটি মূর্তি ছিল। মূর্তিটির এক পা ছিল দ্বীপের উপকূলে এবং অপর পা ছিল উপকূলের নিকটবর্তী দ্বীপে। তার দু'পায়ের মধ্যবর্তী ফাঁক এতই চওড়া ছিল যে, তার নীচ দিয়ে অনায়াসে সামুদ্রিক জাহাজ আসা-যাওয়া করতে পারত। হযরত আমীরে মুআবিয়া (রা) ঐ মূর্তিটি ভেঙ্গে তার তাম্র খণ্ডসমূহ মুসলিম বাহিনীর সাথে ইসকান্দারিয়ায় পাঠিয়ে দেন। জনৈক ইয়াহূদী ব্যবসায়ী ঐ খণ্ডগুলো মুসলমানদের কাছ থেকে ক্রয় করছিল। সাইপ্রাস ও রোড্স জয়ের ফলে হযরত আমীরে মুআবিয়া (রা)-এর খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অনেক বৃদ্ধি পায়। কেননা, এ নৌ বিজয়ের ফলে মুসলমানদের সামনে কনস্টাটিনোপল ও অন্যান্য রাজ্য জয়ের যেন একটি সিংহদ্বার খুলে গিয়েছিল। হিজরী ২৮ সনের শেষভাগে অথবা হিজরী ২৯ প্রথম ভাগে এ ঘটনাগুলো ঘটে।

ইরানী শাসনব্যবস্থায় রদবদল

হিজরী ২৭ সনের প্রথম দিকে বসরাবাসীরা তাদের শাসনকর্তা (গভর্নর) হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করলে হযরত উসমান গনী (রা) তাঁকে পদচ্যুত করে আপন মামাত ভাই হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমের ইব্ন কুরয ইব্ন রাবীআ ইব্ন হাবীব ইব্ন আবদে শাম্‌সকে কূফার গভর্নর নিয়োগ করেন। ঐ সময় হযরত ইব্ন আমের (রা)-এর বয়স ছিল আনুমানিক ২৫ বছর। এতদসত্ত্বেও হযরত উসমান গনী (রা) তাঁকে শুধু হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা)-এর অধীনস্থ বাহিনীর নয়, বরং আম্মান ও বাহরায়নের গভর্নর হযরত উসমান 'আস-সাকাফী (রা)-এর অধীনস্থ বাহিনীরও নেতৃত্ব প্রদান করেন। উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মা'মার (রা) ছিলেন খুরাসানের গভর্নর। খলীফা হযরত উসমান গনী (রা) তাঁকে সে পদ থেকে বদলী করে ফারিস প্রদেশের গভর্নর নিয়োগ করেন। আর খুরাসানের গভর্নর নিয়োগ করেন হযরত উমায়র ইব্ন উসমান ইব্ন সা'দ (রা)-কে। হযরত উমায়র ইব্ন উসমান খুরাসান পৌঁছেই অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে সেখানকার শাসনব্যবস্থা ঢেলে সাজান এবং ফারগানাসহ সমগ্র এলাকা মুসলিম অধিকারে নিয়ে আসেন। হিজরী ২৭ সনের শেষ ভাগে ও ২৮ সনের প্রথম ভাগে হযরত উমায়র ইব্ন উসমান (রা)-কে খুরাসানের গভর্নরের পদ থেকে অপসারণ করা হয়। ঐ সময়ে হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা)-কে কিরমানের শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয়। কিছু দিন পর তাঁকে পদচ্যুত করে তাঁর স্থলে আসিম ইব্ন আমর (রা)-কে নিয়োগ করা হয়। ঐ সময় হযরত ইমরান ইব্ন নুফায়ল (রা)-কে সিজিস্তানের গভর্নর নিয়োগ করা হয়।

ইরানীদের বিদ্রোহ ও ইসলামী বিজয় অভিযান

যেহেতু অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিভিন্ন প্রদেশের প্রশাসক পদে রদবদল করা হয়েছিল, তাই তা ইরানীরা তাদের জন্য একটি গাইবী মদদ মনে করে আপোস-আলোচনার মাধ্যমে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং ইসলামী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু করে দেয়। আসতাখার এবং জওর নামক দু'টি স্থান ছিল ঐ সমস্ত ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধ প্রস্তুতির কেন্দ্রভূমি। ফারিসের গভর্নর হযরত উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মা'মার (রা) এসব ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধ প্রস্তুতির সংবাদ পেয়ে হিজরী ২৭ সনে আসতাখারবাসীদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করেন। আসতাখারের সিংহদ্বারেই যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং হযরত উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মা'মার (রা) তাতে শাহাদত বরণ করেন। সাথে সাথে তাঁর বাহিনীও সেখান থেকে ফিরে চলে যায়। বসরার গভর্নর হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমের (রা) এ সংবাদ পেয়ে তাঁর অধীনস্থ বাহিনী নিয়ে ফারিসের দিকে অগ্রসর হন। তিনি উসমান ইব্ন 'আস (রা)-কে তাঁর অগ্রবর্তী বাহিনীর নেতৃত্ব প্রদান করেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমের (রা) নিজে আসতাখারের দিকে যান এবং হারাম ইব্ন হাইয়ান (রা)-কে 'জওর' অবরোধ করার জন্য প্রেরণ করেন। ইরানীরা আসতাখারের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বিপুল সৈন্যের সমাবেশ ঘটায় এবং অত্যন্ত বীরদর্পে মুসলমানগণের মুকাবিলা করে। এক ভয়ানক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। শেষ পর্যন্ত ইরানীরা পরাজিত হয়ে পলায়ন করে এবং আসতাখারের উপর মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

হযরত হারাম ইবন হাইয়ান (রা) দীর্ঘদিন পর্যন্ত 'জওর' অবরোধ করে রাখেন। তিনি নিয়মিত রোযা রাখতেন এবং শত্রুদের সাথে লড়তেন। সূর্য অস্ত গেলে ইফতার করে নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। ঘটনাচক্রে একদিন এমন হলো যে, ইফতারের পর খাওয়ার মত এক টুকরা রুটিও তাঁর ভাগ্যে জুটলো না। পরের দিন তিনি এ অবস্থায়ই রোযা রাখলেন। সেদিনও ইফতারের পর তাঁর ভাগ্যে কোন রুটি জুটলো না। এভাবে এক সপ্তাহ অতিবাহিত হয়ে গেলো। তিনি একাধারে রোযা রেখে চললেন। যখন শরীর অত্যধিক দুর্বল হয়ে গেলো, তখন তিনি তাঁর ভৃত্যকে বললেন, বৎস, তোমার কি হলো যে, আমি এক সপ্তাহ যাবত শুধু পানি খেয়ে রোযা রাখছি, অথচ তুমি আমাকে খাওয়ার কিছুই দাও না। ভৃত্য বলল, হে আমার মনিব! আমি তো রোজই আপনার জন্য রুটি তৈরী করে রেখে যাই। আশ্চর্যের ব্যাপার যে, আপনি তা পান না। পরের দিন ভৃত্য যথারীতি রুটি পাকিয়ে একটি নির্দিষ্ট স্থানে রাখল এবং সেই রুটি কোথায় যায়, তা দেখার জন্য এক জায়গায় ঘাপটি মেরে বসে রইলো। হঠাৎ সে দেখতে পেলো, শহরের দিক থেকে একটি কুকুর দ্রুতবেগে ছুটে এলো এবং তার মনিবের রুটিগুলো মুখে নিয়ে পুনরায় দ্রুতবেগে ছুটে চলে গেলো। সে কৌতূহলবশত কুকুরের পশ্চাদ্ধাবন করল। কুকুরটি রুটি নিয়ে শহরের রক্ষাপ্রাচীরের দিকে ছুটে গেল। তারপর একটি ড্রেনের ভিতর দিকে শহরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। ভৃত্য হযরত হারাম ইবন হাইয়ান (রা)-এর কাছে আদ্যোপান্ত ঘটনাটি খুলে বললে তিনি তাকে একটি গাইবী মদদ বলেই মনে করলেন। কেননা, শহরে ঢুকার এমন একটি গোপন পথ রয়েছে, তা তো তিনি জানতেন না। যা হোক ঐ রাতেই তিনি কয়েকজন দুঃসাহসী সৈন্যসহ ঐ ড্রেন পথে শহরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন এবং পাহারাদারদের হত্যা করে সঙ্গে সঙ্গে শহরের দরজা খুলে দিলেন। অপেক্ষমাণ ইসলামী বাহিনী তখন দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে এবং তৎক্ষণাৎ শহরটি দখল করে ফেলে। এভাবে অতি সহজে মুসলমানগণ জওর দখল করে নেন। তারপর জওর ও আসতাখারের বিদ্রোহীদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হয় যাতে তারা ভবিষ্যতে আর বিদ্রোহ না করে। এ বিজয় সংবাদ মদীনা তাইয়িবাতে পাঠিয়ে খলীফার কাছ থেকে ভবিষ্যতের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রার্থনা করা হয়।

হিজরী ২৯ সনের হজ্জ

হযরত উসমান গনী (রা) মুহাজির ও আনসারগণের একটি দল নিয়ে হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা মুকাররমা অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যান। মিনা নামক স্থানে পৌঁছার পর তিনি নির্দেশ দেন যে, তাঁবু ফেলে হাজী সাহেবদের যিয়ারতের ব্যবস্থা করা হোক। লোকেরা বিদ্‌আতজ্ঞানে এ কাজকে অপসন্দ করে। কেননা হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা), হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ও হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর যুগে এরূপ করা হতো না। এ সফরেই জুহায়না গোত্রের একটি স্ত্রীলোককে তার সামনে পেশ করা হল। স্ত্রীলোকটি বিধবা ছিল। তারপর সে দ্বিতীয় বিবাহ করে এবং বিবাহের পর ছয় মাস অতিক্রান্ত হতেই সে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করে। ফলে হযরত উসমান (রা) (ব্যভিচারের অভিযোগে) তাকে 'রজম' (প্রস্তরাঘাতে বধ) করার নির্দেশ দেন। যখন হযরত আলী (রা)-এর কাছে এ নির্দেশের সংবাদ পৌঁছে, তখন তিনি হযরত উসমান গনী (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে বলেন : পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন :

وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا

তাকে গর্ভ ধারণ করতে ও তার স্তন ছাড়াতে লাগে ত্রিশ মাস। (৪৬ : ১৫)

এ থেকে জানা গেল যে, গর্ভধারণ ও স্তন ছাড়ানোর সময় কাল ত্রিশ মাস। আর স্তন্যদানের সময়কাল সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে :

اَلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ .

যে স্তন্য দানকাল পূর্ণ করতে চায়, তাদের জন্য মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর পান করাবে। (২ : ২৩৩)

যেহেতু স্তন্যদানের সময়কাল দু'বছর অর্থাৎ চব্বিশ মাস থেকে ত্রিশ মাস বাদ দিলে গর্ভধারণের সর্ব নিম্ন সময়কাল ছয় মাস থাকে। কাজেই, ঐ স্ত্রীলোকের উপর ব্যভিচার প্রমাণিত হয় না।

হযরত উসমান গনী (রা) হযরত আলী (রা)-এর একথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে একটি লোক পাঠিয়ে বলে দিলেন যেন স্ত্রীলোকটিকে 'রজম' করা না হয়। কিন্তু ইতিমধ্যেই 'রজম'-এর পাট চুকিয়ে দেয়া হয়েছিল। হযরত উসমান গনী (রা) এতে খুবই ব্যথিত ও অনুতপ্ত হন। এ বছরই হযরত উসমান গনী (রা) মসজিদে নববীর আয়তন বৃদ্ধি করেন। এবার মসজিদের দৈর্ঘ্য একশ ষাট গজ এবং প্রস্থ একশ পঞ্চাশ গজে গিয়ে দাঁড়ায়। সাথে সাথে মসজিদে পাথরের স্তম্ভ লাগানো হয় এবং দেওয়ালগুলোও পাকা করা হয়।

হিজরী ৩০ সন

ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, হযরত ওয়ালীদ ইব্ন উকবা কুফার গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন। আবু যুবায়দা নামক জনৈক খ্রিস্টান কবি, যে মুসলমান হওয়ার পরও মদ্যপান থেকে বিরত হয়নি, তাকে প্রায়ই হযরত ওয়ালীদ ইব্ন উকবা (রা)-এর সঙ্গে দেখা যেত। এ সূত্র ধরেই লোকেরা হযরত ওয়ালীদ ইব্ন উকবা (রা)-এর উপরও মদ্যপানের অভিযোগ উত্থাপন করে। ধীরে ধীরে এ অভিযোগ খলীফা উসমান গনী (রা)-এর দরবারে গিয়ে পৌঁছে। কাজেই, মদীনা তাইয়িবা থেকে তাকে তলব করা হয়। হযরত ওয়ালীদ (রা) যখন মদীনা তাইয়িবাতে গিয়ে পৌঁছেন, তখন তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপনকারীরাও সেখানে গিয়ে পৌঁছে। হযরত ওয়ালীদ (রা) খলীফার দরবারে পৌঁছতেই হযরত উসমান গনী (রা) তাঁর সাথে 'মুছাফাহ' (করমর্দন) করেন। এতে অভিযোগ উত্থাপনকারীরা তাঁর [হযরত উসমান গনী (রা)-এর] প্রতি অসন্তুষ্ট হয়। তারপর যখন মদপান সম্পর্কিত অভিযোগের তদন্ত করা হয়, তখন এরূপ কোন সাক্ষাৎ পাওয়া যায় নি, যে নিজ চোখে হযরত ওয়ালীদ (রা)-কে মদপান করতে দেখেছে। কাজেই এ সন্দেহজনক অবস্থায় হযরত উসমান গনী (রা) হযরত ওয়ালীদ (রা)-এর উপরে শাস্তির আদেশ স্থগিত রাখেন। এ বিষয়টিও জনসাধারণের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করে। শেষ পর্যন্ত খলীফার দরবারে এ মর্মে সাক্ষ্য পেশ করা হয় যে, আমরা হযরত ওয়ালীদ ইব্ন উকবাকে মদ্যপান করতে দেখিনি বটে; তবে মদ্য বমি করতে দেখেছি। তারপর হযরত উসমান গনী (রা) নির্দেশ দিলেন যেন হযরত ওয়ালীদ (রা)-কে বেত্রাঘাত করা হয়। হযরত আলী (রা)-ও ঐ মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর ইব্ন আবূ তালিব ওয়ালীদ (রা)-কে বেত্রাঘাত করতে শুরু করেন। যখন চল্লিশটি বেত্রাঘাত করা হলো, তখন হযরত

আলী (রা) হযরত আবদুল্লাহ্ (রা)-কে বেত্রাঘাত করা থেকে বিরত রেখে বলেন, যদিও হযরত ফারূকে আযম (রা) মদ্যপানের অপরাধে আশিটি বেত্রাঘাত করতেন এবং তা যথার্থও বটে, তবে হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) মদ্যপানের অপরাধে মাত্র চল্লিশটি বেত্রাঘাত করতেন। আর আমি এক্ষেত্রে হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-কে অনুসরণ করাই অধিকতর সমীচীন বলে মনে করি। পরবর্তী সময়ে হযরত উসমান গনী (রা) হযরত ওয়ালীদ ইব্ন উকবা (রা)-কে পদচ্যুত করে তাঁর স্থলে হযরত সাঈদ ইব্ন 'আস (রা)-কে কূফার গভর্নর নিয়োগ করেন।

হযরত আবূ যর গিফারী (রা)-এর ঘটনা

ঘটনাটি হিজরী ৩০ সনের। হযরত আবূ যর গিফারী (রা) হযরত মুআবিয়া (রা)-এর অধীনে সিরিয়ার একজন সরকারী কর্মচারী ছিলেন। পবিত্র কুরআনের এক আয়াতের অর্থ ও ব্যাখ্যা নিয়ে হযরত মুআবিয়া (রা)-এর সাথে তাঁর বিরোধ বাঁধে।

আয়াত কারীমা হলো–

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ـ

যারা সোনা ও রূপা জমা করে এবং তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে না, তাদের অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও। (৯ : ৩৪)

হযরত আবূ যর গিফারী (রা)-এর মতে আল্লাহ্র পথে খরচ না করে অযথা সম্পদ জমা করে রাখা মোটেই বৈধ নয়। আর হযরত আমীরে মুআবিয়া (রা)-এর মতে, মহান আল্লাহ্র পথে খরচ করার অর্থ মালের যাকাত প্রদান করা। কাজেই, যে মালের যাকাত প্রদান করা হয়, তা জমা করে রাখা অবৈধ নয়। যদি শর্তহীনভাবে মাল জমা করে রাখা গুনাহ্র কাজ হত, তাহলে পবিত্র কুরআনে পরিত্যক্ত মাল বন্টন এবং উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য অংশের কোন উল্লেখ থাকত না। হযরত আবূ যর গিফারী (রা)-এর উপরোক্ত মতাদর্শের কথা জানাজানি হবার পর স্থানীয় জনগণ বিশেষ করে যুবক কিশোররা তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা শুরু করে। হযরত আবূ যর (রা)-ও দমবার পাত্র ছিলেন না। তিনিও বেপরোয়া হয়ে তাঁর মতাদর্শ প্রচারে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। অবস্থা শেষ পর্যন্ত এ পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে যে, হযরত আমীরে মুআবিয়া (রা) হযরত উসমান গনী (রা)-কে বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করেন। তখন হযরত উসমান গনী (রা) এ মর্মে নির্দেশ পাঠান যে, হযরত আবূ যর (রা)-কে অত্যন্ত সম্মানের সাথে মদীনা তাইয়িবাতে পাঠিয়ে দাও। মদীনা তাইয়িবাতে এসেও হযরত আবূ যর (রা) তাঁর মতাদর্শ প্রচার করতে থাকেন। যেহেতু তিনি গোঁড়া মেজাযের লোক ছিলেন, তাই জনগণ সাধারণত তাঁকে উপেক্ষা করেই চলত। কিন্তু মদীনা তাইয়িবাতেও তো অল্প বয়স্ক ও ঠাট্টা-তামাশা করার মত লোক ছিল। তারা মাঝে মাঝে তাঁকে ক্ষেপিয়ে তুলত। ঘটনাচক্রে ঐ সময়ই হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা)-এর ওফাত হয়। তিনি অত্যন্ত সম্পদশালী এবং জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজনের অন্যতম ছিলেন। কেউ না কেউ হযরত আবূ যর (রা)-কে বললো, আবদুর রহমান তো বিরাট পরিমাণ মাল-সম্পদ রেখে গেছেন। আপনি তাঁর সম্পর্কে কি বলেন? হযরত আবূ যর (রা) নির্দ্বিধায় হযরত আবদুর রহমান (রা)-এর উপর আপন ফতওয়া জারি করেন (অর্থাৎ তিনিও অবৈধ কাজ করেছেন)। হযরত কা'ব আহবার (রা) তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি হযরত আবূ যর (রা)-এর ঐ ফতওয়ার বিরোধিতা করেন। তখন

হযরত আবূ যর (রা) রাগতস্বরে বলে উঠেন, 'হে ইয়াহূদী! তুই এ সমস্ত বিষয়ের কি জানিস ?'[১] সঙ্গে সঙ্গে লাঠি দ্বারা তিনি হযরত কা'ব আহবার (রা)-কে আক্রমণও করে বসেন। অগত্যা কা'ব আহবার (রা) সেখান থেকে সোজা হযরত উসমান গনী (রা)-এর দরবারের দিকে ছুটতে থাকেন। হযরত আবূ যর (রা)-ও লাঠি হাতে তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করেন। শেষ পর্যন্ত হযরত উসমান গনী (রা)-এর ভৃত্যরা অনেক কষ্টেসৃষ্টে হযরত কা'ব আহবার (রা)-কে হযরত আবূ যর (রা)-এর হাত থেকে রক্ষা করেন। হযরত আবূ যর (রা)-এর রাগ যখন প্রশমিত হল তখন তিনি নিজেই হযরত উসমান গনী (রা)-এর দরবারে হাযির হয়ে বললেন, আমার আকীদা তো সব ধন-সম্পদই মহান আল্লাহ্র পথে বিলিয়ে দেওয়া ওয়াজিব। সিরিয়ার লোকেরা আমার এ আকীদার বিরোধিতা করেছে এবং আমাকে কষ্ট দিতে চেয়েছে। এখন মদীনা শরীফের লোকেরাও অনুরূপভাবে আমার বিরোধিতা করতে শুরু করেছে। আপনিই বলুন, এখন আমি কি করবো এবং কোথায় যাব ? হযরত উসমান গনী (রা) তখন তাঁকে পরামর্শ দেন : আপনি মদীনা তাইয়্যিবার বাইরে কোন পল্লীতে গিয়ে বসবাস করুন। তখন থেকে আবূ যর (রা) মদীনা শরীফ থেকে তিন মাইল দূরবর্তী 'রাবযাহ' নামক একটি পল্লীতে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন।

হযরত নবী করীম (সা)-এর আংটি

হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর মুবারক পত্রসমূহে এবং নির্দেশাদিতে যে আংটি দ্বারা ছাপ দিতেন, তা তাঁর ওফাতের পর হযরত আয়িশা (রা)-এর কাছে ছিল। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর হযরত আয়িশা তাঁর হাতেই তা সমর্পণ করেন। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর পর ঐ আংটি হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর কাছে হস্তান্তর করা হয়। ফারূকে আযম (রা) যখন তাঁর পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের দায়িত্ব একটি উপদেষ্টা কমিটির হাতে সোপর্দ করেন, তখন ঐ আংটি হযরত রাসূলে করীম (সা)-এর সহধর্মিণী হযরত হাফসা (রা)-এর কাছে আমানতস্বরূপ রেখে দেন। হযরত উসমান গনী (রা) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর হযরত হাফসা (রা) ঐ আংটি তাঁর কাছে হস্তান্তর করেন। ঐ বছরই অর্থাৎ হিজরী ৩০ সনে মদীনা তাইয়্যিবা থেকে দু' মাইল দূরবর্তী 'বি'-রে আরীম' নামক এক কুয়ায় ঐ আংটি হযরত উসমান গনী (রা)-এর হাত থেকে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে কুয়ার সমস্ত পানি সিঞ্চন করা হয়, তন্নতন্ন করে সর্বত্র খুঁজে দেখা হয়, কিন্তু আংটির কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি। হযরত নবীয়ে পাকের আংটি এভাবে হারিয়ে যাওয়ায় হযরত উসমান গনী (রা) যারপরনাই ব্যথিত হন। ঘটনাচক্রে ঐ সময় থেকেই হযরত উসমান গনী (রা) নানা ধরনের বিপদ-আপদের সম্মুখীন হতে থাকেন। অবশ্য ঐ আংটি হারিয়ে যাওয়ার পর তিনি তারই হুবহু আর এক আংটি তৈরী করিয়ে নেন। ঐ বছর মসজিদে নববীতে নামাযীর সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। জুমু'আর দিন তো এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, আযানের শব্দ সব নামাযীর কাছে পৌঁছান কষ্টকর হতে দাঁড়ায়। এ প্রেক্ষাপটে হযরত উসমান গনী (রা) নির্দেশ দেন যেন মুওয়াযযিন এক উঁচু জায়গায় আরোহণ করে খুতবার আযানের পূর্বে আর এক আযান দেন। এভাবে জুমু'আর দিন দু'টি আযানের প্রচলন হয়। ঐ বছরই হযরত উসমান গনী (রা)

---

১. হযরত কা'ব আহবার (রা) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ইয়াহূদী ধর্মাবলম্বী একজন বিরাট আলিম ছিলেন। হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতকালে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

সাহাবায়ে কিরামকে পরামর্শ দেন যেন তাঁরা ইরাক ও সিরিয়ার সম্পত্তি বিক্রি করে মক্কা মুকাররমা, তায়িফ প্রভৃতি জায়গায় সম্পত্তি ক্রয় করেন। বেশীর ভাগ সাহাবীই তাঁর এ পরামর্শ গ্রহণ করেন।

তাবারিস্তান বিজয়

হযরত সাঈদ ইব্‌ন 'আস (রা) কূফার গভর্নর পদে নিযুক্ত হওয়ার পর নতুনভাবে একটি সেনাবাহিনী গঠন করেন। হযরত হাসান ইব্‌ন আলী (রা), হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা), হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা), হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা), হযরত হুযায়ফা ইব্‌ন ইয়ামান (রা) প্রমুখ ঐ বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ঐ বাহিনী নিয়ে হযরত সাঈদ ইব্‌ন 'আস (রা) তাবারিস্তানে অভিযান করেন এবং এতে তাবারিস্তান ও জুরজানের সমগ্র এলাকা দখলে আসে। তারপর হযরত ইয়াযীদ ইব্‌ন মুহাল্লাবকে কূমাসের দিকে প্রেরণ করা হয়।

পবিত্র কুরআন প্রচার

হযরত হুযায়ফা ইব্‌ন ইয়ামান (রা) যখন বসরা, কূফা, রাই, সিরিয়া প্রভৃতি অঞ্চল অতিক্রম করে মদীনা শরীফে ফিরে আসেন, তখন খলীফা উসমান গনী (রা)-এর কাছে বলেন, বিস্ময়ের ব্যাপার যে, ইরাকবাসীগণ কুরআন মজীদ একভাবে পাঠ করেন, তা সিরিয়াবাসীগণ পাঠ করেন অন্যভাবে। বাসরাবাসীগণের কিরাত (পঠন পদ্ধতি) কূফাবাসীদের চাইতে যেমন পৃথক, কূফাবাসীগণের কিরাত পারস্যবাসীদের চাইতে তেমনি পৃথক। কাজেই, সবাই যাতে একই কিরাত পড়ে সেরূপ ব্যবস্থালম্বন করা খুবই জরুরী।

হযরত উসমান গনী (রা) বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য মজলিসে শুরার বৈঠক আহ্বান করেন। সকলেই হযরত হুযায়ফা ইব্‌ন ইয়ামান (রা)-এর অভিমত পসন্দ করেন। তারপর হযরত উসমান গনী (রা) হযরত হাফসা (রা)-এর নিকট থেকে পাক কুরআনের সেই কপি চেয়ে নেন, যা হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর খিলাফতকালে হযরত যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা)-এর অন্য কয়েকজন সাহাবীর ব্যবস্থাধীনে সংগৃহীত ও সংকলিত হয়েছিল। ঐ কপি প্রথম হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর কাছে ছিল। তারপর তা হযরত উমর (রা)-এর কাছে হস্তান্তরিত হয়। হযরত উমর (রা) তা হযরত হাফসা (রা)-এর হিফাযতে রেখেছিলেন। যা হোক, হযরত উসমান গনী (রা) ঐ মুবারক কপির অনুসরণে বেশ কয়েকখানি কপি তৈরীর দায়িত্ব কয়েকজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির উপর অর্পণ করেন। যখন এর অনেকগুলো কপি তৈরী হয়ে গেল, তখন তিনি এক এক কপি এক এক শহরে পাঠিয়ে দেন এবং সেই সাথে নির্দেশ দেন ভবিষ্যতে যেন শুধু এ কপিরই অনুসরণ করা হয় এবং ইতিমধ্যে বিভিন্ন উৎস থেকে যতগুলো কপি তৈরী করা হয়েছে তা যেন অবিলম্বে পুড়িয়ে ফেলা হয়। কূফাতে যখন নতুন কপি পৌঁছল তখন হযরত সাহাবায়ে কিরাম (রা) অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) তাঁর নিজস্ব কিরাতের উপরই অনড় থাকেন।

হিজরী ৩১ সনের ঘটনাবলী

দরবারে খিলাফত থেকে যেসব নির্দেশ জারি করা হয়, সে অনুযায়ী হারাম ইব্‌ন হাইয়ান লশকরী, হারাম ইব্‌ন হাইয়ান আবাসী ও হারছ ইবন রাশেদ পারস্যের বিভিন্ন জেলায়, আহনাফ ইব্‌ন কায়স খুরাসানে, হাবীব ইব্‌ন কুরজহ মার্ভে, খালিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ বলখে এবং

কায়স ইব্‌ন বীরাহ তূসে কর্মকর্তা নিযুক্ত হন। খুরাসানের বেশ কয়েকটি শহরে বিদ্রোহ দেখা দেয়। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমেরের নেতৃত্বে একটি ইসলামী বাহিনী সবগুলো বিদ্রোহই দমন করেন। তারপর নিশাপুরে অভিযান করে সেখানকার বিদ্রোহীদেরকেও শায়েস্তা করা হয়। এরপর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমের সারাখসের দিকে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন এবং নিজে একটি সেনাদলসহ হিরাত গিয়ে উপনীত হন। তিনি হিরাত জয় করে বলখ ও তাবারিস্তানের বিদ্রোহ দমন করেন। তারপর কিরমান, সিজিস্তান এবং পারস্যের বিভিন্ন প্রদেশে গিয়ে সেখানকার বিদ্রোহও দমন করেন। এভাবে ইরান ও ইরাকের সমগ্র শহর ও জনপদে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমেরের মাধ্যমে ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইয়াযদিজার্দের পতন

ইরানী সাম্রাজ্য হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর খিলাফতকালে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। সীমান্তবর্তী অঞ্চলের যে কয়েকটি প্রদেশ বা শহর তখনো ইসলামী খিলাফতের বাইরে রয়ে গিয়েছিল সেগুলো হযরত উসমান গনী (রা)-এর খিলাফত আমলে মুসলমানগণ অধিকার করে নেয়। তখন পারস্য-সম্রাট ইয়াযদিজার্দ একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েন। তাকে কখনো দেখা যেত রাইয়ে, কখনো বলখে, আবার কখনো মার্ভে, কখনো ইসফাহানে, আবার কখনো চীনে, আবার কখনো ফিরে আসতেন পারস্যের সীমান্তবর্তী জেলাসমূহে। তার সাথে কয়েক হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী ছিল। তিনি তার বংশগত সম্মান এবং সামানী পরাক্রম ও আভিজাত্যের কারণে সাধারণ মানুষকে সহজেই নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে পারতেন। একদিন হয়ত তারও সুদিন আসবে– এ প্রত্যাশায়ও মানুষ ইয়াযদিজার্দের পিছনে বার বার সারিবদ্ধ হত। ইরানের বেশীর ভাগ প্রদেশ, জেলা ও শহরে বার বার বিদ্রোহ দেখা দেওয়ার এটাই ছিল সবচেয়ে বড় কারণ। অবশ্য মুসলিম সেনাপতিগণ সবগুলো বিদ্রোহই দমন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। হিজরী ৩১ সনে ইয়াযদিজার্দ এক দল সৈন্য নিয়ে বলখে এসে উপনীত হন এবং কয়েকদিন পর্যন্ত এ অঞ্চলের বিভিন্ন শহর দখল করে রাখেন। মুসলিম বাহিনী যখন উদ্ধার অভিযান চালায় তখন তিনি সেখান থেকে পলায়ন করেন এবং পাছে মুসলমানগণ তাকে বন্দী করে ফেলে এ ভয়ে তিনি জনৈক পানচাক্কী (WATER MILL) চালকের বাড়ীতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। এ অভিনব আগন্তুকের মূল্যবান লেবাস পোশাক, হাতিয়ার ও অলংকারের প্রতি পানচাক্কী চালকের লোভাতুর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। আগন্তুকটি ঘুমিয়ে পড়ার সাথে সাথে সে তাকে হত্যা করে তার দেহ থেকে যাবতীয় অলংকার, হাতিয়ার, পোশাক ইত্যাদি খুলে নেয় এবং তার লাশটি একটি জলাশয়ে নিক্ষেপ করে। মার্ভ এলাকার 'মারগার' নামক স্থানে ইংরেজী ৬৫১ সালের ২৩ আগস্ট এ ঘটনা ঘটে। ইয়াযদিজার্দ তার রাজত্বের প্রথম চার বছর তো তাকে শুধু পালিয়েই বেড়াতে হয়। ইয়াযদিজার্দের মৃত্যুর সাথে সাথে ইরানী বিদ্রোহেরও অবসান ঘটে।

এ বছরই মিসরে অবস্থানরত মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ হুযায়ফা এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর (রা) সেখানকার গভর্নর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাআদ ইব্‌ন আবূ সারাহ-এর কোন কোন প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন এবং এটাকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে দারুন অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত অবস্থা এ পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে যে, তারা একেবারে প্রকাশ্যে হযরত উসমান গনী (রা)-এরও সমালোচনা করতে থাকেন। তারা তাঁকে এই বলে অপবাদ দেন যে, তিনি (উসমান গনী) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'দের মত–লোকদেরকে, যাদের উপর খোদ হযরত

রাসূলুল্লাহ্ (সা) অসন্তুষ্ট ছিলেন, ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশের গভর্নর নিয়োগ করে রেখেছেন। তারা মানুষের উপর জুলুম নির্যাতন ও বাড়াবাড়ি করছে, অথচ তিনি তাদেরকে পদচ্যুত করছেন না।

হিজরী ৩২ সনের ঘটনাবলী

হিজরী ৩১ সনের যুলহাজ্জ মাসে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমির হজ্জব্রত পালনের জন্য মক্কা শরীফের দিকে রওয়ানা হন। এ সুযোগে কারিন নামীয় একজন ইরানী সরদার বিভিন্ন প্রদেশ থেকে ৪০ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী গঠন করে ইরানী প্রদেশসমূহ দখল করতে শুরু করে। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাযিম নামীয় জনৈক মুসলিম গোত্রপতি মাত্র ত্রিশ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে কারিনের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। বেশ কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর তিনি মুজাহিদগণকে নির্দেশ দেন, যেন তারা তাদের বর্শাসমূহ কাপড় দিয়ে জড়িয়ে লেপ্টে নিয়ে তার উপর তেল ও চর্বি মাখিয়ে দেয়। যখন মুসলিম বাহিনী কারিনের নিকটবর্তী হল, তখন সবেমাত্র রাত হয়েছে। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাযিম এবার মুজাহিদগণকে তাদের বর্শায় জড়ানো কাপড়ে আগুন লাগাবার নির্দেশ দেন। মুজাহিদগণ তাই করলেন এবং বর্শা হাতে দুশমনদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এ আকস্মিক হামলা এবং সেই সাথে হাজার হাজার মশালের আলো দেখে ইরানীরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যে যেদিকে পারল ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাল। এ অবস্থায়ও মুজাহিদগণ অনেককে হত্যা করে, অনেককে বন্দী করে এবং অন্যরা পালিয়ে গিয়ে প্রাণ রক্ষা করে। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমির পবিত্র হজ্জ সমাপনান্তে মদীনা শরীফে গিয়ে হযরত উসমান গনী (রা)-এর খিদমতে হাযির হন। কোন কোন ঐতিহাসিকের বর্ণনা মতে, হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) ঐ বছরই (হিঃ ৩২ সন) ৮৫ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। মৃত্যুকালে তিনি প্রচুর ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি রেখে যান।

হিজরী ৩৩ সনের ঘটনাসমূহ

ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, ওয়ালীদ ইব্‌ন উকবা পদচ্যুত হওয়ার পর তার স্থলে হযরত সাঈদ ইব্‌ন 'আস (রা) কূফার গভর্নর নিযুক্ত হন। তিনি কূফাবাসীদের মন জয় করার সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালান। মালিক ইব্‌ন আশতার নামে পরিচিত মালিক ইব্‌ন হারিছ নাখঈ, ছাবিত ইব্‌ন কায়স হামাদানী, আসওয়াদ ইব্‌ন ইয়াযীদ, আলকামা ইব্‌ন কায়দ, জুনদুব ইব্‌ন যুহায়র, জুনদুয ইব্‌ন কাআব আযাদী, উরওয়াহ ইব্‌ন আল-জাআদ আমর ইব্‌ন আল-হাক্ক খুযাঈ, সা'সহি ইব্‌ন সূজান, যায়দ ইব্‌ন সূজান, কুমায়ল ইব্‌ন যিয়াদ প্রমুখ ব্যক্তি সাঈদ ইব্‌ন 'আস-এর দরবারে এসে বসতেন এবং অবাধে কথাবার্তা বলতেন। কখনো হাস্যরসের কথাবার্তাও চলত। একবার সাঈদ ইব্‌ন 'আস (রা)-এর মুখ থেকে একথা বেরিয়ে গেল যে, এ এলাকা কূফা কুরায়শদের উদ্যান। কিন্তু একথা শোনামাত্র মালিক আশতার অত্যন্ত রাগত ভাষায় বলে উঠল কী! যে এলাকাটি আমরা তরবারির জোরে দখল করেছি, সেটাকে তুমি তোমার গোত্রের উদ্যান মনে করে বসেছ ? তার একথার সূত্র ধরে অন্যরাও এরূপ কথাবার্তা বলতে শুরু করে। ফলে হৈ চৈ বেঁধে যায়। তখন আবদুর রহমান আসাদী এভাবে হৈ চৈ করতে সকলকে নিষেধ করেন। এবার সকলে একজোট হয়ে আবদুর রহমানকে আক্রমণ করে এবং তাকে এমনভাবে মারধর করে যে, তিনি চেতনা হারিয়ে ফেলেন। এ ঘটনার পর সাঈদ ইব্‌ন 'আস তার দরবারের নৈশ বৈঠক বন্ধ করে দেন এবং কেউ যাতে

ভিতরে না আসতে পারে, সেজন্য দরজায় প্রহরী মোতায়েন করেন। রাতের এ বৈঠক বন্ধ হওয়ায় লোকেরা খুব অসন্তুষ্ট হয় এবং যেখানে সেখানে জড় হয়ে সাঈদ ইব্‌ন 'আস এবং সেই সাথে হযরত উসমান গনী (রা)-এর বিরুদ্ধে নানা ধরনের অভিযোগ উত্থাপন করতে থাকে। এ অভিযোগ উত্থাপনকারীদের আশেপাশে স্বাভাবিকভাবে বাজে লোকেরা এসেও ভিড় জমাতো।

ধীরে ধীরে বিষয়টি জটিল আকার ধারণ করে। সর্বত্র অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত সাঈদ ইব্‌ন 'আস (রা) হযরত 'উসমান গনী (রা)-কে সমগ্র ব্যাপারটি লিখে জানান। উত্তরে হযরত উসমান গনী (রা) সাঈদ ইব্‌ন 'আসকে লিখেন, 'ঐ লোকদেরকে কূফা থেকে সিরিয়ায় হযরত মুআবিয়া (রা)-এর কাছে পাঠিয়ে দাও।' সাঈদ ইব্‌ন 'আস তাই করলেন। হযরত মুআবিয়া (রা) ঐ লোকদের প্রতি অত্যন্ত সম্মান দেখান, তাদেরকে সাথে নিয়ে পানাহার করেন এবং তাদের দৈনিক ভাতাও নির্ধারণ করে দেন। দুষ্ট প্রকৃতির এ লোকদেরকে সঠিক পথে আনয়নের উদ্দেশ্যেই হযরত উসমান গনী (রা)-এর নির্দেশে তিনি তাদের সাথে অনুরূপ ব্যবহার করেছিলেন। কিছু দিন পর তিনি ঐ লোকদেরকে বুঝিয়ে বললেন, যেন তারা কুরায়শের নেতৃত্ব মেনে নেয় এবং মুসলমানগণের মধ্যকার ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট না করে। কিন্তু ইব্‌ন সূজান হযরত মুআবিয়া (রা)-এর ঐ যুক্তিপূর্ণ সহানুভূতিশীল কথার যে উত্তর দেন তা ছিল অত্যন্ত অযৌক্তিক ও বিদ্বেষপূর্ণ। সে তার জিদের উপরই অনড় থাকে। বাধ্য হয়ে হযরত মুআবিয়া (রা) হযরত উসমান গনী (রা)-এর কাছে লিখেন, এ লোকগুলো সরল পথে আসবে বলে তো মনে হয় না। হযরত উসমান গনী (রা) হযরত মুআবিয়া (রা)-কে লিখলেন, তাহলে তাদেরকে হিমসের গভর্নর আবদুর রহমান ইব্‌ন খালিদের কাছে পাঠিয়ে দাও। হযরত মুআবিয়া (রা) তাই করলেন। হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন খালিদ তাদের আচার-আচরণ ভালভাবে লক্ষ্য করলেন এবং সে অনুযায়ী তাদের সাথে অত্যন্ত কঠোর ব্যবহার করলেন, এমন কি তাদেরকে তার মজলিসে বসার অনুমতিও দিলেন না। তাতে বেশ কাজ হল। কিছু দিন যেতে না যেতেই তারা সরল পথে এসে গেল এবং নিজেদের অতীতের ভুল-ভ্রান্তির উপর অনুশোচনাও প্রকাশ করল। আবদুর রহমান ইব্‌ন খালিদ এ সম্পর্কে হযরত উসমান গনী (রা)-কে অবহিত করলে তিনি উত্তরে লিখলেন, যদি কূফার দিকে যেতে চায় তাহলে যেতে দাও।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাবা

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাবা ছিল ইব্‌ন সাওদা নামে পরিচিত। সে ছিল সানআ শহরের অধিবাসী একজন ইয়াহূদী। হযরত উসমান গনী (রা)-এর খিলাফতকালে সে যখন লক্ষ্য করল যে, মুসলমানগণ অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠেছে এবং মুসলিম জাতি তখন বিশ্বের বিরাট দিগ্বিজয়ী জাতিতে পরিণত হয়েছে, তখন সে মদীনা শরীফে এসে বাহ্যত ইসলাম গ্রহণ করল এবং মুসলমানগণের সাথে এমনভাবে মিশে গেল যে, তার মনের কথা কেউই জানতে পারল না এবং জানার চেষ্টাও করল না। এ সুযোগে সে মুসলমানদের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতাসমূহ আবিষ্কার করল এবং ভালভাবে যাচাই করে নিল। তারপর ইসলামের বিরুদ্ধে কি কি কৌশল অবলম্বন করা যায় বা কি কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় সে সম্পর্কেও খুব চিন্তা গবেষণা করল। ঐ সময়ে বসরায় হাকীম ইব্‌ন জাবালা নামীয় ব্যক্তি বাস করত। সে তার পার্থিব স্বার্থ উদ্ধারের জন্য এ কৌশল অবলম্বন করেছিল যে, সে কোন একটি ইসলামী বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে সুযোগমত

যিম্মীদের উপর লুটপাত চালাত। সে অন্যান্য লোককেও নিজের দলে টেনে নিয়ে এখানে সেখানে ডাকাতি ও রাহাজানি করত। তার এ দুষ্কর্মের সংবাদ শেষ পর্যন্ত হযরত উসমান গনী (রা)-এর কানে গিয়েও পৌঁছে।

খলীফা হযরত উসমান গনী (রা) বসরার গভর্নরকে লিখলেন, 'হাকীম ইব্ন জাবালাকে বসরার অভ্যন্তরে নযরবন্দী করে রাখ এবং কখনো শহরের বাইরে যেতে দিও না।' কাজেই, হাকীম ইব্ন জাবালাকে বসরাতে নযরবন্দী করে রাখা হয়। আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাবা হাকীম ইব্ন জাবালার অবস্থাদি শুনে মদীনা শরীফ থেকে সোজা বসরাতে চলে যায়। সেখানে সে হাকীম ইব্ন আবদুল্লাহ্র ঘরে অবস্থান করে হাকীম ইব্ন জাবালা এবং তার মাধ্যমে তার সঙ্গী-সাথীদের সাথে যোগাযোগ করে ইসলাম ও মুসলমানগণের ধ্বংস সাধনের একটি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা তৈরি করে। ঐ পরিকল্পনা অনুযায়ী সে নিজেকে মুসলমানগণের বন্ধু এবং রাসূল-পরিবারের একান্ত মঙ্গলকামী বলে যাহির করত এবং অত্যন্ত সূক্ষ্ম কথার মার-প্যাঁচে নিজের ধ্বংসাত্মক চিন্তাধারা ও আকীদা-বিশ্বাস সাধারণ্যে প্রচার করত। সে কখনো বলত, মুসলমানগণই বলে বেড়ায়, দুনিয়ায় হযরত ঈসা (রা) পুনরায় আবির্ভূত হবেন, কিন্তু একথা ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে, হযরত মুহাম্মদ (সা)-ও দুনিয়ায় পুনরাবির্ভূত হবেন। সে জনসাধারণের সামনে–

انَّ الَّذِىْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْانَ لَرَادُّكَ الى مَعَادٍ ·

যিনি কুরআনকে তোমার জন্য করেছেন বিধান তিনি অবশ্যই তোমাকে ফিরিয়ে আনবেন প্রত্যাবর্তনস্থলে। (২৮ : ৮৫)

—এ আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করে তাদেরকে এ আকীদা-বিশ্বাসে টেনে আনার চেষ্টা করে যে, অবশ্য অবশ্যই হযরত মুহাম্মদ (সা)-ও দুনিয়ায় পুনরাবির্ভূত হবেন। অনেক বোকাই তার এ প্রতারণার ইন্দ্রজালে পতিত হয় এবং সে ঐ বোকাদের নিয়ে এমন একটি আকীদা দাঁড় করাবার প্রয়াস পায় যে, প্রত্যেক নবীরই একজন 'খলীফা ও ওসী' (প্রতিনিধি) থাকেন। আর হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর ওসী হযরত আলী (রা)। হযরত মুহাম্মদ (সা) যেমন 'খাতামুল 'আম্বিয়া' (শেষ নবী) ঠিক হযরত আলী (রা)-ও তেমনি খাতামুল আওসিয়া' (শেষ ওসী)। তারপর সে প্রকাশ্যে বলতে শুরু করে যে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পর মুসলমানগণ হযরত আলী (রা) ব্যতীত অন্যকে খলীফা বানিয়ে তার (আলীর) অধিকার খর্ব করেছে। কাজেই, এখন সকলেরই উচিত হযরত আলী (রা)-কে সাহায্য করা এবং বর্তমান খলীফাকে হত্যা অথবা পদচ্যুত করে হযরত আলী (রা)-কেই খলীফার আসনে অধিষ্ঠিত করা। আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাবা অনেক ভাবনা-চিন্তার পর এসব পরিকল্পনা তৈরি করেই মদীনা শরীফ থেকে বসরাতে এসেছিল। এখানে এসে সে অত্যন্ত দূরদর্শিতার সাথে এবং যথাযথভাবে তার ঐ সব বদ-আকীদা ও কু-বিশ্বাসসমূহ জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করতে শুরু করে।

ক্রমে ক্রমে এ ফিতনার খবর যখন বসরার গভর্নর আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমের কানে গিয়ে পৌঁছে, তখন তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাবাকে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে ? কোথা থেকে এসেছ এবং এখানে কেন এসেছ ? আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাবা উত্তর দিল, আমি ইয়াহূদী ধর্মের দুর্বলতা ও অসম্পূর্ণতা লক্ষ্য করে শাশ্বত সুন্দর ধর্ম ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি। আমি এখানে আপনার একজন মুসলিম প্রজা হিসাবে বসবাস করতে চাই। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমের বলেন, আমি তোমার হালচাল ও কথাবার্তা পর্যবেক্ষণ করেছি। আমার তো মনে হয়, তুমি

একজন ইয়াহূদী হিসাবে মুসলমানগণের মধ্যে বিশৃঙ্খলা, বিভ্রান্তি ও অনৈক্য সৃষ্টি করতে চাও। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমেরের মুখে একথা শুনে সুচতুর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাবা বুঝতে পারল, এখন আর বসরাতে অবস্থান করা তার জন্য নিরাপদ নয়। তাই সে তার একান্ত বিশ্বস্ত লোকদেরকে তার দলের আদর্শ ও কার্যপদ্ধতি বুঝিয়ে দিয়ে নিজে বসরা থেকে কূফার চলে গেল। কূফা ছিল ইসলামী বাহিনীর দ্বিতীয় কেন্দ্র। সেখানে পূর্ব থেকেই হযরত উসমান গনী (রা) এবং তাঁর নিযুক্ত কর্মকর্তার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন একদল লোক ছিল। তাই আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাবা কূফায় এসে তাদের মাধ্যমে তার অসৎ উদ্দেশ্য সফল করার ভাল সুযোগই পেল।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাবার অন্তরে ছিল একদিকে ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ এবং অন্যদিকে হযরত উসমান গনী (রা)-এর প্রতি ব্যক্তিগত শত্রুতা। তার কার্যকলাপ দেখে মনে হয়, সে হযরত উসমান গনী (রা)-এর উপর কোন কিছুর বদলা বা প্রতিশোধ নিতে চায়। কূফায় এসেই ছদ্মবেশী আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাবা নিজেকে সকলের কাছে একজন অতি মুত্তাকী ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিরূপে প্রকাশ করে। তাই সাধারণভাবে লোকেরা তাকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখতে থাকে এবং কেউ কেউ তার ভক্ত-অনুরক্তেও পরিণত হয়। যখন কুফায় আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাবার আকীদা-বিশ্বাসের চর্চা শুরু হয় তখন সেখানকার গভর্নর হযরত সাঈদ ইব্‌ন 'আস (রা) তাকে ডেকে পাঠিয়ে খুব করে শাসিয়ে দেন। কূফার বুদ্ধিমান ও ভদ্রজনেরাও তাকে একজন সন্দেহজনক লোক বলে মনে করে। এবার আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাবা কূফা থেকে সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হয়। বসরার নগর কূফায়ও সে তার একদল সাঙ্গ-পাঙ্গ রেখে গেল। মালিক আশতার ছিল তাদের অন্যতম। কূফা থেকে সিরিয়া তথা দামিশকে পৌঁছে সে খুব একটা সুবিধা করতে পারল না। তাই শীঘ্রই সেখান থেকে চম্পট দিল। হযরত উসমান গনী (রা) ও বনূ উমাইয়ার প্রতি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাবার শত্রুতা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর এক শহর থেকে বিতাড়িত হয়ে অন্য শহরে আশ্রয় গ্রহণ যেন তার সামনে সাফল্যের এক একটি নতুন ক্ষেত্র ও নতুন সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে লাগলো। সিরিয়া থেকে বের হয়ে সে সোজা মিসরের দিকে চলে গেল। সেখানকার গভর্নর ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'দ। মিসরে পৌঁছে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাবা তার অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে কাজ আরম্ভ করল। এখানে সে তার গুপ্ত সংগঠনের একটি পরিপূর্ণ সংবিধান রচনা করল। তাতে আহলে বায়তের প্রতি ভালবাসা ও হযরত আলী (রা)-এর প্রতি সমর্থন প্রকাশ করাকে সাফল্যের সবিশেষ মাধ্যম রূপে গণ্য করা হল। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'দ (রা) তখন আফ্রিকা, বার্বার, কনস্টানটিনোপল প্রভৃতি ইস্যু নিয়ে এতই ব্যতিব্যস্ত ছিলেন যে, অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে দৃষ্টি দেওয়ার মত অবকাশ তার বড় একটা ছিল না।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাবা মিসর থেকে কূফা ও বসরার সাঙ্গ-পাঙ্গদের সাথে পত্রালাপ শুরু করে। পূর্ব নির্ধারিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মিসর, কূফা ও বসরা থেকে সেখানকার গভর্নরদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত বিভিন্ন অভিযোগ সম্বলিত পত্রাদি মদীনাবাসীগণের কাছে প্রেরিত হতে থাকে। সেই সাথে বসরাবাসীগণের কাছে কূফা ও মিসর থেকে, মিসরবাসীদের কাছে বসরা ও কূফা থেকে এবং কূফাবাসীদের কাছে বসরা, মিসর ও দামিশকে থেকে এ মর্মে অনবরত পত্র আসতে থাকে যে, ঐ সমস্ত এলাকার গভর্নররা মানুষের উপর এতই জুলুম অত্যাচার করছে যে, তাদের জীবন একেবারে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। যেহেতু কোন অঞ্চলেরই গভর্নর বা কর্মকর্তারা

জুলুম করছিলেন না, তাই প্রত্যেক এলাকার লোকও ধারণা করে বসল যে, শুধু আমাদের এলাকা ছাড়া অন্য সব এলাকায়ই জুলুম অত্যাচারের স্টীমরোলার চলছে এবং তা সত্ত্বেও হযরত উসমান গনী (রা) উক্ত গভর্নর ও কর্মকর্তাদেরকে অন্যায়ভাবে তাদের পদে বহাল রাখছেন এবং তাদেরকে পদচ্যুত করতে অস্বীকার করছেন। প্রত্যেক প্রদেশ এবং প্রত্যেক এলাকা থেকে অনবরত রাজধানী মদীনা শরীফেও পত্র আসছিল। এ প্রেক্ষিতে হযরত উসমান গনী (রা) হযরত আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা)-কে মিসরে এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামা (রা)-কে কূফায় প্রেরণ করেন এবং সেখানকার অবস্থা তদন্ত করে দরবারে খিলাফতে তার রিপোর্ট পাঠাবার নির্দেশ দেন। হযরত আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা) যখন মিসরে পৌঁছেনর তখন সে সেখানকার এ সমস্ত লোক যারা গভর্নর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'দ (রা)-এর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল এবং যারা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাবার দলভুক্ত ছিল– তারা কূটচালের মাধ্যমে হযরত আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা)-কে নিজেদের সম-মতাবলম্বী করে নেয় এবং তাকে এ বলে মদীনা শরীফে ফিরে যাওয়া থেকে বিরত রাখে যে, যেহেতু হযরত উসমান গনী (রা) জেনে শুনেই মানুষের উপর জুলুম অত্যাচারের পথ উন্মুক্ত রেখেছেন, তাই তাঁর সংসর্গ এড়িয়ে চলাই সমীচীন। মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামা (রা) কূফা পৌঁছে হযরত উসমান গনী (রা)-এর কাছে এ মর্মে সংবাদ পাঠান যে, এখানকার জনসাধারণ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ প্রকাশ্যে গভর্নরকে দোষারোপ করেছেন এবং তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। ফলে, একটা বিদ্রোহের ভাব পরিলক্ষিত হয়। ঐ সময়ে আশআছ ইব্‌ন কায়স, সাঈদ ইব্‌ন কায়স, সাঈব ইব্‌ন আকবা, মালিক ইব্‌ন হাবীব, হাকীম ইব্‌ন সালামত, জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্, সালমান ইব্‌ন রিবাঈ প্রমুখ অত্যন্ত প্রভাবশালী, দৃঢ়সংকল্পের অধিকারী এবং খিলাফতে ইসলামিয়ার ঐক্য ও সংহতির পক্ষে ব্যক্তিবর্গ কূফা থেকে বিভিন্ন এলাকা অভিমুখে রওনা হয়ে গিয়েছিলেন।

সাঈদ ইব্‌ন 'আস চতুর্দিকে বিশৃঙ্খলা এবং মানুষের মুখে প্রকাশ্যে তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপিত হতে দেখে কা' কা' ইব্‌ন আমরকে আপন স্থলাভিষিক্ত করে কূফা থেকে মদীনা শরীফের দিকে রওয়ানা হন। তার উদ্দেশ্য ছিল খোদ খলীফার সাথে কূফার লোকেরা মালিক আশতার এবং তার অন্যান্য সঙ্গী-সাথী, যারা তখন হিমসে অবস্থান করছিলেন– তাদের লিখলো, আজকাল কূফা একদম খালি। তোমরা যেভাবে পার, এখানে চলে এসো।' কূফায় তখন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও সবর্জনমান্য কোন সরকারী কর্মকর্তা বিদ্যমান না থাকায় সাধারণ মানুষের মুখ একেবারে লাগামহীন হয়ে উঠেছিল। মানুষ প্রকাশ্যে হযরত উসমান গনী (রা) এবং তাঁর নিযুক্ত কর্মকর্তাদেরকে গালি-গালাজ ও দোষারোপ করতে লাগলো। পরিস্থিতি শেষ পর্যন্ত এ পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়াল যে, ইয়াযীদ ইব্‌ন কায়স কূফাবাসীদের একটি প্রতিনিধি দল সঙ্গে নিয়ে এ উদ্দেশ্যে মদীনা শরীফ অভিমুখে রওয়ানা হয় যে, সেখানে পৌঁছে হযরত উসমান গনী (রা)-কে খিলাফতের দায়িত্ব পরিত্যাগে বাধ্য করবে। কিন্তু কা' কা' ইব্‌ন আমর একদল লোক সঙ্গে নিয়ে গিয়ে ইয়াযীদের পথে বাধার সৃষ্টি করেন এবং তাকে বন্দী করে নিয়ে আসেন।

ইয়াযীদ অত্যন্ত বিনীতভাবে কা' কা' ইব্‌ন আমরকে বলল, সা'দ ইব্‌ন 'আসের বিরুদ্ধে আমার কিছু অভিযোগ আছে। তাই আমি তাকে কূফার গভর্নরের পদ থেকে অপসারণ করার উদ্দেশ্যে মদীনায় রওয়ানা হয়েছিলাম। তাছাড়া আমার আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। একথার উপর কা' কা' ইয়াযীদকে ছেড়ে দেন। কিন্তু এরপরই মালিক ইব্‌ন আশতার তার দলবল নিয়ে

হিমস থেকে কূফায় এসে পৌঁছালো। তাদের কূফা পৌঁছার সাথে সাথে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের মধ্যে যেন নবজীবনের সঞ্চার হল। মালিক আশতার প্রকাশ্যে জনসাধারণকে ইয়াযীদ ইব্‌ন কায়সের সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে কূফা থেকে রওয়ানা করল। কা' কা' এ জনদলের মুকাবিলা করতে পারলেন না। তারা কূফা থেকে কাদিসিয়ার নিকটবর্তী জার'আ নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছল।

হিজরী ৩৪ সনের ঘটনাসমূহ

এ বছর কূফার যে অবস্থা ছিল তা তো উপরে বর্ণিত হয়েছে। হযরত উসমান গনী (রা) রাষ্ট্রের অন্যান্য কর্মকর্তার নামেও এ মর্মে নির্দেশ পাঠান যে, এবারকার হজ্জের পর যেন তাঁরা সবাই মদীনা শরীফে এসে তাঁর সাথে পরামর্শ সভায় অংশগ্রহণ করেন। অতএব, সিরিয়া থেকে হযরত মুআবিয়া (রা), মিসর থেকে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন আবী সারাহ (রা), কূফা থেকে সাঈদ ইব্‌ন 'আস (রা), বসরা থেকে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমের (রা) এবং কয়েকটি ছোট ছোট প্রদেশের কর্মকর্তারাও মদীনা শরীফের গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরকে পরামর্শ সভায় অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। তিনি উপস্থিত সবাইকে বলেন, কেন আমার বিরুদ্ধে এ বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে তার কারণ নির্ধারণ করে আমাকে সে সম্পর্কে অবহিত করুন এবং বলুন, এখন আমার করণীয় কি ? আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমের বলেন, আমার মতে এ লোকদেরকে জিহাদে নিয়োজিত রাখাই এর শ্রেষ্ঠতম প্রতিকার। নিষ্কর্মা বসে থাকার দরুনই তাদের মাথায় এ ধরনের ফাসাদ ও কুবুদ্ধির উদয় হয়। যখন তারা জিহাদে লিপ্ত হবে তখন আপনা আপনি এসব বিক্ষোভ-বিশৃঙ্খলার অবসান ঘটবে। সাঈদ ইব্‌ন 'আস বলেন, এ দুষ্ট লোকদের নেতাদেরকে অর্থাৎ দুষ্কৃতির হোতাদেরকে তাদের প্রত্যেকটি কথার উপর যুক্তিভিত্তিক পাকড়াও করতে হবে। তারপর তাদেরকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে হবে। ফলে তাদের অনুসারীরাও আপনাআপনি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে। খলীফা হযরত উসমান গনী (রা) বলেন, এ অভিমতটি নিঃসন্দেহে যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু তাকে কার্যকরী করা সহজ নয়। আমীরে মুআবিয়া (রা) বলেন, আমাদের মধ্যে যিনি যে প্রদেশের গভর্নর আছেন, তিনিই সে প্রদেশ সামলাবেন। এভাবে প্রত্যেকটি প্রদেশ এ দুষ্কৃতিকারীদের থেকে পবিত্র করে নিতে হবে। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'দ (রা) বলেন, তাদের সব লোকই লোভী ও প্রতাপশালী। কাজেই তাদেরকে ধন-সম্পদ দিয়ে আপন করে নেওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

এই পরামর্শ সভায় বিক্ষোভ ও বিশৃঙ্খলার প্রকৃত অবস্থা ও কারণ সম্পর্কে আলোচনা-পর্যালোচনার পর দেখা গেল, এসব বিক্ষোভের খবর একেবারে কাল্পনিক ও অনুমান ভিত্তিক; এতে সভ্যতার লেশ মাত্র নেই। এ প্রেক্ষিতে কেউ কেউ পরামর্শ দিলেন, যারা এ ধরনের বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহে অংশ নেয়, তাদের সবাইকে খুঁজে বের করে হত্যা করে ফেলা উচিত। যারা প্রকৃতই দোষী তাদের প্রতি কোন ভাবেই কৃপা প্রদর্শন সঙ্গত নয়। হযরত উসমান গনী (রা) বলেন, আমি শুধু ঐ পরিমাণ শাস্তি দিতে পারে যা পাক কুরআন ও হাদীস নির্ধারণ করে দিয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি কোন লোককে প্রকাশ্যে মুরতাদ হতে না দেখব, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি কী করে তাকে হত্যা করতে পারি ? যে অপরাধের যে শাস্তি নির্ধারিত আছে, সে অপরাধের জন্য আমি শুধু সে শাস্তিই দিতে পারি। তাছাড়া আমার বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভের সূত্রপাত করা হয়েছে তা সহ্য করার মত যথেষ্ট ধৈর্য ও মনোবল আমার রয়েছে। এ ধরনের

আলাপ-আলোচনা ও কথাবার্তার পর ঐ দিনের পরামর্শ বৈঠক সমাপ্ত হয়। তাতে কোন বিশেষ প্রস্তাব বা কর্মপন্থা গৃহীত হয় নি। অবশ্য এ ব্যবস্থা নেওয়া হয় যে, জিহাদের উদ্দেশ্যে কোন কোন এলাকায় সেনাবাহিনী প্রেরণের জন্য কোন কোন কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়। তারপর গভর্নর ও কর্মকর্তাবৃন্দ মদীনা শরীফ থেকে নিজ নিজ এলাকার দিকে রওয়ানা হন। সাঈদ ইব্ন 'আস (রা) তাঁর যাত্রাপথে যখন জার'আ নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছেন তখন তিনি দেখতে পান যে, ইয়াযীদ ইব্ন কায়সের নেতৃত্বে একটি বিরাট সেনাবাহিনী সেখানে অবস্থান করছে। সাঈদ ইব্ন 'আস সেখানে পৌঁছতেই ইয়াযীদ অন্তত কঠোর ভাষায় বলে, তুমি এখান থেকে অবিলম্বে ফিরে যাও। আমরা তোমাকে কূফায় কখনো প্রবেশ করতে দেব না। একথা শুনে সাঈদ ইব্ন 'আস (রা)-এর ভৃত্য বলল, সাঈদের এখান থেকে ফিরে যাওয়া অসম্ভব। একথা শোনা মাত্র মালিক আশতার আগে বেড়ে সাঈদের ভৃত্যকে উটের পিঠ থেকে টেনে নামিয়ে সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করে ফেলে এবং সাঈদ ইবন 'আস (রা)-কে কূফার পাঠিয়ে দেয়। সাঈদ বাধ্য হয়ে সেখান থেকে মদীনায় ফিরে যান এবং হযরত উসমান গনী (রা)-এর কাছে আদ্যোপান্ত ঘটনা বিবৃত করেন। তখন উসমান গনী (রা) হযরত আবূ মূসা আশআরীকে ডেকে পাঠিয়ে তাকে কূফার গভর্নর নিয়োগ করেন। আবূ মূসা আশআরী (রা) গভর্নর হিসাবে মদীনা শরীফ থেকে কূফায় গিয়ে পৌঁছেন। তিনি সঙ্গে করে হযরত উসমান গনী (রা)-এর একটি পত্র নিয়ে যান, যা কূফাবাসীদের উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল : তোমরা যে ব্যক্তিকে নিজেদের প্রশাসক হিসাবে পসন্দ করেছো ও মনোনীত করেছো আমি তাঁকেই নিয়োগ করে তোমাদের কাছ পাঠালাম। তাতে এও বলা হয়েছিল : যে পর্যন্ত শরীআত আমাকে অনুমতি দেবে আমি তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করে যাব। সেই সাথে তোমাদের যাবতীয় বাড়াবাড়ি সহ্য করে তোমাদেরকে সংশোধন করার চেষ্টা করবো।

আবূ মূসা (রা) কূফায় পৌঁছে জুমু'আর দিন মিম্বরে আরোহণ করে সকলের উদ্দেশ্যে এক ভাষণ দেন। তাতে মুসলমানদের মধ্যকার দলাদলির বিলোপ সাধন এবং আমীরুল মু'মিনীন হযরত উসমান গনী (রা)-এর আনুগত্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। আবূ মূসা (রা)-এর এ ভাষণ প্রদানের ফলে কূফার অবস্থা কিছুটা শান্ত হয় এবং সাধারণ লোক, যারা সাবাঈ দলের সাথে কোন ভাবেই সম্পর্কিত ছিল না, তাদের মধ্যে স্বস্তি ফিরে আসে। কিন্তু আবদুল্লাহ্ ইবন সাবার দল এবং যারা হযরত উসমান গনী (রা)-এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করত তারা সাধারণভাবে হযরত উসমান গনী (রা) কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তাবৃন্দ এমন কি তৎকর্তৃক কূফার আশেপাশে জেলাসমূহে নিযুক্ত ছোট খাটো কর্মচারীদের সম্পর্কেও পাইকারী হারে অভিযোগ উত্থাপন করতে শুরু করে। তারা চিঠি পত্রের মাধ্যমে মদীনা শরীফের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণকেও হযরত উসমান গনী (রা)-এর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার অপচেষ্টা চালায়। মদীনা শরীফের অধিবাসীদের কাছে যখন বাইরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত বিভিন্ন অভিযোগ সম্বলিত চিঠিপত্রাদি পৌঁছত, তখন তারা অত্যন্ত ব্যথিত হতেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে শাস্তি প্রদান অথবা পদচ্যুত করার জন্য হযরত উসমান গনী (রা)-এর উপর চাপ প্রয়োগ করতেন। তদন্তের পর যেহেতু হযরত উসমান গনী (রা) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে নির্দোষ পেতেন, তাই তাকে শাস্তি প্রদান বা পদচ্যুত করতে ইতস্তত করতেন। ফলে মদীনা শরীফেও খোদ হযরত উসমান গনী (রা)-কে সাধারণ লোকেরা প্রকাশ্যে দোষারোপ

করতে শুরু করে এবং এখানেও খলীফার বিরুদ্ধে কানাঘুষা শুরু হয়ে যায়। এ অবস্থা দেখে আবূ উসায়দ সাঈদী, কা'ব ইবন মালিক, হাসসান ইবন ছাবিত (রা) প্রমুখ জনসাধারণকে পরস্পর গালাগালি ও দোষারোপ করা থেকে বিরত রাখতেন এবং ইসলামের দৃষ্টিতে খলীফার আনুগত্য যে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তা সবাইকে বোঝাবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু তাঁদের কথায় সাধারণ মানুষ খুব একটা প্রভাবিত হচ্ছে বলে মনে হত না। কারণ তা ছিল ঐ যুগ যখন আবদুল্লাহ্ ইবন সাবার এজেন্টরা ইসলামী রাষ্ট্রের সকল বড় বড় শহর এবং জনবসতিতে পৌঁছে গিয়েছিল এবং সর্বত্রই নিজেদের কমবেশী অনুসারী তৈরী করে নিয়েছিল।

ইসলামী রাষ্ট্রের তখন পাঁচটি বড় কেন্দ্র ছিল। মদীনা তাইয়িবা ছিল রাজধানী এবং সূচনাকাল থেকেই তা ছিল ইসলামী শক্তি ও শৌর্য-বীর্যের উৎসস্থল ও কেন্দ্রভূমি। কূফা ও বসরা উভয় শহরেই ছিল বিরাট বিরাট সেনাছাউনি। সেখানে যোদ্ধা আরব গোত্রসমূহের বসতি গড়ে উঠেছিল। উভয় স্থানেই ইসলামী শক্তি এতই মজবুত ও সুদৃঢ় ছিল যে, তার প্রভাবে ইরান থেকে আরম্ভ করে তুর্কিস্তান, আর্মেনিয়া, জর্জিয়া, এমন কি প্রশান্ত মহাসাগর ও কৃষ্ণসাগরের উপকূল পর্যন্ত সর্বত্র শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজ করছিল। ফুসতাত বা কায়রোয়ও সেনাছাউনি ছিল এবং মিসর ছাড়াও আলেপ্পো ও ফিলিস্তীন পর্যন্ত তার প্রভাব বিস্তৃত ছিল। দামিশকও ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের একটি কেন্দ্রভূমি। এখানেও মুসলমানদের এ পরিমাণ সমর শক্তি বিদ্যমান ছিল যে, রোম সম্রাট তাতে ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলেন। কেননা, যখনি দামিশকের মুসলিম সেনাবাহিনীর সাথে রোমান সেনাবাহিনীর মুকাবিলা হয়েছে, তখনি রোমান সেনাবাহিনী পরাজিত হয়েছে। সুচতুর আবদুল্লাহ্ ইবন সাবা প্রথম থেকেই এ পাঁচটি কেন্দ্রের গুরুত্ব উপলব্ধি করছিল। সে এটাও ভালভাবে বুঝে নিয়েছিল যে, মুসলিম বিশ্বে এগুলোর মত সামরিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কোন কেন্দ্র নাই। কাজেই সে সর্বপ্রথম মদীনা শরীফে আসে। সেখান থেকে বসরাতে গিয়ে পৌঁছে। দামিশকে হযরত মুআবিয়া (রা)-এর কারণে সে খুব একটা সুবিধা করতে পারে নি। বাকী সব জায়গায়ই সে সাফল্যের সাথে মানুষের আকীদা-বিশ্বাস নষ্ট করেছে, ছোট হোক অথবা বড় হোক সব কেন্দ্রেই নিজের দল গঠন করেছে অথবা এজেন্ট তৈরি করে রেখে এসেছে। দামিশকে আর কিছু না পারলেও হযরত আবূ যর (রা)-এর ঘটনা থেকে সে বেশ কিছু ফায়দা লুটেছে। সে মানুষের মধ্যে এ ধারণা প্রচার করেছে যে হযরত আবূ যর (রা) সত্যি কথা বলছেন এবং তিনি সঠিক পথেই আছেন। কেননা, বায়তুল মালকে হযরত মুআবিয়া মহান আল্লাহর মাল আখ্যা দিয়ে অন্যায়ভাবে নিজের দখলে বা এখতিয়ারে রাখতে চান। প্রকৃতপক্ষে তা মুসলিম জাতির সম্পদ এবং সমগ্র মুসলমান তাতে অংশীদার। কাজেই, মুসলমানদের মধ্যে তা বন্টন করে দেওয়া উচিত। এ প্রসঙ্গে হযরত উসমান গনী (রা)-কে সে সব অভিযোগের উৎস বলে আখ্যা দেয় এবং জনসাধারণকে তার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে। তারপর আবদুল্লাহ্ ইবন সাবা হযরত আবূ দারদা (রা)-এর কাছে যায় এবং অত্যন্ত সতর্কতা ও চাতুর্যের সাথে তাঁর সামনে নিজের বাতিল আকীদাসমূহ তুলে ধরতে শুরু করে। তার কথাবার্তা শুনে হযরত আবূ দারদা (রা) বলে উঠেন, তোমাকে ইয়াহূদী বলে মনে হচ্ছে। তুমি ইসলামের মুখোশ পরে মুসলমানদের পথভ্রষ্ট করছ। সেখানে তার চালাকি খাটে নি দেখে সে হযরত উবাদা ইবন সামিত (রা)-এর কাছে যায়। তিনিও যখন তার কথাবার্তা থেকে তার বাতিল চিন্তাধারা সম্পর্কে একটা ধারণা করে নেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে তাকে পাকড়াও করে হযরত

মুআবিয়া (রা)-এর কাছে নিয়ে যান এবং বলেন, আমার মনে হয় এ হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে আবূ যর (রা)-কে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলেছে এবং আপনার সাথে তাঁর লড়াই বাঁধিয়ে দিয়েছে। হযরত মুআবিয়া (রা) সঙ্গে সঙ্গে তাকে দামিশক থেকে বের করে দেন। তারপর সে মিসরে গিয়ে আপনার ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তারে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করে।

যখন দেশের প্রতিটি অঞ্চল থেকে মদীনা মুনাওয়ারাতে অনবরত অভিযোগ পত্র আসতে থাকে এবং সেখানেও কানাঘুষা শুরু হয় তখন মদীনা শরীফের কিছু সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তি হযরত উসমান গনী (রা)-এর সাথে দেখা করে অনুরোধ করেন যেন তিনি তাঁর নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সম্পর্কে তদন্ত চালান এবং জনসাধারণের অভিযোগসমূহ দূর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেন। হযরত উসমান গনী (রা) কয়েকজন নির্ভরযোগ্য সাহাবীকে বাছাই করে তাঁদের এক-একজনকে এক-এক প্রদেশে পাঠান যেন তাঁরা সংশ্লিষ্ট এলাকার অবস্থা তদন্ত করে তাঁর কাছে এসে রিপোর্ট প্রদান করেন। তিনি মুহাম্মদ ইবন মাসলামা (রা)-কে কূফায়, উসামা ইবন যায়দ (রা)-কে বসরায় এবং আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা)-কে সিরিয়ায় প্রেরণ করেন। এভাবে প্রত্যেকটি ছোট বড় প্রদেশে এক একজন তদন্তকারীকে পাঠানো হয়। কিছুদিন পর তাঁরা ফিরে এসে রিপোর্ট দেন যে, তাঁদের কেউ কোন এলাকায় কোন গভর্নর বা কর্মচারীকে আপত্তিকর কিছু করতে দেখেন নি বরং তাঁরা সংশ্লিষ্ট এলাকায় সুষ্ঠভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। কোন কর্মকর্তা কর্মচারীকে শরীআত বিরোধী কোন কাজ করতেও দেখা যায় নি এবং গণ্যমান্য ও বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন কোন লোকও তাদের কারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপন করেন নি। এসব কথা শুনে মদীনাবাসীগণ অনেকটা স্বস্তি লাভ করে। কিন্তু কিছু দিন যেতে না যেতেই আবার ঐ অবস্থার সৃষ্টি হয়। তখন হজ্জের মওসুম ছিল আসন্ন। হযরত উসমান গনী (রা) প্রত্যেকটি শহর ও জনবসতিতে জনসাধারণের নামে একটি সাধারণ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেন, যার বিষয়বস্তু ছিলো নিম্নরূপ :

> আমার কাছে এ মর্মে সংবাদ আসছে যে,আমার কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা জনসাধারণকে বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে এবং তাদের উপর জুলুম-অত্যাচার চালাচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে আমি সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে নির্দেশ দিয়েছি যেন তারা এবারকার হজ্জে অবশ্যই অংশ গ্রহণ করে। কাজেই, আমার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে যার যে অভিযোগ আছে, সে যেন হজ্জের সময় তা আমার সামনে পেশ করে এবং আপন প্রাপ্য, যদি তা প্রমাণিত হয় তাহলে আমার কাছ থেকে অথবা আমার কর্মকর্তা-কর্মচারীর কাছ থেকে আদায় করে নিয়ে যায়।

হযরত উসমান গনী (রা)-এর নির্দেশ

হযরত উসমান গনী (রা) প্রত্যেক কর্মকর্তা ও কর্মচারীর কাছে নির্দেশ পাঠান যেন তারা অবশ্য অবশ্যই হজ্জে অংশ গ্রহণ করেন। সে মতে মিসরের শাসক আবদুল্লাহ্ ইব্ন সা'দ (রা), সিরিয়ার প্রশাসক মুআবিয়া ইবন আবূ সুফিয়ান (রা), বসরার প্রশাসক আবদুল্লাহ্ ইবন আমের (রা) সহ সকল গভর্নর, কর্মকর্তা ও কর্মচারী হজ্জের মওসুমে মক্কা শরীফে এসে সমবেত হন। অপর দিকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাবার প্রস্তাবানুযায়ী তার অনুগত লোকেরা প্রত্যেকটি প্রদেশ ও প্রত্যেকটি কেন্দ্র থেকে রওয়ানা হয়ে মক্কা শরীফের পরিবর্তে মদীনা শরীফে এসে জড় হয়। হজ্জের দিনগুলোতে হযরত উসমান গনী (রা) ঘোষণা দেন যে, এখানে (মক্কা শরীফে) সকল সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী উপস্থিত রয়েছেন। যদি তাঁদের কারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ

থাকে তাহলে বিনা দ্বিধায় যেন তা পেশ করা হয়। কিন্তু সেখানে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কেউ কোন অভিযোগ উত্থাপন করেনি। এবার খলীফার মজলিসে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ এ ফিতনা ও বিশৃঙ্খলা কিভাবে দূর করা যায় সে সম্পর্কে পরস্পর শলা-পরামর্শ করতে থাকেন। কথার পিঠে কথা উঠে এবং প্রসঙ্গটি অনেক দূর পর্যন্ত গড়ায়। শেষ পর্যন্ত হযরত উসমান গনী (রা) সকলকে সম্বোধন করে বলেন, এ ফিতনা ও বিশৃঙ্খলা অবশ্য অবশ্যই ছড়িয়ে পড়বে এবং এর দ্বার শীঘ্রই উন্মুক্ত হবে। আমি চাই না যে, ফিতনার দরজা উন্মুক্ত করার দায়-দায়িত্ব আমার উপর পড়ুক। আল্লাহ্ তা'আলা খুব ভালভাবেই অবগত আছেন যে, আমি মানুষের উপকার ছাড়া অপকার কখনো করিনি। আমি কখনো তাদের অমঙ্গল চিন্তা করিনি। তাঁর একথা শুনে সকলেই নীরব হয়ে যান এবং হজ্জ সমাপনান্তে মক্কা শরীফ থেকে মদীনা শরীফের দিকে পৌঁছেই যে সমস্ত লোক বাইরে থেকে মদীনা শরীফে এসেছিল তাদেরকে একটি বৈঠকে আহ্বান করেন। তিনি ঐ বৈঠকে হযরত আলী (রা), হযরত তালহা (রা) এবং হযরত যুবায়র (রা)-কেও আহ্বান করেন। হযরত মুআবিয়া (রা)-ও মক্কা শরীফ থেকে হযরত উসমান গনী (রা)-এর সাথে মদীনা শরীফে এসেছিলেন এবং তিনিও ঐ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। ঐ বৈঠকে হযরত মুআবিয়া (রা) সর্বপ্রথম উঠে দাঁড়ান এবং 'হামদ ও ছানার (আল্লাহর প্রশংসা ও নবীর প্রশস্তির) পর সকলকে সম্বোধন করে বলেন :

আপনারা সকলেই হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবী। আপনারা বিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ এবং উম্মতের পৃষ্ঠপোষক। আপনারা আপনাদের বন্ধু উসমান গনী (রা)-কে কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব ছাড়াই খলীফা নির্বাচিত করেছেন। এখন তিনি বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। তাঁর সম্পর্কে মানুষের মুখে মুখে নানা ধরনের কথাবার্তা শোনা যায়। যদি আপনারা এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছে থাকেন, তাহলে তা প্রকাশ্যে বলুন। আমি তাঁর উত্তর দেওয়ার জন্য তৈরী আছি। হ্যাঁ, আমি একথাও অবশ্যই বলে দিতে চাই যে, যদি কারো মনে খলীফা বা আমীর হওয়ার সাধ জাগে তাহলে তার বা তাদের মনে রাখা উচিত যে, শেষ পর্যন্ত পিছন ফিরে পালানো ছাড়া তাদের ভাগ্যে কিছুই জুটবে না।

হযরত আলী (রা) হযরত মুআবিয়া (রা)-এর বক্তৃতার শেষ বাক্যটির উপর তাকে একটি শাসানি দেন এবং অন্য কোন কথা না বলেই বসে পড়েন। এবার হযরত উসমান গনী (রা) দাঁড়িয়ে বলেন :

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ও হযরত উমর (রা) খলীফা হওয়ার পর সতর্কতা হেতু এবং মহান আল্লাহ্র কাছে হিসাব দিতে হবে ভেবে নিজেদের আত্মীয়-স্বজনের সুখ-সুবিধার প্রতি মোটেই দৃকপাত করেন নি। অথচ রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর আত্মীয়-স্বজনের সুখ-সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখতেন এবং তাদেরকে সাহায্য করতেন। আমার আত্মীয়-স্বজনরা সাধারণত গরীব। তাই আমি তাঁদের সাথে সদয় ব্যবহার করে থাকি। যদি আপনারা তা অবৈধ প্রমাণিত করতে পারেন, তাহলে আমি আমার এ আচরণ পরিত্যাগ করতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

আপত্তি উত্থাপন

হযরত উসমান গনী (রা) এ পর্যন্ত বলার পর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, আপনি আপনার আত্মীয়-স্বজনকে অবৈধভাবে ধন-সম্পদ দান করেন। যেমন আপনি আবদুল্লাহ্ ইবন সা'দ

(রা)-কে সমগ্র মালে গনীমত বিলিয়ে দিয়েছেন। হযরত উসমান গনী (রা) উত্তর দেন, আমি মালে-গনীমতের খুমুস (এক-পঞ্চমাংশ) থেকে শুধু এক-পঞ্চমাংশ দান করেছি। আর এভাবে দান করার দৃষ্টান্ত হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতকালেও বিদ্যমান ছিল। তারপর আর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলে, আপনি আপনার আত্মীয়-স্বজনকে 'এমারত' (প্রশাসক পদ) দান করেছেন—যেমন মু'আবিয়া ইবন আবূ সুফিয়ান (রা)-কে সমগ্র সিরিয়া রাজ্যের আমীর (প্রশাসক) বানিয়ে দিয়েছেন এবং হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা)–-কে পদচ্যুত করে তার জায়গায় আবদুল্লাহ্ ইবন আমের (রা)-কে বসরার আমীর নিযুক্ত করেছেন। অনুরূপভাবে আপনি কূফার প্রশাসকের পদ থেকে মুগীরা ইবন শু'বাকে অপসারণ করে সেখানে ওয়ালীদ ইবন উকবা (রা)-কে, তারপর সাঈদ ইবন 'আসকে প্রশাসক নিয়োগ করেছেন। হযরত উসমান গনী (রা) তার উত্তরে বললেন, যাঁদেরকে আমি প্রশাসক পদ দান করেছি তারা আমার আত্মীয়-স্বজন নন, বরং নিজ নিজ দায়িত্ব সুষ্ঠভাবে পালন করার যোগ্যতা রাখেন। যদি আপনাদের দৃষ্টিতে তাঁরা প্রশাসক পদের যোগ্য না হয় এবং এজন্য আমার উপর অযথা পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উত্থাপন করা হয়, তাহলে আমি তাদের জায়গায় অন্য লোক নিয়োগ করতে প্রস্তুত আছি। আমি তো ইতিমধ্যে সাঈদ ইবন 'আস (রা)-কে পদচ্যুত করে তাঁর স্থলে আবূ মূসা আশআরী (রা)-কে কূফার গভর্নর নিয়োগ করেছি। তারপর আর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, আপনি আপনার অযোগ্য আত্মীয়-স্বজনকে প্রশাসকের চাকরি দিয়েছেন—যেমন, আপনার আত্মীয় আবদুল্লাহ্ ইবন আমের (রা) একজন যুবক মাত্র; তাঁকে প্রশাসকের চাকরি দেওয়া উচিত হয়নি। হযরত উসমান (রা) উত্তরে বলেন, বিবেক-বুদ্ধি, দূরদর্শিতা, ধর্মপরায়ণতা এবং অন্যান্য যোগ্যতার ক্ষেত্রে আবদুল্লাহ ইবন আমের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। কাজেই, তাঁর যুবক বয়সী হওয়াটা দোষের কোন ব্যাপার নয়। আপনারা বলুন, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত উসামা ইবন যায়দ (রা)-কে মাত্র ১৭ বছর বয়সে কেন 'আমীর' (সেনাপতি) নিযুক্ত করেছিলেন ? তারপর আর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, আপনি আপনার গোষ্ঠীর লোককে বড় বেশী ভালবাসেন এবং তাদেরকে বড় বড় উপহার দিয়ে থাকেন। হযরত উছমান গনী (রা) উত্তরে বলেন, নিজের গোষ্ঠির লোককে ভালবাসা কোন অপরাধ নয়। যদি আমি তাদেরকে কোন উপহার দিয়ে থাকি, তাহলে তা বায়তুল মাল থেকে দেইনি, বরং আমার নিজস্ব সম্পদ থেকে দিয়েছি। যেখানে বায়তুল মাল থেকে আমি আমার নিজের খরচের জন্যও একটি কানাকড়ি নেইনি, সেখানে আত্মীয়-স্বজনের জন্য কী করে বায়তুল মালের অর্থ খরচ করতে পারি ? আমার ব্যক্তিগত যে ধন-সম্পদ আছে তা তো আমি যাকে ইচ্ছা দান করতে পারি।

তারপর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, আপনি চারণভূমিকে নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়েছেন। হযরত উসমান গনী (রা) উত্তরে বলেন, আমি যখন খলীফা নির্বাচিত হলাম, তখন মদীনা তাইয়্যিবাতে আমার চাইতে অধিক উট বকরী কারোরই ছিল না। কিন্তু বর্তমানে আমার কাছে মাত্র দুটি উট আছে, যা শুধু হজ্জের পরিবহন কাজে ব্যবহার করার জন্য রাখা হয়েছে। আমি এগুলোকেও চারণভূমিতে পাঠাই না। অবশ্য বায়তুল মালের উটসমূহের নির্দিষ্ট চারণভূমি রয়েছে। আর এ নীতি শুধু আমার সময়ে নয় বরং আমার পূর্ব থেকেই চলে আসছে। কাজেই, এজন্য আমাকে অভিযুক্ত করা চলে না। তারপর আর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, আপনি

মীনায় (কসর নামায না পড়ে) পুরা নামায পড়লেন কেন ? সেখানে তো কসর (নামায সংক্ষেপ) করা উচিত ছিল। হযরত উসমান গনী (রা) উত্তরে বলেন, আমার পরিবার-পরিজন যেহেতু মক্কা শরীফের 'মুকীম' (অবস্থানকারী) ছিল, তাই মিনায় আমার জন্য নামায কসর (সংক্ষিপ্ত) না করা বৈধ ছিল। মোটকথা, প্রকাশ্য মজলিসে এভাবে একের পর এক আপত্তি উত্থাপন করা হয় এবং হযরত উসমান গনী (রা) প্রত্যেকটি আপত্তিরই সন্তোষজনক জবাব দেন। এভাবে মজলিসের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং লোকেরা যে যার পথে চলে যায়। তারপর হযরত আমর ইবন 'আস (রা) হযরত উছমান গনী (রা)-কে বলেন, আপনি মানুষের সাথে যতটুকু প্রয়োজন নয় তার চাইতেও বেশী নম্র ব্যবহার করেছেন। ফারূকে আযম (রা)-এর দস্তুর এটা ছিল না। তাঁর থেকে শতশত মাইল দূরে থেকেও একজন কর্মকর্তা বা কর্মচারী, তাঁকে তার (উমরের) সম্মুখে উপবিষ্ট ভৃত্যের চাইতেও অধিক ভয় করত এবং সর্বদা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকত। মানুষের সাথে সেই পরিমাণ নম্র ব্যবহার করা উচিত যার ফলে কোন ফাসাদ বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অবকাশ না থাকে। আপনি যে সমস্ত লোককে জানেন যে, তারা মুসলমানদের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টির প্রয়াস পাচ্ছে তাদেরকে হত্যা করছেন না কেন ? হযরত উসমান গনী (রা) হযরত আমর (রা)-এর এ পরামর্শ শুনে একেবারে নিশ্চুপ হয়ে যান।

হিজরী ৫২ সনের ঘটনাসমূহ

যেসব কর্মকর্তা ও কর্মচারী হযরত উসমান (রা)-এর সাথে মক্কা শরীফ থেকে মদীনা শরীফে এসেছিলেন তারা একের পর এক নিজ নিজ কর্মস্থলে চলে যান। শেষ পর্যন্ত হযরত মুআবিয়া (রা)-ও বিদায় গ্রহণের জন্য হযরত উসমান গনী (রা)-এর দরবারে হাযির হন। তিনি নিবেদন করেন, আমার তো ভয় হয়, না জানি কে কখন আপনার উপর হামলা করে বসবে এবং আপনি তা প্রতিরোধ করতে পারবেন না। আমার কাছে তাই সমীচীন মনে হচ্ছে যে, আপনি আমার সাথে সিরিয়ায় চলে আসুন। সিরিয়ার সমগ্র অধিবাসীই আমার অনুগত এবং আমার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। হযরত উসমান গনী (রা) উত্তর দেন, আমি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (রা)-এর প্রতিবেশীগণকে অর্থাৎ মদীনা শরীফের অধিবাসীগণকে ছেড়ে যেতে পারব না। তখন আমীরে মুআবিয়া (রা) বলেন, তাহলে আমাকে এ ব্যাপারে অনুমতি দিন যে, আমি একটি শক্তিশালী বাহিনী আপনার নিরাপত্তার জন্য সিরিয়া থেকে মদীনায় পাঠিয়ে দেব এবং তারা মদীনা শরীফেই অবস্থান করবে। হযরত উসমান গনী (রা) তখন উত্তর দেন, আমি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতিবেশীদেরকে বিরক্ত করতে চাই না। এ কথা শুনে হযরত মুআবিয়া (রা) বলেন, আপনি নিশ্চয়ই প্রতারিত হবেন। হযরত উসমান গনী (রা) তার উত্তরে :

حَسْبِىَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ・

(আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কর্মবিধায়ক) এ বলে নীরব হয়ে যান। হযরত মুআবিয়া (রা) সেখান থেকে উঠে গিয়ে হযরত আলী (রা), হযরত তালহা (রা) ও হযরত যুবায়র (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং প্রয়োজন দেখা দিলে হযরত উসমান গনী (রা)-কে সাহায্য করার জন্য তাদেরকে বিনীত আবেদন জানান। তারপর তিনি সিরিয়ায় চলে যান।

আবদুল্লাহ ইবন সাবার ষড়যন্ত্র

আবদুল্লাহ্ ইবন সাবা মিসরে বসে জনসাধারণের অগোচরেই তার ষড়যন্ত্রমূলক যাবতীয় কর্মপন্থা একেবারে পাকাপোক্ত করে নিয়েছিল। হযরত আম্মার ইবন ইয়াসির (রা) ও হযরত ওয়ারাকা ইবন রাফি আনসারী (রা)-এর মত সাহাবীদেরকেও সে আপন ইন্দ্রজালে আবদ্ধ করে নিয়েছিল। কিন্তু তার আন্দোলনের মূল লক্ষ্য সম্পর্কে সে এবং তার মুসলিম বেশধারী বিশেষ কয়েকজন বন্ধু ব্যতীত আর কেউই অবহিত ছিল না। ইসলামী খিলাফতকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য সে বাহ্যত হুব্বে আলী (আলী প্রেম) ও হুব্বে আহলে বায়ত (আহলে বায়তের প্রতি প্রেম)-কে মাধ্যমে পরিণত করেছিল। কিন্তু তার মূল উদ্দেশ্য ছিল সুদূরপ্রসারী ও (মুসলিম মিল্লাতের জন্য) অনেক মারাত্মক। যাহোক, উল্লিখিত সামরিক কেন্দ্রসমূহের অনেক সরলপ্রাণ আরবই ইবন সাবার প্রতারণাজালে আটকা পড়ে এবং তারই ইঙ্গিতে প্রত্যেকটি স্থানেই হযরত উসমান গনী (রা)-এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের প্রস্তুতি চলে। প্রত্যেকটি স্থানের এবং প্রত্যেকটি দলের লোকেরা এ ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছেছিল যে, হযরত উসমান গনী (রা)-কে হয় পদচ্যুত, নয়ত হত্যা করতে হবে। তবে পরবর্তী খলীফা কাকে করা হবে সে সম্পর্কে তাদের মধ্যে মতানৈক্য বিদ্যমান ছিল। কেউ হযরত আলী (রা)-কে, কেউ হযরত তালহা (রা)-কে, আবার কেউ হযরত যুবায়র (রা)-কে পরবর্তী খলীফা পদের জন্য সর্বাধিক যোগ্য মনে করত। ইসলামের প্রতি আবদুল্লাহ্ ইবন সাবার আদৌ কোন আসক্তি বা আন্তরিক টান ছিল না বরং হযরত উসমান গনী (রা)-এর বিরোধিতা করাই ছিল তার মূল লক্ষ্য। তাই সে আপাতত হুব্বে আলী (রা)-এর উপর গুরুত্ব প্রদানের বিষয়টি স্থগিত রাখে এবং পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে জনসাধারণকে দ্বিধা-বিভক্ত দেখে তাদেরকে নিজ নিজ অবস্থার উপরই ছেড়ে দেয়।

ফিত্না সৃষ্টিকারী কাফেলাসমূহের মদীনা তাইয়্যিবা যাত্রা

সর্বপ্রথম এক হাজার লোকের একটি কাফেলা তাদের হজ্জ যাত্রার কথা সর্বত্র প্রচার করে মিসর থেকে রওয়ানা হয়। আবদুর রহমান ইবন আদীস, কিনানা ইবন বাশার ইয়ামানী, সুদান ইবন ইমরান প্রমুখ ব্যক্তি এ কাফেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। কাফেলার নেতা নির্বাচিত হয় গাফিকী ইবন হারব মক্কী। স্থির করা হয় যে, সব লোক এক সাথে রওয়ানা হবে না, বরং চারটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে একের পর এক মিসর থেকে রওয়ানা হবে এবং কয়েকটি মনযিল অতিক্রম করার পর পুনরায় একে অপরের সাথে মিলিত হবে। মালিক আশতারের নেতৃত্বেও কূফা থেকে এক হাজার লোকের আর একটি কাফেলা অনুরূপভাবে (চারভাগে বিভক্ত হয়ে) রওয়ানা হয়। যায়দ ইবন সাফওয়ান আবদী, যিয়াদ ইবন রফর হারিছী, আবদুল্লাহ্ ইবন আসিম আমিরী প্রমুখ ছিল ঐ কাফেলার অন্তর্ভুক্ত। এভাবে হোরকাওস ইবন যুহায়দের নেতৃত্বে এক হাজার লোকের একটি দল বসরা থেকে রওয়ানা হয়। ঐ দলে হাকীম ইবন জাবাল্লাহ আবদী, বাশার ইবন শুরায়হ কায়সী প্রমুখ ছিলেন। কাফেলাগুলো হিজরী ৩৫ সনের শাওয়াল মাসে নিজ নিজ শহর থেকে রওয়ানা হয় এবং সকলেই এ কথা প্রচার করে যে, তারা হজ্জ করতে চলেছে। তারা গোপনে গোপনে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, এবার তারা আমীরুল মু'মিনীন হযরত উসমান গনী (রা)-কে অবশ্য অবশ্যই পদচ্যুত করাবে, নয়ত হত্যা করবে। তারা চার ভাগে বিভক্ত হয়ে নিজ নিজ শহর থেকে বের হয় এবং কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর পুনরায়

একত্রিত হয়। এভাবে বেশ কয়েক মনযিল অতিক্রম করার পর তিনটি শহরের তিনটি কাফেলাই পরস্পরের সাথে মিলিত হয় এবং একই কাফেলায় রূপান্তরিত হয়ে মদীনা শীরফের দিকে অগ্রসর হয়। যখন মদীনা শরীফের দূরত্ব ছিল আর তিন মনযিল তখন ঐ কাফেলার মধ্যে যারা হযরত তালহা (রা)-কে খলীফা বানাতে চাচ্ছিলো তারা 'যূখাশার' নামক স্থানে থেমে যায়। আর যারা হযরত যুবায়র (রা)-কে খলীফা নির্বাচন করতে চাচ্ছিল তারা আওয়াস নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে। বসরার বেশীর ভাগ লোক হযরত যুবায়র (রা)-এর এবং মিসরের বেশীর ভাগ লোক হযরত আলী (রা)-এর পক্ষে ছিল।

যিয়াদ ইবন মুনযির এবং আবদুল্লাহ্ ইবন আসেম ঐ সব লোককে সম্বোধন করে বলেন, তোমরা তাড়াহুড়া না করে এখানেই অপেক্ষা কর। আমরা প্রথমে মদীনা শরীফে গিয়ে চেষ্টা করি। কেননা, আমরা জানতে পেরেছি যে, মদীনা শরীফের অধিবাসীরাও যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। যদি এ খবর সত্যি হয় তাহলে আমাদের তো কিছুই করার থাকবে না। এ কথা শুনে সবাই নিশ্চুপ হয়ে যায়। তারপর তারা দু'জন মদীনা শরীফে প্রবেশ করে। তারা হযরত আলী (রা), তালহা (রা), যুবায়র (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে নিজেদের মদীনা শরীফে আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে। অনুরূপভাবে তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহধর্মিণীগণের সাথেও দেখা করে। কিন্তু, কেউই তাদেরকে প্রশ্রয় দেন নি, বরং তিরস্কার করেন এবং অবিলম্বে মদীনা থেকে ফিরে যাবার নির্দেশ দেন।

এখানে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, মদীনা শরীফে অবস্থানরত আবদুল্লাহ ইবন সাবার লোকেরা হযরত আলী (রা), তালহা (রা), যুবায়র (রা) এবং রাসূলুল্লাহ্ (রা)-এর সহধর্মিণীগণের পক্ষ থেকে অনেক চিঠি কূফা, বসরা ও মিসরের ঐ সমস্ত লোকের কাছে পাঠিয়েছিল যারা এ মহান ব্যক্তিদেরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখেন, অথচ তখন পর্যন্ত তারা আবদুল্লাহ্ ইবন সাবার ফাঁদে নিশ্চিতভাবে আটকা পড়েন নি। ঐ সমস্ত বানোয়াট চিঠিতে বলা হয়েছিল, যেহেতু হযরত উসমান গনী (রা) খলীফার আসনে অধিষ্ঠিত থাকার যোগ্যতা সম্পূর্ণরূপে হারিয়েছেন, তাই ত্যকে পদচ্যুত করা একান্ত বাঞ্ছনীয়, আর উম্মতে মুসলিমার স্বার্থে আগামী যিলহাজ্জ মাসেই এ অতি প্রয়োজনীয় কাজটি সমাধা করা উচিত। বিশেষত এ প্রেক্ষাপটেই এ তিনটি কাফেলা সর্বপ্রকার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি এবং হত্যা ও রক্তারক্তির উদ্দেশ্যে মদীনা শরীফে এসে জড় হয়েছিল। অন্যথায় এ তিনটি হাজার লোকের কী করে এ দুঃসাহস হতে পারে যে, যেখানে মদীনা শরীফে আহযাব যুদ্ধকালে বিরাট কাফিরও কোন সুবিধা করে উঠতে পারে নি, সেখানে তারা জোরপূর্বক নিজেদের একটি অতি ঝুঁকিপূর্ণ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য মদীনা শরীফের দিকে ধেয়ে আসবে? বরং এ ভরসায় তারা বুক উঁচিয়ে মদীনা শরীফ অভিমুখে রওয়ানা হয়েছিল যে, মদীনা শরীফের গণ্যমান্য সব লোকই তো আমাদের পক্ষে রয়েছে এবং আমরা যা কিছু করব তাতে তাদেরই উদ্দেশ্য সফল হবে। কিন্তু যখন মদীনা শরীফের গণ্যমান্য ব্যক্তিমাত্রই তাদের এ আগমনকে অন্যায় ও অসঙ্গত বলে সাব্যস্ত করলেন এবং তারা নিজেরাও মদীনা তাইয়িবাতে কোন প্রকার যুদ্ধ প্রস্তুতি দেখতে পেল না, তখন তারা গণ্যমান্য ব্যক্তিদের ঐ বিরোধিতাকে একটি দূরদর্শিতামূলক সাময়িক সিদ্ধান্ত বলে মনে করল এবং বিক্ষোভকারীদের কাছে ফেরত গিয়ে তাদের সকল নেতা প্রতিনিধিকে নিয়ে একটি পরামর্শ সভায় বসল। সভায় মদীনা শরীফের অধিবাসীদের পক্ষ থেকে সকলকে আশ্বস্ত করা

হল এবং এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হল যে, যেহেতু মিসরবাসীদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই হযরত আলী (রা)-কে সমর্থন করে, তাই মিসরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা হযরত আলী-এর সাথে সাক্ষাৎ করবেন। অনুরূপভাবে বসরার অধিবাসীরা যুবায়র (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করবেন। এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনটি পৃথক প্রতিনিধি দল মদীনা শরীফে এসে উল্লিখিত তিন ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করে। প্রত্যেক দলই তাদের সমর্থিত ব্যক্তিকে বলে, আমরা হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফতকে মোটেই পসন্দ করি না। কাজেই, আপনি আমাদের কাছ থেকে খিলাফতের বায়'আত গ্রহণ করুন। কিন্তু উল্লিখিত তিন ব্যক্তির প্রত্যেকেই দৃঢ়ভাবে তা অস্বীকার করেন। এবার দাঙ্গাবাজ মিসরবাসীরা হযরত আলী (রা)-কে বলল, আমাদের ওখানে (মিসরে) নিযুক্ত কর্মকর্তা যেহেতু অত্যন্ত জালিম ও স্বেচ্ছাচারী, তাই আমরা তার অপসারণের ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত কখনো মদীনা শরীফ থেকে ফিরে যাব না। তাদের এ দাপট ও আস্পর্ধা লক্ষ্য করে এবং সময় ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে হযরত আলী (রা) এবং আরো কয়েকজন সাহাবী হযরত উসমান (রা)-এর কাছে গিয়ে তাকে পরামর্শ দেন : এ বিক্ষোভকারীরা যে কথার উপর জিদ ধরেছে তা আপনি পূরণ করে দিন এবং মদীনা শরীফে প্রবেশ করার পূর্বেই ওরা যাতে নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যায়, সে ব্যবস্থা করুন। তারা আবদুল্লাহ্ ইবন সা'দ (রা)-কে মিসরের গভর্নর পদ থেকে অপসারণের জন্য জিদ ধরেছে। তাই তাকে আপাতত অপসারণ করে অন্য কাউকে তার স্থলে নিয়োগ করুন।

হযরত আলী (রা) আপন পোষ্যের (সমর্থকের) জন্য সুপারিশ করেন

হযরত আলী (রা)-এর উপরোক্ত পরামর্শের উপর উসমান গনী (রা) জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে আবদুল্লাহ্ ইবন সা'দ (রা)-এর পরিবর্তে কাকে মিসরের গভর্নর নিয়োগ করা হবে ? হযরত আলী (রা) ও অন্যান্য সাহাবী হযরত মুহাম্মদ ইবন আবূ বকর (রা)-এর নাম প্রস্তাব করেন। মুহাম্মদ ইবন আবূ বকর (রা) প্রথম থেকেই হযরত আলী (রা)-এর সমর্থক ছিলেন এবং তিনি আবদুল্লাহ্ ইবন সাবার প্রতারণা জালেও আবদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। হযরত উসমান গনী (রা) একটি লিখিত নির্দেশের মাধ্যমে মুহাম্মদ ইবন আবূ বকর (রা)-কে মিসরের আমীর তথা গভর্নর নিয়োগ করেন। এবার হযরত আলী (রা) বিক্ষোভকারীদের প্রতিনিধিদেরকে বললেন, 'যাও, এবার তোমাদের দাবী পূরণ হয়েছে।' হযরত তালহা (রা) এবং যুবায়র (রা)-ও তাদেরকে মদীনা শরীফ থেকে চলে যেতে বললেন। ফলে তারা ভালোয় ভালোয় মদীনা শরীফ ছেড়ে চলে গেল। কিন্তু পরবর্তী তৃতীয় বা চতুর্থ দিনে সকল বিক্ষোভকারী তাকবীর ধ্বনি তুলে পুনরায় মদীনা শরীফে এসে প্রবেশ করল এবং সঙ্গে সঙ্গে হযরত উসমান গনী (রা)-এর বাসগৃহ ঘিরে ফেলল। হযরত আলী (রা) তখন তাদেরকে বললেন, তোমরা তো এখান থেকে চলে গিয়েছিলে, আবার ফিরে আসলে কেন ? মিসরের বিক্ষোভকারীরা বলল, খলীফা উসমান গনী (রা) আবদুল্লাহ্ ইবন সা'দ (রা)-কে লিখিত একটি পত্র তাঁর এক ভৃত্যের মাধ্যমে মিসরে পাঠিয়েছিলেন। তাতে লেখা ছিল, আমরা যখনই মিসর পৌঁছব, তখনই যেন আমাদেরকে হত্যা করে ফেলা হয়। আমরা রাস্তায়ই এ পত্র ধরে ফেলেছি এবং তা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। কূফা ও বসরার বিক্ষোভকারীরা বলল যেহেতু আমরা আমাদের মিসরীয় ভাইদের সুখ ও দুঃখের অংশীদার থাকতে চাই, তাই আমরাও তাদের সাথে ফিরে এসেছি। হযরত আলী (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! তা তোমাদের একটা ষড়যন্ত্র ছাড়া কিছু নয়। তার

মধ্যে তোমাদের নেক নিয়্যতের (সদিচ্ছার) কোন চিহ্নই আমি দেখছি না। তারা তখন বলল, পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, এ খলীফাকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে। আপনি আমাদেরকে এ কাজে সাহায্য করুন। হযরত আলী (রা) তখন রাগত-স্বরে বলেন, এ রূপ কাজে আমি কি করে তোমাদের সাহায্য করতে পারি ? তারা বলে উঠল, তাহলে আপনি আমাদের কাছে চিঠি লিখেছিলেন কেন ? হযরত আলী (রা) বললেন, আমি তো তোমাদের কাছে কখনো কোন চিঠি লিখিনি। একথা শুনে বিক্ষোভকারীরা হতচকিত হয়ে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগল। তারপর হযরত আলী (রা) মদীনা শরীফ থেকে 'আহজারু'য-যায়ত' নামক স্থানে চলে যান। এদিকে বিক্ষোভকারীরা হযরত উসমান গনী (রা)-কে বিরক্ত করতে শুরু করে। তখন পর্যন্ত তারা হযরত উসমান গনী (রা)-এর পিছনে নামায পড়ছিল; এবার তা থেকেও বিরত রইল এবং অন্যদেরকেও বিরত রাখার প্রয়াস পেল।

হযরত উসমান গনী (রা) যখন এ পরিস্থিতি লক্ষ্য করলেন এবং এও লক্ষ্য করলেন যে, বিক্ষোভকারীদের দ্বারা মদীনা শরীফের অলিগলি ভরে উঠেছে তখন তিনি বিভিন্ন প্রদেশের কর্মকর্তাদের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়ে চিঠি লিখলেন। কিংবা এও হতে পারে যে, এ সমস্ত খবর লোকমুখে আপনাআপনি বিভিন্ন প্রদেশে পৌছে গিয়েছিল। তাই মিসর, সিরিয়া, কূফা ও বসরা থেকে সাহাবায়ে কিরাম ও অন্যান্য পুণ্যবান ব্যক্তি খলীফার সাহায্যের নিমিত্ত অবিলম্বে মদীনা শরীফে আসার জন্য সকলকে উদ্বুদ্ধ করেন। হযরত মুআবিয়া (রা) হাবীব ইবন মাসলামা ফিহরীকে এবং আবদুল্লাহ ইবন সা'দ (রা) মুআবিয়া ইব্ন খাদীজকে মদীনা শরীফে প্রেরণ করেন। কা'কা' ইবন আমর একটি দল নিয়ে মদীনা শরীফের অভিমুখে রওনা হয়। বিভিন্ন এলাকায় এ সমস্ত খবর পৌছতে বিলম্ব ঘটেছিল অথবা খবর পৌছার পর সাহায্যকারী দল পাঠানো হবে কিনা সে ব্যাপারে ইতস্তত করা হচ্ছিল। তাই কোন সাহায্যকারী গোষ্ঠীই হযরত উসমান (রা)-এর শাহাদতের পূর্বে মদীনা তাইয়িবাতে পৌছতে পারেনি। তারা সকলে পথিমধ্যেই কোন-না-কোন স্থানে এ মর্মান্তিক সংবাদ জানতে পারে এবং সেখান থেকেই আবার নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যায়।

যা হোক ত্রিশ দিন পর্যন্ত হযরত উসমান গনী (রা) ঘেরাও অবস্থায়ই মসজিদে এসে নামায আদায় করেন। তারপর বিক্ষোভকারীরা তাঁকে ঘর থেকে বের হতে দেয় নি এবং তাঁর ঘরে পানি পৌছানোর রাস্তাও বন্ধ করে দেয়। হযরত উসমান গনী (রা) তাদেরকে বার বার বলেন, তোমরা যে চিঠিকে কেন্দ্র করে আমাকে এভাবে হয়রান করছ সে চিঠি যে আমি লিখেছি তার কোন চাক্ষুস প্রমাণ থাকলে পেশ কর, অথবা আমা থেকে কসম নাও। আমি কসম করে বলতে পারি যে, ঐ চিঠি সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। কিন্তু বিক্ষোভকারীরা তখন কোন যুক্তিপূর্ণ কথাই শুনতে রাযী নয়। ব্যাপক বাড়াবাড়ি শুরু হল। ঘরে পানি পৌছানোর পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় হযরত উসমান (রা) অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে পতিত হন। অবশ্য জনৈক প্রতিবেশীর মাধ্যমে গোপনভাবে কিছু কিছু পানি তাঁর ঘরে পৌছতে থাকে।

হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা)-এর ইমামতি

হযরত উসমান গনী (রা) যখন মসজিদে আসতে সক্ষম হলেন না, তখন নামাযের ইমামতির জন্য তিনি হযরত আবূ আইয়ূব (রা)-কে নিযুক্ত করেন। কিন্তু কিছুদিন পর বিক্ষোভকারীদের নেতা সাফিকী ইব্ন হারব মক্কী নিজেই ইমামতি করতে শুরু করে। মিসরে

মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর (রা) যেমন হযরত উসমান গনী (রা)-এর বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডা চালাচ্ছিলেন তেমনি প্রোপাগাণ্ডা চালাচ্ছিলেন উসমান ইব্‌ন হুযায়ফাও। মিসর থেকে আবদুর রহমান ইব্‌ন আদীসের নেতৃত্বে যে কাফেলাটি মদীনা শরীফ অভিমুখে রওয়ানা হয়েছিল, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর (রা) সে কাফেলার সাথে মদীনা শরীফে এসে পৌছেন, কিন্তু মুহাম্মদ ইব্‌ন হুযায়ফা মিসরেই রয়ে গিয়েছিলেন। হযরত উসমান গনী (রা)-এর অবরুদ্ধ হওয়ার সংবাদ যখন মিসরে পৌছল, তখন খোদ আবদুল্লাহ ইব্‌ন সা'দ (রা) একদল লোক নিয়ে মদীনা শরীফ অভিমুখে রওয়ানা হন। যখন তিনি রামাল্লায় পৌছেন তখন খবর আসে যে, মুহাম্মদ ইব্‌ন হুযায়ফা মিসর দখল করে নিয়েছেন। তাই আবদুল্লাহ ইবন সা'দ (রা) সেখান থেকেই মিসরের দিকে ফিরে যান। যখন তিনি ফিলিস্তীনে পৌছেন, তখন খবর পান যে, হযরত উসমান গনী (রা) শাহাদত বরণ করেছেন। এদিকে হযরত উসমান গনী (রা)-এর বাড়ি ৪০ দিন পর্যন্ত অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। ঐ সময় হযরত আলী (রা) কয়েকবারই হযরত উসমান গনী (রা)-এর সাথে দেখা করেন। বিক্ষোভকারীদের বুঝিয়ে সুজিয়ে নিজ নিজ এলাকায় ফেরত পাঠাবার জন্যও তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কিন্তু হযরত উসমান গনী (রা)-এর মীর মুন্‌শী (মুখ্য সচিব) মারওয়ান ইব্‌ন হাকাম, সে আত্মীয়তায় উসমান গনী (রা)-এর চাচাত ভাইও ছিল, হযরত আলী ও বনূ হাশিমের অন্যান্য নেতাকে আপন অশিষ্ট আচরণ দ্বারা বার বার অসন্তুষ্ট ও ত্যক্ত-বিরক্ত করে তুলতে থাকে। বেশ কয়েকবার হযরত উসমান গনী (রা) আপন সদিচ্ছা ও সদাচরণ দ্বারা বিগড়ে যাওয়া পরিস্থিতিকে শুধরে নেন এবং কুরায়শ ও অনসার নেতৃবৃন্দের সহানুভূতি লাভ সক্ষম হন। কিন্তু পর মুহূর্তেই মারওয়ান ইব্‌ন হাকাম আপন লাগামহীন কথাবার্তা দ্বারা পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণের বাইরে ঠেলে দিতে থাকে।

মারওয়ান ইব্‌ন হাকামের ধৃষ্টতা

হযরত উসমান গনী (রা) ছিলেন অত্যন্ত শালীন এবং নম্র স্বভাবের লোক। এ সুযোগে মারওয়ানের দুঃসাহসও অনেক বেড়ে গিয়েছিল। মারওয়ান এবং তার পিতা হাকামকে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনা শরীফ থেকে বহিষ্কার করে দিয়েছিলেন। হযরত সিদ্দীকে আকবর ও ফারূকে আযম (রা) তাঁদের খিলাফত কালেও ঐ বাপ-বেটাকে মদীনা শরীফে প্রবেশ করতে দেন নি। কিন্তু হযরত উসমান গনী (রা) খলীফা হওয়ার পর তাদেরকে মদীনা শরীফে ডেকে নিয়ে আসেন এবং আত্মীয়তার সুবাদে তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন জরুরী মনে করে মারওয়ানকে তার মীর মুন্‌শী (মুখ্য সচিব) নিয়োগ করেন। মীর মুন্‌শী বা কাতিব হয়ে মারওয়ান খলীফার উপর আধিপত্য বিস্তারের সুবর্ণ সুযোগ পায় এবং অত্যন্ত চাতুর্যের সাথে মাঝে মাঝে 'দরবারে খিলাফত' থেকে সাহাবিগণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক নির্দেশাদি জারি করার ব্যাপারেও সাফল্য লাভ করে। এ কারণেই মদীনা শরীফের অধিবাসীরা মারওয়ান ইব্‌ন হাকামের উপর অসন্তুষ্ট ছিল। ফলে দীর্ঘ চল্লিশ দিনের অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা এবং অবরোধকালীন দিনগুলোতে তারাও বিদ্রোহী ও বিক্ষোভকারীদের সাথে মিশে মারওয়ানকে তার পদ থেকে অপসারণের দাবী তুলে। যদি হযরত উসমান গনী (রা) মারওয়ানকে বিক্ষোভকারীদের হাতে সমর্পণ করতেন, তাহলে নিশ্চিতভাবে ঐ বিক্ষোভ এবং বিশৃঙ্খলারও পরিসমাপ্তি ঘটত। কেননা, অন্তত মদীনাবাসীদের কোন ক্ষোভ বা দুঃখ থাকলে তা মারওয়ানের প্রতিই ছিল। হযরত উসমান গনী (রা)-এর সাথে মদীনা শরীফের কারো কোন ব্যক্তিগত শত্রুতা বা বিদ্বেষ ছিল না। কিন্তু হযরত উসমান গনী

(রা) মারওয়ানকে বিক্ষোভকারীদের হাতে সমর্পণ করতে অস্বীকার করেন এজন্য যে, তাঁর বিশ্বাস ছিল তারা সুযোগ পাওয়া মাত্র মারওয়ানকে হত্যা করে ফেলবে। তাই তিনি তা চাননি যে, তাঁরই সুযোগ দানের কারণে মারওয়ানকে হত্যা করা হোক। যখন বিক্ষোভকারীরা অত্যধিক গণ্ডগোল আরম্ভ করে এবং অনুমিত হতে থাকে যে, এখনই তারা হযরত উসমান গনী (রা)-এর ঘরের দরজা ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করে তাঁকে হত্যা করবে তখন হযরত আলী (রা) আপন পুত্রদ্বয় ইমাম হাসান ও ইমাম হুসায়ন (রা)-কে সেখানে পাঠান এবং নির্দেশ দেন যেন তাঁরা সশস্ত্র অবস্থায় হযরত উসমান গনী (রা)-এর দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে এবং ভিতরে কাউকে প্রবেশ করতে না দেয়। অনুরূপভাবে হযরত তালহা (রা) এবং হযরত যুবায়র (রা) আপন আপন পুত্রদেরকে হযরত উসমান (রা)-এর দরজায় পাহারা দেওয়ার জন্য পাঠিয়ে দেন। তারা সবাই সেখানে পৌঁছে বিক্ষোভকারীদেরকে রুখে দাঁড়ায়। ফলে তারা ভিতরে প্রবেশ করার সাহস পায়নি। কেননা এ সব ব্যক্তিদের কেউ না কেউ বিক্ষোভকারীদের হাতে আহত বা নিহত হলে আশংকা ছিল যে সমগ্র বনী হাশিম তাদের বিরুদ্ধে চলে যাবে। অপর দিকে বিক্ষোভকারীদের এ ভয়ও ছিল যে হযরত উসমান গনী (রা)-এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা অবরোধের সংবাদ পাওয়ার পর অবশ্যই মদীনা শরীফ অভিমুখে তাদের সেনাবাহিনী প্রেরণ করবে এবং ঐসব সেনাবাহিনী মদীনা শরীফ পৌঁছে গেলে তাদের লক্ষ্য অর্জন কঠিন হয়ে পড়বে। তাই তারা অবিলম্বে হযরত উসমান গনী (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠে। দরজায় কড়া পাহারা থাকার দরুন তারা হযরত উসমান (রা)-এর গৃহসংলগ্ন অন্য একটি গৃহে প্রবেশ করে এবং সে গৃহের দেওয়াল টপকিয়ে হযরত উসমান গনী (রা)-এর গৃহে প্রবেশ করে।

হযরত উসমান গনী (রা)-এর শাহাদত বরণ

মিসরের বিক্ষোভকারীরা যখন পুনরায় মদীনা শরীফে ফিরে এসে জনসাধারণকে ঐ চিঠি দেখায় এবং হযরত উসমান গনী (রা) যখন শপথ করে বলেন যে, তিনি ঐ চিঠি সম্পর্কে কিছুই জানেন না–তখন বিক্ষোভকারীদের নেতা আবদুর রহমান ইব্‌ন আদীস হযরত উসমান গনী (রা)-কে বলে, আপনি আপনার এ শপথ বাক্যে চাই মিথ্যাবাদী হন, আর চাই সত্যবাদী, আপনাকে কোন অবস্থায়ই খলীফা পদে বহাল রাখা বৈধ হবে না। কেননা, আপনি যদি মিথ্যাবাদী হন, তাহলে কোন মিথ্যাবাদী তো মুসলমানদের খলীফা হতে পারে না। আর আপনি যদি সত্যবাদী হন, তাহলে এমন দুর্বল খলীফা যার অনুমতি ও অবগতি ব্যতীতই তাঁর নামে যার ইচ্ছা সেই যে কোন নির্দেশ লিখে পাঠাতে পারে, তাঁকে তো কোন মতেই খলীফা পদে বহাল রাখা চলে না। আবদুর রহমান ইব্‌ন আদীস হযরত উসমান গনী (রা)-কে বলে, আপনি নিজেই খলীফা পদে ইস্তফা দিন। তিনি উত্তর দিলেন, যে জামাটি আল্লাহ তা'আলা আমাকে পরিয়ে দিয়েছেন আমি স্বয়ং তা খুলে ফেলতে পারি না। অর্থাৎ আমি নিজ থেকে খলীফা পদ পরিত্যাগ করতে পারি না। তারপর বিক্ষোভকারীরা তাঁর গৃহ অবরোধ করে ফেলে এবং তাঁর উপর বাড়াবাড়ি শুরু করে। যখন হযরত উসমান গনী (রা)-এর পানি বন্ধ করে দেওয়া হল এবং পানির অভাবে তিনি আপন পরিবারসহ ভীষণ কষ্টের সম্মুখীন হলেন তখন তিনি ঘরের ছাদের উপর আরোহণ করে সকলকে তার ন্যায্য অধিকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। তিনি এও স্মরণ করিয়ে দিলেন যে তিনি হচ্ছেন সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারীদের অন্যতম। বিক্ষোভকারীদের উপর তাঁর এ বক্তৃতার কিছুটা প্রভাব পড়ে। ফলে, তাদের কেউ কেউ

বলতে থাকে, ভাই, ওকে ছেড়ে দাও এবং ক্ষমা কর। ইতিমধ্যে মালিক ইব্‌ন আশতার এসে পড়ে এবং জনতাকে উদ্দেশ্য করে বলে, খবরদার ! এসব কথায় ভুলে গেলে চলবে না। এগুলো প্রতারণা ছাড়া কিছু নয়। এতে ফেঁসে যাওয়ার অর্থ নিজেদেরই সর্বনাশ ডেকে আনা। তার কথা শুনে লোকেরা আবার হযরত উসমান গনী (রা)-এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেল। বিক্ষোভকারীরা যখন নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারল যে, ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে যেসব সেনাবাহিনী আসবে তারা অনিবার্যভাবে হযরত উসমান গনী (রা)-এর সমর্থক ও আমাদের বিরোধী হবে। তাই তারা হযরত উসমান গনী (রা)-কে অবিলম্বে হত্যা করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়। ঐ সময় হযরত আয়েশা (রা) হজ্জ পালনের সংকল্প নেন এবং আপন ভাই মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর (রা)-কে তাঁর সাথে মক্কা মুকাররমাতে যেতে বলেন। কিন্তু মুহাম্মদ ইবন আবূ বকর (রা) তাঁর সাথে যেতে অস্বীকার করেন। কেননা, ইতিমধ্যে বিক্ষোভকারীদের সাথে তাঁর বেশ ভাব জমে উঠেছিল। কাতিবে ওয়াহী হযরত হানযাল (রা) মুহাম্মদকে বলেন, তুমি উম্মুল মু'মিনীনের সাথে যাচ্ছ না, বরং আরবের মূর্খজনদের অনুসরণ করছ, তা কিন্তু তোমার সম্মান ও মর্যাদার সাথে খাপ খাচ্ছে না। মুহাম্মদ ইবন আবূ বকর (রা) তাঁর ঐ কথার কোন উত্তর দেন নি। তারপর হানযালা (রা) কূফার দিকে চলে যান। এ ন্যক্কারজনক পরিস্থিতি লক্ষ্য করে হযরত তালহা (রা), হযরত যুবায়র (রা) এবং অন্যান্য সাহাবী তাঁদের ঘরের দরজা বন্ধ করে দেন। তাঁরা তখন না ঘর থেকে বের হতেন, আর না কারো সাথে মেলামেশা করতেন। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হযরত উসমান গনী (রা)-এর দরজায় দণ্ডায়মান থেকে দৃঢ়তার সাথে বিক্ষোভকারীদের মুকাবিলা করেন এবং তাদেরকে রুখে দাঁড়ান। কিন্তু হযরত উসমান গনী (রা) তাঁকে আমীরে হজ্জ নিযুক্ত করে জবরদস্তিমূলকভাবে মুয়াযযমাতে পাঠিয়ে দেন। অথচ তিনি তখন বলেছিলেন, এ বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা আমার কাছে হজ্জের চাইতেও অধিক পসন্দনীয়। হযরত হাসান ইব্‌ন আলী, হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র, মুহাম্মদ ইব্‌ন তালহা এবং সাঈদ ইব্‌ন 'আস (রা)-ও দৃঢ়তার সাথে বিক্ষোভকারীদের রুখে দাঁড়ান এবং শেষ পর্যন্ত লড়াই করে তাদেরকে পিছনে হটিয়ে দেন।

কিন্তু হযরত উসমান গনী (রা) কসমের পর কসম কেটে তাদেরকে লড়াই থেকে বিরত রাখেন এবং ঘরের ভিতরে ডেকে নিয়ে যান। এ সুযোগে বিক্ষোভকারী দরজায় আগুন লাগিয়ে দেয় এবং ভিতরে ঢুকে পড়ে। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) প্রমুখ বের হয়ে আবার বিক্ষোভকারীদের মুকাবিলা করে তাদেরকে ঘর থেকে বের করে দেন। তখন হযরত উসমান গনী (রা) কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন। যখন তিনি–

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ٠

তাদেরকে লোকে বলেছিল যে, তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমায়েত হয়েছে সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় কর, কিন্তু তা তাদের ঈমান মযবুত করেছিল এবং তারা বলেছিল, 'আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কর্ম বিধায়ক। (৩ : ১৭৩)

–এ আয়াতে পৌঁছেন তখন উপস্থিত লোকদেরকে সম্বোধন করে বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমা থেকে একটি অঙ্গীকার নিয়েছেন এবং আমি সে অঙ্গীকারের উপর কায়েম আছি।

কাজেই, তোমরা কখনো এ বিক্ষোভকারীদের মুকাবিলা করো না এবং তাদেরকে হত্যাও করো না। তিনি হযরত হাসান ইব্ন আলী (রা)-কে নির্দেশ দেন, তুমি এখনি তোমার পিতার কাছে চলে যাও। কিন্তু তিনি পরিস্থিতি লক্ষ্য করে ফিরে যাওয়া পসন্দ করলেন না এবং দরজায় দাঁড়িয়ে পূর্বের ন্যায় বিক্ষোভকারীদেরকে বাধা দিতে থাকলেন।

মুগীরা ইব্ন আখনাস (রা)-কোন মতেই এ ভয়াবহ পরিস্থিতি মেনে নিতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর কয়েকজন সাথীসহ বিক্ষোভকারীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং লড়তে লড়তে শাহাদত বরণ করেন। অনুরূপভাবে হযরত আবূ হুরায়রা (রা)–

يَا قَوْمِ مَا لِيْ اَدْعُوكُمْ اِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُوْنَنِيْ اِلَى النَّارِ ·

(হে আমার সম্প্রদায় ! আমার কি হয়ে গেল যে, আমি তোমাদেরকে নাজাতের দিকে আহবান করছি, অথচ তোমরা আমাকে আগুনের দিকে আহবান করছ)।

একথা বলতে বলতে বিক্ষোভকারীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। হযরত উসমান গনী (রা) যখন তা জানতে পারেন তখন তিনি জোর করে হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-কে ডেকে নিয়ে আসেন এবং তাঁকে লড়াই থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেন। ঐ সময়ে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা) সেখানে আসেন। তিনিও বিক্ষোভকারীদেরকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে এ ফিতনা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা তাঁর উপদেশ শোনা দূরের কথা, উল্টো তাঁকে আক্রমণ করার প্রস্তুতি নেয়। হযরত উসমান গনী (রা)-এর ঘরে তখন যে সমস্ত লোক ছিলেন তাদের কেউ কেউ ছাদে উঠে বিক্ষোভকারীদের গতিবিধি লক্ষ্য করছিলেন, কেউ কেউ দরজায় দাঁড়িয়ে যে সমস্ত বিক্ষোভকারী ভিতরে আসতে চাচ্ছিলো তাদেরকে বাধা প্রদান করছিলেন। হযরত উসমান গনী (রা) এবং তাঁর স্ত্রী নায়েলা বিনতে ফারাফাদাহ্ তখন ঘরে অবস্থান করছিলেন।

বিক্ষোভকারীরা প্রথমে প্রতিবেশীর ঘরে ঢুকে। তারপর সেখান থেকে দেওয়াল টপকিয়ে হযরত উসমান গনী (রা)-এর ঘরে ঢুকে তাঁর উপর হামলা চালায়। মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর সর্বাগ্রে হযরত উসমান গনী (রা)-এর কাছে পৌঁছে এবং তাঁর দাড়ি টেনে ধরে রাগত স্বরে বলে, হে না'সাল ! (নির্বোধ বৃদ্ধ), আল্লাহ্ তোমাকে লাঞ্ছিত করুন। হযরত উসমান (রা) তখন বলেন, আমি না'সাল নই বরং আমি হচ্ছি আমীরুল মু'মিনীন উসমান। মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর বলে, এ বার্ধক্যেও তোমার মধ্যে খিলাফতের সখ রয়েছে। হযরত উসমান গনী (রা) বলেন, তোমার বাবা যদি আজ জীবিত থাকতেন, তাহলে তুমি আমার এ বার্ধক্যকে সম্মানের চোখে দেখতে এবং এ ভাবে আমার দাঁড়ি টেনে ধরতে না। একথা শুনে মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর ভীষণভাবে লজ্জিত হন এবং হযরত উসমান (রা)-এর দাঁড়ি ছেড়ে দিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যান। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দুষ্কৃতিকারীদের একটি দল দেওয়াল টপকিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ে। ঐ দলে বিক্ষোভকারীদের নেতা আবদুর রহমান ইবন আদীস, কিনানাহ ইবন বশীর, আমর ইবন উমুক, আমীর ইব্ন হানাবী, সাওদান ইব্ন হুমরান গাফিকী ছিল। কিনানাহ্ ইব্ন বশীর এসেই হযরত উসমান গনী (রা)-এর উপর তরবারি চালায়। হযরত উসমান গনী (রা)-এর স্ত্রী নায়িলাহ্ আগে বেড়ে হাত দিয়ে তরবারির আঘাত রুখে রাখার চেষ্টা করেন। ফলে তার অঙ্গুলীগুলো কেটে গিয়ে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কিনানাহ্ আবার আঘাত করে এবং সেই আঘাতেই হযরত উসমান গনী (রা) শাহাদত বরণ করেন। তখন তিনি

কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করছিলেন। রক্তের ফোঁটা কুরআনের যে আয়াতের উপর পড়েছিল তা ছিল–

فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ـ

(তাদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (২ : ১৩৭)

আমর ইব্ন উমুক তাঁকে বর্শা দিয়ে নয়টি আঘাত করে। আমীর ইব্ন হানাবী আগে বেড়ে এমনভাবে ঘুষি মারে যে তার পাঁজরের হাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। সে অনবরত ঘুষি মারছিল এবং বলছিল, "তুমি কেন আমার বাবাকে এমনভাবে বন্দী করে রেখেছিলে যে, সে অবস্থায়ই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।" ঘরের মধ্যে যে এ প্রলয়কাণ্ড ঘটে গেছে, ছাদের উপরে বা দরজায় অবস্থানকারী লোকেরা তখন তা জানতে পারে নি। হযরত উসমান গনী (রা)-এর স্ত্রী নায়িলাহ্ যখন চীৎকার দিয়ে উঠে তখন লোকেরা ছাদ থেকে এবং দরজার দিক থেকে সেদিকে ছুটে আসে। কিন্তু বিক্ষোভকারীরা ইতিমধ্যে তাদের কাজ সেরে ফেলেছে। এবার তারা দ্রুত পলায়ন করে। অবশ্য তাদের কেউ কেউ হযরত উসমান গনী (রা)-এর ভৃত্যদের হাতে মারা যায়। এ মর্মান্তিক ঘটনার পর, দরজায় যারা পাহারারত ছিলেন, তারা সেখানে দাঁড়িয়ে থাকার প্রয়োজন বোধ করেননি। এ সুযোগে দুষ্কৃতিকারীরা দলে দলে হযরত উসমান (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করে তার যাবতীয় মাল-আসবাব, এমন কি দেহের কাপড়টি পর্যন্ত লুট করে নিয়ে যায়। এ অশান্ত ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে হযরত উসমান গনী (রা)-এর মৃত্যু সংবাদ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এ দুঃখজনক ঘটনাটি ঘটে হিজরী ৩৫ সনের ১৮ই যিলহজ্জ তারিখে। তিন দিন পর্যন্ত হযরত উসমান গনী (রা)-এর লাশ এভাবে পড়ে থাকে। শেষ পর্যন্ত হাকীম ইব্ন হিযাম এবং যুবায়র ইব্ন মুতঈম হযরত আলী (রা)-এর কাছে যান। হযরত আলী (রা) লাশ দাফনের অনুমতি দেন। রাতের বেলা 'ঈশা ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়ে জানাযা বের করা হয়। জানাযার সাথে যুবায়র, হাসান, আবূ জাহম ইব্ন হুযায়ফা (রা) ও মারওয়ান প্রমুখ ছিলেন। বিক্ষোভকারীরা জানাযার নামাযে এবং দাফনেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে চায়। কিন্তু হযরত আলী (রা)-এর কারণে তাদের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। যুবায়র ইব্ন মুতঈম (রা) জানাযার নামায পড়ান। গোসল ছাড়াই পরিধানে যে কাপড় ছিল তা দিয়েই লাশ দাফন করা হয়।

হযরত উসমান গনী (রা)-এর শাহাদতের সময় আবদুল্লাহ্ ইবন হাযরামী মক্কা শরীফের, কাসিম ইব্ন 'রাবীআ ছাকাফী তায়িফের, ইয়া'লা ইব্ন মীনাহ সান'আর, আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাবীআ জুনদের, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমিল বসরার, মুআবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ান সিরিয়ার, আবদুর রহমান ইব্ন খালিদ হিমসের, হাবীব ইব্ন মাসলামা কিন্নাসরীনের, আবুল আওয়ার সালামী জর্দানের এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন কায়েস ফাযারী বাহরায়নের গভর্নর ছিলেন। আর আলকামা ইবন হাকীম কুনদি আমীর মুআবিয়া (রা)-এর পক্ষ থেকে ফিলিস্তীনের কর্মকর্তা ছিলেন। আবূ মূসা আশআরী (রা) কূফার প্রশাসক এবং আবদুল্লাহ ইব্ন আমর প্রধান সামরিক কর্মকর্তা ছিলেন। জারির মুখনী এবং সাম্মাক আনসারী উভয়েই সাওয়াদের রাজস্ব কর্মকর্তা ছিলেন। জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ কারকীসীয়ার, আশআস ইব্ন কায়স আযারবায়জানের এবং সায়িব ইবন আকরা ইসফাহানের গভর্নর ছিলেন। মদীনা শরীফে বায়তুল মালের কর্মকর্তা ছিলেন উকবা ইব্ন আমর এবং বিচার বিভাগের কর্মকর্তা ছিলেন হযরত যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা)।

হযরত উসমান গনী (রা) ১২ বছর খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত থেকে ৮২ বছর বয়সে শাহাদাত লাভ করেন। তাঁকে 'জান্নাতুল বাকী'তে দাফন করা হয়। তাঁর মোট ১১ জন ছেলে ও ৬ জন মেয়ে ছিলো।

এক নযরে উসমানী খিলাফত

উসমানী খিলাফতের ঘটনাবলী অধ্যয়ন করলে অনায়াসে বোঝা যায় যে, আমরা নবী করীম (সা)-এর যুগ এবং সিদ্দীকী ও ফারূকী খিলাফতের যুগ অতিক্রম করে এক নতুন যুগে প্রবেশ করেছি। এ যুগের আবহাওয়া চালচলন ধরন-করণ সবকিছুই যেন আলাদা। ফারূকী খিলাফত পর্যন্ত মুসলমানগণের কাছে পার্থিব ধন-সম্পদের কোন গুরুত্ব ছিল না। খোদ খলীফার অবস্থা এরূপ ছিল যে, পরিবার-পরিজনের দৈনন্দিন খরচ মেটাবার জন্য তাঁর হাতে অন্যান্য লোকের চাইতেও অনেক কম অর্থ আসত। আর এ অভাব ও দারিদ্র্যকে খলীফা তাঁর জন্য কোন বিপদ বলে মনে করতেন না। অনুরূপভাবে পার্থিব ধন-সম্পদের প্রতি সাধারণ মুসলমানদেরও কোন লোভ ছিল না। ইসলাম প্রচার এবং মহান আল্লাহর পথে প্রাণ বিসর্জন যেন ছিল তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। উসমানী যুগে এ অনুভূতি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। হযরত উসমান গনী (রা) প্রথম থেকেই বিত্তশালী ছিলেন। খলীফা হওয়ার পরও তাঁর এবং তাঁর পূর্ববর্তী দুই খলীফার আর্থিক অবস্থার মধ্যে অনেক তফাত ছিল। তাছাড়া হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর খিলাফতের শেষ যুগ পর্যন্ত দেশ জয়ের প্রক্রিয়া জারি থাকে এবং অনেক সম্পদশালী ও উর্বর এলাকা মুসলমানগণের অধিকারে আসে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই সেখানকার বিত্ত-সম্পদও মুসলমানগণের হস্তগত হয়। কিন্তু তারা সেই বিত্ত-সম্পদ ব্যবহার এবং তা উপভোগ করার কৌশল পর্যন্ত জানত না। হযরত উসমান গনী (রা)-এর যুগেই মুসলমানগণ তাদের অর্জিত অর্থ-সম্পদ আয়েশ-আরামের কাজে নিয়োজিত করতে শুরু করে। মদীনা শরীফের সাধারণ ছাপড়াগুলোও দালান-কোঠায় রূপান্তরিত হয়। মানুষের অন্তরে ধন-সম্পদ অর্জন ও অর্থ সংগ্রহের স্পৃহা জাগে। সেই সাথে মুসলমানগণের মধ্যে যে বীরত্ব ও পৌরুষ ছিল এবং আরবদের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল তা ধীরে ধীরে লোপ পেতে শুরু করে। সামরিক প্রবৃত্তির স্থান দখল করে আমীরী স্বভাব তথা বড়লোকী ঠাটবাট। আর তাই ছিল মুসলমানদের উপর আপতিত সবচেয়ে বড় বিপদ, ছিল তাদের দুর্ভাগ্য।

সিদ্দীকে আকবর (রা) ও ফারূকে আযম (রা)-এর যুগ পর্যন্ত কুরায়শী ও হিজাযী অধিকাংশ মুসলমানই হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র যুগ প্রত্যক্ষ করেছিল। ফলে তারা ভেদাভেদহীন একই জাতিতে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। তারা সকলেই ইসলামকে মনে করত নিজেদের সম্পদ এবং নিজেদেরকে ইসলামের উত্তরাধিকারী জ্ঞান করত। ইসলামের ঔদার্য তাদের অন্তর থেকে গোত্রীয় সংকীর্ণতাকে একেবারে মুছে ফেলেছিল। তাদের কাছে ইসলামের বন্ধনের চাইতে বড় বন্ধন আর কিছুই ছিল না। ইসলামই ছিল তাদের কাছে সবচেয়ে প্রিয় বস্তু। দেশ জয়ের আওতা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের আওতাভুক্ত প্রদেশের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেল। ধীরে ধীরে ইসলামী সেনাবাহিনী ও ইসলামী মিল্লাতের মধ্যে এমন লোকের সংখ্যাও রাতারাতি বৃদ্ধি পেল যারা অতি সম্প্রতি ইসলাম গ্রহণ করেছে। এ সমস্ত লোকের অন্তরে তখন পর্যন্ত গোত্র ও সম্প্রদায়গত ভেদ-বৈষম্যের স্থলে ইসলামের প্রেম-ভালবাসা প্রাধান্য লাভ করতে পারেনি। ফারূকী খিলাফতের বিজয় অভিযানসমূহে যেসব মুজাহিদ অংশগ্রহণ করে তাদের

অধিকাংশই ছিল বনূ বকর, বনূ ওয়ায়েল, বনূ আবদুল কায়স, বনূ রাবীআ, বনূ আযদ, বনূ কিনদা, বনূ তামীম, বনূ কুযাআ' প্রভৃতি গোত্রের লোক। তারা ইরান ও সিরিয়ার প্রদেশসমূহ, মিসর, ফিলিস্তীন ইত্যাদি জয় করেছিল। এদের হাতেই ইরানী ও রোমান সম্রাটের রাজমুকুট ভূলুণ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু এ গোত্রগুলোর মধ্যে একটি গোত্রও এমন ছিল না যারা হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র সংস্পর্শ পেয়েছিল। ব্যক্তিগতভাবে যাদের ভাগ্যে তা জুটেছিল তাদের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য। কাজেই দেখা যায়, যে সমস্ত গোত্রের সৈনিক দ্বারা ইসলামের দুর্বার সেনাবাহিনী গড়ে উঠেছিল তারা ঈমান ও ইসলামের প্রতি আন্তরিক আকর্ষণের দিক দিয়ে কুরায়শী হিজাযী সাহাবিগণের স্তরে পৌঁছতে পারিনি। তাছাড়া ফারূকে আযম (রা)-এর দৃষ্টি এতই প্রশস্ত ও গভীর ছিল যে, প্রত্যেকটি বিষয়ের খুঁটিনাটি দিকও তিনি জানতেন। তিনি এমন একটি 'নিযাম' (ব্যবস্থা) চালু করেছিলেন এবং মুহাজির ও আনসারের নেতৃত্বকে এমনভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন যে, তাঁর খিলাফত আমলে অন্যান্য লোক কখনো কল্পনাও করতে পারে নি যে, তারা মুহাজির কিংবা আনসারদের সমকক্ষ। হযরত ফারূকে আযম (রা) আনসার ও মুহাজিরগণকে এমন এক মর্যাদায় পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন যে, মনে হত যেন তাঁরা একটি রাজপরিবার এবং একটি মহাপরাক্রমশালী বিজেতা জাতির সদস্য। হযরত ফারূকে আযম (রা) আরবের দুর্দান্ত সেনাবাহিনীর বীরত্ব, দুঃসাহিসকতা ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের প্রতি এতই যত্নবান ও সচেষ্ট ছিলেন যে, তিনি তাঁর খিলাফত আমলে সিরিয়ার জাঁকজমকপূর্ণ শহরসমূহ, আয়েশ-আরামে ভরা জনবসতিসমূহের, এমনকি সেগুলোর ধারে কাছেও ইসলামী সেনাবাহিনীর অবস্থানের কোন সুযোগ দেন নি। অপর দিকে তিনি এমন কিছু কৌশল অবলম্বন করেছিলেন যার ফলে সাধারণ লোকেরা মর্যাদাবান সাহাবিগণ থেকে কিছুটা তফাতে থাকতে বাধ্য হত। তাতে সাহাবিগণের প্রভাব ও মর্যাদা যেমন সংরক্ষিত হত তেমনি আরবের নয় বরং সমগ্র বিশ্বের নির্বাচন ও প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তিরা তাদের সংসর্গ লাভের সুযোগ পেত।

হযরত উসমান গনী (রা)-এর যুগে এ সমস্ত বৈশিষ্ট্য একের পর এক মুছে যেতে থাকে। উপরে উল্লিখিত গোত্রসমূহের লোকেরা নিজেদেরকে মুহাজির, আনসার এবং কুরায়শী ও হিজাযীদের শুধু সমকক্ষ নয় বরং তাদের চাইতে শ্রেষ্ঠতর বলেও বিবেচনা করতে থাকে। সাহাবায়ে কিরাম, যাঁরা শাহী বংশের মর্যাদা রাখতেন, দূর-দূরান্তের প্রদেশসমূহে ছড়িয়ে পড়েন। মদীনা শরীফের ঐক্য ও ঐতিহ্য ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়। রাজধানী মদীনা শরীফ রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস হয়ে আর থাকতে পারে নি। যার ফলে সেই জাতি ও গোত্রগত ভেদ বৈষম্য পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। প্রত্যেক গোত্র ও গোষ্ঠীর মধ্যে সেই বর্বর যুগের প্রথাপদ্ধতি ও সামাজিক রীতিনীতি পুনরায় পরিলক্ষিত হতে থাকে। ফলে ইসলামী সম্বন্ধ ও ধর্মীয় ভ্রাতৃত্বের প্রভাব স্বাভাবিকভাবে লোপ পায়। মুহাজির ও আনসারগণ নও মুসলিম জনসমুদ্রে মিশে গিয়ে একাকার হয়ে যায়। ফলে তাদের সেই প্রভাব ও মর্যাদা আর অক্ষুণ্ন থাকে নি।

হযরত উসমান গনী (রা) অত্যন্ত নম্র স্বভাবের লোক ছিলেন ; কিন্তু রাষ্ট্রের আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হলে সুষ্ঠু নম্র মেযাজে কাজ হয় না, প্রয়োজনবোধে শক্তি প্রয়োগ করা লাগে এবং কঠিন হতে হয়। হযরত উসমান গনী (রা)-এর যুগে একদিকে মুসলমানগণ অর্থ-বিত্ত ও আরাম-আয়েশের প্রতি আসক্ত হয়ে উঠেছিল এবং অন্যদিকে দেখা দিয়েছিল খলীফার প্রতি ভয়ভীতির পরিবর্তে কিছুটা উপেক্ষা ও তাচ্ছিল্যের ভাব। এ সুযোগে অর্থ ও

খ্যাতিলোভী স্বার্থশিকারীরা জনসাধারণের মধ্যে নানা ধরনের প্রোপাগাণ্ডা চালানোর সুযোগ পায়। কুরায়শী ও হিজাযীদের মধ্যে যারা ক্ষমতালোভী ছিল তারা অত্যন্ত সহজেই ঐ সমস্ত নও-মুসলিম গোত্র এবং তাদের বিজয়ী সেনাবাহিনীর সাহায্য ও সমর্থন লাভে সক্ষম হয়।

ইসলাম-পূর্ব যুগে কুরায়শ বংশকে দু'ভাগে বিভক্ত বলে মনে করা হত। আর একটি ছিল বনূ উমাইয়া এবং অপরটি ছিল বনূ হাশিম। বনূ হাশিম ও বনূ উমাইয়া ছাড়াও কুরায়শ বংশের আরো অনেকগুলো গোত্র ছিল। কিন্তু যেহেতু বনূ উমাইয়া ছিল একে অপরের শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী, তাই কুরায়শের বাকি গোত্রগুলো এদের কোন না কোন একটির পক্ষাবলম্বী ছিল। বনূ উমাইয়ার শক্তি ও প্রভাব ইসলামের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বে বনূ হাশিমের চাইতে কিছুটা বেশী ছিল। তবে এর অনেক পূর্বে তারা ছিল বনু হাশিমের চাইতে দুর্বল। যখন হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনূ হাশিম গোত্রে আবির্ভূত হন তখন বনূ উমাইয়া তাঁর এবং ইসলামের বিরোধিতা করে সবচাইতে বেশি। উহুদ ও আহযাবের ভয়ানক যুদ্ধে ইসলাম বিরোধী বাহিনীসমূহের প্রধান সেনাপতি ছিলেন আবূ সুফিয়ান এবং তিনি ছিলেন বনূ উমাইয়া গোত্রেরই লোক। শেষ পর্যন্ত খোদ আবূ সুফিয়ান এবং বনূ উমাইয়ার সব লোকই ইসলাম গ্রহণ করে। ফলে উমাইয়া ও হাশিমীদের মধ্যকার বিবাদ-বিসংবাদও লোপ পায়। হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রা) ও হযরত উমর ফারূক (রা)-এর খিলাফতকালে ঐ একই অবস্থা বিদ্যমান ছিল। তখন মনে হত, সবগুলো গোত্রই এক ও অভিন্ন এবং তাদের মধ্যে আদৌ কোন শত্রুতা বা ভেদাভেদ নেই। কিন্তু হযরত উসমান গনী (রা)-এর খিলাফতকালে বনূ উমাইয়ার অন্তরে সেই জাহিলী যুগের বিদ্বেষমূলক প্রতিদ্বন্দ্বী মনোভাব আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। আর যেহেতু হযরত উসমান গনী (রা) ছিলেন বনূ উমাইয়া গোত্রীয় এবং সেই সাথে আপন আত্মীয়-স্বজন তথা গোত্রীয় লোকদের উপকার সাধনের প্রতি অধিক মনোযোগী, তাই স্বাভাবিকভাবেই বনূ উমাইয়ারা তার থেকে অধিক পরিমাণে উপকৃত হতে থাকে। অপর দিকে মুসলমানদের সামরিক আধিপত্য বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের অন্তরে স্বাভাবিকভাবেই বিত্ত-সম্পদের লিপ্সাও জেগে উঠে। জনসাধারণের উপর থেকে খলীফার দাপট বা ভয়ভীতিও হ্রাস পায়। নও-মুসলিম যোদ্ধাদের আধিক্যের কারণে মুহাজির, আনসার এবং কুরায়শদের প্রভাব-প্রতিপত্তিও অনেকটা লোপ পায়। মদীনা শরীফেও আর সেই আনসার-মুহাজিরের ঐক্যবদ্ধ জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব ছিল না। তাছাড়া বনূ উমাইয়া তাদের ব্যক্তিগত ও গোত্রীয় স্বার্থ উদ্ধারের প্রতি ছিল সর্বদা সজাগ, সচেতন। হযরত উসমান গনী (রা)-এর নম্র মেজাজের সুযোগ গ্রহণ করে উমাইয়া গোত্রের মুখ্য সচিব (মীর মুনশী) মারওয়ান ইবন হাকামকে তারা বনূ উমাইয়ার এমনি এক কট্টর সহায়ক ও অন্ধ পক্ষাবলম্বীতে পরিণত করে যে, সে সর্বত্র, সর্বক্ষণ ও সর্বতোভাবে বনূ উমাইয়ার লোকদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের ব্যাপারে যেন পাগলপারা হয়ে উঠে। এক্ষেত্রে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর স্বার্থের প্রতি সে মোটেই দৃকপাত করত না।

যখন রাজ্য ও প্রদেশসমূহের গভর্নর পদে প্রধানত বনূ উমাইয়ারা অধিষ্ঠিত হয় এবং ইসলামী রাষ্ট্রের প্রায় প্রত্যেকটি অঞ্চলের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদও তাদের দখলে চলে যায়, তখন তাদের মধ্যে সেই পুরাতন মনোবৃত্তি আবার জেগে উঠে। অর্থাৎ তারা বনূ হাশিমের উপর নিজেদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার কাজে পুনরায় আত্মনিয়োগ করে। আর এর অনিবার্য ফলশ্রুতিতে বনূ হাশিম এবং অন্যান্য গোত্র ও বনূ উমাইয়ার এ মনোবৃত্তি সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠে। একথা

বলা যে, খোদ হযরত উসমান গনী (রা) বনূ উমাইয়াদের এ আন্দোলন বা প্রচেষ্টার হোতা ছিলেন একটা গুরুতর অপবাদ ছাড়া কিছু নয়। কেননা, তার মধ্যে কোন ষড়যন্ত্র, কুট-কৌশল কিংবা কপটতার নাম-নিশানাও ছিল না। তাঁর নম্র স্বভাব ও ক্ষমাপরায়ণতা এবং আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সৌজন্যমূলক আচরণই বনূ উমাইয়াকে সেই সুযোগ প্রদান করেছিল যে, তারা তাদের গোত্র ও বংশগত প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা-তদবীরে লিপ্ত হয় এবং এভাবে তাদের মধ্যে জাহিলী যুগের সেই বিস্মৃত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিদ্বেষমূলক মনোবৃত্তি পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। আর এ সমস্ত মনোবৃত্তি চরিতার্থ করার কাজে ইন্দন জোগায় বিত্ত-সম্পদের প্রাচুর্য, আয়েশ-সামগ্রীর সহজলভ্যতা এবং সুখ-সম্ভোগের প্রতি জনসাধারণের আসক্তি। এ সমস্ত আচার-আচরণ ছিল সিদ্দিক ও ফারুকী খিলাফতকালে মানুষের কল্পনারও অতীত। অবশ্য একটি কথা না বলে উপায় নেই যে, যদিও স্বগোত্রের লোক এবং আত্মীয়-স্বজনের উপকার করা একটি অতি প্রশংসনীয় কাজ, কিন্তু একজন খলীফা যখন এ কাজটি করবেন, তখন তাঁকে খুবই সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। আর তা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, এক্ষেত্রে যথার্থ সাবধানতা অবলম্বনের ব্যাপারে হযরত উসমান গনী (রা)-এর কিঞ্চিৎ শৈথিল্য লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে আপন চাচাত ভাই মারওয়ান ইবন হাকামকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত একাধারে নিজের কাতিব তথা মীর মুনশী, মন্ত্রী ও উপদেষ্টা পদে বহাল রাখা নিঃসন্দেহে একটি সতর্কতা বিরোধী কাজ ছিল। আর তা এ কারণে নয় যে, সে তার আত্মীয় ছিল, বরং এ কারণে যে তাক্ওয়া, পরহিযগারী ও রূহানিয়াতের দিক দিয়ে সে এতই নিম্নমানের ছিল যে, স্বভাবচরিত্র ও আচার-আচরণের দিক দিয়ে ঐ বিরাট পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার কোন যোগ্যতাই তার মধ্যে ছিল না।

হযরত উসমান গনী (রা) খলীফা পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে ইরানের বিভিন্ন প্রদেশে বিদ্রোহ দেখা দেয়। কিন্তু ইসলামীবাহিনী প্রতিটি ক্ষেত্রে বিদ্রোহীদেরকে পরাজিত ও পর্যুদস্ত করে সমগ্র দেশব্যাপী পুনরায় শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে। এ সমস্ত বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে একটি উপকার এও হয়েছিল যে, প্রত্যেকটি বিদ্রোহ কবলিত প্রদেশের সীমান্ত এলাকাসমূহের প্রতি নজর দেওয়া হয়। ফলে অনেক নতুন নতুন এলাকার উপরও মুসলমানগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন, উত্তর ইরানের বিদ্রোহসমূহ দমন করতে গিয়ে সীস্তান ও কিরমানের প্রদেশসমূহও মুসলমানগণ দখল করে নেয়। উত্তর ও দক্ষিণ ইরানের বিদ্রোহ দমন এবং তুর্কী ও চীনাদের আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে মুসলমানগণ হিরাত, কাবুল, বলখ ও আমুদরিয়ার তীরস্থ এলাকাসমূহও দখল করে নেয়। রোমানরা মিসর ও ইস্কান্দারিয়াহ আক্রমণ করলে মুসলমানগণ তাদেরকে পরাস্ত করে এবং তাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে গিয়ে সাইপ্রাস ও রোডস দ্বীপের উপরও নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। আফ্রিকার রোমান গভর্নর সৈন্য সমাবেশ ঘটিয়ে মিসরের ইসলামী বাহিনীকে ভীতি প্রদর্শন করতে চাইলেন। যার ফলশ্রুতিতে বারকা, ত্রিপলী পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল মুসলমানগণ দখল করে নেন। অনুরূপভাবে এশিয়া মাইনরের রোমানবাহিনী কিছুটা হাত-পা ছুড়ে কসরত দেখাতে চাইলে মুসলমানগণ তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং আর্মেনিয়া ও তিফলিস পর্যন্ত সমগ্র এলাকার উপর নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে।

মোটকথা, হযরত উসমান গনী (রা)-এর খিলাফত কালেও মুসলমানগণ যথেষ্ট পরিমাণে এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিজয় লাভ করে। ফলে ইসলামী রাষ্ট্রের অনেক বিস্তৃতি ঘটে। খলীফা

হযরত উসমান গনী (রা)-এর নির্দেশে ইরান, সিরিয়া প্রভৃতি রাজ্য বা প্রদেশের গভর্নরগণ রাস্তাঘাট নির্মাণ করেন, মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং শিল্প বাণিজ্য ও কৃষি উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্র বাহ্যিক উন্নতির সাথে সাথে শিল্পগত উন্নতিরও প্রচেষ্টা চালায়। অবশ্য এ সমস্ত উন্নয়নকর্ম উসমানী খিলাফতের প্রথম দিকে অর্থাৎ ছয় বছরের মধ্যে সম্পাদিত হয়। শেষ দিকে অর্থাৎ শেষ ছয় বছরে অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হয় এবং ক্রমে ক্রমে তার বিস্তার ঘটে। তার পূর্বে মুসলমানদের লক্ষ্য শুধু ইসলামের প্রচার এবং অংশীবাদিতার মূলোৎপাটন ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কিন্তু, এখন তারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়। ফলে পরস্পরের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ দেখা দেয় এবং দিনের পর দিন ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ছিন্ন হতে থাকে। বনূ উমাইয়া মদীনা শরীফে তাদের জনসংখ্যা ও প্রভাব বৃদ্ধি করে। অন্যান্য রাজ্য বা প্রদেশেও দিন দিন তাদের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে।

আর তা ঠিক নয় যে, বনূ উমাইয়ার এ কার্যধারা লক্ষ্য করে অন্যান্য মুসলিম গোত্রের লোকেরা আপনা-আপনি তাদের পক্ষাবলম্বন করেছিল কিংবা কোনরূপ বিচার-বিবেচনা ছাড়াই তাদের বিরোধিতা করে গোত্রীয় লড়াইয়ের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল– বরং বনূ উমাইয়ার এ ভ্রান্ত কর্মধারা লক্ষ্য করার পর সাহাবায়ে কিরাম অর্থাৎ সর্বজনমান্য মুহাজির ও আনসারগণ যদি সহজভাবে ও দূরদর্শিতার সাথে জনসাধারণকে বোঝাতেন এবং ফিতনা ও বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ার আগেই তা দমন করার চেষ্টা করতেন, তাহলে তাঁদের প্রচেষ্টা কখনো বিফলে যেত না। কেননা, তখন পর্যন্ত মুহাম্মদিয়ার উপর তাঁদের এতটুকু প্রভাব ছিল যে, তাঁরা তাঁদের কথা না মেনে পারত না। বনূ উমাইয়া তাদের ক্ষমতা ও প্রভাব বৃদ্ধির যে চেষ্টা শুরু করে তা বেশ কিছুদিন পর সাহাবায়ে কিরাম উপলব্ধি করতে পারত। কিন্তু যখন এ জিনিসটি তাদের উপলব্ধিতে আসে, তখন থেকে চেষ্টা শুরু করে দিলেও তাঁরা এ বিশৃঙ্খলা দমনে সফলকাম হতে পারতেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ঠিক ঐ সময়ে উম্মতে মুসলিমার উপর আর একটা ভয়ানক বিপদ নেমে আসে আর তা হলো, ঠিক ঐ সময়ে আবদুল্লাহ ইবন সাবা নামীয় অতি চতুর, অতি সূক্ষ্মদর্শী ও তড়িৎকর্মা জনৈক ইয়াহূদী বাহ্যিকভাবে ইসলাম দরদী সেজে একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার ভিত্তিতে ইসলাম ও মুসলিম জাতির ধ্বংস সাধনে নিজেকে সর্বতোভাবে নিয়োগ করে।

হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগেও মুনাফিকদের হাতে মুসলমানগণ বার বার প্রতারিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। উসমানী যুগে এসে আর একজন ইয়াহূদী মুনাফিকের হাতে মুসলমানগণ অশেষ দুর্ভোগের সম্মুখীন হয়। মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবন উবায়্য ও মুনাফিক আবদুল্লাহ্ ইবন সাবার মধ্যে কে মুসলমানদের জন্য অধিক বিপজ্জনক ছিল তা নির্ণয় করা সত্যি কঠিন। তবে একথা অবশ্যই বলা যেতে পারে যে, আবদুল্লাহ্ ইবন উবায়্য তার বাতিল পরিকল্পনাসমূহ কার্যকরী করতে গিয়ে খুব কমই সাফল্য লাভ করেছে। কিন্তু আবদুল্লাহ্ ইবন সাবা যদিও ব্যক্তিগত পর্যায়ে কোন সাফল্য অর্জন করতে পারে নি, কিন্তু মুসলিম মিল্লাতের ঐক্য ও সংহতিকে নিঃসন্দেহে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। ইসলাম ও মুসলিম জাতির ধ্বংস সাধনে সে যে পরিকল্পনা গ্রহণ করে তার সবচাইতে উল্লেখযোগ্য দিক হলো, সে বনূ উমাইয়ার বিরোধিতায় এক সাথে ও এককভাবে সমগ্র আরব গোত্রগুলোকে ক্ষেপিয়ে তুলে। এজন্য সে হযরত আলী (রা)-এর মুহাব্বত ও ভালবাসাকে মাধ্যম বা বাহানা হিসাবে গ্রহণ করে। আর যেসব গোত্রে সে বনূ উমাইয়ার প্রতি বিদ্বেষ ও হযরত উসমান গনী (রা)-এর প্রতি শত্রুতা সৃষ্টি

করতে চাচ্ছিল তারা ছিল ঐ সমস্ত লোক যারা অমুসলিমদের বিরুদ্ধে বিজয়ের পর বিজয় লাভ করে দাম্ভিক হয়ে উঠেছিল এবং নিজেদের এ কৃতিত্বের কারণে কুরায়শ এবং হিজাযবাসীদেরকে থোড়াই কেয়ার করত। তারা সবেমাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তাই পুরাতন মুসলিমগণের মত তারা ইসলামের মর্মকথা তখনও গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারেনি। আবদুল্লাহ্ ইবন সাবা অতি সহজেই অন্যান্য গোত্রের লোকদেরকে হযরত উসাম গনী (রা) ও বনূ উমাইয়ার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপনে উদ্বুদ্ধ করে। তারপর সে বসরা, কূফা, দামিশকে প্রভৃতি সামরিক কেন্দ্র পরিভ্রমণ করে এবং দামিশক ছাড়া অন্য সব জায়গায় সে তার অনুকূল আবহাওয়া ও পরিবেশ সৃষ্টিতে সফলকাম হয়। দামিশকেও যে সে একেবারে সাফল্য লাভ করেনি তা নয়। সেখানেও সে হযরত আবূ যর গিফারী (রা) কেন্দ্রিক ঘটনা থেকে যথেষ্ট ফায়দা উঠায়। তারপর সে মিসরে যায় এবং ইতিমধ্যে ইসলামী রাষ্ট্রের কেন্দ্রসমূহ যে আন্দোলনের সূচনা করে এসেছিল, সেখানে বসে বসে তা সুবিন্যস্ত করার প্রয়াস পায়। সে মিসরকে তার কেন্দ্রভূমিতে পরিণত করে এজন্য যে, সেখানকার গভর্নর আবদুল্লাহ্ ইবন সা'দ (রা) স্বেচ্ছাচারিতার দিক দিয়ে অন্যান্য গভর্নরদের চাইতে যতটুকু এগিয়ে ছিলেন, দূরদর্শিতার দিক দিয়ে ছিলেন ততটুকু পেছনে। তাছাড়া তিনি রোমানদের হামলা প্রতিরোধ এবং আফ্রিকা, ত্রিপলী প্রভৃতি অঞ্চলের প্রতিরক্ষায় এতই ব্যস্ত ছিলেন যে, আভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র ও বিশৃঙ্খলা দমনের প্রতি খুব একটা মনোযোগ দিতে পারছিলেন না। তাছাড়া আবদুল্লাহ্ ইবন সাবা মিসরে এমন দু'তিনজন সাহাবীকেও পেয়ে যায় যাঁরা অতি সহজেই তার প্রতারণা জালে আবদ্ধ হয়ে তার লক্ষ্য অর্জনে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে থাকেন।

আবদুল্লাহ্ ইবন সাবা বসরায় হযরত তালহা (রা)-এর এবং কূফাতে হযরত যুবায়র (রা)-এর অত্যধিক জনপ্রিয়তা দেখে এর বিরুদ্ধে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। কেননা এ কথা সে ভালভাবেই জানত যে, ইসলামী বিশ্বে সামগ্রিকভাবে হযরত আলী (রা)-ই সর্বাধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেন। তাই সে কূফা, বসরা ও দামিশক ছেড়ে মিসরে চলে আসে। এখানে স্থির হয়ে বসে সে কূফা ও বসরাবাসীদের অন্তরে সেই বিদ্বেষভাবে ফলে ফুলে সুশোভিত করে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করে যা সে বনূ উমাইয়া ও হযরত উসমান গনী (রা)-এর বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে সৃষ্টি করে এসেছিল। তবে মিসরে ঐ বিদ্বেষভাবে সৃষ্টি ছাড়াও সে হযরত আলী (রা)-কে ভালবাসা, তাঁর অত্যাচারিত হওয়া, খিলাফত থেকে তাঁকে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত রাখা, তাঁর 'ওয়াছী' (রাসূলের প্রতিনিধি) হওয়া প্রভৃতি ধ্যান-ধারণাও মানুষের মধ্যে প্রচার করে। এ প্রচারের কাজেও সে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করে এবং হযরত আলী (রা)-এর প্রতি সহানুভূতিশীল ও তাঁর সমর্থনকারীদের একটি বিরাট দল গঠন করতে সক্ষম হয়। আবদুল্লাহ্ ইবন সাবার এ কর্মতৎপরতা শীঘ্রই ইসলামী বিশ্বে এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করে এবং সেই সাথে গণ্যমান্য সাহাবায়ে কিরামের হাত থেকে সেই সুযোগ চলে যেতে থাকে যা অবলম্বনে তাঁরা বনূ উমাইয়াকে সঠিক পথে রাখার প্রচেষ্টায় সফলকাম হতে পারতেন। আবদুল্লাহ্ ইবন সাবার দুষ্কর্মের জঘন্যতম দিকটি ছিল সে তার বিশ্বস্ত এজেন্টদের সাহায্যে মদীনা তাইয়িবা থেকে হযরত আলী (রা)-এর নামাংকিত, কল্পিত ও বানোয়াট চিঠিপত্র কূফা, বসরা ও মিসরবাসীদের কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করে। সে নিজেকে হযরত আলী (রা)-এর প্রতিনিধি হিসাবে পরিচিত করে তুলতেও সক্ষম হয়, যার ফলে সে মানুষকে ব্যাপকভাবে

প্রতারণা করার সুবর্ণ সুযোগ লাভ করে। তারই প্রতারণার ফলে একদিকে হযরত উসমান গনী (রা)-কে নৃশংসভাবে শহীদ করা হয় এবং অন্যদিকে সেই অতীত থেকে আজ পর্যন্ত কিছু কিছু মানুষ এ ভ্রান্ত ধারণায় লিপ্ত হয়ে আছে যে, হযরত আলী (রা)-এর ইঙ্গিতে ও ষড়যন্ত্রেই (আল্লাহ্ পানাহ) হযরত উসাম গনী (রা)-কে শহীদ করা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এর চাইতে ভ্রান্ত, জঘন্য ও অমূলক কোন কথা আর হতে পারে না। আবদুল্লাহ্ ইবন সাবা না হযরত উসমান গনী (রা)-এর বন্ধু ছিল, আর না ছিল হযরত আলী (রা)-এর প্রতি সহানুভূতিশীল। সে ছিল উভয়েরই শত্রু এবং ইসলামের ধ্বংস সাধনে সদা-তৎপর। এ কারণেই সে হযরত উসমান গনী (রা)-কে হত্যা করিয়েছে এবং অন্যদিকে হযরত আলী (রা)-কে ঐ হত্যার ষড়যন্ত্রকারী প্রমাণ করে তাঁর সম্মান ও মর্যাদার উপর মারাত্মক আঘাত হেনেছে।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ও হযরত উমর ফারূক (রা)-এর পর যদি হযরত আলী (রা) খলীফা নির্বাচিত হতেন, তাহলে তা হত সময়ের বিবেচনায় ও ক্রমধারা অনুসারে সর্বাধিক সঙ্গত ও সমীচীন। যদি হযরত আলী (রা) হযরত উমর ফারূক (রা)-এর পর খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হতেন তাহলে তাঁর ও হযরত উমর ফারূক (রা)-এর খিলাফতের মধ্যে এক অপূর্ব সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হত। হযরত উমর ফারূক (রা)-এর ন্যায় হযরত আলী (রা)-এর মধ্যে ছিল সেই সারল্য, সেই তাকওয়া ও ধর্মপরায়ণতা, বিত্তসম্পদের প্রতি সেই অনাসক্তি, জাতীয় ও গোত্রীয় পক্ষপাতিত্বের প্রতি সেই অনীহাভাব ইত্যাদি। তাই সম্ভবত দীর্ঘদিন পর্যন্ত মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে স্বজনপ্রিয়তা ও গোত্রীয় পক্ষপাতিত্বের উদ্ভব হত না। হযরত উসমান গনী (রা)-এর পর হযরত আলী (রা)-এর খলীফা নির্বাচিত হওয়াটা যে তাঁর খিলাফত আমলের যাবতীয় ব্যর্থতার মূল কারণ তা আমাদের আগামী আলোচনা থেকে প্রতিপন্ন হবে।

হযরত উসমান গনী (রা)-এর চরিত্র ও গুণাবলী

হযরত উসমান গনী (রা) প্রকৃতিগতভাবেই ছিলেন শান্তিকামী ও ধৈর্যশীল। জাহিলিয়া যুগেও তিনি মদ্যপানকে অবৈধ মনে করতেন। সে যুগেও তিনি কখনো ব্যভিচারের ধারে কাছে ঘেষেন নি বা চৌর্য বৃত্তিকে প্রশ্রয় দেন নি। তখনও তাঁর বদান্যতা দ্বারা সাধারণ মানুষ উপকৃত হত। তিনি প্রত্যেক বছরই হজ্জ করতেন এবং মদীনায় তাঁবু স্থাপন করতেন। তিনি যতক্ষণ হাজীগণকে পানাহার না করাতেন ততক্ষণ নিজের তাঁবুতে ফিরে আসতেন না। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত তহবিল থেকেই জনসাধারণকে এভাবে দাওয়াত করে খাওয়াতেন। হযরত উসমান গনী (রা) 'জায়শুল উসরা' (কঠিন দিনগুলোতে গঠিত বাহিনী– যেমন, তাঁবুক যুদ্ধের জন্য গঠিত বাহিনী)-এর প্রায় যাবতীয় সামগ্রীর যোগান দিতেন। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (রা) এবং তাঁর পরিবারকে বারবার অনশনের সম্মুখীন হতে হত। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে হযরত উসমান গনী (রা)-ই তাঁদের জন্য প্রয়োজনীয় আহার্য সামগ্রী পাঠিয়ে দিতেন। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর জন্য বার বার এ বলে দু'আ করতেন :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ قَدْ رَضِيْتُ عَنْ عُثْمَانَ فَارْضِ عَنْهُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ قَدْ رَضِيْتُ عَنْ عُثْمَانَ فَارْضِ عَنْهُ ·

(হে আল্লাহ! আমি উসমানের উপর রাযী আছি; আপনিও তাঁর উপর রাযী হয়ে যান! হে আল্লাহ্! আমি উসমানের উপর সন্তুষ্ট আছি, আপনিও তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান।)

একবার সন্ধ্যা থেকে ভোর পর্যন্ত শুধু এ দু'আই তিনি করেছিলেন। সিদ্দীকী খিলাফতকালে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। আহার্য সামগ্রীর অভাবে মানুষ অত্যন্ত কষ্টের সম্মুখীন হয়। একবার

এ সংবাদ প্রচারিত হল যে, হযরত উসমান গনী (রা)-এর খাদ্য বোঝাই এক হাজার উট মদীনা শরীফে এসে পৌছেছে। তখন মদীনা শরীফের ব্যবসায়িগণ হযরত উসমান গনী (রা)-এর কাছে গিয়ে বললেন, আপনার এ খাদ্য সামগ্রী আমাদের কাছে দেড়গুণ দামে বিক্রি করে দিন। কিন্তু হযরত উসমান গনী (রা) পাল্টা তাঁদেরকে বললেন, আপনারা সবাই সাক্ষী থাকুন, আমি আমার আমদানীকৃত এসব সামগ্রী মদীনা শরীফের দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদেরকে দান করলাম।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) বলেন, আমি ঐ রাত্রে স্বপ্নে দেখলাম, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) নূরানী পোশাক পরিহিত অবস্থায় একটি ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছেন। আমি দৌড়ে গিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়ালাম এবং নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল ! আপনাকে দেখার জন্য আমি খুবই উদগ্রীব ছিলাম। তিনি উত্তর দিলেন, এখন আমার খুবই তাড়া আছে। উসমান আজ এক হাজার উটভর্তি খাদ্য সামগ্রী দান করেছেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা তার সে দান কবুল করে তাঁর সাথে জান্নাতের এক কনের বিবাহ দিয়েছেন এবং আমি এখন ঐ বিবাহ উৎসবে যোগদান করতে যাচ্ছি। হযরত উসমান গনী (রা) যখন থেকে ইসলাম গ্রহণ করেন তখন থেকে তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রতি জুমা'আর দিনে একজন দাসকে মুক্তি দান করেন। তিনি এক জুমুআতে কোন দাসকে মুক্তি দান করতে না পারলে পরবর্তী জুমুআ'তে দুজন দাসকে মুক্তি দান করতেন। অবরুদ্ধ থাকা অবস্থায় যখন বিক্ষোভকারীরা তাঁর পানি বন্ধ করে দিয়েছিল, তখনও তিনি অনবরত দাসদের মুক্তিদান করতে থাকেন। তিনি অত্যন্ত সাদাসিধে খাবার খেতেন এবং সাদাসিধে পোশাকও পরিধান করতেন। কিন্তু মেহমানদের সামনে অত্যন্ত সুস্বাদু ও দামী খাবার পরিবেশন করতেন। খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরও তিনি কখনো নিজেকে সাধারণ মানুষের চাইতে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করতেন না। তিনি সবার সাথে বসতেন, সবাইকে সম্মান করতেন, কিন্তু কারো কাছ থেকে প্রাপ্তির প্রত্যাশা করতেন না। একবার তিনি তাঁর এক গোলামকে বলেন, "আমি তোমার উপর বাড়াবাড়ি করেছি, তুমি আমার উপর থেকে তার প্রতিশোধ গ্রহণ কর। তাঁরই নির্দেশে গোলাম তাঁর কান ধরে। তখন তিনি বলতে থাকেন, ভাই, আরো জোরে ধর। কেননা, দুনিয়ার প্রতিশোধ আখিরাতের প্রতিশোধের চাইতে অনেক সহজ।" কুরআন করীমের প্রচার এবং একই পাঠ পদ্ধতির উপর সবাইকে ঐকমত্যে পৌছানো তাঁরই বিরাট কীর্তি। তিনি মসজিদে নববীর আয়তন বৃদ্ধি করেছিলেন, যেমন ওপরে বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত হয়েছে। তিনি দৈনিক ভাতাসমূহ এবং ওয়াযীফা (উপহার-উপঢৌকন) বণ্টনের জন্য দিন ও সময় নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। প্রত্যেকটি কাজ যথাসময়ে ও যথাযথভাবে সম্পাদন করা ছিল তাঁর চিরন্তন অভ্যাস। হযরত উমর ফারূক (রা)-এর যুগে জুম'আর দিন ঠিক সেই সময়ে আযান দেওয়া হত যখন ইমাম খুতবা দেওয়ার জন্য মিম্বরে আরোহণ করতেন। হযরত উসমান গনী (রা)-এর যুগে যখন লোকসংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পায় তখন তিনি নির্দেশ দেন যে, খুতবার আযানের পূর্বেও যেন একবার আযান দেওয়া হয়। তখন থেকে আজ পর্যন্ত জুম'আর সময় দু'বার আযান দেওয়ার রীতি প্রচলিত হয়ে আসছে।

কয়েকটি জরুরী কথা

যখন বিক্ষোভকারীরা মদীনা শরীফে প্রবেশ করে অত্যন্ত গর্হিত ও অশিষ্ট আচরণ করতে থাকে তখন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ অভিমুখে রওয়ানা হন। হজ্জ সমাপনান্তে মদীনা শরীফে ফিরে আসার সময় পথিমধ্যে সারফ নামক স্থানে

জনৈক উবায়দ ইবন আবূ সালামার কাছ থেকে তিনি এ সংবাদ পান যে, হযরত উসমান গনী (রা)-কে বিক্ষোভকারীরা শহীদ করে ফেলেছে। তখন তিনি মদীনা শরীফে না এসে পুনরায় মক্কা শরীফে ফিরে যান।

যখন বিক্ষোভকারীরা মদীনা শরীফে ভিড় জমায়, তখন হযরত আমর ইব্ন 'আস (রা)-ও মদীনা শরীফে ছিলেন। কিন্তু যখন তিনি দেখলেন যে, বিক্ষোভকারীদের অশিষ্ট আচরণ ও অত্যধিক বাড়াবাড়ি সমগ্র মদীনা শরীফ অবদমিত করে ফেলেছে এবং মদীনা শরীফের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ বিক্ষোভকারীদের মুকাবিলায় আবদুল্লাহ্ এবং মুহাম্মদকে সঙ্গে নিয়ে মদীনা শরীফ থেকে ফিলিস্তীন চলে যান এবং সেখানে বসবাস করতে থাকেন। সেখানেই তার কাছে হযরত উসমান গনী (রা)-এর দুঃখজনক মৃত্যুসংবাদ গিয়ে পৌছে।

মিসরের গভর্নর আবদুল্লাহ্ ইব্ন সা'দ যখন এ সংবাদ পান যে, মদীনা শরীফে বিক্ষোভকারীরা হযরত উসমান গনী (রা)-কে অবরোধ করে রেখেছে, তখন তিনি মিসর থেকে মদীনা শরীফ অভিমুখে রওয়ানা হন। কিন্তু পথিমধ্যে যখন শুনতে পান যে, হযরত উসমান গনী (রা) শাহাদত বরণ করেছেন তখন মদীনায় না এসে মিসরের দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু পথিমধ্যে যখন জানতে পারেন যে, মুহাম্মদ ইব্ন রাবীআ' মিসর দখল করে নিয়েছে তখন বাধ্য হয়ে ফিলিস্তীনে অবস্থান করেন। তারপর সেখান থেকে দামিশকের দিকে চলে যান।

হযরত উসমান গনী (রা)-এর শাহাদতের সময় হযরত আলী (রা), হযরত তালহা (রা) ও হযরত যুবায়র (রা) এ তিনজন অতি গণ্যমান্য ও প্রভাবশালী সাহাবী মদীনায় ছিলেন। এ ছাড়াও হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা), হযরত সা'দ ইব্ন ওয়াক্কাস (রা) প্রমুখ শ্রদ্ধাভাজন সাহাবীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু ঐ উচ্ছৃঙ্খল বিক্ষোভকারীদের হাতে সবাই যেন অসহায় যিম্মীতে পরিণত হয়েছিলেন। মদীনা শরীফের কর্তৃত্ব বিক্ষোভকারীদের হাতে চলে গিয়েছিল। প্রথমোক্ত ব্যক্তিত্রয় যদিও বিক্ষোভকারীদের চোখে যথেষ্ট সম্মান ও মর্যাদার পাত্র ছিলেন, কিন্তু তাঁরা তাদের ইয্যত ও সম্মানের ভয়ে নিজ নিজ ঘরের দরজা বন্ধ করে নিজে থেকে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের কেউই তখন ঘর থেকে বের হতেন না। অবশ্য হযরত আলী (রা) বিশেষ কোন প্রয়োজন দেখা দিলে মদীনা শরীফের বাইরে যেতেন। কারো কারো মতে, বিক্ষোভকারীদের অশিষ্ট আচরণ থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যেই তিনি মদীনা শরীফের বাইরে চলে গিয়েছিলেন। তাই যখন হযরত উসমান গনী (রা)-কে শহীদ করা হয়, তখন হযরত আলী (রা) মদীনা শরীফ থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে অবস্থান করছিলেন।

বিক্ষোভকারীদের হাতে মদীনা শরীফের শাসনক্ষমতা

মিসর, কূফা ও বসরার বিক্ষোভকারীরা যে দিন মদীনা শরীফে প্রবেশ করে হযরত উসমান গনী (রা)-এর ঘর ঘেরাও করে ফেলে এবং তাঁকে মসজিদে আসতে বাধা দেয়, প্রকৃতপক্ষে সেদিন থেকেই মদীনা শরীফের শাসনক্ষমতা তাদের হাতে চলে যায়। কিন্তু যেহেতু অবরুদ্ধ অবস্থায় হলেও খলীফা তখনও বিদ্যমান ছিলেন, তাই বিক্ষোভকারীদের এ হুকুমত (শাসন ক্ষমতা)-কে 'হুকুমত' আখ্যা দেওয়া চলে না। অবশ্য হযরত উসমান গনী (রা)-কে শহীদ করার পর মদীনায় আনুমানিক এক সপ্তাহ বিক্ষোভকারীদের নেতা গাফিকী ইব্ন হারব মক্কীর শাসন বলবৎ থাকে। তখন সে নিজেই সব রকম হুকুমজারি করত এবং নামাযের ইমামতিও করত। কিন্তু এ বিক্ষোভকারীদের মধ্যেও বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী কিছু লোক ছিল। তারা চিন্তা করে

দেখল, এ হত্যাকাণ্ডের পর যদি আমরা এখান থেকে এভাবে নিজ নিজ ঘরে চলে যাই, তাহলে তা নিশ্চয়ই আমাদের জন্য কোন শুভ পরিণাম বয়ে আনবে না। বরং আমরা যেখানেই থাকব সেখানেই আমাদেরকে হত্যা করা হবে এবং এ বিক্ষোভকে একটি ফাসাদ ও বিদ্রোহ হিসাবে গণ্য করা হবে এবং আমরা এর বৈধতার কোন যুক্তিই তখন পেশ করতে পারব না। তারপর তারা আপোসে সলা-পরামর্শ করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, এখনি কাউকে খলীফা নির্বাচন করতে হবে এবং কাজ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এখান থেকে ফিরে যাওয়া চলবে না। বিক্ষোভ চলা কালীন দিনগুলোতেও অনুরূপ প্রস্তাব নিয়ে কিছু লোক কূফা ও বসরা থেকে মক্কা শরীফ অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গিয়েছিল। আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাবাও মিসর থেকে রওয়ানা হয় এবং প্রায় সবার অজ্ঞাতে ও অগোচরে মদীনা শরীফে প্রবেশ করে আপন এজেন্ট ও চরদের সাথে মিশে একাকার হয়ে যায়। যেহেতু বিক্ষোভকারীদের সবাই আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাবার বন্ধু ছিল না, বরং তাদের মধ্যে অনেক বেকুফ, হুজুগী ও ভিন্ন মতাবলম্বী লোকও ছিল তাই আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাবা মদীনা শরীফে এসে ইচ্ছে করেই নিজে কোন নেতৃত্ব বা কর্তৃত্ব গ্রহণ করল না বরং আপন এজেন্টদের মাধ্যমে জনসমুদ্রকে আন্দোলিত করে নিজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনে আত্মনিয়োগ করল। একজন খলীফা নির্বাচনের প্রস্তাব মূলত আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাবারই ছিল। যাহোক, বিক্ষোভকারীরা একত্রিত হয়ে হযরত তালহা (রা), হযরত যুবায়র (রা) ও হযরত আলী (রা)-এর সাথে পৃথক পৃথক ভাবে সাক্ষাৎ করল এবং তাদের প্রত্যেকের কাছেই আবেদন জানাল : আপনি খলীফার পদ গ্রহণ করুন এবং আমাদের কাছ থেকে বায়'আত নিন। কিন্তু তাদের প্রত্যেকেই খলীফার পদ গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। শেষ পর্যন্ত এ উদ্ভূত সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্য আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাবা একটি নতুন কৌশল অবলম্বন করল। সে অনুযায়ী বিক্ষোভকারীরা ঢোল পিটিয়ে ঘোষণা করে দিল যে, যেহেতু মদীনা শরীফের অধিবাসীরাই যাবতীয় ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন, যেহেতু তারাই প্রথম থেকে খলীফা নির্বাচন করে আসছেন এবং তাদেরই নির্বাচিত খলীফাকে সমগ্র বিশ্বের মুসলমানরা খলীফা বলে স্বীকার করে আসছে—তাই আমরা ঘোষণা করছি এবং মদীনা শরীফের অধিবাসীদেরকে এ মর্মে সতর্ক করে দিচ্ছি যে, তোমাদেরকে শুধু দু'দিন সময় দেওয়া হচ্ছে। তোমরা এ দু'দিনের মধ্যে একজন খলীফা নির্বাচন কর, অন্যথায় দুদিন পর আমরা আলী, তালহা ও যুবায়র-এ তিনজনকেই হত্যা করে ফেলবো। এ ঘোষণা শুনে মদীনা শরীফের অধিবাসিগণ আতংকিত হয়ে উঠে। তারা দ্রুত নিজ নিজ ঘর থেকে বের হয়ে হযরত আলী (রা)-এর কাছে ছুটে যায়। অনুরূপভাবে তারা হযরত তালহা (রা) ও হযরত যুবায়র (রা)-এর সাথেও দেখা করে। হযরত তালহা ও হযরত যুবায়র (রা) পরিষ্কার ভাষায় বলেন, আমরা খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করতে মোটেই রাযী নই। হযরত আলী (রা)-ও প্রথমে অস্বীকার করেন। কিন্তু যখন লোকেরা খুব কাকুতি মিনতি করতে লাগল তখন তিনি রাযী হয়ে যান। তিনি রাযী হওয়ার সাথে সাথে লোকজন দলে দলে ছুটে গিয়ে তাঁর হাতে বায়'আত করে। মদীনা শরীফের অধিবাসী এবং সেই সাথে বিক্ষোভকারীরা সর্বসম্মতিক্রমে তাঁকে খলীফা বলে মেনে নেয়।

হযরত আলী (রা)

নাম ও বংশ-পরিচয়

আলী ইব্‌ন আবূ তালিব ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন আবদে মনাফ ইব্‌ন কুসাই ইব্‌ন কিলাব ইব্‌ন মুররাহ্‌ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুওয়াই ইব্‌ন গালিব।

হযরত রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাঁকে আবুল হাসান ও আবূ তুরাব নামে ডাকতেন। তাঁর মায়ের নাম ফাতিমা বিনত আসাদ ইব্‌ন হাশিম। হযরত আলী (রা) একাধারে হযরত রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর চাচাত ভাই ও জামাই ছিলেন। তিনি ছিলেন হযরত রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রাণপ্রিয় কন্যা হযরত ফাতিমা (রা)-এর স্বামী। তিনি মধ্যমাকৃতির, অথচ কিঞ্চিত খাটো ছিলেন। তাঁর দেহ ছিল হৃষ্টপুষ্ট; মাথার চুল কিছুটা উঠে গিয়েছিল; সমগ্র দেহ লোমে ঢাকা ছিল। দাঁড়ি ছিল লম্বা ও ঘন; গোধূম বর্ণের দেহ।

তাঁর বৈশিষ্ট্য

হযরত আলী (রা) ছিলেন সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম। তিনি ছিলেন ঐ সব ব্যক্তিদেরও অন্যতম, যাঁরা কুরআন মজীদ একত্রিত করে হযরত রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে জমা দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন বনী হাশিম গোত্রের সর্বপ্রথম খলীফা। জাহিলিয়াত যুগেও তিনি কখনো মূর্তিপূজা করেননি। হযরত রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যখন মক্কা শরীফ থেকে মদীনা তাইয়্যিবাতে হিজরত করেন তখন তাঁর কাছে রক্ষিত আমানতসমূহ স্ব স্ব মালিকের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি হযরত আলী (রা)-কে মক্কায় রেখে গিয়েছিলেন। হযরত রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর এই নির্দেশ পালন করার পর তিনিও মদীনা তাইয়্যিবাতে হিজরত করেন। শুধুমাত্র তাবূক যুদ্ধ ছাড়া অন্য সব যুদ্ধেই তিনি হযরত রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সঙ্গে ছিলেন। তাবূক যুদ্ধে যাবার সময় হযরত রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাঁকে মদীনা শরীফের কর্মকর্তা তথা প্রতিনিধি নিয়োগ করে গিয়েছিলেন। উহুদ যুদ্ধে হযরত আলী (রা)-এর দেহে মোট ১৬টি ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল। খায়বার যুদ্ধে হযরত রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাঁর হাতে পতাকা তুলে দিয়েছিলেন এবং পূর্বাহ্নেই ঘোষণা করেছিলেন যে, খায়বার দুর্গ তাঁর (আলী রা)-এর হাতেই বিজিত হবে। তিনি খায়বার দুর্গের গুরুভার লৌহকপাট একাই আপন পিঠে উঠিয়ে নিয়েছিলেন। অথচ পরবর্তী সময়ে অনেক লোকের সম্মিলিত শক্তি ছাড়া সেটাকে তার জায়গা থেকে একটুখানি নড়ানোও সম্ভব হয়নি। তিনি তাঁর আবূ তুরাব নামটি খুবই পসন্দ করতেন। কেউ তাকে এ নামে ডাকলে তিনি খুবই সন্তুষ্ট হতেন। তাঁর এ নামকরণের কারণ : একবার তিনি ঘর থেকে বের হয়ে মসজিদে আসেন এবং সেখানেই ঘুমিয়ে পড়েন। তারপর হযরত রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মসজিদে আসেন এবং তাঁকে ঘুম থেকে জাগান। তিনি তখন তাঁর (আলীর) দেহের মাটি মুছে দিচ্ছিলেন এবং বলছিলেন, আবূ তুরাব উঠো !

তাঁর গুণসমূহ

হযরত সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা) বলেন, তাবূক যুদ্ধের সময় যখন হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আলী (রা)-কে মদীনা শরীফে অবস্থানের নির্দেশ দেন, তখন তিনি (আলী রা) বলেন, আপনি আমাকে স্ত্রীলোক ও শিশুদের উপর খলীফা বানিয়ে এখানে ছেড়ে যাচ্ছেন ? হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তুমি কি এ কথায় সন্তুষ্ট নও যে, আমি তোমাকে সেই ভাবে ছেড়ে যাচ্ছি যেভাবে হযরত মূসা (আ) হারূন (আ)-কে ছেড়ে গিয়েছিলেন। তবে শুধু একটি পার্থক্য, আমার পরে কোন নবী আসবে না। খায়বার যুদ্ধ চলাকালে একবার হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, "আমি আগামীকাল এমন এক ব্যক্তির হাতে পতাকা তুলে দেব যাঁর হাতে এ দুর্গ বিজিত হবে এবং যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে সন্তুষ্ট করে নিয়েছে।" ঐ সৌভাগ্যবান ব্যক্তিটি কে তা দেখার জন্য পরদিন ভোরে যখন সাহাবিগণ অপেক্ষা করছিলেন, তখন হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আলী (রা)-কে ডেকে তাঁর হাতে পতাকা তুলে দেন এবং তাঁর হাতেই দুর্গ বিজিত হয়। যখন আয়াতে "মুবাহালা" নাযিল হয় তখন হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আলী (রা), ফাতিমা (রা), হাসান (রা) ও হুসাইন (রা)-কে ডেকে পাঠান এবং বলেন, "হে আমার প্রতিপালক ! তাঁরাই আমার পরিবারের লোক।" একবার হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমি যার বন্ধু আলীও তার বন্ধু। তারপর বলেন, হে আমার প্রতিপালক যে ব্যক্তি আলীর সাথে ভালবাসার সম্পর্ক রাখে আপনিও তার সাথে ভালবাসার সম্পর্ক রাখুন এবং যে আলীর সাথে শক্রতার সম্পর্ক রাখে আপনিও তার সাথে শক্রতার সম্পর্ক রাখুন। একবার হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, চার ব্যক্তি এমন আছে যাদেরকে ভালবাসার জন্য আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উপস্থিত সবাই বললেন, অনুগ্রহপূর্বক তাদের নাম বলুন। তিনি বললেন, আলী, আবূ যর, মিকদাদ ও সালমান ফারসী। হযরত ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, যখন হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুহাজিরগণকে আনসারগণের সাথে পরস্পর ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে দেন তখন হযরত আলী (রা) ক্রন্দনরত অবস্থায় হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে আরয করেন, 'আপনি প্রত্যেক মুহাজিরকেই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে দিয়েছেন, শুধু আমিই বাকি রয়ে গেছি। তখন হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন দুনিয়া ও আখিরাতে তুমি আমার ভাই।" একবার হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন, "আমি জ্ঞানের শহর, আর আলী তার দরজা।" হযরত উমর (রা) একবার বলেন, যে কোন বিষয় বোঝার ক্ষেত্রে হযরত আলী (রা) আমাদের সবার আগে। হযরত আয়িশা (রা)-এর সামনে হযরত আলী (রা)-এর প্রসঙ্গ উঠলে তিনি বলেন, আলীর চাইতে সুন্নতকে বেশী বোঝে এমন লোক এখন আর বেঁচে নেই। হযরত আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত আছে, একবার হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আলী (রা)-কে বলেন, জঘন্যতম দু'ব্যক্তির একজন আহমার, যে হযরত সালিহ (আ)-এর উটনীর পা কেটেছিল, আর অন্যজন সেই ব্যক্তি যে তোমার মাথায় তরবারি দিয়ে আঘাত করে তোমার দাঁড়ি রক্তরঞ্জিত করবে।

হযরত আলী (রা)-এর বিচার-মীমাংসা ও বাণীসমূহ

হযরত আলী (রা) বলেন, মহান আল্লাহ্র শোকর যে, ধর্মীয় বিষয়ে আমার শক্রও আমার কাছে ফাত্ওয়া চায়। মুআবিয়া (রা) আমার কাছে লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করেছে, 'খুনসাই মুশকিল' (জটিল আকারের নপুংসক) পরিত্যক্ত সম্পত্তির কত অংশ পাবে ? আমি তাঁর কাছে

লিখে পাঠিয়েছি যে, খুনসার লিঙ্গের আকার আকৃতি অনুযায়ী তার উপর উত্তরাধিকারের নির্দেশ প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ যদি তাঁর লিঙ্গ পুরুষদের মত হয় তাহলে সে পুরুষ আর যদি স্ত্রী লোকের মত হয় তাহলে স্ত্রীলোক বলে গণ্য হবে। হযরত আলী (রা) যখন বসরাতে চলে যান তখন ইবন কাওয়া ও কায়স ইবন উবাদাহ্ তাঁর কাছে নিবেদন করেন : কোন কোন লোক বলে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) আপনাকেও এ মর্মে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, আমার পরে তোমাকেই খলীফা মনোনীত করা হবে। এ ব্যাপারে আপনার চাইতে বিশ্বস্ত লোক তো আর কেউ হতে পারে না। কাজেই আমরা আপনাকেই জিজ্ঞাসা করছি, কথাটা কি সত্য ? হযরত আলী (রা) উত্তরে বলেন : এটা একেবারেই অমূলক কথা যে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) খিলাফতের ব্যাপারে আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে কোন প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকলে আমি হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা)-কে মিম্বরের উপর দাঁড়াতেই দিতাম না এবং আমার পক্ষে কেউ থাক অথবা না থাক নিজ হাতেই তাঁদেরকে হত্যা করতাম। আসল ব্যাপার হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অসুস্থতার কাল যখন প্রলম্বিত হল তখন একবার মুয়াযযিন এসে তাঁকে নামায পড়াবার জন্য ডাকলে তিনি মুয়াযযিনকে বলেন, "আবূ বকরকে নিয়ে যাও। তিনি আমার স্থলে নামায পড়াবেন।" কিন্তু উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাঁর এ ইচ্ছা থেকে বিরত রাখতে চাইলে তিনি বলেন, "তুমি দেখছি হযরত ইউসুফ (আ)-এর যুগের স্ত্রীলোকদের মত।" হযরত আবূ বকর (রা)-কেই নিয়ে যাও।" যেদিন হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইনতিকাল করেন, সেদিন যখন আমি আমার স্থানগত মর্যাদা সম্পর্কে চিন্তা করলাম তখন ঐ ব্যক্তিকেই আমার পার্থিব ব্যাপারেও নেতা মেনে নিলাম, যাকে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের ধর্মীয় ব্যাপারে (নামাযের ইমামতির জন্য) নেতা নির্বাচন করেছিলেন। কেননা, নামায হচ্ছে আসল দীন (ধর্ম), আর হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) দীনের প্রতিষ্ঠাতা এবং দুনিয়ারও ব্যবস্থাপক। তাই আমরা হযরত আবূ বকর (রা)-কেই যোগ্য মনে করে তাঁর হাতেই বায়'আত করি। এ ব্যাপারে আমাদের মধ্যে কেউ দ্বিমত পোষণ করেনি। কেউ কারো ক্ষতি করার কথা চিন্তা করেনি এবং কেউ হযরত আবূ বকর (রা)-এর প্রতি অসন্তুষ্টও হননি। কাজেই আমিও হযরত আবূ বকর (রা)-এর হক আদায় করেছি। তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেছি, তাঁর সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে তাঁর পক্ষে লড়েছি, তিনি আমাকে যা কিছু দিয়েছেন তাই গ্রহণ করেছি, যেখানে আমাকে লড়ত হুকুম করেছেন সেখানেই এবং শরীআতের বিধান মতে যাকেই শাস্তি দিতে বলেছেন তাকেই শাস্তি দিয়েছি। তিনি ইনতিকালের সময় হযরত উমর (রা)-কে তাঁর খলীফা বা প্রতিনিধি মনোনীত করে যান। তাঁর পর আমি হযরত উমর (রা)-এর সাথেও সেরূপ ব্যবহার করেছি, যেরূপ ব্যবহার হযরত আবূ বকর (রা)-এর সাথে করতাম। যখন হযরত উমর (রা)-এর শাহাদতের সময় ঘনিয়ে এল, তখন আমি মনে মনে চিন্তা করলাম যে, ইসলাম গ্রহণে আমার অগ্রবর্তিতা, রাসূলে পাকের সাথে আমার নিকটাত্মীয়তা এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের কথা বিবেচনা করে হযরত উমর (রা) আমার জন্যই খিলাফতের নির্দেশ দিয়ে যাবেন। কিন্তু তিনি এ ভয়ে যে, না জানি এমন কোন ব্যক্তিকে আবার মনোনীত করে যাবে যার পরিণাম ভাল নয় (আমাকে মনোনীত করেননি)। এই একই কারণে তিনি তাঁর সন্তানকেও খিলাফত থেকে বঞ্চিত করে যান। হযরত উমর (রা) যদি দান ও অনুগ্রহের আদর্শ অনুসরণ করতেন তাহলে তিনি আপন সন্তানের চাইতে কাউকেই যোগ্য মনে

করতেন না। যাহোক, শেষ পর্যন্ত নির্বাচনের দায়িত্ব কুরায়শের হাতে আসে এবং আমিও ছিলাম তাঁদের একজন। যখন লোকেরা খলীফা নির্বাচনের জন্য একত্রিত হয় তখন আমি ধারণা করি যে, তারা আমাকে ছাড়িয়ে যাবে না। হযরত আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা) আমার কাছ থেকে এ মর্মে প্রতিশ্রুতি নেন যে, যাকেই খলীফা নির্বাচিত করা হয় আমি যেন তাঁরই আনুগত্য স্বীকার করি। তারপর যখন তিনি হযরত উসমান (রা)-এর হাত ধরেন তখন আমি বুঝতে পারি যে, আমার কাছ থেকে যে প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছে তা অন্য ব্যক্তির আনুগত্যের জন্যই নেওয়া হয়েছে। তাই আমি হযরত উসমান (রা)-এর হাতেই বায়'আত করলাম এবং তাঁর সাথে সেই ব্যবহারই করলাম যা হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা)-এর সাথে করতাম। যখন হযরত উসমান (রা)-এরও শাহাদত লাভ হল তখন আমি চিন্তা করলাম যে, ঐ সব ব্যক্তি তো গত হয়ে গেছেন যাঁদেরকে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের ইমাম বানিয়েছিলেন এবং ঐ ব্যক্তিও গত হয়ে গেছেন যাঁর আনুগত্যের জন্য আমার কাজ থেকে প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছিল। কাজেই এবার আমি (নিজের জন্য) বায়'আত গ্রহণের প্রস্তুতি নিলাম। 'আহলে হারামাইন' (মক্কা-মদীনার অধিবাসীবৃন্দ) এবং কূফা-বসরার অধিবাসীরাও আমার হাতে বায়'আত করে। এখন খিলাফতের ব্যাপারে এমন এক ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন যিনি (হযরত রাসূলের সাথে) আত্মীয়তা, জ্ঞান-প্রজ্ঞা, ইসলামে অগ্রবর্তিতা কোন দিক দিয়েই আমার সমকক্ষ নন। এমতাবস্থায় আমিই খিলাফতের যোগ্য।

জনৈক ব্যক্তি হযরত আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করল, আপনি আপনার এক ভাষণে বলেছিলেন, "হে আমার প্রতিপালক ! আমাকে সেরূপ যোগ্যতা দান করুন যেরূপ যোগ্যতা আপনি খুলাফা-ই-রাশিদীনকে দান করেছিলেন"—তাহলে আপনার মতে খুলাফা-ই-রাশিদীন কারা ? একথা শুনে হযরত আলী (রা)-এর চক্ষু অশ্রুতে ভরে উঠলো। তিনি বললেন, তাঁরা আমার বন্ধু হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা)। তাঁরা উভয়েই 'ইমামুল হুদা' (পথ প্রদর্শনের নেতা) ও শায়খুল ইসলাম (ইসলামের গণ্যমান্য ব্যক্তি)। কুরায়শগণ হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পর দু'জনকে অনুসরণ করেছে এবং যারা এদেরকে অনুসরণ করেছে তারা মুক্তি পেয়েছে। হযরত আলী (রা) মিথ্যাচারিতাকে অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। একবার তিনি কিছু বলছিলেন এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁর কোন কথার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে। তখন তিনি তার জন্য বদদু'আ করলেন। তারপর দেখা গেল, মজলিস থেকে উঠার পূর্বেই ঐ ব্যক্তি তার দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে।

একবার দু'ব্যক্তি খেতে বসল। তাদের একজনের কাছে ছিল পাঁচটি রুটি এবং অন্যজনের কাছে তিনটি। ইতিমধ্যে অপর এক ব্যক্তি এল এবং তারা দু'জন ঐ তৃতীয় ব্যক্তিকে তাদের সাথে খেতে বসাল। খাওয়া-দাওয়ার পর তৃতীয় ব্যক্তি তাদের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় তাদের দু'জনকে আট দিরহাম দিয়ে বলল, আমি যা খেয়েছি এটা তারই বিনিময় মনে কর। তৃতীয় ব্যক্তি চলে যাবার পর দিরহামগুলো ভাগ করতে গিয়ে তাদের দু'জনের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। যার পাঁচটি রুটি ছিল সে অপর ব্যক্তিকে বলল, আমি এ থেকে পাঁচ দিরহাম পাব এবং তুমি পাবে তিন দিরহাম। কেননা, আমার রুটি ছিল পাঁচটি এবং তোমার রুটি ছিল তিনটি। তিন রুটির অধিকারী বলল, আমি দিরহামগুলোর অর্ধেক (অর্থাৎ চার দিরহাম) ছাড়া কোন মতেই রাযী হব না। এ কলহ শেষ পর্যন্ত এ পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছল যে, তারা উভয়ে

বিচারপ্রার্থী হয়ে হযরত আলী (রা)-এর দরবারে গিয়ে হাযির হল। তিনি তাদের উভয়ের বক্তব্য শুনে তিন রুটির অধিকারী ব্যক্তিকে বললেন, তোমার রুটির পরিমাণ ছিল কম। তিন দিরহাম দিলেও তোমার ভাগে বেশি পড়ে। কাজেই তুমি তিন দিরহামেই রাযী হয়ে যাও। সে বলল, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আমার প্রাপ্য না পাব, ততক্ষণ কিছুতেই রাযী হব না। হযরত আলী (রা) বললেন, তাহলে শেষ পর্যন্ত তোমার ভাগে পড়বে মাত্র এক দিরহাম। একথা শুনে এ ব্যক্তি বিস্ময় ভরা কণ্ঠে বলল, আপনিও দেখছি আশ্চর্য ধরনের রায় দিলেন। এবার আমাকে বুঝিয়ে বলুন তো, আমার ভাগে মাত্র একটি এবং তার ভাগে বাকি সাতটি পড়ে কিভাবে? হযরত আলী (রা) বললেন, তাহলে শোনো। সর্বমোট আটটি রুটি ছিল এবং তোমরা লোক ছিলে তিনজন। যেহেতু এগুলো সমানভাগে ভাগ করা সম্ভব নয়, তাই প্রত্যেকটি রুটি তিন টুকরা করলে মোট চব্বিশ টুকরা হয়। তা তো জানা সম্ভব নয় যে, কে কম খেয়েছে বা কে বেশি খেয়েছে। কাজেই, তা ধরে নিতে হবে যে, তিনজনই সমান সমান খেয়েছে অর্থাৎ প্রত্যেকে খেয়েছে আট টুকরা করে। তাহলে তোমার তিন রুটির নয় টুকরা থেকে তৃতীয় ব্যক্তি খেয়েছে মাত্র এক টুকরা এবং তুমি খেয়েছ আট টুকরা। আর তোমার সঙ্গীর পাঁচ রুটির পনর টুকরা থেকে সে খেয়েছে আট টুকরা এবং বাকি সাত টুকরা খেয়েছে ঐ তৃতীয় ব্যক্তি। যেহেতু তৃতীয় ব্যক্তি খেয়েছে তোমার এক টুকরা এবং তোমার সঙ্গীর সাত টুকরা, তাই আট দিরহামের মধ্যে সে পাবে সাত দিরহাম এবং তুমি পাবে মাত্র এক দিরহাম। একথা শুনে লোকটি বলল, হাঁ, এখন আমি রাযী হলাম। একদা জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে এ মর্মে অভিযোগ পেশ করল যে, অমুক ব্যক্তি বলে, সে স্বপ্নের মধ্যে আমার মায়ের সাথে ব্যভিচার করেছে। তিনি তখন রায় দিলেন, ঐ ব্যক্তিকে রোদে দাঁড় করিয়ে তার ছায়ার উপর বেত্রাঘাত কর।

তাঁর হিকমতপূর্ণ বাণীসমূহ

হযরত আলী (রা) বলেন, লোক সকল! তোমরা তোমাদের কথা ও কাজ এবং আত্মা ও দেহের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোল। কিয়ামতে মানুষকে সেই কাজের বদলা দেওয়া হবে যা সে এখানে করে যাবে এবং তাদেরই সাথে তার হাশর (পুনরুত্থান) হবে যাদের সাথে তার ভালবাসার সম্পর্ক থাকবে। তোমাদের আমল (কর্ম) যাতে আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় হয় সেজন্য ঐকান্তিক চেষ্টা কর। কেননা, কোন আমলই তাক্‌ওয়া (আল্লাহর ভীতি) ও আন্তরিকতা ছাড়া গ্রহণীয় হয় না।

হে কুরআনের আলিম (জ্ঞানী) তুমি কুরআনের আলিম ও (কুরআন অনুযায়ী কর্ম সম্পাদনকারী) হও। প্রকৃত আলিম সেই ব্যক্তি, সে যা পড়ে তার উপর আমল করে এবং ইলম ও আমলের মধ্যে সমন্বয় বিধান করে। এমন এক যুগ আসবে যকন ইলম ও আমলের মধ্যে কোন সম্পর্ক থাকবে না। আলিম নামধারী লোকেরা চক্রাকারে বসবে এবং একে অন্যের উপর ফখর (গর্ব) করতে থাকবে। এমন কি, যখন তাদের কাছে কোন লোক এসে বসবে তখন তারা তাকে অন্যত্র গিয়ে বসতে হুকুম দেবে। স্মরণ রেখো, আমল (কর্ম) চক্রাকারের মজলিস বা বৈঠকের সাথে নয়, বরং তা মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রাখে। সচ্চরিত্রতা মানুষের অলংকার, বুদ্ধি তার সাহায্যকারী এবং শিষ্টাচার তার উত্তরাধিকার। হিংস্রতা দাম্ভিকতার চাইতেও খারাপ বস্তু।

জনৈক ব্যক্তি হযরত আলী (রা)-এর খিদমতে হাযির হয়ে নিবেদন করল, 'তকদীর' (ভাগ্য) কি তা আমাকে বুঝিয়ে বলুন। তিনি উত্তর দিলেন, তা একটা 'অন্ধকার পথ' এ সম্পর্কে

জিজ্ঞেস করো না। লোকটি পুনরায় ঐ নিবেদন করল। তিনি উত্তর দিলেন, তা মহান আল্লাহর এমন একটা রহস্য যা তোমার থেকে গোপন রাখা হয়েছে। কাজেই তুমি কেন তা তালাশ করছ ? তার পরে লোকটি পুনরায় ঐ একই নিবেদন করলে তিনি বললেন, আচ্ছা বল তো, আল্লাহ্ তোমাকে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী তৈরি করেছেন, না তোমার ইচ্ছানুযায়ী ? সে উত্তর দিল, আল্লাহ্ তাঁরই ইচ্ছানুযায়ী আমাকে তৈরি করেছেন। তিনি তখন বললেন, কাজেই মহান আল্লাহ্ যেভাবে চাইবেন সে ভাবেই তোমাকে ব্যবহার করবেন, তাতে তো তোমার করার কিছু নেই।

- প্রত্যেকটি বিপদের একটি সমাপ্তি আছে। আর যখন কারো উপর কোন বিপদ আসে তখন তা আপন সমাপ্তি পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। বুদ্ধিমানের উচিত, বিপদে পড়লে ব্যস্ত বা হতাশ না হওয়া এবং তা দূর করার জন্য অস্থির হয়ে না পড়া। কেননা, এতে কষ্ট আরো বৃদ্ধি পায়।
- চাওয়ার পর কাউকে কিছু দেওয়ার নাম দান বা বখশিশ আর না চাইতে কিছু দেওয়ার নাম বদান্যতা (সাখাওয়াত)। ইবাদত বন্দেগীতে ঔদাসিন্য, জীবিকা নির্বাহে টানাটানি এবং স্বাদে ক্ষয়িষ্ণুতা গুনাহ বা অপরাধেরই শাস্তি।
- হযরত ইমাম হাসান (রা)-কে শেষবারের মত তিনি যে নসীহত করেছেন তা হলো, বুদ্ধি সবচেয়ে বড় ঐশ্বর্য আর মূর্খতা সবচেয়ে বড় দরিদ্র।
- জঘন্যতম হিংস্রতা দাম্ভিকতা আর সচ্চরিত্র মহান আল্লাহর সবচেয়ে বড় দান। আহাম্মকের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাক। কেননা, সে নিকটতমকে দূরতম এবং দূরতমকে নিকটতম করে দেয়।
- কৃপণ থেকে দূরে থাক। কেননা সে তোমা থেকে সেই জিনিসটি দূরে ঠেলে দেয় যার প্রয়োজন তোমার খুব বেশী।
- পাপিষ্ঠের কাছে বসো না। কেননা, সে তোমাকে কড়ির বিনিময়ে বেচে দেবে।
- পাঁচটি কথা স্মরণ রেখো। গুনাহ ছাড়া আর কোন জিনিসকেই ভয় করা উচিত নয়। মহান আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো উপর ভরসা করা উচিত নয়। যে ব্যক্তি কোন জিনিস জানে না তা জানার জন্য সে যেন কখনো লজ্জাবোধ না করে। কোন আলিমকে যদি এমন কোন কথা জিজ্ঞেস্ করা হয় যা সে জানে না তাহলে তার উচিত বিনাদ্বিধায় এ কথা বলে দেওয়া যে, আল্লাহ্ সবচাইতে ভাল জানেন। ধৈর্য ও ঈমানের মধ্যে সেরূপ সম্পর্ক যেরূপ সম্পর্ক মাথা ও দেহের মধ্যে। যখন ধৈর্য চলে যেতে শুরু করে তখন ধরে নিও তোমার ঈমানও চলে যাচ্ছে। যখন মাথা চলে যায় তখন দেহ বাঁচে কি করে ?
- ফকীহ (বুদ্ধিমান) ঐ ব্যক্তিকে বলা উচিত, যে মানুষকে মহান আল্লাহ্ থেকে নিরাশ করে না, তার কাছে গুনাহ্ আসার সুযোগ দেয় না, মহান আল্লাহর আযাব থেকে তাকে শংকামুক্ত করে না এবং কুরআন শরীফ থেকে বিমুখ রেখে তাকে অন্য কোন কিছুর অভিমুখী করে না।

ডালিম ফল সেই হালকা ঝিল্লীসহ খাওয়া উচিত, যা দানার সাথে সম্পৃক্ত থাকে। কেননা তা পাকস্থলীতে গিয়ে খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে। এমন এক যুগ আসবে যখন একজন মু'মিন সাধারণ একজন গোলামের চাইতেও অধিক লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে।

হযরত আলী (রা)-এর খিলাফতকালে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী

খিলাফতের বায়'আত

হযরত উসমান গনী (রা)-এর শাহাদতের এক সপ্তাহ পর হিজরী ৩৫ সনের ২৫ যুলহাজ্জ তারিখে মদীনা শরীফে হযরত আলী (রা)-এর হাতে সাধারণ বায়'আত অনুষ্ঠিত হয়। হযরত উসমান গনী (রা)-এর শাহাদতের পর মদীনা শরীফে ছিল তাঁর হত্যাকারীদের প্রাধান্য। তারা প্রথমে মদীনা শরীফের অধিবাসিগণকে ধমকিয়ে ও ভয় প্রদর্শন করে একজন খলীফা নির্বাচন করতে বাধ্য করে। বিক্ষোভকারীদের অধিকাংশই ছিল হযরত আলী (রা)-এর পক্ষে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মদীনা শরীফের অধিবাসিগণও হযরত আলী (রা)-কে সমর্থন করত। লোকেরা হযরত আলী (রা)-এর কাছে গিয়ে বায়'আত গ্রহণের জন্য তাঁকে অনুরোধ করলে তিনি বলেন, তোমরা আমাকে খলীফা নির্বাচন করেছ বটে, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত 'আসহাবে বদর' (বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারিগণ) আমাকে খলীফা বলে না মানবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের এ নির্বাচনের কোন মূল্য নেই। একথা শুনে লোকেরা 'আসহাবে বদর'-এর কাছে গেল এবং যথাসম্ভব তাঁদেরকে একত্রিত করে হযরত আলী (রা)-এর সামনে হাযির করল। সর্বপ্রথম মালিক আশতার হযরত আলী (রা)-এর হাতে বায়'আত করে। তারপর অন্য লোকেরা বায়'আত করার জন্য অগ্রসর হয়।

হযরত আলী (রা) বলেন, হযরত তালহা (রা) এবং হযরত যুবায়র (রা)-এর মতামতও জানা উচিত। তখন মালিক আশতার হযরত তালহা (রা)-এর কাছে এবং হাকীম ইবন আবদুল্লাহ্ যুবায়র (রা)-এর কাছে গেল এবং তাঁদেরকে জোর করে হযরত আলী (রা)-এর সামনে এনে হাযির করল। হযরত আলী (রা) তাঁদেরকে বলেন, আপনাদের দু'জনের মধ্য থেকে যিনিই খলীফা হতে চান, আমি তাঁর হাতে বায়'আত করতে প্রস্তুত আছি। তাঁরা উভয়েই খলীফা হতে অস্বীকার করেন। তারপর ঐ দু'জনকে বলা হয়, যদি আপনারা নিজেরা খলীফা হতে না চান তাহলে হযরত আলী (রা)-এর হাতে বায়'আত করুন। তাঁরা উভয় বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করতে থাকেন। এমনি সময়ে মালিক আশতার খাপ থেকে তরবারি টেনে বের করে হযরত তালহা (রা)-কে বলে, আমি এখনি তোমাকে শেষ করে ফেলব। হযরত তালহা (রা) পরিস্থিতি লক্ষ্য করে হযরত আলী (রা)-কে সম্বোধন করে বলেন, আমি আপনার হাতে এ শর্তে বায়'আত করছি যে, আপনি মহান আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূলের সুন্নাত অনুযায়ী আদেশ-নিষেধ দিবেন এবং শাস্তির বিধানসমূহ জারি করবেন (অর্থাৎ হযরত উসমান (রা)-এর হত্যাকারীদের উপর কিসাস জারী করবেন)। হযরত আলী (রা) তাতে স্বীকৃত হন। হযরত তালহা (রা) বায়'আতের জন্য তাঁর কর্তিত দুর্বল হাতটি বাড়ালেন (উহুদ যুদ্ধে ভীষণ ভাবে আহত হওয়ার কারণে তাঁর হাতটি অবশ হয়ে গিয়েছিল)। কোন কোন লোক ঐ মজলিসে সর্বপ্রথম হযরত তালহা (রা) বায়'আতের জন্য তাঁর কর্তিত হাতটি বাড়িয়ে দিচ্ছেন দেখে সেটাকে হযরত আলী (রা)-এর খিলাফতের জন্য একটি অশুভ সংকেত বলে মনে করে। তারপর হযরত যুবায়র (রা)-এর সাথেও ঐ একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল। তিনিও হযরত তালহা (রা)-এর শর্তসমূহ পেশ করে হযরত আলী (রা)-এর হাতে বায়'আত করলেন। হযরত সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-কেও বায়'আত করতে বলা হলো। কিন্তু তিনি তাঁর ঘরের দরজা বন্ধ করে ফেললেন এবং বললেন, যখন সকল লোক বায়'আত করে নেবে তখন আমিও বায়'আত করবো। তিনি

এ প্রতিশ্রুতিও দেন যে, আমার পক্ষ থেকে ভয়ের কোন কারণ নেই। তখন হযরত আলী (রা) তাঁকে আপন অবস্থার উপরই ছেড়ে দিলেন। লোকেরা হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর বায়'আত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে, তখন মালিক আশতার তরবারি বের করে বলে, আমি তাঁকে হত্যা করব। হযরত আলী (রা) মালিক আশতারকে বাধা দিয়ে বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)-এর জামিন হচ্ছি। এরপর আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) উমরা পালনের জন্য মক্কা শরীফ অভিমুখে রওয়ানা হন। যখন আলী (রা) তাঁর এ অবস্থা জানতে পারেন এবং লোকেরাও বলাবলি করতে থাকে যে, তিনি (আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর) (রা) আপনার বিরোধিতা করার ইচ্ছা নিয়েই মদীনা শরীফ থেকে চলে যাচ্ছেন তখন হযরত আলী (রা) তাঁকে অবিলম্বে বন্দী করার জন্য লোক পাঠান। কিন্তু সেই মুহূর্তে হযরত আলী (রা)-এর কন্যা উম্মে কুলছুম (যিনি ছিলেন হযরত উমর (রা)-এর সহধর্মিণী) হযরত আলী (রা)-এর কাছে আসেন এবং তাঁকে এ কথার নিশ্চয়তা দেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) আপনার বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন করবেন না ; তিনি শুধু উমরা পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ অভিমুখে রওয়ানা হয়েছেন। কাজেই হযরত আলী (রা) আশ্বস্ত হন। এ ছাড়াও মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামাহ (রা), উসামা ইব্ন শু'বাহ (রা), আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা) প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিও বায়'আত করেন নি। বহু লোক বিশেষ করে বনূ উমাইয়া বায়'আতে অংশগ্রহণ না করার জন্য মদীনা শরীফ থেকে সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা করে। কোন কোন লোক ঐ উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ অভিমুখেও রওয়ানা হয়। যে কয়জন সাহাবায়ে কিরাম মদীনা শরীফে ছিলেন অথচ বায়'আত করেননি তাঁদেরকে হযরত আলী (রা) ডেকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তাঁরা পরিষ্কার ভাষায় বলেন, এখনও মুসলমানদের মধ্যে রক্তারক্তির কারণ বিদ্যমান রয়েছে এবং বিশৃঙ্খলাও পুরাপুরি বন্ধ হয়নি। তাই আমরা কারো হাতে বায়'আত না করে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকতে চাই।

তারপর হযরত আলী (রা) মারওয়ান ইব্ন হাকামকে তলব করেন। কিন্তু তাকে কোথাও পাওয়া যায়নি। হযরত উসমান গনী (রা)-এর সহধর্মিণীর (যিনি অকুস্থলে হাযির ছিলেন) কাছে হত্যাকারীদের নাম জিজ্ঞেস করা হলে তিনি কারো নাম বলতে পারেন নি ; তবে দু'ব্যক্তির আকার-আকৃতির বর্ণনা দেন। মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর (রা) সম্বন্ধে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি (নায়িলাহ) বলেন, হযরত উসমান (রা) নিহত হওয়ার পূর্বেই তিনি (মুহাম্মদ) দরজা দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গিয়েছিলেন। বনূ উমাইয়ার কিছু লোক উসমান (রা)-এর স্ত্রী নায়িলার কর্তিত অংগুলিসমূহ এবং হযরত উসমান (রা)-এর রক্তমাখা জামাটি নিয়ে সিরিয়ায় হযরত মুআবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ান (রা)-এর কাছে চলে যায়।

খিলাফতের দ্বিতীয় দিন

হযরত তালহা (রা) এবং হযরত যুবায়র (রা) পরদিন হযরত আলী (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং বলেন, আমরা তো আপনার হাতে এ শর্তে বায়'আত করেছি যে, আপনি হযরত উসমান (রা)-এর হত্যাকারীদের 'কিসাস' জারি করলেন। যদি আপনি এ ব্যাপারে ইতস্তত করেন তাহলে আমাদের বায়'আতও অকার্যকর (বাতিল) বলে বিবেচিত হবে। হযরত আলী (রা) বলেন, আমি অবশ্যই হযরত উসমান (রা)-এর হত্যাকারীদের উপর কিসাস জারি করব এবং তাঁর ঘটনার ব্যাপারে সুবিচার করব; কিন্তু এখনো বিক্ষোভকারীদের প্রাধান্য রয়েছে এবং খিলাফতের ব্যাপারেও স্থিরতা আসেনি। তাই, আমাকে আরো কিছুটা অবকাশ দিন। কিছু স্বস্তি

লাভের পর আমি ঐ বিষয়টির প্রতি পুরাপুরি মনোনিবেশ করবো। বর্তমান অবস্থায় এ ব্যাপারে কিছু করা সম্ভব নয়। হযরত আলী (রা)-এর একথা শুনে হযরত তালহা ও হযরত যুবায়র (রা) উভয়েই নিজ নিজ ঘরে চলে যান। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে এ বিষয়কে কেন্দ্র করে কানাঘুষা শুরু হয়ে যায়। হযরত উসমান (রা)-এর হত্যাকারীসহ সকল বিক্ষোভকারীও এ ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে যে, যদি কিসাস কার্যকর করা হয় তাহলে তো আমাদের রক্ষা নেই। আর ঐ সমস্ত লোক যারা হযরত উসমান গনী (রা)-কে মজলুম মনে করত এবং দাঙ্গাবাজদের প্রতি আন্তরিক ঘৃণা পোষণ করত, তারা একথা বিশ্বাস করতে শুরু করে যে, ঐ সমস্ত লোক যারা হযরত উসমান (রা)-কে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে তাদেরকে আপন কৃতকর্মের পরিণাম আর ভোগ করতে হবে না এবং এভাবে তারা মজা করে ঘুরে বেড়াবে। মানুষের মনে অনুরূপ ধারণা সৃষ্টি হওয়া হযরত আলী (রা)-এর খিলাফতের জন্য ছিল ক্ষতিকারক। কিন্তু ঐ অবস্থায় যখন ইসলামী রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়েছিল এবং রাজধানী মদীনা তায়্যিবাতে এক অস্বস্তিকর পরিবেশ বিরাজ করছিল এর কোন প্রতিবিধান করাও হযরত আলী (রা)-এর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

দাঙ্গাবাজদের অবাধ্যতা

বায়'আতে খিলাফতের তৃতীয় দিন হযরত আলী (রা) নির্দেশ দিলেন কূফা, বসরা, মিসর এবং অন্যান্য প্রদেশ থেকে আগত সকল আরবই যেন মদীনা থেকে চলে যায়। কিন্তু আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাবা এবং তার দলের লোকেরা এ হুকুম অমান্য করে মদীনা তাইয়িবা থেকে চলে যেতে অস্বীকার করে এবং বেশীর ভাগ দাঙ্গাবাজও এ ব্যাপারে তাদেরকে সমর্থন করে। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল হযরত আলী (রা)-এর খিলাফতের জন্য সর্বপ্রথম অশুভ সংকেত। কেননা, তাঁর নির্দেশ এ লোকেরাই মানতে অস্বীকার করছে যারা নিজেদেরকে তারই জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ বলে জাহির করত। তারপর হযরত তালহা (রা) ও হযরত যুবায়র (রা) হযরত আলী (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে বলেন, আপনি আমাদেরকে বসরা ও কূফাতে পাঠিয়ে দিন। যেহেতু সেখানকার লোকদের সাথে আমাদের ভাল সম্পর্ক রয়েছে, তাই আমরা সেখানে গিয়ে মানুষের বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারাকে একীভূত করার চেষ্টা করবো। তাঁদের একথার উপর হযরত আলী (রা)-এর কিছুটা সন্দেহ জাগে। তাই তিনি তাঁদের উভয়কে মদীনা তাইয়িবা থেকে বাইরে যেতে নিষেধ করে দেন।

হযরত মুগীরা (রা) ও ইব্ন আব্বাস (রা)-এর সুপরামর্শ

হযরত আলী (রা) এক লিখিত নির্দেশবলে তাঁর খিলাফতের তৃতীয় ও চতুর্থ দিনেই হযরত উসমান (রা)-এর সময়কার সকল কর্মকর্তা ও প্রশাসককে পদচ্যুত করেন এবং তাদের স্থলে অন্য কর্মকর্তা ও প্রশাসক নিয়োগ করেন। তা শুনে, হযরত মুগীরা ইব্ন শু'বাহ, যিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোক ছিলেন এবং হযরত আলী (রা)-এর নিকটাত্মীয়ও ছিলেন, হযরত আলী (রা)-এর কাছে এসে বলেন, আপনি হযরত তালহা, হযরত যুবায়র (রা) ও অন্যান্য কুরায়শের উপর মদীনা শরীফের বাইরে যাবার ব্যাপারে যে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন তার প্রতিক্রিয়া হবে সমগ্র কুরায়শ বংশের লোক আপনার খিলাফতকে তাদের জন্য অস্বস্তিকর বলে ভাবতে শুরু করবে। ফলে আপনার প্রতি তাদের কোন সহানুভূতি থাকবে না। অপর দিকে হযরত উসমান (রা)-এর সময়কার কর্মকর্তা ও প্রশাসকদের পদচ্যুত করার ব্যাপারে আপনি

তাড়াহুড়ার আশ্রয় নিয়েছেন। তাই প্রেরিত কর্মকর্তাদেরকে ডেকে পাঠান এবং সাবেক কর্মকর্তাদেরকে নিজ নিজ এলাকায় বহাল রাখুন এবং তাদের কাছ থেকে শুধু বায়'আত ও আনুগত্য দাবী করুন।

হযরত আলী (রা) পরিষ্কার ভাষায় হযরত মুগীরা (রা)-এর প্রস্তাব মেনে নিতে অস্বীকার করেন। পরদিন যখন হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হযরত আলী (রা)-এর কাছে আসেন এবং কথা প্রসঙ্গে তিনি তাঁর পূর্বেকার অভিমত পাল্টিয়ে বলেন, হযরত উসমান (রা)-এর কর্মকর্তাদের পদচ্যুতির ব্যাপারটি আপনার ত্বরান্বিত করাই উচিত। যখন হযরত মুগীরা (রা) সেখান থেকে উঠে চলে যান তখন হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হযরত আলী (রা)-কে বলেন, হযরত মুগীরা (রা) আপনাকে কাল সঠিক উপদেশই দিয়েছিলেন, আজ কিন্তু প্রতারণা করেছেন। তখন হযরত আলী (রা) বলেন, এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি ? আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, হযরত উসমান (রা)-এর শাহাদতের সময় আপনার মক্কা থেকে চলে যাওয়াটাই সঙ্গত ছিল। যাক, এ মুহূর্তে তাই সমীচীন যে, আপনি হযরত উসমান গনী (রা) কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তাদেরকে স্ব-স্ব পদে ততক্ষণ পর্যন্ত বহাল রাখুন যতক্ষণ না খিলাফতের ভিত্তি মজবুত ও সুদৃঢ় হয়ে উঠে। আপনি যদি তাদের পদচ্যুতির ব্যাপারে তাড়াহুড়া করেন তাহলে বনূ উমাইয়া জনসাধারণকে এ বলে ধোঁকা দেবে যে, আমরা হযরত উসমান গনীর হত্যাকারীদের 'কিসাস' দাবী করছি যেমন মদীনার অধিবাসীরাও ঐ একই কথা বলছে। এভাবে জনসাধারণ তাদের দলে ভিড়ে যাবে। ফলে আপনার খিলাফতের ভিত্তি দুর্বল ও নড়বড়ে হয়ে উঠবে। একথা শুনে হযরত আলী (রা) বলেন, মুআবিয়াকে আমি তরবারির আঘাতেই শায়েস্তা করবো ; এ ব্যাপারে তাকে মোটেই খাতির করা হবে না। হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন, আপনি বীরোত্তম ব্যক্তি বটে, তবে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : اَلْحَرْبُ خَدْعَةٌ (যুদ্ধ একটা ধোঁকা ছাড়া কিছু নয়)।

যদি আপনি আমার কথা শোনেন তাহলে আমি আপনাকে এমন কৌশল বাতলে দেব যে, বনূ উমাইয়া শুধু চিন্তাভাবনা করতে থাকবে, কিন্তু আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। হযরত আলী (রা) বলেন, আমার মধ্যে না আপনার স্বভাব-চরিত্র রয়েছে, আর না মুআবিয়ার, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, আমার মতে তাই সঙ্গত যে, আপনি আপনার মাল-সামগ্রী নিয়ে ইয়ানবুর দিকে চলে যান এবং সেখানে গিয়ে দরজা বন্ধ করে থাকুন। আরবের লোক তখন উদভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়াবে, কিন্তু আমীর পদের জন্য আপনার মত যোগ্য লোক কোথাও পাবে না। আর যদি আপনি এ সমস্ত লোকদের (হযরত উসমান (রা)-এর হত্যাকারীদের) সাথে উঠাবসা করেন তাহলে লোকেরা আপনার উপর হযরত উসমান (রা)-কে হত্যার অভিযোগ উত্থাপন করবে। হযরত আলী (রা) তখন বলেন, আপনার একথা আমার কাছে যুক্তিসঙ্গত মনে হচ্ছে না বরং আমার কথাই আপনার মানা উচিত। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) তখন বলেন, নিঃসন্দেহে তাই আমার জন্য উচিত যে, আমি আপনারই নির্দেশ পালন করব। তখন হযরত আলী (রা) বলেন, আমি আপনাকে সিরিয়ার গভর্নর করে পাঠাতে চাই। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, মুআবিয়া হচ্ছে হযরত উসমান (রা)-এর নিকটতম আত্মীয় আর আমি হচ্ছি আপনার নিকটতম আত্মীয়। কাজেই, সে (মুআবিয়া) সিরিয়ায় দাখিল হওয়ার সাথে সাথে আমাকে হয় হত্যা করবে নয়ত বন্দী করে রাখবে। তাই মুআবিয়ার কাছে

চিঠিপত্র লিখে কোন না কোনভাবে তার বায়'আত গ্রহণ করাই এখন যুক্তিসঙ্গত। হযরত আলী (রা) এ কথা মানতে অস্বীকার করেন। অপর দিকে হযরত মুগীরা ইব্ন শুবাহ্ যখন দেখলেন যে, হযরত আলী (রা) তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী চলবেন না, এমনকি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর পরামর্শও তিনি রদ করে দিয়েছেন, তখন তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে মদীনা শরীফ থেকে চলে যান।

কর্মকর্তা ও প্রশাসক নিয়োগ

হযরত আলী (রা) উসমান ইব্ন হানীফকে মক্কা শরীফে, আম্মারা ইব্ন শিহাবকে কূফাতে, উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাসকে ইয়ামনে, কায়স ইব্ন সা'দকে মিসরে এবং সাহল ইব্ন হানীফকে সিরিয়ায় কর্মকর্তা বা প্রশাসক নিয়োগ করে পাঠান। উসমান ইব্ন হানীফ যখন বসরায় পৌঁছেন তখন কিছু লোক তাঁকে কর্মকর্তা বা হাকিম হিসাবে মেনে নেয়। আবার কিছু লোক বলে, আমরা আপতত চুপচাপ থাকব। আগামীতে মদীনা শরীফের অধিবাসিগণ যে কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করবে, আমরাও তাই মেনে চলব। কূফার দিকে আম্মারা ইব্ন শিহাবকে পাঠানো হয়েছিল। পথিমধ্যে তুলায়হা ইব্ন খুওয়ায়লিদের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তুলায়হা আম্মারাকে বলেন, তাই সঙ্গত যে, তুমি এখান থেকে ফিরে যাও। কেননা, কূফাবাসীরা আবূ মূসার পরিবর্তে অন্য কোন কর্মকর্তাকে মেনে নিতে রাযী হবে না। এবার যদি তুমি আমার কথা না মান, তাহলে আমি তোমার গর্দান উড়িয়ে দেব। এ কথা শুনে আম্মারা চুপচাপ মদীনা শরীফের দিকে ফিরে আসেন। উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস ইয়ামনে প্রবেশ করার পূর্বেই সেখানকার প্রাক্তন কর্মকর্তা ইউআন্না ইবন মুনাব্বিহ মদীনা শরীফের দিকে রওয়ানা হয়ে গিয়েছিলেন। তাই উবায়দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস নির্বিঘ্নে ইয়ামনের শাসনভার নিজ হাতে তুলে নেন। কায়স ইব্ন সা'দ যখন মিসরে পৌঁছেন, তখন সেখানকার কিছু লোক তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে এবং কিছু লোক চুপচাপ থাকে। আবার কিছু লোক বলতে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের ভাইরা (বিক্ষোভকারীরা) মদীনা শরীফ থেকে মিসরে ফিরে না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা কিছু করতে চাই না। সুহায়ল ইব্ন হানীফ সিরিয়ার দিকে যাচ্ছিলেন। তাবূক পৌঁছার পর কয়েকজন অশ্বারোহীর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। অশ্বারোহীরা জিজ্ঞেস করে, তুমি কে? সুহায়ল উত্তর দেন, আমি আমীর নিযুক্ত হয়ে সিরিয়ায় যাচ্ছি। তারা বললো, তোমাকে উসমান ছাড়া অন্য কেউ যদি আমীর নিযুক্ত করে পাঠিয়ে থাকে, তাহলে তোমার জন্য মঙ্গলজনক যে, তুমি এখান থেকেই মদীনা শরীফের দিকে ফিরে যাও। একথা শুনে সুহায়ল মদীনা শরীফের দিকে ফিরে আসেন। তিনি যখন মদীনা শরীফে প্রবেশ করেন তখন তার সাথে সাথে আরো কয়েকজন কর্মকর্তাও মদীনা শরীফে এসে পৌঁছেন। জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ বাজালী হযরত উসমান (রা)-এর শাহাদতের মুহূর্তে হামাদানের কর্মকর্তা ছিলেন। হযরত আলী (রা) তাকে লিখেন, 'তুমি তোমার প্রদেশবাসীদের বায়'আত নিয়ে আমার কাছে চলে আস। তিনি সে নির্দেশ পালন করে মদীনা শরীফে চলে আসেন।

হযরত আমীরে মুআবিয়া (রা) আত্মপক্ষ সমর্থন

হযরত আলী (রা) মা'বাদ আসলামীর মাধ্যমে আবূ মূসা আশআরী (রা)-এর কাছে একটি পত্র প্রেরণ করেন। ঐ পত্রের উত্তরে আবূ মূসা (রা) লিখেন ঃ কুফাবাসীরা আমার হাতে বায়'আত করেছে, অধিকাংশ লোক তা করেছে সন্তুষ্টচিত্তে ও আগ্রহভরে, তবে কিছু লোক

অনিচ্ছার সাথে। যখন কূফায় আবূ মূসার নামে পত্র প্রেরণ করা হয় ঠিক একই সময় জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ এবং সাবযা জাহ্মীর অপর একটি পত্র প্রেরণ করা হয় আমীর মুআবিয়ার নামে দামিশকে। কিন্তু সুদীর্ঘ তিন মাস পর্যন্ত সেখান থেকে কোন উত্তর পাওয়া যায় নি। হযরত আমীরে মুআবিয়া (রা) কয়েক মাস পর্যন্ত পত্রবাহককে অপেক্ষমাণ রাখেন। অতঃপর সীলমোহরকৃত একটি পত্র আপন পত্রবাহক কাবীসা আবসীর হাতে দিয়ে জারীর ইব্ন আবদুল্লাহর সাথে মদীনায় প্রেরণ করেন। পত্রের খামে স্পষ্টাক্ষরে হযরত আলীর নাম-ঠিকানা লেখা ছিল (من معاوية إلى علي)। পত্রটি নিয়ে বাহকদ্বয় হিজরী ৩৬ সনের রবীউল আউয়াল মাসের শেষ দিকে মদীনায় পৌঁছেন। মুআবিয়া (রা)-এর পত্রবাহক হযরত আলী (রা)-এর দরবারে হাযির হয়ে পত্রটি তাঁর কাছে হস্তান্তর করেন। হযরত আলী (রা) খাম খুলে দেখতে পান এর ভিতরে কোন পত্র নেই। তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে পত্রবাহকের দিকে তাকান। পত্রবাহক বলেন, আমি পত্রবাহক মাত্র ; আমি আমার প্রাণের নিরাপত্তা চাই। আলী (রা) বলেন, হাঁ, তুমি অবশ্যই নিরাপত্তা পাবে। এরপর পত্রবাহক বললো, সিরিয়ার কেউই আপনার হাতে বায়'আত করবে না। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, ৬০ হাজার গণ্যমান্য ব্যক্তি হযরত উসমান (রা)-এর রক্তমাখা জামা নিয়ে অঝোরে কাঁদছে। মানুষকে উত্তেজিত করার উদ্দেশ্যে ঐ জামা দামিশকের জামে মসজিদের মিম্বরের উপর রাখা হয়েছে। আলী (রা) তখন বললেন, 'ঐ সমস্ত লোক আমার থেকে উসমান হত্যার বদলা নিতে চাচ্ছে, অথচ আমি উসমান হত্যার সাথে কোন ভাবেই জড়িত নই। আল্লাহ উসমানের হত্যাকারীদের বিচার করুন।' এই বলে তিনি পত্রবাহককে মুআবিয়ার কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন।

সাবাঈদের গোমরাহী

বিদ্রোহীরা ও সাবাঈরা ঐ দূতকে গালিগালাজ করে এবং তাকে প্রহার করতে চায়। কিন্তু কয়েকজন মদীনাবাসী তাকে ঐ নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করেন এবং সে দামিশকে ফিরে যায়। বিদ্রোহীদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্র বিরুদ্ধেও এই অভিযোগ উত্থাপন করে যে আমীর মুআবিয়ার সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকায় সে দীর্ঘদিন সিরিয়ায় অবস্থান করেছে এবং যথাসময়ে সেখান থেকে ফিরে আসে নি। জারীর এ অভিযোগ শ্রবণ করে অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং ফারকীসা শহরের দিকে চলে যান। আমীর মুআবিয়ার কাছে এই সংবাদ পৌঁছলে তিনি ফারকীসায় আপন দূত পাঠিয়ে জারীরকে এক রকম জোর করেই সেখান থেকে নিজের কাছে নিয়ে আসেন।

সিরিয়া আক্রমণের প্রস্তুতি

মদীনাবাসীরা যখন আমীরে মুআবিয়া (রা) ও হযরত আলী (রা)-এর দূতদের আসা-যাওয়া এবং তাদের মধ্যকার সম্পর্ক উত্তপ্ত হওয়ার ব্যাপারটি লক্ষ্য করে তখন তারা এই ভেবে চিন্তিত হয়ে পড়ে যে, মুসলমানদের মধ্যে হয়ত আরো 'একটি' ভয়ানক রক্তক্ষয়ী ব্যাপার ঘটে যাবে। তারা এ সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানার জন্য যিয়াদ ইবন হানযালাকে সরাসরি হযরত আলী (রা)-এর কাছে পাঠায়। যিয়াদ হযরত আলীর সাথে সাক্ষাৎ করলে তিনি প্রসঙ্গক্রমে তাকেও বলেন, হাঁ যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়ে যাও। যিয়াদ প্রশ্ন করেন, কি জন্য এই যুদ্ধ ? আলী (রা) বলেন, সিরিয়ায় আক্রমণ পরিচালনার জন্য। যিয়াদ নিবেদন করেন, এরূপ পরিস্থিতিতে নম্র ও

দয়ার্দ্র ব্যবহারই তো উত্তম। আলী (রা) বলেন, না শাস্তিই বিদ্রোহীদের প্রাপ্য। মদীনাবাসীরা যখন জানতে পারল যে, হযরত আলী (রা) অচিরেই সিরিয়া আক্রমণ করবেন তখন হযরত তালহা ও হযরত যুবায়র (রা) হযরত আলীর সাথে সাক্ষাত করে নিবেদন করলেন : আমরা উমরা পালনের উদ্দেশ্যে পবিত্র মক্কায় যেতে চাই। অতএব আমাদের যাওয়ার অনুমতি দিন। হযরত আলী (রা) তাঁদের মদীনায় বেশি দিন রুখে রাখা তথা নযরবন্দী করে রাখা অসমীচীন মনে করে মক্কা গমনের অনুমতি দেন। তারপর তিনি মদীনায় এই মর্মে একটি সাধারণ ঘোষণা দেন যে, সিরিয়ায় আক্রমণ পরিচালনার জন্য সবাই যেন অস্ত্রশস্ত্র ও রসদপত্র নিয়ে তৈরি থাকে। তারপর তিনি বসরায় উসমান ইব্ন হানীফের কাছে, কূফায় আবূ মূসার কাছে এবং মিসরে কায়স ইব্ন সা'দের কাছে পত্র পাঠিয়ে নির্দেশ দেন : তোমরা যথাসম্ভব তোমাদের শক্তি ও প্রভাব খাটিয়ে সৈন্য সংগ্রহ করো এবং তলব করার সাথে সাথে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

মুসলমানদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ

মদীনাবাসীর অধিকাংশ হযরত আলী (রা)-এর নির্দেশ অনুযায়ী যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করলে তিনি কুছাম ইব্ন আব্বাস (রা)-কে মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত প্রশাসক নিয়োগ করেন এবং আপন পুত্র মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়া (রা)-এর হাতে সেনাবাহিনীর পতাকা তুলে দেন। তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা)-কে ডান পাশের বাহিনীর (মায়মানা), আমর ইব্ন আবী সালমাকে বামপার্শ্বের বাহিনীর এবং আবূ উবায়দা ইব্নুল জাররাহ্র ভাই আবূ লায়লা ইব্নুল জাররাহকে সম্মুখবর্তী বাহিনীর (মুকাদ্দিমাতুল জায়শ) অধিনায়ক নিয়োগ করেন। তিনি এ ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেন যাতে বিদ্রোহীদের কেউ (যাদের বেশীর ভাগ লোক তখনো মদীনায় অবস্থান করছিল।) সেনাবাহিনীর কোন অংশের অধিনায়কত্ব না পায়। এভাবে হযরত আলী (রা) তাঁর বাহিনীর বিভিন্ন অংশের অধিনায়কত্ব বন্টন করেন। কিন্তু বাহিনীটি তখনো মদীনা থেকে রওয়ানাই হয়নি। এমনি সময়ে মক্কার দিক থেকে সংবাদ এল যে, সেখানে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতি চলছে। এই সংবাদ পাওয়া মাত্র হযরত আলী (রা) সিরিয়া আক্রমণের সংকল্প তখনকার মত মুলতবি করেন।

মক্কায় উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা)-এর যুদ্ধ প্রস্তুতি

যেমন উপরে বর্ণিত হয়েছে, উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা) হজ্জ সমাপনান্তে মক্কা থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করছিলেন। তিনি সারিফ নামক স্থানে পৌঁছলে হযরত উসমান গনী (রা)-এর শাহাদত বরণের সংবাদ পান এবং সেখান থেকেই পুনরায় মক্কায় ফিরে যান। তাঁর কাছে এই সংবাদও পৌঁছে যে, মদীনার লোকেরা খলীফা হিসাবে হযরত আলী (রা)-এর হাতে বায়'আত করেছেন। তাঁর মক্কায় ফিরে যাওয়ার কারণ জানার জন্য লোকেরা তাঁর সওয়ারীর চারপাশে সমবেত হলে তিনি সবাইকে সম্বোধন করে বলেন : "আল্লাহর কসম! উসমান (রা)-কে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে এবং আমি এই হত্যার প্রতিশোধ নেব। আক্ষেপের বিষয়, আগত লোকেরা ক্রীতদাসদের সাথে একজোট হয়ে এই বিদ্রোহ করেছে। তারা এইজন্য হযরত উসমান (রা)-কে বিরোধিতা করেছে যে, তিনি যুবক বয়সের লোকদের আমিল গভর্নর নিয়োগ করেছেন। অথচ প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তাঁর পূর্ববর্তীরাও অনুরূপ করেছিলেন। ঐ বিদ্রোহীরা নিজেদের দাবীর অনুকূলে প্রমাণ পেশ করতে অপারগ হয়ে হযরত উসমান (রা)-এর শত্রুতায় বদ্ধপরিকর হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা যে রক্তপাত হারাম করেছেন

তারা তা প্রতিহত করেছে, যে শহরকে আল্লাহ্ তা'আলা আপন রাসূল (সা)-এর হিজরত স্থল বানিয়েছিলেন সে শহরেই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে এবং যে মাসে রক্তপাত তথা যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল সে মাসেই রক্তপাত করেছে, যে সম্পদ গ্রহণ করা তাদের জন্য অবৈধ ছিল তারা তা ছিনিয়ে নিয়েছে। আল্লাহ্র কসম ! উসমান (রা)-এর একটি অঙ্গুলীও এই দাঙ্গাবাজ গোষ্ঠী তথা সমগ্র বিশ্বের চাইতেও শ্রেষ্ঠ। যে ত্রুটি-বিচ্যুতির অজুহাতে ওরা হযরত উসমান (রা)-এর শত্রুতে পরিণত হয়েছিল তিনি তা থেকে পবিত্র হয়ে গিয়েছিলেন ।

হযরত উসমান (রা)-এর পক্ষ থেকে মক্কার আমিল (গভর্নর) ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমির হাদরামী। তিনি হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা)-এর এই বক্তৃতা শুনে বলে উঠেন, সর্বাগ্রে আমি হযরত উসমান (রা)-এর হত্যার প্রতিশোধ নেব।

একথা শুনে বনূ উমাইয়ার লোকেরা, যারা হযরত উসমান (রা)-এর শাহাদত লাভের পর সবেমাত্র মক্কায় গিয়ে পৌঁছে ছিল, এক বাক্যে বলে উঠল, আমরা সবাই আপনার সাথে আছি। সাঈদ ইব্নুল 'আস, ওয়ালীদ ইব্ন উকবা প্রমুখও ছিলেন ঐ সমস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমির বসরা থেকে পদচ্যুত হয়ে মক্কার দিকেই আসেন। ইয়ালা ইব্ন মুনাব্বিহ আসেন ইয়ামন থেকে এবং সাথে করে নিয়ে আসেন ছয় শ' উট ও ছয় লক্ষ দীনার। এরপর প্রস্তাব গৃহীত হতে থাকে যে, অবশ্যই উসমান হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া হবে।

হযরত তালহা (রা) এবং যুবায়র (রা) মদীনা থেকে মক্কায় এসে পৌঁছলে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা) তাঁদের উভয়কে ডেকে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি কারণে ও কিভাবে মক্কা থেকে চলে এসেছ ? তাঁরা উভয়ে উত্তর দেন, মদীনার পুণ্যবান ও অভিজাত লোকদের উপর বেদুঈন এবং বিদ্রোহীরা প্রাধান্য বিস্তার করে ফেলেছে। আমরা তাদের ভয়ে এখানে পালিয়ে এসেছি। হযরত আয়িশা (রা) বলেন, তাহলে তো ওদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে আমাদের সাথে তোমাদেরও থাকা উচিত। তাঁরা উভয়েই নিজেদের আগ্রহ ও সম্মতির কথা তাঁকে জানান। মক্কাবাসীরা সকলেই হযরত আয়িশা (রা)-এর বাধ্য ও অনুগত ছিলেন। বসরার প্রাক্তন গভর্নর আবদুল্লাহ ইব্ন আমির, ইয়ামনের গভর্নর ইয়ালা এবং তালহা ও যুবায়র (রা) এ চারজনকে হযরত আয়িশা (রা)-এর সেনাবাহিনীর অধিনায়ক এবং সব ব্যাপারেই তাঁর উপদেষ্টা মনে করা হত। প্রথমে কেউ একজন পরামর্শ দিল : মক্কা থেকে রওয়ানা হয়ে মদীনাকে পাশ কাটিয়ে আমাদের সোজা সিরিয়ায় চলে যাওয়া উচিত। একথার উপর আবদুল্লাহ ইব্ন আমের বলেন, সিরিয়ায় আমীরে মুআবিয়া (রা) রয়েছেন এবং সেই দেশ সামাল দেওয়ার মত তাঁর যথেষ্ট ক্ষমতা ও যোগ্যতা রয়েছে। অতএব আমাদের এখান থেকে বসরার দিকে যাওয়া সমীচীন মনে হয়। সেখানে নিশ্চয়ই আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল অনেক লোক রয়েছে। আমিও সেখানে গভর্নর হিসাবে বেশ কিছুদিন অবস্থান করেছিলাম। তাছাড়া বসবাসীরা হযরত তালহা (রা)-এর প্রতি সবচাইতে বেশি সহানুভূতিশীল। অতএব বসরায় আমাদের সাফল্য সুনিশ্চিত। এভাবে একটি বিরাট প্রদেশ ও বিরাট জনগোষ্ঠী আমাদের হাতে আসবে। কেউ একজন বললো, আমরা মক্কায় থেকেই শত্রুদের মুকাবিলা করছি না কেন ? এর উত্তরে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমের বললেন, মক্কাবাসীদেরকে নিঃসন্দেহে আমরা আমাদের মতাবলম্বী করে নিয়েছি এবং তারা আমাদের পক্ষে রয়েছেন। কিন্তু আলী বাহিনী মদীনা থেকে এসে হামলা

করলে তা তারা প্রতিরোধ করতে পারবে না। আমরা যদি এখান থেকে আমাদের সামরিক শক্তি নিয়ে বসরার দিকে চলে যাই তাহলে মক্কাবাসীরাও আমাদের পক্ষে এসে যাবে। তখন আমাদের শক্তি অনেক বৃদ্ধি পাবে, আমরা যে কোন হামলা প্রতিরোধ করতে পারব এবং উসমান হত্যার বদলা নিতেও সক্ষম হব।

মোটকথা সকলেই এ মত সমর্থন করে। এবার বসরা যাত্রার প্রস্তুতি শুরু হল। এরপর সকলে এই সিদ্ধান্ত নিলেন যে, আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা), যিনি তখন মক্কায় অবস্থান করেছিলেন, তাঁকেও পক্ষে নিতে হবে এবং নেতৃত্ব তাঁর হাতেই সোপর্দ করতে হবে। যা হোক হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-কে ডেকে পাঠানো হল এবং তাঁর কাছে নিবেদন করা হল, আপনি উসমান হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করুন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) উত্তরে বলেন, আমি মদীনাবাসীদের সাথে রয়েছি। তারা যা করবে আমি তা-ই করব। তাঁর এই উত্তর শুনে কেউ এ নিয়ে তাঁর সাথে আর কথা কাটাকাটি করল না। হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা) ছাড়া অন্যান্য উম্মুল মু'মিনীন তখন মক্কায় অবস্থান করছিলেন। যখন তাঁরা শুনলেন, হযরত আয়িশা (রা) বসরা যেতে মনস্থ করেছেন তখন তাঁরাও তাঁর সাথে সেখানে যেতে মনস্থ করেন। হযরত হাফসা বিন্ত উমরও তাঁদের সাথে ছিলেন। তাঁর ভাই আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) তাঁকে বসরা যেতে নিষেধ করেন। ফলে তিনি মক্কায় থেকে যান। মুগীরা ইব্ন শু'বাও মক্কায় পৌঁছে গিয়েছিলেন এবং তিনিও বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান।

হযরত আয়িশা (রা)-এর মক্কা থেকে বসরা যাত্রা

আবদুল্লাহ ইব্ন আমির এবং ইয়ালা ইব্ন মুনাব্বিহ্ যথাক্রমে বসরা ও ইয়ামন থেকে প্রচুর অর্থ এবং রসদপত্র নিয়ে মক্কায় এসেছিলেন। অতএব তাঁরা হযরত আয়িশা (রা)-এর সফর সামগ্রীর প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। রওয়ানা হওয়ার পূর্বে সমগ্র মক্কা শহরে ঘোষণা দেওয়া হয় যে, হযরত আয়িশা, হযরত তালহা ও হযরত যুবায়র (রা) বসরা অভিমুখে রওয়ানা হচ্ছেন। অতএব যে ব্যক্তি ইসলাম-দরদী ও উসমান হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে ইচ্ছুক সে যেন তাঁদের সফরসঙ্গী হয়। তাকেও বাহন, সফর সামগ্রী ইত্যাদি দেওয়া হবে। মোটকথা, এভাবে পবিত্র মক্কা থেকে দেড় হাজার লোকের একটি বাহিনী বসরা অভিমুখে যাত্রা করে। ঠিক ঐ মুহূর্তে মারওয়ান ইবনুল হাকাম এবং সাঈদ ইব্নুল 'আসও মক্কায় আসেন এবং ঐ বাহিনীতে যোগ দেন।। মক্কা থেকে কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর চতুর্দিক থেকে দলে দলে লোক এসে তাঁদের সাথে যোগদান করতে থাকে এবং শীঘ্রই বাহিনীর সদস্য-সংখ্যা তিন হাজারে গিয়ে দাঁড়ায়।

উম্মুল ফাদল বিনত হারিছ এবং আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা)-ও ঐ বাহিনীতে ছিলেন। তাঁরা জুহায়না গোত্রের যুফার নামক জনৈক লোককে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে হযরত আলী (রা)-এর কাছে প্রেরণ করেন এবং একটি পত্রের মাধ্যমে ঐ বাহিনীর বসরা যাত্রার যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন। উম্মুহাতুল মু'মিনীনের মধ্যে যাঁরা হযরত আয়িশার সফরসঙ্গী হয়েছিলেন তাঁরা ইরাক পর্যন্ত আসার পর কাঁদতে কাঁদতে হযরত আয়িশা (রা)-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মদীনায় চলে যান।

যেমন ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, মারওয়ান ইবনুল হাকামও ঐ বাহিনীর সাথে ছিলো। এই মারওয়ান হযরত উসমান (রা)-কে বিভিন্ন অভিযোগের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করেছিলো। হযরত

উসমান (রা) মুসলমানদের সর্বসম্মত দাবী অনুযায়ী তাঁর কর্মপন্থা পরিবর্তন করতে চাইলে এই মারওয়ানই তাঁকে তা থেকে বিরত রাখেন। সাধারণ লোকেরা এই মারওয়ান ইব্নুল হাকামকেই ঘৃণা করত। হযরত উসমান (রা)-কে যখন ঘেরাও করা হয়েছিল তখন যদি তিনি বিদ্রোহীদের দাবী অনুযায়ী মারওয়ানকে তাদের হাতে সমর্পণ করতেন তাহলে তাঁর সাথে এই দুঃখজনক আচরণ কখনো করা হত না এবং তাঁকে শাহাদত বরণ করতেও হত না, বরং অতি সহজেই যাবতীয় বিবাদের মীমাংসা হয়ে যেত। কিন্তু তিনি মারওয়ানকে দাঙ্গাবাজদের হাতে সমর্পণ করেননি এই ভয়ে যে তারা তাকে নির্ঘাত হত্যা করবে।

মারওয়ান ইবনুল হাকাম সেই ব্যক্তি যাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন মিথ্যা কথনের কারণে মদীনা থেকে বের করে দিয়েছিলেন (এবং মহানবীর জীবদ্দশায় তাকে আর মদীনায় প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি)। মোটকথা, মারওয়ান ছিলো এক ধূর্ত ও ভয়ংকর ব্যক্তি। ঐ বাহিনীর সফর সঙ্গী হয়েও সে তার চিরাচরিত স্বভাববশত বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে লিপ্ত হয়। মক্কা থেকে রওয়ানা হওয়ার পর প্রথম সালাতের সময় হলে মারওয়ানই আযান দেয়, এরপর তালহা ও যুবায়র (রা)-এর কাছে এসে বলেন, আপনাদের দু'জনের মধ্যে কার উপর ইমামতির দায়িত্ব অর্পণ করা হবে ? তাঁরা উভয়ে কিছু বলার পূর্বেই আবদুল্লাহ্ ইবন যুবায়র (রা) বলেন, আমার পিতার উপর, ইবন তালহা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেন, আমার পিতার উপর। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা) এ বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হওয়ার সাথে সাথে মারওয়ানকে ডেকে পাঠান এবং বলেন, তুমি কি আমাদের কাজ লণ্ডভণ্ড করে দিতে চাচ্ছ ? ইমামত আমার বোনপুত্র ইবনুয যুবায়র করবে।

আরো কয়েক মনযিল অগ্রসর হওয়ার পর একদা মারওয়ান হযরত তালহা এবং যুবায়র (রা)-কে জিজ্ঞেস করল, যদি আপনারা জয়ী হন তাহলে কাকে খলীফা বানাবেন ? তাঁরা উত্তর দিলেন, জনসাধারণ আমাদের দু'জনের মধ্যে যাঁকে খলীফা নির্বাচন করবে সে-ই খলীফা হবে। একথা শুনে সাঈদ ইবনুল 'আস বলেন, তোমরা তো শুধু উসমান হত্যার বদলা নেবার জন্য বের হয়েছ। হযরত উসমান (রা)-এর পুত্রকেই খিলাফতের দায়িত্ব দেওয়া উচিত। হযরত তালহা ও যুবায়র বললেন, তুমি যদি অন্য কারো নাম প্রস্তাব করতে তাহলে না হয় বিবেচনা করা যেত। কিন্তু এটা কী করে সম্ভব যে, মুহাজিরদের প্রবীণ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের বাদ দিয়ে অল্প বয়স্ক একটি ছেলেকে খলীফা মনোনীত করা হবে ? সাঈদ বলল, যদি ব্যাপার তাই হয় তাহলে আমি তোমাদের সাথে নেই। একথা বলে তিনি সেখান থেকে ফিরে গেলেন। আবদুল্লাহ্ ইবন খালিদ ইবন উসায়দ এবং মুগীরা ইবন শু'বাও ফিরে গেলেন। তাদের সাথে সাকীফ গোত্রের অনেক লোকও ফিরে গেল। অগত্যা হযরত তালহা ও যুবায়র (রা) বাকী লোকদের নিয়ে সামনে অগ্রসর হলেন। ঘটনাচক্রে তাঁরা স্বপ্নকূপে (বিরে রুইয়া) উপনীত হলে কুকুরের দল ঘেউ ঘেউ শুরু করল। ঐ কুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে বলা হল, এটা স্বপ্নকূপ। এই নাম শোনার সাথে সাথে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা) বলেন, আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে চলো, আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে চলো। লোকেরা বলল, কেন ? তিনি উত্তর দিলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সহধর্মিণীদের সাথে বসা অবস্থায় বলেছিলেন : "হায়! আমি যদি জানতে পারতাম, তোমাদের মধ্যে কাকে দেখে স্বপ্নকূপের কুকুররা ঘেউ ঘেউ করবে ?" একথা বলে হযরত আয়িশা (রা) তাঁর উটের ঘাড়ে আঘাত করেন এবং সেখানেই তা বসিয়ে দেন। তিনি

একদিন এবং একরাত সেখানেই অবস্থান করেন এবং সমগ্র বাহিনীও তাঁর সাথে অবস্থান করে। হঠাৎ বাহিনীর মধ্যে এই চিৎকার উঠে, জলদি কর, আলী (রা) তোমাদের কাছে এসে পৌঁছে গেছেন। একথা শুনে সমগ্র বাহিনী বসরা অভিমুখে চলতে শুরু করে। হযরত আয়িশা (রা)-ও বাহিনীর সাথে রওয়ানা হন। কেননা ইতিপূর্বেই তাঁকে বলা হয়েছিল যে, ভুলবশত কেউ না কেউ এই কুয়াকে 'স্বপ্নের কুয়া' বলেছিল। প্রকৃতপক্ষে এটা তা নয় এবং এ পথে তা পড়তেও পারে না। এভাবেই স্বপ্নকুয়ার পাশে অবস্থানের পরিসমাপ্তি ঘটল।

বসরার গভর্নরের বিরোধিতা

হযরত আয়িশা (রা)-এর বাহিনী বসরার নিকটবর্তী হলে তিনি প্রথমে আবদুল্লাহ্ ইবন আমেরকে বসরাবাসীদের কাছে পাঠান। তিনি সেখানকার গণ্যমান্য লোকদের কাছে পত্রাদিও লিখেন এবং তার জবাবের অপেক্ষা করেন। বসরার তখনকার গভর্নর উসমান ইবন হুনায়ফ তাঁর আগমন সংবাদ জানতে পেরে বসরার গণ্যমান্য লোকদের একটি প্রতিনিধিদল তাঁর কাছে পাঠান। তারা উম্মুল মু'মিনীনের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর আগমনের কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, বিদ্রোহীরা এবং বিভিন্ন গোত্রের দুষ্কৃতিকারীরা এই হাঙ্গামার সৃষ্টি করেছে এবং তারা মুসলমানদের ঐক্য বিনষ্ট করে ইসলামের ক্ষতিসাধন করতে চাচ্ছে। আমি মুসলমানদের এই দল নিয়ে এজন্য বের হয়েছি যে, আমি জনসাধারণকে প্রকৃত ঘটনা অবহিত করব এবং তাদেরকে সংশোধন করব। মুসলমানদের সংশোধন ছাড়া আমার এই সফরের অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। বসরার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এরপর হযরত তালহা ও হযরত যুবায়র (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তাঁরা বলেন, আমরা হযরত উসমান হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য বের হয়েছি। এরপর বসরাবাসীরা প্রশ্নে করেন, আপনারা উভয়ে কি হযরত আলী ইবন আবী তালিব (রা)-এর হাতে বায়'আত করেন নি ? তাঁরা বলেন, আমরা বায়'আত করেছি, তবে এই শর্তে যে হযরত উসমান হত্যার প্রতিশোধ নিতে হবে। তাছাড়া যখন আমাদের কাছ থেকে বায়'আত গ্রহণ করা হয় তখন তরবারি আমাদের মাথার উপর ঝুলছিলো। এরপর বসরার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উসমান ইবন হুনায়ফের কাছে ফিরে যান এবং হযরত আয়িশা, তালহা ও যুবায়র (রা)-এর সাথে তাদের যে কথাবার্তা হয়েছে সে সম্পর্কে তাকে অবহিত করেন। উসমান ইবন হুনায়ফ তা শুনে বিস্মিত হন এবং অলক্ষ্যে বলে উঠেন :

انَّا لِلّٰهِ وَانَّا الَيْهِ رٰجِعُوْنَ

এরপর তিনি বসরার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের জিজ্ঞেস করেন, এখন আপনাদের ইচ্ছা কি ? তারা বলেন, চুপচাপ থাকুন। উসমান বলেন, আমি তাঁদের প্রতিরোধ করব যতক্ষণ না হযরত আলী (রা) এখানে এসে পৌঁছেন। তারপর বসরার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা নিজ নিজ বাড়িতে গিয়ে চুপচাপ থাকেন। এবার উসমান এই মর্মে ঘোষণা দেন যে, সমগ্র বসরাবাসী যেন অবিলম্বে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং মসজিদে এসে সমবেত হলে উসমান ইবন হুনায়ফ বসরার কায়স নামীয় জনৈক ব্যক্তিকে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য দাঁড় করান। সে বলতে লাগলো, লোকেরা! যদি তালহা, যুবায়র এবং তাঁদের সঙ্গীরা এখানে তাদের প্রাণের নিরাপত্তার জন্য এসে থাকেন তাহলে এটা সম্পূর্ণ ভুল। কেননা মক্কায় সামান্য একটি পাখিরও প্রাণের নিরাপত্তা রয়েছে।

সেখানে কেউ কাউকে কষ্ট দিতে পারে না। আর যদি তাঁরা উসমান হত্যার বদলা নেবার জন্য এসে থাকেন তাহলে আমরা তো হযরত উসমান (রা)-এর হত্যাকারী নই। অতএব এটাই সমীচীন যে, তাঁরা যেদিক থেকে এসেছে তোমরা তাদেরকে সেদিকেই ফিরিয়ে দাও। এ বক্তৃতা শুনে আসওয়াদ ইবন সুরায় আস-সাদী দাঁড়িয়ে বললেন, এরা আমাদের উসমান (রা)-এর হত্যাকারী ভেবে এখানে আসেনি, বরং তাঁর হত্যাকারীদের মুকাবিলা করার জন্য আমাদের সাহায্য চাইতে এসেছে। একথা শুনে লোকেরা উল্লিখিত কায়সের উপর কংকর নিক্ষেপ করতে শুরু করে। ফলে মসজিদের ঐ সভা পণ্ড হয়ে যায়। উসমান ইবন হুনায়ফ বুঝতে পারেন যে, বসরায়ও তালহা এবং যুবায়র (রা)-এর প্রতি সহানুভূতিশীল এবং তাঁদের সাহায্যকারী লোক রয়েছে।

সম্মুখসমরের আয়োজন

হযরত আয়িশা (রা) তাঁর বাহিনী নিয়ে 'মারুব' নামক স্থানে উপনীত হলে উসমান ইবন হুনায়ফ তার বাহিনী নিয়ে বসরা থেকে বের হন এবং সম্মুখযুদ্ধের জন্য তাদেরকে সারিবদ্ধ করেন। হযরত আয়িশা (রা)-এর ডান পাশের বাহিনীর অধিনায়কত্বে ছিলেন হযরত তালহা (রা) এবং বাম পাশের বাহিনীর অধিনায়কত্বে ছিলেন হযরত যুবায়র (রা)। যখন উভয় বাহিনী একে অন্যের মুখামুখি হয়ে দাঁড়াল তখন প্রথমে ডান পাশের বাহিনী থেকে হযরত তালহা বের হন এবং আল্লাহর প্রশংসা ও রাসূলের উপর দরূদ পাঠ করার পর হযরত উসমান (রা)-এর গুণাবলী বর্ণনা করেন এবং তাঁর হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সকলকে উৎসাহিত করেন। তারপর বাম পাশের বাহিনী থেকে হযরত যুবায়র বের হন এবং প্রকাশ্যে হযরত তালহা (রা)-এর বক্তৃতা সমর্থন করেন। এরপর হযরত উম্মুল মু'মিনীন সকলকে সম্বোধন করে বিভিন্ন উপদেশ দেন। উম্মুল মু'মিনীনের বক্তৃতা শুনে উসমান ইবন হুনায়ফের সৈন্যরা তৎক্ষণাৎ দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তাদের একদল তো উসমানের নেতৃত্বে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত ছিল এবং অপর দল তালহা ও যুবায়র (রা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অসমীচীন মনে করে। হযরত উম্মুল মু'মিনীন এবং হযরত তালহা ও যুবায়র (রা) যখন দেখলেন, স্বয়ং উসমান বাহিনীর মধ্যে দলাদলি সৃষ্টি হয়েছে তখন তাঁরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এসে নিজ নিজ তাঁবুতে অবস্থান করতে থাকেন। কিন্তু উসমান ইবন হুনায়ফ নিজ সৈন্যদের নিয়ে মুকাবিলার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করেন। উপরন্তু তিনি জারিয়া ইবন কুদামিয়াকে উম্মুল মু'মিনীনের কাছে পাঠান! জারিয়া এসে বললো, হে উম্মুল মু'মিনীন! আপনার এই অভিশপ্ত উটে আরোহণ করে আগমনের চেয়ে উসমান গনী (রা)-এর হত্যাকাণ্ড বরং ভাল ছিল। আপনার জন্য আল্লাহ্ পর্দার যে নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন আপনি তা ভঙ্গ করছেন। আপনি নিজের ইচ্ছায় এখানে এসে থাকলে অবিলম্বে মদীনায় ফিরে যান। আর কেউ জোর করে আপনাকে এখানে নিয়ে এসে থাকলে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করুন এবং লোকদেরকে নিজ নিজ ঘরে ফিরে যাওয়ার আদেশ দিন। তার এই বক্তৃতা শেষ হয়নি এমনি সময় হাকীম ইবন জাবালা উম্মুল মু'মিনীনের বাহিনীর উপর হামলা করে বসে। উম্মুল মু'মিনীনের বাহিনী সে হামলা প্রতিরোধ করে। কিন্তু রাত ঘনিয়ে আসার কারণে সেদিনকার মত যুদ্ধ স্থগিত থাকে। পরদিন ভোর বেলা উভয় পক্ষের মধ্যে পুনরায় যুদ্ধ শুরু হয় এবং হাকীম ইবন জাবালা নিহত হয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে, উসমান ইবন হুনায়ফ শেষ পর্যন্ত পরাজিত হন এবং বসরার উপর তালহা ও যুবায়র

(রা)-এর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। উসমান ইবন হুনায়ফকে গ্রেফতার করে তালহা ও যুবায়র (রা)-এর কাছে নিয়ে আসা হলে তারা তা উম্মুল মু'মিনীনকে অবহিত করেন। উম্মুল মু'মিনীন উসমানকে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। উসমান সেখান থেকে ছাড়া পেয়ে হযরত আলী (রা)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য সোজা মদীনা রওয়ানা হন। বসরা হযরত তালহা, যুবায়র ও উম্মুল মু'মিনীন (রা)-এর দখলে চলে আসলেও সেখানে পক্ষ-বিপক্ষ শত্রু-মিত্র উভয় ধরনের লোকই বিদ্যমান ছিল।

হযরত আলী (রা)-এর বসরা যাত্রা

হযরত আলী (রা) যখন জানতে পারলেন মক্কাবাসীরা তাঁর বিরুদ্ধে প্রস্তুতি নিচ্ছে তখন তিনি তাঁর সিরিয়া যাত্রার পরিকল্পনা মুলতবি রাখেন। এরপর তাঁর কাছে সংবাদ পৌছে যে, হযরত আয়িশা, যুবায়র ও তালহা (রা) সৈন্যবাহিনী নিয়ে মক্কা থেকে বসরার দিকে রওয়ানা হয়ে গেছেন। এতে তিনি মর্মাহত হন। তিনি সমগ্র মদীনাবাসীর সাহায্য কামনা করেন। জুমুআর ভাষণে তিনি জনসাধারণকে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে বলেন। মদীনাবাসীদের কাছে এটা খুবই অসহনীয় ঠেকছিল যে, তাদেরকে এবার আয়িশা, তালহা ও যুবায়র (রা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। কিন্তু হযরত আবুল হায়সাম বদরী, যিয়াদ ইব্‌ন হানযালা, খুযায়মা ইব্‌ন ছাবিত (রা) প্রমুখ সাহাবী এ ব্যাপারে তাঁদের সম্মতি প্রকাশ করলে অন্যান্য লোকও তাতে সম্মত হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত হিজরী ৩৬ সনের রবীউল আউয়াল মাসের শেষ দিকে হযরত আলী (রা) মদীনা থেকে বসরা অভিমুখে রওয়ানা হন। মদীনায় অবস্থানরত কূফা ও মিসরের লোকেরাও তাঁর সফরসঙ্গী হয়।

ইয়াহূদী মুনাফিক আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাবা

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাবাও নিজ সঙ্গী-সাথীসহ হযরত আলী (রা)-এর বাহিনীতে যোগদান করেছিল। আলী (রা) যখন মদীনা থেকে রওয়ানা হন ঠিক তখনি হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম (রা)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম (রা) আলী (রা)-এর ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরেন এবং তাঁকে বলেন, 'হে আমীরুল মু'মিনীন ! আপনি মদীনা ছেড়ে যাবেন না। আল্লাহর কসম ! যদি আপনি এখান থেকে চলে যান তবে মুসলমানদের আমীর আর কখনো এখানে ফিরে আসবে না। লোকেরা তখন গালি-গালাজ করতে করতে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম (রা)-কে তাড়া করে। কিন্তু হযরত আলী (রা) তাদের বলেন, তাঁকে ছেড়ে দাও। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীদের মধ্যে তিনি একজন গণ্যমান্য লোক। এরপর হযরত আলী অগ্রসর হয়ে 'যীযায়' নামক স্থান উপনীত হন এবং সেখানেই সংবাদ পান যে, তালহা ও যুবায়র (রা) বসরায় প্রবেশ করেছেন।

হযরত আলী 'যীযায়' অবস্থান করেন এবং সেখান থেকেই দেশের বিভিন্ন প্রদেশ ও রাজ্যের জনসাধারণের কাছে নির্দেশাদি পাঠান। তিনি মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর ও মুহাম্মদ ইব্‌ন জাফর (রা)-কে কূফায় প্রেরণ করেন যাতে তারা সেখানকার লোকদের একত্রিত করে যীযায় নিয়ে আসেন। আর যীযায় যেসব লোক অবস্থান করছিল তিনি তাদের প্রশিক্ষণ দিতে থাকেন। কয়েকদিন পর মদীনা থেকে তিনি তাঁর রসদপত্র ও বাহন ইত্যাদি নিয়ে আসার ব্যবস্থা করে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার সংকল্প করেন। যেহেতু সাধারণ লোকের কাছে হযরত তালহা ও যুবায়র

(রা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা একটি অপসন্দনীয় ব্যাপার ছিল তাই হযরত আলী (রা) বলেন, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁদের উপর হামলা করব না যতক্ষণ না তাঁরা আমার উপর হামলা করে। আমি যথাসম্ভব বুঝিয়ে তাদের সঠিক পথে নিয়ে আসারই চেষ্টা করব। হযরত আলী (রা) যীযাহ থেকে রওয়ানা হচ্ছিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে 'তাঈ' গোত্রের একটি দল এসে তাঁর বাহিনীতে যোগদান করে। এজন্য তিনি তাদের প্রশংসা করেন। যীযাহ্ থেকে রওয়ানা হওয়ার সময় তিনি আমর ইবনুল জাররাহকে অগ্রবর্তী বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করেন। হযরত আলী (রা) যখন 'ফীদ' নামক স্থানে পৌঁছেন তখন 'তাঈ' ও 'আসাদ' গোত্রের কিছু লোক এসে তাঁর সহযোগী হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলো। তিনি বলেন, তোমরা তোমাদের অঙ্গীকারে সুদৃঢ় থাক, এটাই যথেষ্ট। যুদ্ধের জন্য তো আমার কাছে যথেষ্ট সংখ্যক মুহাজির রয়েছেন। ঐ স্থানেই কূফা থেকে আগত জনৈক ব্যক্তি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে। সে বলে, আবূ মূসা আশআরী (রা) সম্পর্কে আপনার ধারণা কি ? যদি আপনি আপোস রফার উদ্দেশ্যে বের হয়ে থাকেন, অর্থাৎ তালহা, যুবায়র প্রমুখের সাথে আপোস করতে চান তাহলে আবূ মূসা এ ক্ষেত্রে আপনার সহায়ক হবেন না। আলী (রা) বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ আমাদের উপর হামলা না করবে ততক্ষণ আমাদের যুদ্ধ করার কোন ইচ্ছা নেই। হযরত আলী 'ফীদ' থেকে রওয়ানা হয়ে সালাবিয়াহ' নামক স্থানে পৌঁছে সংবাদ পান যে, হাকীম ইব্‌ন জাবালা নিহত হয়েছেন। সেখানেই উসমান ইব্‌ন হুনায়ফ তাঁর কাছে এসে হাযির হন। আলী (রা) তাঁকে দেখে বলেন, তোমার উপর দিয়ে যে ভীষণ বিপদ গেছে তার পুরস্কার তুমি অবশ্যই পাবে।

তারপর হযরত আলী (রা) বলেন, তালহা ও যুবায়র তো প্রথমে আমার হাতে বায়'আত করেছিলেন। এরপর তাঁরা তাঁদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন। তাঁরা আবূ বকর, উমর ও উসমান (রা)-এর আনুগত্য করেছেন, অথচ আমার বিরোধিতা করছেন। হায়, যদি তাঁরা একথা জানতেন যে আমি তাঁদের (অন্য তিন খলীফা) থেকে পৃথক নই। -একথা বলে তিনি তালহা ও যুবায়রকে বদ দু'আ করেন।

মুহাম্মদদ্বয়ের কূফা যাত্রা

মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর ও মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর (রা)-কে আলী (রা) কূফায় প্রেরণ করেছিলেন। তাঁরা কূফায় পৌঁছে আলী (রা)-এর লেখা একটি পত্র আবূ মূসাকে দেন এবং আলী (রা)-এর নির্দেশ অনুযায়ী জনসাধারণকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। কিন্তু কেউ তাতে সাড়া দিল না। মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর অত্যন্ত জোরেসোরে তাদেরকে যুদ্ধের জন্য অনুপ্রাণিত করতে চেষ্টা করলে তারা বলে, দুনিয়ার রাস্তা হচ্ছে যুদ্ধের জন্য বের হওয়া, আর আখিরাতের রাস্তা হচ্ছে (যুদ্ধে না গিয়ে) ঘরে বসে থাকা। একথা বলে তারা স্থির হয়ে বসে রইলো। এটা দেখে মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর (রা) রাগান্বিত হন এবং আবূ মূসার সাথে কঠোর আচরণ করেন। আবূ মূসা তাঁদের দু'জনকে বলেন, হযরত উসমান গনী (রা)-এর বায়'আতের দায়-দায়িত্ব আমার ও আলী (রা)-এর ঘাড়ে রয়েছে। যদি যুদ্ধ একান্ত অপরিহার্য হয়েই থাকে তাহলে উসমান (রা)-এর হত্যাকারীরা যেখানেই অবস্থান করুক না কেন, সেখানেই তাদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে। শেষ পর্যন্ত তাঁরা উভয়ে নিরাশ হয়ে কূফা থেকে চলে আসেন এবং যীকার নামক স্থানে হযরত আলী (রা)-এর সাথে মিলিত হয়ে তাঁকে কূফার যাবতীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেন।

আশ্‌তার ও ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর কূফা যাত্রা

মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর তাঁদের মিশনে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসার পর আলী (রা) আশতার-কে সম্বোধন করে বলেন, তুমি ইব্‌ন আব্বাসকে সঙ্গে নিয়ে কূফায় যাও এবং আবূ মূসাকে যেভাবে পার বোঝাবার চেষ্টা কর। যা হোক তাঁরা উভয়ে কূফা যাত্রা করেন। সেখানে পৌঁছে তারা আবূ মূসাকে আসল পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করার চেষ্টা করেন এবং তাঁর কাছে সামরিক সাহায্য চান। কিন্তু আবূ মূসা আগাগোড়া একথাই বলতে থাকেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত বিশৃঙ্খলা প্রকাশিত না হয়, ততক্ষণ আমি নীরব (নিরপেক্ষ) থাকবো। শেষ পর্যন্ত আশতার ও ইব্‌ন আব্বাস নিরাশ হয়ে সেখান থেকে ফিরে আসেন এবং হযরত আলী (রা)-কে বলেন, আমাদের কোন কথাই আবূ মূসাকে প্রভাবিত করতে পারে নি।

আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির ও হাসান ইব্‌ন আলীর কূফা যাত্রা

আশতার ও ইব্‌ন আব্বাস ফিরে আসার পর আলী (রা) আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির এবং আপন পুত্র হাসান (রা)-কে কূফা প্রেরণ করেন। তাঁহার উভয়ের আগমন সংবাদ শুনে হযরত আবূ মূসা কূফা মসজিদে আসেন। তিনি হাসান ইব্‌ন আলী (রা)-এর সাথে গলাগলি করেন এবং আম্মার ইব্‌ন ইয়াসিরকে সম্বোধন করে বলেন, তুমি হযরত উসমান গনী (রা)-কে কোন সাহায্য কর নি, বরং দুষ্কৃতিকারীদের সাথে মিশে গিয়েছিলে। আম্মার উত্তরে বলেন, আমি তা করিনি। হযরত হাসান বলেন, লোকেরা এ ব্যাপারে আমাদের সাথে কোন পরামর্শ করেনি। আর এখন লোকদের সংশোধন করা ছাড়া আমাদের কোন উদ্দেশ্য নেই। আর আমীরুল মু'মিনীন (রা) উম্মতের সংশোধনমূলক কাজের ক্ষেত্রে কাউকেই ভয় করেন না। আবূ মূসা অত্যন্ত শিষ্টতার সাথে উত্তর দেন, আমার পিতামাতা আপনার উপর উৎসর্গ হোন, আপনি সত্যি কথাই বলেছেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে বলেছেন, শীঘ্রই ফিতনা ও বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়বে। আর ঐ অবস্থায় উপবিষ্ট ব্যক্তি দণ্ডায়মান ব্যক্তির চাইতে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হবে। তাছাড়া মুসলমান মাত্রই পরস্পর ভাই ভাই। তাদেরকে হত্যা করা এবং তাদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করা হারাম। আবূ মূসার ঐ সমস্ত কথায় আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা) এতই বিরক্ত হন যে, তিনি শেষ পর্যন্ত তাঁকে গালি দিয়ে বসেন। আবূ মূসা গালি শুনে চুপ হয়ে যান। কিন্তু উপস্থিত লোকজনের মধ্যে কেউ কেউ এর প্রত্যুত্তর দেয়। এরপর কথায় কথা বাড়ে এবং লোকেরা আম্মারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তখন আবূ মূসাই আম্মারকে রক্ষা করেন।

ঐ সময়ে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা) বসরা থেকে কূফাবাসীদের কাছে পত্রাদি পাঠান। সেগুলোতে তিনি লিখেছিলেন, এই মুহূর্তে তোমরা কাউকে সাহায্য করো না, বরং নিজ নিজ ঘরে চুপচাপ বসে থাক অথবা আমাদের সাহায্য কর। আমরা উসমান হত্যার প্রতিশোধ নিতে বের হয়েছি। এ বৈঠকেই যায়দ ইব্‌ন সূহান মসজিদের মধ্যে দাঁড়িয়ে হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা)-এর একটি পত্র সবাইকে পড়ে শোনায়। এজন্য সিবত ইব্‌ন রিবঈ তাকে গালি দিয়ে বসে। ফলে উপস্থিত লোকদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। লোকেরা প্রকাশ্যে হযরত উম্মুল মু'মিনীনকে সমর্থন করতে থাকে। আবূ মূসা (রা) উত্তেজনা প্রশমনের চেষ্টা করছিলেন এবং বলছিলেন, ফিতনা প্রশমিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা ঘরে বসে থাক, আমার আনুগত্য কর, আরবের টিলাসমূহের মতো এক একটি টিলায় পরিণত হও যাতে মজলুমরা

তোমাদের ছায়ায় এসে আশ্রয় নেয়। তোমাদের বর্শার অগ্রভাগ নত করে ফেল এবং নিজ নিজ তরবারি খাপে ভরে নাও।

এসব কথা শোনার সাথে সাথে যায়দ ইব্‌ন সূহান আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা)-এর সাহায্যের জন্য সকলকে অনুপ্রাণিত করতে থাকেন এবং একের পর এক কয়েক ব্যক্তি তার বক্তব্য সমর্থন করেন। অতঃপর আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির বলেন, লোক সকল ! হযরত আলী (রা) তোমাদেরকে ন্যায় ও সত্যের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তোমরা উঠ এবং তাঁর বাহিনীতে যোগদান কর। তারপর হযরত হাসান ইব্‌ন আলী (রা) বলেন, লোক সকল! আমাদের আহ্বানও গ্রহণ কর, আমাদের আনুগত্য কর এবং যে বিপদে তোমরা ও আমরা পতিত হয়েছি তা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য আমাদেরকে সাহায্য কর। আমীরুল মু'মিনীন বলেছেন, যদি আমরা মজলুম হই তাহলে তোমরা আমাদেরকে সাহায্য কর, আর যদি আমরা জালিম হই তাহলে তোমরা আমাদের থেকে যাবতীয় অধিকার কেড়ে নাও। তিনি এও বলেছেন, সর্বপ্রথম তালহা ও যুবায়রই আমার হাতে বায়'আত করেছেন, অথচ সর্বপ্রথম তাঁরাই অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছেন। হযরত হাসান ইব্‌ন আলীর বক্তৃতা জনসাধারণকে খুব প্রভাবিত করে এবং তারা হযরত আলীকে সমর্থনের কথা জানায়। আলী (রা) আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির এবং হাসানকে প্রেরণের পর পর আশতারকেও কূফায় প্রেরণ করেন। আশতার ঠিক সেই মুহূর্তে কূফায় গিয়ে পৌঁছে যখন হাসান ইব্‌ন আলী (রা) বক্তৃতা করছিলেন। আশতারের উপস্থিতির কারণে বিষয়টি আরো গুরুত্ব পায়। ফলে আবূ মূসা আশআরীর কথা আর কেউ শুনেনি। এতদসত্ত্বেও তিনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই অভিমতই ব্যক্ত করছিলেন যে, নির্জনবাস গ্রহণ কর এবং পক্ষপাতিত্ব ত্যাগ কর। মালিক আশতার কূফায় পৌঁছে বিভিন্ন গোত্রকে উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপারে অত্যন্ত কৃতিত্বের পরিচয় দেন। উপরন্তু তিনি আবূ মূসা আশআরীকে গভর্নর ভবন খালি করে দিতে বলেন।

যাহোক, হাসান (রা), আম্মার (রা) ও আশতার কূফা থেকে নয় হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী নিয়ে রওয়ানা হন। কূফাবাসীদের এই বাহিনী 'যীকার' নামক স্থানের নিকটবর্তী হলে হযরত আলী তাদেরকে অভ্যর্থনা জানান। এরপর তিনি তাদেরকে সম্বোধন করে বলেন, 'হে কূফাবাসী ! আমরা তোমাদের কষ্ট দিচ্ছি। তোমরাও আমাদের সাথে মিলে বসরাবাসীদের মুকাবিলা করবে। যদি তারা তাদের সংকল্প ত্যাগ করে তাহলে তো এর চাইতে ভাল আর কিছুই হতে পারে না। আর যদি তারা তাদের সংকল্পে অটল থাকে তাহলেও আমরা তাদের সাথে নম্র আচরণ করব যাতে আমাদের পক্ষ থেকে জুলুম বাড়াবাড়ির সূচনা না হয়। যে কাজেই ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকবে আমরা তা সংশোধন না করে ছাড়বো না। এই সমস্ত কথা শোনার উপর কূফাবাসীরাও আলী (রা)-এর যীকার নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে। পরদিন আলী (রা) কা'কা' ইব্‌ন আমর (রা)-কে বসরা প্রেরণ করেন। এই যীকার নামক স্থানেই বিখ্যাত তাবিঈ হযরত উয়ায়স আল কারনী (রহ) আলী (রা)-এর হাতে বায়'আত হন।

আপোস প্রচেষ্টা

আলী (রা) কা'কা' ইব্‌ন আমরকে বসরায় এজন্য প্রেরণ করেন যাতে তিনি সেখানে উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা, তালহা ও যুবায়র (রা)-এর সাথে ব্যক্তিগতভাবে আলাপ-আলোচনা করে

সেখানে তাদের আগমনের কারণ সম্পর্ক অবহিত হন এবং যথাসম্ভব বুঝিয়ে আপোস মীমাংসার মাধ্যমে তাঁদেরকে নতুনভাবে বায়'আতের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। কা'কা' ইব্‌ন আমর (রা) ছিলেন সুবক্তা, বিচক্ষণ ও অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহচর্য লাভে ধন্য। তিনি বসরায় পৌঁছে তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি আয়িশা (রা)-এর কাছে নিবেদন করেন : কোন্ বস্তুটি আপনাকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে? আর আপনার লক্ষ্যই বা কি? তিনি বলেন, আমার একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে মুসলমানদের সংস্কার সাধন এবং কুরআনের উপর আমল করার জন্য তাদেরকে অনুপ্রেরণা দান। হযরত তালহা এবং যুবায়র (রা)-ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁদেরও অনুরূপ প্রশ্ন করলে তাঁরাও ঠিক একই উত্তর দেন। একথা শুনে হযরত কা'কা' ইব্‌ন আমর (রা) বলেন, আপনাদের লক্ষ্য যদি সংশোধন ও কুরআনের উপর আমল করার জন্য মুসলমানদেরকে অনুপ্রেরণা দান হয়ে থাকে, তাহলে তো এভাবে তা অর্জন করা যাবে না, যেভাবে আপনারা চাচ্ছেন। তাঁরা বলেন, কুরআনে 'কিসাসের' হত্যার পরিবর্তে হত্যার নির্দেশ রয়েছে। আমরা উসমান হত্যার কিসাস নিতে চাই। কা'কা' (রা) বলেন, এভাবে তো কোথাও কিসাস নেওয়া হয় না। প্রথমে ইমামত ও খিলাফত কায়েম এবং তা সুদৃঢ় করা জরুরী যাতে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর উসমান হত্যাকারীদের থেকে তো সহজেই কিসাস নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু দেশে যখন আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত নেই তখন কিসের ভিত্তিতে কিসাস গ্রহণ করা হবে? দেখুন, আপনারা এই বসরায়ই বহু লোককে উসমান-হত্যার কিসাসে ইতিমধ্যে হত্যা করেছেন, কিন্তু হারকুস ইব্‌ন যুহায়রকে ধরতে পারেন নি। যখন আপনারা তার পশ্চাদ্ধাবন করেছেন তখন ছয় হাজার লোক তার পক্ষ নিয়ে আপনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে তৈরি হয়ে গেছে। ফলে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে আপনারা তার পশ্চাদ্ধাবন থেকে বিরত রয়েছেন। অনুরূপভাবে হযরত আলী (রা) যখন বিশৃঙ্খলা দমন ও অধিকতর শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে বাধ্য হয়ে সঙ্গে সঙ্গে 'কিসাস' নিতে সক্ষম হয় নি তখন আপনাদের আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা উচিত ছিল। এটা কি করে আপনাদের জন্য বৈধ হবে যে, আপনারা নিজেরাও নিয়ম-শৃঙ্খলা ভংগ করবেন? এভাবে তো শুধু বিশৃঙ্খলাই বাড়বে, মুসলমানদের মধ্যে আরো রক্তারক্তি হবে এবং এই সুযোগে উসমান (রা)-এর হত্যাকরীরাও 'কিসাস' থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে।

এই সমস্ত কথা বলার পর কা'কা' ইব্‌ন আমর অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় বলেন, হে মান্যবর ব্যক্তিবৃন্দ! এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় সংস্কারকর্ম হচ্ছে বিষয়টির আপোস রফা করা যাতে মুসলমানরা শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করতে পারে। আপনারা হচ্ছেন, শান্তিদূত হিদায়াতের বাহক। আপনারা আল্লাহর দিকে চেয়ে আমাদেরকে বিপদের মধ্যে ফেলবেন না। অন্যথায় আপনারাও বিপদে পতিত হবেন এবং এতে উম্মতে মুহাম্মাদীও ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

কা'কা'র এই কথায় উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা), তালহা ও যুবায়র (রা) অত্যন্ত প্রভাবান্বিত হন। তাঁরা বলেন, আপনার বক্তব্য অনুযায়ী যদি আলীর চিন্তাধারা এই হয় এবং তিনি যদি প্রকৃতই উসমানের হত্যাকারীদের থেকে কিসাস গ্রহণের ইচ্ছা রাখেন তাহলে তো যুদ্ধ ও বিরোধের কোন কারণই বাকী থাকে না। আমরা তো এতদিন যাবত মনে করে আসছিলাম, উসমানের হত্যাকারীদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি রয়েছে। তাই উসমানের হত্যাকারীরা তাঁর বাহিনীতে রয়েছে এবং তাঁর প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজেই হস্তক্ষেপ করছে। কা'কা' বলেন,

আমি যা কিছু বলেছি আলী (রা)-ও তাই চিন্তা করছেন। তাঁরা বলেন, তাহলে তো তাঁর সাথে আমাদের কোন বিরোধ নেই। এই কথোপকথনের পর কা'কা' (রা) বসরা থেকে বিদায় নিয়ে আলী (রা)-এর বাহিনীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। বসরার একদল প্রভাবশালী ব্যক্তিও তাঁর সফর সঙ্গী হন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল হযরত আলী এবং কূফাবাসীরা কি চিন্তা করছেন এবং তারা প্রকৃতই আপোস মীমাংসায় রাযী কিনা সে সম্পর্কে সরাসরি জ্ঞাত হওয়া। কেননা এই মর্মে একটি গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল যে, হযরত আলীর সংকল্প হচ্ছে, বসরা জয় করে সেখানকার যুবকদের হত্যা করা এবং শিশু ও স্ত্রীলোকদের দাসদাসীতে পরিণত করা। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাবার লোকেরা যারা হযরত আলীর বাহিনীতে ঢুকে পড়েছিল তারাই বসরায় এই গুজব রটনা করেছেন। কা'কা' ইব্‌ন আমর (রা) হযরত আলী (রা)-এর দরবারে হাযির হয়ে যাবতীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন এবং তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। এরপর বসরার প্রতিনিধিদল, যারা কা'কা'র সাথে এসেছিলেন কূফাবাসীদের সাথে, যারা আলী (রা)-এর বাহিনীতে যোগদান করেছিলেন, অবাধে মিলিত হয়ে তাদের মতামত জানতে চাইলে তারা সকলেই আপোস-নিষ্পত্তিকে অগ্রাধিকার দেন। এরপর হযরত আলী (রা)-ও ঐ প্রতিনিধিদলকে নিজের কাছে ডেকে তাদেরকে সর্বতোভাবে সান্ত্বনা প্রদান করেন। ফলে তারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট চিত্তে সেখান থেকে বসরায় ফিরে যায় এবং আপোস-নিষ্পত্তির প্রস্তাব যে সঠিক সে সম্পর্কে সকলকে অবহিত করে।

বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির ষড়যন্ত্র

আপোসরফার এই পটভূমি সৃষ্টি হওয়ার পর আলী (রা) সমগ্র বাহিনীকে একত্রিত করে বলিষ্ঠ ভাষায় একটি হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতা প্রদান করেন। এরপর তিনি নির্দেশ দেন, আগামীকাল আমরা বসরার দিকে যাত্রা করব। কিন্তু আমাদের এই যাত্রা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে নয়, বরং শুধু আপোসরফা ও যুদ্ধের আগুন নির্বাপনের উদ্দেশ্যে। সাথে সাথে তিনি এ নির্দেশ দেন, যে সমস্ত লোক উসমানকে ঘেরাও করেছিল বা ঐ কাজে শরীক ছিল তারা যেন আমাদের সাথে যাত্রা না করে বরং তারা যেন আমার বাহিনীর থেকে পৃথক হয়ে যায়। আলী (রা)-এর এই বক্তৃতা এবং নির্দেশ শুনে মিসরবাসীরা এবং তাদের নেতা আবদুল্লাহ্ ইবন সাবা অত্যন্ত চিন্তান্বিত হয়ে পড়ে।

আলী (রা)-এর বাহিনীতে ঐ ধরনের লোকের সংখ্যা মোটামুটি আড়াই হাজারের মত ছিল। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক প্রভাবশালী ও সুচতুর লোকও ছিল। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাবা তাদের নেতৃস্থানীয় লোকদের একটি বিশেষ বৈঠকে আহবান করে। ঐ বৈঠকে ইব্‌ন মুলজিম, আশতার এবং আশতারের বিশিষ্ট বন্ধুবান্ধব যেমন, উলিয়া ইব্‌ন হায়সাম, সালিম ইব্‌ন সা'লাবা, শুরায়হ্ ইব্‌ন আদানা প্রমুখ বিদ্রোহী অংশগ্রহণ করেছিলেন। তারা বলাবলি করতে থাকে, তালহা ও যুবায়র এখনো কিসাস গ্রহণে সংকল্পবদ্ধ। সম্প্রতি আমীরুল মু'মিনীনও তাঁদেরই অনুরূপ মত পোষণ করেছেন। আজ আমাদেরকে তাঁর বাহিনী থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যদি তাঁদের মধ্যে একটা আপোসরফা হয়ে যায় তাহলে তাঁরা একজোট হয়ে কিসাস গ্রহণ করবে এবং আমাদের সকলকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। আশতার বলে, প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তালহাই হোক বা যুবায়রই হোক অথবা আলী আমাদের সম্পর্কে তাঁরা সকলেই একমত। এখন যদি তাঁরা একটা আপোস-মীমাংসায় পৌঁছে যায় তাহলে

নিশ্চিতভাবে আমাদের হত্যা করবে। অতএব আমাদের উচিত তালহা, যুবায়র, আলী-এই তিনজনকেই উসমান (রা)-এর কাছে পৌঁছিয়ে দেয়া (হত্যা করা)। এরপর আপনা আপনি শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। ঐ বৈঠকের সভাপতি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাবা বলল, তোমাদের সংখ্যা অনেক কম। আলীর বাহিনীতে এই মুহূর্তে বিশ হাজার সৈন্য রয়েছে। অনুরূপভাবে বসরায় তালহা ও যুবায়রের সাথে কমপক্ষে ত্রিশ হাজার সৈন্য রয়েছে। এমতাবস্থায় আমাদের লক্ষ্য অর্জন করা খুবই কঠিন। সালিম ইব্‌ন সা'লাবা বলল, একটা আপোস-মীমাংসা হওয়া পর্যন্ত আমাদের উচিত দূরে কোথাও চলে যাওয়া। গুরায়হ বলে এই অভিমত দুর্বল ও অন্তঃসারশূন্য। তারপর প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ নিজ অভিমত ব্যক্ত করতে থাকে। ফলে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছা কঠিন হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত সকলেই আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাবাকে বলে, আপনি আপনার অভিমত ব্যক্ত করুন; হয়ত এর উপরই আমরা একমত হতে পারব। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাবা বললো, ভ্রাতৃবৃন্দ, আমাদের সকলেরই মঙ্গল এর মধ্যে নিহিত রয়েছে যে, আমরা হযরত আলী (রা)-এর বাহিনীতে মিশে থাকব এবং কখনো তা থেকে বিচ্ছিন্ন হব না। যদি তিনি একান্তই আমাদের তাঁর বাহিনী থেকে বের করে দেন তাহলেও আমরা তাঁর আশেপাশে অবস্থান করব, দূরে কোথায় চলে যাব না। উপরন্তু তাঁকে বলব, আমরা আপনার আশেপাশে থাকতে চাই এজন্য যে, যদি আপনি কোন আপোস-মীমাংসায় পৌঁছতে না পারেন এবং যুদ্ধ বেঁধে যায় তাহলে যথাসময়ে আমরাও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে আপনাকে সাহায্য করতে পারব। হযরত আলীর বাহিনীর সাথে অথবা তাদের সন্নিকটে থেকে আমাদেরকে এই চেষ্টা করতে হবে যে, যখন উভয় বাহিনী একে অন্যের নিকটবর্তী হবে তখন কোন না-কোন ভাবে যেন যুদ্ধ বেঁধে যায় এবং কোনরূপ আপোস-মীমাংসা হতে না পারে। আর এটা কঠিন কাজ নয়। শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষ যখন একে অন্যের বিরুদ্ধে লিপ্ত হবে তখন আমাদের আর দুশ্চিন্তার কোন কারণ থাকবে না।

উষ্ট্রের যুদ্ধ

ভোর বেলা হযরত আলী (রা) তাঁর বাহিনীকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন। বিদ্রোহীদের যে বাহিনী মদীনা থেকে হযরত আলীর সফরসঙ্গী হয়েছিল তাদের একটি অংশ তাঁর বাহিনীর সাথেই মিশে থাকে। পথিমধ্যে বকর ইব্‌ন ওয়ায়েল, আবদুল কায়স প্রভৃতি গোত্রের লোকেরাও আলীর বাহিনীতে যোগ দেয়। বসরার সন্নিকটে পৌঁছার পর আলী (রা) 'আসরে উবায়দুল্লাহ্'র মাঠে তাঁর তাঁবু খাটান। অপর দিকে হযরত আয়িশা, তালহা ও যুবায়র (রা) তাঁদের বাহিনীসহ একই মাঠে এসে অবস্থান গ্রহণ করেন। তিন দিন পর্যন্ত উভয় বাহিনী একদম চুপচাপ পরস্পর মুখামুখি হয়ে অবস্থান করে। ঐ সময়ে যুবায়র (রা)-এর কোন কোন সঙ্গী বলে, আমাদের যুদ্ধ শুরু করে দেওয়া উচিত। যুবায়র বলেন, কা'কা' ইব্‌ন আমরের মাধ্যমে আপোস-মীমাংসার আলাপ-আলোচনা চলছে। আমাদের উচিত, এর ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করা। আপোস-মীমাংসার কথাবার্তা চলাকালে বিপক্ষের উপর আক্রমণ পরিচালনা কোনভাবেই বৈধ নয়। আলী (রা)-এর কাছে তাঁর বাহিনীর কোন কোন লোক যুদ্ধ শুরু করে দেওয়ার দাবী জানায়। কিন্তু তিনিও একই কথা বলেন। একদা জনৈক ব্যক্তি আলী (রা)-কে জিজ্ঞেস করে, আপনি বসরার দিকে এসেছেন কেন। তিনি বলেন, বিশৃঙ্খলা দমন ও মুসলমানদের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের জন্য। সে বলে, বসরাবাসীরা যদি আপনার কথা না মানে এবং আপনার বিপক্ষ দলও

আপনার সাথে আপোস-মীমাংসায় না আসে তাহলে আপনি কি করবেন ? আলী (রা) বলেন, আমি তাদের প্রতিরোধ করব। ইতিমধ্যে একটি লোক বলে উঠে, তালহা, যুবায়র প্রমুখ বলে থাকেন, আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য বের হয়েছি। আপনার মতে কি তাঁদের কাছে উসমান হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের কোন প্রমাণ আছে ? সে আরো বলে, আপনার কাছেও কি এমন প্রমাণ আছে, যার ভিত্তিতে আপনি উসমান হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে বিলম্ব করছেন ? আলী (রা) উত্তরে বলেন, যখন কোন বিষয় সন্দেহজনক হয়ে পড়ে এবং প্রকৃত ঘটনা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায় তখন তাড়াহুড়া না করে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত। এরপর ঐ লোকটি জিজ্ঞেস করল, যদি আগামীকাল উভয় পক্ষ মুখামুখি হয়ে পড়ে এবং যুদ্ধ বেঁধে যায় তখন আমাদের এবং ওদের কি পরিণাম হবে। আলী (রা) বলেন, আমাদের এবং ওদের অর্থাৎ উভয় পক্ষের নিহত ব্যক্তিরা জান্নাতে যাবে।

এরপর আলী (রা) হাকাম ইব্‌ন সালাম এবং মালিক ইব্‌ন হাবীবের মাধ্যমে হযরত তালহা ও যুবায়রের কাছে এই মর্মে একটি অনুরোধবার্তা পাঠান : আপনারা যদি আপনাদের সেই সিদ্ধান্তে অটল থাকেন, যে সম্পর্কে কা'কা' ইব্‌ন আমর (রা) আমাকে অবহিত করেছেন তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত একটা কথা পাকাপাকি না হয়– আপনারা যুদ্ধ থেকে বিরত থাকুন। উত্তরে তালহা এবং যুবায়র (রা) বলেন, আপনি নিশ্চিত থাকুন, আমরা আমাদের সিদ্ধান্তে অটল রয়েছি। এরপর হযরত যুবায়র এবং হযরত তালহা (রা) তাঁদের বাহিনীর সম্মুখ সারি থেকে আগে বেড়ে দুই বাহিনীর মধ্যবর্তী স্থানে আসেন। তাঁদেরকে এই অবস্থায় দেখে হযরত আলী (রা) তাঁর বাহিনী থেকে বের হয়ে তাঁদের এতটুকু নিকটবর্তী হয়ে যান যে, তাঁদের একজনের ঘোড়ার মুখ অন্য জনের ঘোড়ার মুখ স্পর্শ করে। আলী (রা) প্রথমে তালহাকে সম্বোধন করে বলেন, তুমি শত্রুতা ও বিদ্বেষবশত এই বাহিনী সংগ্রহ করেছ এবং আমার সাথে মুকাবিলা করতে এসেছ। তুমি আল্লাহর কাছে কি এর কোন ওযর পেশ করতে পারবে এবং তোমার এই কাজকে বৈধ প্রমাণিত করতে পারবে ? আমি কি তোমার দীনী ভাই নই ? তোমার উপর কি আমার এবং আমার উপর কি তোমার রক্ত (অর্থাৎ পরস্পরকে হত্যা করা) হারাম নয়? তালহা (রা) উত্তরে বলেন, তুমি কি উসমান হত্যার ব্যাপারে ষড়যন্ত্র কর নি? আলী (রা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা সবই দেখেন এবং সবই জানেন এবং তিনি উসমান হত্যাকারীদের যথোপযুক্ত শাস্তি দেবেন। হে তাল্‌হা! তুমি কি আমার হাতে বায়'আত করনি ? তালহা উত্তরে বলেন, হাঁ, আমি বায়'আত করেছি, তবে ঐ সময়ে আমার মাথার উপর তরবারি ঝুলছিল। অর্থাৎ আমি বাধ্য হয়ে বায়'আত করেছি এবং তাও এই শর্তে যে, উসমান হত্যাকারীদের থেকে কিসাস নেওয়া হবে।

এরপর আলী (রা) যুবায়রকে সম্বোধন করে বলেন, তোমার কি ঐ দিনের কথা মনে পড়েছে, যেদিন রাসূলুল্লাহ (সা) তোমাকে বলেছিলেন, তুমি এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে লড়বে এবং এটা হবে তার উপর তোমার অত্যাচার। একথা শুনে যুবায়র বলেন, হাঁ, মনে পড়ছে। কিন্তু মদীনা থেকে আমার রওয়ানা হওয়ার পূর্বে আপনি তো একথা আমাকে বলেননি। অন্যথায় আমি মদীনা থেকে বেরই হতাম না। এখন আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি আপনার বিরুদ্ধে কখনো যুদ্ধ করব না। এই কথোপকথনের পর তাঁরা পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে যান। হযরত যুবায়র তখন হযরত আয়িশা (রা)-এর কাছে গিয়ে বলেন, আজ আলী (রা) আমাকে এমন

একটি কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যার কারণে আমি কোন অবস্থায়ই তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারি না। এখন আমার ইচ্ছা সকলকে ত্যাগ করে আমি মদীনায় ফিরে যাব। উম্মুল মু'মিনীনও প্রথম থেকেই অনুরূপ সংকল্প পোষণ করছিলেন। কেননা স্বপ্নকূপে উপনীত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সেই ভবিষ্যদ্বাণীটি তাঁর মনে পড়েছিল। কিন্তু উম্মুল মু'মিনীন যুবায়রের কথা, কোন উত্তর দেওয়ার পূর্বেই আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র (রা) তাঁর পিতা যুবায়র (রা)-কে সম্বোধন করে বলতে থাকেন, আপনি দুই পক্ষকে যুদ্ধক্ষেত্রে এনে দাঁড় করিয়েছেন, একের বিরুদ্ধে অন্যকে ক্ষেপিয়ে তুলেছেন এবং এখন আবার যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগের উদ্যোগ নিচ্ছেন। আমার তো মনে হচ্ছে, আপনি আলী (রা)-এর বাহিনী দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছেন এবং আপনার মধ্যে কাপুরুষতা দেখা দিয়েছে। একথা শুনে যুবায়র সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়েন এবং অস্ত্রসজ্জিত হয়ে একাকি হযরত আলী (রা)-এর বাহিনীর দিকে চলে যান এবং তাদের অভ্যন্তরে ঢুকে এদিক ঘোরাফেরা করে পুনরায় ফিরে আসেন। আলী (রা) তাঁকে আসতে দেখে প্রথমেই নিজের লোকদের বলে রেখেছিলেন, সাবধান ! কেউ যেন তাঁকে কোনরূপ বাধা না দেয় এবং তার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত না হয়। ফলে কেউই তাঁর সাথে কোন অশিষ্ট আচরণ করেনি।

যুবায়র (রা) ফিরে গিয়ে তাঁর ছেলেকে বলেন, আমি যদি প্রকৃতই ভয় পেতাম তাহলে আলী (রা)-এর বাহিনীর মধ্যে এভাবে ঢুকে পড়তাম না। আসল কথা হল, আমি আলী (রা)-এর সামনে কসম করে বলেছি যে, আমি তাঁর মুকাবিলায় দাঁড়াব না এবং তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না। আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র বলেন, আপনি আপনার কসমের কাফ্‌ফারাস্বরূপ একটি ক্রীতদাস মুক্ত করে দিন। যুবায়র (রা) তখন বলেন, আমি আলী (রা)-এর বাহিনীতে আম্মার (রা)-কে দেখেছি এবং হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আম্মারকে একদল বিদ্রোহী হত্যা করবে। মোটকথা, যুদ্ধ ও সংঘর্ষের ধারণা উভয় পক্ষের নেতৃবৃন্দ তাদের অন্তর থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছিলেন এবং তারই ফলশ্রুতিতে আলী (রা)-এর পক্ষ থেকে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) তালহা ও যুবায়র (রা)-এর কাছে আসেন এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন তালহা (রা) তালহা ও যুবায়র (রা)-এর পক্ষ থেকে আলী (রা)-এর কাছে আসেন। পরস্পর আলোচনার ভিত্তিতে তৃতীয় দিন সন্ধ্যার সময় আপোস-মীমাংসার শর্তাবলী নির্ধারণ ও চূড়ান্ত করা হয় এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, পরদিন ভোর বেলায় আপোস চুক্তি লিপিবদ্ধ করা হবে এবং উভয় পক্ষই তাতে স্বাক্ষর করবে। উভয় বাহিনী তিন দিন পর্যন্ত মুখোমুখি অবস্থায়ই ছিল। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাবার দল এবং অন্যান্য বিদ্রোহী গোষ্ঠী, যারা আলী (রা)-এর ধারে কাছেই অবস্থান করছিল, এই তিন দিনের মধ্যে তাদের চক্রান্ত বাস্তবায়নের কোন সুযোগই পায় নি। এবার যখন তারা জানতে পারল যে, ভোর বেলায়ই আপোস চুক্তি লিপিবদ্ধ করা হবে তখন তারা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ে এবং রাতভর বিভিন্ন সলা-পরামর্শ করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত অতি প্রত্যূষে তারা তালহা ও যুবায়র (রা)-এর বাহিনীর উপর অতর্কিতে হামলা করে বসে। প্রতিপক্ষ বাহিনীর যে অংশের উপর হামলা করা হয়েছিল তারা তা প্রতিরোধের জন্য নিজ নিজ অস্ত্র হাতে তুলে নেয়। আর যখন একাংশের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় তখন উভয় পক্ষের সকল সৈন্যই একে অন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

যুদ্ধের এই হৈ চৈ শুনে তালহা ও যুবায়র (রা) নিজ নিজ তাঁবু থেকে বের হয়ে এর কারণ জিজ্ঞেস করে জানতে পারেন যে, আলী (রা)-এর সৈন্যরা অকস্মাৎ তাদের বাহিনীর উপর

হামলা করে বসেছে। তখন তাঁরা আক্ষেপ করে বলেন, হায় ! আলী (রা) দেখছি রক্তপাত ছাড়া ক্ষান্ত হবেন না। অপর দিকে আলী (রা) তাঁর তাঁবু থেকে বের হয়ে হৈ চৈ-এর কারণ জিজ্ঞেস করলো, আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাবা কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে পূর্ব থেকে তাঁর তাঁবুর পাশে দণ্ডায়মান কয়েক ব্যক্তি প্রায় সমস্বরে বলে উঠে, তালহা ও যুবায়র (রা) অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে আকস্মিকভাবে আমাদের উপর হামলা করে বসেছেন এবং বাধ্য হয়ে তাঁদের হামলা প্রতিরোধ করার জন্য আমাদের লোকেরা তাঁদের উপর প্রতি-হামলা করেছে। আলী (রা) আক্ষেপ করে বলেন, হায় ! তালহা ও যুবায়র দেখছি রক্তপাত ছাড়া ক্ষান্ত হবে না। তারপর তিনি তাঁর বাহিনীকে শত্রুদের মুকাবিলা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। শেষ পর্যন্ত ঘোরতর যুদ্ধ শুরু হয়। দুই পক্ষের সেনাপতিরা একে অপরকে অপরাধী সাব্যস্ত করে এবং আসল ব্যাপার উভয়ের কাছেই অজ্ঞাত থেকে যায়। তবে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর উভয় বাহিনীর অধিনায়করা নিজ নিজ বাহিনীর উদ্দেশ্যে একই ধরনের নির্দেশ জারি করেন। তা হলো, যদি কেউ এই যুদ্ধ থেকে পলায়ন করে তবে যেন তার পশ্চাদ্ধাবন না করা হয়। কোন আহত ব্যক্তিকে যেন আক্রমণ না করা হয় এবং কারো ধন-সম্পদ যেন লুটপাট না করা হয়। এর দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, তালহা, যুবায়র ও আলী (রা) কারো অন্তরেই পরস্পরের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ বা শত্রুতা ছিল না বরং উভয় পক্ষের কাছেই এই যুদ্ধ ছিল নেহাৎ অবাঞ্ছিত ও অকল্পনীয় এবং তাঁরা একান্ত বাধ্য হয়েই যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছিলেন। আবদুল্লাহ্ ইবন সাবার দল এবং মিসর ও অন্যান্য অঞ্চলের বিদ্রোহীরা খুব স্ফূর্তির সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে নিজ নিজ বীরত্ব প্রদর্শন করতে থাকে। তারা সব সময়ই হযরত আলীর আশেপাশে থেকে বিশেষ করে তাঁকেই যেন তাদের বাহাদুরী দেখিয়ে চলে। কা'ব ইবন মিসওয়ার হযরত উম্মুল মু'মিনীনের কাছে গিয়ে নিবেদন করে : যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় একটাই সমীচীন যে, আপনি উটে আরোহণ করুন এবং সোজা যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে দাঁড়ান। সম্ভাবনা রয়েছে যে, আপনার জন্তুযান দেখে লোকেরা যুদ্ধ থেকে বিরত থাকবে এবং পরস্পর আপোস-মীমাংসার একটা পন্থা বের হয়ে আসবে। কথাটি হযরত উম্মুল মু'মিনীনের পসন্দ হয় এবং তিনি উটে আরোহণ করে যুদ্ধক্ষেত্রে রওয়ানা হন। সাবধানতা অবলম্বন করতে গিয়ে লোকেরা তার শিবিকার উপর বর্ম ছড়িয়ে দেয় এবং উটটিকে এমন একটি জায়গায় নিয়ে দাঁড় করায় যেখান থেকে যুদ্ধের দৃশ্য পরিষ্কার নজরে পড়ে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা)-এর সওয়ারী দেখে যুদ্ধের আগুন প্রশমিত হওয়ার পরিবর্তে যেন আরো দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠে।

তার পক্ষের যোদ্ধারা ভাবল, উম্মুল মু'মিনীন সেনাপতি হিসাবে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং আমাদেরকে আরও বেশী বীরত্বের সাথে লড়ার জন্য অনুপ্রাণিত করছেন। অপর দিকে হযরত আলী (রা) প্রতিপক্ষের এই অবাঞ্ছিত নির্মমতা প্রত্যক্ষ করে স্বয়ং অস্ত্রসজ্জিত হয়ে প্রতিপক্ষের উপর আক্রমণ পরিচালনা এবং আপন বাহিনীকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করা জরুরী মনে করেন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পরই তালহা (রা)-এর পায়ে একটি তীর এসে বিদ্ধ হয় এবং তার সমস্ত মোজা রক্তে ভরে যায়। তীরের আঘাত ছিল মারাত্মক। তাই কোনমতেই রক্ত বন্ধ হচ্ছিল না। কা' কা' ইবন আমর (রা), যিনি হযরত আলী (রা)-এর পক্ষে লড়ছিলেন, তালহার ঐ অবস্থা দেখে উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠেন, হে আবূ মুহাম্মদ! আপনার যখম (ক্ষত) খুবই মারাত্মক। অতএব আপনি অবিলম্বে বসরায় ফিরে যান। তালহা (রা) বসরার দিকে রওয়ানা

হলেন কিন্তু বসরায় প্রবেশ করার সাথে সাথে ক্ষতস্থানের ব্যথায় চেতনা হারিয়ে ফেলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ইনতিকাল করেন। তাঁকে সেখানেই সমাধিস্থ করা হয়। মারওয়ান ইবনুল হাকাম ঐ যুদ্ধে হযরত তালহা এবং যুবায়রের বাহিনীতে যোগ দেন। যখন যুদ্ধ শুরু হয় তখন তালহা (রা) সংকল্প নেন, তিনি কখনো আলী (রা)-এর মুকাবিলা করবেন না। তাই তিনিও বাহিনী থেকে পৃথক হয়ে যান এবং কিছুটা তফাতে দাঁড়িয়ে আলী (রা)-এর মধ্যকার কথোপকথন এবং আম্মার (রা)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাপারটি পুনরায় ভেবে দেখেন এবং সেই প্রেক্ষিতে এই যুদ্ধ থেকে একদম আলাদা এবং সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ঠিক এই অবস্থায় যখন মারওয়ান তাঁকে দেখল এবং পরিষ্কার বুঝতে পারল যে, তিনি এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে এখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার সংকল্প নিয়েছেন তখন তিনি আপন ভৃত্যকে অর্থপূর্ণ একটি ইঙ্গিত করে এবং সে সাথে সাথে তার (মারওয়ানের) মুখের উপর এমনভাবে একটি চাঁদর লেপটে দেয় যে, তাকে তখন আর চেনাই যাচ্ছিল না। এমতাবস্থায় মারওয়ান তার ধনুকে একটি বিষমাখা তীর লাগিয়ে তালহা (রা)-কে লক্ষ্য করে তা ছুড়ে মারে। তীরটি তাঁর পা ভেদ করে তাঁর ঘোড়ার পেটে গিয়ে আঘাত হানে। ফলে ঘোড়াটি তালহা (রা)-কে নিয়ে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে। হযরত তালহা (রা) উঠে আলী (রা)-এর এক গোলামকে (যে ঘটনাক্রমে তাঁর সামনে এসে পড়েছিল), ডেকে আলীর প্রতিনিধি হিসাবে তার হাতে অথবা হযরত কা' কা' (রা)-এর হাতে (যিনি ঘটনাক্রমে সেখানে এসে পড়েছিলেন) নতুনভাবে বায়'আত হন। এরপর তিনি বসরা ফিরে যান এবং সেখানেই ইনতিকাল করেন। হযরত আলী (রা) তা জানতে পেরে তালহা (রা)-এর জন্য দু'আ করেন, তাঁর প্রশংসা করেন এবং তাঁর জন্য আক্ষেপ করতে থাকেন।

হযরত যুবায়র (রা)-এর আপোসকামিতা

যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো। হযরত যুবায়র ইবনুল আওয়াম (রা) যিনি প্রথম থেকেই মনস্থ করে ফেলেছিলেন যে, তিনি আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন না, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পৃথক হয়ে যান। ঘটনাক্রমে হযরত আম্মার (রা) তাঁকে দেখে ফেলেন এবং অগ্রসর হয়ে তাঁকে যুদ্ধের আহ্বান জানান। যুবায়র (রা) বলেন, আমি তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না। কিন্তু যেহেতু আম্মার (রা) যুবায়র (রা)-কে যুদ্ধের আহবায়ক মনে করে তাঁর প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন তাই তাঁকে আক্রমণ করে বসেন। যুবায়র (রা) আম্মারের প্রতিটি আঘাত প্রতিঘাত করে নিজেকে রক্ষা করতে থাকেন, কিন্তু প্রতি আঘাত করেননি। শেষ পর্যন্ত আম্মার (রা) ক্লান্ত হয়ে পড়েন এবং এই সুযোগে যুবায়র (রা) সেখান থেকে সরে পড়েন। বসরাবাসীদের মধ্যে আহনাফ ইবন কায়স আপন গোত্রের একটি দল নিয়ে নিরপেক্ষভাবে উভয় বাহিনী থেকে কিছুটা দূরত্বে তাঁবু খাটিয়ে অবস্থান করছিলেন। তারা প্রথম থেকেই উভয় পক্ষের নেতাদের জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তারা উভয় বাহিনীর কোন পক্ষে যোগ দেবেন না বা কারো বিরোধিতাও করবেন না। যুবায়র (রা) যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে যান। তিনি আহনাফ ইবন কায়সের সেনাছাউনির নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় ঐ বাহিনীর আমর ইবনুল জারমূয নামীয় জনৈক ব্যক্তি যুবায়র (রা)-কে অনুসরণ করতে থাকে। সে তাঁর কাছে একটি মাসআলা সম্পর্কে জানতে চায়। মূলত সে একটি অসৎ উদ্দেশ্যে যুবায়র (রা)-এর পিছু নিয়েছিল। 'ওয়াদী সাবায়' পৌঁছার পর নামাযের সময় হলে যুবায়র (রা) নামাযে দাঁড়িয়ে যান। তিনি সিজদায়

গেলে আমর তাঁর উপর আকস্মিক হামলা চালায়। এরপর সে সেখান থেকে সোজা আলী (রা)-এর নিকট গিয়ে হাযির হয়। প্রথমে জনৈক ব্যক্তি আলী (রা)-কে বলে, যুবায়র ইবনুল আওয়াম (রা)-এর হত্যাকারী আপনার সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চায়। তিনি উত্তরে বলেন, হাঁ তাকে অনুমতি প্রদান কর, তবে এই সাথে তাকে জাহান্নামের সুসংবাদও দাও। সে আলী (রা)-এর সামনে এলে তিনি তার হাতে যুবায়র (রা)-এর তরবারি দেখতে পান। এতে তাঁর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে যায় এবং তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলেন, হে জালিম! এটা হচ্ছে তরবারি যা দীর্ঘদিন পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (রা)-এর হিফাযতে নিয়োজিত ছিল। আমর ইবনুল জারমূযের উপর এই কথা এমন প্রতিক্রিয়া হয় যে, সে আলী (রা)-এর সামনেই তাঁর সম্পর্কে কয়েকটি অশিষ্ট বাক্য উচ্চারণ করে। অতঃপর নিজেই নিজের পেটের মধ্যে তরবারি ঢুকিয়ে দিয়ে জাহান্নামের পথে যাত্রা করে।

হযরত তালহা (রা)-ও সরে পড়লেন

যুদ্ধের প্রারম্ভেই তালহা ও যুবায়র (রা) যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিলেন। বিভিন্ন গোত্রের অধিনায়ক ও ছোট খাটো নেতারা নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে হযরত আয়িশা (রা)-এর পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য অটল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। স্বয়ং হযরত আয়িশা (রা) চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন, যাতে কোনও উপায়ে যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যায় এবং আপোসরফারও একটা পথ বেরিয়ে আসে। অতএব এই পক্ষের তথা আহলে জামালের পক্ষের সৈন্যবাহিনীর পরিচালনার জন্য সত্যিকার অর্থে কোন অধিনায়কই নিয়োজিত ছিল না। তাছাড়া সাধারণ যোদ্ধারাও জানত না, তারা যে যুদ্ধ করছে তা আসলে হযরত উম্মুল মু'মিনীনের মনঃপূত কিনা। হযরত উম্মুল মু'মিনীন এবং তাঁর সমগ্র বাহিনী হযরত আলী (রা) সম্পর্কে এই ধারণা করে বসেন যে, তিনি আপোস-মীমাংসার কথাবার্তা বলে তাদেরকে ধোঁকা দিতে চেয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত অন্যায়ভাবে তাদের উপর আকস্মিক হামলা করে বসেছেন। এমতাবস্থায় তাঁরা তো তাদের বাহিনীকে আক্রমণ বা প্রতিরোধ থেকে রুখে রাখতে পারেন না। অপর দিকে বসরাবাসীরা একথা বিশ্বাস করতে লাগলো যে, হযরত আলী (রা) বসরাবাসীদেরকে হত্যা করে তাদের স্ত্রী-পুত্র কন্যাদেরকে দাসদাসীতে পরিণত করার যে গুজব রটেছিল তা আসলে গুজব নয়, সত্য। মোটকথা উভয় পক্ষের দশ হাজারেরও অধিক মুসলমান নিহত হল, অথচ শেষ পর্যন্ত কেউই জানতে পারল না যে, কি করে এই যুদ্ধ সংঘটিত হল। প্রত্যেক পক্ষ তার বিরুদ্ধ পক্ষকে জালিম ও দোষী সাব্যস্ত করতে থাকলো। যেহেতু স্বয়ং আলী (রা) নিজ বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তাই তাঁর পক্ষ থেকে বিপক্ষ দলের উপর এমন ভয়ানক হামলা চালানো হয় যে, পিছু হটা ছাড়া তাদের সামনে কোন পথই খোলা ছিল না। শেষ পর্যন্ত হযরত আয়িশা (রা)-এর উট হযরত আলী (রা)-এর বাহিনীর আওতার মধ্যে চলে আসে। উটের নাকদড়ি ছিল কা'বের হাতে। তিনিই আয়িশা (রা)-কে পরামর্শ দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে এসেছিলেন যাতে যুদ্ধের পরিবর্তে আপোসরফার একটা পথ বেরিয়ে আসে। যখন হযরত উম্মুল মু'মিনীন দেখলেন যে, হামলারত যোদ্ধারা কোন মতেই থামছে না এবং তাঁর উট রক্ষায় নিয়োজিত যেসব বসরাবাসী পিছপা হয়ে গিয়েছিল তারাও নব উদ্যমে অটল হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং উভয় পক্ষের মধ্যে অত্যন্ত জোরেসোরে তরবারি যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে তখন তিনি কা'বকে নির্দেশ দিলেন, তুমি উটের নাকদড়ি ছেড়ে দিয়ে এবং কুরআন মজীদ উচিয়ে ধরে সামনের দিকে

অগ্রসর হও এবং লোকদের কুরআন মজীদের ফায়সালার দিকে আহ্বান কর। তুমি উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা কর : আমরা কুরআনের ফায়সালা মানি, তোমরাও কুরআনের ফায়সালা মানো। কা'ব (রা) সম্মুখে অগ্রসর হয়ে ঐ ঘোষণা দেন। তখন আবদুল্লাহ্ ইবন সাবার লোকেরা একসাথে তার উপর অসংখ্য তীর বর্ষণ করে এবং তিনি সাথে সাথে শহীদ হয়ে যান। এতে বসরাবাসীরা আরো বেশি ক্ষিপ্ত হয় এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই হযরত আয়িশা (রা)-এর উটের আশেপাশে লাশের স্তূপ জমে যায়। বসরাবাসীরা অনবরত নিহত হচ্ছিল, কিন্তু তারা বিপক্ষ দলের কোন যোদ্ধাকে আয়িশা (রা)-এর ধারে কাছে ঘেষতে দিচ্ছিলো না। আলী (রা) এই দৃশ্য দেখে সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নিলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত এই উট যুদ্ধক্ষেত্রে দৃশ্যমান থাকবে ততক্ষণ যুদ্ধের স্ফুলিঙ্গ নির্বাপিত হবে না। আয়িশা (রা)-এর উট আক্রমণের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হয়েছিল। চতুর্দিক থেকে তাঁর শিবিকার উপর তীর বর্ষিত হচ্ছিল এবং তিনি উসমান হত্যাকারীদের জন্য বদদু'আ করছিলেন।

আলী (রা) তাঁর লোকদের নির্দেশ দিলেন : যেভাবে পার এই উটকে আঘাত কর। উট ভূমিতে লুটিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধেরও পরিসমাপ্তি ঘটবে। বিদ্রোহীদের নেতা আশতার আলী (রা)-এর পক্ষ নিয়ে অত্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করছিল। এভাবে অন্যান্য বিদ্রোহীও প্রশংসনীয়ভাবে লড়ে যাচ্ছিল। হযরত আলীর পক্ষ থেকে একের পর এক অত্যন্ত জোরদার হামলা চালানো হলেও আহলে জামালের পক্ষ থেকে অত্যন্ত বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে সব কয়টি হামলাই প্রতিহত করা হয়। আবদুল্লাহ্ ইবন যুবায়র (রা) ও মারওয়ান ইবন হাকাম হামলা প্রতিরোধ করতে গিয়ে আহত হন। আবদুর রহমান ইবন আত্তাব, জানদুব ইবন যুহায়র, আবদুল্লাহ্ ইবন হাকীম প্রমুখ হযরত আয়িশার উট রক্ষা করতে গিয়ে শাহাদত বরণ করেন। শেষ পর্যন্ত হযরত আয়িশা (রা)-এর পক্ষীয়রা এমন ভয়ানক হামলা করে যে, উটের সম্মুখভাগ বহুদূর পর্যন্ত একেবারে পরিষ্কার হয়ে যায়। আলী (রা) তাঁর বাহিনীকে পিছপা হতে দেখে পুনরায় জোরদার আক্রমণ চালান এবং সামনে এগিয়ে যান। উটের সম্মুখবর্তী যোদ্ধারা বেশ কয়েকবার আগে বেড়ে পুনরায় পিছনে হটে যায়। শেষ পর্যন্ত জনৈক ব্যক্তি সুযোগ পেয়ে তরবারি দ্বারা উটের পায়ে আঘাত করে। সঙ্গে সঙ্গে উটটি চীৎকার দিয়ে বসে পড়ে।

ঐ সময় কা'কা' ইবন আমর (রা) উটের একেবারে নিকটে পৌঁছে গিয়েছিলেন। উটটি ভূলুণ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে আয়িশা (রা)-এর বাহিনী বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে আলী (রা)-এর বাহিনী উটটি ঘিরে ফেলে। আলী (রা) মুহাম্মদ ইবন আবূ বকর (রা)-কে, যিনি তাঁর সাথেই ছিলেন–নির্দেশ দেন, তুমি তাড়াতাড়ি গিয়ে তোমার বোনের হিফাযত কর, কেউ যেন তাঁকে কোন প্রকার কষ্ট না দেয়। কা'কা' ইবন আমর (রা), মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর ও আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা) শিবিকার রশি কেটে তা একটি পৃথক জায়গায় নিয়ে রাখেন এবং পর্দার উদ্দেশ্যে তার উপর চাঁদর জড়িয়ে দেন। স্বয়ং আলী (রা)-ও সেখানে যান এবং শিবিকার নিকটবর্তী হয়ে আয়িশা (রা)-কে সালাম জানিয়ে বলেন, 'মা! আপনি কুশলে আছেন তো ? আল্লাহ্ তা'আলা আপনার প্রতিটি ভ্রান্তি ক্ষমা করুন। হযরত আয়িশা (রা) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তোমারও প্রতিটি ভ্রান্তি ক্ষমা করুন। এরপর আলী (রা)-এর বাহিনীর অধিনায়করা একের পর এক হযরত উম্মুল মু'মিনীনকে সালাম করার জন্য হাযির হন। তখন কা'কা'কে হযরত আয়িশা (রা) বলেন হায়! এই ঘটনার বিশ বছর পূর্বে যদি আমার মৃত্যু হয়ে যেত! কা'কা' (রা) একথা

হযরত আলী (রা)-এর কাছে বললে তিনিও বলে উঠেন, হায়, আজ থেকে বিশ বছর পূর্বে যদি আমারও মৃত্যু হয়ে যেত।

এই যুদ্ধ 'জামাল যুদ্ধ' নামে খ্যাত। কারণ হযরত আয়িশা (রা) যে জামালে (উটে) আরোহণ করে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েছিলেন সেটাই যুদ্ধের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল। এই যুদ্ধে হযরত আয়িশা (রা)-এর পক্ষে যোদ্ধার সংখ্যা ছিল ত্রিশ হাজার, যার মধ্যে নয় হাজারই নিহত হয়। আর আলী (রা)-এর পক্ষে যোদ্ধার সংখ্যা ছিল বিশ হাজার, যার মধ্যে এক হাজার সত্তরজন নিহত হয়। আলী (রা) সকল নিহতের জানাযা পড়েন এবং সকলকে কবরস্থও করেন। সেনাছাউনি এবং যুদ্ধক্ষেত্রে যেসব মাল পাওয়া গিয়েছিল সেগুলো সম্পর্কে ঘোষণা প্রদান করা হয় : যে ব্যক্তি এসে কোন মাল নিজের বলে শনাক্ত করবে সে অবাধে তা নিয়ে যেতে পারবে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে হযরত উম্মুল মু'মিনীনকে তাঁর ভাই মুহাম্মদ ইবন আবূ বকর বসরায় নিয়ে গিয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্ন খালাফ খুযাঈর ঘরে সাফিয়্যা বিনতুল হারিছ ইবন আবূ তালহার কাছে রাখেন। পরদিন হযরত আলী (রা) বসরায় প্রবেশ করেন। সমগ্র বসরাবাসী তাঁর হাতে বায়'আত করে। এরপর আলী (রা) হযরত উম্মুল মু'মিনীনের খিদমতে গিয়ে হাযির হন। যেহেতু আবদুল্লাহ্ ইবন খালাফ এই যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন তাই তার মা আলী (রা)-কে দেখে অনেক কটু কথা বলেন। কিন্তু আলী (রা) তার কোন প্রতিবাদ করেন নি। তার কোন কোন সঙ্গীর কাছে বিষয়টি অস্বস্তিকর মনে হলেও আলী (রা) তাদের বলেন, যেহেতু মহিলারা প্রকৃতিগতভাবে দুর্বল হয়ে থাকে, তাই আমরা গোটা মহিলা সমাজকেই ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখি। আর এরা তো হচ্ছে মুসলিম মহিলা। অতএব এদের প্রত্যেকটি কথাই সহ্য করে নেওয়া উচিত। আলী (রা) হযরত উম্মুল মু'মিনীন (রা)-এর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, আপনার কোন কষ্ট হয় নি তো ? তারপর সব বিষয়েরই একটা মিটমাট হয়ে যায়। আলাপ-আলোচনা কালে হযরত আলী (রা) যেমন নিজের পক্ষ থেকে ওযর পেশ করেন, তেমনি ওযর পেশ করেন হযরত আয়িশা (রা)-ও। আলী (রা) আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বসরার হাকিম (গভর্নর) নিয়োগ করেন। এরপর মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকরকে সফরের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেন। সফরের যাবতীয় আসবাব-সামগ্রী সংগ্রহ করে হিজরী ৩৬ সনের ১লা রজব তারিখে হযরত আলী (রা) বসরার চল্লিশজন নেতৃস্থানীয় মহিলা সমভিব্যাহারে হযরত আয়িশা (রা)-কে মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর (রা)-এর সাথে বসরা থেকে বিদায় দেন। তিনি কয়েক ক্রোশ-পর্যন্ত হযরত হাসান ইব্ন আলী (রা)-কে তাঁর সঙ্গে পাঠান। উম্মুল মু'মিনীন প্রথমে মক্কায় যান। যিলহাজ্জ পর্যন্ত তিনি মক্কায়ই অবস্থান করেন এবং হজ্জ আদায় করার পর হিজরী ২৭ সনের মুহাম্মদ মাসে মদীনায় ফিরে আসেন।

জামাল যুদ্ধে উমাইয়া বংশের অনেকে অংশ গ্রহণ করেছিল। তারা সবাই আয়িশা (রা)-এর পক্ষেই যুদ্ধ করেছিল। যুদ্ধের পর মারওয়ান, উতবা ইব্ন আবূ সুফিয়ান, মারওয়ানের ভাই আবদুর রহমান ও ইয়াহইয়া প্রমুখ বনূ উমাইয়ার সব লোক বসরা থেকে সিরিয়া চলে যায় এবং দামিশকে গিয়ে হযরত আমীরে মুআবিয়ার সাথে মিলিত হয়। আবদুল্লাহ্ ইবনুল যুবায়র (রা) যিনি জামাল যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন, বসরায় আযদ গোত্রের এক ব্যক্তির ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। হযরত আয়িশা (রা) আপন ভাই মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর (রা)-এর মাধ্যমে তাঁকে ডেকে পাঠান এবং নিজের সাথে মক্কায় নিয়ে আসেন।

সাবাঈ দলের আর একটি দুষ্কর্ম

হযরত আয়িশা (রা)-কে বসরা অভিমুখে রওয়ানা করার পর হযরত আলী (রা) বসরার বায়তুলমাল খুলেন এবং তাতে যে নগদ অর্থ ছিল তা সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করে দেন, যারা জামাল যুদ্ধে তাঁর পতাকাতলে লড়েছিল। প্রত্যেক ব্যক্তির ভাগে পাঁচশ দিরহাম করে পড়ে। এই অর্থ বন্টন করার পর তিনি বলেন, যদি তোমরা সিরিয়া আক্রমণ করে জয়যুক্ত হতে পার তাহলে নির্দিষ্ট ভাতা ছাড়াও এই পরিমাণ অর্থ তোমাদের দেওয়া হবে। আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাবার দল, যাদেরকে 'ফিরকা-ই স্যাবাইয়া' নামে অভিহিত করা হয় জামাল যুদ্ধ শেষ হতেই হযরত আলীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অশিষ্ট কথাবার্তা বলতে শুরু করে। তাদের এই অশিষ্ট কথাবার্তা, দোষারোপ ও তিরস্কার-ভর্ৎসনার আসল কারণ হল হযরত আলী বিপক্ষ দলের মাল-আসবাব লুণ্ঠন করতে তাদেরকে কড়া ভাষায় নিষেধ করে দিয়েছিলেন। তারা এখন পর্যন্ত কটুক্তি করে আসছিল, কিন্তু যখন তিনি প্রত্যেক যোদ্ধাকে পাঁচ দিরহাম করে দেন তখন এর উপরও তারা নানা ধরনের আপত্তি উত্থাপন করতে শুরু করে। শেষ পর্যন্ত তাদের এই বিরোধিতা এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে যে, তাদেরকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। তিনি তাদেরকে যতই সদুপদেশ দিতেন, যতই বোঝাতেন ততই তাদের বক্রতা ও অসদাচরণ বৃদ্ধি পেত। শেষ পর্যন্ত অবস্থা এই পর্যায়ে গড়ায় যে, একদিন তারা সবাই বসরা ছেড়ে চলে যায়। আলী (রা)-এর আশংকা হলো, এরা দেশের কোথাও না কোথাও গিয়ে বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে। তাই তিনি ওদের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য বসরা থেকে একটি সেনাবাহিনী নিয়ে বের হন। কিন্তু তাদের নাগাল পাওয়া যায় নি। এখানে একটি কথা মনে রাখা দরকার যে, আবদুল্লাহ ইব্ন সাবা নিজেকে এমনভাবে যাহির করত যেন সে আলী (রা)-এর একজন অন্ধ ভক্ত এবং তাঁর জন্য উৎসর্গিতপ্রাণ। আলী (রা)-এর ভালোবাসার অন্তরালেই সে হযরত উসমান (রা)-কে হত্যার যাবতীয় ষড়যন্ত্র করেছিল। নিজেকে আলী প্রেমিক ঘোষণা করে সে জনসাধারণকে পথভ্রষ্ট করত। কিন্তু জামাল যুদ্ধ ও বসরা বিজিত হওয়ার পর ঐ সাবাঈ দল বুঝতে পারল যে, এবার হযরত আলীর বিরোধিতা করলেই ইসলামের অধিকতর ক্ষতি সাধন করা সম্ভব হবে। তাই তারা অত্যন্ত জোরেসোরে আলী (রা)-এর বিরোধিতা করতে লাগল। এ দলটি প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের নামধারী ইয়াহূদী ও ইসলাম-দুশমনদের একটি দল ছিল যা পরবর্তীকালে 'খারিজী সম্প্রদায়' নামে আত্মপ্রকাশ করে।

হযরত উমর ফারূক (রা)-এর শাহাদত লাভের পর থেকে ইসলামে শত্রুদের নতুন ষড়যন্ত্র উদ্ভাবন এবং গোপন সমিতি গঠনের যে ধারার সূচনা হয় তা আজো বিশ্বের সর্বত্র অব্যাহত রয়েছে। এমন একটি যুগও পাওয়া যাবে না যখন ইসলামের এই শত্রুরা কোন না কোন গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল না। কখনো তারা আবূ লূ' লূ' ও তার প্ররোচকরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে, কখনো দেখা দিয়েছে আবদুল্লাহ ইব্ন সাবা এবং সাবায়ী ফিরকারূপে, আবার কখনো চিহ্নিত হয়েছে খারিজী ফিরকা নামে। কখনো তারা বনূ উমাইয়ার বিরুদ্ধে আব্বাসী ও আরবীদের হয়ে ষড়যন্ত্র করেছে, কখনো আব্বাসীদের উপর আরবীদের তুলে ধরার চেষ্টা করেছে, কখনো তারা উৎসর্গিতপ্রাণ ইসমাঈলীয়া নাম ধারণা করেছে, কখনো ফ্রিম্যাসনের রূপ ধারণ করেছে, আবার কখনো তাদের এই গোপন সোসাইটি নৈরাজ্যবাদী ও বিচ্ছিন্নতাবাদীরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। কখনো তারা কূটনীতির পোশাক পরেছে, আবার কখনো রাজা-বাদশাহদের পররাষ্ট্র দফতরের

অফিসসমূহে নিজেদের স্থান করে নিয়েছে। এভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবনের শেষ দিনগুলো বাদে আর সব সময়েই এই গোপন ষড়যন্ত্রকারী দলের অস্তিত্ব ছিল। এরা কখনো বাবিলে (ব্যাবিলনে) হারূত-মারূত এবং হযরত হিযকীল ও দানিয়ালের তদবীরসমূহ সফল করার কাজে নিয়োজিত ছিল, আবার কখনো নিয়োজিত ছিল হিন্দুস্থানে বৌদ্ধ মহাযান বংশের বিরাট সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করে ব্রাহ্মণ চানক্যের মাধ্যমে চন্দ্রগুপ্তকে বিজয়ী করে তোলার কাজে। কখনো এই দল রুস্তমকে হত্যা করে কায়ানীদের বিখ্যাত রাজবংশের ধ্বংস ডেকে এনেছে। কখনো এরা শুধু বৌদ্ধ ধর্মকে নয় বরং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সাম্রাজ্য এবং সংস্কৃতি ও সভ্যতাকেও হিন্দুস্তান থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে, আবার কখনো জুলিয়াস সিজারকে হত্যা করিয়ে রোমান সাম্রাজ্যের প্রভাব-প্রতিপত্তি মিটিয়ে দিয়েছে, মোটকথা, বিশ্বে শুধু বিশ পঁচিশটি বছরের একটি যুগ এমনভাবে কেটেছে, যখন গোপন ষড়যন্ত্রকারী এই দলের কোন অস্তিত্ব ছিল না। আর থাকলেও তা অজ্ঞাত ছিল। আর এই যুগটি হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ (সা), আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এবং উমর ফারূক (রা)-এর যুগ। এই যুগের পূর্বে এবং পরেও বিশ্বে সব সময়ই এই ষড়যন্ত্রকারীদের অস্তিত্ব ছিল। অতএব এই ইতিহাসের পাঠক এবং খিলাফতে রাশিদার ইতিহাসের শেষাংশের পাঠককে গোপন ষড়যন্ত্রকারী এই ইসলাম-শত্রুদের উৎসুক দৃষ্টিতে দেখা উচিত নয়।

সাবাঈ ফিরকা, যারা প্রকাশ্য বিরোধিতা করে বসরা থেকে পলায়ন করে তারা দ্রুত ইরাকে ও আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং লম্পট লোকদেরকে নিজেদের সাথে শামিল করে একটি বিরাট দল গড়ে তোলে। তারা সর্বপ্রথম সিজিস্তান অভিমুখে যাত্রা করে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, তারা একের পর এক ইরানের প্রদেশসমূহে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটাবে যাতে মুসলমানদের খলীফা (হযরত আলী) গোটা দেশকে পুনরায় একটি স্থায়ী রাষ্ট্রে পরিণত করার অবকাশ না পান। ইরানের প্রদেশসমূহে বিদ্রোহ সৃষ্টি করে *তারা আলী (রা)-কে এমনভাবে ব্যতিব্যস্ত রাখতে চাচ্ছিল যাতে তিনি সিরিয়া আক্রমণ করার* এবং জয়যুক্ত হওয়ার সুযোগই না পান। তাদের সিজিস্তানের দিকে যাত্রার কথা জানতে পেরে আলী (রা) তাদেরকে দমনের জন্য হযরত আবদুর রহমান তাঈকে প্রেরণ করেন। কিন্তু তাদের মুকাবিলা করতে গিয়ে আবদুর রহমান তাঈ শাহাদাত বরণ করেন। এই সংবাদ পাওয়ার পর আলী (রা) চার হাজার সৈন্যের একটি বাহিনীসহ রিবঈ ইবন কাসকে সেখানে প্রেরণ করেন। তিনি তাদেরকে পরাজিত করে একেবারে ছিন্ন ভিন্ন করে দেন। ইতিমধ্যে সিফ্ফীন যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে মুসলিমরূপী ইয়াহূদীরা অর্থাৎ সাবাঈ গোষ্ঠী নিজেদের লক্ষ্য হাসিলের জন্য আলী (রা)-এর বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হওয়াকেই সমীচীন মনে করে এবং সুযোগ বুঝে ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগতভাবে একের পর এক তাতে যোগ দেয়।

কূফায় রাজধানী স্থানান্তর

জামাল যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর হযরত আলী (রা)-এর সবচেয়ে বড় কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়, সিরিয়া প্রদেশকে আয়ত্তাধীনে আনা এবং আমীর মুআবিয়ার কাছ থেকে বায়'আত গ্রহণ করা। এই লক্ষ্যে তিনি কূফায় অবস্থান করাই সমীচীন মনে করলেন। তাছাড়া আলী (রা)-এর বাহিনীর মধ্যে কূফীরাই ছিল সর্বাধিক শক্তিশালী। এই প্রেক্ষিতেও কূফার রাজধানী স্থানান্তর ছিল যুক্তিসঙ্গত। উপরন্তু কূফা ছিল মদীনার চাইতে সিরিয়ার অধিক নিকটবর্তী। ইরানী প্রদেশগুলো ছিল কূফা দ্বারা অধিক প্রভাবিত। আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হলো, হযরত উসমান

(রা)-এর খিলাফত আমলে মদীনার গণ্যমান্য তথা সাহাবিগণ বিভিন্ন প্রদেশে কর্মকর্তা বা গভর্নর পদে নিয়োগ লাভ করে মদীনার বাইরে চলে গিয়েছিলেন এবং তাঁদের পরিবার-পরিজন ও বন্ধু-বান্ধবদের অনেকেই নিজেদের সফর সঙ্গী করে সংশ্লিষ্ট প্রদেশে নিয়ে গিয়েছিলেন। কেননা এতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা গভর্নরের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেত এবং প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনা করাও সহজ হত। এভাবে হযরত উসমান (রা)-এর শাসন আমলে মদীনার গুরুত্বপূর্ণ জনগোষ্ঠী চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। ফারূকে আযম (রা) তাঁর খিলাফত আমলে মদীনাকে সর্ববৃহৎ ও সর্বাধিক শক্তিশালী কেন্দ্রে পরিণত করেছিলেন এবং নবগঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষে তার প্রয়োজনও ছিল। কিন্তু এখন আর সে প্রয়োজন বাকী ছিল না। আলী (রা)-এর পূর্ববর্তী খলীফাদের স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার বা সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়ার প্রয়োজন পড়েনি। কিন্তু সমসাময়িক পরিস্থিতিরি প্রেক্ষিতে আলী (রা) স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে হাযির থাকতে এবং একজন সেনাপতিরূপে যুদ্ধ পরিচালনা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। যা হোক আলী (রা)-এর মদীনার পরিবর্তে কূফায় অবস্থান করাটাই ছিল অধিক সমীচীন। তাই তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বসরার শাসনকর্তা নিয়োগ করে নিজে সৈন্যবাহিনীসহ কূফায় চলে যান।

এখানে একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, হযরত উসমান (রা)-এর হত্যাকারী এবং বিদ্রোহীদের একটি অংশ আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাবার প্রচেষ্টায় তার একান্ত ভক্তে পরিণত হয়েছিল। এদেরকে আবদুল্লাহ ইব্ন সাবার দল বলা যেতে পারে। কিন্তু যেহেতু অনেক সরলপ্রাণ মুসলমান স্রেফ প্রতারিত হয়ে ঐ সাবাঈ দলে যোগদান করেছিল তাই সত্যিকার অর্থে সাবাঈ দল বলতে ঐ সামান্য সংখ্যক লোকদের বোঝাত, যারা ছিল ঐ দলের মূল ভিত্তি। তারা যখন যেভাবে প্রয়োজন মনে করত, ঐ ধরনের লোক দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে মনে করত, তখন সেভাবে সে ধরনের লোকদের অন্তর্ভুক্ত করে তাদের মধ্য থেকেই একজন দলীয় নেতা নিয়োগ করত এবং ইতিপূর্বে অপর লক্ষ্য হাসিলের জন্য যেসব লোককে নিজেদের দলে ভিড়িয়েছিল তাদেরকে ছেড়ে দিত। এটাই একমাত্র কারণ যে, উসমান হত্যার ক্ষেত্রে সাবা দল সকল বিদ্রোহীকেই কাজে লাগিয়েছিল এবং জামাল যুদ্ধ পর্যন্ত তাদের একটি বিরাট অংশকে নিয়োজিত রেখেছিল। জামাল যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর যখন তারা আলী (রা)-এর বিরোধিতা এবং তার ছিদ্রান্বেষণে আত্মনিয়োগ করে তখন বিদ্রোহীদের একটি বিরাট অংশ সাবাঈ দল থেকে পৃথক হয়ে যায়। তারা হযরত আলীর সাথে সম্পৃক্ত থাকে এবং আপন কর্মতৎপরতা ও ত্যাগ উৎসর্গের বদৌলতে খলীফার দরবারে যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জনেও সক্ষম হয়। হযরত আলী কূফায় আবাস গ্রহণ করায় কূফীদের উপর তাঁর নির্ভরশীলতা আরো বেশী বৃদ্ধি পায়। এভাবে উসমানের হত্যাকারীরা হযরত আলীর বাহিনীতে শুধু আশ্রয়ই নেয়নি, বরং তাদের অনেকেই তার আস্থা অর্জনেও সক্ষম হয়। আর আমীরে মুআবিয়ার শক্তি বৃদ্ধির এটাও ছিল একটা কারণ। কেননা যে সমস্ত লোক হযরত উসমানের হত্যাকারীদের কিসাস গ্রহণ জরুরী মনে করত তারা যখন ঐ হত্যাকারীদেরই কিছু লোককে আলী (রা)-এর বাহিনীতে সসম্মানে ও সদর্পে বিচরণ করতে দেখত তারা আমীরে মুআবিয়ার তুলনায় আলী (রা)-এর অধিক উত্তম স্বীকার করা সত্ত্বেও আমীর মুআবিয়া (রা)-কে সমর্থন করছিল। আমীরে মুআবিয়া উসমান হত্যার প্রতিশোধের দাবীতেই হযরত আলীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন।

মিসরের গভর্নর পদে মুহাম্মদ ইবন আবূ বকর (রা)-এর নিযুক্তি

যেমন উপরে বর্ণিত হয়েছে, হযরত উসমানের শাহাদত লাভের মুহূর্তে মুহাম্মদ ইবন আবূ হুযায়ফা আবদুল্লাহ্ ইবন সা'দকে মিসরের শাসনক্ষমতা থেকে হটিয়ে নিজেই তা করায়ত্ত করে নেন। আলী (রা) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার সাথে সাথে কায়স ইবন সা'দ (রা)-কে মিসরের গভর্নর নিয়োগ করে মদীনা থেকে প্রেরণ করেন। কায়স মাত্র সাতজন লোক সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা হন এবং মিসরে পৌঁছেই মুহাম্মদ ইবন আবূ হুযায়ফাকে পদচ্যুত করে নিজেই সেখানকার শাসনভার গ্রহণ করেন। মিসরের ইয়াযীদ ইবন হারিছ, আসলামা ইবন মুখাল্লাদ প্রমুখ এমন কিছু লোকও ছিল যারা উসমান হত্যার কিসাস দাবী করছিল। তারা কায়সের হাতে বায়'আত হতে অস্বীকার করে এই অজুহাতে যে, তারা আরো কিছুদিন অপেক্ষা করবে এবং উসমান হত্যার ব্যাপারটি কিভাবে মিটমাট করা হয় তা লক্ষ্য করবে। যখন একটা মীমাংসা হয়ে যাবে তখন তারা অবশ্যই বায়'আত করবে। আর যতক্ষণ তারা বায়'আত না করবে ততক্ষণ নীরব থাকবে, কায়সের কোনরূপ বিরোধিতা করবে না। যা হোক কায়স নিজের সুন্দর চরিত্র ও যোগ্যতাবলে মিসরে পুরোপুরিভাবে নিজের প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন।

জামাল যুদ্ধশেষে আলী (রা) কূফায় যাত্রা করলে আমীরে মুআবিয়া এই ভেবে বিচলিত হয়ে পড়েন যে, এখন তাঁরই উপর আক্রমণ পরিচালনা করা হবে। তিনি এটাও ভেবে রেখেছিলেন যে, মিসরে কায়স ইব্ন সা'দ একজন প্রতিপত্তিশালী জনপ্রিয় গভর্নর। তিনি হযরত আলীর প্রেরিত লোক এবং তাঁরই একান্ত ভক্ত। অতএব আলী (রা) যখন কূফার দিক থেকে সিরিয়া আক্রমণ করবেন তখন তিনি কায়স ইব্ন সা'দকে অবশ্যই নির্দেশ দেবেন, "তুমি ও তোমার বাহিনী নিয়ে মিসরের দিক থেকে সিরিয়া আক্রমণ কর।" আর উভয় দিক থেকে সিরিয়া আক্রমণ করা হলে তাঁকে (মুআবিয়াকে) নিঃসন্দেহে ভয়ানক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। মুআবিয়া (রা) স্বাভাবিকভাবেই নিজের শক্তি অর্জন ও তা সমন্বিত করার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিলেন এবং তিনি সে সুযোগ পুরোপুরি কাজেও লাগিয়েছিলেন। উসমান (রা)-এর রক্তাক্ত জামা এবং তাঁর স্ত্রীর কর্তিত অঙ্গুলীসমূহ তাঁর কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। তিনি প্রতিদিন এই জামা ও অঙ্গুলীসমূহ দামিশ্কের জামে মসজিদের মিম্বরের উপর রেখে দিতেন এবং জনসাধারণ তা দেখে আহাজারী করত। যেহেতু সিরিয়া প্রদেশ সব সময়ই রোমান সম্রাটের আক্রমণের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, তাই প্রথম থেকেই সেখানে একটি অতি শক্তিশালী বাহিনী মোতায়েন রাখা হত। এই মুহূর্তেও সেখানে একটি বিরাট বাহিনী মোতায়েন ছিল এবং সে বাহিনীর প্রত্যেকটি সদস্যই এই মর্মে শপথ করেছিল। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা উসমান হত্যার প্রতিশোধ না নেবে ততক্ষণ তারা বিছানায় ঘুমাবে না এবং ঠাণ্ডা পানিও পান করবে না। তাছাড়া আরবের গণ্যমান্য ও বাহাদুর লোকদেরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার ব্যাপারে আমীরে মুআবিয়া ছিলেন সদাতৎপর। তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার এবং নানা উপহার উপঢৌকন দিয়ে তাদেরকে বশ করে নেওয়ার ব্যাপারে তিনি ছিলেন সদাসতর্ক। যারা কাজের লোক তাদেরকে নিজের দলে টানা এবং তাদের মন জয় করার অপূর্ব ক্ষমতা ছিল তাঁর। নিজের দাবীর যথার্থতা প্রমাণ এবং নিজেকে উসমান (রা)-এর উত্তরাধিকারী বানিয়ে একজন মজলুম হিসাবে নিজেকে প্রকাশ করার ব্যাপারে তিনি মোটেই অমনোযোগী ছিলেন না। উসমান (রা)-এর শাহাদত লাভের পর তিনি পুরোপুরি এক বছরের অবকাশ পেয়েছিলেন এবং

এই সময়ে উপরোক্ত বিষয়সমূহের প্রস্তুতি গ্রহণ ছাড়া তাঁর অন্য কোন কাজ ছিল না। কিন্তু হযরত আলী এই সময় দারুণ ব্যস্ততার মধ্যে ছিলেন। যদিও কূফায় চলে যাওয়ার পর একমাত্র সিরিয়া প্রদেশ ছাড়া সমগ্র মুসলিম রাষ্ট্র বাহ্যত হযরত আলীর অধিকারে চলে এসেছিল, কিন্তু তিনি তখনো সেই প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার অধিকারী হতে পারেন নি, যা হযরত ফারূকে আযমের যুগে মুসলমানদের খলীফা তথা আমীরুল মু'মিনীনের ছিল। হিজায, ইয়ামন, ইরাক, মিসর, ইরান তথা ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বত্রই অনুগত লোকদের সাথে সাথে এমন কিছু লোকও পাওয়া যেত যারা আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন আপত্তি উত্থাপন করত এবং তাঁর বিভিন্ন কর্মসূচীর প্রকাশ্য সমালোচনা করত। এ কারণেই হযরত আলী কোন প্রদেশ থেকেই আশানুরূপ সামরিক সাহায্য লাভ করতে পারেন নি।

আমীরে মুআবিয়া (রা)-এর অবস্থা ছিল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। যদিও শুধুমাত্র সিরিয়া প্রদেশের উপর তাঁর আধিপত্য ছিল, কিন্তু সমগ্র দেশ ছিল তাঁর সমমতাবলম্বী। এজন্য সমগ্র দেশেই তাঁর একটা গ্রহণযোগ্যতা ছিল। হযরত আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে তাঁকে শেষ পর্যন্ত লড়তে হবে, এ বিশ্বাস তাঁর প্রথম থেকেই ছিল। এ প্রেক্ষিতে তিনি সর্বপ্রথম যে কর্মপন্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলেন তা হলো মিসরের দিক থেকে সিরিয়া আক্রমণের সম্ভাবনা দূর করা। মুআবিয়া (রা) কায়স ইবন সা'দ (রা)-এর শক্তি ও যোগ্যতায় প্রভাবিত ছিলেন। এটাকে আমীরে মুআবিয়ার সৌভাগ্যই বলতে হবে যে, হঠাৎ এমন একটি কারণ সৃষ্টি হয়ে গেল, যার ফলে তাঁর সংকল্প ও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়ে গেল। আমীরে মুআবিয়া (রা) কায়সকে এই মর্মে পত্র লিখলেন : হযরত উসমান (রা)-কে অন্যায়ভাবে শহীদ করা হয়েছে। অতএব তাঁর কিসাসের দাবীতে আমাকে আপনার সহযোগিতা করা উচিত। কায়স উত্তরে লিখেন : আমি যতটুকু জানি, আলী (রা) উসমান হত্যা ষড়যন্ত্রে মোটেই শরীক ছিলেন না। তাঁর হাতে যখনি লোকেরা বায়'আত করে ফেলেছে এবং তিনি খলীফার আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে গেছেন তখন তাঁর মুকাবিলা বা বিরোধিতা করা আপনার উচিত হবে না। এই সোজা উত্তর পাওয়ার পর আমীরে মুআবিয়ার করণীয় হলো আলী (রা)-এর মুখামুখি হওয়ার পূর্বেই সর্বশক্তি নিয়োগ করে মিসর আক্রমণ করে কায়সের দিক থেকে আগত সম্ভাব্য বিপদ দূরীভূত করা, এরপর আলী (রা)-এর হামলা প্রতিরোধ করা। কিন্তু এই কাজ ছিল নিঃসন্দেহে ঝুঁকিপূর্ণ। কেননা মিসরে যুদ্ধ যদি কিছুটা প্রলম্বিত হয়ে যায় এবং আমীরে মুআবিয়া (রা) সেখান থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে না পারেন তাহলে সমগ্র সিরিয়া আলী (রা)-এর দখলে চলে যাবে এবং আমীরে মুআবিয়ার প্রাণ নিয়ে পালাবারও কোন পথ থাকবে না। অপরদিকে কায়স ইবন সা'দ ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ এড়িয়ে যেতে চাচ্ছিলেন যতক্ষণ না হযরত আলী (রা)-এর আক্রমণের খবর এসে পৌঁছে। তার পরিকল্পনা ছিল, ঐ খবর পাওয়ার সাথে সাথে তিনি মিসরের দিক থেকে আমীরে মুআবিয়ার উপর আক্রমণ করে তাঁকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করবেন।

ইতিমধ্যে কায়সের একটি চিঠি আলী (রা)-এর কাছে কূফায় গিয়ে পৌঁছে। তিনি তাতে লিখেছিলেন, মিসরের অভ্যন্তরে বহু লোক এখনো নিরপেক্ষ আছে। আমি তাদেরকে সে অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছি এবং তাদের উপর কোনরূপ পীড়াপীড়ি করা সমীচীন মনে করিনি। তখন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন জা'ফর আলী (রা)-কে এই মর্মে পরামর্শ দেন যে, ঐ নিরপেক্ষ লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং তাদের বায়'আত করতে বাধ্য করার জন্য কায়সকে নির্দেশ

দেওয়া উচিত। কেননা এভাবে নীরবে বসে থাকতে দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। অতএব কায়সের কাছে এ নির্দেশ পাঠিয়ে দেওয়া হল। তিনি আলী (রা)-এর এই নির্দেশ পালন অপ্রয়োজনীয় এমন কি ক্ষতি বলে বিবেচনা করে তাঁকে পুনরায় লিখলেন, ঐ সমস্ত লোকেরা এখন নীরব রয়েছে, তাঁরা আপনার জন্য মোটেই ক্ষতিকর নয়। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হলে তারা সবাই আপনার শত্রুদের সাথে গিয়ে মিলিত হবে এবং তখন তাঁরা আপনার জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রমাণিত হবে। অতএব তাদেরকে এই অবস্থায়ই ছেড়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু এই পত্র প্রাপ্তির পর হযরত আলীর দূতেরা অত্যন্ত জোর দিয়ে বলল যে, কায়স নিশ্চয়ই গোপনে আমীরে মুআবিয়ার সাথে ষড়যন্ত্র করছেন। আলী (রা) তাদের এ কথা বিশ্বাস করতে ইতস্তত করছিলেন। কেননা তিনি কায়সকে মিসরের জন্য অপরিহার্য মনে করতেন। আমীরে মুআবিয়া জানতে পারলেন যে, কায়সের ভূমিকা সম্পর্কে হযরত আলী (রা)-এর দরবারে সন্দেহ প্রকাশ করা হচ্ছে, তখন তিনি নিজ দরবারে প্রকাশ্যভাবে তাঁর প্রশংসা করতে থাকেন এবং সকলের কাছে বলতে শুরু করেন যে, কায়স হচ্ছে আমার পক্ষের লোক। আমি সব সময় তাঁর চিঠিপত্র পেয়ে থাকি। তিনি প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সম্পর্কে আমাকে সব সময় অবহিত করেন। কখনো কখনো তিনি জনসমাবেশে এও বলেন যে, যারা মিসরে উসমান (রা) হত্যার কিসাস দাবী করছে কায়স তাদের যথার্থ সম্মান ও মর্যাদা এবং অনেক বড় বড় উপহার-উপঢৌকন প্রদান করেছেন। দামিশকে অবস্থানরত হযরত আলী (রা)-এর গুপ্তচররা আমীরে মুআবিয়ার ঐ সমস্ত কথাবার্তা সম্পর্কে তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে অবহিত করে এবং তারই ফলশ্রুতিতে আলী (রা) কায়সকে পদচ্যুত করে মুহাম্মদ ইবন আবূ বকর (রা)-কে মিসরের গভর্নর নিয়োগ করেন। মুহাম্মদ ইবন আবূ বকর মিসরে পৌঁছে কায়সকে তাঁর পদচ্যুতি ও নিজের নিয়োগপত্র দেখালে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত ও মর্মাহত হন এবং মিসর থেকে সোজা মদীনা অভিমুখে যাত্রা করেন।

আলী (রা)-এর মদীনা থেকে চলে আসার পর সেখানে কারোরই শাসন-কর্তৃত্ব ছিল না। সেখানে এমন লোকও ছিলেন, যারা তাঁর খিলাফতকে ন্যায়ানুগ বলে স্বীকার করতেন এবং তাঁর প্রত্যেকটি হুকুম অবশ্য পালনীয় মনে করতেন। আর এ ধরনের লোকের সংখ্যাও ছিল প্রচুর যারা উসমান (রা)-এর হত্যাকারীদের থেকে কিসাস গ্রহণ না করার কারণে খুবই অস্বস্তির মধ্যে ছিলেন এবং এ ব্যাপারে আলী (রা)-এর বিলম্ব ও উপেক্ষাকে অত্যন্ত আপত্তির চোখে দেখতেন। তারা তাঁকে অভিযুক্ত করার ব্যাপারেও ছিলেন দ্বিধাহীন। কায়স ইবন সা'দ মদীনায় পৌঁছলে আমীরে মুআবিয়া প্রায় সাথে সাথেই মারওয়ানকে এই বলে মদীনায় প্রেরণ করেন যে, যেভাবেই হোক কায়সকে বুঝিয়ে সঙ্গে করে সিরিয়ায় নিয়ে আস। মারওয়ান প্রথম প্রথম কায়সকে বোঝান। এতে কোন ফলোদয় না হলে মারওয়ান তাকে এমনভাবে বিরক্ত শুরু করে যে, তিনি তা সহ্য করতে না পেরে মদীনা থেকে সোজা কূফায় হযরত আলীর কাছে চলে যান। তিনি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন। এতে আলী (রা) নিশ্চিত হয়ে তাঁকে আপন সভাসদ হিসাবে গ্রহণ করেন। মুআবিয়া (রা) এ খবর পেয়ে মারওয়ানকে লিখেন, তুমি যদি এক লক্ষ বীরযোদ্ধার একটি বাহিনী দিয়ে আলী (রা)-কে সাহায্য করতে তবে সেটাও কায়সের তাঁর কাছে চলে যাওয়া থেকে ছিল অধিক শ্রেয়।

মুহাম্মদ ইবন আবূ বকর মিসরে পৌঁছে নিরপেক্ষ লোকদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা দিলেন : হয় তোমরা আমার বশ্যতা স্বীকার কর এবং আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা)-এর বায়'আতের অন্তর্ভুক্ত হও, অন্যথায় আমাদের দেশ ছেড়ে চলে যাও। তারা বলল, আমাদের সাথে যুদ্ধ বা আমাদের উপর বাড়াবাড়ি করার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না। অন্তত কিছুদিন অবকাশ দিন, যাতে আমরা আমাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করতে পারি। কিন্তু মুহাম্মদ ইবন আবূ বকর বললেন, তোমাদের কোন মতেই অবকাশ দেওয়া যেতে পারে না। আর নবাগত গভর্নরের এই জবাব শুনে তড়িৎ গতিতে নিজেদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে এবং তাকে প্রতিরোধের জন্যও যথার্থ প্রস্তুতি নেয়। ফলে মুহাম্মদ নিজে তাঁর সৃষ্ট এই সমস্যায় এমনভাবে জড়িয়ে পড়েন যে, সিফ্ফীন যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাতে নিমজ্জিত থাকেন। অপর দিকে আমীরে মুআবিয়া মিসরের দিক থেকে একেবারে নিশ্চিত হয়ে সিফ্ফীন যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত হন।

মুআবিয়া (রা)-এর কাছে আমর ইবনুল 'আস (রা)-এর উপস্থিতি

ফারূকী খিলাফত আমলে হযরত আমর ইবনুল 'আস (রা) মিসর জয় করে তা ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করেন। যখন বিদ্রোহীরা মদীনায় প্রবেশ করে হযরত উসমান (রা)-কে অবরোধ করে তখন তিনি মদীনায় ছিলেন। বিদ্রোহীদের অবাঞ্ছিত আচরণ এবং তাদের এই বিশৃংখলার অশুভ পরিণামের কথা চিন্তা করে তিনি মদীনা থেকে চলে যাওয়া সমীচীন মনে করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি আপন দুই পুত্র আবদুল্লাহ এবং মুহাম্মদকে সঙ্গে নিয়ে মদীনা থেকে সোজা বায়তুল মুকাদ্দাসে চলে যান। তিনি সেখান থেকে অত্যন্ত গভীরভাবে দেশের পরিস্থিতির উপর লক্ষ্য রাখেন এবং দৈনন্দিন ঘটনাবলীরও খোঁজ-খবর নিতে থাকেন। তিনি প্রথমে উসমান (রা)-এর শাহাদতের সংবাদ পান। এরপর জানতে পারেন যে, আলী (রা)-এর হাতে বায়'আত নেওয়া হয়েছে। কিন্তু তিনি (আলী) উসমানের হত্যাকারীদের কিসাস গ্রহণে ইতস্তত করছেন। তিনি আরও শুনতে পান যে, তালহা এবং যুবায়র (রা) আয়িশা (রা)-কে সঙ্গে নিয়ে বসরার দিকে যাত্রা করেছেন এবং আমীরে মুআবিয়া বায়'আত গ্রহণে অস্বীকার করে উসমান হত্যার কিসাস দাবী করেছেন। তিনি আরও শুনতে পান যে, আলী (রা)-ও বসরার দিকে যাত্রা করেছেন। এর পর পরই সংবাদ পান যে, তালহা, যুবায়র (রা) উভয়ই জামাল যুদ্ধে শাহাদতবরণ করেছেন এবং আলী (রা) বসরার উপর তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠা করে আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা)-কে সেখানকার গভর্নর নিয়োগ করে নিজে কূফায় চলে গেছেন এবং সেখান থেকে সিরিয়া আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তিনি এও শুনতে পান যে, আমীরে মুআবিয়া (রা)-ও আলী (রা)-এর আক্রমণ প্রতিহত করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

এই সংবাদ শুনে হযরত আমর ইবনুল 'আস (রা) তাঁর পুত্রদ্বয়ের সাথে পরামর্শ করেন। তিনি তাদের বলেন, এখনি যথার্থ সময় যে, আমি আমীরে মুআবিয়ার কাছে চলে যাব এবং খিলাফতের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে এর একটা প্রতিবিধান করবো। জামাল যুদ্ধের পূর্বে চার ব্যক্তি খিলাফতের দাবীদার ছিলেন। প্রথমত আলী (রা)। তিনি তো খলীফা নির্বাচিতই হয়েছিলেন এবং লোকেরা তাঁর হাতে বায়'আতও করেছিল। দ্বিতীয়ত হযরত তালহা (রা)। বসরাবাসীরা ছিল তাঁর সমর্থক ও সাহায্যকারী। তাঁরা তাঁকে খলীফার পদের যোগ্য মনে করত। তৃতীয়ত হযরত যুবায়র (রা)। তাঁর ভক্ত এবং তাঁকে খলীফা পদের যোগ্য বিবেচনাকারীর সংখ্যা কূফায়

ছিল সবচেয়ে বেশী। চতুর্থত আমীরে মুআবিয়া (রা)। তিনি সিরিয়ার গভর্নর ছিলেন এবং হযরত আবূ বকর (রা)-এর আমল থেকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন ছিলেন। দীর্ঘদিন থেকে সিরিয়ার শাসনভার তাঁর হাতে ন্যস্ত ছিল। হযরত উসমান (রা)-এর আত্মীয় স্বগোত্রীয় এবং উত্তরাধিকারী হওয়ার কারণে তিনি (মুআবিয়া) তাঁর হত্যা প্রতিশোধ 'কিসাস' গ্রহণের দাবী উত্থাপন করেছেন। এবার হযরত তালহা ও যুবায়র (রা)-এর শাহাদত বরণের পর শুধুমাত্র দু'ব্যক্তিই খিলাফতের দাবীদার রয়ে গেছেন। আমীরে মুআবিয়া বলেছেন, হযরত আলী (রা) হলেন বিদ্রোহীদের নির্বাচিত খলীফা যারা উসমান (রা)-কে শহীদ করেছে। এমন শীর্ষস্থানীয় অনেক সাহাবী তখন মদীনার বাইরে ছিলেন, খলীফা নির্বাচন বা ইতিপূর্বেকার খলীফাদের বায়'আতের ক্ষেত্রে যাঁদের অংশগ্রহণকে অপরিহার্য বিবেচনা করা হয়েছে। অথচ এই নির্বাচনে তাঁদের কাছ থেকে কোন পরামর্শও গ্রহণ করা হয়নি। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো, আলী (রা) হযরত উসমানের হত্যাকারীদেরকে তাঁরই বাহিনীতে আশ্রয় দিয়ে রেখেছেন। অপর দিকে তিনি বলছেন, মু'আবিয়া (রা) ইসলামের জন্য ত্যাগ স্বীকার এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকটাত্মীয় ও ইসলাম গ্রহণে অগ্রণী হওয়ার ক্ষেত্রে কোন মতেই আমার সাথে মুকাবিলা করতে পারবে না। মোটকথা, তারা একে অন্যের বিরুদ্ধে অগ্রগণ্যতার দাবী করছেন। এমতাবস্থায় আমি নিজেকে এসব ব্যাপার থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা সমীচীন মনে করি না। আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) পিতাকে পরামর্শ দেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা), হযরত আবূ বকর, হযরত উমর ও উসমান (রা) সকলেই তাঁদের জীবনের অন্তিম সময় পর্যন্ত আপনার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন। অতএব আমি এটাই সমীচীন মনে করি যে, আপনি ঘরের দরজা বন্ধ করে একেবারে চুপচাপ বসে থাকুন, যতক্ষণ না লোকেরা কোন এক ব্যক্তি সম্পর্কে ঐকমত্যে পৌঁছে। কিন্তু অপর পুত্র মুহাম্মদ বললেন, আপনি হচ্ছেন আরবের গণ্যমান্য, প্রভাবশালী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদের অন্যতম। অতএব আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত হস্তক্ষেপ না করবেন ততক্ষণ এ বিষয়টির কোন চূড়ান্ত ফায়সালা হবে না।

আমর ইবনুল 'আস (রা) তাঁর উভয় পুত্রের বক্তব্য শুনে বলেন, আমি আবদুল্লাহ্র পরামর্শের মধ্যে ধর্মের মঙ্গল এবং মুহাম্মদের পরামর্শের মধ্যে দুনিয়ার মঙ্গল লক্ষ্য করছি। অতঃপর তিনি এ সম্পর্কে আরো কিছুটা ভেবে-চিন্তে বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে রওয়ানা হন এবং দামিশকে হযরত আমীরে মু'আবিয়ার কাছে চলে যান। আমীরে মু'আবিয়া তাঁর উপস্থিতিকে একটি বিরাট সৌভাগ্যের লক্ষণ বলে মনে করেন। আমর ইবনুল 'আস আমীরে মুআবিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করে সর্বপ্রথম যে কথাটি বলেন তা হলো মজলুম খলীফার হত্যার প্রতিশোধ অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। আপনি এ ব্যাপারে যে দাবী উত্থাপন করেছেন তা ঠিক ও যথার্থ। প্রথম প্রথম আমীরে মু'আবিয়া (রা) অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তাঁর সঙ্গে মেলামেশা করেন। এরপর তাঁর উপর পরিপূর্ণ আস্থা স্থাপন করে তাঁকে তার উপদেষ্টা নিয়োগ করেন। হযরত আমর (রা) আমীরে মুআবিয়াকে পরামর্শ দেন : হযরত উসমান (রা)-এর রক্তাক্ত জামা এবং তাঁর স্ত্রী নায়লার কর্তিত অঙ্গুলীসমূহ এভাবে প্রতিদিন জনসমুদ্রে দর্শনের প্রয়োজন নেই। অন্যথায় এ ব্যাপারে মানুষের আগ্রহ উচ্ছ্বাস ক্রমে ক্রমে অবদমিত হয়ে যাবে। অতএব শুধু বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে এগুলো প্রদর্শন করা উচিত। আমীরে মু'আবিয়া তাঁর এই অভিমত পসন্দ করেন। ফলে জামা ও অঙ্গুলী সামনে রেখে প্রতিদিন যে আহাজারির রোল উঠত তা বন্ধ

হয়ে যায়। আমর (রা) আমীরে মু'আবিয়াকে এটাও বোঝান যে, জামাল যুদ্ধের কারণে প্রকৃতপক্ষে হযরত আলী (রা)-এর সামরিক শক্তি অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়েছে। কেননা জামাল যুদ্ধে কম করে হলেও আট নয় হাজার লোক নিহত হয়েছে। এই নিহতদের মধ্যে অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিও রয়েছেন। এখন যখন বসরাবাসীরা হযরত আলীর হাতে বায়'আত করেছেন তখন তারা কূফাবাসীদের সাথে মিশে যাবে এবং এই মিশ্রিত বাহিনী স্বাভাবিকভাবেই মনেপ্রাণে কখনো যুদ্ধ করবে না। তাদের মধ্যে সব সময়ই অনৈক্য বিরাজ করবে। আমর ইবনুল 'আস (রা)-এর এই অনুমান অমূলক ছিল না। অবশ্যই এই রহস্য সম্পর্কে সাবাঈ দলও অবহিত ছিল।

সিফ্ফীন যুদ্ধের পটভূমি

হযরত আলী (রা) কূফায় গিয়ে সিরিয়া আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণে মনোনিবেশ করেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) তাঁর বাহিনী নিয়ে বসরা থেকে রওয়ানা হন। এই সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে আলী (রা)-ও কূফায় আবূ মাসঊদ আনসারী (রা)-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করে নাখীলায় চলে যান এবং সেনাবাহিনীর শৃংখলা বিধানে আত্মনিয়োগ করেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)-ও বসরী বাহিনী নিয়ে সেখানে এসে পৌঁছেন। সেখান থেকে আলী (রা) যিয়াদ ইব্ন নাসর হারিছীর নেতৃত্বে অগ্রবর্তী বাহিনী হিসাবে আট হাজার সৈন্য প্রেরণ করেন। এরপর শুরায়হ ইব্ন হানীর নেতৃত্বে চার হাজার সৈন্যের আর একটি বাহিনী যিয়াদের পিছে পিছে প্রেরণ করেন। তিনি নিজে নাখীলা থেকে রওয়ানা হয়ে মাদায়েনে গিয়ে পৌঁছেন এবং সেখানে মাসঊদ সাকাফীকে গভর্নর নিয়োগ করে মাকাল ইব্ন কায়সের নেতৃত্বে তিন হাজার সৈন্য প্রেরণ করেন। এরপর তিনি মাদায়েন থেকে রিক্কার দিকে রওয়ানা হন। তিনি রিক্কার নিকটস্থ ফুরাত নদী অতিক্রম করেন এবং সেখানে যিয়াদ, শুরায়হ, মাকাল প্রমুখ অধিনায়কের বাহিনীগুলোকে একত্রিত করেন। অপর দিকে হযরত মুআবিয়া যখন জানতে পারেন যে, আলী (রা) এক বিরাট বাহিনী নিয়ে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছেন তখন তিনি আবুল আওয়ার সালামীর নেতৃত্বে একটি অগ্রবর্তী বাহিনী প্রেরণ করেন। আলী (রা) ফুরাত নদী অতিক্রম করার পর যিয়াদ এবং শুরায়হ্ উভয়ে পুনরায় অগ্রবর্তী বাহিনীর অধিনায়ক হিসাবে প্রেরণ করেন। যিয়াদ ও শুরায়হ্ সিরিয়া সীমান্তে প্রবেশ করার পর জানতে পারেন যে আবুল আওয়ার সালামী সিরিয়া থেকে একটি বাহিনী নিয়ে আসছে। তারা সঙ্গে সঙ্গে হযরত আলী (রা)-কে এ সম্পর্কে অবহিত করেন। আলী (রা) তখন আশতারকে প্রেরণ করেন এবং নির্দেশ দেন : তুমি যখন যিয়াদ ও শুরায়হের কাছে গিয়ে পৌঁছবে তখন সমগ্র বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করে যিয়াদ ও শুরায়হকে যথাক্রমে ডান পাশের ও বাম পাশের বাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করবে। আর সিরীয় বাহিনী যতক্ষণ না তোমাদের উপর হামলা করে, তোমরা তাদের উপর হামলা করবে না। আশতার সেখানে গিয়ে সমগ্র বাহিনীর অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন এবং যিয়াদ ও শুরায়হকে যথাক্রমে ডান পাশের ও বামপাশের বাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করেন। অপর দিকে আবুল আওয়ারও তাদের মুখামুখি তাঁবু স্থাপন করেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উভয় বাহিনী পরস্পরের বিপরীত নিজ নিজ তাঁবুতে অবস্থান করে। কিন্তু ঠিক সন্ধ্যার পর আবুল আওয়ার হামলা করে বসেন। তবে কিছুক্ষণ যুদ্ধ করার পর উভয় বাহিনী পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে যায়। পরদিন সকাল বেলা আবুল আওয়ার তার বাহিনীর সম্মুখসারি থেকে

যুদ্ধক্ষেত্রে এগিয়ে আসেন। অপর দিক থেকে হাশিম ইব্‌ন উত্‌বা এগিয়ে গিয়ে তার মুকাবিলা করেন। আসরের সময় পর্যন্ত উভয়ে যুদ্ধ করতে থাকেন। এরপর তাঁরা পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে নিজ নিজ বাহিনীর দিকে ফিরে যাচ্ছিলেন। এমন সময় আশতার তার বাহিনীকে প্রতিপক্ষের উপর আক্রমণের নির্দেশ দেন। আবুল আওয়ারও আপন লোকদের হামলার নির্দেশ দেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলে। তবে রাতের আধার ঘনিয়ে আসায় সেদিনকার মত তা মুলতবি হয়ে যায়।

পরদিন হযরত আলী (রা)-ও সেখানে এসে পৌছেন এবং জানা যায় যে, আমীরে মুআবিয়া (রা)-ও আপন বাহিনী নিয়ে শীঘ্রই সেখানে এসে পৌছেছেন। এ খবর পেয়ে আলী (রা) আশতারকে নির্দেশ দেন : তুমি তাড়াতাড়ি ফুরাত উপকূলে পৌছে পানির উপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা কর। কিন্তু আশতার সেখানে পৌছে দেখতে পান, মুআবিয়া (রা) ইতিমধ্যে পানির উপর নিজের দখল প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছেন। আলী (রা) এ সংবাদ পেয়ে সা'সা' ইব্‌ন সাওহানকে একটি পয়গামসহ মুআবিয়া (রা)-এর কাছে পাঠান। উক্ত পয়গামে আমীরে মুআবিয়াকে সম্বোধন করে বলা হয় : আমরা তোমাদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত লড়ব না, যতক্ষণ না তোমাদের ওযর-আপত্তি শ্রবণ করি এবং সত্য প্রচারের মাধ্যমে তোমাদের উপর হুজ্জত (দলীল) প্রতিষ্ঠা করি। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় যে, তোমরা ফুরাত দখল করে আমাদের পানি বন্ধ করে দিয়েছ। ফলে পিপাসায় মানুষ কাতর হয়ে পড়েছে। তোমরা তোমাদের লোকদেরকে নির্দেশ দাও যাতে নদী থেকে পানি নিতে ওরা আমাদের বাধা না দেয়, যতক্ষণ না আমাদের মধ্যকার বিবাদের একটা মীমাংসা হয়ে যায়। আর তোমরা যদি এই চাও যে, যে উদ্দেশ্যে আমরা এখানে এসেছি সেটা ভুলে গিয়ে তোমরা পানিকে উপলক্ষ করেই যুদ্ধ করবে এবং এই যুদ্ধে যে জয়ী হবে একমাত্র সেই পানি পান করার অধিকার পাবে তাহলে তার জন্যও আমরা প্রস্তুত রয়েছি। আমীরে মুআবিয়া সঙ্গে সঙ্গে আপন উপদেষ্টাদের ডেকে পাঠান এবং তাদের সামনে বিষয়টি পেশ করেন। তখন মিসরের প্রাক্তন গভর্নর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'দ এবং ওয়ালীদ ইব্‌ন উকবা বলেন, পানির উপর থেকে আমাদের অধিকার প্রত্যাহার করা চলবে না, বরং ওদেরকে তৃষিত রেখেই মারতে হবে। কেননা ওরা হযরত উসমান (রা)-এর পানি বন্ধ করে দিয়েছিল এবং তৃষিত অবস্থায়ই তাঁকে শহীদ করেছে। কিন্তু আমর ইবনুল 'আস (রা) তাদের বিরোধিতা করে বলেন, পানি বন্ধ করা কিংবা আলী (রা)-এর বাহিনীকে তৃষ্ণায় কষ্ট দেওয়া মোটেই উচিত হবে না। এই বৈঠকেই সা'সা' এবং ওয়ালীদ ইব্‌ন উকবার মধ্যে কিছুটা শক্ত কথা কাটাকাটি হয়, এমন কি তা গালিগালাজের পর্যায়ে গিয়ে পৌছে। সা'সা' সেখান থেকে অসন্তুষ্ট হয়ে আলী (রা)-এর কাছে আসেন এবং বলেন, ওরা আমাদের পানি আনার অনুমতি দেয় না। আলী (রা) আশআস্ ইব্‌ন কায়সকে একটি বাহিনীসহ প্রেরণ করেন। এবং বলেন, তোমরা জোর করে পানির উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা কর। অপর দিকে আবুল আওয়ার সালামীও মুকাবিলার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং উভয় পক্ষের মধ্যে রক্তাক্ত যুদ্ধ শুরু হয়। কিন্তু যুদ্ধের একটা চূড়ান্ত ফায়সালা হওয়ার পূর্বেই আমর (রা) মু'আবিয়া (রা)-কে বুঝিয়ে বলেন, যদি আপনি পানির উপর থেকে আপনার দখল প্রত্যাহার না করেন, আর আলী (রা)-এর লোকেরা পানিতে কষ্ট পায় তাহলে অনিবার্যভাবে আপনার বাহিনীর অনেক লোকের অন্তরেই ওদের প্রতি দয়া ও করুণার উদ্রেক হবে এবং তারা আপনাকে পরিত্যাগ করে

আলীর বাহিনীতেই গিয়ে যোগ দেবে। অতঃপর তারা আপনাকে পাষাণ-হৃদয় ও জুলুমের অভিযোগে অভিযুক্ত করবে এবং আলীর পক্ষ নিয়ে আপনার বিরুদ্ধে লড়বে। আমীরে মু'আবিয়া তখনই আপন বাহিনীর মধ্যে ঘোষণা দেন : বিপক্ষ দলকে পানি থেকে বাধা দেওয়া বা পানিতে কষ্ট দেওয়া চলবে না। এভাবে একটি হাঙ্গামা চরম আকার ধারণ করার পূর্বেই প্রশমিত হয়ে যায়।

এরপর দু'দিন পর্যন্ত যুদ্ধ ছাড়াই উভয় বাহিনী পরস্পরের বিপরীতে নীরবে অবস্থান করে। ইতিমধ্যে হিজায, ইয়ামন ও আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এবং হামাদান প্রভৃতি ইরানী অঞ্চল থেকে অনেক লোক আলী (রা)-এর বাহিনীতে এসে যোগ দেয় এবং বাহিনীর মোট সৈন্য সংখ্যা নব্বই হাজারে গিয়ে দাঁড়ায়। আমীর মুআবিয়ার বাহিনীর মোট সৈন্যসংখ্যা ছিল আশি হাজার। দুই বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন যথাক্রমে হযরত আলী ও হযরত মু'আবিয়া (রা)। উভয় বাহিনীর বড় বড় অংশের জন্য পৃথক পৃথক অধিনায়ক নিয়োগ করা হয়। আলী (রা)-এর বাহিনীতে আশতারকে কূফার অশ্বারোহী বাহিনীর, সুহায়ল ইব্‌ন হানাফীকে বসরার অশ্বারোহী বাহিনীর, আম্মার ইব্‌ন ইয়াসিরকে কূফার পদাতিক বাহিনীর এবং কায়স ইব্‌ন সা'দকে বসরার পদাতিক বাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করা হয়। অবশিষ্ট গোত্রসমূহ এবং প্রদেশসমূহের বাহিনীসমূহের জন্য পৃথক পৃথক অধিনায়ক নিয়োগ করা হয় এবং তাদেরকে পৃথক পৃথক পতাকাও প্রদান করা হয়। আর আমীরে মু'আবিয়ার বাহিনীতে যুলকালা' হামীরীকে ডান পাশের বাহিনীর, হাবীব ইব্‌ন মাসলামাকে বামপাশের বাহিনীর, আবুল আওয়ার সালামীকে সম্মুখবর্তী বাহিনীর, আমর ইবনুল 'আসকে দামিশকের অশ্বারোহী বাহিনীর এবং মুসলিম ইব্‌ন ওকবাকে পদাতিক বাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করা হয়। এছাড়াও বাহিনীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের জন্য আবদুর রহমান ইব্‌ন খালিদ, উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন উমর, বশীর ইব্‌ন মালিক কিনদী প্রমুখকে অধিনায়ক নিয়োগ করা হয়।

উভয় বাহিনীর নীরবতার পর তৃতীয় দিন (হিজরী ৩৬ সনের ১লা যিলহাজ্জ) আলী (রা), মুআবিয়া (রা)-কে বুঝিয়ে আনুগত্য স্বীকারে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তাঁর কাছে বশীর ইব্‌ন আমর ইব্‌ন মুহসিন আনসারী, সাঈদ ইব্‌ন কায়স এবং শীছ ইব্‌ন রিবঈ তামীমীর সমন্বয়ে একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন। এই প্রতিনিধিদল আমীরে মু'আবিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করে সর্ব প্রথম বশীর ইব্‌ন আমর বলেন, 'হে মুআবিয়া! তুমি মুসলমানদের মধ্যে দলাদলি ও রক্তারক্তির সৃষ্টি করো না। মু'আবিয়া উত্তরে বলেন, তুমি তোমার বন্ধু আলীকেও এই উপদেশ দিয়েছ কি ? বশীর (রা) উত্তরে বলেন, ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকটাত্মীয় হওয়ার কারণে তিনি খিলাফত পদের অধিক হকদার। অতএব তোমার উচিত তাঁর হাতে বায়'আত করা। মু'আবিয়া (রা) উত্তরে বলেন, এটা কোন মতেই সম্ভব নয় যে, আমরা উসমান হত্যার দাবী ছেড়ে দেব। শীছ ইব্‌ন রিবঈ বলেন, হে মুআবিয়া, তুমি উসমান হত্যার কিসাসের যে দাবী করছ তার অন্তরালে তোমার কি মতলব লুকিয়ে রয়েছে তা আমরা ভাল করেই বুঝি। তুমি উসমানের সাহায্যে এগিয়ে যেতে এজন্য বিলম্ব করেছ যাতে তিনি শহীদ হয়ে যান এবং তুমি তাঁর খুনের দাবীকে উপলক্ষ করে খিলাফতের দাবী উত্থাপন করতে পার। হে মুআবিয়া ! তুমি তোমার ঐ খামখেয়ালী থেকে বিরত হও এবং আলীর সাথে ঝগড়া করতে যেয়ো না। মুআবিয়া তখন অত্যন্ত কঠোর ভাষায় শীছের উত্তর দেন। শীছও ছেড়ে কথা বলার পাত্র নন।

তিনিও মুআবিয়ার উদ্দেশ্যে কঠোর ভাষা ব্যবহার করেন। শেষ পর্যন্ত প্রতিনিধিদল আপোস-মীমাংসায় ব্যর্থ হয়ে আলী (রা)-এর কাছে ফিরে আসে।

সিফ্‌ফীন যুদ্ধের সূচনা

আপোস মীমাংসার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার সাথে সাথে উভয় পক্ষই যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু করে। কিন্তু যেহেতু উভয় পক্ষই ছিল মুসলমান, সর্বোপরি তারা ছিল একে অন্যের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু, তাই কারো অন্তরেই যুদ্ধ করার সেরূপ আগ্রহ বা প্রেরণা ছিল না, যেরূপ কাফিরদের বেলায় হয়ে থাকে। সাধারণভাবে লোকেরা চাচ্ছিলো যেন যুদ্ধ না বাঁধে এবং যে কোনভাবে আপোস-মীমাংসার পথ বেরিয়ে উভয় পক্ষ থেকে একজন করে লোক যুদ্ধক্ষেত্রে বেরিয়ে আসত এবং পরস্পরের সাথে মল্লযুদ্ধে লিপ্ত হত আর বাকীরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখত। কিছুদিন পর্যন্ত প্রতিদিনই এ ধরনের যুদ্ধ চলতে থাকে। এরপর যুদ্ধের ক্ষেত্র কিছুটা সম্প্রসারিত হয়। উভয় পক্ষের এক একজন অধিনায়ক নিজ নিজ পক্ষ থেকে সীমিত সংখ্যক সৈন্য নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে এগিয়ে আসত এবং উভয় পক্ষের এই দুই ক্ষুদ্র বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ চলতে থাকত। আর বাকী সৈন্যরা নিজ নিজ জায়গায় নীরবে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখত। একমাস পর্যন্ত এ ধরনের মুকাবিলা চলতে থাকে। অন্য কথায় বলতে গেলে একমাস পর্যন্ত উভয় বাহিনী তাদের ভাবী রক্তাক্ত যুদ্ধের জন্য পরস্পরের মধ্যে মহড়া দিতে থাকে। এক মাসের এই বিচ্ছিন্ন যুদ্ধকে সিফ্‌ফীন যুদ্ধের প্রথম ভাগ আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। যিলহাজ্জ মাস শেষ হয়ে মুহাররম মাস আরম্ভ হলে (১লা মুহাররম ৩৭ হিজরী) উভয় পক্ষই এক মাসের জন্য সম্পূর্ণরূপে যুদ্ধ বন্ধ রাখে। এই একমাস উভয় পক্ষের সৈন্যরা একেবারে নীরব থাকে এবং এই অবকাশে পুনরায় আপোস-মীমাংসার কথাবার্তা চলতে থাকে। এখানে একটি কথা প্রণিধানযোগ্য যে, মুহাররমের এই এক মাস পরস্পরের উপর কোনরূপ আঘাত না করে উভয় বাহিনীকে নীরবে নিজ নিজ তাঁবুতে অবস্থান করা একথারই স্পষ্ট প্রমাণ যে, উভয় বাহিনীই মনে করত, যুদ্ধের চেয়ে আপোস-মীমাংসাই ভাল এবং মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যকার যুদ্ধ মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। যখন সকল যোদ্ধার মধ্যেই এই মনোবৃত্তির সৃষ্টি হয় তখন তাদের অধিনায়করাও কোন না কোনভাবে একটা আপোস চুক্তিতে উপনীত হতে বাধ্য হন। কিন্তু এই শান্তি ও নীরবতার দিনগুলোতে সাবাঈ দল, যারা ছদ্মবেশে হযরত আলী (রা)-এর বাহিনীতে অবস্থান করছিল এবং যাদের পৃথক কোন পরিচয় ছিল না, অশান্তি সৃষ্টির ব্যাপারে অত্যন্ত তৎপর থাকে। উভয় পক্ষের মধ্যে যাতে সহানুভূতি ও ভালবাসার সৃষ্টি না হয়ে ঘৃণা-বিদ্বেষের সৃষ্টি হয় সেজন্য তারা সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়। আর উভয় বাহিনীর অধিনায়কদের অবস্থান ছিল এই যে, আলী (রা)-এর পক্ষে তো খিলাফত ত্যাগ করা কোনমতেই সম্ভব ছিল না। আবার এই মুহূর্তেই হযরত উসমান (রা)-এর হত্যাকারী এবং বিদ্রোহীদের শাস্তি প্রদান করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। কেননা মালিক আশতারের মতো প্রতাপশালী সেনাপতি, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর (রা)-এর মত গভর্নর ও আম্মার ইব্‌ন ইয়াসিরের মত সম্মানিত সাহাবীকে শাস্তি প্রদান এবং সমগ্র কূফা ও মিসরীয় বাহিনীকে শত্রুতে পরিণত করা মোটেই সহজ ব্যাপার ছিল না। তা ছাড়া যে অবস্থায় ঐ হত্যাকাণ্ড ঘটে তাতে হত্যাকারী ও ষড়যন্ত্রকারীদেরকে সাক্ষ্য-প্রমাণের মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে চিহ্নিত করাও সম্ভব ছিল না। সর্বোপরি আলী (রা) আমীরে মুআবিয়ার মুকাবিলায় খিলাফতের পদের জন্য সব দিক দিয়েই যে অধিক যোগ্য ছিলেন তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ ছিল না।

অপর দিকে আমীরে মুআবিয়া মক্কার রইস এবং উহুদ ও আহযাবের বিরাট যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি আবূ সুফিয়ানের পুত্র হওয়ার কারণে আরবের আমীর বলে মনে করতেন। উপরন্তু তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহধর্মিণী উম্মে হাবীবা (রা)-এর ভাই এবং ওয়াহী লেখক। উসমানের উত্তরাধিকারী হওয়ার দিক দিয়ে উসমান হত্যার কিসাস দাবী করা তিনি নিজের একটি পবিত্র অধিকার জ্ঞান করতেন। এত বড় একটি হত্যাকাণ্ডের হোতাদের খুঁজে বের করা কঠিন বলে কারো উপর থেকে কিসাস গ্রহণ না করা, তাঁর মতে, একটি সাক্ষাত জালিয়াতি ছাড়া কিছু নয়। হযরত আলী (রা)-এর কোন ব্যাখ্যাই তাঁর বোধগম্য হচ্ছিল না। অন্য কথায়, তিনি তা বুঝতে চাচ্ছিলেন না। আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে তালহা (রা) ও যুবায়র (রা)-এর বিদ্রোহ, মদীনার বেশ কয়েকজন সাহাবী তাঁর হাতে বায়'আত হওয়া থেকে এবং তাঁর (মুআবিয়া) প্রতি আমর ইবনুল 'আস প্রমুখের সহায়তা আমীরে মুআবিয়ার আস্থা ও বিশ্বাসকে আরো জোরদার করে দিয়েছিল। উভয় পক্ষের নেতৃবৃন্দ নিজ নিজ দাবী ও সংকল্প পুনর্বিবেচনা করতে এবং উচ্চাশা ত্যাগ করতে নিশ্চয়ই বাধ্য হতেন, যদি তাদের সঙ্গীসাথী এবং সৈন্যরা নিজেরা সঠিক পথে এসে এর পর নিজেদের নেতৃবৃন্দের উপরও সঠিক পথে আসার জন্য চাপ প্রয়োগ করত। এজন্য ঐ বিরতিকাল তথা মুহাররম মাস ছিল একটি যথার্থ মাস। কিন্তু সাবাঈ দল এমনভাবে ষড়যন্ত্রের পর ষড়যন্ত্র চালায় যে, মুসলমানরা শেষ পর্যন্ত একটা আপোস-মীমাংসায় উপনীত হতে ব্যর্থ হয়।

বিরতিকালীন পুনরায় আপোস-মীমাংসার চেষ্টা

যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার পর হিজরী ৩৭ সনের কোন এক সময়ে হযরত আলী (রা) আমীরে মুআবিয়ার সাথে একটা আপোস-মীমাংসায় উপনীত হওয়ার জন্য পুনরায় তাঁর কাছে একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন। তাতে আদী ইবন হাতিম, যায়দ ইবন কায়স, যিয়াদ ইবন হাসফাহ্ ও শীছ ইবন রিবঈ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। শীছ ইবন রিবঈ প্রথম প্রতিনিধি দলেও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং সেবার তাঁর সাথে আমীরে মুআবিয়ার শক্ত কথা কাটাকাটিও হয়েছিল। অতএব পুনরায় শীছকে প্রতিনিধিদলের অন্তর্ভুক্ত করা ঝুঁকিমুক্ত ছিল না। প্রতিনিধি দলটি আমীরে মুআবিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করে নিজেদের কর্তব্য পালন করে। প্রথমে আদী ইবন হাতিম (রা) আল্লাহর প্রশংসা ও রাসূলের গুণগান করার পর বলেন, হে মুআবিয়া! তুমি আলী (রা)-এর আনুগত্য স্বীকার কর। তুমি বায়'আত করলে মুসলমানরা পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবে। তুমি ও তোমার বন্ধুরা ছাড়া কেউই বায়'আত থেকে বিরত থাকে নি। যদি তুমি এই বিরোধিতা অব্যাহত রাখ তাহলে পুনরায় জামাল যুদ্ধের মতো দুঃখজনক ঘটনাও ঘটে যেতে পারে। মুআবিয়া (রা) তাঁর কথায় ছেদ টেনে বলেন, হে আদী! তুমি আপোস-মীমাংসার জন্য এসেছ, না যুদ্ধ লড়াবার জন্য ? তুমি জামাল যুদ্ধের কথা বলে আমাকে কি ভয় দেখাচ্ছ ? তুমি তো জানই, আমি হচ্ছি আরবের শ্রেষ্ঠ বীর যোদ্ধাদের বংশধর। আমি যুদ্ধকে ভয় করি না। আমি জানি, তুমিও উসমান হত্যাকারীদের অন্যতম। আল্লাহ্ তোমাকেও ধ্বংস করুন। অতঃপর ইয়াযীদ ইবন কায়স বলেন, আমরা প্রতিনিধি হয়ে তোমার কাছে এসেছি। তোমাকে উপদেশ দেওয়া আমাদের কাজ নয়। কিন্তু আমাদের অবশ্যই চেষ্টা করা উচিত যাতে মুসলমানদের মধ্যে ঐক্যের সৃষ্টি হয়। এই বলে তিনি আলী (রা)-এর গুণাবলী এবং তাঁর খলীফা হওয়ার যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্যাবলী বর্ণনা করেন। এর উত্তরে মুআবিয়া (রা) বলেন, তুমি আমাকে

মুসলিম জামাআতের প্রতি কেন আহ্বান জানাচ্ছ ? মুসলিম জামাআত তো আমাদের সাথেও আছে। তাছাড়া আমি তোমাদের বন্ধুকে খলীফা পদের যোগ্য মনে করি না। কেননা তিনি আমাদের খলীফাকে হত্যা করেছেন এবং তাঁর হত্যাকারীদের আশ্রয় দিয়েছেন। আপোস-মীমাংসা তখনই হতে পারে যখন তিনি উসমান (রা)-এর হত্যাকারীদের আমাদের হাতে সমর্পণ করবেন। মুআবিয়া (রা) এই পর্যন্ত বলার পর শীছ তাঁর কথার মাঝখানে বলে উঠেন, হে মুআবিয়া! তুমি কি আম্মার ইবন ইয়াসির (রা)-কে হত্যা করবে ? মুআবিয়া উত্তর দেন, এমন কি জিনিস আছে, যা আম্মারের হত্যা থেকে আমাকে বাধা দিতে পারে ? আমি হযরত উসমানের গোলামের বিনিময়েও তাকে হত্যা করতে পারি। শীছ ইবন রিবঈ বলেন, তুমি কখনো তাকে হত্যা করতে পারবে না যতক্ষণ না ভূপৃষ্ঠ তোমার জন্য সংকীর্ণ হয়ে যায়। মুআবিয়া উত্তরে বলেন, এর আগেই ভূপৃষ্ঠ তোমার জন্য সংকীর্ণ হয়ে যাবে। এ ধরনের কথা কাটাকাটির পর এই প্রতিনিধিদলও ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে।

আলী (রা)-এর ঐতিহাসিক ভাষণ

এরপর হযরত আমীরে মুআবিয়া (রা) হাবীব ইবন মাসলামা, শুরাহবীল ইবনুস সিমত এবং মাআন ইবন ইয়াযীদের সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রতিনিধিদল আলী (রা)-এর কাছে প্রেরণ করেন। হাবীব ইবন মাসলামা আলী (রা)-কে বলেন, উসমান (রা) সত্যপন্থী খলীফা ছিলেন। তিনি কিতাব ও সুন্নাহ্ অনুযায়ী হুকুম জারি করতেন। তাঁর জীবন তোমার কাছে অসহ্য হওয়ায় তুমি তাঁকে হত্যা করেছ। যদি তুমি তাঁকে হত্যা না করে থাক তাহলে তাঁর হত্যাকারীদের আমাদের হাতে সমর্পণ কর এবং খিলাফত থেকে সরে দাঁড়াও। এরপর মুসলমানরা যাকে ইচ্ছা নিজেদের খলীফা নির্বাচন করবে। একথা শুনে আলী (রা) রাগান্বিত হন এবং বলেন, তুমি চুপ কর। রাষ্ট্র পরিচালনা ও খিলাফত সম্পর্কে এ ধরনের বক্তৃতা ঝাড়ার কোন অধিকার তোমার নেই। হাবীব ইবন মাসলামা বলেন, তুমি আমাকে শীঘ্রই সেই অবস্থায় দেখবে, যা তোমার মনঃপূত নয়। একমাত্র তরবারিই এই বিরোধের মীমাংসা করবে। আলী (রা) বলেন যাও, তোমার মন যা চায় তাই কর। এই বলে তিনি দাঁড়িয়ে যান এবং আল্লাহর প্রশংসা ও রাসূলের প্রশস্তির পর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আবির্ভাবের কথা উল্লেখ করেন। তারপর হযরত আবূ বকর ও উমর (রা)-এর অনুপম গুণাবলীর উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমরা এ দু'জনকে তাঁদের দায়িত্ব সুষ্ঠভাবে পালন করতে দেখেছি। তাই আমি রক্ত সম্বন্ধ ও আত্মীয়তার দিক দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকটতর হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের খিলাফতের ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিনি। এরপর জনসাধারণ উসমান (রা)-কে খলীফা নির্বাচন করল। তাঁর কর্মধারায় লোকেরা অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে হত্যা করে। তারপর লোকেরা আমার হাতে বায়'আত করার আবেদন জানায়। আমি তাদের আবেদনে সাড়া দেই। কিন্তু বায়'আতের পর তালহা (রা) ও যুবায়র (রা) তাঁদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন এবং মুআবিয়া (রা) আমার বিরোধিতা করতে থাকেন। অথচ তিনি আমার মত প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত নন। আমি অবাক হচ্ছি এই ভেবে যে, তোমরা কিভাবে তার অনুগত হয়ে গেলে। এমতাবস্থায় যে, আমি তোমাদেরকে কিতাব, সুন্নাহ ও আরকানে ইসলাম (ধর্মের একান্ত করণীয় বিষয়সমূহ)-এর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। আমি হক ও সত্যকে সঞ্জীবিত এবং অন্যায় ও বাতিলকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছি। শুরাহবীল ইবনুস সিমত এই বক্তৃতা শোনার পর আলী

(রা)-কে বলেন, আপনি কি এ কথার সাক্ষ্য দেন না যে, হযরত উসমান (রা)-কে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে। তিনি উত্তরে বলেন, আমি উসমান (রা)-কে মজলুমও বলি না, আবার জালিমও বলি না। একথা শুনে প্রতিনিধিদলের ব্যক্তিত্রয় এই বলে উঠে দাঁড়ান যে, যে ব্যক্তি উসমান (রা)-কে মজলুম বলে না আমরা তার প্রতি অসন্তুষ্ট এবং তাকে উপদেশ দেওয়া না দেওয়া সমান। কেননা এর কোন প্রভাবই তার উপর পড়বে না। এই ঘটনার পর আপোস-মীমাংসার আর কোন উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা চালানো হয়নি।

সিফ্‌ফীন যুদ্ধের এক সপ্তাহ

হিজরী ৩৭ সনের মুহাররম মাসের শেষ দিনে আলী (রা) আপন বাহিনীকে সাধারণভাবে জানিয়ে দেন যে, আগামীকাল অর্থাৎ ১লা সফর থেকে চূড়ান্ত যুদ্ধ শুরু হবে। তিনি এ ঘোষণাও দেন যে, আমাদের প্রতিপক্ষ যখন পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করবে তখন না তাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে, আর না তাদের হত্যা করা হবে। আহতদের সম্পদ লুট করা যাবে না। কোন লাশ বিকৃত করা চলবে না। স্ত্রী লোকেরা গালি-গালাজ করলেও তাদের উপর কোনরূপ বাড়াবাড়ি করা চলবে না। মুআবিয়া (রা)-ও অনুরূপ নির্দেশ তাঁর বাহিনীর মধ্যে জারি করেন। ১লা সফর ভোরবেলা যুদ্ধ শুরু হয়। ঐ দিন কূফাবাসীরা আশতারের নেতৃত্বে এবং সিরিয়াবাসীরা হাবীব ইবন মাসলামার নেতৃত্বে পরস্পরের মুকাবিলা করে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অবিরাম যুদ্ধ চলে। কিন্তু জয়-পরাজয়ের কোন ফায়সালা হয়নি। দ্বিতীয় দিন আলী (রা)-এর পক্ষ থেকে হাশিম ইবন উতবা অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে বের হন। সিরিয়াবাসীদের পক্ষ থেকে আবুল আওয়ার সুলামী তার মুকাবিলা করেন। ঐ দিনও সন্ধ্যা পর্যন্ত ভয়ানক যুদ্ধ চলে। কিন্তু চূড়ান্ত ফায়সালা হয়নি। তৃতীয় দিন আলী (রা)-এর পক্ষ থেকে আম্মার ইবন ইয়াসির (রা) এবং মুআবিয়া (রা)-এর পক্ষ থেকে আমর ইবনুল 'আস (রা) স্ব-স্ব বাহিনী নিয়ে বের হন। এ দিনকার যুদ্ধ ছিল প্রথম দু'দিনের যুদ্ধের চাইতেও ভয়ংকর। আম্মার ইবন ইয়াসির (রা) সন্ধ্যার খানিক পূর্বে এমন জোরদার হামলা চালান যে, আমর ইবনুল 'আস (রা)-কে কিছুটা পিছনে হটে যেতে হয়। শেষ পর্যন্ত ঐদিনও কোন ফায়সালা হল না। চতুর্থ দিন মুআবিয়া (রা)-এর পক্ষ থেকে উবায়দুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) এবং আলী (রা)-এর পক্ষ থেকে তাঁর পুত্র মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়া নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করেন। ঐ দিনও ভয়ানক যুদ্ধ হয়। যখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিল তখন উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) তাঁর বাহিনী থেকে পৃথক হয়ে মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়াকে এককভাবে তাঁর সাথে মুকাবিলা করার আহ্বান জানান। সঙ্গে সঙ্গে মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়া উচ্ছ্বাসবশে তাঁর দিকে এগিয়ে যান। কিন্তু আলী (রা) তৎক্ষণাৎ ঘোড়া ছুটিয়ে তাঁর কাছে যান এবং তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। তারপর উবায়দুল্লাহ্ ইবন উমর সিরীয় বাহিনীর দিকে ফিরে যান। পঞ্চম দিনে আলী (রা)-এর পক্ষ থেকে ওয়ালীদ ইবন উতবা বের হন এবং সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত রক্তাক্ত যুদ্ধ চলে। ষষ্ঠ দিনে এদিক থেকে মালিক আশতার এবং ওদিক থেকে হাবীব ইবন মাসলামা দ্বিতীয়বারের মত যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করেন। ঐদিনও সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘোরতর যুদ্ধ চলে; কিন্তু জয়-পরাজয়ের কোন ফায়সালা হয়নি। সপ্তম দিনে স্বয়ং হযরত আলী (রা) ও মুআবিয়া (রা) নিজ নিজ বাহিনীকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। ঐ দিনের যুদ্ধ ছিল পূর্বের দিনগুলোর চাইতে আরো ভয়ংকর। তবে আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষই ছিল সমানে সমান।

এই সাতদিনের যুদ্ধকালে প্রতি দিনই উভয় পক্ষ থেকে নতুন নতুন অধিনায়ক নিযুক্ত হতেন এবং উভয়েই নিজ নিজ বীরত্ব ও যোগ্যতা প্রদর্শন করতেন। যেহেতু উভয় বাহিনীরই সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় সমান (নব্বই হাজার ও আশি হাজার) এবং উভয় বাহিনীতেই বীরত্ব ও রণকৌশলের অধিকারী লোকের সংখ্যাও ছিল সম-পরিমাণ তাই তাদের কেউ জয়ী হয়নি, আবার পরাজিতও হয়নি। উভয় পক্ষ থেকেই একথা প্রকাশ পেতে থাকে যে, তাদের মধ্যে যুদ্ধ করার বা বীরত্ব প্রদর্শনের যথেষ্ট আগ্রহ-উদ্দীপনা বিদ্যমান। এ সপ্তাহটি ছিল মুসলমানদের জন্য দুর্ভাগ্যজনক। কেননা এতে উচ্ছ্বাস ও উন্মাদনাবশে তারা অনরবত একে অন্যের রক্ত ঝরাচ্ছিল। আর অমুসলিমরা অত্যন্ত শান্তি ও স্বস্তির সাথে তামাশা দেখছিল। কিন্তু এর চাইতেও দুর্ভাগ্যজনক আরো দু'টি দিন ছিল সমাগত।

সিফফীন যুদ্ধের শেষ দু'দিন

পরিপূর্ণ এক সপ্তাহের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর হিজরী ৩৭ সনের ৮ই সফর বৃহস্পতিবার উভয় বাহিনী এক চূড়ান্ত যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়। বুধ ও বৃহস্পতিবারের মধ্যবর্তী সম্পূর্ণ রাত প্রস্তুতিতেই কেটে যায়। বৃহস্পতিবার দিন ফজরের নামাযের ঠিক পর পর আলী (রা) তাঁর সমগ্র বাহিনী নিয়ে সিরীয়দের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি বাহিনীর মাঝখানে অবস্থান করছিলেন। তাঁর সাথে ছিলেন কূফা ও বসরার গণ্যমান্য ব্যক্তিবৃন্দ এবং মদীনাবাসী যাদের বেশীর ভাগ ছিল আনসার এবং স্বল্প সংখ্যকও বনূ খুযাআ ও বনূ কিনানার লোক। আলী (রা) আবদুল্লাহ্ ইবন বুদায়ল ইবন ওয়ারাকা খুযাঈকে তাঁর ডান পাশের বাহিনীর এবং আবদুল্লাহকে বাম পাশের বাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করেন। তিনি প্রত্যেকটি গোত্রের জন্য পৃথক পৃথক স্থান নির্ধারণ করে দেন। প্রত্যেকটি গোত্রেরই ছিল পৃথক পৃথক পতাকা ও পৃথক পৃথক অধিনায়ক। আম্মার ইবন ইয়াসির (রা)-কে কবিতা আবৃত্তিকারী ও কুরআন তিলাওয়াতকারীদের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। আর কায়স ইবন সা'দকে ও আবদুল্লাহ্ ইবন ইয়াযীদকে কবিতা-আবৃত্তিকারীদের নেতা নিয়োগ করা হয়।

আমীরে মুআবিয়া নিজের তাঁবুতে বসে লোকদের কাছ থেকে মৃত্যুর তথা আত্মবিসর্জনের বায়'আত নেন। তাঁর বাহিনীতে হাবীব ইবন মাসলামা ডান পাশের বাহিনীর এবং উবায়দুল্লাহ্ ইবন উমর বাম পাশের বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন। আলী (রা)-এর ডান পাশের বাহিনী প্রথমে অগ্রসর হয় এবং আবদুল্লাহ্ ইবন বুদায়ল খুযাঈ তার অধীনস্থ বাহিনী অর্থাৎ ডান পাশের বাহিনী নিয়ে আমীরে মুআবিয়ার বাম পাশের বাহিনী অর্থাৎ হাবীব ইবন মাসলামার উপর হামলা চালান। যদিও এই হামলা ছিল অত্যন্ত জোরদার ও মারাত্মক, কিন্তু সিরীয় বাহিনীর জন্য তা সুবিধাজনক হয়ে দাঁড়ায়। আবদুল্লাহ্ ইবন বুদায়ল হাবীব ইবন মাসলামার বাহিনীকে পিছন দিকে ঠেলতে ঠেলতে সেই স্থানে নিয়ে যান যেখানে লোকেরা হযরত মুআবিয়ার হাতে মৃত্যুর বায়'আত নিয়েছিল। ডান পাশের বাহিনীর এই নাজুক অবস্থা লক্ষ্য করে মুআবিয়া (রা) তাঁর আশেপাশের সৈনিকদের হামলা করার নির্দেশ দেন। তারা এমন সাংঘাতিক হামলা চালায় যে, আবদুল্লাহ্ ইবন বুদায়ল মাত্র আড়াইশ' সৈন্যসহ সেখানে টিকে থাকেন। অবশিষ্ট সমগ্র ইরাকী সৈন্য সেখান থেকে পালিয়ে ঠিক সেই জায়গায় চলে আসে, যেখানে আলী (রা) দাঁড়িয়ে ছিলেন। নিজের ডান পাশের বাহিনীর এই করুণ অবস্থা দেখে তিনি সুহায়ল ইবন হানীফকে মদীনাবাসীদের অধিনায়ক নিয়োগ করেন এবং তাকে তৎক্ষণাৎ আবদুল্লাহ্ ইবন বুদায়লের

সাহায্যার্থে পাঠান। কিন্তু সিরীয়রা সুহায়লকে আবদুল্লাহ্ ইবন বুদায়ল পর্যন্ত পৌঁছতে দেয়নি। এবং অল্প কিছুক্ষণ পরই আবদুল্লাহ্ ইবন বুদায়ল আপন সঙ্গীসাথীসহ সিরীয় বাহিনীর হাতে নিহত হন। একদিকে ডানপাশের বাহিনীর এই পরাজয় আলী (রা)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল, অপরদিকে বাম পাশের বাহিনীও সিরীয়দের হাতে পর্যুদস্ত হচ্ছিলো। বাম পাশের বাহিনীতে শুধু রাবীআ গোত্র আপন জায়গায় অটল হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং বাকী সৈন্যরা পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিল। নিজের বাম পাশের বাহিনীকে পালিয়ে আসতে দেখে হযরত আলী (রা) আপন পুত্রত্রয় হাসান, হুসায়ন ও মুহাম্মদকে সেদিকে পাঠান এই উদ্দেশ্যে যে, রাবীআ গোত্রও যেন সেখান থেকে পালিয়ে আসে। আলী (রা) আশতারকে নির্দেশ দেন যেন তিনি ডান পাশের পলায়নকারীদের গিয়ে বলেন, তোমরা এই মৃত্যু থেকে কোথায় পালিয়ে যাচ্ছ, যে মৃত্যুকে তোমরা কখনো নিজেদের বশে আনতে পারবে না। আশতার ঘোড়া হাঁকিয়ে ডান পাশের পলায়ন রত যোদ্ধাদের কাছে গিয়ে আলী (রা)-এর ঐ পয়গাম শোনান এবং অত্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে তাদের বিবেকে আঘাত করে এমন কিছু কথা বলে তাদেরকে দাঁড় করান। এরপর তাদেরকে সাথে নিয়ে সিরীয়দের মুকাবিলায় আত্মনিয়োগ করেন। অপর দিকে বাম পাশের বাহিনীর অবস্থা সামাল দিতে স্বয়ং আলী (রা) এগিয়ে যান। রাবীআ গোত্রের লোকেরা যখন দেখে যে স্বয়ং আলী (রা) তাদের সাথে শরীক হয়ে তরবারি চালাচ্ছেন তখন তাদের সাহসও দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়।

স্বয়ং আলী (রা)-কে লড়তে দেখে আবূ সুফিয়ানের গোলাম আহমার সেদিকে ধেয়ে এলো। কিন্তু আলী (রা)-এর গোলাম কায়সান অগ্রসর হয়ে তার সাথে মুকাবিলা করতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত আহমারের হাতে কায়সান নিহত হয়। আলী (রা) নিজ গোলামকে এভাবে নিহত হতে দেখে আহমারের উপর হামলা চালান এবং রাগের বশে তাকে শূন্যে উঠিয়ে এমন জোরে মাটির উপর ছুড়ে মারেন যে, তার উভয় হাতই সঙ্গে সঙ্গে বেকার হয়ে পড়ে। সিরীয় বাহিনী আলী (রা)-কে যুদ্ধরত অবস্থায় দেখে তাঁর উপর হামলা চালায়। কিন্তু রাবীআ গোত্রের লোকেরা শক্ত হাতে হামলা প্রতিহত করে। তাই তারা আলী (রা)-এর ধারে কাছেও পৌঁছতে পারেনি। অপর দিকে আশতারও ডানপাশের বাহিনীর অবস্থা সামলে নেন। ফলে আলী (রা)-এর বাহিনীর মধ্যে যে আশংকাজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে যাচ্ছিল তা কেটে যায়। এবার উভয় বাহিনী একেবারে অনড় থেকে তরবারি চালাতে লাগলো। আসরের পূর্ব পর্যন্ত এই অবস্থা অব্যাহত থাকে। ঠিক আসরের সময় মালিক আশতার আমীরে মুআবিয়ার বামপাশের বাহিনীকে পিছনের দিকে হটিয়ে দেন। কিন্তু তাঁর আত্মোৎসর্গের জন্য বায়'আতকারী বাহিনী নিজেদের বামপাশের বাহিনীর সহায়তা করে এবং আলী (রা)-এর ডানপাশের বাহিনীকে বেশ খানিকটা পিছনে হটিয়ে দেয়। তাঁর পক্ষ থেকে আবদুল্লাহ্ ইবন হুসায়ন, যিনি হযরত আম্মার ইবন ইয়াসিরের সঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন, কবিতা আবৃত্তি করতে করতে অগ্রসর হন। বিপক্ষ বাহিনী থেকে ওকবা ইবন হুদায়বা নুমায়রী অগ্রসর হয়ে তার মুকাবিলা করে। ওকবা নিহত হলে সিরীয়দের পক্ষ থেকে একটি অতি জোরদার হামলা চালানো হয়। ফলে ইরাকীদেরকে যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। এতদসত্ত্বেও তারা নিজ নিজ অবস্থানে অটল থাকে। আলী (রা) ডানপাশের বাহিনীর সাহস বৃদ্ধি এবং তাদেরকে যুদ্ধের জন্য অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে স্বয়ং বামপাশের বাহিনীর দিক থেকে ডানপাশে চলে আসেন। সেখানে অত্যন্ত জোরেসারে তরবারি

যুদ্ধ চলছিলো। অপর দিকে যুলকালা হিময়ারী ও উবায়দুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) আলী (রা)-এর ডানপাশের বাহিনীর উপর এমন জোরে হামলা চালান যে, রাবীআ গোত্রের লোকেরাও তাদের অবস্থানে টিকে থাকতে পারেনি। সেখানে লাশের স্তূপ জমে উঠে। বামপাশের বাহিনীর এই বিপর্যস্ত অবস্থা দেখে আবদুল কায়স অগ্রসর হয়ে রাবীআ গোত্রকে টিকিয়ে রাখেন এবং সিরীয়দের অগ্রযাত্রা প্রতিরোধ করেন। এই সময়োপযোগী সাহায্যের কারণে বামপাশের বাহিনীর অবস্থা পুনরায় চাঙ্গা হয়ে উঠে এবং তাতে যুলকালা ও আবদুল্লাহ্ ইবন উমর উভয়ই নিহত হন।

মোটকথা, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উভয় পক্ষের ডানপাশের ও বামপাশের তীব্র তরবারি যুদ্ধ চলে। কিন্তু উভয় পক্ষেরই মধ্যবর্তী বাহিনী তখনো নীরব দাঁড়িয়েছিল। শেষ পর্যন্ত আলী (রা)-এর পক্ষ থেকে আম্মার ইয়াসির (রা) উচ্চৈঃস্বরে সকলকে সম্বোধন করে বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি চায় এবং নিজের ধন ও জনের দিকে ফিরে যাবার ইচ্ছা না রাখে সে যেন আমার সাথে আসে। তিনি এই বলে এগিয়ে যান। তাঁর সাথে আরো অনেক লোক মারা অথবা মরার সংকল্প নিয়ে এগিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত তিনি আলী (রা)-এর পতাকাবাহী হাশিম ইবন উতবার কাছে গিয়ে পৌঁছেন। হাশিমও পতাকা নিয়ে তাঁর সাথে এগিয়ে যান। আম্মার (রা) নিজের বিশেষ দলটি সঙ্গে নিয়ে সিরিয়ার মধ্যবর্তী বাহিনীর উপর হামলা চালান। তখন দিন শেষ হয়ে রাত ঘনিয়ে আসছিল। তাঁর ঐ হামলা ছিল অত্যন্ত ভয়ংকর। আমর ইবনুল 'আস (রা) অত্যন্ত কষ্টে তা প্রতিরোধ করেন। তারপর ভয়ানক তরবারি যুদ্ধ শুরু হয় এবং আম্মার (রা) শহীদ হন।

আম্মার (রা)-এর নিহত হওয়ার সংবাদ পেয়ে আলী (রা) অত্যন্ত মর্মাহত হন। তারপর সিরীয় বাহিনীর প্রত্যেকটি অংশই যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তরবারির ঝন্‌ঝনানি, বর্শা নিক্ষেপকারীদের হট্টগোল, কবিতা আবৃত্তির আওয়ায এবং যোদ্ধাদের তাকবীর ধ্বনিতে রাতের নীরবতা ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায়। এটা ছিল জুমুআর রাত যা 'লায়লাতুল হারীর' নামে খ্যাত। এই রাতে হযরত উয়ায়স কারনীও শহীদ হন। আলী (রা)-কে কখনো ডান পাশের বাহিনীতে, কখনো বামপাশের বাহিনীতে, আবার কখনো সম্মুখ বাহিনীতে তরবারি চালাতে দেখা যায়। আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা) বামপাশের বাহিনী এবং আশতার ডানপাশের বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। অনুরূপভাবে আমীরে মুআবিয়া, আমর ইবনুল 'আস ও অন্যান্য অধিনায়ক সিরীয় বাহিনীকে সব সময় যুদ্ধে নিয়োজিত রাখেন। এভাবে সারা রাত কেটে গেলে। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়ার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। জুমুআর দিন যুদ্ধ শুরু হল। এদিনও সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত উভয় বাহিনী পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত থাকলো।

লায়লাতুল হারীরের যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা ঘটেছিল। হযরত আলী (রা) বার হাজার অশ্বারোহীর একটি শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে এত তড়িৎ বেগে প্রতিপক্ষের উপর হামলা চালান যে, একেবারে চোখের পলকে তিনি আমীরে মুআবিয়ার তাঁবু পর্যন্ত পৌঁছে যান। তিনি তখন আমীরে মুআবিয়াকে ডেকে বলেন, মুসলমানদের হত্যা করিয়ে কোন লাভ নেই। এসো আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে পরস্পরের মুকাবিলা করি। আমাদের মধ্যে যে জয়ী হবে সে-ই খলীফা হবে। এই আওয়াজ শুনে আমর ইবনুল 'আস (রা) আমীরে মুআবিয়া (রা)-কে বললেন, কথা তো ঠিকই, মুকাবিলার জন্য আপনার বের হওয়াই উচিত। তখন তিনি বললেন, তুমি এই সিদ্ধান্ত

তোমার নিজের জন্য পসন্দ করছ না কেন? তুমি কি জান না যে, আলীর মুকাবিলার জন্য যে বের হয় সে আর ফিরে আসে না। অতঃপর হেসে বললেন, সম্ভবত তুমি আমাকে এজন্য যুদ্ধ ক্ষেত্রে পাঠাচ্ছ যাতে আমি মারা যাই এবং এই সুযোগে তুমি সিরিয়ার বাদশাহ বনে বস। মোটকথা, আমীরে মুআবিয়ার পক্ষ থেকে আলী (রা)-কে কোন উত্তর দেওয়া হয়নি। অগত্যা তিনি তাঁর বাহিনীতে ফিরে আসেন। জুমু'আর দিনও দুপুর পর্যন্ত যথারীতি যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। ত্রিশ ঘন্টারও বেশী সময় ধরে অনবরত যুদ্ধ চলছিল। এই সময়ের মধ্যে দুই পক্ষের প্রায় সত্তর হাজার লোক নিহত হয়। মুসলমানদের জন্য এর চাইতে দুঃখজনক বিষয় আর কী হতে পারে যে, এই ত্রিশ ঘন্টার মধ্যে তাদের যে পরিমাণ সমরশক্তি ধ্বংস হল তার মাধ্যমে তারা এই পৃথিবী কেন, এরূপ কয়েকটি পৃথিবী অনায়াসে জয় করতে পারত। যখন সূর্য কিছুটা ঢলে পড়ল তখন মালিক আশতার নিজের অধীনস্থ বাহিনীর দায়িত্ব আয়ান ইবন জুযার উপর অর্পণ করে স্বয়ং অশ্বারোহীদের একটি দল পৃথক করে নিয়ে তাদেরকে সিরিয়াবাসীদের উপর জোরদার হামলা চালাতে এবং প্রয়োজনবোধে এজন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। অশ্বারোহীরাও কথা দিল, হয় আমরা বিজয় লাভ করব, নয়ত প্রাণ দেব। অশ্বারোহীদের একটি অংশ হযরত আলী (রা)-এর কমান্ডে থাকল এবং বড় অংশটি আশতারের সাথে চলে গেল। এবার আশতার একটি অনুকূল অবস্থান থেকে সিরীয়দের উপর হামলা চালান। যুদ্ধের একটি চূড়ান্ত ফায়সালার জন্য এ মুহূর্তটি ছিল আলী (রা)-এর বাহিনীর জন্য খুবই অনুকূল। কেননা গতকাল অর্থাৎ বৃহস্পতিবার দিন সিরীয় বাহিনীকে খুবই সজীব ও দুঃসাহসী মনে হচ্ছিল। ঐ দিন আলী (রা)-এর বাহিনীর অবস্থা সন্ধ্যা পর্যন্ত এতই নাজুক ছিল যে, মনে হচ্ছিলো পরাজয় বুঝি এদের ভাগ্যে রয়েছে। কিন্তু রাতের যুদ্ধে সিরীয়দের অধিক লোক নিহত হয়। আজ জুমু'আর দিন সূর্য ঢলে পড়া পর্যন্ত যদিও উভয় বাহিনীকে 'সমানে সমান' মনে হচ্ছিল, কিন্তু সিরীয়দের অর্ধেক লোকই ইতিমধ্যে মৃত্যু বরণ করেছে। ফলে তাদের সংখ্যা আশি হাজার থেকে নেমে এখন পঁয়ত্রিশ হাজারে গিয়ে পৌঁছেছে। আলী (রা)-এর বাহিনীতে এ যাবৎ বিশ থেকে পঁচিশ হাজার লোক নিহত হয়েছিল এবং তাদের মোট সংখ্যা এখনো ছিল ষাট হাজার। অর্থাৎ এখন তাঁর সৈন্য সংখ্যা মুআবিয়া (রা)-এর সৈন্য সংখ্যার প্রায় দ্বিগুণ।

এভাবে শত্রুবাহিনীকে যুদ্ধে ব্যস্ত রেখে নিজের বাহিনী থেকে বাছাই করা একদল সৈন্য নিয়ে শত্রুবাহিনীর পিছন দিক থেকে আকস্মিক আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেওয়া এবং তাদের উপর জয়লাভ করা আলী (রা)-এর পক্ষে খুবই সহজ ছিল। এই প্রেক্ষিতেই মালিক আশতার তার প্রাণ-উৎসর্গকারী অশ্বারোহীদের নিয়ে শত্রুর উপর ভয়ানক আক্রমণ চালান। অশ্বারোহীদের মাধ্যমে এই আক্রমণ পরিচালনা বাঞ্ছনীয়ও ছিল। কেননা যে পদাতিক বাহিনী একাধারে ত্রিশ বত্রিশ ঘন্টা যাবত যুদ্ধরত ছিল তারা নিঃসন্দেহে এরূপ ক্লান্ত ও দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে, তাদের মাধ্যমে জোরদার আক্রমণ চালিয়ে শত্রুবাহিনীকে ছিন্ন ভিন্ন করা মোটেই সহজ ছিল না। অপর দিকে অশ্বারোহীদেরকে তখন পর্যন্ত কাজে খুব একটা লাগানো হয়নি। তাই পদাতিক সৈন্যদের অনুপাতে তারা ছিল অধিকতর সজীব। আশতার তড়িৎ বেগে শত্রুদের উপর হামলা চালান এবং শত্রুদের মধ্যবর্তী বাহিনীর কাছে পৌঁছে যান। আলী (রা) যখন আশতারকে সাফল্যজনক হামলা পরিচালনা করতে দেখেন এবং এও লক্ষ্য করেন যে, তার বাহিনীর পতাকা ক্রমেই এগিয়ে যাচ্ছে তখন তিনিও তার বাহিনী থেকে একের

পর এক ছোট ছোট অশ্বারোহী দল আশতারের সাহায্যে পাঠাতে থাকেন যাতে তার আক্রমণ কোনভাবেই ব্যর্থ না হয় এবং সার্বিক জয়লাভ সুনিশ্চিত হয়ে উঠে।

আলী (রা)-এর এই কৌশল অব্যর্থ প্রমাণিত হয়। সিরীয় বাহিনীর পতাকাবাহী আশতারের হাতে নিহত হয় এবং আমর ইবনুল 'আস ও মুআবিয়ার অবস্থান স্থলের সামনেই রক্তাক্ত যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায়। ঘোরতর যুদ্ধে উভয় বাহিনীর অবস্থানস্থল এমনভাবে সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল যে, ডানপাশের ও বামপাশের বাহিনী আপন মধ্যবর্তী বাহিনীর সাথে মিশে গেল এবং একে অপরকে হত্যা করার জন্য উদ্যত হয়ে উঠল। যদি ডানপাশের বাহিনীর ও বামপাশের বাহিনী ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকত এবং যুদ্ধের একটি কেন্দ্রভূমিও থাকত তাহলে আশতারের ঐ হামলা কোন চূড়ান্ত ফায়সালা করতে পারত না। কেননা অনুরূপ অবস্থায় বাহিনীর একটি অংশের শক্তি অন্য অংশের দিকে সহজেই স্থানান্তরিত করা যেত এবং প্রধান সেনাপতিও নিজের বাহিনীকে রক্ষা করার একটা না একটা কৌশল বের করতে পারতেন। কিন্তু ঐ আক্রমণ এমন সঠিক সময়ে করা হয়েছিল যে, সিরীয় বাহিনীর সামনে পরাজয় বরণ ছাড়া অন্য কোন পথই খোলা ছিল না। সিরীয় বাহিনীর অধিনায়ক বিপক্ষ বাহিনীকে এভাবে এগিয়ে আসতে এবং আপন পতাকাবাহীকে এভাবে নিহত হতে দেখে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। প্রতিপক্ষের সমগ্র সৈন্য দ্রুতবেগে এগিয়ে আসছিল এবং সেই হামলা প্রতিরোধ করার কোন ক্ষমতাই তার বাহিনীর মধ্যে অবশিষ্ট ছিল না। তখনো সিরীয়রা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেনি, তবে তাদের পরাজিত হওয়ার ব্যাপারটি কয়েক ঘন্টা নয়, বরং কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘটতে যাচ্ছিল। এমনি সময়ে আমর ইবনুল 'আস এমন একটি কৌশল আঁটলেন যে, যুদ্ধের ফলাফল সম্পূর্ণ পাল্টে গেল।

যুদ্ধের পরিসমাপ্তি

আলী (রা) আশতারের সফল আক্রমণ প্রত্যক্ষ করে যেমন আনন্দিত ও আশান্বিত হয়েছিলেন, মুআবিয়া (রা) বাহিনীর বিপর্যস্ত অবস্থা প্রত্যক্ষ করে তেমনি নিরাশ ও দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন। আমর ইবনুল 'আস মুআবিয়াকে বলেন, 'কী দেখছ, সকলকে নির্দেশ দাও যেন তারা অবিলম্বে নিজ নিজ বর্শায় কুরআন মজীদ গেঁথে তা উঁচু করে ধরে এবং উচ্চৈঃস্বরে বলতে থাকে هذَا كِتَابُ اللّٰهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ (আমাদের এবং তোমাদের মধ্যকার ফায়সালা এ কুরআনই করবে)। সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে এই নির্দেশ দেওয়া হল এবং সিরিয়ার প্রত্যেকটি সৈন্য নিজ নিজ বর্শায় কুরআন গেঁথে তা উঁচিয়ে ধরে উচ্চৈঃস্বরে বলতে লাগল, আমরা কুরআনের ফায়সালা মানি। কোন কোন দিক থেকে এ আওয়াজ উঠল, মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ। আমাদের যুদ্ধ তো ধর্মের জন্য। অতএব এসো, আমরা কুরআনের ফায়সালাই মেনে নেই এবং এখানেই যুদ্ধের ইতি টানি। কোন কোন দিক থেকে এ আওয়াজও উঠল, মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ। এ কুরআনকেই হাকিম হিসাবে মেনে নাও। যুদ্ধে যদি সিরীয়রা ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে রোমানদের আক্রমণকে কে প্রতিরোধ করবে ? আর যদি ইরাকীরা ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে প্রাচ্যের আক্রমণকারীদের মুকাবিলা কে করবে ? আলী (রা)-এর সৈন্যরা কুরআনকে বর্শায় গেঁথে ঊর্ধ্বে তুলে ধরা দেখে যুদ্ধ থেকে হাত গুটিয়ে নিল। আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা) সিরীয়দের এই কৌশল লক্ষ্য করে বললেন, এতক্ষণ যুদ্ধ হচ্ছিলো, এবার প্রবঞ্চনা শুরু হল। আলী (রা) তাঁর লোকদের বুঝিয়ে বললেন, তোমরা এই মুহূর্তে শৈথিল্য প্রদর্শন করো না। কেননা শীঘ্রই

তোমরা জয়লাভ করবে। লোকেরা অনবরত যুদ্ধ করতে করতে হাঁপিয়ে উঠেছিল। তাছাড়া মুসলমানদের মধ্যকার এই যুদ্ধকে তারা ইসলাম বিরোধী মনে করছিলো। তাই তারা যুদ্ধের পরিবর্তে আপোস-মীমাংসার ঐ আবেদনকে যথার্থ বিবেচনা করল এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজ নিজ তরবারি খাপের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে দিল। তখন পর্যন্ত উভয় বাহিনীর শক্তি সমান সমান বলে প্রতীয়মান হচ্ছিলো। আলী (রা)-এর বাহিনীর বিজয় যে অতি নিকটবর্তী তা তিনি ও অন্যান্য অভিজ্ঞ সমরনায়ক যেমন বুঝতে পারছিলেন, সাধারণ সৈন্যরা তেমন বুঝতে পারছিল না। প্রকৃতপক্ষে নিজ নিজ অবস্থানে থেকে তা বুঝে উঠার শক্তিও তাদের ছিল না। এ কারণেই আলী (রা)-এর বেশির ভাগ লোক সিরীয়দের ঐ ইচ্ছাকে তাদেরই প্রতিফলন এবং একান্ত সময়োচিত কর্মপন্থা বলে বিবেচনা করল। এ অবস্থা দেখে সাবাঈদের চোখও খুলে গেল। তারাও তৎপর হয়ে উঠল এবং আলী (রা)-এর চারপাশে একত্রিত হয়ে তাঁর উপর অনবরত চাপ সৃষ্টি করতে লাগল যেন তিনি অবিলম্বে আশতারকে যুদ্ধ থেকে নিরস্ত করে পিছনে ডেকে নিয়ে আসেন।

আশতার তার সাফল্যকে নিশ্চিত জেনে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে যুদ্ধ করছিলেন। কিন্তু যারা আশতারকে পিছনে ডেকে নিয়ে আসা ও যুদ্ধ বন্ধ করে দেওয়ার দাবী উত্থাপন করেছিল তাদের সাথে সাধারণ সৈন্যরাও এসে যোগ দিতে থাকে। ফলে একদিকে লোকেরা যুদ্ধ বন্ধ করে দেয় এবং অপর দিকে সিরীয়রা সম্মিলিতভাবে আশতারের হামলা প্রতিরোধ করার সুযোগ পায়। উপরন্তু হযরত আলীকে তাঁর লোকেরা চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে এবং তাঁকে সম্বোধন করে অশিষ্টের মত বলতে থাকে, যদি আপনি আশতারকে ফিরে আসার হুকুম না দেন তাহলে আমরা আপনার সাথেও সেই আচরণ করব যে আচরণ আমরা উসমানের সাথে করেছি। এই ভয়ানক অবস্থা দেখে আলী (রা) সঙ্গে সঙ্গে লোক পাঠিয়ে আশতারকে এই বলে ডেকে পাঠান যে, এখানে বিশৃঙ্খলার দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেছে। অতএব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তুমি আমার কাছে ফিরে এসো। আশতার অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফিরে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে লড়াই থেমে গিয়ে সমগ্র যুদ্ধক্ষেত্রে নেমে এল শান্তি ও নীরবতা। আশতার ফিরে এলে আলী (রা) তার কাছে প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা করলেন। আশতার অত্যন্ত আক্ষেপ করে বললেন, "হে ইরাকবাসী! যখন সিরীয়দের উপর তোমাদের বিজয় লাভ ছিল সুনিশ্চিত ঠিক তখনই তোমরা তাদের প্রতারণার ফাঁদে পা দিলে।" সাধারণ লোকের মধ্যে যুদ্ধ বিরোধী মনোভাব এমনভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল যে, তারা আশতারের উপর হামলা করতে উদ্যত হয়, কিন্তু আলী (রা)-এর ধমকে তা থেকে বিরত থাকে। এরপর আশআস্ ইবন কায়স আগে বেড়ে হযরত আলীর কাছে নিবেদন করেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! লোকেরা তো কুরআনকে তাদের ফায়সালাকারী মেনে নিয়েছে এবং যুদ্ধও বন্ধ হয়ে গেছে–। এখন যদি আমাকে অনুমতি দেন তাহলে আমি মুআবিয়ার কাছে গিয়ে তার ইচ্ছার কথা জানতে পারি। আলী (রা) তাকে অনুমতি দিলে তিনি আমীরে মুআবিয়ার কাছে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কুরআনকে বর্শায় গেঁথে কি উদ্দেশ্যে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছিলে? তিনি উত্তরে বলেন, আমরা এবং তোমরা উভয়ই আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূলের হুকুম মেনে নেব। আমরা আমাদের পক্ষ থেকে এক ব্যক্তিকে মনোনীত করব এবং তোমরা তোমাদের পক্ষ থেকে এক ব্যক্তিকে মনোনীত করবে। আর ঐ দুই ব্যক্তির কাছ থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার নেওয়া হবে যে, তারা কুরআন মজীদ অনুসরণে এই

বিবাদের একটা মীমাংসা করবে। এরপর তারা উভয়ে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে আমরা উভয় পক্ষই তা মেনে নেব।

এরপর আশআস্ ইবন কায়স আলী (রা)-এর কাছে ফিরে আসেন এবং আমীরে মুআবিয়ার কথা তাঁকে শোনান। আলী (রা)-এর চারপাশের লোকেরা একথা শুনে সমস্বরে বলে উঠল, আমরা এতে সম্মত আছি এবং এ ধরনের ফায়সালাই আমরা সমর্থন করি। এরপর আমীরে মুআবিয়া ও সিরিয়াবাসীদের জিজ্ঞেস করা হলো, তোমরা তোমাদের পক্ষ থেকে কাকে হাকিম নিযুক্ত করতে চাও ? তারা আমর ইবনুল 'আস (রা)-এর নাম বলল। এবার আলী (রা)-এর দরবারে বিষয়টি উত্থাপিত হল। তিনি বললেন, এ কাজের জন্য আমি আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাসকেই পসন্দ করি। কিন্তু তাঁর দরবারের লোকেরা বলল, তিনি হচ্ছেন আপনার আত্মীয়। আমরা এমন ব্যক্তিকে মধ্যস্থতাকারী মনোনীত করতে চাই যার সাথে আপনার ও আমীরে মুআবিয়ার সমান সম্পর্ক রয়েছে। তখন তিনি বললেন, তোমরা কাকে পসন্দ কর ? লোকেরা বলল, আবূ মূসা আশআরী (রা) এ কাজের জন্য সর্বাধিক যোগ্য বলে আমরা মনে করি। তিনি বললেন, আমি আবূ মূসা (রা)-কে নির্ভরযোগ্য মনে করি না। তোমরা যদি ইবনুল আব্বাসকে আমার আত্মীয় হওয়ার কারণে মনোনীত না কর তাহলে মালিক আশতারকে মনোনীত করে ফেল। তিনি আমার আত্মীয় নন। লোকেরা বলল মক্কী জীবন থেকেই হযরত আবূ মূসা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংসর্গে ছিলেন। তিনি একজন সম্মানিত সাহাবী। কিন্তু মালিক আশতার এই গুণাবলী থেকে বঞ্চিত। অতএব আমরা আবূ মূসার উপর তাকে অগ্রাধিকার দিতে পারি না। শেষ পর্যন্ত আবূ মূসা আশআরীই হযরত আলীর পক্ষের হাকিম নিযুক্ত হন। তখনো হযরত আলীর দরবারে এ সম্পর্কে আলোচনা চলছিল—এমন সময় আমীরে মুআবিয়ার পক্ষ থেকে আমর (রা) অঙ্গীকারনামা লেখার জন্য সেখানে এসে হাযির হন।

অঙ্গীকারনামা লিপিবদ্ধকরণ এবং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রত্যাবর্তন

আমর ইবনুল 'আস (রা) হযরত আলীর দরবারে হাযির হয়ে তাঁকে অঙ্গীকারনামা লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে অনুরোধ জানান এবং তখনই উভয় পক্ষের সম্মতিতে নিম্নলিখিত অঙ্গীকারনামা লিপিবদ্ধ করা হয়।

> আলী ইবন আবূ তালিব ও মুআবিয়া ইবন আবূ সুফিয়ানের মধ্যে এই অঙ্গীকারনামা লিপিবদ্ধ করা হলো। আলী ইবন আবূ তালিব (রা) কূফাবাসী এবং ঐ সমস্ত লোকের পক্ষ থেকে, যারা তাঁর সাথে রয়েছেন, একজন মুনসিফ তথা মধ্যস্থতাকারী নিযুক্ত করেছেন। অনুরূপভাবে মুআবিয়া ইবন আবূ সুফিয়ান সিরিয়াবাসী এবং ঐ সমস্ত লোকের পক্ষ থেকে যারা তার সাথে রয়েছেন, একজন মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করেছেন। আমরা আল্লাহর কিতাব (আল-কুরআন) এবং তাঁর নির্দেশকে চূড়ান্ত ফায়সালাকারী মেনে নিয়ে এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, আমরা আল্লাহর হুকুম এবং আল্লাহর কিতাব ছাড়া অন্য কিছুকে (আমাদের বিষয়াদি ফায়সালার ক্ষেত্রে) গুরুত্ব দেব না। আমরা 'আলহামদু' (সূরা ফাতিহা) থেকে আরম্ভ করে 'ওয়ান্নাস' (সূরা নাস) পর্যন্ত সমগ্র কুরআন যেসব কাজ করার নির্দেশ দেয় আমরা তাই করব এবং যে কাজ করতে নিষেধ করে আমরা তা থেকে বিরত থাকব।

দুই পক্ষের যে দু'জন প্রতিনিধি মনোনীত হয়েছেন তারা হচ্ছেন আবূ মূসা আবদুল্লাহ্ ইবন কায়স আশআরী (রা) এবং আমর ইবনুল 'আস (রা)। এরা উভয়ে আল্লাহর কিতাবের মধ্যে যে নির্দেশ পাবেন তদনুযায়ী ফায়সালা করবেন। আর যদি আল্লাহর কিতাবের মধ্যে নির্দেশ না পান তাহলে সেই সুন্নাত অনুযায়ী ফায়সালা করবেন, যার উপর মুসলিম উম্মতের মতৈক্য রয়েছে।

এরপর উভয় হাকিম তথা আবূ মূসা আশআরী ও আমর ইবনুল 'আস (রা)-এর নিকট থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার নেওয়া হয় যে, তাঁরা আল্লাহ্কে হাযির-নাযির জেনে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাত অনুযায়ী উভয় পক্ষের মধ্যকার বিরোধের সঠিক ফায়সালা করবেন এবং মুসলিম উম্মাহকে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বিচ্ছিন্নতার মধ্যে নিক্ষেপ করবেন না। এরপর উভয় হাকিমকে পরবর্তী রমযান পর্যন্ত ছয় মাসের সময় দেওয়া হয় এবং বলা হয় যে, তাঁরা এই সময়ের মধ্যে যখন ইচ্ছা উভয় পক্ষকে অবহিত করে আওয়াজ নামক স্থানে (যা দামিশক ও কূফার ঠিক মধ্যস্থলে ও দুমাতুল জানদালের সন্নিকটে অবস্থিত) তাঁদের ফায়সালা শুনিয়ে দেবেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁরা উভয় পক্ষের মধ্যকার বিরোধপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করবেন এবং একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন। উভয় পক্ষের সম্মতিতে এই প্রস্তাবও গৃহীত হয় যে, যখন হাকিমদ্বয় তাঁদের চূড়ান্ত ফায়সালা শোনাবার জন্য আওযাজের দিকে রওয়ানা হবেন তখন আলী (রা) মাত্র চারশ' লোক নিয়ে কূফা থেকে আবূ মূসা আশআরীর সাথে আসবেন। অনুরূপভাবে আমীরে মুআবিয়া (রা) দামিশক থেকে মাত্র চারশ' লোক নিয়ে আমর ইবনুল 'আসের সাথে আসবেন। এই আটশো লোক যাদেরকে হাকিমদ্বয় তাঁদের চূড়ান্ত ফায়সালা শোনাবেন সমগ্র মুসলিম মিল্লাতের প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য হবেন।

উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর আলী (রা) ও মুআবিয়া (রা) আপন আপন বাহিনীর কাছ থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার গ্রহণ করেন যে, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত শোনানোর পর উভয় হাকিম বা প্রতিনিধির জানমাল ও পরিবার-পরিজনের পরিপূর্ণ নিরাপত্তা থাকবে। এরপর অঙ্গীকার পত্রের দু'টি কপি তৈরি করা হয়। তাতে সাক্ষী ও যামিন হিসাবে স্বাক্ষর করেন হযরত আলী (রা)-এর পক্ষ থেকে আশআস্ ইবন কায়স, সা'দ ইবন কায়স হামদানী, ওয়ারাকা ইবন ইয়াহইয়া বাজালী, আবদুল্লাহ্ ইবন ফাহল আজালী, হুজর ইবন আদী আল-কিনদী, আবদুল্লাহ্ ইবন তুফায়ল আমিরী, উকবা ইবন যিয়াদ হাদরামী, ইয়াযীদ ইবন খুযায়মা তামীমী, মালিক ইবন কা'ব হামাদানী এবং আমীরে মুআবিয়া (রা)-এর পক্ষ থেকে আবুল আওয়ার হাবীব ইবন মাসলামা, যুউল ইবন আমর উযরী, হামযা ইবন মালিক হামাদানী, আবদুর রহমান ইবন খালিদ মাখযূমী, সুমাইয়া ইবন ইয়াযীদ আনসারী, উতবা ইবন আবূ সুফিয়ান ও ইয়াযীদ ইবনুল হুর আবসী। উভয় কপি তৈরি হলে তার একটি আবূ মূসা আশআরী (রা)-এর এবং অপরটি আমর ইবনুল 'আস (রা)-কে সোপর্দ করা হল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, হযরত আলী (রা)-এর পক্ষ থেকে সাক্ষী ও যামিন হিসাবে আশতারকে স্বাক্ষর করতে বললে তিনি স্পষ্ট ভাষায় তা অস্বীকার করেন। আশআস ইবন কায়স এজন্য তাকে চাপ দিলে উভয়ের মধ্যে চরম কথা কাটাকাটি হয়, তবে তা ফিতনার পর্যায়ে পৌঁছতে পারেনি। অঙ্গীকারনামা সম্পর্কিত বিষয়াদি সম্পন্ন করতে চার দিন লেগে যায়। সফর মাসের ১৩ তারিখে অঙ্গীকারনামা উভয় হাকিমের হাতে অর্পণ করা হয়। এরপর উভয় বাহিনী সিফ্ফীনের যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে কূফা ও

দামিশকের দিকে ফিরে যায়। আমীর মুআবিয়া ভালোয় ভালোয় দামিশকে পৌঁছতে সক্ষম হলেও আলী (রা)-এর সামনে ফিতনার আর একটি নতুন দরজা খুলে যায়।

খারিজী ফিতনা

হিজরী ৩৭ সনের ১৩ই সফর যখন হযরত আলী (রা) সিফ্ফীনের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কূফা প্রত্যাবর্তনের সংকল্প নেন তখন কিছু লোক তাঁর কাছে এসে বলেন, আপনি কূফা প্রত্যাবর্তনের পরিকল্পনা ত্যাগ করে সিরীয়দেরকে আক্রমণ করুন। আলী (রা) বলেন, অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করার পর আমি কী করে আমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে পারি ? এখন আমাদেরকে রমযান মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে এবং আপোস-মীমাংসার পর যুদ্ধ করা তো দূরের কথা, যুদ্ধের কথা চিন্তা করাও উচিত হবে না। একথা শুনে ওরা নীরবে তাঁর কাছ থেকে চলে যায়। কিন্তু পৃথক হওয়ার পর তারা তাদের সমতাবলম্বী লোকদের প্ররোচিত করতে থাকে যেন তারা হযরত আলী (রা) থেকে পৃথক হয়ে নিজেরাই নিজেদের পথ বেছে নেয়। ফলে আলী (রা) যখন তাঁর বাহিনী নিয়ে কূফা থেকে রওয়ানা হন তখন সমগ্র পথ জুড়ে তাদের মধ্যে পরস্পর ঝগড়া-ঝাটি ও কথা কাটাকাটি চলতে থাকে। কেউ বলছিলো, মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করায় ভালই হয়েছে, কেউ বলছিলো মন্দ হয়েছে, কেউ বলছিলো, এ ব্যাপারে মধ্যস্থতাকারী হাকিম নিয়োগ করা শরীআতের দৃষ্টিতে বৈধ, কেউ বলছিল আল্লাহ্ তা'আলা শুধুমাত্র স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারেই এভাবে মধ্যস্থতাকারী হাকিম নিয়োগের হুকুম দিয়েছেন। আবার কেউ বলছিল, এটাকে স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারের সাথে তুলনা করা ঠিক হয়নি, আমাদের নিজেদের বাহুবলেই এর মীমাংসা করা উচিত ছিল।

আবার কেউ এই বলে আপত্তি উত্থাপন করছিলো যে, উভয় হাকিমের ন্যায়পরায়ণ হওয়া অত্যাবশ্যকীয়। যদি তাঁরা ন্যায়পরায়ণ না হয়ে থাকেন তাহলে কেন তাদেরকে হাকিম মেনে নেওয়া হল ? আবার কেউ কেউ বলছিলো, আলী (রা) কর্তৃক যুদ্ধ মুলতবি রাখা এবং আশতারকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা ঠিক ছিল না। অতএব তার হুকুম মেনে নেওয়াটা আমাদের জন্য মোটেই উচিত হয়নি। এর উত্তরে আবার কেউ কেউ বলছিলো, আমরা যেহেতু আলী (রা)-এর হাতে বায়'আত করেছি, অতএব তাঁর প্রত্যেকটি হুকুম মান্য করা আমাদের জন্য ফরয। এর উত্তরে আবার কেউ কেউ বলছিলো, আমরা কখনো তাঁর কোন অন্যায় হুকুম মানব না, যে কোন হুকুম মানা না মানার ব্যাপারে আমরা স্বাধীন। আমাদেরও বিবেক-বুদ্ধি রয়েছে। আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলের সুন্নাত আমাদের জন্য যথেষ্ট। এ দু'টিকে ডিংগিয়ে আমরা অন্য কারো হুকুম মেনে নিতে পারি না। একথা শুনে আবার কেউ কেউ বলছিলো, আমরা আলী (রা)-এর সাথে রয়েছি এবং সর্বাবস্থায় তাঁর হুকুম মান্য করা আমাদের জন্য ফরয এবং এটাকে আমরা হুবহু শরীআত বলেই মনে করি। আমরা এটাও মনে করি যে, তাঁকে অমান্য করা কুফরী সমতুল্য। এভাবে কথা বাড়তে বাড়তে পরিস্থিতি এই পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায় যে, প্রত্যেক মনযিলেই পরস্পরের মধ্যে গালাগালি, এমন কি হাতাহাতি চলতে থাকে। আপন বাহিনীর এই ধ্বংসাত্মক অবস্থা নিরসনের জন্য আলী (রা) লোকদের নানাভাবে বোঝান, কিন্তু যেহেতু তাঁর বাহিনীর মধ্যে জ্বলন্ত আগুনে ঘি ঢালার মত লোকের অভাব ছিল না– তাই বলতে গেলে তাঁর সব চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। যে বাহিনী কূফা থেকে সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ অবস্থায় সিফ্ফীনে

পৌঁছেছিল ইতিমধ্যে তাদের উপর দিয়ে অনৈক্যের এক প্রলয়ংকারী ঝড় বয়ে গেছে। ফলে মত ও পথের দিক দিয়ে এখন তারা ছিন্ন ভিন্ন শতধা বিভক্ত। গোটা বাহিনীর মধ্যে যে নিয়ম-শৃঙ্খলা থাকার কথা ছিল স্বাভাবিকভাবেই তাও নষ্ট হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে এখন বহু সংখ্যক দল-উপদলের সৃষ্টি হয়েছে এবং প্রত্যেক দল উপদলই সম্পূর্ণ পৃথক ধারণা ও পৃথক আকীদা পোষণ করছে। তারা প্রকাশ্যে একে অন্যের বিরোধিতা করছে, এমন কি একে অন্যের বিরুদ্ধে তরবারি ধারণ করতেও ইতস্তত করছে না।

কিন্তু এদের মধ্যে দু'টি দল ছিল বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। তারা সংখ্যার দিক দিয়ে এবং উৎসাহ-উদ্দীপনার ক্ষেত্রেও ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাদের একটি দল আলী (রা)-কে দোষী সাব্যস্ত করত এবং তার আনুগত্য মোটেই জরুরী মনে করত না। অপর দলটি ছিল এদের সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা হযরত আলীকে ভুলত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র মনে করত, এমন কি তাঁর আনুগত্যকে আল্লাহ্ ও আল্লাহর রাসূলের আনুগত্যের উপর প্রাধান্য দিতেও কসুর করত না। প্রথম দল 'খাওয়ারিজ' এবং দ্বিতীয় দল 'শী'আনে আলী' নামে পরিচিতি লাভ করে। একটি লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, এ সমস্ত লোকই ইমাম বা নেতা ছিল যারা আলী (রা)-কে যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য করেছিল। তারা হযরত আলীকে বলেছিল, আপনি আশতারকে শীঘ্রই ফিরিয়ে আনুন এবং যুদ্ধ বন্ধ করুন। অন্যথায় আমরা আপনার সাথে সেই আচরণ করব যে আচরণ আমরা উসমানের সাথে করেছি। আলী (রা) তাদেরকে বার বার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন, তোমরাই তো আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করিয়েছ এবং আপোস-মীমাংসাকেই পসন্দ করেছ। এখন আবার তোমরাই আপোস-মীমাংসা অপসন্দ করছ এবং আমাকে দোষী সাব্যস্ত করছ। কিন্তু তাঁর এ কথায় কেউই কান দিচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি এরূপ ধারণ করল যে, কূফার নিকটবর্তী হওয়ার পর বার হাজার লোক আলী (রা)-এর বাহিনী থেকে পৃথক হয়ে 'হারূরার দিকে চলে গেল।

এটা ছিল 'খাওয়ারিজ'-এর দল। তারা হারূরায় গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করে এবং আবদুল্লাহ্ ইবনুল কাওয়াকে তাদের নামাযের ইমাম এবং শীছ ইবন রিবঈকে সেনাবাহিনী প্রধান নিয়োগ করে। ইনি হচ্ছেন সেই শীছ ইবন রিবঈ, যাকে আলী (রা) সিফফীনের যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থানকালে দুবার তার প্রতিনিধিদলের অন্তর্ভুক্ত করে আমীরে মুআবিয়ার কাছে পাঠিয়েছিলেন। আর প্রত্যেক বারই তিনি আমীরে মুআবিয়ার সাথে এমন রূঢ়ভাবে কথা বলেন যে, এরপর প্রতিনিধিদলকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে হয়। এই দলটি হারূরায় নিজেদের সংগঠিত করে ঘোষণা দিল :

> বায়'আত শুধু আল্লাহর জন্য। আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলের সুন্নাত অনুযায়ী পুণ্য কাজে আদেশ দেওয়া এবং পাপ কাজে নিষেধ করা আমাদের জন্য ফরয। কোন খলীফা বা আমীর নেই। বিজয় লাভের পর আমরা যাবতীয় কাজ মুসলমানদের পরামর্শে এবং তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠের মতানুসারে সম্পাদন করব। আমীরে মুআবিয়া (রা) ও আলী (রা) উভয়ই সমান এবং উভয়ই অপরাধী।

খারিজীদের এই গতিবিধি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর হযরত আলী (রা) অত্যন্ত ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও ঔদার্যের পরিচয় দেন। কূফায় প্রবেশ করে তিনি সর্বপ্রথমে ঐ সমস্ত লোকের পরিবার-পরিজনের কাছে গিয়ে তাদের প্রতি সমবেদনা ও সহানুভূতি জানান যারা সিফ্ফীন যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন। তিনি এই বলে তাদের সান্ত্বনা দেন যে, সিফফীন যুদ্ধে যারা নিহত

হয়েছেন তারা আল্লাহর পথে শাহাদত বরণ করেছেন। এরপর খারিজীদের বুঝিয়ে সঠিক পথে নিয়ে আসার জন্য তিনি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা)-কে তাদের কাছে পাঠান। তিনি তাদের সেনাছাউনিতে গিয়ে পৌঁছে তাদেরকে বোঝাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা তাঁর সাথে উল্টাপাল্টা তর্কবিতর্ক করে।

আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা)-এর সাথে খারিজীদের তর্কবির্তক চলছিল। এমন সময় স্বয়ং আলী (রা) সেখানে গিয়ে পৌঁছেন। প্রথমে তিনি ইয়াযীদ ইবন কায়সের তাঁবুতে যান। কেননা ঐ দলের উপর ইয়াযীদ ইবন কায়সের প্রভাব ছিল সর্বাধিক। আলী (রা) ইয়াযীদের তাঁবুতে ঢুকে দু'রাকাআত নফল নামায আদায় করেন। এরপর তাকে ইসফাহান ও রায়-এর গভর্নর নিয়োগ করে সেই বৈঠকে যান, যেখানে ইবন আব্বাস (রা)-এর সাথে খারিজীরা তর্ক-বিতর্ক জুড়ে দিয়েছিল। তিনি খারিজীদের সম্বোধন করে বলেন, তোমাদের মধ্যে অধিক বুদ্ধিমান ও নেতৃস্থানীয় কে ? তারা বলল, আবদুল্লাহ্ ইবন কাওয়া। তিনি আবদুল্লাহকে সম্বোধন করে বলেন, তোমরা তো আমার হাতে বায়'আত করেছিলে; এখন আমার বিরুদ্ধে চলে গেলে কেন? তারা বলে, আপনার অন্যায় সিদ্ধান্তের কারণে।

আলী (রা) বলেন, আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি যুদ্ধ বন্ধ করার পক্ষে ছিলাম না। তোমরাই তো যুদ্ধ বন্ধ করাকে অপরিহার্য মনে করেছিলে, যার ফলে আমি মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ এবং তাদের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য হই। তবে আমি উভয় মধ্যস্থতাকারীর নিকট থেকেই এই মর্মে অঙ্গীকার নিয়েছি যে, তারা পবিত্র কুরআন অনুযায়ী ফায়সালা করবেন। যদি তারা কুরআন অনুযায়ী ফায়সালা করেন তাহলে তো এতে ক্ষতির কিছু নেই। আর যদি তারা কুরআনের বিরুদ্ধে ফায়সালা করেন তাহলে আমরা কখনো তা মেনে নেব না। একথা শুনে খারিজীরা বলল, মুআবিয়া মুসলমানদের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টির ব্যাপারে অগ্রণীয় ভূমিকা পালন করেছে। অতএব তাঁর ক্ষেত্রে হাকিম বা মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করা মোটেই ঠিক হয়নি। তাঁর সম্পর্কে কুরআনে এই মর্মে পরিষ্কার নির্দেশ রয়েছে যে, সে হত্যাযোগ্য অপরাধী। আলী (রা) বলেন, আমরা তো কোন মানুষকে হাকিম নিয়োগ করিনি। পবিত্র কুরআনই হচ্ছে প্রকৃত হাকিম। যাদেরকে হাকিম বা মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করা হয়েছে তারা আমাদেরকে তাদের নিজেদের নয় বরং কুরআনেরই ফায়সালা শোনাবে। এরপর খারিজীরা আপত্তি উত্থাপন করে বলে, তাহলে এজন্য সুদীর্ঘ ছয় মাস সময় দেওয়ার কি প্রয়োজন ছিল ? আলী (রা) বলেন, হয়ত এই সময়ের মধ্যে মুসলমানদের মধ্যকার মতবিরোধ আপনাআপনি শেষ হয়ে যাবে। মোটকথা, দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত এ ধরনের কথাবার্তা চলতে থাকে। খারিজীদের একজন নেতাকে আলী (রা) ইতিমধ্যে ইসফাহান এবং 'রায়-এর গভর্নর নিয়োগ করেছিলেন। তাছাড়া তাঁর কথাবার্তায়ও সাধারণ লোকেরা কিছুটা প্রভাবিত হয়। ফলে খারিজীরা সাময়িকভাবে হলেও চুপ হয়ে যায়। তারপর হযরত আলী (রা) তাদেরকে নম্রভাবে বলেন, চল এবার তোমরা কূফায় গিয়ে অবস্থান কর। এই ছয় মাসের মধ্যে তোমাদের বাহনগুলোও হৃষ্টপুষ্ট হয়ে যাবে। এরপর আমরা শত্রুর মুকাবিলায় বের হব। তারা তাঁর এ কথায় রাযী হয়ে গেল এবং তাঁর সাথে কূফায় এসে মধ্যস্থতাকারী হাকিমদের ফায়সালা শোনার অপেক্ষায় রইলো। আলী (রা) ইবন আব্বাস (রা)-কে বসরায় প্রেরণ করেন। যেহেতু তিনি বসরার গভর্নর ছিলেন তাই এখন তাঁকেই সেখানকার শাসনব্যবস্থা পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

আযরাজ নামক স্থানে সালিশদ্বয়ের সিদ্ধান্ত

যখন ছয় মাসের অবকাশ প্রায় সমাপ্তির পথে তখন হযরত আলী (রা) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা)-কে বসরা থেকে ডেকে পাঠান এবং শুরায়হ ইবন হানী আল-হারিফীর নেতৃত্বে চারশো লোককে আবূ মূসা আশআরী (রা)-এর সাথে আযরাজের দিকে প্রেরণ করেন। ইবন আব্বাস (রা)-কে ঐ দলের সালাতের ইমাম নিয়োগ করা হয়। আলী (রা) শুরায়হ ইবন হানীকে বুঝিয়ে বলেন, যখন আযরাজে আমর ইবনুল 'আস (রা)-এর সাথে তোমার সাক্ষাৎ হবে তখন তাকে বলো : সততা ও সত্যবাদিতা পরিত্যাগ করবেন না এবং কিয়ামতের কথা স্মরণ রাখবেন। অনুরূপভাবে হযরত মুআবিয়া (রা)-ও আমর ইবনুল 'আস (রা)-এর সাথে চারশো লোক প্রেরণ করেন। এই ফায়সালা শোনার এবং আযরাজের বৈঠকে অংশগ্রহণের জন্য মক্কা এবং মদীনার কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তিকেও দাওয়াত করা হয়। তাঁরা মুসলমানদের মধ্যকার এই মতানৈক্য দূর করার প্রচেষ্টায় শরীক হওয়ার উদ্দেশ্যে ঐ বৈঠকে যোগদান করতে অস্বীকার করেননি। অতএব হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন উমর, আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র, সা'দ ইবন ওয়াক্কাস (রা) প্রমুখ সাহাবী বৈঠকে যোগ দেন। আযরাজে একত্রিত হওয়ার পর ফায়সালা শোনার জন্য লোকেরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। কিন্তু ফায়সালা ঘোষণার পূর্বে সালিশদ্বয়ের তো এ ব্যাপারে পরস্পর মত বিনিময়ের প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া মক্কা-মদীনার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের জন্যও অপেক্ষা করার প্রয়োজন ছিল।

আলী (রা) যখন আবূ মূসা আশআরী (রা)-কে কূফা থেকে আযরাজের দিকে পাঠাচ্ছিলেন তখন খারিজীদের পক্ষ থেকে হারকূস ইবন যুহায়র এসে তাঁর কাছে নিবেদন করল, আপনি সালিসী ফায়সালা স্বীকার করে নিয়ে মস্তবড় ভুল করেছেন। এখনো তা থেকে বিরত হোন এবং শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য এগিয়ে যান। আমরা সবাই আপনার সাথে আছি। আলী (রা) উত্তরে বলেন, আমি কখনো আমার অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে পারব না। এ হচ্ছে সেই হারকূস ইবন যুহায়র, যে ছিল হযরত উসমান (রা)-এর হত্যাকাণ্ডের ঘটনার বিদ্রোহীদের একজন বিশিষ্ট নেতা এবং যখন খারিজীদলের অন্যতম নেতা হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। আবূ মূসা আশআরী (রা) কূফা থেকে রওয়ানা হওয়ার পর আলী (রা) তাঁর কাছে প্রতিদিন চিঠি পাঠাতে থাকেন। অনুরূপভাবে প্রতিদিন আমর ইবনুল 'আসের কাছেও মুআবিয়া (রা)-এর চিঠি আসতে থাকে। ব্যাপারটির দিকে উভয় হাকিমেরই সতর্ক দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন ছিল। আলী (রা)-এর পত্রাদি আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাসের নামে এবং আমীরে মুআবিয়ার চিঠি আমর ইবনুল 'আসের নামে আসত। আমর ইবনুল ' আসের সঙ্গীদের মধ্যকার নিয়ম-শৃঙ্খলা ছিল খুবই সন্তোষজনক। তারা সকলেই ছিল তাঁর অনুগত। তাদের কোন ব্যক্তি জিজ্ঞেস করত না যে, মুআবিয়া (রা) আপনার কাছে কি লিখেছেন ? কিন্তু আলী (রা)-এর পাঠানো চারশো ব্যক্তিরই অবস্থা ছিল এর ঠিক বিপরীত। তারা প্রতিদিন তাঁর চিঠি আসার সাথে সাথে ইবন আব্বাসের চারপাশে ভিড় জমাত এবং প্রত্যেকেই জিজ্ঞেস করত, আলী (রা) আজ কি লিখেছেন ? ফলে তাঁর সব কথাই সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ্যে জানাজানি হয়ে যেত। ইবন আব্বাস (রা) ভয়ানক বিপদের মধ্যে ছিলেন। উপস্থিত পরিস্থিতি বিবেচনা করে তিনি কিছু কিছু তথ্য গোপন রাখতে চাইতেন। কিন্তু তাতে লোকেরা তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হত। এভাবে ক্রমান্বয়ে তাঁর প্রায় সকল সঙ্গীই তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয় এবং প্রকাশ্যে তাঁর

বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে থাকে যে, তিনি আলীর চিঠি গোপন করেন এবং আমাদের শোনাতে চান না।

যাহোক আবদুল্লাহ্ ইবন উমর, আবদুর রহমান ইবন আবূ বকর, আবদুল্লাহ্ ইবনু যুবায়র, আবদুর রহমান ইবনুল হাব্‌স, আবদুর রহমান ইবন আবদে ইয়াগূস যুহরী, আবূ জাহম ইবন হুযায়ফা, মুগীরা ইবন শু'বা, সা'দ ইবন ওয়াক্কাস (রা) প্রমুখ গণ্যমান্য ব্যক্তি আযরাজে উপনীত হলে তাঁদের নিজের মধ্যে একটি বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তাতে আবূ মূসা আশআরী ও আমর ইবনুল 'আসও যোগদান করেন এবং ঐ গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সামনেই তাঁদের পরস্পর কথাবার্তা শুরু হয়। আমর (রা) প্রথমে আবূ মূসাকে একথা স্বীকার করিয়ে নেন যে উসমান (রা)-কে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে। এরপর তাঁকে একথাও স্বীকার করিয়ে নেন যে, জ্ঞাতিভাই হওয়ার সুবাদে উসমান (রা)-এর হত্যার প্রতিশোধ দাবী করার অধিকার মুআবিয়ার রয়েছে। এ দু'টি কথার বিরুদ্ধে আবূ মূসা (রা) কখনো আপত্তি উত্থাপন করেন নি, বরং নির্দ্বিধায়ই তিনি তিনি তা স্বীকার করেন।

তারপর আমর ইবনুল 'আস (রা) খিলাফতের ব্যাপারে আলোচনা শুরু করেন। তিনি বলেন, মুআবিয়া (রা) কুরায়শের একটি অতি অভিজাত ও প্রখ্যাত গোত্রের সাথে সম্পর্কিত। তিনি হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহধর্মিণী উম্মে হাবীবা (রা)-এর ভাই। তিনি একাধারে সাহাবী ও কাতিবে ওয়াহী (ওয়াহী লিপিবদ্ধকারী)। এই কথাগুলো শুনে আবূ মূসা (রা) বলে উঠেন, মুআবিয়ার এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু আলী (রা) ও অন্যান্য সম্মানিত ব্যক্তি বিদ্যমান থাকতে মুআবিয়ার হাতে খিলাফতের দায়িত্ব কীভাবে অর্পণ করা যেতে পারে? মুআবিয়ার উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য তো আলী (রা)-এর মধ্যে আরো বেশী পরিমাণে বিদ্যমান। যেমন, তিনি আত্মীয়তার দিক দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (রা)-এর অতি নিকটতম ব্যক্তি। তিনিও কুরায়শের একটি অভিজাত গোত্রের সাথে সম্পর্কিত এবং কুরায়শ বংশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের অন্যতম। জ্ঞান, বীরত্ব, তাকওয়া প্রভৃতি গুণের দিক দিয়ে তো তিনি অনন্য। আমর (রা) বলেন, আমীরে মুআবিয়ার মধ্যে অধিকতর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক যোগ্যতা রয়েছে। আর মূসা (রা) বলেন, তাকওয়া ও ঈমানদারীর মুকাবিলায় এই সমস্ত জিনিসের উল্লেখ করা চলে না। মোটকথা, এভাবে কথাবার্তা চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত আবূ মূসা আশআরী (রা) বলেন, আমার তো অভিমত এই যে, আলী, মুআবিয়া উভয়কে খিলাফতের পদ থেকে অপসারণ করে আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা)-কেই খলীফা বানানো উচিত। আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) চোখ বন্ধ করে আপন চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন। এমনি সময়ে যখন নিজের নাম উচ্চারিত হতে শোনেন তখন চোখ খুলে উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠেন, আমি এতে সম্মত নই। আমর (রা) তখন বলেন, তাহলে তুমি আমার ছেলে আবদুল্লাহকে মনোনীত করছ না কেন?

আবূ মূসা বলেন, হাঁ, তোমার ছেলে আবদুল্লাহ্ অত্যন্ত পুণ্যবান বটে, কিন্তু তুমি তাকে এই যুদ্ধে শরীক করে ফিতনার মধ্যে নিক্ষেপ করেছ। এভাবে দীর্ঘক্ষণ আলাপ-আলোচনা চলার পরও যখন এমন কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছা গেল না যাতে উভয়ে একমত হতে পারেন তখন আমর (রা) এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, যেহেতু মুআবিয়া ও আলীর পরস্পর বিরোধ ও যুদ্ধ বিগ্রহের কারণে সমগ্র মুসলমান আজ ভয়ানক বিপদের মধ্যে পতিত, অতএব এটাই শ্রেয় যে, আমরা তাঁদের উভয়কেই পদচ্যুত করব, এরপর সমগ্র মুসলমানকে অধিকার দেব, যেন তারা

সম্পূর্ণ একমত হয়ে কিংবা সংখ্যাগরিষ্ঠের মত নিয়ে নিজেদের একজন খলীফা নির্বাচন করে। আমর (রা) আবূ মূসা (রা)-এর ঐ মত সমর্থন করেন। তারপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, বাইরে গিয়ে সাধারণ্যে এই ফায়সালার কথা জানিয়ে দেওয়া হবে। যদিও উভয় হাকিমই এ ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছেছিলেন, কিন্তু এই অভিমতও শংকামুক্ত ছিল না। কেননা আলী (রা) তাঁর পদচ্যুতিকে কখনো মেনে নিতে পারতেন না। তাছাড়া মুআবিয়া (রা)-ও তাঁর পিছনে সমগ্র সিরিয়ার সমর্থন এবং কিছু সংখ্যক সাহাবীর পৃষ্ঠপোষকতা থাকার কারণে ঐ ফায়সালা সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিতে পারতেন না। যাহোক, যখন ঘোষণা করা হল যে, এখনই সাধারণ সভায় উভয় হাকিমের ফায়সালা ঘোষণা করা হবে তখন অপেক্ষমাণ লোকেরা সঙ্গে সঙ্গে একটি জায়গায় সমবেত হয়ে গেল। সেখানে একটি মিম্বরও রাখা হল এবং উভয় হাকিম অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তির সাথে সেখানে এসে হাযির হলেন।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা

আমর ইবনুল 'আস (রা) আবূ মূসা আশআরী (রা)-কে বলেন, আমাদের মধ্যে যে ফায়সালা হয়েছে তা সবাইকে শুনিয়ে দিন। আবূ মূসা আশআরী (রা) মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন।

> লোকেরা! আমরা উভয়ে অনেক চিন্তাভাবনা করেছি এবং শেষ পর্যন্ত শুধু একটি সিদ্ধান্তের উপরই ঐকমত্যে পৌঁছেছি। এখন আমি তোমাদেরকে সেই সিদ্ধান্তই শুনিয়ে দিচ্ছি। আশা করি এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে মুসলমানদের মধ্যকার অনৈক্য দূর হয়ে যাবে এবং তাদের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। আমি এবং আমর ইবনুল 'আস যে সিদ্ধান্তের উপর একমত হয়েছি তা এই যে, আমরা এই মুহূর্তে আলী এবং মুআবিয়া উভয়কেই পদচ্যুত করলাম এবং তোমাদেরকে অধিকার দিলাম, তোমরা ঐকমত্যের ভিত্তিতে যাকে ইচ্ছা, তোমাদের খলীফা নির্বাচিত করো।

আবূ মূসা আশআরী তাঁর ঘোষণা শেষ করে মিম্বর থেকে অবতরণ করেন। এরপর আমর ইবনুল 'আস (রা) মিম্বরে দাঁড়িয়ে সকলকে সম্বোধন করে বলেন :

> আপনারা সবাই সাক্ষী যে, আবূ মূসা আপন বন্ধু হযরত আলী (রা)-কে পদচ্যুত করেছেন। আমিও এ ব্যাপারে তাঁর সাথে একমত। আমিও আলী (রা)-কে পদচ্যুত করছি। তবে মুআবিয়া (রা)-কে আমি পদচ্যুত করছি না, বরং স্বপদেই বহাল রাখছি। কেননা তিনি অন্যায়ভাবে নিহত খলীফার নিকটজন এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার যোগ্য।

যদি আমর ইবনুল 'আস (রা) আবূ মূসা আশআরী (রা)-এর অভিমত পুরাপুরি সমর্থন করতেন এবং আমীরে মুআবিয়ার পক্ষে কিছু না বলতেন তা হলে পরে সালিশদ্বয়ের ফায়সালার যে বেইজ্জতী হয়েছে তা কখনো হত না। আবূ মূসা যা কিছু বলেছেন তাতে কিছু না কিছু দুর্বলতা বা ভ্রান্তি হয়ত থাকতে পারে, কিন্তু তাতে পক্ষপাতিত্ব ও অবিশ্বস্ততার লেশমাত্র ছিল না। এ ব্যাপারে তথায় সমবেত আটশ' মুসলমানের মধ্যেও সম্ভবত কোন মতানৈক্য হত না। কেননা উভয় হাকিমের পক্ষ থেকে একজন খলীফা নির্বাচনের অধিকার তো তাদের দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরে যা কিছু ঘটেছিল তার সবই পরেও ঘটার ছিল এবং তা হয়ত মুসলমানদের জন্য আরো বেশী মারাত্মক হত। কেননা আলী (রা) কখনো তাঁর পদচ্যুতিকে মেনে নিতেন

না। অনুরূপভাবে মুআবিয়া (রা)-ও সিরিয়ার রাষ্ট্রক্ষমতা এবং নিজের দাবী কখনো ত্যাগ করতেন না। আর তৃতীয় যে খলীফা বা আমীরকে এই জনসভা নির্বাচন করত তিনি আমীরে মুআবিয়া (রা) বা হযরত আলী (রা) থেকে অধিক শক্তিশালী হতে পারতেন না। এভাবে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর স্থলে তৃতীয় আর একজন প্রতিদ্বন্দ্বীর আবির্ভাব ঘটত এবং মুসলমানদের ধ্বংস হত আরো ব্যাপকতর এবং আরো বেশী ত্বরান্বিত।

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আমীরে মুআবিয়া আপোস-মীমাংসার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। যদি তিনি একান্তই আপোস-মীমাংসা চাইতেন তাহলে সিফফীন প্রান্তরে ব্যাপকতর যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে যখন আলী (রা)-এর পক্ষ থেকে আপোস-মীমাংসার চেষ্টা করা হয়েছিল তখন তিনি আপোস-মীমাংসার এই প্রস্তাব অর্থাৎ দুই পক্ষ থেকে দুইজন মধ্যস্থতাকারী নিয়োগের আবেদন পেশ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি শুধু তখনই আপোস-মীমাংসার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন যখন তাঁর পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। অতএব তাঁর পক্ষ থেকে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগের প্রস্তাব এবং هٰذَا كِتَابُ اللّٰهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ (এই কিতাবই আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করবে) এই উক্তি ঘাড়ের উপর থেকে বিপদ দূর করা ও পরাজয় থেকে রক্ষা পাওয়ার একটি যুদ্ধ কৌশল, একটি সামরিক প্রতারণা ছাড়া কিছুই ছিল না। অনুরূপভাবে আলী (রা)-ও মধ্যস্থতাকারী নিয়োগের এই প্রস্তাব আনন্দচিত্তে মেনে নেননি। তিনি তো এর বিরুদ্ধে ছিলেন; লোকেরাই তাঁকে এজন্য বাধ্য করেছিল। তারাই হুমকি দিয়ে আশতারকে ফিরিয়ে এনেছিল এবং যুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষণা করিয়েছিল। অতএব আমর ইবনুল 'আস (রা) যদি সাধারণ সমাবেশে আবূ মূসা আশআরী (রা)-এর বক্তব্য অক্ষরে অক্ষরে সমর্থন করতেন এবং তাদের উভয়কে বরখাস্ত করতেন তবে তাঁরা উভয়ে তা মেনে নিতেন কি না এটা বিশ্বাস করা মোটেই সহজ ছিল না। যাই হোক সালিশদ্বয় জনতার সামনে নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করেন, যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। আমর ইবনুল 'আসের বক্তব্য শুনে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস এবং অন্যরা আবূ মূসা (রা)-কে এই বলে দোষারোপ করতে শুরু করেন যে, আপনি প্রতারিত হয়েছেন। আবূ মূসা (রা) আমর ইবনুল 'আসকে এই বলে তিরস্কার করেন যে, তুমি আমাদের মধ্যে গৃহীত সিদ্ধান্তের পরিপন্থী মত প্রকাশ করেছ এবং আমাকে ধোঁকা দিয়েছ। মোটকথা আমর (রা)-এর বক্তৃতার পর পরই সেখানে দারুণ হট্টগোল ও বিশৃঙ্খলা শুরু হয়ে যায়।

শুরায়হ্ ইবন হানী আমর ইবনুল 'আসকে তরবারি দ্বারা আঘাত করেন। তিনি তা প্রতিহত করে শুরায়হের উপর পাল্টা আঘাত হানেন। ইতিমধ্যে লোকেরা তাদের মধ্যখানে এসে যায় এবং উভয়কেই যুদ্ধ থেকে নিরস্ত করে। এ মজলিসে বিশৃঙ্খলা ও বাড়াবাড়ি সৃষ্টি হওয়ার কারণেও আমীরে মুআবিয়া লাভবান হন এবং হযরত আলী হন ক্ষতিগ্রস্ত। কেননা এই অবস্থায় সিরীয় ও ইরাকী উভয় দলের এই জায়গায় অবস্থান উভয় পক্ষের নেতাদের চোখেই ছিল বিপজ্জনক। এমতাবস্থায় উভয় পক্ষের আটশো মুসলমানের পক্ষে সর্বসম্মতিক্রমে না কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব ছিল, আর না গণ্যমান্য সাহাবীদের পক্ষে সম্ভব ছিল আপোস-মীমাংসার ব্যাপারে কোনরূপ সাহায্য করা। আবূ মূসা আশআরী এবং আমর ইবনুল 'আস (রা)-ও অতিদ্রুত সেখান থেকে দামিশকের দিকে যাত্রা করেন। শুরায়হ ও আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস তাঁদের সঙ্গীদের নিয়ে কূফা রওয়ানা হন। মক্কা ও মদীনা থেকে যে কয়জন গণ্যমান্য ব্যক্তি

এসেছিলেন তাঁরা অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে নিজ নিজ গৃহ অভিমুখে রওয়ানা হন। মোটকথা, অতি অল্প সময়েই মধ্যেই আযরাজের জনসমাবেশ কোথায় যেন মিলিয়ে যায়।

সিরীয়রা অত্যন্ত আনন্দচিত্তে আমর ইবনুল 'আসের সঙ্গে দামিশকের দিকে যাচ্ছিল। এখান থেকেই তারা মুআবিয়া (রা)-কে আমীরুল মু'মিনীন ও খলীফাতুল মুসলিমীন বলতে শুরু করে। দামিশক পৌঁছে সিরীয়রা তাঁকে সাফল্যের সুসংবাদ দেয় এবং সকলে মিলে তাঁর হাতে বায়'আত করে। কিন্তু ইরাকের লোক, যারা আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা) ও শুরায়হ ইবন হানীর সাথে কূফার দিকে যাচ্ছিল তাঁদের অবস্থা ছিল সিরীয়দের ঠিক বিপরীত। তারা পরস্পর অনবরত কথা কাটাকাটি করছিল। কেউ আবূ মূসাকে দোষী সাব্যস্ত করছিল, আবার কেউ তাঁকে নির্দোষ প্রমাণের চেষ্টা করছিল। কেউ আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করছিল এবং মধ্যস্থতাকারী হাকিম নিয়োগের ব্যাপারে তাঁর সম্মতি প্রদানকে একটি ভুল পদক্ষেপ আখ্যা দিচ্ছিল। কেউ কেউ আবার আমর ইবনুল 'আসের প্রতারণামূলক বক্তব্য প্রদানের উপর তাঁকে গালিগালাজ করছিল। মোটকথা, এই চারশ' লোকের অবস্থা ছিল ঠিক ঐ বাহিনীর মত যারা কিছু দিন পূর্বে সিফফীন থেকে আলী (রা)-এর সাথে কূফার দিকে যাচ্ছিল। যাহোক, কূফা পৌঁছার পর ইবন আব্বাস (রা) আলী (রা)-কে যাবতীয় ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি আবূ মূসা এবং আমর ইবনুল 'আস উভয়ের সিদ্ধান্তকে কুরআন বিরোধী আখ্যা দিয়ে তা মেনে নিতে অস্বীকার করেন এবং মুআবিয়া, আমর, হাবীব ইব্‌ন মাসলামা, আবদুর রহমান ইবন মুখাল্লাদ, দাহহাক ইবন কায়স, ওয়ালীদ ও আবুল আওয়ারকে অভিসম্পাত করেন। এই অভিশাপ প্রদানের খবর আমীরে মুআবিয়ার নিকট পৌঁছলে তিনিও আলীকে অনুরূপ অভিসম্পাত করেন। আর তখন থেকেই এ দু'পক্ষের পরস্পর অভিশাপ প্রদানের প্রচলন শুরু হয়।

انَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ ٠

আযরাজের ঘটনায় আমীরে মুআবিয়ার এতটুকু উপকার হয় যে, যারা তাকে সমর্থন করত, ইতিপূর্বে তারা তাঁকে আমীরুল মু'মিনীন বা 'মুসলমানদের খলীফা' বলত না, কিন্তু এখন থেকে তারা তাঁকে প্রকাশ্যে আমীরুল মু'মিনীন বলতে শুরু করে। কিন্তু আযরাজের ঘটনার ফলে নতুন কোন দল এসে তাঁর হাতে বায়'আত করেনি। আর হযরত আলী (রা) প্রথম থেকেই দ্বিগুণ অসুবিধার মধ্যে ছিলেন। এখন সে অসুবিধা তিন গুণ বৃদ্ধি পেল। মুআবিয়া (রা)-ও সিরীয়দের দমন করা এবং খারিজীদের কাবুতে রাখা ও দু'টি দায়িত্ব তো প্রথম থেকেই তাঁর ঘাড়ে ন্যস্ত ছিল, এখন আবার তাঁর উপর ন্যস্ত হল তৃতীয় আর একটি কঠিন দায়িত্ব। তা হলো, স্বয়ং আপন বন্ধু-বান্ধব এবং অনুসারীদের একথা হৃদয়ঙ্গম করানো যে, উভয় হাকিম যেহেতু পরস্পর বিরোধী মত পোষণ করেছেন, তাই তাদের কারো ফায়সালাই মেনে নেওয়া যেতে পারে না। তাছাড়া উভয় হাকিমকে পবিত্র কুরআন এ অধিকার দেয়নি যে, তাঁরা আল্লাহ্ ও রাসূলের হুকুম ছেড়ে নিজ নিজ ইচ্ছামত ফায়সালা করবে এবং জলাঞ্জলি দেবে। বেশ কয়েকদিন পর্যন্ত আলী (রা) কূফাবাসীদের একথাই বোঝাতে থাকলেন যে, যেহেতু উভয় হাকিমের ফায়সালাই মেনে নেওয়া যেতে পারে না তাই আমাদের উচিত সিরীয়দের উপর হামলা করা। যখন লোকেরা তাঁর একথা বুঝতে পারল এবং তিনি সিরিয়ার

উপর আক্রমণ পরিচালনার প্রস্তুতি নিতে লাগলেন তখন খারিজীদের দল, যারা তখন কূফায় যথেষ্ট পরিমাণে ছিল, পুনরায় নিজেদের মত পরিবর্তন করল।

খারিজীদের বিশৃঙ্খলা

ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, আলী (রা) হাকিমদের ফায়সালা শোনার জন্য চারশ' লোককে আযরাজে পাঠানোর সময় হারকূস ইবন যুহায়র তাঁকে বলেছিল, আপনি এখনো মধ্যস্থতাকারীদের ফায়সালা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন এবং সিরিয়ার উপর হামলা করুন। কিন্তু আলী (রা) তার একথা মেনে নিতে অস্বীকার করেছিলেন এবং বলেছিলেন, আমরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে পারব না এবং নিজেদের লিখিত প্রতিশ্রুতি থেকেও ফিরে আসতে পারব না। এখন যখন হারকূস ও অন্যান্য খারিজীরা দেখল যে, স্বয়ং আলী (রা) মধ্যস্থতাকারী হাকিমদের ফায়সালাকে অমূলক এবং অগ্রহণীয় প্রমাণ করে লোকদেরকে সিরিয়া আক্রমণে উৎসাহিত করছেন তখন যুরআ' ইবনুল বারহ্ ও হারকূস ইবন যুহায়র এ দু'জন খারিজী নেতা আলী (রা)-এর কাছে এসে বলে, আপনি প্রথমে আমাদের সঠিক পরামর্শ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন, অথচ এখন আপনি নিজেই সেই কাজ করছেন যার কথা আমরা আপনাকে বলেছিলাম। মধ্যস্থতাকারীদের ফায়সালার প্রতি সম্মতি প্রকাশ করে আপনি ভুল করেছিলেন, কিন্তু সে ভুল আপনি স্বীকার করেন নি। অথচ এখন আপনি মধ্যস্থতাকারীদের ফায়সালা অমূলক আখ্যা দিয়ে সিরিয়া আক্রমণের সংকল্প নিয়েছেন। অতএব এখন থেকে আমরা তখনই আপনাকে সমর্থন করব যখন আপনি আপনার ভ্রান্তি ও অপরাধ স্বীকার করে তা থেকে তওবা করবেন।

আলী (রা) উত্তরে বললেন, মধ্যস্থতাকারীদের সমর্থন এবং তাদেরকে হাকিম হিসাবে মেনে নিতে তোমরাই তো আমাকে বাধ্য করেছিলে। অন্যথায় যুদ্ধের মাধ্যমে তখনই তো একটা ফায়সালা হয়ে যেত। এটা কেমন কথা যে, এখন তোমরা আমাকে অপরাধী আখ্যা দিয়ে তওবা করতে বলছ। তারা বলল, আচ্ছা আমরা স্বীকার করছি যে, আমরা অপরাধ করেছি এবং এজন্য আমরাও তওবা করছি। আপনিও আপনার অপরাধের কথা স্বীকার করে সেজন্য তওবা করুন, এরপর সিরীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হোন। আলী (রা) বললেন, আমি তো অপরাধের কথা স্বীকারই করছি না; অতএব তওবা করব কিসের জন্য? একথা শুনে ওরা উভয়ে সেখান থেকে উঠে দাঁড়াল এবং لَا حُكْمَ إلَّا لِلّٰه (আল্লাহ্ ছাড়া কারো হুকুম মানি না) এই শ্লোগান দিতে দিতে নিজ নিজ গন্তব্যের দিকে চলে গেল। এরপর আলী (রা) কূফার মসজিদে বক্তৃতা দিতে দাঁড়ালে মসজিদের এক কোণা থেকে এক খারিজী উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠল, لَا حُكْمَ إلَّا لِلّٰه (আল্লাহ্ ছাড়া কারো সালিশ মানি না)। আলী (রা) তখন বললেন, দেখ, এই লোকেরা সত্য কথার দ্বারা বাতিলকে প্রকাশ করছে। এরপর তিনি বক্তৃতা দিতে শুরু করলে পুনরায় আওয়াজ উঠে 'লা হুকমা ইল্লা লিল্লাহ্। আলী তখন বলেন, তোমরা আমার সাথে অত্যন্ত অসঙ্গত আচরণ করছ। আমরা তোমাদের মসজিদে আসতে বাধা দেই না। যতক্ষণ, তোমরা আমাদের সাথে ছিলে আমরা তোমাদের গনীমতের সম্পদের সমান ভাগ দিয়েছি। আর আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না যতক্ষণ তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ না করবে। আমরা এখন তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহ্র নির্দেশের অপেক্ষা করছি– দেখি তিনি কি ফায়সালা করেন।

একথা বলে তিনি মসজিদ থেকে বের হয়ে আপন ঘরের দিকে চলে যান। তারপর খারিজীরাও পরস্পর সলা-পরামর্শের উদ্দেশ্যে আবদুল্লাহ্ ইবন ওয়াহবের ঘরে একত্রিত হয়। সেখানে আবদুল্লাহ্ ইবন ওয়াহব, হারকূস ইবন যুহায়র, হামযা ইবন সিনান, যায়দ ইবন হুসায়ন তাঈ, শুরায়হ ইবন আদান প্রমুখ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, এখন খারিজীদের উচিত কূফা থেকে বেরিয়ে গিয়ে কোন একটি পাহাড়ী এলাকায় অবস্থান গ্রহণ করা, তথা আলীর হুকুমতের বাইরে গিয়ে নিজেদের একটি পৃথক হুকুমত প্রতিষ্ঠা করা। হামযা ইবন সিনান আসাদী বলল, এখান থেকে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে আমাদের উচিত, কোন এক ব্যক্তিকে আমীর মনোনীত করা এবং তার হাতে নিজেদের পতাকা তুলে দেওয়া।

এ কাজের জন্য পরদিন শুরায়হের ঘরে পুনরায় বৈঠক বসল। ঐ বৈঠকে আবদুল্লাহ্ ইবন ওয়াহবকে খারিজীরা তাদের আমীর মনোনীত করল এবং তার হাতে বায়'আত করল। আবদুল্লাহ্ ইবন ওয়াহব বলল, এখন আমাদেরকে এখান থেকে এমন কোন শহরে চলে যেতে হবে যেখানে আমরা আল্লাহ্র হুকুম জারি করতে পারি। কেননা আমরাই হচ্ছি আহলে হক বা ন্যায়পন্থী। শুরায়হ্ বলল, মাদায়েনের দিকে আমাদের চলে যাওয়া উচিত। কেননা সেখানে যে সামান্য সৈন্য রয়েছে তাদেরকে পরাস্ত করে অতি সহজেই আমরা এলাকার উপর নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হব। এরপর আমরা সেখানে আমাদের বসরায় অবস্থানরত ভাইদেরকেও ডেকে নিয়ে যাব। যায়দ ইবন হুসায়ন বলল, যদি আমরা সকলে একযোগে বের হই তাহলে এটা আশ্চর্য নয় যে, আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে। অতএব এটাই সমীচীন যে, আমরা দু' দু' চার চার বা দশ দশ জন হয়ে এখান থেকে বের হব এবং সোজা মাদায়েনে না গিয়ে প্রথমে নাহরাওয়ান প্রান্তরে গিয়ে সমবেত হব। তারপর পত্র মারফত বসরার ভাইদেরকেও সেখানে ডেকে নিয়ে যাব। এই অভিমত সকলেই পসন্দ করে। এরপর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তারা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে কূফা থেকে বের হয়। সেই সাথে তারা বসরার খারিজীদের কাছে লিখে, তোমরাও বসরা থেকে বের হয়ে নাহ্রাওয়ানে এসে আমাদের সাথে মিলিত হও। আশআর ইবন আযাকী তাইমী পাঁচশ' খারিজীর একটি দল নিয়ে বসরা থেকে বের হয়। আলী (রা) যখন জানতে পারলেন যে, বহু সংখ্যক খারিজী কূফা থেকে বের হয়ে মাদায়েন অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেছে তখন তিনি সেখানকার শাসক সা'দ ইব্ন মাসঊদের কাছে একজন দ্রুতগামী দূত পাঠিয়ে তাঁকে নির্দেশ দেন, খারিজীদের প্রতিরোধ কর এবং তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাক। সা'দ নিজ ভ্রাতুষ্পুত্রকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে স্বয়ং একটি বাহিনী নিয়ে খারিজীদের প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে 'কুরজ' নামক স্থানে খারিজীদের একটি দলের সাথে তাঁর সংঘর্ষ হয়। সন্ধ্যা পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। রাতের অন্ধকারে খারিজীরা দজলা নদী অতিক্রম করে চলে যায়। এরপর বসরার খারিজীরা সেখানে গিয়ে পৌঁছে। তাদের সাথেও সা'দের সংঘর্ষ হয়। শেষ পর্যন্ত তারাও দাজলা অতিক্রম করে নাহরাওয়ান নামক স্থানে গিয়ে নিজ দলের সাথে মিলিত হতে সক্ষম হয়। নাহ্রাওয়ানে খারিজীরা নিজেদের সুসংগঠিত করে নেয়। তারপর আলী (রা) ও তাঁর অনুসারীদের উপর কুফরী ফতওয়া জারি করে এবং যারা 'হযরত আলী ন্যায়ের উপর রয়েছেন' একথা স্বীকার করত তাদেরকে হত্যা করতে শুরু করে। তাদের সংখ্যা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে, এমন কি তা পঁচিশ হাজারে গিয়ে দাঁড়ায়।

নাহ্‌রাওয়ান যুদ্ধ

খারিজীরা কূফা থেকে চলে যাওয়ার পর আলী (রা) কূফাবাসীদের সিরিয়া আক্রমণের জন্য উৎসাহিত করেন। তিনি প্রথমে আমীরে মুআবিয়াকে সিরিয়া থেকে উৎখাত করতে চাচ্ছিলেন। তিনি সিরিয়া অভিযানের উপর খারিজী ফিতনাকে অগ্রাধিকার দিতে চাচ্ছিলেন না। তিনি বসরায় ইবন আব্বাস (রা)-এর কাছে লিখেন, সিরিয়া অভিযানের জন্য যে পরিমাণ সৈন্য সরবরাহ সম্ভব অবিলম্বে তা পাঠিয়ে দাও। বসরা থেকেও খারিজীরা চলে গিয়েছিল এবং এটা হযরত আলীর পক্ষে ভালই হয়েছিল। কেননা এরা শহরে না থাকায় সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিরও কোন সম্ভাবনা ছিল না। বসরায় তখন ষাট হাজার যোদ্ধা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু যখন ইবন আব্বাস (রা) লোকদেরকে আলী (রা)-এর চিঠি পড়ে শোনান এবং তাদেরকে সিরিয়া আক্রমণে উদ্বুদ্ধ করেন তখন তাদের মধ্য থেকে মাত্র তিন হাজার লোক তৈরি হয়, অবশিষ্টরা হযরত আলীর নির্দেশ যেন শুনেও শুনেনি। কূফার লোকেরাও যেন নিরাসক্ত হয়ে পড়েছিল। বসরার ঐ তিন হাজার যোদ্ধা হারিছা ইবন কুদামার নেতৃত্বে কূফা পৌঁছলে আলী (রা) কূফাবাসীদের একত্রিত করে একটি ভাষণ দেন। তাতে তিনি সকলকে যুদ্ধের জন্য অনুপ্রাণিত করেন। শেষ পর্যন্ত কূফাবাসীরা যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়ে যায় এবং চল্লিশ হাজারেরও অধিক সৈন্য আলী (রা)-এর পতাকাতলে সমবেত হয়। তিনি খারিজীদেরও আর এক দফা তাঁর সাথে যুদ্ধে শরীক হওয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করা সঙ্গত মনে করেন। তিনি নাহ্‌রাওয়ানে ইবন ওয়াহবের কাছে একটি চিঠি পাঠান। তাতে তিনি বলেন, তোমরা সিরীয়দের মুকাবিলা করার জন্য আমাদের কাছে চলে এসো। আমি আমার প্রথম সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সিরীয়দের সাথে যুদ্ধ করতে সংকল্পবদ্ধ। ইবন ওয়াহব আলী (রা)-এর চিঠি তার সঙ্গীদের পড়ে শোনায় এবং সকলের পরামর্শ অনুযায়ী তার নিম্নোক্ত উত্তর দেয়–

> তুমি আল্লাহ্ ও আল্লাহর রাসূলের হুকুমের বিরোধিতা করে মধ্যস্থতাকারী হাকিমদ্বয় নিয়োগ করেছিলে এবং এখন সিরীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাচ্ছ। এটাও তুমি তোমার রিপুর তাড়নায় করছ। যদি তুমি তোমার নিজের কাফির হওয়ার কথা স্বীকার কর এবং সেজন্য তওবা কর তাহলে আমরা তোমার সাহায্যের জন্য প্রস্তুত আছি। অন্যথায় আমরা তোমার সাথে যুদ্ধ করতে রাযী নই।

এই চিঠি পাওয়ার পর আলী (রা) খারিজীদের সম্পর্কে একেবারে নিরাশ হয়ে যান। কিন্তু তিনি তাঁর সিরিয়া অভিযানের পরিকল্পনা বাতিল করলেন না। তিনি খারিজীদের সঠিক পথে আনার আপ্রাণ চেষ্টা করেন, কিন্তু তারা কোন মতেই একটা আপোস-মীমাংসায় আসল না। তিনি যখন ওদেরকে বলতেন, তোমরাই তো আমাকে যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য করেছিলে, অতএব এখন কি করে তোমরা আমাকে দোষী সাব্যস্ত করছ, তখন ওরা বলত, আমরা আমাদের ভুল স্বীকার করছি, তুমিও তোমার ভুল স্বীকার করে নাও। আমরা জানি যে, আমরা ভুল করে কাফির হয়ে গিয়েছিলাম; কিন্তু তওবা করে তো পুনরায় মুসলমান হয়েছি। এভাবে তুমিও তওবা করে মুসলমান হয়ে যাও। তাহলে আমরা তোমার উপর কুফরীর যে ফতওয়া দিয়েছিলাম তা উঠিয়ে নেব। অন্যথায় আমরা তোমাকে কাফির বলেই বিশ্বাস করব এবং তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাব।

এই সব পাগলামী কথাবার্তা উপেক্ষা করে আলী (রা) সিরিয়া আক্রমণের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতে যাচ্ছিলেন। এমন সময় তাঁর কাছে সাহাবী আবদুল্লাহ্ ইবন খাব্বাব (র)-এর শাহাদতের সংবাদ এসে পৌঁছে। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন খাব্বাব (রা) এক সফরে ছিলেন। তিনি নাহরাওয়ানের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় খারিজীদের একটি দল জানতে পারেন যে, তিনি একজন সাহাবী। অমনি তারা এসে তাকে প্রশ্ন করে, আবূ বকর ও উমর (রা) সম্পর্কে আপনার অভিমত কি ? তিনি উত্তর দেন, তাঁরা উভয়েই পুণ্যবান এবং আল্লাহর সম্মানিত বান্দা ছিলেন। এরপর তারা প্রশ্ন করে, আপনি উসমানের খিলাফতের প্রথম ও শেষ যুগ সম্পর্কে কি বলেন ? আবদুল্লাহ্ ইবন খাব্বাব (রা) উত্তর দেন, তিনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সত্যপন্থী ও ন্যায়বান ছিলেন। তারপর তারা প্রশ্ন করে, আলী সম্পর্কে আপনার অভিমত কি ? তিনি মধ্যস্থতাকারী হাকিম নিয়োগ করার পূর্বে এবং পরে কিরূপ ছিলেন ? তিনি উত্তরে বলেন, আল্লাহ্ ও আল্লাহর রাসূলের হুকুমকে বোঝা এবং তার উপর আমল করার ব্যাপারে আলী (রা) তোমাদের চাইতে অনেক অগ্রগামী। খারিজীরা একথা শুনতেই রাগে বেসামাল হয়ে আবদুল্লাহ্ ইবন খাব্বাব, তাঁর স্ত্রী ও সঙ্গী-সাথীদের হত্যা করে। আলী (রা) এই সংবাদ পেয়ে বিস্তারিত অবস্থা জানার জন্য হারছ ইবন মুররাকে সেখানে পাঠান। কিন্তু খারিজীরা তাঁকেও নির্মমভাবে হত্যা করে। এই সংবাদের সাথে সাথে আলী (রা)-এর কাছে এই সংবাদও পৌঁছে যে, খারিজীরা এখন যাকেই পায়, যে তাদের সমমতাবলম্বী নয় তাকেই হত্যা করে। এতে আলী (রা)-এর বাহিনীর লোকেরা এই ভেবে শংকিত হন যে, যদি তারা সিরিয়ার দিকে চলে যায় তাহলে সেই সুযোগে খারিজীরা কূফা, বসরা তথা সমগ্র ইরাক দখল করে নেবে এবং তাদের সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজনকে হত্যা করবে। আলী (রা)-এর এই ধারণা জন্মে যে, খারিজীরা কূফা ও বসরা দখল করে নিয়ে সিরিয়ার উপর হামলা করে লাভের চেয়ে বরং ক্ষতিই হবে বেশি। অতএব তিনি সিরিয়া যুদ্ধ মুলতবি রেখে খারিজীদের দমনে রওয়ানা হন এবং নাহরাওয়ানের নিকটবর্তী হয়ে তাদের কাছে নিম্নোক্ত পয়গাম পাঠান।

> তোমাদের মধ্যে যারা আমাদের ভাইদের হত্যা করেছ তাদের আমাদের হাতে সমর্পণ কর। আমরা তাদেরকে কিসাসস্বরূপ হত্যা করব এবং তোমাদেরকে তোমাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দিয়ে সিরিয়া রওয়ানা হব। যতক্ষণ আমরা সিরিয়া-যুদ্ধে লিপ্ত থাকব আশা করি সেই সময়ের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সত্য পথে নিয়ে আসবেন।

এরপর আলী (রা) একের পর এক বেশ কয়েকজন গণ্যমান্য সাহাবীকে খারিজীদের কাছে পাঠান যাতে তারা ওয়ায-নসীহত ও উপদেশ প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে সঠিক পথে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন। তিনি স্বয়ং খারিজীদের একদল প্রতিনিধিকে ডেকে পাঠিয়ে অনেক নসীহত করেন। তিনি তাদেরকে বলেন, মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ যদি ভুল হয়ে থাকে তাহলে সেজন্য তোমরাই দায়ী। যাহোক অতীতে যা কিছু ঘটেছে তা ভুলে যাও এবং আমার সাথে সিরিয়া অভিযানে চল। খারিজীরা প্রতিবারই ঐ একই উত্তর দেয় : নিঃসন্দেহে আমরা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের হুকুমের বিরোধিতা করে কাফির হয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু তওবা করে পরে আবার মুসলমান হয়েছি। এখন তুমিও যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার অপরাধ স্বীকার করে তওবা না করবে ততক্ষণ কাফিরই থেকে যাবে এবং অনুরূপ অবস্থায় আমরা সর্বক্ষণ তোমার বিরোধিতা

করতে থাকব। আলী (রা) বলেন আমি আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছি, হিজরত করেছি এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করেছি। এমতাবস্থায় কি করে নিজেকে কাফির বলব ? শেষ পর্যন্ত তিনি খোদ খারিজী বাহিনীর একেবারে সন্নিকটে চলে যান এবং তাদেরকে উপদেশ দিতে থাকেন। কিন্তু সাধারণ খারিজীরা তাঁর উপদেশে প্রভাবিত হতে পারে এই আশংকায় তাদের নেতারা উচ্চৈঃস্বরে তাদের অনুসারীদের এই বলে উপদেশ দিতে থাকে–

তোমরা কখনো আলীর কথা শুনবে না এবং তাঁর সাথে কথাও বলবে না। বরং তোমাদেরকে, একদিন যে আল্লাহ্‌র সম্মুখীন হতে হবে সে সম্পর্কে ভয় কর– অর্থাৎ যুদ্ধ শুরু করে দাও।

এই অবস্থা লক্ষ্য করে আলী (রা) সেখান থেকে পিছিয়ে আসেন এবং নিজ বাহিনীকে বিন্যস্ত করে প্রত্যেকটি খণ্ড বাহিনীর জন্য এক একজন অধিনায়ক নিয়োগ করেন। তিনি হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা)-কে পতাকা দিয়ে বলেন, আপনি এই পতাকা নিয়ে একটি উচ্চ ভূমিতে দাঁড়ান এবং উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা দিন : 'যে ব্যক্তি যুদ্ধ না করে আমাদের কাছে আসবে তাকে নিরাপত্তা প্রদান করা হবে। আর যে ব্যক্তি কূফা অথবা মাদায়েনের দিকে চলে যাবে সেও নিরাপদ। এই ঘোষণা শুনে কিছু লোক কূফার দিকে এবং কিছু লোক মাদায়েনের দিকে চলে যায়। কিছু লোক এসে আলী (রা)-এর বাহিনীতেও যোগ দেয়। শেষ পর্যন্ত খারিজীদের বাহিনীতে এক-তৃতীয়াংশ লোক অবশিষ্ট থাকে। এই যুদ্ধে খারিজীদের প্রভাবশালী নেতা আবদুল্লাহ্ ইবন ওয়াহব, যায়দ ইবন হুসায়ন, হারকূস ইবন যুহায়র, আবদুল্লাহ্ ইবন শাজার, শুরায়হ্ ইবন আদানা প্রমুখ নিহত হয় এবং শুধু নয়জন খারিজী কোন মতে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ রক্ষা করে। হযরত আলী (রা) খারিজীদের লাশসমূহ দাফন না করে সেই অবস্থায়ই ফেলে রেখে সেখান থেকে চলে আসেন।

ঐ যুদ্ধে বাহ্যত খারিজীদের সম্পূর্ণ শক্তি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তাই এখন আর ওদের দিক থেকে কোন আশংকা বাকী ছিল না। হযরত আলী (রা) নাহরাওয়ান যুদ্ধ শেষ করে যখন সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হওয়ার সংকল্প নেন তখন আশআস ইবন কায়স তাঁর কাছে নিবেদন করে : আপনি অনুগ্রহ করে আপাতত সিরিয়া অভিযান মুলতবি রেখে সৈন্যদেরকে কিছুদিন বিশ্রাম গ্রহণের সুযোগ দিন। কিন্তু তিনি একথা পসন্দ করেন নি। তিনি নাখীলায় এসে অবস্থান নেন এবং নির্দেশ দেন, সিরীয়দের উপর বিজয় লাভ করে ফিরে না আসা পর্যন্ত যেন কেউ কূফায় না যায়। কিন্তু লোকেরা তাঁর এই নির্দেশ মানেনি। তারা ছাউনি ত্যাগ করে নিজ নিজ ঘরে চলে যায়। আলী (রা) যখন দেখেন যে, ছাউনি একেবারে শূন্য হয়ে গেছে তখন তিনি নিজেও কূফায় চলে যান এবং সেখানে গিয়ে সব নেতাকে একত্রিত করে তাদের কাছে এই দায়িত্বহীনতা ও আরামপ্রিয়তার কারণ জিজ্ঞেস করেন। অতি অল্প সংখ্যক লোকই তাঁর কথা শুনে এবং সিরিয়া আক্রমণের ব্যাপারে সম্মতি প্রকাশ করে বাকী সবাই নীরব থাকে। এরপর তিনি সকলকে একত্রিত করে সিরিয়া অভিযানের জন্য তাদেরকে অনুপ্রাণিত করেন। সকলে তাঁর বক্তৃতা নীরবে শুনল বটে, কিন্তু যুদ্ধের ব্যাপারে কোন আগ্রহ দেখাল না। তিনি এই অবস্থা দেখে নীরব থাকতে বাধ্য হন। এরপর তিনি আর সিরিয়া আক্রমণ করতে পারেন নি।

মিসরের অবস্থা

ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, সিফফীন যুদ্ধ চলাকালে মুহাম্মদ ইবন আবূ বকর মিসরের গভর্নর ছিলেন এবং ঐ যুদ্ধে আলী (রা)-এর পক্ষে বা মুআবিয়া (রা)-এর বিপক্ষে কোন ভূমিকা

পালন করতে পারেন নি। কেননা তিনি তখন উসমান-ভক্তদের সাথে আভ্যন্তরীণ বিবাদে লিপ্ত ছিলেন। তথাকথিত উসমান-ভক্তরা মুআবিয়া ইবন খাদীজকে তাদের নেতা মনোনীত করে মুহাম্মদ ইবন আবূ বকরের সাথে যথারীতি যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছিল। তারা কয়েকটি যুদ্ধে বিজয় লাভও করেছিল। সিফফীন যুদ্ধের পর আলী (রা) প্রথমে মালিক আশতারকে জাযীরার শাসক নিয়োগ করে পাঠান, কিন্তু কয়েক দিন পর পুনরায় তাকে মিসরের গভর্নর পদে নিয়োগ করেন। মুহাম্মদ যখন এ সংবাদ পান যে, মালিক আশতার মিসরের শাসক হয়ে আসছেন তখন তিনি দুঃখিত হন। অনুরূপভাবে মুআবিয়াও এই সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন। কেননা তিনি মালিক আশতারকে একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি হিসাবেই জানতেন। তিনি সম্যক বুঝতে পেরেছিলেন যে, মালিক আশতার মিসরের ক্ষমতায় একবার বসে গেলে অবস্থা তার (মুআবিয়া) জন্য অত্যন্ত প্রতিকূল হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু ঘটনাক্রমে মালিক আশতার মিসরে পৌঁছার পূর্বেই পথিমধ্যে ইনতিকাল করেন। ফলে মুহাম্মদই যথারীতি মিসরের শাসক থেকে যান। মালিক আশতারের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে আলী (রা) মুহাম্মদের কাছে একটি পত্র প্রেরণ করেন। তাতে তিনি লিখেন, আমি মালিক আশতারকে মিসরের গভর্নর পদে এজন্য নিয়োগ করিনি যে, আমি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট, বরং সে অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে এমন কিছু রাজনৈতিক বিষয়ের মীমাংসা করতে পারত যা মিসর সরকারের জন্য ছিল খুবই প্রয়োজনীয়। তিনি যখন পথিমধ্যেই ইনতিকাল করেছেন তখন তুমিই মিসর প্রশাসনের জন্য শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি। তোমার উচিত দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সাথে শত্রুদের মুকাবিলা করা। ঐ পত্রের উত্তরে মুহাম্মদ ইবন আবূ বকর লিখেন, আমি আপনার একান্ত অনুগত এবং আপনার শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। মধ্যস্থতাকারী হাকিমদের ফায়সালা ঘোষণার পূর্বেই এই সমস্ত ঘটনা ঘটেছিল। যখন আযরাজ নামক স্থানে শালিসদ্বয়ের ফায়সালা ঘোষিত হল তখন সিরিয়াবাসীরা আমীরে মুআবিয়াকে খলীফা মেনে নিয়ে তাঁর হাতে বায়'আত করে। ফলে তাঁর শক্তি ও প্রতিপত্তি বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। উপরন্তু তিনি মুআবিয়া ইবন খাদীজের কাছে, যিনি মুহাম্মদ ইবন আবূ বকরের সাথে যুদ্ধরত ছিলেন, চিঠিপত্র লিখে তাকে তার সংগ্রাম চালিয়ে যেতে উৎসাহ দিতে থাকেন। তখন ইবন খাদীজ মুআবিয়ার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিনিও মনে মনে তাই কামনা করছিলেন। তিনি অবিলম্বে আমর ইবন 'আসকে ছয় হাজার সৈন্য নিয়ে মিসরের দিকে প্রেরণ করেন। সেই সাথে মুহাম্মদ ইবন আবূ বকরের নামে তিনি একটি চিঠিও লিখে দেন। আমর (রা) মিসরের সন্নিকটে পৌঁছে নিজের একটি চিঠির সাথে মুআবিয়া (রা)-এর চিঠিটিও মুহাম্মদের কাছে প্রেরণ করেন। মুহাম্মদ উভয় পত্রই আলী (রা)-এর কাছে কূফায় পাঠিয়ে দেন। আলী (রা) জনসাধারণকে একত্রিত করে তাদেরকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করেন। মাত্র দু'হাজার লোক মিসর অভিযানের জন্য তৈরি হয়। অগত্যা তিনি তাদেরকেই মালিক ইবন কা'বের নেতৃত্বে মিসরের দিকে প্রেরণ করেন। ওদিকে মুহাম্মদ দু'হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী কিনানা বিশরির নেতৃত্বে আমর ইবনুল 'আসের মুকাবিলায় প্রেরণ করেছিলেন। সিরীয়দের মুকাবিলা করতে গিয়ে কিনানা নিহত হন, তার কিছু সঙ্গী মারা যায় এবং কিছু এদিক-ওদিক পলায়ন করে।

এই পরাজয়ের সংবাদ শুনে মুহাম্মদ ইবন আবূ বকর স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার সংকল্প নেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গীরা সিরীয়দের সম্পর্কে এতই ভীত হয়ে পড়ে যে, যুদ্ধের পূর্বেই তারা তার সঙ্গ

ছেড়ে চলে যায়। মুহাম্মদ তখন নিজেকে একেবারে একাকী পেয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এসে জাবালা ইবন মাসরূকের ঘরে আশ্রয় নেন। তখন সিরীয় বাহিনী এবং মুআবিয়া ইবন খাদীজের সঙ্গীরা জাবালার 'ঘর' চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে।

মুহাম্মদ জীবনের আশা থেকে নিরাশ হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন এবং শত্রুদের সাথে মুকাবিলা করতে করতে বন্দী হন। মুআবিয়া ইবন খাদীজ তাঁকে হত্যা করে এবং তাঁর লাশ একটি মৃত ঘোড়ার চামড়ার মধ্যে ঢুকিয়ে আগুনে পুড়িয়ে ফেলে। আলী (রা)-এর গোয়েন্দা আবদুর রহমান ইবন শাবাত ফাযারী সিরিয়া থেকে ফিরে এসে তাঁকে উপরোক্ত ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করে। তিনি তখনই মালিক ইবন কা'বকে ফেরত আনার জন্য লোক প্রেরণ করেন। ওদিকে মালিক ইবন কা'ব কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর পথিমধ্যে হাজ্জাজ ইবন আরাফা আনসারীর সাথে তার দেখা হয়। হাজ্জাজ মিসর থেকে আসছিলেন। তিনি মুহাম্মদের মৃত্যু এবং আমর ইবনুল 'আস কর্তৃক মিসর দখলের কথা মালিক কা'বকে বলেন। ইতিমধ্যে আলী (রা) কূফাবাসীদের একত্রিত করে একটি বক্তৃতা দেন। তিনি তাদেরকে দোষারোপ করে বলেন, তোমাদেরই অকর্মণ্যতা ও নিস্পৃহতার কারণে মিসর দেশটি আমার হাতছাড়া হয়ে গেল। কিন্তু এই বক্তৃতা শুনেও কূফাবাসীরা চুপ থাকে। আলী (রা) শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে মিসর ও সিরিয়ার চিন্তা ছেড়ে দেন। মুহাম্মদ ইবন আবূ বকর হিজরী ৩৮ সনে মিসরে নিহত হন।

অন্যান্য প্রদেশও দখলের চেষ্টা

মিসর দখলের পর আমীরে মুআবিয়ার সাহস অনেক বেড়ে যায়। এবার তিনি বসরা দখলের চেষ্টা করেন। বসরার পরিস্থিতিও ছিল মিসরেরই অনুরূপ। জামাল যুদ্ধের কারণে অনেক বসরাবাসী আলী (রা)-এর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল। তারা উসমান হত্যার প্রতিশোধ নেওয়াও জরুরী মনে করত। মুআবিয়া (রা) আবদুল্লাহ্ ইবন হাদরামীকে বসরার দিকে প্রেরণ করেন। তিনি তাকে বুঝিয়ে বলেন, যেসব লোক আলীর প্রতি অসন্তুষ্ট এবং উসমান হত্যার প্রতিশোধ নেওয়াকে জরুরী মনে করে তুমি তাদেরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট কর, তাদের মন জয়ের ব্যাপারে সর্বদা সচেষ্ট থাক এবং কূট-কৌশলের মাধ্যমে বসরা দখল করে নাও। ইবনুল হাদরামী যখন বসরায় পৌঁছে তথাকার শাসক আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস সেখানে ছিলেন না। তিনি কোন কারণে হযরত আলীর কাছে গিয়েছিলেন। এটা ছিল ইবনুল হাদরামীর জন্য একটি সুবর্ণ সুযোগ। বসরার একটি শক্তিশালী দল তার পক্ষে চলে আসে। কূফায় আলী (রা)-এর কাছে যখন এই সংবাদ গিয়ে পৌঁছে তখন তিনি আয়ান ইবন দাবীয়াকে সেখানে পাঠান এবং নির্দেশ দেন, যেভাবে পার, ইবনুল হাদরামীর চারপাশে যারা সমবেত হয়েছে, তাদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টির চেষ্টা কর। আয়ান চেষ্টায় সাফল্য লাভ করেন। ফলে ইবনুল হাদরামী হিজরী ৩৮ সনের শেষ দিকে বসরায় নিহত হয়।

হিজরী ৩৯ সনে ফারিসবাসীরা যখন দেখতে পেল যে, বসরাবাসীদের মধ্যে অনৈক্য দেখা দিয়েছে, সেখানকার কিছু লোক আলীর প্রতি সহানুভূতিশীল, আবার কিছু লোক মুআবিয়ার প্রতি সহানুভূতিশীল তখন তারা বিদ্রোহ করে তাদের গভর্নর সুহায়ল ইবন হানীফকে সেখান থেকে বের করে দেয়। আলী (রা) বসরার গভর্নর ইবন আব্বাসকে লিখলেন, যিয়াদকে

ফারিসের প্রশাসক নিয়োগ করে অবিলম্বে সেখানে পাঠিয়ে দাও। যিয়াদ ফারিস পৌঁছে তরবারির জোরে সেখানকার লোকদেরকে সঠিক পথে নিয়ে আসেন।

মুআবিয়া (রা) যখন জানতে পারেন যে, লোকেরা আলী (রা)-এর কথায় খুব একটা কান দিচ্ছে না, তার সাথে যুদ্ধে যেতে রাযী হচ্ছে না, এমন কি এখানে সেখানে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করছে তখন তিনি এই পরিস্থিতির সদ্ব্যবহারের চেষ্টা করেন। তিনি বদান্যতা, ক্ষমা, উপহার-উপঢৌকন ইত্যাদির মাধ্যমে লোকদের নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করেন। তিনি সকলের জন্য তাঁর ঔদার্য ও বদান্যতার দরজা এমনভাবে খুলে দেন যে মদীনা, তায়িফ, ইয়ামন প্রভৃতি স্থান থেকে লোকেরা দলে দলে দামিশকে এসে তার দরবারে ভিড় জমাতে থাকে। মুআবিয়া (রা) নু'মান ইবন বশীরকে আইনুত তামরের দিকে প্রেরণ করেন। সেখানকার গভর্নর মালিক ইবন কা'বের কাছে আলী (রা)-এর পক্ষ থেকে কোন সাহায্য না পৌঁছায় নু'মান সহজেই 'আইনুত তামর' দখল করে নেন। মুআবিয়া (রা) সুফিয়ান ইবন আওফকে একটি শক্তিশালী বাহিনী দিয়ে মাদায়েনের দিকে প্রেরণ করেন। সুফিয়ান আনবার, মাদায়েন প্রভৃতি অঞ্চলের ধন-সম্পদ যতটুকু সম্ভব লুটে নিয়ে দামিশক অভিমুখে রওয়ানা হয়। আলী (রা) এই সংবাদ পেয়ে তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করেন, কিন্তু তার নাগাল পাননি।

ইরাক ও ইরানেই আলী (রা)-এর খিলাফত সীমিত হয়ে পড়লো

অনুরূপভাবে আমীরে মুআবিয়া (রা) বুসর ইবন আরতাতকে হিজায ও ইয়ামনের দিকে প্রেরণ করেন। মদীনাবাসীরা আমীরে মুআবিয়ার হাতে বায়'আত করে। তারপর মক্কাবাসী ও ইয়ামনবাসীরাও মদীনাবাসীদের অনুসরণ করে। ইয়ামনের রাজধানী সানআ' থেকে হযরত আলীর সমর্থক গভর্নর উবায়দুল্লাহ্ ইবন আব্বাসকে বের করে দেওয়া হয়। মোটকথা, হিজরী ৪০ সনের প্রথম দিকেই ইয়ামন, হিজায, সিরিয়া, ফিলিস্তীন, মিসর প্রভৃতি রাজ্যে আমীরে মুআবিয়ার শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ সমস্ত অঞ্চলে না ছিল কোন বিদ্রোহ, না ছিল কোন আভ্যন্তরীণ গোলযোগের আশংকা, আর না ছিল কোনরূপ প্রশাসনিক দুর্বলতা। মক্কা-মদীনা উভয় শহরকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ অঞ্চল হিসাবে রেখে দেওয়া হয়। অর্থাৎ ঐ দুই শহরে না হযরত আলীর হুকুমত ছিল, আর না মুআবিয়ার। এ ব্যাপারে তাঁরা উভয়েই সম্মত ছিলেন। ইরাক ও ইরান ছিল আলী (রা)-এর অধিকারভুক্ত। তবে ইরাকের আরব সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে বেশ কিছু লোক এমনও ছিল যারা আলীর প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল না। অনুরূপভাবে ইরানেও ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহের ধারা অব্যাহত ছিল। ইরানের অগ্নি উপাসকরা এই সুযোগে তাদের হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন দেখছিল। কূফা ও বসরার মত দু'টি কেন্দ্রীয় শহরেও কিছু লোক এমন ছিল যারা আলী (রা)-এর পরিবর্তে বরং মুআবিয়ার প্রতিই ছিল সহানুভূতিশীল। আলী (রা) আপন বীরত্ব ও নির্ভীকতা দ্বারা অনেক কিছুই করতে চাচ্ছিলেন। তিনি চাচ্ছিলেন তাঁর খিলাফতকে ইসলামী বিশ্বের একক খিলাফতে পরিণত করতে। কিন্তু প্রধানত তাঁর সঙ্গী-সাথীরা ছিল কাপুরুষ ও অবাধ্য। ফলে তিনি আশানুরূপ কিছুই করতে পারছিলেন না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আলী (রা)-এর বাহিনীতে ছিল অনারবদের আধিক্য, অপরদিকে মুআবিয়ার বাহিনীতে ছিল আরবদের আধিক্য। হিজায ও ইয়ামনের শাসনক্ষমতা হস্তগত করার পর আমীরে মুআবিয়ার মর্যাদা ও গুরুত্ব অনেক বেড়ে যায়।

এতদ্‌সত্ত্বেও আলী (রা)-এর ব্যক্তিত্ব, বীরত্ব ও মর্যাদা এতই উঁচু ছিল যে, তাঁর সামনে মুআবিয়া (রা) নিজেকে কিছুটা দুর্বল মনে করতেন। আর এ কারণেই তিনি সব সময় আলী (রা) সম্পর্কে আতংকিতও থাকতেন।

বসরা থেকে ইবন আব্বাস (রা)-এর বিদায়

ঐ সময়ে অর্থাৎ হিজরী ৪০ সনের প্রথম দিকে আর একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা) আলী (রা)-এর উপর অসন্তুষ্ট হয়ে বসরার শাসনক্ষমতা ছেড়ে মক্কায় চলে যান। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, আবুল আসওয়াদ ইবন আব্বাস (রা)-এর উপর এই মর্মে একটি মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করেন যে, তিনি (ইবন আব্বাস) তাঁর (আবুল আসওয়াদের) অনুমতি ছাড়া বায়তুল মাল থেকে অর্থ খরচ করেছেন। তিনি বসরা থেকে বিষয়টি লিখিতভাবে আলী (রা)-কে জানান। এজন্য আলী (রা) আবুল আসওয়াদকে ধন্যবাদ জানিয়ে লিখেন, এ ধরনের তথ্যাদি পাঠানো এবং গভর্নরগণের পদস্খলন সম্পর্কে আমাকে অবহিত করা নিশ্চয়ই তোমার আন্তরিকতা ও সহমর্মিতার লক্ষণ। অপর দিকে তিনি ইবন আব্বাসকে লিখেন, আমার কাছে তোমার সম্পর্কে এই এই অভিযোগ এসেছে, তোমার কাছে এর কি উত্তর রয়েছে? ইবন আব্বাসের পত্রে আবুল আসওয়াদের কোন উল্লেখ ছিল না। তিনি উত্তরে লিখেন, আপনার কাছে যে সংবাদ পৌঁছেছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আমি যে মাল খরচ করেছি তা ছিল আমার ব্যক্তিগত। এর সাথে বায়তুল মালের কোন সম্পর্ক ছিল না। আলী (রা) এর উত্তরে লিখেন, ওটা তোমার ব্যক্তিগত সম্পদ হয়ে থাকলে আমাকে বলো, তুমি এটা কোথা থেকে এবং কিভাবে পেয়েছিলে এবং কোথায় রেখেছিলে? উত্তরে ইবন আব্বাস (রা) লিখেন, আমি এ ধরনের গভর্নরের পদ থেকে ইস্তফা দিলাম। আপনি যাকে সমীচীন মনে করেন তাকেই বসরার শাসনকর্তা করে পাঠিয়ে দিন। আমি যা খরচ করেছি তা ছিল আমার ব্যক্তিগত মাল এবং আপন ইচ্ছামত তা খরচ করার অধিকার আমার ছিল। এই পত্র লিখেই তিনি তাঁর সফরের আয়োজন করেন এবং বসরা থেকে রওয়ানা হয়ে সোজা মক্কা মুআয্‌যমায় চলে যান।

ঐ সময়ে যখন আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) বসরার শাসনক্ষমতা ছেড়ে মক্কা মুআয্‌যমায় চলে গিয়েছিলেন তখন আলী (রা)-এর ভাই আকীলও তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হয়ে আমীরে মুআবিয়ার কাছে চলে যান। মুআবিয়া (রা) সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জন্য যথাযোগ্য ভাতা নির্ধারণ করে দেন। আকীলের এভাবে তাঁর কাছে চলে যাওয়াটা আলী (রা)-কে গভীরভাবে মর্মাহত করে। তিনি মুআবিয়ার মুকাবিলা করা খুবই জরুরী মনে করেন। তিনি কূফাবাসীদেরকে সিরিয়া আক্রমণের জন্য অনুপ্রাণিত করেন। এবার কূফাবাসীদের উপর তাঁর বক্তৃতার প্রভাব এমন গভীরভাবে পড়ে যে, প্রায় ষাট হাজার কূফাবাসী তাঁর হাতে এই মর্মে বায়'আত করে যে, তাদের দেহে প্রাণ থাকা পর্যন্ত তারা তাঁকে ত্যাগ করবে না এবং শত্রুদের তারা হয় মারবে, নয়ত নিজেরাই মরবে। এই ষাট হাজারের উপর আরো সৈন্য এবং প্রয়োজনীয় যুদ্ধসামগ্রী সংগ্রহের কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। খারিজীদের সামরিক শক্তি নাহরাওয়ানেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। অতএব বাহ্যত এখন তাদের দিক থেকে আশংকার কোন কারণ ছিল না।

তিন নেতার হত্যায় খারিজীদের ভয়ংকর পরিকল্পনা

উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, নাহরাওয়ান যুদ্ধে শুধু নয়জন খারিজী প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল। তারা ছিল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। তারা প্রথমে পারস্যের বিভিন্ন এলাকায় আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও উত্তেজনা সৃষ্টির প্রয়াস পায়। কিন্তু তাতে সাফল্য লাভ করতে না পেরে তারা ইরাক ও হিজাযে এসে এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত আবদুর রহমান ইবন মুলজিম মুরাদী, বারক ইবন আবদুল্লাহ্ তামীমী ও আমর ইবন বকর তামীমী এই তিন ব্যক্তি মক্কা মুআয্যমায় একত্রিত হয় এবং আপোসে নাহরাওয়ানের নিহতদের স্মরণ করে আন্তরিক বেদনা প্রকাশ করে। এরপর তারা এ ব্যাপারে একমত হয় যে, যে সমস্ত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বর্তমানে ইসলামী বিশ্বকে উত্তপ্ত করে রেখেছে তাদেরকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে। তিন জন এ কথায় অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়। তারপর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, আবদুর রহমান ইবন মুলজিম মুরাদী মিসরী আলী (রা)-কে, বারক ইবন আবদুল্লাহ্ তামীমী মুআবিয়া (রা)-কে এবং আমর ইবন বকর তামীমী সা'দ মিসরের শাসনকর্তা আমর ইবন 'আস (রা)-কে হত্যা করবে। আর তিনটি হত্যাকাণ্ডই হবে একই দিনে ও একই সময়ে। অর্থাৎ ১৬ই রমযান শুক্রবার ঠিক ফজরের সময়। এরপর ওরা তিনজন যথাক্রমে কূফা, দামিশক ও মিসরে চলে যায়।

রমযান মাসের ঐ নির্দিষ্ট দিনে বারক ইবন আবদুল্লাহ তামীমী দামিশকের মসজিদে প্রবেশ করে। মুআবিয়া (রা) যখন ফজরের নামাযের ইমামতি করছিলেন তখন তাঁকে আঘাত করে এবং আঘাত ঠিকমত লেগেছে মনে করে সেখান থেকে দৌড়ে পালায়। কিন্তু তাকে বন্দী করা হয়। ঐ আঘাতে মুআবিয়া আহত হয়েছিলেন, কিন্তু তা তেমন মারাত্মক ছিল না। তাই কিছুদিনের মধ্যেই তিনি আরোগ্য লাভ করেন। এক বর্ণনা অনুযায়ী বারককে ঐ মুহূর্তেই এবং অপর বর্ণনা অনুযায়ী কয়েক বছর বন্দীশালায় রেখে কোন এক সময় হত্যা করা হয়। মুআবিয়া (রা) এ ঘটনার পর থেকে মসজিদে একটি সংরক্ষিত স্থান নির্মাণ করান এবং যথারীতি পাহারারও ব্যবস্থা করেন। ঐ নির্দিষ্ট দিনে ও নির্দিষ্ট সময়ে আমর ইবন বকর মিসরের মসজিদে প্রবেশ করে খারিজা ইবন আবী হাবীবাকে আমর ইবনুল 'আস মনে করে তরবারির একটিমাত্র আঘাতে হত্যা করে ফেলে। ঘটনাচক্রে ঐদিন আমর (রা) অসুস্থ থাকায় তার পরিবর্তে খারিজা নামীয় জনৈক সামরিক অফিসার মিসরের মসজিদে ফজরের নামাযের ইমামতি করছিলেন। একই দিনে ও একই সময়ে আবদুর রহমান ইবন মুলজিম মসজিদের মধ্যে হযরত আলী (রা)-এর উপর হামলা চালায়। তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন, যার ফলে মাত্র দু'দিন পর অর্থাৎ হিজরী ৪০ সনের ১৭ই রমযান তিনি ইনতিকাল করেন। এই দুঃখজনক ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, ইবন মুলজিম কূফায় এসে তার বন্ধুদের সাথে মিলিত হয়। কিন্তু কারো কাছে তার পরিকল্পনার কথা প্রকাশ করেনি। শেষ পর্যন্ত সে শাবীব ইবন শাজারাহ আশজাঈ নামীয় জনৈক বন্ধুকে নিজের গোপন উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করে তার সাহায্য কামনা করে। সে তার কাছে পরিষ্কার বলে আমরা নাহরাওয়ানের নিহতদের বদলা নিতে আলী (রা)-কে হত্যা করতে চাই। প্রথমে শাবীব তাকে তার এ সংকল্প থেকে বিরত রাখতে চাইলেও শেষ পর্যন্ত চিন্তা-ভাবনা করে তাকে সাহায্য প্রদানে সম্মত হয়। তামীম গোত্রের দশ ব্যক্তি, যারা খারিজীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং নাহরাওয়ান যুদ্ধে নিহত হয়েছিল, তাদের যেসব আত্মীয়-স্বজন কূফায় থাকত তারা আলী (রা)-এর প্রতি অসন্তুষ্ট ও বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিল।

ইবন মুলজিম ঐসব লোকদের সাথে মেলামেশা করতে প্রায়ই ওদের ঘরে যেত। সেখানেই সে কাতাম' নাম্নী এক অতি সুন্দরী নারীকে দেখতে পায়। কাতামের পিতা এবং কাতামের কাছে তার বিয়ের পয়গাম পাঠায়। তখন কাতাম বলে, তুমি যদি প্রথমে মাহর পরিশোধ করে দাও তাহলে আমি বিয়ের জন্য তৈরি আছি। তার কাছে মাহরের পরিমাণ জিজ্ঞেস করা হলে সে উত্তরে বলল, তিন হাজার দিরহাম, একটি দাসী, একটি দাস এবং আলীর কর্তিত মাথা হচ্ছে আমার মাহর। ইবন মুলজিম তো এসেই ছিল আলী (রা)-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে। অতএব সে বিনা-দ্বিধায় বলে উঠল, শুধু সর্বশেষ শর্তটিই আমি পূরণ করতে পারি। বাকি শর্তগুলো এখনই পূর্ণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

কাতাম বলল, যদি তুমি শেষ শর্তটি পূরণ করে দাও তাহলে আমি প্রথম শর্তগুলো ছেড়ে দেব। ইবন মুলজিম বলল, যদি আমি সত্যি সত্যি আলী (রা)-কে হত্যা করতে সক্ষম হই তাহলে তুমি একথা কোথাও প্রকাশ করতে পারবে না। কাতাম তা গোপন রাখার প্রতিশ্রুতি দিল এবং ইবন মুলজিমকে তার কাজে সাহায্য করার জন্য 'ওয়ারদান' নামীয় আপন এক আত্মীয়কেও নিয়োগ করল। শেষ পর্যন্ত সেই নির্দিষ্ট দিন অর্থাৎ ১৬ই রমযান শুক্রবার ঘনিয়ে এল। ইবন মুলজিম, শাবীব ইবন শাজারা এবং ওয়ারদান-এর তিন জনই পূর্ববর্তী রাতে কূফা মসজিদে এল এবং দরজার কাছে ঘাপটি মেরে বসে থাকল। হযরত আলী (রা) আপন অভ্যাস অনুযায়ী মানুষকে নামাযের জন্য আহবান জানাতে মসজিদে এসে প্রবেশ করেন। সর্বপ্রথম ওয়ারদান আগে বেড়ে তাকে আঘাত করে। কিন্তু তার তরবারি দরজার চৌকাঠে কিংবা দেওয়ালে আটকে যায় এবং আলী (রা) সামনে এগিয়ে যান। ইবন মুলজিম তড়িৎ বেগে আগে বেড়ে তাঁর কপালের উপর তরবারির আঘাত করে। আঘাতটি ছিল খুবই মারাত্মক। তিনি আহত হওয়ার পর নির্দেশ দেন, এদেরকে পাকড়াও কর। লোকেরা নামাযের জন্য মসজিদে এসে পড়েছিল। এ আদেশ শুনতেই তারা খুনীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে ওয়ারদান ও শাবীব মসজিদ থেকে বের হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ইবন মুলজিম বের হতে পারেনি। সে মসজিদের এক কোণায় লুকিয়েছিল। সেখান থেকেই তাকে বন্দী করা হয়। শাবীবকে হাদরামী নামক জনৈক ব্যক্তি ধরেছিল, কিন্তু সে তার হাত থেকে ছুটে পালায়। ওয়ারদান ঊর্ধ্বশ্বাসে তাকে ধরে ফেলে এবং সেখানেই হত্যা করে। ইবন মুলজিমকে বন্দী অবস্থায় আলী (রা)-এর সামনে হাযির করা হলে নির্দেশ দেন, যদি আমি এই আঘাতের কারণে মৃত্যুবরণ করি, তাহলে তোমরা ওকেও হত্যা করবে। আর যদি আমি সুস্থ হয়ে উঠি তাহলে আমি যা সঙ্গত মনে করি তাই করব। এরপর তিনি বনূ মুত্তালিবকে ওসীয়ত করেন। তিনি বলেন, 'আমার হত্যাকে তোমরা মুসলমানদের রক্তারক্তির ওসীলায় পরিণত করো না। স্রেফ এই একটি লোককে কিসাস স্বরূপ হত্যা করবে, যে আমার হত্যাকারী। এরপর তিনি নিজ পুত্র হাসান (রা)-কে সম্বোধন করে বলেন, হে হাসান! যদি আমি এই ক্ষতের কারণে মৃত্যুমুখে পতিত হই তাহলে তুমি তারই তরবারি দিয়ে তাকে এমনভাবে আঘাত করবে যাতে সে মারা যায়। কখনো 'মুসলা' (নিহতের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তন) করো না। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা নিষেধ করেছেন।

ইবন মুলজিমের তরবারির আঘাত আলী (রা)-এর কানের লতি পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল এবং তরবারির ধারালো প্রান্ত নেমে গিয়েছিল একেবারে মস্তিষ্ক পর্যন্ত। এই অবস্থায় তিনি

শুক্রবার দিন জীবিত থেকে ১৭ই রমযান শনিবার ইনতিকাল করেন। ওফাতের পূর্বে জুনদুব ইবন আবদুল্লাহ্ তাঁর কাছে এসে নিবেদন করেন, আপনি যদি আমাদের থেকে পৃথক হয়ে যান অর্থাৎ যদি আপনার ইনতিকাল হয়ে যায় তাহলে কি আমরা হাসান (রা)-এর হাতে বায়'আত করবো ? তিনি উত্তর দেন, আমি এ ব্যাপারে কিছুই বলব না, তোমরা যা সঙ্গত মনে করবে তাই করবে। এরপর তিনি হুসায়ন (রা)-কে ডেকে পাঠান এবং বলেন, আমি তোমাকে তাকওয়া অবলম্বন এবং দুনিয়া নিয়ে মগ্ন না থাকার জন্য ওসীয়ত করছি। কোন জিনিস অর্জিত না হলে তুমি সেজন্য আক্ষেপ করো না। সব সময় হক কথা বলো, ইয়াতীমদের দয়া করো এবং অসহায়দের সাহায্য করো। জালিমদের শত্রু এবং মজলুমদের সাহায্যকারী হয়ে থাক। কুরআনের অনুসরণ কর। এজন্য কেউ যদি তোমাকে দোষারোপ বা গালি-গালাজ করে তাহলে ভয় পেয়ো না। এরপর তিনি মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়াকে সম্বোধন করে বলেন, আমি তোমাকেও ঐ সময় কথা মেনে চলতে এবং তোমার দু'ভাইয়ের মর্যাদার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে ওসীয়ত করছি। তাদের হক তোমার উপর বেশি। তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমার কোন কথা বলা উচিত নয়। এরপর তিনি হুসায়নকে সম্বোধন করে বলেন, তোমাদেরও উচিত মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়ার সাথে সব সময় সদাচরণ করা এবং তাকে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখা। এরপর তিনি তাঁর সাধারণ ওসীয়ত লিপিবদ্ধ করাতে থাকেন। তাঁর নিঃশ্বাস ফুরিয়ে যাওয়ার সময় হয়ে গিয়েছিল এবং তখন তাঁর মুখ থেকে শুধু 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ছাড়া আর কোন শব্দ বের হচ্ছিল না।

আলী (রা)-এর কবর অজ্ঞাত

হযরত আলী (রা)-এর ইনতিকালের পর ইবন মুলজিমকে হাসান (রা)-এর সামনে উপস্থিত করা হলে তিনি তরবারির এক আঘাতেই তাকে হত্যা করেন। আলী (রা) পৌনে পাঁচ বছর খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত থেকে ৬৩ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। হাসান, হুসায়ন ও আবদুল্লাহ্ ইবন জা'ফর (রা) তাঁর গোসল দেন এবং তিন কাপড়ের কাফন পরান। কাফনের মধ্যে কোন কামীজ ছিল না। হাসান (রা) তাঁর জানাযায় নামায পড়ান। কোন কোন বর্ণনামতে কূফার মসজিদে, কোন কোন বর্ণনামতে তাঁর নিজের ঘরে, আবার কোন কোন কোন বর্ণনামতে কূফা থেকে দশ মাইল দূরে তাঁকে দাফন করা হয়। কোন কোন বর্ণনামতে, না জানি খারিজীরা তাঁর দেহ অসম্মান করে– এই ভয়ে হযরত হাসান (রা) তাঁকে মূল কবর থেকে উঠিয়ে অতি গোপনে অপর একটি কবরে দাফন করেন। অপর এক বর্ণনা মতে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পাশে দাফন করার উদ্দেশ্যে তাঁর জানাযা মদীনায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো। কিন্তু পথিমধ্যে জানাযাবাহী উটটি দৌড়ে পালায়। এরপর তাঁর কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। অপর একটি বর্ণনামতে, ঐ উটটিকে 'তাঈ নামক স্থানে পাওয়া যায়। লোকেরা সঙ্গে সঙ্গে তা ধরে ফেলে এবং তার পিঠের উপর থেকে জানাযা নামিয়ে সেখানেই দাফন করে। মোটকথা, এত বড় একজন মহান ব্যক্তির মাযার কোথায় তা আজ পর্যন্ত কেউ জানতে পারেনি। এর মূল কারণ এই যে, খারিজীদের ভয়ে তাঁকে এমন এক জায়গায় দাফন করা হয়, যার কথা সাধারণ মানুষ জানত না। সম্ভবত এর মধ্যে এক বড় হিকমত (রহস্য) এই যে, পরবর্তীকালে মানুষেরা আলী (রা)-কে 'খোদার মর্যাদায়' অধিষ্ঠিত করতেও দ্বিধা করেনি। যদি তাঁর মাযারের সঠিক সন্ধান জানা থাকত তাহলে লোকেরা সেটাকে শিরকের একটি কেন্দ্রস্থলে পরিণত করে ছাড়ত। আমরা অহরহ দেখতে

পাচ্ছি, কত মহান ব্যক্তির কবরকেই না লোকেরা 'কিবলা' ও প্রতিমা বানিয়ে রেখেছে। এটা নিশ্চিত যে, আলী (রা)-এর কবর চিহ্নিত থাকলে আজ অনেক মুসলমানের অবস্থা মক্কার মুশরিকদের মতই হত।

স্ত্রী ও পুত্র-কন্যা

হযরত আলী (রা) বিভিন্ন সময়ে মোট নয়টি বিবাহ করেন। তাঁর ঔরসে ১৪টি ছেলে ও ১৭টি মেয়ে জন্মগ্রহণ করে। তাঁর প্রথম বিবাহ হয় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কন্যা হযরত ফাতিমা (রা)-এর সাথে। ফাতিমার গর্ভে দুই ছেলে হাসান ও হুসায়ন (রা) এবং দুই মেয়ে যয়নাব ও উম্মে কুলসুম জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ওফাতের পর তিনি উম্মুল বানীন বিনত হারাম কিলাবিয়াকে বিবাহ করেন। তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন চার ছেলে—আব্বাস, জাফর, আবদুল্লাহ্ ও উসমান। তিনি তৃতীয় বিবাহ করেন লায়লা বিনত মাসঊদ ইবন খালিদকে। তাঁর গর্ভে উবায়দুল্লাহ ও আবূ বকর এই দুই ছেলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চতুর্থ বিবাহ করেন আসমা বিনত উমায়সকে। তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন মুহাম্মদ আল-আফসার এবং ইয়াহ্ইয়া এই দুই ছেলে। শেষোক্ত আট ভাই-ই ইমাম হুসায়ন (রা)-এর সাথে কারবালার যুদ্ধে শহীদ হন। আলী (রা) পঞ্চম বিবাহ করেন উমামা বিনত আবুল 'আসকে। ইনি ছিলেন যয়নাব বিনত রাসূলুল্লাহ্ (রা)-এর মেয়ে। তার গর্ভে মুহাম্মদ আল-আওসাত জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ষষ্ঠ বিবাহ করেন হাকাবা গোত্রের খাওলা বিনত জা'ফরকে। তার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন মুহাম্মদ আল-আকবর (র) যাকে মুহাম্মদ হানাফিয়াও বলা হত। তিনি সপ্তম বিবাহ করেন সাহ্বা বিনত রাবীঈ তাগলাবিয়াকে। তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন উম্মুল হাসান, রামলা, কুবরা ও উম্মে কুলসুম সুগরা। তিনি অষ্টম বিবাহ করেন উম্মে সাঈদ বিনত উরওয়া ইবন মাসঊদ সাকাফিয়াকে। তাঁর গর্ভে তিনজন কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নবম বিবাহ করেন বিনত ইমরাউল কায়স ইবন আদী কালবীকে। তাঁর গর্ভে এক কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে এবং শিশুকালেই মারা যায়। এদের ছাড়া তাঁর আরও কয়েকজন কন্যা সন্তান ছিল যাঁদের নাম জানা যায়নি। আওন ইবন আলী (রা) নামীয় তাঁর আর একজন পুত্র ছিল যাঁর জন্ম হয়েছিল আসমা বিনত উমায়সের গর্ভে। স্রেফ হাসান, হুসায়ন, মুহাম্মদ হানাফিয়া, আব্বাস ও জা'ফর (র) এই পাঁচ পুত্র থেকে তাঁর বংশ জারি আছে। অন্যদের বংশের কোন ধারাক্রম অব্যাহত থাকেনি।

একনযরে আলী (রা)-এর খিলাফতকাল

হযরত আলী (রা) ছিলেন এমনি একজন শীর্ষস্থানীয় সাহাবী যাঁর ইনতিকালের পর এমন কোন ব্যক্তি বর্তমান ছিলেন না যাঁর সম্মান ও মর্যাদা সমগ্র মুসলিম বিশ্বের কাছে স্বীকৃত ছিল এবং যিনি অত্যন্ত দুঃসাহসিকতার সাথে মানুষকে ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে পারতেন। হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা) তাঁর শাহাদাত লাভের সংবাদ শুনে বলেন, এখন আরবের লোকেরা যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। কেননা তাঁর পরে এমন আর কেউ বেঁচে নেই, যে তাদের খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখতে সক্ষম। অবশ্য একথা মনে করলে চলবে না যে, হযরত আলী (রা)-এর পর সাহাবায়ে কিরাম (রা) ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করার কাজ ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাঁরা নিশ্চয়ই তা করতেন, তবে শুধু একজন উপদেশ দাতা

ও নসীহতকারী হিসাবে। আর হযরত আলী (রা) ছিলেন ঐ সমস্ত ব্যক্তির অন্যতম যাঁরা নবী-রাসূলদের মতই মানুষকে কিছু করার আদেশ দিতেন। এমনকি ব্যক্তিগত রাজনৈতিক বিরোধ থাকা সত্ত্বেও আমীরে মুআবিয়া (রা) মাযহাবী বিষয়াদির ক্ষেত্রে আলী (রা) থেকে ফতওয়া গ্রহণ করতেন।

হযরত আলী (রা) কূটকৌশল ও প্রবঞ্চনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। তাঁর মতে হক ও সত্যকে স্বীকার করে নেওয়া সবচাইতে বেশি জরুরী। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকটাত্মীয় হওয়ার কারণে তিনি প্রথম থেকেই নিজেকে খিলাফত পদের জন্য সর্বাধিক যোগ্য মনে করতেন এবং একথা তিনি সাধারণ্যে প্রকাশও করেছিলেন। এ কারণেই বেশ কিছু দিন পর্যন্ত তিনি হযরত আবূ বকর (রা)-এর হাতে বায়'আত করেননি। কিন্তু ঐ সময়ে আবূ সুফিয়ান আবূ বকর (রা)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য তাঁকে প্ররোচিত করলে তিনি অত্যন্ত কড়া ভাষায় তাকে ধমক দেন। কেননা তিনি এ ধরনের কাজ অত্যন্ত খারাপ মনে করতেন। তারপর যখন তাঁর বুদ্ধিতে একথা আসে যে, খিলাফতের ব্যাপারে আত্মীয়তার কোন সম্বন্ধ নেই, বরং এ ব্যাপারে আরো অনেক জরুরী বিষয় বিবেচনা করতে হয় এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পর হযরত আবূ বকর (রা) ছিলেন খিলাফত পদের জন্য সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তি তখন তিনি নিজে থেকে হযরত আবূ বকর (রা)-এর কাছে গিয়ে তাঁর হাতে বায়'আত করেন। আর বায়'আত করার পর তিনিই ছিলেন আবূ বকর (রা)-এর সবচেয়ে বড় সাহায্যকারী ও সবচেয়ে বেশি অনুগত। উমর ফারূক (রা) তাঁর খিলাফতকালে আলী (রা)-এর পরামর্শকেই সবচাইতে বেশি মূল্য দিতেন এবং যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে প্রধানত তাঁর অভিমতই গ্রহণ করতেন। আলী (রা) উসমান (রা)-কেও সব সময় সুপরামর্শ দিতেন। উসমান (রা) তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী চলেন, না অন্যের পরামর্শ অনুযায়ী, সেদিকে তিনি দৃষ্টিপাত করতেন না। আবার উসমান (রা)-এর কোন কাজ তাঁর কাছে আপত্তিকর মনে হলে তিনি বিনাদ্বিধায় তাঁর প্রতিবাদ করতেন। লোকেরা যখন হযরত উসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে তখন তাঁর (আলীর) দৃষ্টিতে এ অভিযোগ যতটুকু সত্য তিনি ঠিক ততটুকু পর্যন্তই তাঁর বিরোধিতা করেন এবং তা থেকে তাঁকে বিরত রাখার চেষ্টা করেন। এ ছাড়া বাকি সবটুকুতেই তিনি হযরত উসমান (রা)-কে সমর্থন করেন। মদীনা যখন বিদ্রোহীদের আয়ত্তাধীন এবং সেখানে যখন তারা বাড়াবাড়িমূলক কার্যকলাপ শুরু করে দিয়েছে তখন তিনি নিজেকে নিরপেক্ষ ও দায়মুক্ত রূপে প্রকাশ করার জন্য কোন চালবাজির আশ্রয় নেননি বরং সেই অবস্থায়ও তিনি নিজের পবিত্র স্বভাব ও পবিত্র মানসিকতার উপর কায়েম থাকেন। উসমান (রা)-এর শাহাদত লাভের পর যখন লোকেরা তাঁর হাতে বায়'আত করতে চায় তখন তিনি যেহেতু নিজেকে খিলাফত পদের জন্য সর্বাধিক যোগ্য মনে করতেন তাই শুধু লোক দেখানোর জন্য তিনি বায়'আত গ্রহণে ইতস্তত করেননি বা তার প্রতি অনীহাও প্রকাশ করেননি। হযরত উসমান (রা)-কে খলীফা নির্বাচন কালে তাঁর (আলীর) ধারণা ছিল যে, তাঁকেই খলীফা নির্বাচন করা হবে। আর প্রকৃত ব্যাপারও ছিল এই যে, উমর ফারূক (রা)-এর পর যদি তিনি খলীফা নির্বাচিত হতেন তাহ্‌লে মুসলিম বিশ্বের সেই অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিত না যা পরবর্তী সময়ে সমগ্র মুসলিম মিল্লাতকে একেবারে ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছিল। কিন্তু সাহাবায়ে কিরামের এই সতর্কতা অবলম্বনের কারণে যে ইসলামী খিলাফতকে আত্মীয়তার সাথে কোনভাবেই সম্পর্কযুক্ত করা উচিত হবে না উসমান (রা)-কে আলীর

মুকাবিলায় প্রাধান্য দেওয়া হয়, তখন হযরত আলী (রা)-ও সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রতি লক্ষ্য করে বিনা দ্বিধায় উসমান (রা)-এর হাতে বায়'আত করেন। মোটকথা, আলী (রা)-এর যাবতীয় কাজকর্ম থেকে একথা পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, তিনি যে কথাকে ন্যায় ও সত্য মনে করতেন সে কথাকে প্রকাশ করতে মোটেই দ্বিধা করতেন না। তাঁর চেহারা ছিল তাঁর অন্তরের ছবি এবং তাঁর বাহ্যিক অবস্থা ছিল তাঁর অভ্যন্তরীণ অবস্থার দর্পণ। তিনি ছিলেন এক উলঙ্গ তরবারি। সত্যকে সত্য বলাই ছিল তাঁর প্রকৃতি। যদি তাঁর স্থলে অন্য কোন ব্যক্তি হত তাহলে সে উসমান হত্যার সময়ে অনেক কিছু থেকেই নিজেকে গুটিয়ে রাখত এবং খিলাফতের বায়'আত গ্রহণকালে অনেক ধরনের সাবধানতা অবলম্বন করত। অনুরূপভাবে খিলাফতের বায়'আত অনুষ্ঠানের পর সাধারণ গুজবসমূহের প্রভাব দূরীকরণ এবং বনূ উমাইয়াদের বিরোধিতামূলক প্রচেষ্টাসমূহ বানচাল করার উদ্দেশ্যে মুহাম্মদ ইবন আবূ বকর, মালিক আশতার প্রমুখ কয়েকজন বিদ্রোহীকে উসমান (রা)-এর হত্যার কিসাসস্বরূপ হত্যা করে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা স্বাভাবিক করে নেওয়া খুব একটা কঠিন ছিল না। কেননা এ ব্যাপারে মুসলিম বিশ্বের জনসাধারণ আলী (রা)-কে সহায়তাদানে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু এ ধরনের নিশ্চিত কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ তাঁর হস্তগত হয়নি যার ভিত্তিতে তিনি (হযরত আলী) ঐসব লোকের মৃত্যুদণ্ড দিতে পারেন। অতএব তিনি বিষয়টি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করতে থাকেন এবং ইত্যবসরে যে ফিতনার সৃষ্টি হয় তার মুকাবিলাও করেন, কিন্তু যে কাজটি তিনি করণীয় মনে করেননি তা কখনো করেননি।

যে সমস্ত লোক আলী (রা)-এর সংস্পর্শে এসেছিল তাদের বেশির ভাগই ছিল সুযোগ সন্ধানী, সুচতুর ও চালবাজ। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগ থেকে ফারূকে আযম (রা)-এর যুগ পর্যন্ত যে ইসলামী পরিবেশ বিরাজ করছিল তা পার্থিব লোভ-লালসা চরিতার্থকরণ, প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন, বংশগত রেষারেষির পুনরাবির্ভাব– বিশেষ করে একই সাথে ইরান, মিসর প্রভৃতি অঞ্চলের বিরাট সংখ্যক নও-মুসলিমের ইসলামী ভ্রাতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে কিছুটা ম্লান হয়ে পড়তে শুরু করেছিল। যদি হযরত আলী (রা) ফারূকে আযম (রা)-এর পর খলীফা হতেন তাহলে তিনি তাঁর অপরিসীম যোগ্যতা দ্বারা ফারূকী আমলের অবস্থাকেই বহাল রাখতে পারতেন। কিন্তু উসমান (রা) তা পারেন নি। তাঁর যুগে সাহাবীদের সংখ্যা অনেক কমে গিয়েছিল। প্রভাবশালী ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবীদের প্রায় সকলেই তখন পরপারে। হাতে গোনা যে কয়জন বেঁচেছিলেন তাঁরাও ছিলেন পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন। কেউ ছিলেন কূফায়, কেউ বসরায়, কেউ দামিশকে, কেউ মিসরে, কেউ ইয়ামনে, কেউ ফিলিস্তীনে, কেউ মক্কায়, আবার কেউ মদীনায়। ফারূকে আযম (রা)-এর যুগ পর্যন্ত বিরাট সংখ্যক সাহাবী মদীনায়ই থাকতেন। অল্প যে কয়েকজন প্রয়োজনবশত বাইরে যেতেন, প্রয়োজন শেষ হওয়ার সাথে সাথে তাঁরা পুনরায় মদীনায় ফিরে আসতেন। আলী (রা) তাঁর রাজধানী মদীনা থেকে কূফায় স্থানান্তরিত করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কূফাকে রাজধানী বানিয়ে যে সুযোগ-সুবিধা তিনি পাবেন ভেবেছিলেন তা পাননি। সাথে সাথে তিনি সেই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা থেকেও বঞ্চিত হন যা মদীনার সাথে সম্পৃক্ত ছিল। ইসলামী বিশ্বে হিজায প্রদেশের যে গুরুত্ব ছিল, কূফা রাজধানী হওয়ার কারণে তা হ্রাস পায়। ফলে তিনি হিজায প্রদেশ থেকে যে সাহায্য-সহযোগিতা পেতেন তা থেকেও বঞ্চিত হন।

মুনাফিক ও গোপন ষড়যন্ত্রকারীরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগেও মুসলমানদের বেশ কয়েকবার অসুবিধায় ফেলেছিলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের আসল লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। সিদ্দীকী ও ফারূকী আমলে এই দুষ্কৃতিকারীরা উল্লেখযোগ্য কোন দুষ্কর্মের সুযোগ পায়নি। উসমানী যুগে তারা পুনর্গঠিত হওয়ার সুযোগ পায়। আর আলী (রা)-এর যুগ তাদেরই সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার মধ্যে অতিবাহিত হয়। যদি তিনি আরো কিছুটা সুযোগ পেতেন এবং এত তাড়াতাড়ি তাঁর শাহাদতের দুর্ঘটনা না ঘটতো তাহলে নিশ্চিতভাবে তিনি আরো কিছুদিনের মধ্যেই সমগ্র ফিতনাবাজদের পর্যুদস্ত করে ইসলামী বিশ্বকে অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা থেকে মুক্ত করে তুলতে পারতেন। কেননা এতসব বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও তাঁর সাহস ও দৃঢ়তায় কোন ভাটা পড়েনি। যে কোন সমস্যার সমাধানে তিনি সদা প্রস্তুত থাকতেন। তাঁর মধ্যে কখনো হতাশার সৃষ্টি হত না। তিনি মানুষের প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, ভীরুতা ও কাপুরুষতা সম্বন্ধে ইতিমধ্যে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। তিনি ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কেও অবহিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন যেগুলোর প্রতিক্রিয়া ছিল তাঁর ধারণার বিপরীত। কিন্তু এটাই আল্লাহর ইচ্ছা ছিল যে, তিনি শীঘ্রই শাহাদত বরণ করবেন এবং সেই সুযোগে উমাইয়া বংশ বলতে গেলে এক রকম নির্বিবাধেই তাদের আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ লাভ করবে।

উমাইয়া গোত্র নিজেদেরকে আরবের নেতা এবং বনূ হাশিমকে তাদের প্রতিযোগী মনে করত। ইসলাম তাদের ঐ অহংকার ও ঔদ্ধত্যকে মুছে ফেলে দিয়েছিল, কিন্তু উসমান (রা)-এর খিলাফতকালে তা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। উমাইয়ারা তাদের হারানো নেতৃত্ব ফিরে পাবার জন্য পুনরায় চিন্তাভাবনা শুরু করে। তারা যে পরিকল্পনা গ্রহণ করে তার সুফল বাস্তবায়নে মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। উসমান (রা)-এর খিলাফতকালে যে সমস্ত অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল সেগুলোর সংস্কার ও সংশোধন এবং অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য আলী (রা)-কে অনেক কষ্ট ভোগ করতে হয় এবং তাঁর বেশির ভাগ সময়, এমন কি সমগ্র খিলাফতকাল এতেই ব্যয় হয়। কিন্তু পরিস্থিতি আয়ত্তে আসার পূর্বেই আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি শাহাদত বরণ করেন। যদি এমন হত যে, হযরত উসমান (রা)-এর পর ফারূকে আযম (রা) পুনরায় খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হতেন তাহলে নিশ্চিতভাবে তিনি কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সেই প্রথম অবস্থা পুনরায় ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হতেন। মূলত যা ঘটার তাই ঘটেছে এবং আল্লাহর ইচ্ছায়ই ঘটেছে।

হযরত আলী ও মুআবিয়া (রা)-এর পরস্পর সংঘর্ষ, যুবায়র, তালহা ও আলী (রা)-এর পরস্পর বিরোধ, লড়াই ইত্যাদিকে আমরা নিজেদের যুগের বিরোধ ও যুদ্ধ সংঘাতের সাথে তুলনা করে নানারূপ ধোঁকা ও প্রতারণার শিকার হয়ে পড়ি। আমরা এই মহান ব্যক্তিগণের চরিত্র আমাদের চরিত্রের পাল্লায় তুলে মাপতে চাই। এটা শুধু ভ্রান্তি নয় বরং ধৃষ্টতারই শামিল। এটা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, জামাল যুদ্ধে হযরত তালহা ও যুবায়র (রা) অত্যন্ত দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সাথে প্রতিপক্ষের মুকাবিলা করার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। কিন্তু যখন তাঁদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একটি হাদীস স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় আর তাও এমন সময়ে, যখন তাঁদের অধীনে ছিল উৎসর্গিতপ্রাণ একদল সেনাবাহিনী– তখন তাঁরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। এজন্য তাদেরকে লজ্জা দেওয়া হয়, কাপুরুষ আখ্যা দেওয়া হয় কিন্তু তাঁরা দীন ও ঈমানের উপর অন্য কোন কিছুকে প্রাধান্য দিতে মোটেই রাযী হননি। যে তালহা ও যুবায়র (রা)

যুদ্ধক্ষেত্রকে একটি ক্রীড়াক্ষেত্র মনে করতেন, অত্যন্ত প্রতিকূল পরিবেশেও যাঁরা অনবরত তরবারি চালিয়ে অতি শক্তিশালী প্রতিপক্ষকেও নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছেন, তাঁরাই একটি হাদীস শোনামাত্র সোজা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে গেলেন। অথচ আজকাল আমরা দেখি, তথাকথিত কিছু কিছু ধর্মীয় নেতা– যাদেরকে মুসলমানরা অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার চোখে দেখে, যখন– তাঁদের মধ্যে কোন মতবিরোধ দেখা দেয় তখন তাঁরা পরস্পর বিতর্ক বাহাস ও মুনাযারা করে বছরের পর বছর কাটিয়ে দেন। তারা একে অন্যকে অপমান করেন, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেন, এমন কি সুযোগমত কোর্ট-কাছারীতে একে অন্যের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন, একে অন্যকে গালি-গালাজ করেন– সর্বোপরি একে অন্যকে হেয় জ্ঞান করাকে নিজেদের কর্তব্য বলে মনে করেন। সাধারণত তাদের কেউই নিজের ভুল স্বীকার করেন না এবং প্রতিপক্ষের দাবী ন্যায্য হলেও তা মেনে নিতে চান না। এরূপ ঘটনা আমরা সচরাচর ঘটতে দেখি। সিফফীন যুদ্ধ এবং সালিশদ্বয়ের ফায়সালা ঘোষণার পর একদা মুআবিয়া (রা) আলী (রা)-এর কাছে এই মর্মে একটি ফতওয়া চেয়ে পাঠান যে, হিজড়া (একই দেহে স্ত্রী ও পুরুষ চিহ্নযুক্ত মানুষ)-এর মীরাছ সম্পর্কে শরীআতের হুকুম কি ? তিনি লিখে পাঠান, তার লিঙ্গের আকারের প্রাবল্য অনুযায়ী অর্থাৎ লিঙ্গের আকৃতিতে নারীত্বের প্রাবল্য থাকলে তাকে নারী মনে করতে হবে। আর পুরুষত্বের প্রাবল্য থাকলে পুরুষ বিবেচিত হবে, মীরাসের হুকুম জারি করা হবে। জামাল যুদ্ধের পর যখন তিনি বসরায় প্রবেশ করেন তখন কায়স ইবন উবাদা তাঁর কাছে নিবেদন করেন, লোকেরা বলে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আপনাকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তাঁর পর আপনাকেই খলীফা নির্বাচিত করা হবে– একথা কি ঠিক ? তিনি উত্তরে বলেন, একথা ভুল। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে কখনো মিথ্যা বলতে পারি না। যদি তিনি আমাকে এই প্রতিশ্রুতি দিতেন তাহলে কি আমি হযরত আবূ বকর, উমর ও উসমান (রা)-কে খলীফা বলে মানতাম এবং তাদের হাতে বায়'আত করতাম ? আজকাল কি কারো কাছ থেকে এ ধরনের নির্লোভ আচরণ আশা করা যেতে পারে ? এই কুরআন সম্পর্কেও—যার প্রারম্ভিক আয়াতে বলা হয়েছে, 'এই সেই কিতাব, এতে কোন সন্দেহ নেই'– আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

يُضِلُّ بِهِ كَثِيْرًا وَّيَهْدِىْ بِهِ كَثِيْرًا ٠

এর দ্বারা অনেককেই তিনি বিভ্রান্ত করেন, আবার বহু লোককে সৎপথে পরিচালিত করেন (২ : ২৬)।

হযরত আদম (আ)-এর সময় থেকে হক ও বাতিলের সংঘর্ষ চলে আসছে এবং তা চিরদিন অব্যাহত থাকবে। রহমানী (সৎ) ও শয়তানী (অসৎ)। এ দু' দলের অস্তিত্ব অতীতেও ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। হকপন্থী ও বাতিল পন্থীদের অস্তিত্ব থেকে বিশ্ব কখনো খালি থাকতে পারে না। আর এই হক-বাতিলের সংঘর্ষের কারণেই পুণ্যবানরা তাঁদের পুণ্যকর্মের পুরস্কার পান এবং আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনের ঈমানের মর্যাদা দিয়ে থাকেন। অতএব কুরআন যদি বহু লোকের হিদায়াত এবং কারো কারো পথভ্রষ্টতার কারণ হয়ে থাকে তবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের প্রশংসা করতে গিয়ে তাদেরকে গিয়ে তাদেরকে মধ্যপন্থী জাতিরূপে আখ্যায়িত করেছেন।

যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ·

এভাবে আমি তোমাদের এক মধ্যপন্থী জাতি রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষী হও এবং রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হয়। (২ : ১৪৩)

ইসলাম মানুষকে মধ্যপন্থা শেখায় এবং যে কোন ধরনের বাড়াবাড়ি থেকে রক্ষা করে। অনেক লোক আলী (রা) সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে পথভ্রষ্ট হয়েছে। এই পথভ্রষ্ট লোকদের মধ্যে একটি দল তাঁর বিরোধিতার উপর এত জোর দিয়েছে যে, তাদের এই বিরোধিতা শত্রুতার চাইতে হীনতার পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। তারা আল্লাহর এই প্রিয় বান্দাকে তিরস্কার করতেও দ্বিধা করেনি এবং এভাবে তারা তাদের বিভ্রান্তি ও ক্ষতির পথ প্রশস্ত করেছে। আর অপর দলটি তাঁকে ভালবাসার ক্ষেত্রে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করে তাঁকে খোদায়ী মর্যাদায় পৌঁছে দিয়েছে। তারা এক বান্দাকে আল্লাহর গুণাবলীর প্রকাশস্থল ঘোষণা করে অন্যান্য পবিত্র ও পুণ্যবান বান্দাদের তিরস্কার ও হেয় প্রতিপন্ন করা পুণ্যের কাজ মনে করেছে। এভাবে তারা তাদের পথভ্রষ্টতাকে বর্ধিত ও সম্প্রসারিত করে প্রথম দলেরই সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়েছে। এ ক্ষেত্রে আলী (রা)-এর অস্তিত্ব অনেকাংশে ঈসা (আ)-এর অস্তিত্বের সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়েছে। কেননা ইয়াহূদীরা ঈসা (আ)-এর বিরোধিতা করে যেমন পথভ্রষ্ট হয়েছে, তেমনি ঈসায়ীরা তাঁকে খোদায়ী মর্যাদায় তুলে দিয়ে পথভ্রষ্ট জাতিতে পরিণত হয়েছে। সাচ্চা মুসলমানরা যেমন ঈসা (আ)-এর ব্যাপারে সব ধরনের বাড়াবাড়ি থেকে বিরত থেকে অর্থাৎ ইয়াহূদী ও ঈসায়ীদের বাতিল আকীদা-বিশ্বাসকে পরিহার করে মধ্যপন্থার উপর কায়েম রয়েছে তেমনি তারা মধ্যপন্থার উপর কায়েম রয়েছে হযরত আলীর ব্যাপারে খারিজী ও শিয়াদের বাড়াবাড়িমূলক আকীদা-বিশ্বাস পরিহার করে। আমার এই কথাগুলো কোন ইতিহাস গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা কারো নযরে হয়ত বেমানান ঠেকতে পারে, কিন্তু যে বিষয়টি পরবর্তীকালে সমগ্র ইসলামী বিশ্বের উপর এক মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল তা নিশ্চয় ইসলামী ইতিহাসে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে এবং এতে দোষের কিছু নেই।

সাহাবায়ে কিরামকে আজকালকার মুসলমানদের সাথে তুলনা করা যেমন ভ্রান্তিকর, তেমনি তাঁদের মানবীয় দুর্বলতা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র মনে করাও এক ধরনের ভ্রান্তি। শেষ পর্যন্ত তাঁরা মানুষই ছিলেন। অন্য যে কোন মানুষের মত তাঁদেরও খাওয়া-পরার প্রয়োজন ছিল, প্রয়োজন ছিল জীবন ধারণের অন্যান্য সামগ্রীরও। সাহাবীরা তো দূরের কথা, খোদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও নিজেকে মানুষ বলে স্বীকার করতে গর্ববোধ করতেন। আমরা আমাদের প্রতিদিনকার সালাতে—

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ·

(আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল) একথা বলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে আল্লাহ্র বান্দা সে কথা নির্বিবাদে স্বীকার করি এবং তার সাক্ষ্যও প্রদান করি। আমরা একথাও মানি যে, তাঁর জীবন হচ্ছে এমন একটি পরিপূর্ণ আদর্শ জীবন, যা অনুসরণের মাধ্যমে মানব জীবনকে সার্থক করে তোলা যায়। সাহাবীরা হচ্ছেন ঐ সমস্ত ভাগ্যবান ব্যক্তি, যাঁরা কোনরূপ মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আদর্শ জীবন প্রত্যক্ষ করেছেন এবং হিদায়াত ও

সৌভাগ্য লাভ করেছেন। কিন্তু যেহেতু তাঁরা নবী ছিলেন না, নিষ্পাপ ছিলেন না, তাঁদের সবার যোগ্যতাও সমান ছিল না তাই তাঁদের মধ্যে একদিকে যেমন আমরা পাই সিদ্দীকে আকবর ও ফারূকে আযম, অন্যদিকে তেমনি পাই মুআবিয়া ও মুগীরাকেও। তাদের মধ্যে একদিকে যেমন আয়িশা ও আলী (রা)-এর ফকীহর অস্তিত্ব রয়েছে, অন্যদিকে তেমনি অস্তিত্ব রয়েছে আবূ হুরায়রা ও ইবন মাসঊদ (রা)-এর মত রাবী ও মুহাদ্দিসের। একদিকে তাঁদের মধ্যে যেমন আমর ইবনুল 'আস (রা)-এর মত রাজনীতিক ও কূটনীতিক রয়েছেন, অন্যদিকে তেমনি রয়েছেন আবদুল্লাহ্ ইবন উমর ও আবূ যর (রা)-এর মত মুত্তাকী। অতএব যোগ্যতার তারতম্যের কারণে তাঁদের কর্মকাণ্ডের মধ্যে কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তবে তা প্রকৃতপক্ষে আমাদের জন্য রহমত ও উন্নতির সোপান বিশেষ। আমাদের উচিত; তাঁদের সেই মতপার্থক্যকে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে রহমতের উপকরণে পরিণত করা। নির্বোধের মত তাড়াহুড়া করে তাঁদের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করা এবং এভাবে নিজেদের পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত করা আমাদের জন্য মোটেই উচিত নয়।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতের পর হিজরী ৩০ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ বিশ বছর ধরে মুসলমানরা একের পর এক দেশ জয় করতে থাকেন। শুধু প্রত্যেক বছরে নয়, বরং প্রত্যেক মাসেই কোন না কোন দেশ বা অঞ্চল ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হতে থাকে। এই বিশ বছরে এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের প্রায় সব কয়টি সভ্য দেশ মুসলমানদের শাসনাধীনে চলে আসে এবং ইসলামী রাষ্ট্রের নেতৃত্ব ও প্রাধান্য সমগ্র দুনিয়ার স্বীকৃতি লাভ করে। হিজরী ৩০ সাল থেকে ৪০ সাল পর্যন্ত মুসলমানরা পারস্পরিক ও আভ্যন্তরীণ বিবাদে লিপ্ত থাকে। তাই স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা এ সময়কালে কোন দেশ জয় করতে পারে নি। বাহ্যিক দৃষ্টিতে দশ বছরের এই সময়কাল মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক ও ক্ষতিকর মনে হলেও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকালে এর মধ্যেও অনেক মঙ্গলজনক দিক ধরা পড়বে। যে শক্তির মাধ্যমে ঐ বিশ বছরের মহাবিজয় অর্জিত হয়েছিল তা ছিল ঐ আধ্যাত্মিকতা ও রূহানী শিক্ষার ফলশ্রুতি, যা সাহাবায়ে কিরাম কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে অর্জন করেছিলেন। আর ঐ দশ বছর সময়কালে মুসলমানদের মধ্যে যে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সৃষ্টি হয়েছিল তা জড়বাদ এবং এই দুনিয়ার অধিবাসী হওয়ার কারণে যে কোন মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে। তবে ঐ দশ বছরের প্রতিবন্ধকতা ও আভ্যন্তরীণ বিবাদ মুসলিম বিশ্বকে সেই শক্তি ও আদর্শগত নমুনা সরবরাহ করেছিল, যেভাবে শীতকালে গাছ তার পরিবৃদ্ধির উপাদান সঞ্চয় করে এবং বসন্ত ঋতু আসার সাথে সাথে উপাদানের মাধ্যমে ফলফুল এবং পাতার জন্ম দেয়। যদি ঐ যুগে মুসলমানরা নিজেদের মধ্যকার যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ধ্বংসাত্মক কার্যাবলী প্রত্যক্ষ না করত এবং তাঁদের ইতিহাসের প্রথম দিকে পৃষ্ঠাসমূহের মধ্যে ঐ দশ বছরের দুঃখজনক পৃষ্ঠাগুলো না থাকত তাহলে পরবর্তী যুগে তাদের সোনালী যুগ অতীত হওয়ার অনেক পরে, যখন তারা কখনো এমনি সাংঘাতিক ধরনের কোন ধাক্কা খেত, তখন জ্ঞানবুদ্ধি শূন্য হয়ে এমনভাবে মাটিতে লুটিয়ে পড়ত যে, এরপর পুনরায় উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা তাদের থাকত কিনা সন্দেহ। ধাক্কা খাওয়া, আভ্যন্তরীণ মতবিরোধ সৃষ্টি হওয়া, ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ করা এবং দেশব্যাপী গৃহযুদ্ধের আগুন ছড়িয়ে পড়া—এগুলো হচ্ছে মানব সমাজের হাবীল ও কাবীল যুগের সুন্নাত বা সাধারণ নীতি। মানব জাতি যতদিন এ দুনিয়ায় বসবাস করবে ততদিন এই সমস্ত জিনিসের অস্তিত্বও এখানে

থাকবে। হক ও বাতিলের যুদ্ধ যেভাবে দুনিয়ায় জারি রয়েছে সেভাবে আধ্যাত্মিক দুর্বলতা ও বৈষয়িকতার কারণে ন্যায় ও সত্যের অনুসারীদের মধ্যে মাঝে মাঝে পরস্পর মতবিরোধ ও সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়েছে। হযরত মূসা (আ) যখন আপন ভাই হযরত হারূন (আ)-এর দাড়ি ও মাথার চুল ধরে টানাটানি করতে পারেন, যখন ইউসুফ (আ)-কে তাঁর ভাইয়েরা কুয়ার মধ্যে নিক্ষেপ করতে পারেন এবং অধুনা প্রচলিত বাইবেলের বর্ণনানুযায়ী হযরত ঈসা (আ)-এর হাওয়ারীরা (অনুসারীরা) যখন খোদা ঈসা (আ)-এর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে পারে তখন সত্যের অনুসারীদের অভ্যন্তরীণ মতবিরোধ এবং সাহাবায়ে কিরামের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ নিয়ে অহরহ হৈ চৈ করার পিছনে কোন যুক্তি থাকতে পারে না। পারস্পরিক মতবিরোধ এবং লড়াই-ঝগড়া থেকে মানব জাতি কখনো সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকতে পারেনি। তাছাড়া এই স্বাভাবিক ব্যাপারটি যদি সাহাবায়ে কিরামের যুগেও না ঘটত তাহলে কিভাবে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ কাটিয়ে উন্নতির পথ অবলম্বন করা যায় এবং কিভাবে পর্বত-প্রমাণ বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে সম্মুখে অগ্রসর হতে হয়, তা তাদের পরবর্তী বংশধররা জানতে পারত না এবং অনেক চিন্তা-গবেষণা করেও আজ ইসলামকে তার আসল রূপে আবিষ্কার করাও কারো পক্ষে সম্ভব হত না। অন্য কথায় বলতে গেলে, হযরত আলী, হযরত মুআবিয়া এবং হযরত তালহা ও যুবায়র (রা)-এর মধ্যকার মতবিরোধ ইসলামী রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য বসন্ত বা প্লেগ রোগের প্রতিষেধক টিকাস্বরূপ। ঐ টিকা প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত উপকারী প্রমাণিত হয়েছে। এটা স্মরণ করে আজো মুসলমানরা তাদের প্রত্যেকটি পতন ও ধ্বংসের পর পুনরায় সতর্ক ও সাবধান হয়ে উঠছে। বনূ উমাইয়া ও বনূ আব্বাসের পারস্পরিক বিরোধ, আব্বাসী খিলাফত আমলে নেতৃস্থানীয় কিছু ব্যক্তির বিদ্রোহ, গযনবী ও ঘুরীদের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ-বিগ্রহ, ফাতিমী ও মুওয়াহিদদের মধ্যকার সংঘর্ষ, উসমানী ও সাফাবীদের মধ্যকার সংঘাত, আফগান ও মুঘলদের মধ্যকার যুদ্ধ- মোটকথা এ ধরনের অসংখ্য অভ্যন্তরীণ ঘটনা আছে যার প্রতিটির মধ্যেই ছিল মুসলমানদের ধ্বংস ও পতনের যথেষ্ট উপাদান। যখনই ঐসব ঘটনা সংঘটিত হত তখন অমুসলিমরা সর্বসম্মতিক্রমে এই অভিমত ব্যক্ত করত যে, এরপর আর মুসলমানরা নিজেদের সামলে নিতে পারবে না এবং পুনরায় উন্নতি করার যোগ্যতাও আর ফিরে পাবে না। কিন্তু বিশ্ববাসী সব সময়ই দেখেছে যে, তারা ঐ অবস্থায়ও নিজেদের সামলে নিয়েছে এবং পুনরায় উন্নতিও করেছে। তারা ঐ অবস্থায়ও নিরাশ হওয়াকে কুফরী মনে করেছে এবং নিজেদেরকে সব সময় আশাবাদী ও সুদৃঢ় রেখেছে। তারা ইসলামের মর্যাদাকে নিজেদের সম্মানের উপর এবং ইসলামের অস্তিত্বকে নিজেদের অস্তিত্বের উপর প্রাধান্য দিয়েছে।

হালাকু বাগদাদ ধ্বংস করল। কিন্তু মুসলমানরা সঙ্গে সঙ্গে হালাকুর বংশধরদের অন্তরকে ইসলামের আলোকে আলোকিত করে নিল। ঈসায়ী বিশ্ব একতাবদ্ধ হয়ে মুসলমানদের কাছ থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস ছিনিয়ে নিল, কিন্তু সালাহুদ্দীন আইয়ূবী সমগ্র ইউরোপের সম্মিলিত শক্তিকে একেবারে পর্যুদস্ত করে ঐ পবিত্র শহর পুনরায় দখল করে নিলেন। মোটকথা, খিলাফতে রাশিদার শেষ দশ বছরে যা কিছু ঘটেছে তা নিঃসন্দেহে মুসলমানদের ভবিষ্যত জীবনকে অধিকতর দুঃসাহসী, সংযমী ও সুদৃঢ় করে তুলেছে। অতএব আলী (রা)-এর যুগের যুদ্ধ-বিগ্রহকে ইসলাম এবং ইসলামী বিশ্বের জন্য ক্ষতিকর আখ্যা দেওয়া চলে,

তবে তাঁর উপকারের দিকটি–যদিও তার ক্ষতির অনুপাতে অনুল্লেখযোগ্য, একেবারে বিস্মৃত হওয়া চলে না।

দিনের সাথে রাত, আলোর সাথে অন্ধকার, বসন্তের সাথে শীত, ফুলের সাথে কাঁটা, বাঘের সুন্দর ও আকর্ষণীয় আকার-অবয়বের মধ্যে হিংস্রতা, সাপের চিত্তাকর্ষক আকার ও চলনের মধ্যে প্রাণঘাতী বিষ এবং রত্নরাজিতে পরিপূর্ণ সমুদ্রের মধ্যে ধ্বংস ও ডুবে মরার আশংকা বিদ্যমান। যদি কুফরীর অভিশাপ দুনিয়াতে বিদ্যমান না থাকত তাহলে ঈমানের নিআমাত আমরা মোটেই উপলব্ধি করতে পারতাম না। যদি আমরা ঘাড় অন্ধকার রাতের সম্মুখীন না হতাম তাহলে চাঁদনী রাত আমাদেরকে এত আনন্দ দান করতে পারত না। মোটকথা, আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিটি সৌন্দর্যের সাথে একটি অসৌন্দর্য সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন এবং প্রতিটি মাধুর্যের সাথে রেখে দিয়েছেন একটি তিক্ততা। এই নিয়মের উপরই বিশ্ব কারখানা চলছে। ইসলামী খিলাফত দুনিয়ায় মানবজাতির জন্য একটি নি'আতামতস্বরূপ। যখন চন্দ্র ও সূর্যের চেহারাও কলংকমুক্ত নয় তখন এই নি'আমাতও যদি কখনো কখনো কালিমালিপ্ত বা পতনোন্মুখ হয়ে পড়ে তবে তাতে বিস্মিত বা আশাহত হওয়ার কোন কারণ নেই। হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফত আমলে মুনাফিক ও মুসলিম নামধারী ইসলামের একদল শত্রুর আবির্ভাব ইতিহাস অধ্যয়নকারীদের চোখে খুবই অপসন্দনীয় ঠেকে এবং তারা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী এই দল সৃষ্টির জন্য ইসলামকে দায়ী করতেও দ্বিধা করে না, কিন্তু তারা যদি গভীরভাবে লক্ষ্য করে তাহলে বুঝতে পারবে জীবনটা টিকে থাকার একটি নিত্যনৈমিত্তিক সংগ্রাম ছাড়া কিছু নয়। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম হচ্ছে যাবতীয় শয়তানী শক্তির বিরুদ্ধে রহমানী শক্তিসমূহের অহরহ সংগ্রামেরই অপর নাম। আর শয়তানী শক্তিসমূহের মধ্যে সবচাইতে বড় শক্তি হচ্ছে ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী মুনাফিকদের শক্তি। আজ পর্যন্ত ইসলামী খিলাফত যখনই এবং যেখানেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এই ষড়যন্ত্রকারী মুনাফিকদের কারণেই হয়েছে। এই মুনাফিকরা এখনো দুনিয়ায় বিদ্যমান এবং সত্য কথা বলতে গেলে, তাদেরকে পূর্বের চাইতে অধিক শক্তিশালীই দেখা যাচ্ছে। এই মুনাফিকরা হঠাৎ করে হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফত আমলে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেনি, বরং তাদের অভ্যুদয়ের সূচনা হয়েছিল ফারূকে আযম (রা)-এর খিলাফত আমলে। এরপর তারা অতি দ্রুত সংগঠিত হয়ে হযরত উসমান (রা)-এর শাহাদত থেকে হযরত আলী (রা)-এর শাহাদত লাভ পর্যন্ত সময়কালে নিজেদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করে। আজ পর্যন্ত এই ধারাই অব্যাহত রয়েছে। হযরত হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন উমর ফারূক (রা) শাহাদত লাভ করেন তখন থেকেই ইসলামের ভাগ্যসূর্য অস্তমিত হতে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : যতক্ষণ পর্যন্ত এই ব্যক্তি (উমর ফারূকের দিকে ইঙ্গিত করে) তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে ততক্ষণ বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয়ের দরজাও বন্ধ থাকবে। ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : "আসমানের প্রত্যেক ফেরেশতা উমরকে সমীহ্ করে এবং যমীনের প্রত্যেক শয়তান তাকে ভয় করে।" একদা হযরত কা'ব আহবার (রা)-কে হযরত উমর (রা) জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি বনী ইসরাঈলদের আসমানী কিতাবসমূহের কোথাও আমার উল্লেখও দেখেছ ? তিনি উত্তর দেন, হাঁ, আপনার সম্পর্কে লেখা হয়েছে আপনি একজন প্রবল প্রতাপান্বিত শাসক হবেন এবং আল্লাহর পথে কোন সমালোচনাকারীরই পরোয়া করবেন না। আপনার পরে যিনি খলীফা হবেন তাকে জালিমরা

হত্যা করবে। এরপর বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়বে। মুজাহিদ (র) বলেন, আমরা প্রায়ই বলাবলি করতাম, হযরত উমর (রা)-এর খিলাফত আমলে শয়তানরা বন্দী ছিল এবং তাঁর ইনতিকালের পর তারা শৃঙ্খলমুক্ত হয়েছে।

হযরত ইমাম হাসান (রা)

নাম, বংশ-পরিচয়, দৈহিক গঠন ইত্যাদি

হাসান ইব্ন আলী ইব্ন আবূ তালিবকে খুলাফা-ই-রাশিদীনের সর্বশেষ মনে করা হয়। তিনি হিজরী ৩ সনের মধ্যশাবানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর চেহারার সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চেহারার অনেক মিল ছিল। তাঁর নাম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ই রেখেছিলেন। জাহিলী যুগে কারো এই নাম ছিল না। ইমাম বুখারী (র) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদা মিম্বরের উপর বসা ছিলেন এবং তাঁর পাশেই বসা ছিলেন হাসান (রা)। তিনি কখনো জনতার দিকে, আবার কখনো হাসানের দিকে তাকাচ্ছিলেন এবং বলছিলেন : আমার এই পুত্র (নাতি) হচ্ছে একজন নেতা। সে মুসলমানদের দু'দলের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করবে। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাসানকে আপন কাঁধের উপর বসিয়ে রেখেছিলেন। পথিমধ্যে এক ব্যক্তির সাথে তাঁদের সাক্ষাৎ হলে সে হাসানকে সম্বোধন করে বলল, বৎস! তুমি তো একজন উত্তম সওয়ারী (বহনকারী) পেয়েছ। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, সওয়ারও (আরোহীও) যে অতি উত্তম। আবদুল্লাহ্ ইবনুয যুবায়র (রা) বলেন, আহলে বায়ত' (রাসূলের পরিবারবর্গ)-এর মধ্যে হাসানের সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চেহারার অনেক মিল ছিল এবং তিনি তাঁকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন।

অনুপম চরিত্র বৈশিষ্ট্য

ইমাম হাসান (রা) অত্যন্ত ধৈর্যশীল, গাম্ভীর্যসম্পন্ন, মহৎ ও বদান্য ব্যক্তি ছিলেন। বিশৃঙ্খলা ও রক্তপাত তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। তিনি পদব্রজে পঁচিশবার হজ্জ করেন, অথচ উট ঘোড়া তাঁর সাথে থাকত। উমায়র ইবন ইসহাক বলেন, আমার কাছে শুধু হযরত হাসান (রা)-ই এমন ব্যক্তি ছিলেন যে, তিনি কথা বলতেন আমি চাইতাম যেন তিনি অবিরত কথা বলে যান এবং তাঁর কথা যেন শেষ না হয়। আমি তাঁর মুখ থেকে কখনো কোন বিশ্রী কথা শুনিনি।

মারওয়ান যখন মদীনার গভর্নর ছিলেন এবং ইমাম হাসান (রা)-ও খিলাফত ত্যাগ করে মদীনায়ই বসবাস করতেন তখন একদা মারওয়ান তাঁর কাছে জনৈক ব্যক্তির মাধ্যমে বলে পাঠায় তুমি হচ্ছ খচ্চরতুল্য (আল্লাহ্ পানাহ্)। যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয় তোমার বাপ কে, তখন সে বলে, আমার মা ছিল একটি ঘোটকী। এর উত্তরে তিনি মারওয়ানকে বলে পাঠান, আমি একথা কখনো ভুলব না যে, তুমি আমাকে অহেতুক গালি দিচ্ছ। একদিন তোমাকে ও আমাকে আল্লাহর সামনে হাযির হতে হবে। যদি তুমি নিজের কথায় সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা এই সত্য বলার জন্য তোমাকে উত্তম প্রতিদান দেবেন। আর যদি তুমি মিথ্যাবাদী হয়ে থাক তাহলে ভালোভাবে স্মরণ রাখ, আল্লাহ্ তা'আলা সর্বাধিক প্রতিশোধ

গ্রহণকারী। জাব্বীর ইবন আসমা (রা) বলেন, হাসান (রা) ইনতিকাল করলে মারওয়ান তাঁর লাশের কাছে ক্রন্দন করতে থাকে। তখন ইমাম হুসায়ন (রা) বলেন, এখন তো তুমি কাঁদছ, কিন্তু জীবিতাবস্থায় তুমি তাঁকে সব সময়ই কষ্ট দিতে। তখন মারওয়ান বলে, তুমি তো জানই, আমি এমন এক ব্যক্তির সাথে এরূপ আচরণ করতাম যিনি ছিলেন পাহাড়ের চাইতেও অধিক ধৈর্যশীল ও উদার। আলী ইবন যায়দ বলেন, ইমাম হাসান (রা) দু'বার নিজের সমস্ত সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে দান করেন এবং তিনবার দান করেন অর্ধেক অর্ধেক। এমন কি শেষ পর্যন্ত একটি জুতা রেখে দেন, অপরটি দান করে ফেলেন।

একদা তাঁর সামনে উল্লিখিত হল যে, আবূ যর (সা) বলেন, ঐশ্বর্যের চাইতে দারিদ্র্য এবং সুস্থতার চাইতে অসুস্থতা আমার কাছে অধিক প্রিয়। তিনি (আলী), তখন বললেন, আল্লাহ্ আবূ যরের উপর কৃপা করুন, আমি তো নিজেকে পুরোপুরি আল্লাহর হাতে ছেড়ে দেই এবং কোন কিছুই আশা করি না। তিনি (আল্লাহ্) যা চান তাই করুন, এতে হস্তক্ষেপ করার কোন ক্ষমতা আমার নেই।"

তিনি যখন হিজরী ৪১ সনের রবিউল আউয়াল মাসে তাঁর খিলাফতের দায়িত্ব আমীরে মুআবিয়ার হাতে সমর্পণ করেন তখন থেকে তাঁর বন্ধুবান্ধব তাঁকে 'আরুল মুসলিমীন' বা 'মুসলমানদের লজ্জা ও অপমান' এই নামে ডাকতো। তিনি বলতেন, 'আর (লজ্জা ও অপমান) নার' (জাহান্নাম)-এর চাইতে ভালো। জনৈক ব্যক্তি তাঁকে বলল, হে মুসলমানদের অপমানকারী! তোমার উপর সালাম। তিনি উত্তরে বললেন, আমি মুসলমানদের অপমান করিনি বরং রাজত্ব লাভের জন্য তোমাদের হত্যা করাটা আমার কাছে ভালো লাগেনি। যুবায়র ইবন নুফায়ল (রা) বলেন, আমি হাসান (রা)-কে বললাম, গুজব শোনা যাচ্ছে যে, আপনি পুনরায় খিলাফতের আকাঙ্ক্ষা করেন। তিনি উত্তরে বলেন, যখন আমি আরববাসীর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিলাম, যাকে দিয়ে ইচ্ছা যে কারো বিরুদ্ধে লড়তে পারতাম, তখন আমি শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য খিলাফত ত্যাগ করেছি। এখন শুধু হিজাযবাসীকে সন্তুষ্ট করার জন্য কি করে তা গ্রহণ করতে পারি? তিনি হিজরী ৫০ সনের রবিউল আউয়াল মাসে ইনতিকাল করেন। কেউ কেউ বলে, বিষ প্রয়োগে তাঁকে হত্যা করা হয়। ইমাম হুসায়ন (রা) প্রায়ই তাঁর কাছ থেকে জানতে চাইতেন, কে তাঁকে বিষ দিয়েছে? কিন্তু তিনি কারো কথা বলেন নি বরং বলেছেন, যার উপর আমার সন্দেহ রয়েছে সে-ই যদি আমার হত্যাকারী হয় তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর শক্ত প্রতিশোধ নেবেন। অন্যথায় আমার কারণে কেন একজন মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হবে।

ইমাম হাসান (রা)-এর খিলাফতকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী

আলী (রা)-এর ওফাতের সময় তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনার পরে কি আমরা হাসানের হাতে বায়'আত করব? তিনি উত্তরে বলেছিলেন, আমি আমার অবস্থা নিয়েই মগ্ন আছি। যাকে তোমাদের পসন্দ হয় তার হাতেই বায়'আত করবে। লোকেরা তাঁর এ কথাকেই ইমাম হাসানের পক্ষে অনুমতি ধরে নিয়ে তাঁর হাতে বায়'আত করে। সর্বপ্রথম কায়স ইবন সা'দ ইবন আব্বাস বায়'আতের জন্য স্বীয় হাত ইমাম হাসানের দিকে বাড়িয়ে দেন। এরপর অন্য লোকেরাও এসে বায়'আত করতে থাকে। বায়'আত গ্রহণের সময় ইমাম হাসান (রা)

সবার কাছে অঙ্গীকার নিচ্ছিলেন, তোমরা আমার কথা অনুযায়ী চলবে। আমি যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব তোমরাও তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং আমি যার সাথে সন্ধি করব তোমরাও তার সাথে সন্ধি করবে।

এই বায়'আত গ্রহণের পরপরই কূফাবাসীরা পরস্পর কানাঘুষা করতে থাকে যে, মনে হচ্ছে তাঁর (হাসানের) যুদ্ধ করার ইচ্ছা নেই। মুআবিয়া (রা) যখন হযরত আলী (রা)-এর শাহাদতের সংবাদ জানতে পারেন তখন তিনি নিজের জন্য আমীরুল মু'মিনীন উপাধি গ্রহণ করেন। মধ্যস্থতাকারী দুই হাকিমের ফায়সালা ঘোষিত হওয়ার পর পরই সিরিয়াবাসীদের কাছ থেকে তিনি বায়'আত গ্রহণ করলেও এখন আবার নতুন ভাবে বায়'আত গ্রহণ করেন। কায়স ইবন সা'দ (রা) যখন ইমাম হাসান (রা)-এর হাতে বায়'আত করছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন, আমি আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাত অনুসরণ এবং বিধর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আপনার হাতে বায়'আত করছি। তখন ইমাম হাসান বলেছিলেন, জিহাদ, যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদি তো আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। পৃথকভাবে এগুলোর উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন নেই। এই শেষোক্ত উক্তি থেকেই কূফাবাসীরা কানাঘুষা করার সুযোগ পায়। তারা সন্দেহ করে যে, যুদ্ধের প্রতি তাঁর কোনই আকর্ষণ নেই। আমীরে মুআবিয়া নতুন ভাবে বায়'আত গ্রহণের কাজ শেষ করে ষাট হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী নিয়ে দামিশক থেকে কূফা অভিমুখে রওয়ানা হন। তিনি ইমাম হাসান (রা)-এর কাছে এই মর্মে একটি পয়গাম পাঠান, সন্ধি যুদ্ধের চেয়ে শ্রেয় এবং বর্তমান মুহূর্তে এটাই সমীচীন যে, আপনি আমাকে খলীফা স্বীকার করে নিন এবং আমার হাতে বায়'আত করুন। ইমাম হাসান (রা) যখন মুআবিয়া (রা)-এর আগমন সংবাদ পান তখন তিনিও চল্লিশ হাজার সৈন্য নিয়ে কূফা থেকে রওয়ানা হন। বিভিন্ন মনযিল অতিক্রম করে যখন তাঁর বাহিনী 'দীরে আবদুর রহমান' নামক স্থানে পৌঁছে তখন তিনি কায়স ইবন সা'দকে বার হাজার সৈন্য সম্বলিত অগ্রবর্তী বাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করে অগ্রে পাঠিয়ে দেন। হাসান (রা)-এর বাহিনী 'সাবাতে মাদয়েন' নামক স্থানে যখন পৌঁছে তখন সেখানে কেউ না কেউ এ মিথ্যা গুজব রটিয়ে দেয় যে, কায়স ইবন সা'দ (রা) নিহত হয়েছেন। হাসান (রা) সওয়ারীর পশুগুলোকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য সেখানে একদিন অবস্থান করেন। এ স্থানেই তিনি সবাইকে সমবেত করে একটি ভাষণ দেন। আল্লাহ্র প্রশংসা ও রাসূলের প্রশস্তির পর তিনি বলেন :

> লোক সকল! তোমরা আমার হাতে এই শর্তে বায়'আত করেছ যে, যুদ্ধ সন্ধি উভয় ক্ষেত্রেই তোমরা আমার অনুসরণ করবে। আমি মহান আল্লাহ্ তা'আলার শপথ করে বলছি, কারো সাথে আমার শত্রুতা বা হিংসা-বিদ্বেষ নেই। প্রাচ্য থেকে পশ্চিম পর্যন্ত অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীতে এমন একটি লোকও আমার নযরে পড়ে না যার সম্পর্কে আমার অন্তরে মনোমালিন্য বা ঘৃণার ভাব রয়েছে। একতা, ঐক্য, ভালোবাসা, নিরাপত্তা, সন্ধি ও সংস্কার-সংশোধনকে আমি সব সময়ই অনৈক্য ও শত্রুতার চাইতে শ্রেয় মনে করি।

ইমাম হাসান (রা)-এর উপর কুফরী ফতওয়া

এই বক্তৃতা শুনে খারিজী ও মুনাফিকরা সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বাহিনীতে একথা প্রচার করে দিল যে, হাসান (রা) মুআবিয়ার সাথে সন্ধি করতে চান। সেই সাথে তারা তাঁর উপর কুফরী

ফতওয়া জারি করে। এ থেকে জানা যাচ্ছে যে, মুসলমানদের উপর কুফরী ফতওয়া জারি করার রীতি মুনাফিক ও সাবাঈদেরই আবিষ্কৃত। তারাই হযরত আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে কুফরী ফতওয়া জারি করেছিলো। বিস্ময়ের ব্যাপার যে, আজ আমাদের যুগের আলিম ও ফাযিল বলে কথিত এক শ্রেণীর জুব্বাধারী মুফতী মুনাফিক ও মুসলিম নামধারী ইয়াহূদীদের ঐ অপবিত্র রীতিকে জীবিত রাখতে এবং উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার কটিবন্ধনকে কুফরী ফতওয়ার খড়্গের আঘাতে ছিন্নভিন্ন করে ফেলতে যেন সব সময় তৈরি হয়ে রয়েছে। যাহোক, ঐ কুফরী ফতওয়া ইমাম হাসানের বাহিনীতে এক মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কেউ বলতে লাগল, ইমাম হাসান (রা) কাফির হয়ে গেছেন, আবার কেউ বলতে লাগল তিনি কাফির হননি। শেষ পর্যন্ত কুফরীর ফতওয়াদানকারীদের দলই ভারী হয়ে গেল এবং তারা তাদের বিরুদ্ধবাদীদের উপর বাড়াবাড়ি শুরু করে দিল। শেষ পর্যন্ত তাদেরই একটি বিরাট দল ইমাম হাসান (রা)-কে কাফির বলতে বলতে তাঁর তাঁবুতে ঢুকে পড়ল এবং চারদিক থেকে তাঁর পরনের পোশক ধরে টানাটানি শুরু করল। ফলে তাঁর সমস্ত পোশাক ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। তাঁর কাঁধের উপর থেকেও চাদর টেনে নেওয়া হল এবং লুণ্ঠন করা হল তাঁর তাঁবুর যাবতীয় সামগ্রী। এ অবস্থা দেখে তিনি সঙ্গে সঙ্গে নিজের ঘোড়ায় আরোহণ করলেন এবং তাঁকে সাহায্য করার জন্য রাবীআ ও হামদান গোত্রকে আহ্বান জানালেন। ঐ দুই গোত্রের লোক সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আহ্বানে সাড়া দিল এবং ঐ দুষ্কৃতিকারীদেরকে তাঁর কাছ থেকে হটিয়ে দিতে সক্ষম হল। কিছুক্ষণ পর, বাহিনীর মধ্যে ইতিপূর্বে যে হৈ চৈ শুরু হয়েছিল তাও বন্ধ হল। সেখান থেকে তিনি মাদায়েন নগরীর দিকে রওয়ানা হন। জাররাহ্ ইবন কাবীসাহ্ নামীয় জনৈক খারিজী পথিমধ্যে সুযোগ বুঝে তাঁর উপর বর্শা নিক্ষেপ করে। এতে তাঁর এক রানে আঘাত লাগে। তাঁকে একটি খাটিয়ায় তুলে মাদায়েনের 'কাসরে আবয়াদে নিয়ে আসা হয় এবং সেখানেই তিনি অবস্থান করেন। আবদুল্লাহ্ ইবন হানযালা ও আবদুল্লাহ্ ইবন যুবয়ান জাররাহকে হত্যা করেন। চিকিৎসকরা 'কাসরে আবয়াদেই তাঁর ক্ষতের চিকিৎসা করেন এবং তিনি শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করেন। কায়স ইবন সা'দ যে বার হাজার সৈন্য নিয়ে অগ্রযাত্রা করেছিলেন তারা 'আনবার' নামক স্থানে পৌঁছলে মুআবিয়া এসে তাদের ঘেরাও করে ফেলেন এবং আবদুল্লাহ্ ইবন আমরকে আপোস-চুক্তির ব্যাপারে প্রাথমিক আলাপ-আলোচনার জন্য একটি বাহিনীসহ মাদায়েনে প্রেরণ করেন। অপর দিকে মাদায়েন পৌঁছার পর নিজ বাহিনীর অসদাচরণের প্রেক্ষিতে ইমাম হাসান নিজ থেকেই আপোস চুক্তি সম্পাদনের সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন এবং দূত হিসাবে আমীরে মুআবিয়ারই এক ভাগ্নে আবদুল্লাহ ইবন হারিছ ইবন নাওফালকে সন্ধিচুক্তির একটি আবেদনসহ ইতিপূর্বেই আমীরে মুআবিয়ার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

আবদুল্লাহ্ ইবন আমের মাদায়েনের নিকট এসে পৌঁছেছেন শুনে তাঁর মুকাবিলার জন্য ইমাম হাসান (রা) তাঁর বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন। আবদুল্লাহ্ ইবন আমের এই পরিস্থিতি লক্ষ্য করে ইরাকী বাহিনীর একেবারে নিকটবর্তী হয়ে তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, আমি যুদ্ধ করার জন্য আসিনি। আমি হচ্ছি আমীরে মুআবিয়ার অগ্রবর্তী বাহিনীর অধিনায়ক। তিনি (মুআবিয়া) তাঁর মূল বাহিনী নিয়ে আনবারে অবস্থান করছেন। তোমরা হাসান (রা)-এর কাছে আমার সালাম পৌঁছিয়ে দাও এবং বলো, আবদুল্লাহ্ আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছে যে, যুদ্ধের হাত রুখে রাখ, যাতে মুসলমানরা ধ্বংস থেকে রক্ষা পায়। যখন ইমাম

হাসান (রা) এই কথা শুনলেন তখন তিনি মাদায়েনে ফিরে এলেন এবং আবদুল্লাহ্ কাছে এই মর্মে পয়গাম পাঠালেন: আমি আমীরে মুআবিয়ার সাথে সন্ধি করতে এবং খিলাফত ছেড়ে দিতে রাযী আছি, আর এই শর্তে যে, আমীরে মুআবিয়া কিতাব ও সুন্নাহর উপর কায়েম থাকবেন, পূর্ববর্তী সব মতবিরোধ ভুলে যাবেন এবং কারো জানমালের ক্ষতি করবেন না। তিনি এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দেবেন যে, তিনি আমার পক্ষের লোকদের প্রাণের নিরাপত্তাও প্রদান করবেন? সন্ধি নিশ্চিতভাবেই ভালো। আবদুল্লাহ্ ইবন আমের এই সংবাদ নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমীরে মুআবিয়ার কাছে ফিরে যান এবং বলেন, ইমাম হাসান (রা) কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে খিলাফত ছেড়ে দিতে প্রস্তুত রয়েছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, শর্তগুলো কি ? আবদুল্লাহ্ বললেন, প্রথম শর্ত এই যে, যখন আপনি ইনতিকাল করবেন তখন হযরত হাসান (রা) খিলাফতের অধিকারী হবেন। দ্বিতীয় শর্ত এই যে, যতদিন আপনি জীবিত থাকবেন ততদিন প্রতিবছর পাঁচ লক্ষ দিরহাম করে ইমাম হাসান (রা)-কে বায়তুল মাল থেকে প্রদান করবেন। তৃতীয় শর্ত এই যে, আহওয়ায ও ফারিস এলাকার খারাজ ব্যক্তিগতভাবে ইমাম হাসান (রা) পেতে থাকবেন।

আবদুল্লাহ্ স্বয়ং ইমাম হাসান (রা)-এর পক্ষ থেকে এই তিনটি শর্ত পেশ করার পর সেই শর্তগুলোও মুআবিয়া (রা)-কে শুনিয়ে দেন, যা তিনি ব্যক্তিগতভাবে তাকে বলেছিলেন। মুআবিয়া (রা) বলেন, এই সমস্ত শর্ত আমি মঞ্জুর করব। কেননা আমি বুঝতে পারছি যে, তাঁর নিয়্যত পবিত্র এবং তিনি মুসলমানদের মধ্যে আপোস-মীমাংসার পক্ষপাতী। এরপর মুআবিয়া (রা) একটি সাদা কাগজে স্বাক্ষর দিয়ে এবং তাঁর উপর নিজের মোহর লাগিয়ে আবদুল্লাহ ইবন আমেরের কাছে তা হস্তান্তর করে বলেন, এই কাগজ হাসানের কাছে নিয়ে যাও এবং তাঁকে বল, "আপনি যে যে শর্ত চান এই কাগজের উপর লিপিবদ্ধ করুন, আমীর মুআবিয়া (রা) আপনার সব শর্তই পূরণ করতে প্রস্তুত আছেন।" ইমাম হুসায়ন ও আবদুল্লাহ্ ইবন জা'ফর (রা) যখন জানতে পারলেন যে, হাসান (রা) সন্ধি স্থাপনের সংকল্প নিয়েছেন তখন তাঁরা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে ঐ সংকল্প থেকে তাঁকে বিরত রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু হাসান (রা) তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করেননি। কেননা তিনি আলী (রা)-এর যুগ থেকে কূফাবাসী ও ইরাকবাসীদের অস্থিরচিত্ততা প্রত্যক্ষ করে আসছিলেন। তাছাড়া মুআবিয়া (রা)-এর রাষ্ট্র পরিচালনার দক্ষতা ও প্রখর প্রতিভার দিকটিও তাঁর সামনে ছিল। অতএব তিনি সন্ধি স্থাপনেই সুদৃঢ় থাকেন।

সন্ধিপত্র

আবদুল্লাহ্ ইবন আমের মুআবিয়া (রা)-এর সীলমোহর লাগানো ও স্বাক্ষরযুক্ত কাগজটি নিয়ে এলেন এবং এতে যে কোন শর্ত লিপিবদ্ধ করার কথা বললেন, তখন ইমাম হাসান (রা) বলেন, আমি কখনো এই শর্ত পসন্দ করি না যে, আমীরে মুআবিয়ার পর আমাকে খলীফা মনোনীত করা হোক। কেননা আমি যদি খিলাফতের একান্ত প্রত্যাশীই হতাম তাহলে এখন তা ছেড়ে দিতাম না। এরপর তিনি কাতিবকে ডেকে সন্ধিপত্র লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দেন। সন্ধিপত্রের ভাষা ছিল নিম্নরূপ :

এই সন্ধিপত্রটি হাসান ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব এবং মুআবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ানের মধ্যে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। তাঁরা উভয়ে নিম্নলিখিত বিষয়ে একমত হয়েছেন। খিলাফতের

দায়িত্ব মুআবিয়া ইবন আবূ সুফিয়ানের হাতে সোপর্দ করা গেল। তাঁর পরে মুসলমানরা সময়ের দাবি অনুযায়ী যাকে ইচ্ছা খলীফা নির্বাচন করবে। মুআবিয়ার হাত ও জিহবা (কথা) থেকে সব মুসলমান নিরাপদ থাকবে। তিনি সকলের সাথে ভালো ব্যবহার করবেন। আলী (রা)-এর সাথে সম্পর্কিত এবং তাঁর পক্ষাবলম্বনকারী অনুরূপভাবে হাসান, হুসায়ন এবং তাঁদের সম্পর্কিতদেরকে আমীরে মুআবিয়া কোনভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবেন না। ইমাম হাসান ও হুসায়ন (রা) এবং তাঁদের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিরা যে শহরে বা যে বসতিতে ইচ্ছা বসবাস করতে পারে। মুআবিয়া, তাঁর কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের এই অধিকার থাকবে না যে, তারা ওদেরকে নিজেদের অধীনস্থ মনে করে নিজেদের কোন ব্যক্তিগত নির্দেশ পালনে বাধ্য করবেন। মুআবিয়া (রা) সব সময় আসওয়ায প্রদেশ থেকে আদায়কৃত খারাজ হাসান (রা)-কে প্রদান করতে থাকবেন। কূফার বায়তুলমালে বর্তমানে যে পরিমাণ অর্থ মজুদ আছে, হাসান (রা)-কে তার মালিক বলে স্বীকার করে নেওয়া হবে। তিনি এই অর্থ যেভাবে ইচ্ছা খরচ করতে পারবেন। উপহার-উপঢৌকন প্রদানের ব্যাপারে আমীরে মুআবিয়া (রা) বনূ হাশিমকে অন্যদের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করবেন।

এই চুক্তিপত্রের উপর সাক্ষী ও যামিন হিসাবে আবদুল্লাহ ইবন হারিছ ইব্ন নাওফাল, উমর ইব্ন আবী সালামা প্রমুখ কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তির স্বাক্ষর নেওয়া হয়। এই চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয়ে আনবারে মুআবিয়া (রা)-এর কাছে গিয়ে পৌঁছলে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। তিনি সেখান থেকে অবরোধ উঠিয়ে নেন এবং কায়স ইব্ন সা'দ (রা)-কে মুক্ত করে দিয়ে কূফা অভিমুখে রওয়ানা হন। কায়স (রা)-ঐ দিন সন্ধ্যায় আপন সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে কূফায় গিয়ে পৌঁছেন। মুআবিয়া (রা) কূফার জামে মসজিদে পৌঁছে ইমাম হাসান (রা) ও কূফাবাসীদের কাছ থেকে বায়'আত নেন। কায়স ইব্ন সা'দ বায়'আত করতে স্বীকৃত হননি এবং মসজিদেও আসেন নি। মুআবিয়া (রা) তাঁর কাছেও আপন স্বাক্ষর ও মোহর সংযুক্ত একটি সাদা কাগজ পাঠিয়ে দিয়ে বলেন, তোমার যে শর্ত ইচ্ছা, এর উপর লিখে দাও, আমি তা মেনে নেব। তখন কায়স ইব্ন সা'দ তাঁর কাছে নিজের ও নিজের সঙ্গীদের প্রাণের নিরাপত্তা চান। তিনি কোন ধনসম্পদ তাঁর কাছে চাননি। মুআবিয়া (রা) সঙ্গে সঙ্গে তাঁর এই শর্তগুলো মেনে নেন। এরপর কায়স ও তাঁর সঙ্গীরা মুআবিয়া (রা)-এর হাতে বায়'আত করেন।

ইমাম হুসায়ন (রা)-ও বায়'আত করতে অস্বীকার করেন। এজন্য মুআবিয়া (রা)-এর পক্ষ থেকে চাপ সৃষ্টি করা হলে হাসান (রা) তাকে বলেন, আপনি ওর উপর চাপ দিবেন না। কেননা আপনার হাতে বায়'আত করার চাইতে তাঁর কাছে তাঁর আত্মমর্যাদাবোধ অধিক প্রিয়। একথা শুনে মুআবিয়া (রা) নীরব হয়ে যান। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ইমাম হুসায়ন (রা)-ও আমীর মুআবিয়ার হাতে বায়'আত করেন। ঐ সফরে আমীর মুআবিয়ার সাথে আমর ইবনুল 'আস (রা)-ও ছিলেন। তিনি আমীরে মুআবিয়াকে বলেন, "এখন আপনি হাসান (রা)-কে বলুন যেন তিনি জনতার সামনে একটি ভাষণ দেন। মুআবিয়া (রা) তাঁর এই পরামর্শ পসন্দ করেন। হাসান (রা) জনতার সামনে নিম্নোক্ত ভাষণ দেন :

মুসলমানগণ ! আমি বিশৃঙ্খলা খুবই অপসন্দ করি। আমি আমার মাতামহের উম্মত থেকে ফিতনা-ফাসাদ দূরীকরণ এবং মুসলমানদের জান-মালের নিরাপত্তার জন্য আমীরে মুআবিয়ার সাথে সন্ধি করেছি এবং তাঁকে আমীর ও খলীফা বলে স্বীকার করে নিয়েছি। যদি খিলাফত ও রাষ্ট্র পরিচালনা তাঁর অধিকার হয়ে থাকে তাহলে তা তাঁর হাতে পৌঁছে গেছে। আর যদি আমার অধিকার হয়ে থাকে তাহলে আমি তা তাঁকে দান করলাম।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ভবিষ্যদ্বাণী

এরপর একের পর এক চুক্তির সবগুলো ধাপ অতিক্রান্ত হয় এবং ইমাম হাসান (রা) সম্পর্কিত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সেই ভবিষ্যদ্বাণীও পূর্ণ হয় যাতে তিনি বলেছিলেন : "আর এ পুত্র (নাতি) হচ্ছে একজন নেতা। আল্লাহ তা'আলা তার মাধ্যমে মুসলমানদের দু'টি দলের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করাবেন। ইমাম হাসান (রা) তাঁর ভাষণ শেষে যখন মিম্বর থেকে নামেন তখন আমীরে মুআবিয়া অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তাঁকে সম্বোধন করে বলেন :

"আবূ মুহাম্মদ ! আপনি আজ এমন বাহাদুরী ও বীরত্ব দেখিয়েছেন যা আজ পর্যন্ত কেউ দেখাতে পারে নি।

হযরত আলী (রা)-এর শাহাদতের ছয় মাস পর হিজরী ৪১ সনে এই সন্ধি সম্পাদিত হয়। তাই হিজরী ৪১ সনকে 'আমূল জামাআত' বা 'সম্মিলনী বছর' বলা হয়।

চুক্তি সম্পাদনের পর মুআবিয়া (রা) কূফা থেকে দামিশকের দিকে যাত্রা করেন। এরপর যতদিন পর্যন্ত হাসান (রা) জীবিত ছিলেন, মুআবিয়া তাঁর সাথে অত্যন্ত সৌজন্যমূলক ব্যবহার করেন এবং চুক্তির শর্তানুযায়ী তাঁর কাছে সর্বদা অর্থ প্রেরণ করতে থাকেন। মুআবিয়া (রা) কূফা থেকে চলে যাবার পর কূফাবাসীরা আপোসে বলাবলি করতে শুরু করল যে, আহওয়ায প্রদেশের খারাজ হচ্ছে আমাদেরই প্রাপ্য মালে গনীমত। আমরা এ থেকে হাসান (রা)-কে কিছুই নিতে দেব না। একথা শুনে তিনি কূফাবাসীদের একত্রিত করেন এবং তাদেরকে সম্বোধন করে নিম্নোক্ত ভাষণ দেন।

হে ইরাকবাসী ! আমি বার বার তোমাদের ক্ষমা করেছি। তোমরা আমার পিতাকে শহীদ করেছ, আমার সহায়-সম্পদ লুট করেছ এবং আমাকে বর্শা মেরে আহত করেছ। তোমরা দুই শ্রেণীর নিহত ব্যক্তির কথা স্মরণ রেখেছো, প্রথমত যারা সিফ্ফীন যুদ্ধে নিহত হয়েছে এবং দ্বিতীয়ত যারা নাহরাওয়ানে নিহত হয়েছে। এখন তোমরা আমার কাছে ঐ নিহতদের বদলা দাবী করছ। আমীরে মুআবিয়া তোমাদের সাথে যে কাজটি (চুক্তি) করেছেন তাতে তোমাদের কোন সম্মান নিহিত নেই এবং ন্যায়বিচারও তাই। অতএব তোমরা যদি মৃত্যুর জন্য রাযী থাক আমি ঐ চুক্তি ভঙ্গ করে ফেলব এবং তীক্ষ্ণধার তরবারির মাধ্যমেই এর একটা ফায়সালা তলব করব। আর যদি তোমরা তোমাদের জীবনকে ভালবাস তাহলে অতঃপর আমি এই চুক্তির উপর কায়েম থাকব।

এই ভাষণ শোনার সাথে সাথে চতুর্দিক থেকে আওয়াজ উঠল, আপনি চুক্তির উপর কায়েম থাকুন, চুক্তির উপর কায়েম থাকুন। আসল কথা হল, ইমাম হাসান (রা) কূফাবাসীদের ভীরুতা ও নির্বুদ্ধিতা সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন। তাই তিনি তাদেরকে হুমকি দিয়েই সরল পথে নিয়ে আসতে চাচ্ছিলেন এবং এটাকে সমীচীন মনে করেছিলেন। যাহোক, এখন থেকে আমীরে

মুআবিয়া সর্বসম্মতিক্রমেই খিলাফতের পদে অধিষ্ঠিত হন। হযরত সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রা) যিনি রাষ্ট্রীয় কাজকর্মের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে শুধু উট বকরী চরাতেন এবং নির্জনে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকতেন--তিনিও মুআবিয়া (রা)-এর হাতে বায়'আত করেন। মোটকথা, এমন কোন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি আর অবশিষ্ট ছিলেন না, যিনি সঙ্গে সঙ্গে অথবা কিছুদিন ভাবনা-চিন্তার পর আমীরে মুআবিয়াকে খলীফা স্বীকার করে তাঁর হাতে বায়'আত করেন নি। চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর ইমাম হাসান (রা) কিছুদিন কূফায় অবস্থান করেন। এরপর কূফা পরিত্যাগ করে নিজের সঙ্গী-সাথী ও ভক্ত-অনুরক্তসহ মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হন। কূফাবাসীরা কিছুদূর পর্যন্ত তাঁকে এগিয়ে দেয়। মদীনা আসার পর তিনি আর কখনো অন্য কোথাও বসবাস করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন নি।

বিষ প্রয়োগের কল্পকাহিনী

হিজরী ৫০ অথবা ৫১ সনে ইমাম হাসান (রা) ইনতিকাল করেন। সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে যে, তাঁকে তাঁর স্ত্রী জা'দা বিনতুল আশআছ বিষ প্রয়োগ করেছিলেন। কিন্তু যেখানে স্বয়ং হাসান ও হুসায়ন (রা)-ও নিশ্চিতভাবে জানতে পারেন নি, কে এবং কেন তাঁকে বিষ পান করিয়েছে সেখানে শত শত বছর পর কাউকে এজন্য নিশ্চিতভাবে অভিযুক্ত করার কোন যুক্তি থাকতে পারে না।

মৃত্যুশয্যায় ইমাম হাসান (রা) ইমাম হুসায়ন (রা)-কে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পর হযরত আলী (রা) পর্যন্ত খিলাফত এসে পৌঁছেছে, খাপ থেকে তরবারি বের হয়ে পড়েছে এবং এভাবে ব্যাপারটি চূড়ান্ত রূপ ধারণ করেছে। এখন আমি ভালো করেই জানি যে, নবুওয়াত ও খিলাফত আমাদের বংশে একত্রিত হতে পারবে না। আমার এ আশংকাও রয়েছে যে, কূফার নির্বোধরা তোমাকে এখান থেকে বের করার চেষ্টা করবে। তুমি তাদের ধোঁকায় পড়ো না। আমি হযরত আয়িশা সিদ্দিকা (রা)-কে বলছিলাম যেন তিনি আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পাশে সমাধিস্থ হওয়ার অনুমতি দেন। তখন তো তিনি রাযী হয়েছিলেন। এখন লোকেরা বলছে, তুমি যখন তাঁকে এ সম্পর্কে বলবে তখন তিনি রাযী হবেন না। কিন্তু আমার পরে তুমি অবশ্যই তাঁকে এ সম্পর্কে বলবে। যদি তিনি অনুমতি না দেন তবে তুমি এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করবে না। ইমাম হাসান (রা)-এর ইনতিকালের পর ইমাম হুসায়ন (রা) আয়িশা (রা)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি এতে সম্পূর্ণ রাযী আছি। কিন্তু তিনি রাযী হয়েছেন জানতে পেরে মারওয়ান এ ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেন। হুসায়ন (রা) ও তাঁর সঙ্গীরা অস্ত্রসজ্জিত হয়ে মারওয়ানকে শায়েস্তা করার জন্য রওয়ানা হন। কিন্তু আবূ হুরায়রা (রা) হুসায়ন (রা)-কে অনেক বুঝিয়ে রক্তপাতের সংকল্প থেকে বিরত রাখেন। শেষ পর্যন্ত ইমাম হাসান (রা)-কে তাঁর মহিয়সী মাতা হযরত ফাতিমা (রা)-এর পাশে দাফন করা হয়। হাসান (রা)-এর নয় পুত্র ও ছয় কন্যাসহ সর্বমোট পনর জন সন্তান ছিল।

এক নজরে ইমাম হাসান (রা)-এর খিলাফত

কোন কোন ঐতিহাসিক হযরত ইমাম হাসান (রা)-এর ছয় মাসের খিলাফতকে খিলাফতে রাশিদার অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। কেননা এই খিলাফত ছিল স্বল্পকালীন এবং অসম্পূর্ণ। প্রকৃত পক্ষে এটাকে স্বল্পকালীন বলা হলেও অসম্পূর্ণ বলা ঠিক হবে না। অন্যথায় অসম্পূর্ণ আখ্যা দিয়ে হযরত আলী (রা)-এর খিলাফতকেও খিলাফতে রাশিদার আওতা-বহির্ভূত হবে। আর

এটা মোটেই বৈধ হবে না। তাছাড়া কোন খিলাফত স্বল্পকালীন হলে তাকে যে খিলাফত বলা যাবে না, এটাও কোন যুক্তিসঙ্গত কথা নয়। ইমাম হাসান (রা)-এর খিলাফত সম্পর্কে ধৈর্য সহকারে চিন্তা করলে দেখা যাবে, এটা খিলাফতে রাশিদারই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটা সত্যি যে, তাঁর খিলাফত দেশ জয় তথা যুদ্ধ-বিগ্রহের হাঙ্গামা থেকে মুক্ত ছিল। তবে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে রক্তপাত ছাড়াই ইসলাম ও ইসলামী বিশ্বের সেই উপকার করেছেন যা অনেক বছরের খিলাফত এবং শত শত যুদ্ধ-বিগ্রহের মাধ্যমেও কারো পক্ষে করা সম্ভব হত না। ইসলামী খিলাফত পরিচালনার দিক দিয়ে তিনি নিঃসন্দেহে খুলাফায়ে রাশিদীনের সাথে স্থান পাবার যোগ্যতা রাখেন। কেননা তিনি দশ বছরের যুদ্ধকে, যা বন্ধ হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না, নিমিষের মধ্যে বন্ধ করে দেন। তিনি মুনাফিক ও মুসলিম নামধারী ইয়াহূদীদের নানা ধরনের ষড়যন্ত্রকে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বানচাল করে দেন, যা দশ বছর যাবত অনবরত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে এক ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছিল। ফলে দুষ্কৃতিকারীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। গত দশ বছর যাবত যে বিজয় অভিযান বন্ধ ছিল তিনি পুনরায় তা পরিচালনার সুযোগ করে দেন। তিনি সেই মুশরিকদের নিরাশ করে দেন, যারা দশ বছর যাবত মুসলমানদের গৃহযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করে তাদের পতন সম্পর্কে আশান্বিত হয়ে উঠেছিল। তিনি পুনরায় ইসলামের শত্রুদের মুসলিম যোদ্ধাদের সেই সব অস্ত্রের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেন, যা এতদিন পর্যন্ত শুধু মুসলমানদেরই রক্ত পান করেছিল। খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)-এর পর তাঁর চাইতেও তিনি অধিক বীরত্ব প্রদর্শন করেন যখন তিনি কূফায় আমীরে মুআবিয়া (রা)-এর হাতে বায়'আত করে বলেছিল "যদি খিলাফত ও রাষ্ট্র পরিচালনার উপর আমীরে মুআবিয়ার অধিকার থেকে থাকে তাহলে তিনি তা পেয়ে গেছেন। আর যদি আমার অধিকার থেকে থাকে তাহলে আমি তা তাঁর জন্য ছেড়ে দিলাম।"

আমীরে মুআবিয়ার সাথে সন্ধি স্থাপনের মাধ্যমে তিনি মুসলমানদের সামনে যে অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন তা কিয়ামত পর্যন্ত তাদের পথপ্রদর্শনের ক্ষেত্রে সমুদ্রের বাতিঘরের মতো কাজ করবে। ইমাম হাসান (রা)-এর কাছে চল্লিশ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী ছিল। এই বাহিনীর লোকেরা যতই বোকা, অস্থিরচিত্ত বা অশিষ্টই হোক, একথা তো সত্যি যে, তারা মুআবিয়া (রা) ও সিরীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের শপথ গ্রহণ করেছিল। এমতাবস্থায় স্বনামধন্য বীরশ্রেষ্ঠ পিতার সন্তান ৩৭ বছরের একজন বীর যুবকের পক্ষে তাঁর প্রতিপক্ষ তথা আমীরে মুআবিয়াকে এক হাত না দেখিয়ে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকা কখনো সম্ভব হত না। হাসান (রা) একথাও জানতেন যে, সমগ্র ইসলামী বিশ্ব জানে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে কত বেশী ভালোবাসতেন। আলী (রা)-এর চাইতেও তাঁর এ সুযোগ বেশী ছিল যে, তিনি সাহাবায়ে কিরাম এবং মুসলিম বিশ্বের সমগ্র মুসলমানের সহানুভূতি ও ভালোবাসা অতি অল্প সময়ে এবং অতি সহজে লাভ করতে পারতেন। তিনি সৈন্য পরিচালনা ও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট যোগ্যতা রাখতেন। দুঃসাহস ও সংকল্পের দৃঢ়তাও তাঁর মধ্যে ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার অগণিত রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এজন্য যে, তিনি ইসলামের সেবার সেই শ্রেষ্ঠতম নমুনা উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য স্থাপন করে গেছেন, যা শুধু সর্বগুণের অধিকারী রাহমাতুল লিল আলামীনের একজন মহান নাতির পক্ষেই সম্ভব ছিল।

মোটকথা, ইমাম হাসান (রা) মুসলিম মিল্লাতের পরস্পর বিচ্ছিন্ন দু'টি দলকে একত্রিত করে সেই বিরাট কাজ আনজাম দিয়েছেন যা ছিল বিশ্বের পরস্পর বিচ্ছিন্ন দু'টি ভূখণ্ডকে একত্রে

জুড়ে দেওয়া কিংবা বিদীর্ণ আসমানের দু'টি খণ্ডকে একত্রে মিলিয়ে দেওয়ার চাইতেও কঠিন। তিনি তাঁর খিলাফত আমলে কোন যুদ্ধ বা রক্তপাত করেন নি। তবে তিনি বিশ্বের সমস্ত বীর সেনানায়ক ও দিগ্বিজয়ীদের মাথার মুকুটে পরিণত হয়েছেন। তিনি মুআবিয়া (রা)-এর সাথে আপোস চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন তাতে মুসলমানদের পক্ষে রোম সাগর এবং রোম সাগরের মধ্যবর্তী দ্বীপসমূহ জয় করাও সম্ভব হয়েছিল। তারা পদানত করতে পেরেছিল ত্রিপলী, মরক্কো, স্পেন, সিন্ধু, আফগানিস্তান, তুর্কিস্তান প্রভৃতি দেশ। ইমাম হাসান (রা) ইসলামী বিশ্বে এক নব জীবনের সূচনা করেছিলেন। তিনি তাঁর অতুলনীয় আভিজাত্যের নমুনা পেশ করে ইসলামী বিশ্বে পুনরায় স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে এনেছিলেন। মুসলমানদের প্রতিটি সাফল্য, বিজয় ও উন্নতি তাঁর আত্মার উপর রহমতের বারি বর্ষণ করবে। হে ফাতিমাতুয যাহরা (রা)-এর আদরের দুলাল, আবূ তালিবের বংশের চন্দ্র, মুসলিম উম্মাহর আলোকবর্তিকা, আমার অন্তর তোমার প্রেমে প্লাবিত, আমার দিল তোমার মর্যাদা ও মাহাত্ম্যে পরিপূর্ণ। আমার দেহের প্রতিটি লোমকূপে, প্রতিটি রক্তকণায় তোমার প্রশংসার সুর ধ্বনিত। তোমার বীরত্ব হিমালয়ের চেয়ে উন্নত। তোমার পৌরুষ মহাসাগরের চেয়ে উদার। হে সুমহান বীর জান্নাতবাসীদের নেতা ! আমার পক্ষ থেকে সালাম গ্রহণ কর এবং কিয়ামতের কঠিন দিনে আমাকে ভুলে যেও না। ওয়াস্‌সালাম।

খিলাফতে রাশিদা সম্পর্কে কিছু কথা

খিলাফতে রাশিদার ইতিহাস সমাপ্ত হল। এখন সূচনা হবে খিলাফতে বনূ উমাইয়ার বর্ণনা। খিলাফতে বনূ উমাইয়া এবং তাঁর পরে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য খিলাফতের তুলনায় খিলাফতে রাশিদার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, খুলাফায়ে রাশিদীনের প্রত্যেক খলীফা মুসলমানদের গণ্যমান্য ব্যক্তিবৃন্দ ও সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা নির্বাচিত হতেন। কোন খলীফাকে তাঁর পূর্ববর্তী খলীফা মনোনীত করলেও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শের পরই তিনি তা করতেন। এর সাথে বংশগত উত্তরাধিকারিত্বের কোন দাবী কোন মতেই সম্পৃক্ত ছিল না। অন্যান্য খিলাফতের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি পরিত্যক্ত হয় এবং সেখানে চালু করা হয় অযৌক্তিক উত্তরাধিকারিত্ব ভিত্তিক রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা।

খিলাফতে রাশিদার সময়ে, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ, আপত্তি, উত্থাপন, জবাব তলব এবং পরামর্শ দানের পুরাপুরি অধিকার যে কোন মুসলমানের ছিল। কিন্তু পরবর্তী খিলাফতসমূহে মুসলমানদেরকে সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়।

খিলাফতে রাশিদার যুগে খলীফাদের বাহ্যিক অবস্থা, তাঁদের পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসগৃহ, পরিবহন, খাদ্য, পানীয়, উঠাবসা ও চলাফেরা সব কিছুই সাধারণ মুসলমানদের মত ছিল। কিন্তু পরবর্তী খিলাফতসমূহে খলীফার চালচলন ছিল রাজসিক এবং সাধারণ মানুষের চালচলন ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের।

খিলাফতে রাশিদার আমলে খলীফা তাঁর ইচ্ছানুযায়ী নিজের জন্য বা নিজের আত্মীয় স্বজনের জন্য একটি পয়সাও খরচ করতে পারতেন না। কেননা রাষ্ট্রীয় কোষাগার তখন ছিল সাধারণ মুসলমানের সম্পত্তি। কিন্তু পরবর্তী খিলাফতসমূহে বায়তুলমাল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগারকে খলীফারই ব্যক্তিগত সম্পত্তি মনে করা হতে থাকে। ফলে খলীফা যাকে ইচ্ছা দান করতেন, উপহার-উপঢৌকন দিতেন। এতে কারো কোনরূপ আপত্তির অধিকার ছিল না।

খুলাফায়ে রাশিদীনের সবাই ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবী। তাঁরা সব সময় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংস্পর্শে থাকতেন। পরবর্তীকালে মুআবিয়া ও আবদুল্লাহ ইব্‌নুয যুবায়র (রা) ছাড়া অন্য কোন উল্লেখযোগ্য সাহাবী খলীফা ছিলেন না।

খুলাফায়ে রাশিদীনের সবাই ছিলেন ঐ সমস্ত ব্যক্তি যাঁদেরকে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তী খিলাফতসমূহে এ ধরনের কোন সাহাবী পাওয়া যায় না। খুলাফায়ে রাশিদীন সাধারণ মুসলমানদের নিজেদেরই সন্তানতুল্য মনে করতেন, তাদেরকে নিজেদের দাস বা প্রজা জ্ঞান করতেন না এবং তাদেরকে অন্যায়ভাবে কোন নির্দেশ পালনে বাধ্য করতেন না। কিন্তু পরবর্তী খিলাফতসমূহে এর বিপরীত অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। তখনকার খলীফারা 'কায়সার' ও কিসরা' রূপে আত্মপ্রকাশ করেন।

খুলাফায়ে রাশিদীনের শাসন পদ্ধতি পার্থিব দিক দিয়ে কায়সার ও কিসরার হুকুমতের মত জুলুম অত্যাচারমূলক ছিল না। ধর্মীয় ব্যাপারেও তাঁরা নিজেরা কিছু করতে পারতেন না। যখন কোন ধর্মীয় ব্যাপারে সন্দেহ বা মতবিরোধ দেখা দিত তখন তাঁরা অন্যান্য সাহাবীকে ডেকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন এবং যে কথাটি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে প্রমাণিত হত তদনুযায়ী হুকুম জারি করতেন। যখন কোন ধর্মীয় ব্যাপারে তাঁদের ভুল-ভ্রান্তি হয়ে যেত এবং পরবর্তী সময়ে তা ধরা পড়ত তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে তা সংশোধন করে নিতেন। মোটকথা, ধর্মীয় ও পার্থিব উভয় দিক দিয়ে তাঁদের নেতৃত্ব ও হুকুমত ছিল বর্তমান যুগের খাঁটি গণতান্ত্রিক রাষ্ঠসমূহের প্রেসিডেন্ট ও দীনী উলামার নেতৃত্ব ও হুকুমতের এক সম্মিলিত রূপ। তবে একমাত্র কুরআন-সুন্নাহ ছিল তাঁর দিক-নির্দেশক। নিজ ইচ্ছানুযায়ী তাঁরা কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারতেন না। তাঁদের কাজ ছিল শরীআতের হুকুম-আহকাম জারি করা এবং শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা। তাঁদের যুগে জনসাধারণ সব ধরনের স্বাধীনতা ভোগ করত। তারা যে কোন ছোট-খাটো ব্যাপারেও আপত্তি উত্থাপন করতে পারত এবং খলীফা তাঁর সন্তোষজনক জবাব দানে বাধ্য থাকতেন। খুলাফায়ে রাশিদীনের হুকুম-আহকাম জারি করার জন্য কোন শক্তির বা বাহিনীর প্রয়োজন ছিল না। বরং প্রত্যেক ব্যক্তিই ঐ হুকুম-আহকাম চাই তা তার বিরুদ্ধে যাক না কেন-বিনা দ্বিধায় মেনে নিত। এতে পরিষ্কার প্রমাণিত হয় যে, তাঁদের হুকুমত ছিল ভক্তি-ভালবাসার উপর প্রতিষ্ঠিত, ভয়ভীতি বা জুলুম অত্যাচারের মাধ্যমে তা পরিচালিত হত না। কিন্তু পরবর্তী খলীফার শরীআতের বিধান জারি এবং তা প্রতিষ্ঠা করার কাজ নিজেরা ছেড়ে দিয়ে মওলভী মুফতী ও বিচারকদের হাতে সোপর্দ করেন। মসজিদসমূহে খতীব ও ইমাম পৃথক পৃথক লোককে নিয়োগ করা হয়। খলীফারা সেনাবাহিনী ও রাষ্ট্রীয় কোষাগারের কর্তৃত্ব নিজেদের হাতে রেখে এই দুই শক্তিকে নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করতে শুরু করেন। যার ফলে তাদের হুকুমত ও রাষ্ট্র ভয়ভীতি ও জুলুম-অত্যাচারের উপর পরিচালিত হতে থাকে। মানুষের বৈধ অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া হয়। ধর্মীয় বিধান জারি ও প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও পরস্পর ভুল বোঝাবুঝি ও সন্দেহ-সংশয় নিরসনের বৈধ স্বাধীনতা জনসাধারণের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়। এ কারণেই আজ অনেকেই বুঝতে পারে না, একজন রঈস-বা নবাবের যে ধরনের ভয়ভীতি সাধারণ মানুষের অন্তরে বিদ্যমান বা রঈস-নবাবরা তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকে যে পরিমাণ জরুরী মনে করেন– তা কেন খুলাফায়ে রাশিদীনের মধ্যে বিদ্যমান ছিল না বা কেন তারা তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকে কোন জরুরী বিষয় বলে মনে করতেন না। খুলাফায়ে রাশিদীনের প্রতি ভয়-ভীতি

ছিল ঠিক সেরূপ যেরূপ ভয়ভীতি থাকে একজন দয়ালু শিক্ষক সম্পর্কে কিংবা স্নেহময় মাতাপিতার সম্পর্কে। তাঁরা মানুষের রক্ষক ছিলেন, ভক্ষক ছিলেন না। আজ একজন সূফী, মুফতী কিংবা জুব্বাধারী মওলবীর কথা ও কাজের সমালোচনা করতে গিয়ে মানুষ যে পরিমাণ ভয় পায় খুলাফায়ে রাশিদীনের সমালোচনা করতে গিয়ে জনসাধারণ ততটা ভয়ও পেত না।

মুসলমানদের সংশোধনই ছিল খুলাফায়ে রাশিদীনের প্রধান লক্ষ্য। তাঁরা ছিলেন আল্লাহ্‌র বাণী প্রচার এবং শরীআতের হুকুম জারি করারই প্রত্যাশী। শুধু সম্পদ ও প্রাচুর্য লাভের উদ্দেশ্যে দেশের পর দেশ জয় করা তাঁদের লক্ষ্য ছিল না।

খুলাফায়ে রাশিদীন বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আদায়কৃত কর এবং গনীমাত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) জমা করে রাখার পক্ষপাতী ছিলেন না। যে পরিমাণ সম্পদ বায়তুলমালে আসত তাঁরা তা মুসলমান-দের মধ্যে বন্টন করে দিতেন অথবা জনসাধারণের কল্যাণে বিভিন্ন কাজে খরচ করে ফেলতেন। এভাবে সমগ্র মাল খরচ করার পর তাঁরা বায়তুলমালকে একেবারে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করে নিতেন; কিন্তু পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত খিলাফতসমূহের অবস্থা ছিল এর ঠিক বিপরীত।

খুলাফায়ে রাশিদীন সর্বদা হজ্জ করতে যেতেন, সেখানে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত মুসলমানদের সাথে মিলিত হতেন, তাদের অভাব-অভিযোগ ও প্রয়োজনাদি সম্পর্কে অবহিত হতেন, তাদের অঞ্চলে নিয়োগকৃত সরকারী কর্মকর্তার যোগ্যতা-অযোগ্যতা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতেন এবং তদনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতেন। এভাবে হজ্জের বিরাট জনসমাবেশকে তাঁরা তাদের উপর অর্পিত দায়িত্বসমূহ পালনের একটা বিরাট সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করতেন। যদি কোন জরুরী কাজ কিংবা অন্য কোন প্রতিবন্ধকতার কারণে তাঁরা হজ্জে যেতে অপারগ হতেন তাহলে কোন ব্যক্তিকে নিজের প্রতিনিধি পাঠিয়ে উল্লিখিত প্রয়োজনাদি পূরণ করতেন। কিন্তু খিলাফতে রাশিদার পর অন্যান্য খলীফা হজ্জের জনসমাবেশ থেকে উপরোক্ত পদ্ধতিতে উপকৃত হওয়ার দিকটি ত্যাগ করেন।

খুলাফায়ে রাশিদীন রাজধানীর মসজিদে নিজেরা সালাতের ইমামতি করতেন এবং জুমু'আর খুতবা দিতেন। তাঁদের পর শুধু বনূ উমাইয়ার খলীফাদের এই রীতি প্রচলিত থাকলেও অন্যান্য খলীফা সালাতের ইমামতি ও জুমু'আর খুতবা প্রদানের দায়িত্ব থেকে নিজেদের অব্যাহতি দেন।

খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগে মুসলমানদের মধ্যে পৃথক পৃথক ধর্মীয় ফিরকা বা দল-উপদল ছিল না। তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিত, তবে দীন ও মিল্লাত এবং আকীদা-বিশ্বাসের ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে দলাদলির নাম-নিশানাও ছিল না, যা পরবর্তীকালে দেখা যায়। আজ তো শীআ', সুন্নী, ওয়াহাবী, হানাফী, শাফিঈ, কাদিরী, চিশতী ইত্যাদি শত শত ফিরকা বিদ্যমান। লক্ষণীয় ব্যাপার হল, এদের প্রতিটি ফিরকাই অপরাপর ফিরকা থেকে নিজেদের উৎকৃষ্টতর মনে করে এবং অন্যদের থেকে নিজেদের পৃথক করে রাখার উপর গুরুত্বও আরোপ করে।

খুলাফায়ে রাশিদীনের আমলে দীন ও শরীআতের সামনে আত্মীয়তা, জাতীয়তা, আঞ্চলিকতা ইত্যাদির কোন গুরুত্ব ছিল না। যখন দীন ও মিল্লাতের প্রশ্ন সামনে আসত তখন ভাই-ভাইয়ের বা পিতা-পুত্রের পক্ষপাতিত্ব করা তো দূরের কথা, তার দিকে ফিরেও তাকাত না। তখন প্রতিটি লোকের বাক-স্বাধীনতা ছিল। একজন সাধারণ মুসলিমও খলীফার সামনাসামনি তাঁর সমালোচনা করতে পারতো। কিন্তু পরবর্তী খলীফাদের আমলে এই বাক-স্বাধীনতা এবং দীন ও মিল্লাতের প্রতি ঐকান্তিকতা আর বাকী থাকে নি।

খুলাফায়ে রাশিদীন নিজেদেরকে মুসলমানদের বাদশাহ্ নয় বরং একজন নগণ্য খাদিম মনে করতেন এবং তদনুযায়ী তাদের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত রাখতেন। তাঁরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, তাঁরা মুসলমানদের রাখাল বা চৌকিদার ছাড়া কিছু নন। খুলাফায়ে রাশিদীনের কোন কথা বা কাজের উপর সামান্য সন্দেহ দেখা দিলেও যে কোন লোক স্বাধীনভাবে তার সমালোচনা ও প্রতিবাদ করতে পারতো।

তারীখ-ই-ইসলামের এই প্রথম খণ্ডে খিলাফতে রাশিদার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করা হল। এতে অধিকাংশ সাহাবায়ে কিরামের নাম বিভিন্ন ঘটনা প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। আশা করি ঐসব নামের বরকতেই এই খণ্ডটির অধ্যয়ন শ্রদ্ধেয় পাঠকদের জন্য কল্যাণকর হবে। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে দশজন সাহাবী, যাদেরকে 'আশারায়ে মুবাশশারাহ' (বেহেশতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন) বলা হয়, সর্বাধিক সম্মানিত ছিলেন। এরা হচ্ছেন সেই দশজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, যাঁরা নিজেদের আমলে হাসানাহ্ তথা পুণ্য কার্যাদির বদৌলতে এই দুনিয়ায়ই স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র মুখ থেকে নিজেদের জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ শ্রবণ করেছেন। এরা হচ্ছেন : হযরত আবূ বকর, হযরত উমর, হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত আবদুর রহমান ইবন আওফ, হযরত তালহা, হযরত যুবায়র, হযরত সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস, হযরত আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ্ ও হযরত সাঈদ ইবন যায়দ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম)। শেষোক্ত জন অর্থাৎ হযরত সাঈদ ইবন যায়দ (রা) ছাড়া বাকি নয়জন সম্পর্কে বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। নিম্নে তাঁর সম্পর্কেও কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হচ্ছে।

হযরত সাঈদ ইবন যায়দ (রা)

তিনি ছিলেন হযরত উমর ফারূক (রা)-এর চাচাত ভাই ও ভগ্নিপতি। তাঁর বংশতালিকা নিম্নরূপ : সাঈদ ইবন যায়দ ইবন আমর ইবন নুফায়ল ইবন আবদুল্লাহ্ ইবন কুরত ইবন রিবাহ ইবন আদী। রাসূলুল্লাহ্ (রা)-এর অধিনায়কত্বে পরিচালিত সব কয়টি যুদ্ধেই তিনি তাঁর সঙ্গী ছিলেন। শুধু বদর যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেননি। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে বদরযুদ্ধের গনীমতের অংশ দেন এবং তাঁকে বদরীদেরও অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি অনেক কারামত তথা অলৌকিক ঘটনার অধিকারী এবং 'মুসতাজাবুদ দাওয়াত' (যার দু'আ কবূল হয়) ছিলেন। হিজরী ৫১ সনে ৭২ বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন। একদা জনৈক স্ত্রীলোক তাঁর বিরুদ্ধে জমি সংক্রান্ত একটি মিথ্যা দাবী উত্থাপন করে। তিনি তার জন্য এই বলে বদ দু'আ করেন, "হে আল্লাহ্! যদি এই স্ত্রীলোক তার দাবীতে মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তাকে অন্ধ করে দাও। সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকটি অন্ধ হয়ে গেল এবং কিছুদিন পর কোথাও যাওয়ার সময় একটি কুয়ায় পড়ে মারা গেল। একদা কূফার জামে মসজিদে হযরত আলী (রা) সম্পর্কে জনৈক ব্যক্তিকে কিছু অপ্রীতিকর শব্দ উচ্চারণ করতে শুনে তিনি বললেন : আবূ বকর, উমর, উসমান, আলী, তালহা, যুবায়র, আবূ উবায়দা, সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস এবং আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা)—এই নয় ব্যক্তি হচ্ছেন 'আশারায়ে মুবাশশারা-এর অন্তর্ভুক্ত। জনৈক ব্যক্তি তখন বলল, দশম ব্যক্তির নামটিও অনুগ্রহ করে বলে দিন। একথা শুনে তিনি চুপ হয়ে গেলেন। ঐ ব্যক্তি পুনরায় তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তর দিলেন, আমি হচ্ছি ঐ দশম ব্যক্তি।

ইফাবা (উন্নয়ন) ২০০৭-২০০৮/অ:স:/৫০১০-৩,২৫০

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ